আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯ - ৯১১ হি. / ১৪৪৫ - ১৫০৫ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

২

ষষ্ঠ পারা • সপ্তম পারা • অষ্টম পারা • নবম পারা • দশম পারা

• সম্পাদনায় •

হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

• অনুবাদ ও রচনায় •

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাদ, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

• প্রকাশনায় •

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা

মূল ❖ আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.)
অনুবাদক ❖ মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.

প্রকাশকাল ❖ ৮ জিলকদ, ১৪৩১ হিজরি
১৭ অক্টোবর, ২০১০ ইংরেজি
২ কার্তিক, ১৪১৭ বাংলা
শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৬২০.০০ টাকা মাত্র

বাংলা ভাষাভ. জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলা লেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন র দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্ব ারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাং ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অষ্টম, নবম ও দশম বং তরুণ ও উদীয়মান লেখক, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ-এর উস্তাদ স্নেহের মা আবদুল গাফফারকে ষষ্ঠ ও সপ্তম পারার [দ্বিতীয় খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন রা এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্প মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে মিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও রকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)], তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতু সাবী, তাফসীরে উসমানি, তাফসীরে মাযহারীসহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

সূচিপত্র

الجزء السابع : সপ্তম পারা
১৭৯-২৯৬

الجزء الثامن : অষ্টম পারা
২৯৭-৪২৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء التاسع নবম পারা
৪২৭-৫৭৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء العاشر দশম পারা
৫৭৫-৭১৭

١٥٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ كُلِّهِمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيْهِمْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اُجُوْرَهُمْ ط ثَوَابَ اَعْمَالِهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمًا بِاَهْلِ طَاعَتِهٖ.

১৫২. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণ সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি তাদের কার্যের পুরস্কার দিবেন نُؤْتِيْهِمْ শব্দটি نُوْن দ্বারা অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন ও ى দ্বারা অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে পঠিত রয়েছে। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল তাঁর বন্ধুদের প্রতি এবং পরম দয়ালু। বাধ্যগতদের বিষয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ : اَلْجَهْرَ শব্দের মর্ম হলো رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقَوْلِ وَغَيْرِهٖ অর্থাৎ আওয়াজ উঁচু করা। এখানে جَهْرٌ بِالْقَوْلِ দ্বারা সাধারণ (مُطْلَقْ) اِظْهَارٌ বা প্রকাশকরণ উদ্দেশ্য। চাই তা সশব্দে হোক বা না হোক।

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : এটি উহ্য مُسْتَثْنٰى مِنْهُ সুতরাং এ আপত্তি শেষ হয়ে গেল যে, اِلَّا مَنْ ظُلِمَ পূর্বের থেকে اِسْتِثْنَا শুদ্ধ নয় এবং اَلْجَهْرَ হলো মাসদারের উহ্য ফায়েল আর মাসদারের ফায়েল হযফ করা জায়েজ আছে। আর اِلَّا مَنْ ظُلِمَ সেটা উহ্য ফায়েল থেকেই مُسْتَثْنٰى কিংবা উহ্য مُضَافٌ মানা হবে। মূল ইবারত হবে এভাবে– اِلَّا جَهْرَ مَنْ ظُلِمَ উক্ত উভয় সূরতে مُسْتَثْنٰى টি مُتَّصِلٌ হবে।

قَوْلُهُ اَىْ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে মহব্বত না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্রোধ ও শাস্তি।

قَوْلُهُ : فَاِنْ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا : এ জুমলাটি جَوَاب شَرْط আর اِنْ تُبْدُوْا এবং اِنْ تُخْفُوْهُ এবং اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ –এই তিনটি জুমলা عَفُوًّا -এর মাধ্যমে شَرْط হয়েছে। جَوَاب شَرْط দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে মূলত তৃতীয় জুমলা তথা اَوْتَعْفُوْا এর جَوَاب شَرْط উদ্দেশ্য। কেননা যদি শর্ত দ্বারা اِبْدَاءِ خَيْر বা اِخْفَاءِ خَيْر উদ্দেশ্য হতো তাহলে جَوَاب شَرْط হিসেবে শুধু فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا বলে ক্ষান্ত করা শুদ্ধ হবে না। এ থেকে জানা গেল, اِبْدَاءِ خَيْر এবং اِخْفَاءِ خَيْر যে কেবল ভূমিকা স্বরূপ আনা হয়েছে। একথা বোঝানোর জন্য যে, প্রকাশ্যে কিংবা গোপনভাবে কল্যাণ কাজ করাও ছওয়াবের কাজ কিন্তু প্রতিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া অনেক বড় ছওয়াবের কাজ। কেননা এটি আল্লাহ তা'আলারও সিফত

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ : **পরনিন্দা ও কুৎসা রচনা :** আলোচ্য আয়াত চারিত্রিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অর্থে পরনিন্দা ও কুৎসা রচনা এবং আইনের ভাষায় কারো মানহানিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ, একক জাতি উভয়ের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এক মহান নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। اَلْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ এ কথার আওতায় কারো অনুপস্থিতিতে কারো নিন্দা চর্চা করা এসে যায় এবং সম্মুখে পরস্পর তীব্র বাকবিতণ্ডা ও অকারণে ও শরিয়তের ন্যায়সঙ্গত কল্যাণদৃষ্টি ব্যতীত নিন্দাবাদ কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়; সামনেও নয় আর অগোচরেও নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ : অবশ্য মজলুম ব্যক্তি তার মনের উষ্ণতা-বাষ্প বকেঝকেও নিবারণ করতে পারে এবং বিচারকের সামনে অভিযোগও করতে পারে।

মানুষের স্বভাবগত দাবি, তার পূর্ণ অক্ষমতা ও আংশিক অক্ষমতার প্রয়োজনের প্রতি এতটা গুরুত্ব প্রদান শরিয়তে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম করেছে কী? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি শরিয়ত মাজলুমকে জালেমের সামলোচনা করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে একথাও বলে দিয়েছে যে, এটি আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো ভালো কাজ নয়; বরং ভালো কাজ হলো, ক্ষমা করে নিজের ভেতর আল্লাহর আখলাক সৃষ্টি কর।

এ হচ্ছে অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনে ইসলামি মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত। একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ অর্থাৎ তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়; কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে, যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনে কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে যায়। -[জামালাইন-২/১১৮]

قَوْلُهُ إِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تَعْفُوْا الخ : চারিত্রিক দিক থেকে এ তিনটি স্তর বস্তুত ভিন্ন এবং এক্ষেত্রে অতি সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। إِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا মানুষ স্বভাবিকভাবেই কোনো ভালো কাজ করার সাথে সাথেই তার প্রকাশনা ও ঘোষণা দিয়ে থাকে। মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করার প্রবণতা তার কিছুটা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এক রকম সৎকাজ এতেও হয়ে গেল, নেকী এতেও হলো; কিন্তু তা হালকা ধরনের, প্রাথমিক পর্যায়ের।

قَوْلُهُ اَوْ تُخْفُوْهُ : দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদা এই, সৎকাজ করে এবং মানুষের কাছ থেকে বিনিময় ও সুখ্যাতির কোনো আশাই করবে না; বরং কোনো লোককে তা জানতেই দেবে না এবং সর্বদা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কতিপয় জরুরী টীকা :

قَوْلُهُ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ : তৃতীয় মর্যাদা এই যে, কোনো লোক কারো পক্ষ থেকে কোনো মন্দ আচরণের সম্মুখীন হয়ে গেলে সে তা এড়িয়ে যায় প্রতিশোধ নেয় না। তবে এটা সহ্য করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এতে সে যা অর্জন করে তার মূল্য সদ্ব্যবহার ও সদাচারণের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

এই আয়াতে নির্যাতিতকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত ও শক্তিমান হয়েও যখন অপরাধীকে ক্ষমা করেন, তখন অধীনস্থ ও দুর্বল বান্দার তো বিনাবাক্যে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা উচিত। সারকথা, জুলুমের জন্য জালিমের প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ, তবে ধৈর্য ধরে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদেরকে সংশোধন করতে চাইলে তাদের উৎপীড়ন ও অপকার্যে ধৈর্যধারণ কর এবং গোপনে সদয়ভাবে তাদেরকে বোঝাও। প্রকাশ্যে তিরস্কারও নিন্দা পরিহার কর। তাদেরকে প্রকাশ্য শত্রু বানিও না। -[তাফসীরে উসমানী, টীকা-২১১]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ .... وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ الخ : ইহুদিরাও জঘন্য মুনাফিক : এখান থেকে ইহুদিদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইহুদিদের চরিত্রে মুনাফিকী ও কপটতা ছিল অতিমাত্রায়। রাসূলে কারীম ﷺ -এর জমানায় যারা মুনাফিক ছিল তারা হয় ইহুদি ছিল, অথবা তাদের সাথে যারা সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত ও তাদের পরামর্শ মানত, এমন সব লোক ছিল। তাই কুরআন মাজীদের অধিকাংশ বর্ণনায় একই স্থানে উভয় দলের উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে না, আবার কতক রাসূলকে মানে, কতককে অস্বীকার করে, মোটকথা ইসলাম ও কুফরের মাঝখানে নিজেদের জন্য একটি নতুন ধর্মমত উদ্ভাবন করে, তারাই প্রকৃত কাফের, তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী টীকা-২১২]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তখনই গ্রহণযোগ্য যখন সমকালীন নবীর প্রতিও ঈমান আনা হয় ও তাঁর আদেশ পালন করা হয়। নবীকে অস্বীকার করে মহান আল্লাহকে মানা অর্থহীন, তাঁর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই; বরং কোনো একজন নবীকে অস্বীকার করা মহান আল্লাহ ও অন্য সব নবীকে অস্বীকার করার নামান্তর। ইহুদিরা যখন রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রত্যাখ্যান করল তখন তারা আল্লাহকে এবং অন্য সব নবীকে প্রত্যাখ্যানাকারী বলে সাব্যস্ত হলো এবং ঘোর কাফের হিসেবে গণ্য হলো। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا : আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও সতর্ক করা হয়েছে যে, কেউ মনে করতে পারে উপরে বর্ণিত চিহ্নিত লোকদের অবস্থান ও মর্যাদা তো কাফেরদের চেয়ে ভালো হবে। কিছুতেই নয়; বরং তারাও পাকা কাফের বলে প্রমাণিত। أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ বাক্য বিন্যাসেই তাকিদ রয়েছে। তদুপরি حَقًّا শব্দটি অতিরিক্ত তাতে জোর সৃষ্টি করেছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ الخ : এ আয়াতে ঈমানদারদের চরিত্র ও আদর্শের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা সকল নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। যেমন নাকি মুসলমানগণ কোনো নবীকে অস্বীকার করে না।

এ আয়াত দ্বারা وَحْدَتُ اَدْيَانْ তথা 'সকল ধর্ম এক' এ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। যার প্রবক্তাদের নিকট মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা জরুরি নয় এবং ঐ সকল অমুসলিমকেও মুক্তির যোগ্য মনে করে যারা নিজেদের ধারণামতে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ঈমান বিল্লাহর সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর রিসালতের প্রতিও ঈমান আনা আবশ্যক। যদি এই শেষ রিসালতকে কেউ অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহর প্রতি তার ঈমানও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে। উল্লিখিত আয়াতে মূলত ইহুদিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা পূর্ববর্তী নবীদের মধ্য হতে নিজেদের সিলসিলারই কতিপয় নবীকে স্বীকার করে না। যেমন তারা হযরত ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.)-কে নবী বলে স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কেও অস্বীকার করেছে। কিন্তু যেহেতু কুরআনের শব্দ ব্যাপক, তাই ইহুদি খ্রিস্টান ছাড়াও বর্তমান যুগের মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবীরাও এতে শামিল হবে। ইউরোপে Deists নামে একটি ফের্কা আছে এবং হিন্দুস্থানেও ব্রাহ্মণ সমাজ নামে একটি ফের্কা আছে। যারা তাওহীদের প্রবক্তা। কিন্তু বিশ্বাসগতভাবে তারা ওহী ও নবুয়তের অস্বীকারকারী। এসব এমন ভুল ও অসম্পূর্ণ চিন্তাধারা যেগুলো নিঃশেষ ও নির্মূল করার জন্যই ইসলামের আগমন। ইসলাম তো সকল নবী-রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শের স্বীকার করে। এতে কোনো অবকাশ নেই যে, অমুক নবীকে মানা যাবে বা অমুককে মানা যাবে না।

এ আয়াতে ঐ সকল নামধারী মুক্তচিন্তার অধিকারী মুসলমানকেও সতর্ক করে দিয়েছে, যারা শরিয়তের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দসই বিষয়কে বেছে নেয়। যেমনটি হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাট আকবার করেছিল। সে কুফর ও ইসলামের সংমিশ্রণে দীনে ইলাহী নামে এক নতুন ধর্মের আবিষ্কার করেছিল।

অনুবাদ

١٥٣. يَسْئَلُكَ يَا مُحَمَّدُ اَهْلُ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدُ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ جُمْلَةً كَمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى تَعَنُّتًا فَاِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ سَاَلُوْا اَيْ اٰبَاؤُهُمْ مُوْسٰٓى اَكْبَرَ اَعْظَمَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً عَيَانًا فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ الْمَوْتُ عِقَابًا لَهُمْ بِظُلْمِهِمْ ج حَيْثُ تَعَنَّتُوْا فِي السُّؤَالِ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ اِلٰهًا مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ الْمُعْجِزَاتُ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ج وَلَمْ نَسْتَاصِلْهُمْ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا تَسَلُّطًا بَيِّنًا ظَاهِرًا عَلَيْهِمْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ بِقَتْلِ اَنْفُسِهِمْ تَوْبَةً فَاَطَاعُوْهُ.

১৫৩. হে মুহাম্মদ! কিতাবীগণ অর্থাৎ ইহুদিগণ তোমাকে কষ্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাকে তাদের জন্য আসমান থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর যেমন এক দফায় সম্পূর্ণ কিতাব নাজিল হয়েছিল তেমনি এক দফায় সম্পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে। তোমার নিকট যদি এই দাবি সাংঘাতিক বলে মনে হয় তবে জেনে রাখ, মূসার নিকট তারা অর্থাৎ তাদের পিতৃপুরুষরা এতদপেক্ষাও বড় সাংঘাতিক দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, প্রকাশ্যে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে আমাদেরকে আল্লাহ দর্শন করাও। তাদের এই সীমালঙ্ঘনের জন্য অর্থাৎ প্রশ্নে এই ধরনের অবাধ্যতা প্রদর্শন করায় তারা বজ্রাহত হয়েছিল। অর্থাৎ এর শাস্তি স্বরূপ তারা বজ্রের মাধ্যমে মৃতুর শিকার হয়েছিল তাদের নিকট আল্লাহর একত্ববাদিতার উপর স্পষ্ট প্রমাণ মুজেযাসমূহ আসার পরও তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, আমি এটাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। ফলে তাদেরকে আর সমূলে ধ্বংস করিনি এবং মূসাকে স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেছিল। অর্থাৎ তাদের উপর তাকে সুস্পষ্ট ক্ষমতার অধিকারী করেছিলাম। তিনি তাদেরকে তওবা স্বরূপ স্ব স্ব জনকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তাদেরকে তা পালন করতে হয়েছিল।

١٥٤. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ الْجَبَلَ بِمِيْثَاقِهِمْ بِسَبَبِ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ لِيَخَافُوْا فَيَقْبَلُوْهُ وَقُلْنَا لَهُمْ وَهُوَ مُظِلٌّ عَلَيْهِمُ ادْخُلُوا الْبَابَ بَابَ الْقَرْيَةِ سُجَّدًا سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيْدِ الدَّالِ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الدَّالِ اَيْ لَا تَعْتَدُوْا فِي السَّبْتِ بِاصْطِيَادِ الْحِيْتَانِ فِيْهِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا عَلٰى ذٰلِكَ فَنَقَضُوْهُ.

১৫৪. তাদের অঙ্গীকারের জন্য অর্থাৎ তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য তূর পর্বতকে তাদের উপরে তুলে ধরেছিলাম যেন তারা ভয় পায় এবং তা গ্রহণ করে নেয় এবং তা তাদের মাথার উপর স্থির রেখেই তাদেরকে বলেছিলাম, নতশিরে অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে দ্বারে অর্থাৎ নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে বলেছিলাম শনিবারে অর্থাৎ এদিন মৎস শিকার করত তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। لَا تَعْدُوْا এটা অপর এক কেরাতে ع বর্ণে ফাতাহ ও د বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটাতে মূলত د বর্ণ ت -এর اِدْغَامْ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে বলে ধরা হবে। অর্থ– সীমালঙ্ঘন করিও না। এবং এই বিষয়ে আমি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম কিন্তু তারা তাও ভঙ্গ করে।

١٥٥. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَا زَائِدَةٌ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ لَعَنَّاهُمْ بِسَبَبِ نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ لِلنَّبِيِّ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط لَا تَعِى كَلَامَكَ بَلْ طَبَعَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا تَعِى وَعْظًا فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ص مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ ـ

১৫৫. তাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে فَبِمَا -এর مَا শব্দটি এই স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। আর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। এই স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়া (لَعَنَّا) -এর সাথে এটি مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছিলাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত" সুতরাং তোমার কথা ধরতে পারি না। রাসূল ﷺ সমীপে তাদের এই উক্তি করার কারণে আমি তাদের অভিসম্পাত করেছিলাম; বরং তাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তাতে সিল করে দিয়েছেন, মোহর করে দিয়েছেন। ফলে তারা কোনো উপদেশ ধরে রাখতে পারে না। সুতরাং তাদের খুব কম জনই যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সাথীগণ বিশ্বাস আনয়ন করে।

١٥٦. وَبِكُفْرِهِمْ ثَانِيًا بِعِيْسٰى وَكُرِّرَ الْبَاءُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا لا حَيْثُ رَمَوْهَا بِالزِّنَا ـ

১৫৬. এবং দ্বিতীয়বার ঈসার সাথে কুফরি করার কারণে بِكُفْرِهِمْ এটাকে যে বাক্যটির সাথে عَطْف করা হয়েছে সেই বাক্যটি অর্থাৎ بِمَا نَقْضِهِمْ বাক্যটি এবং এর মাঝে فَصْل বা ব্যবধান থাকায় এই স্থানে ب অক্ষরটির পুনরুক্তি করা হয়েছে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেওয়ার কারণে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছিলাম। হযরত মারইয়ামকে তারা ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল।

١٥٧. وَقَوْلِهِمْ مُفْتَخِرِيْنَ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط فِىْ زَعْمِهِمْ اَىْ بِمَجْمُوْعِ ذٰلِكَ عَذَّبْنَاهُمْ قَالَ تَعَالٰى تَكْذِيْبًا لَّهُمْ فِىْ قَتْلِهٖ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط الْمَقْتُوْلُ وَالْمَصْلُوْبُ وَهُوَ صَاحِبُهُمْ بِعِيْسٰى اَىْ اَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِ شِبْهَهٗ فَظَنُّوْهُ اِيَّاهُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط اَىْ فِىْ عِيْسٰى لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مِنْ قَتْلِهٖ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَمَّا رَاَوُا الْمَقْتُوْلَ اَلْوَجْهُ وَجْهُ عِيْسٰى وَالْجَسَدُ لَيْسَ بِجَسَدِهٖ فَلَيْسَ بِهٖ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ بَلْ هُوَ هُوَ ـ

১৫৭. আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' অহংকার করত তাদের ধারণানুসারে এই উক্তি করায় অর্থাৎ উল্লিখিত এই সব কারণে আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছি। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা সম্পর্কিত বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি। কিন্তু তাদের এরূপ ভুল ধারণা হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের সঙ্গী ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত ব্যক্তিটির সাথে হযরত ঈসার চেহারার সামঞ্জস্যতায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাকে হযরত ঈসার, আকৃতির সদৃশ করে দিলে তারা তাকেই ঈসা বলে ধারণা করে বসে ও তাকে হত্যা করে। যারা তাঁর অর্থাৎ হযরত ঈসার বিষয়ে মতভেদ করেছিল নিশ্চয় তারা তার এই হত্যা সম্পর্কে সংশয়যুক্ত। পরে নিহত ব্যক্তিটিকে দেখে তাদের কয়েকজন বলেছিল, চেহারা তো ঈসার মতো মনে হয় তবে শরীরের আকৃতি তাঁর আকৃতির মতো নয়। সুতরাং এ ঈসা নয়। অপর কয়েকজন বলেছিল, ন এ-ই সেই।

مَا لَهُمْ بِهِ بِقَتْلِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لٰكِنْ يَتَّبِعُوْنَ فِيْهِ الظَّنَّ الَّذِيْ تَخَيَّلُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا لا حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِنَفْيِ الْقَتْلِ ـ

আর এই সম্পর্কে অর্থাৎ তার হত্যা সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই নেই إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ এটি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ এই বিষয়ে তারা কেবল তাদের ধারণাকৃত সন্দেহেরই অনুসরণ করে। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। يَقِيْنًا শব্দটি হত্যা না করার বক্তব্যটির তাকিদ স্বরূপ حَالٌ হয়েছে।

١٥٨. بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا فِيْ مُلْكِهِ حَكِيْمًا فِيْ صُنْعِهِ ـ

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী ও তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

١٥٩. وَإِنْ مَا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِعِيْسٰى قَبْلَ مَوْتِهِ ج أَيِ الْكِتَابِيِّ حِيْنَ يُعَايِنُ مَلٰئِكَةَ الْمَوْتِ فَلَا يَنْفَعُهُ إِيْمَانُهُ أَوْ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى لَمَّا يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عِيْسٰى عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ج بِمَا فَعَلُوْهُ لَمَّا بُعِثَ إِلَيْهِمْ ـ

১৫৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, সে إن এটা এ স্থানে مَا বা না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মৃত্যুর পূর্বে যখন সে মৃত্যুর ফেরেশতা দর্শন করবে তখন তার উপর অর্থাৎ হযরত ঈসার বিশ্বাস আনায়ন করবে না। কিন্তু এই সময়ের বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা তার কোনো উপরকার সাধিত হবে না। অথবা এর অর্থ হলো, হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি অবতরণ করবেন, তখন তাঁর অর্থাৎ ঈসার মৃত্যুর পূর্বে সকল কিতাবী তাঁর উপর ঈমান আনবেন। এবং কিয়ামতের দিন সে অর্থাৎ ঈসা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ যখন তাঁকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তারা কি করেছে সেই সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য দান করবেন।

١٦٠. فَبِظُلْمٍ أَيْ بِسَبَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا هُمُ الْيَهُوْدُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ هِيَ الَّتِيْ فِيْ قَوْلِهِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ الْآيَةَ وَبِصَدِّهِمُ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ صَدًّا كَثِيْرًا لا

১৬০. যারা ইহুদি হয়েছে তাদের জুলুমের জন্য هَادُوْا অর্থ– ইহুদিগণ। তাদের জন্য অবৈধ করেছি উত্তম জিনিস যা তাদের জন্য বৈধ ছিল, আল্লাহর বাণী حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ এই আয়াতে তার বিবরণ বিদ্যমান। এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের পথে বহুবিধ বাধাদানের জন্য। كَثِيْرًا শব্দটি এই স্থানে উহ্য صَدًّ -এর বিশেষণ। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে صَدًّا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

١٦١. وَأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ فِي التَّوْرٰىةِ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط بِالرِّشٰى فِي الْحُكْمِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا مُؤْلِمًا ـ

১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে যদিও তা তাওরাতে তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং বিচার-মীমাংসার ঘুষ গ্রহণ করত অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

١٦٢. لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ الثَّابِتُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَالْمُؤْمِنُوْنَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْكُتُبِ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ بالنون والياء اَجْرًا عَظِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ.

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্বজ্ঞানে সুদৃঢ় স্থিত প্রজ্ঞ- যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তারা এবং মুমিনগণ অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা যে কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং যারা সালাত কায়েম করে, اَلْمُقِيْمِيْنَ শব্দটি نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ রূপে অর্থাৎ مَدْح বা প্রশংসা অর্থবোধক কোনো فِعْل বা ক্রিয়ার مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب [ফাতাহযুক্ত] হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে এটি رَفْع [পেশযুক্ত] সহকারেও পঠিত রয়েছে। এবং যারা জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকেই শীঘ্র আমি মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দিব। سَنُؤْتِيْهِمْ এটি نُوْن দ্বারা অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন ও ى দ্বারা অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَيَانًا : এটি হয়তো বা উহ্য মাসদারের সিফত হবে। اَىْ اَرِنَا اِرَاءَةً عَيَانًا এ সূরতে لَفْظًا মাসদার হবে কিংবা اَىْ رُؤْيَةً عَيَانًا হবে। مَصْدَرٌ بِغَيْرِلَفْظِه

قَوْلُهُ فَاِنِ اسْتَكْبَرْتَ الخ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَقَدْ سَاَلُوْا হলো উহ্য شَرْط -এর জাযা।

قَوْلُهُ اٰبَاءُهُمْ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগের ইহুদিদের প্রতি উক্ত প্রশ্নের নিসবত করাটা মাজাযী বা রূপক অর্থে। কেননা নবীযুগে বিদ্যমান ইহুদিরা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রশ্নের ব্যাপারে একমত বা সন্তুষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ اَلْمُعْجِزَاتُ : اَلْبَيِّنٰتُ -এর তাফসীরে اَلْمُعْجِزَاتُ উল্লেখ করে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, اَلْبَيِّنٰتُ দ্বারা উদ্দেশ্য তাওরাত নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। কেননা গরুর বাছুরকে উপাস্য বানানোর সময় তাওরাত প্রদান করা হয়নি; বরং তার পরে প্রদান করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ بَابَ الْقَرْيَةِ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْبَابَ -এর মধ্যকার اَلِفْ لَامْ টি مُضَافْ اِلَيْه -এর عِوَضْ বা বদলায় আনা হয়েছে। আর اَلْقَرْيَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য আয়লা নগরী।

قَوْلُهُ سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ : এখানে উদ্দেশ্য হলো سُجَّدًا দ্বারা তার পরিচিত অর্থ তথা وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে سَجْدَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বুঝা এবং বিনয় ও অক্ষমতা প্রদর্শন করা।

قَوْلُهُ لَا تَعْدُوْا : عَدَا يَعْدُوْا থেকে نَهِى مُضَارِعْ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ- তোমরা সীমালজ্ঞন করো না। تَعْدُوْا মূলত تَعْدُوُوْا ছিল। প্রথম واو -টি পেশযুক্ত। এটি শব্দের لَامْ কালিমা। وَاوْ -এর উপর পেশ কঠিন হওয়ার কারণে পড়ে গেছে। এখন দুই وَاوْ -এর মাঝে দুটি সাকিন একত্রে হওয়ার কারণে وَاوْ -টি পড়ে গেছে। ফলে تَعْدُوْا হয়েছে। অপর এক কেরাতে تَعَدُّوْا রয়েছে। যা মূলত تَعْتَدُوْا ছিল। প্রথম تَاء -টি دَالْ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার পর দুটি دَالْ পরস্পরে ইদগাম হয়েছে। ফলে تَعَدُّوْا হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى ذٰلِكَ نَقَضُوْهُ : এ অংশটুকু বৃদ্ধির উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা। প্রশ্নে فَبِمَا نَقْضِهِمْ -এর مُتَفَرَّعٌ عَلَيْهِ বিদ্যমান নেই। সুতরাং تَفْرِيْعٌ সঠিক হয়নি।

উত্তর. বাক্যে সংক্ষিপ্ততা রয়েছে। মূল ইবারত হবে এভাবে–

وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا عَلٰى ذٰلِكَ فَنَقَضُهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ الخ

قَوْلُهُ غُلْفٌ : এটি غِلَافٌ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ ثَانِيًا بِعِيْسٰى : অর্থাৎ প্রথমবার হযরত মূসা (আ.)-এবং তাওরাতের প্রতি কুফরি করার কারণে আর দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরি করার কারণে তাদের অন্তকরণে মোহর পড়েছিল। উভয়টিই طَبَعَ عَلَى الْقُلُوْبِ -এর কারণে সমৃদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নাকি সাধারণ কুফর মোহর মেরে দেওয়ার কারণ। এটি عَطْفُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ -এর অন্তর্ভুক্ত। مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه এর মাঝে যেহেতু কারণ (سَبَبٌ) ভিন্ন ভিন্ন, তাই এখানে عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِه লাযেম আসে না।

قَوْلُهُ فِيْ زَعْمِهِمْ : এর সম্পর্ক হলো اِنَّا قَتَلْنَا -এর সাথে এবং এটি আল্লাহ তা'আলার উক্তি। অর্থাৎ ইহুদিরা নিজেদের ধারণামতে হত্যা করেছে। বাস্তবে তারা হত্যা করেনি।

আর যদি فِيْ زَعْمِهِمْ -এর সম্পর্ক রাসূল ﷺ -এর সাথে হয় তাহলে এটি ইহুদিদের উক্তি হবে। যার মর্ম হলো, আমরা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি, যিনি খ্রিস্টানদের ধারণা মতে আল্লাহর রাসূল কেননা ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালতে বিশ্বাসী ছিল না।

قَوْلُهُ اَيْ بِمَجْمُوْعِ ذٰلِكَ : অর্থাৎ উল্লিখিত সবগুলোর عَطْف হয়েছে فَبِمَا نَقْضِهِمْ -এর উপর।

قَوْلُهُ اَلْمَقْتُوْلَ وَالْمَطْلُوْبُ : এটি شُبِّهَ -এর নায়েবে ফা'য়েল।

قَوْلُهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ : اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হওয়ার কারণ হলো ظَنٌّ শব্দটি عِلْم -এর জিনসভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ اَلْكِتَابِيْ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بِه -এর যমীর হযরত ঈসা (আ.)-এর দিকে এবং مَوْتِه -এর যমীর উহ্য اَحَدٌ -এর দিকে ফিরেছে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাবী।

قَوْلُهُ اَوْ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى : এর দ্বারা দ্বিতীয় তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ অবস্থায় উভয় যমীর হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ফিরবে।

قَوْلُهُ وَهِيَ الَّتِيْ فِيْ قَوْلِه : এর দ্বারা সূরা আন'আমের প্রতি ইঙ্গিত।

قَوْلُهُ صَدًّا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَثِيْرًا হলো উহ্য মওসূফের সিফত।

قَوْلُهُ نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ : অর্থাৎ اَمْدَحُ উহ্য থাকার কারণে اَلْمُقِيْمِيْنَ শব্দটি নসবযুক্ত হয়েছে। اَيْ اَمْدَحُ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ এ সূরতে জুমলাটি مُعْتَرِضَه হবে এবং وَاوْ -টি اِعْتِرَاضِيَّه হবে।

قَوْلُهُ وَقُرِءَ بِالرَّفْعِ : অর্থাৎ اَلْمُقِيْمُوْنَ তথা رَفْع সহও পঠিত রয়েছে। এ সূরতে اَلرَّاسِخُوْنَ -এর সাথে عَطْف হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহে তাদের আরো কিছু নিন্দনীয় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা পেশ করে তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তি ও আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে এই প্রসঙ্গ বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

শানে নুযূল ও ইহুদিদের হঠকারিতা : কতিপয় ইহুদি দলপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান হতে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের

আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করেনি; বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদিদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রাসূলদেরও উত্যক্ত করতো, আল্লাহদ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে 'আল্লাহ' দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর আকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে ইহুদিরা অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকাশ্য মুজেযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (আ.)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়তো তারা শরিয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নিচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লঙ্ঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখিরাতেও তাদের নিকৃষ্টতার শাস্তি ভোগ করতে হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسَى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ : [সুতরাং এমন জাতির নিকট থেকে এমন ফরমায়েশ কোনো আচমকা বা বিরল কিছুই নয়]। আনুষঙ্গিকভাবে এ উত্তরও পাওয়া গেল যে, স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তো এমন বস্তু এনেছিলেন, এর পরেও কেন এসব জালেমের দল বাজে কথা থেকে নিবৃত্ত হয়নি? তারা তো তাঁর কাছে সরাসরি আল্লাহর দর্শনের আবেদন করেছিল। ঘটনা প্রবাহের যাবতীয় কাহিনী এর কারণে তুলে ধরা হয়েছে যে, আসলে তাদের জাতীয় ইতিহাস হঠকারিতা ও বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। এ ধরনের আপত্তিকর আবেদনের মূল উদ্দেশ্য সত্যের অন্বেষণ-অনুসন্ধান নয়; বরং শুধুই আস্ফালন ও পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া।

هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّ طَلَبَ هٰؤُلَاءِ لِنُزُوْلِ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ لَيْسَ لِأَجْلِ الْاِسْتِرْشَادِ بَلْ لِمَحْضِ الْعِنَادِ (كَبِيْر) : অর্থাৎ এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আসমান থেকে তাদের উপর কিতাব অবতরণের দাবির অর্থ সত্যের উদঘাটন নয়; বরং একমাত্র শত্রুতাই উদ্দেশ্য। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ : ثم শব্দটি সময়ের বিলম্বজ্ঞাপক নয়; বরং কল্পনার দূরত্ব জ্ঞাপক অর্থাৎ এমন বেহুদা ও অনর্থক আবেদন কি কম ছিল? এ থেকেও অনর্থক ও গুরুতর অপরাধমূলক আচরণ এই ছিল যে, তারা গো-বৎসের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর পেশকৃত প্রমাণাদি ও মুজেযাসমূহ [অলৌকিক কর্মকাণ্ড] জানা, বুঝা ও দেখার পরও শিরক, বিশেষত জঘন্যতম শ্রেণির শিরক। গো-বৎসের পূজা এমনিতেই জঘন্য ছিল; সুস্থ বিবেক বুদ্ধি এ কাজকে অস্বীকার করে। কিন্তু সত্যের প্রচারক পয়গাম্বরের আনীত বলিষ্ঠ প্রমাণাদি ও সুস্পষ্ট যুক্তির উপস্থিতিতে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বটে। –[তাফসীরে মাজেদী : ৩৮৯]

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا مُوْسَى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا : তাঁর সে ক্ষমতা এই যে, তিনি বাছুরটাকে জবাই করে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তার ছাই ভস্ম সাগরে উপরের বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন। তাছাড়া সত্তর হাজার বাছুর-পূজারীকে হত্যা করা হয়েছিল। –[তাফসীরে উসমানী : ২১৫]

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ : অর্থাৎ ইহুদিরা যখন বলল, তাওরাতের বিধানাবলি কঠিন। আমরা এটা মানি না। তখন তূর পাহাড়কে উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তাওরাতের বিধানাবলি কবুল কর ও শক্ত করে ধর, নয়তো এই পাহাড়ের তলায় তোমাদের চাপা দেওয়া হবে। –[তাফসীরে উসমানী : ২১৬]

قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا : ইহুদিদের প্রতি আদেশ হয়েছিল, সিজদা করে মাথা ঝুঁকিয়ে নগরে প্রবেশ কর। তারা সিজদার পরিবর্তে নিতম্ব ঘেঁষে ঢুকতে লাগল। এভাবে তারা নগরে পৌঁছতেই প্লেগ-আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের মধ্যেই প্রায় সত্তর হাজার খতম হয়ে যায়। -[তাফসীরে উসমানী : ২১৭]

قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ : **ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা :** ইহুদিদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এদিনই বেশি মাছ দেখা যেত। তারা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল যে, নদীর তীরে একটি হাউজ তৈরি করল। শনিবার সে হাউজে নদী থেকে মাছ আসলে তারা মুখ বন্ধ করে দিত। পরদিন তারা তা শিকার করত। এই দুষ্টবুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বানরে পরিণত করেন, যা সমস্ত জীব-জন্তুর মধ্যে নিকৃষ্টতর ও মূল্যহীন। -[তাফসীরে উসমানী : ২১৮]

قَوْلُهُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ : **আয়াতের যোগসূত্র :** পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের দৌরাত্ম্য এবং তজ্জন্য তাদের নিন্দা ও শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তাদের কতিপয় অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন- হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের মিথ্যা দাবি ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা বা শূলে চড়ানোর ব্যাপারে তারা যে দাবি করছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তারা যাকে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি ঈসা (আ.) নয়; বরং তার সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে তাদের নির্যাতন ও হস্তক্ষেপ হতে উদ্ধার করে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে নিরাপদে আসমানে উত্তোলন করেছেন। -[মা'আরিফুল কুরআন]

ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ : ইহুদিরা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে পরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করেন। কারণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে, তাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গ মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান, অন্যায়ভাবে নবীগণের রক্তপাত এবং তাদের এই উক্তি যে, আমাদের অন্তরে আবরণের ভেতর। রাসূলে কারীম ﷺ ইহুদিদেরকে সুপথে ডাকলে তারা বলতে থাকে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর। তোমার কথা সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ব্যাপারটি তারা যা বলছে তা নয়, আসলে কুফরির কারণে তাদের অন্তরে মহান আল্লাহ তা'আলা মোহর করে দিয়েছেন। কাজেই, ঈমান তাদের নসীবে নেই। হ্যাঁ, কিছু লোক এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ।

-[তাফসীরে উসমানী : ২১৯]

ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, খোদায়ী নিদর্শনাদির অস্বীকৃতি, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তাদের قُلُوْبُنَا غُلْفٌ উক্তির ব্যাখ্যা ১ম পারায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মূলত فَبِمَا نَقْضِهِمْ বাক্যের স্বীকৃত উহ্য কথা এই فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ (قُرْطُبِىْ) অর্থাৎ তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আমরা তাদেরকে অভিশাপ দিলাম [কাতাদা (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত কুরতুবী] আরবি ভাষার বাকধারা অনুসারে এরূপ উহ্য রীতি ব্যাপক। শ্রোতাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ধরনের কথা উহ্য রাখা হয় حُذِفَ هٰذَا لِعِلْمِ السَّامِعِ (قُرْطُبِىْ) এটা শ্রোতাদের জ্ঞানের জন্য উহ্য রাখা হয়। -[কুরতুবী]।

এ কথাটির জওয়াব উহ্য রাখা আলংকারিক দিক থেকে অতিসুন্দর, যা শ্রোতার স্মৃতিপটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। -[বাহর]।

بِمَا শব্দে مَا বর্ণটি অতিরিক্ত এবং কথার গুরুত্ব জ্ঞাপক। -[তাফসীরে মাজেদী : ৩৯১]

قَوْلُهُ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ : এ ধরনের সীল-মোহর প্রথমেই লাগানো হয় না, কেবল বিনিময় বা শাস্তিরূপেই লাগানো হয়। আর এক্ষেত্রে তো এর ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কুফরির উপর কুফরির বিনিময়ে।

-[কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী : ৩৯২]

قَوْلُهُ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا : [এবং অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ এ ঈমান মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়] এই যৎসামান্য ঈমান অলাভজনক এ কারণে হবে যে, এ ঈমান সকল নবীর উপর ঈমানকে অন্তর্ভুক্ত করবে না اَىْ اِلَّا اِيْمَانًا قَلِيْلًا اَىْ بِبَعْضِ الْاَنْبِيَاءِ وَذَالِكَ غَيْرُ نَافِعٍ لَهُمْ (قُرْطُبِىْ) وَهٰذَا غَيْرُ مُفِيْدٍ لِاَنَّ الْكُفْرَ بِالْبَعْضِ كُفْرٌ بِالْكُلِّ (رُوْح) অর্থাৎ কেবল সামান্য ঈমান, যার অর্থ কিছু নবীর প্রতি ঈমান, আর এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। -[কুরতুবী]

আর এটা উপকারী নয়, কেননা কিছু সংখ্যকের প্রতি কুফরি সকলের প্রতি কুফরির সমতুল্য। -[রূহুল মা'আনী]

কিতাবীদের ঈমানের অবস্থাটি এই ছিল যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকার করতো আর হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করতো; হযরত ইসহাককে সত্যায়ন করতো, কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করতো। অথবা উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়াকে যদিও মেনে নিত, কিন্তু সর্বশেষ নবী স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করতো। এ অবস্থায় ঈমান শব্দের উপর শরয়ী ঈমানের প্রয়োগ হতে পারে না। শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক অর্থে ঈমান সে বস্তুকেই বলা হয়, যা নবুয়তের গোটা সূত্রকেই তার বিশ্বাসের আওতাভুক্ত করে নেয়। সুতরাং এক নবীর উপর বিশ্বাস করে অন্যান্য নবীদেরকে অস্বীকার করার কোনো অর্থই হতে পারে না। لِأَنَّهُ إِيْمَانٌ لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (تهانوى) فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ يَكْفُرْ بِرَسُوْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِالْإِيْمَانِ بِأَحَدٍ مِنَ الرَّسُوْلِ الْبَتَّةَ (كبير) কারণ সে হচ্ছে শাব্দিক বা আভিধানিক ঈমান, শরয়ী ঈমান নয় [থানভী], অতএব আমরা স্পষ্ট বলেছি যে, যে লোক এক রাসূলকে অস্বীকার করে, সে অবশ্যই রাসূলদের মধ্য থেকে একজন রাসূলের উপর ঈমান আনার অধিকারী হয় না। –[কাবীর, তাফসীরে মাজেদী : ৩৯৩]

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا : [এভাবে যে, নাউযুবিল্লাহ! তিনি দুশ্চরিত্রা ছিলেন] بُهْتَانًا عَظِيْمًا অতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। ইহুদিদের পুস্তকগুলোতে এই পবিত্র চরিত্রের সতী সাধ্বী মহিলা সম্পর্কে এমন বহু জঘন্য বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে এ পৃষ্ঠাগুলোতে প্রতিবাদ রূপেও সেসব কাহিনী লেখনীতে প্রকাশ করার যোগ্য নয়। কুরআন মাজীদ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এসব অপকথার উপর সালংকার বর্ণনায় শুধু 'বুহতানুন আযীম' জঘন্য অপবাদ বলে ইশারা দিয়েই ক্ষান্ত রয়েছে। মারইয়ামের উপর টীকা বিগত ৩য় পারায় লিখিত হয়েছে। ইনি ইমরানের কন্যা এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর শ্রদ্ধেয়া মা ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী ইউসুফের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়নি, যিনি কাঠের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত ধার্মিক ও খোদাপোরস্ত লোক ছিলেন। بِكُفْرِهِمْ এখানে ইহুদিদের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং কি কি কারণে এসব শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানে ইহুদিদের **কুফরি বলতে হযরত** ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে কুফরির কথা বুঝানো হয়েছে।

–[বায়যাভী, তাফসীরে মাজেদী টীকা : ৩৯৪]

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ الخ : অর্থাৎ তাদের শাস্তির আরো কারণ হলো, তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করে কুফরির বৃদ্ধি সাধন করেছিল, হযরত মারইয়ামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছিল এবং এই দম্ভোক্তিতে লিপ্ত ছিল যে, আমরা মহান আল্লাহর রাসূল মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে হত্যা করেছি। এ সমস্ত কারণে তাদের উপর আজাব ও মসিবত নাজিল হয়। –[তাফসীরে উসমানী : ২২০]

এটা কাদের উক্তি? স্পষ্টত ইহুদিদের উক্তি, যারা এতে সন্তুষ্টি ছিল এবং গর্বের সঙ্গে এর দাবিও করতো اَلْمَسِيْحَ -رَسُوْلَ اللّٰهِ শব্দদ্বয় ইহুদিদের নয়, তারাতো এ দু'টি পদ-মর্যাদা বা মাসীহ হওয়া এবং রাসূল হওয়াই অস্বীকার করতো। কুরআন মাজীদ মূল ঘটনা হিসেবে তাঁর আসল স্থান ও মর্যাদা বিবৃত করেছে। এটা কুরআন মাজীদের সাধারণ বর্ণনাধারা। এখানে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর গুণ-পরিচয় বিবৃত করা হয়েছে। –[বাহর]

হতে পারে তাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাদের কদর্য ভাষার পরিবর্তে সুন্দর ভাষায় বিবৃত করেছেন।

–[তাফসীরে কাবীর, কাশশাফ]

এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নব পর্যায়ে তাঁর প্রশংসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। –[বায়যাভী]

এও সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও তা স্বীকার করতো না [মাদারিক]। إِنَّا قَتَلْنَا কতল বা হত্যার আসল অর্থ হচ্ছে দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন করা, তা যে কোনো ভাবে এবং যে কোনো উপায়েই হোক না কেন। উর্দু এবং বাংলা বাগধারায় এটাকেই বলা হয় বিনাশ সাধন করা, শেষ করে দেওয়া; أَصْلُ الْقَتْلِ إِزَالَةُ الرُّوْحِ عَنِ الْجَسَدِ (راغب) অর্থাৎ হত্যা বা নিধনের মূল হচ্ছে দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করা। –[রাগিব] হত্যা করা অর্থ মেরে ফেলা, প্রহার দ্বারা, প্রস্তর দ্বারা, বিষ প্রয়োগ দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে। –[তাজ] هُوَ إِزَالَةُ الرُّوْحِ عَنِ الْجَسَدِ كَالْمَوْتِ (ابو البقاء) অর্থাৎ কতল বা হত্যা মৃত্যুর মতো, দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন করা। –[আবূল বাকা] ইমাম কুরতুবী অন্য একটি আয়াত তথা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন–

اَلْقَتْلُ هُوَ كُلُّ فِعْلٍ يُفِيْتُ الرُّوْحَ وَهُوَ اَنْوَاعٌ مِنَ النَّحْرِ وَالذَّبْحَةِ وَالْخَنْقِ وَالرَّضْخِ وَشِبْهِهٖ

অর্থাৎ কতল বা হত্যা হচ্ছে, এমন কর্ম, যা দ্বারা প্রাণ হরণ করা হয়। তা কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন নহর করা, জবাই করা, গলা টিপে মারা, টুকরা টুকরা করা বা এ ধরনের অন্য কোনো উপায়ে প্রাণ বধ করা। এখানে ফিকহের পরিভাষায় হত্যা উদ্দেশ্য নয়, যার অর্থ কেবল ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে রোমান আদালত থেকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হলেও এবং সে দেশীয় আদালত মৃত্যু-দণ্ডাদেশ কার্যকর করতে সক্ষম হলেও তাঁকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করায় এবং তাঁকে মৃত্যু-দণ্ডাদেশ শোনানোর সর্বতোভাবে ইহুদিদের হস্তই সক্রিয় ছিল। কুরআন মাজীদ যেহেতু কোনো সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তত্ত্বও বাদ দেয় না, এ কারণে তা যথার্থভাবেই তাঁর হত্যা বা হত্যার উদ্যোগের দায়িত্ব ইহুদিদের উপর ন্যস্ত করে। ইঞ্জিলের নানাবিধ বর্ণনাতো এতটুকু অংশে অর্থের ক্ষেত্রে, অনেকাংশে শব্দের ক্ষেত্রেও একমত যে, রোমান আদালতের বিচারক পোলাটিস কিছুতেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল না; বরং আদালতের বিচারক তো তা থেকে যথারীতি দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু ইহুদিরা মিথ্যা আপীল দায়ের করে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং সন্ত্রাস আর বিপর্যয় সৃষ্টির হুমকি দিয়ে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দান করতে বিচারককে বাধ্য করে। মথিতে উল্লিখিত ইঞ্জীলের একটা ক্ষুদ্র বিবরণ লক্ষণীয়– "পীলাত তখন দেখিলেন, তাঁর চেষ্টা বিফল, বরং আরো গোলযোগ হচ্ছে, তখন জল নিয়ে লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝিবে। তাহাতে সমস্ত লোক উত্তর করিল, তাহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপর বর্তাক। তখন তিনি তাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।" –[মথিঃ২৪-২৬]

অন্যান্য ইঞ্জীলও একথা স্বীকার করে। বরং লূক -এ তো এতটুকু অতিরিক্ত স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে **মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করার জন্য তিন তিনবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহুদিরা** প্রতিবারই তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে। –[লূকঃ ২৩ঃ২২]

এসব তো স্বয়ং খ্রিস্টানদের বিবরণ। খোদ ইহুদীদের রচিত হযরত ঈসা (আ.)-এর যে প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থ বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ এবং যার ইংরেজী অনুবাদও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ ঘটনাকে গর্বের সঙ্গে নিজেদের কীর্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষ্যে তাঁর নিহত হওয়ার যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হয়েছে, তাতেও দেখা যায় যে, সমস্ত দায়-দায়িত্ব ইহুদি কর্তা ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে রোমান বা বিচারকদের উল্লেখ দেখা যায় না। যেমন– "সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদেরকে স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে জিরূজালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীন বর্গের, প্রধান শাসকদের এবং অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে।" –[মথি ১৬ঃ২১]

পরে তিনি তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিতে **আরম্ভ করিলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হবে** এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে হইবে।" –[মার্ক ৮ঃ৩১]

"তিনি কহিলেন, মানুষ্য পুত্রকে অনেক দুৎখ ভোগ করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান শাসকগণ ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, এবং হত হইতে হইবে।" –[লূক ৯ঃ২২] –[তাফসীরে মাজেদী : ৩৯৫]

قَوْلُهُ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ : সূরা আলে ইমরানের يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুশমন ইহুদিদের দুরভিসন্ধি বানচাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে হেফাজত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোনো সুযোগ ইহুদিদেরকে দেওয়া হবে না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আ.)-এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদিদের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে– وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ অর্থাৎ ওরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে তাফসীর হযরত যাহ্হাক (রহ.) **বলেন-ইহুদিরা যখন** হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ একস্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আ.)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলিস তখন রক্তপিপাসু ইহুদি ঘাতকদের হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদি দুরাচারী একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় ভক্ত-অনুচরদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এই গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আ.) নিজের জামা ও পাগড়ি তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সদৃশ করে দেওয়া হলো। যখন তিনি গৃহ হতে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদিরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না; বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ হতে বেরিয়ে এলো তখন অন্য ইহুদিরা তাকেই ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করলো এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। -[তাফসীরে মাযহারী]

উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনোটিই সত্য হতে পারে। কুরআনে কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত সত্য ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কুরআন পাকের আয়াত ও তার তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, শুধু অনুমান করে তারা বিভিন্ন উক্তি ও দাবি করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا .

অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে, তাদের কাছে, এ সম্পর্কে কোনো সত্য-নির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বলল, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ.) হয় তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ.)-ই বা গেলেন কোথায়? -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৫৪৮]

قَوْلُهُ بَلْ شُبِّهَ لَهُمْ : অথবা তারা ধোঁকায় পতিত হয়েছে অথবা আসল সত্য তাদের কাছে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে। এরা কারা ছিল? কারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল, বা কাদের উপর আসল বিষয় গোলমাল বা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল? স্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য সেসব ইহুদি বা মাসীহ (আ.) -এর দুশমন, উপর থেকে যাদের সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছে। যেন বলা হয়েছে যে, তাদের উপর সন্দেহ পতিত হয়েছে [মাদারিক]। তাদের কাছে ব্যাপারটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। -[বায়যাভী]

অথবা এভাবে বলা যায় যে, নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে তারা সন্দেহে পতিত হয় এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তারা সন্দেহে পতিত হয়। নিহত এবং শূলিবিদ্ধ ব্যক্তি তাদের নিকট সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল (জালালাইন)। মোটকথা আমাদের সমস্ত মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, ইহুদিরা ধোঁকায় পতিত হয় এবং তারা হযরত মাসীহ মনে করে অন্য কাউকে শূলিবিদ্ধ করে। কিন্তু যাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছে, সে কে ছিল এবং ধোঁকায় স্বরূপই বা কি হয়েছিল, এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব কুরআন মাজীদে নেই, কোনো বিশুদ্ধ হাদীসেও নেই। -[তাফসীরে মাজেদী : ৩৯৭]

قَوْلُهُ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا : হযরত ঈসা (আ.)-কে যে হত্যা করা হয়নি, তা জোর দিয়ে বুঝানোর জন্য এ আয়াতাংশে **يَقِيْنًا শব্দ যোগ করা হয়েছে।** -[কাশশাফ, মাদারিক, জালালাইন]

মাসীহ (আ.)-এর মৃত্যু বা হত্যা যেহেতু এক বিরাট গুমরাহীর কারণ এবং দুনিয়ার দুটি বিরাট জাতি অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান গুমরাহীতে লিপ্ত ও নিমজ্জিত। এ কারণে কুরআন মাজীদ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার প্রয়োজন অনুভব করছে। –[তাফসীরে মাজেদী : ৪০১]

قَوْلُهُ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ : ইহুদিরা কি হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছিল? আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি। এ সম্পর্কে তারা নানা রকম কথা বলছে তা শুধুই অনুমান নির্ভর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভ্রমে ফেলেছেন। প্রকৃত জ্ঞান তাদের কারোরই নেই। আসলে আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি তো সব কিছুই করতে সক্ষম এবং তাঁর সব কাজেই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনা হয়েছিল এই যে, ইহুদিরা যখন হযরত মসীহ (আ.)-কে হত্যা করার সংকল্পে এগিয়ে আসল, তখন তাদের একজন লোক সবার আগে কক্ষে প্রবেশ করল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মসীহ (আ.)-কে আকাশে তুলে নিলেন এবং সেই ব্যক্তির চেহারাকে অবিকল মাসীহ (আ.)-এর আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিলেন। দলের অন্যান্য লোক ভিতরে ঢুকে তাকেই মাসীহ (আ.) মনে করল এবং হত্যা করল। পরে যখন খেয়াল হলো তখন বলতে লাগল, আরে এর চেহারা তো মসীহ সদৃশ, কিন্তু বাকি শরীর তো আমাদের সঙ্গীর মতো মনে হচ্ছে। কেউ বলল, এ যদি মাসীহ (আ.) হয়ে থাকে, তবে আমাদের সাথী কই গেল? আবার আমাদের লোকটি হয়ে থাকলে মাসীহ (আ.) কোথায়? এভাবে আন্দাজ-অনুমান করে এক একজন এক এক ধরনের কথা বলতে লাগল। প্রকৃত ঘটনা কারোরই জানা ছিল না। সত্য তো এই যে, হযরত ঈসা (আ.) আদৌ নিহত হননি; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন এবং ইহুদিদেরকে বিভ্রমে ফেলে দিয়েছেন।

اِلَيْهِ অর্থ নিজের দিকে বা নিজের আসমানের দিকে। এভাবে مُضَافٌ উহ্য রাখার দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদে ভুরি ভুরি রয়েছে। আর যেভাবে আল্লাহ "তাঁর দিকে ডেকে নিয়েছেন" অর্থ আখিরাত পানে ডেকে নিয়েছেন বুঝা যায়, তেমনিভাবে আরবি উর্দু বাকরীতিতে আল্লাহর দিকে তুলে নেওয়ার অর্থ আসমানের দিকে তুলে নেওয়া। এখানে তাঁকে আসমানে দিকে তুলে নেওয়া বুঝানো হয়েছে –[রাগিব] কারণ আল্লাহতো স্থানপাত্রের উর্ধ্বে। –[কুরতুবী, মাদারিক ও বাহর]

رَفَعَهُ - رَفْع তথা উপরে তোলার আসল অর্থ হচ্ছে শারীরিক বা বস্তুগতভাবে উপরে তোলা। اَلرَّفْعُ يُقَالُ فِى الْاَجْسَامِ الْمَوْضُوْعَةِ اِذَا اَعْلَيْتُهَا عَنْ مَكَانِهَا (رَاغِبْ) অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তার স্থান থেকে উপরে তোলাকে رَفْع বলা হয়। এটা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। –[রাগিব]

তবে রূপকভাবে মর্যাদা উন্নীত করা অর্থেও رَفْع শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। (رَاغِبْ) اَىْ رُفِعَ مِنْ حَيْثُ التَّشْرِيْفِ অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধি হিসেবে তাকে উপরে তোলা হয়েছে। –[রাগিব]

কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য কোনো শক্তিশালী কারণ বর্তমান থাকতে হবে; যা এখানে নেই। কোনো কোনো অজ্ঞ এবং নব উদ্ভূত ফিরকা যুক্তি দিয়ে বলে যে, رَفَعَهُ বা উপরে তুলে নেওয়াকে যেহেতু আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সুতরাং বাধ্য হয়ে এখানে মর্যাদা উন্নীত করা অর্থই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ رَفْع -কে রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এ যুক্তি কুরআন অনুধাবন থেকে অনেক দূরে থাকারই প্রমাণ বহন করে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, কুরআন মাজীদে এ ধরনের আয়াত আছে কিনা? وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ এখানে আল্লাহর দিকে হিজরত অর্থ কি দারুল ইসলাম বা মদীনার দিকে হিজরত করার অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ এখানে পালনকর্তার দিকে গমন করা অর্থ যে, শাম দেশে গমন করা, তা বুঝতে কি কারো কষ্ট হয়? এ ধরনের আরো অনেক আয়াত উল্লেখ করা যায়। ইমাম রাযী (র.) যথার্থই লিখেছেন, সম্মান আর মর্যাদার যে প্রেক্ষাপটে এখানে আল্লাহর পানে তুলে নেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিজেই এ কথার প্রমাণ যে, এ তুলে নেওয়াটা কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয়। সালেহ আর মুত্তাকীদের ব্যাপক হারে জান্নাতে প্রবেশ এবং জান্নাতের সুখ ভোগ ও স্থান কাল উপভোগ থেকে তা স্বতন্ত্র কিছু رَفَعَهُ اِلَيْهِ اَعْظَمُ مِنْ بَابِ الثَّوَابِ مِنَ الْجَنَّةِ وَمِنْ كُلِّ مَا فِيْهَا مِنَ اللَّذَّاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ (كَبِيْر) জান্নাত আর জান্নাতের সমুদয় বস্তুগত সুখ সম্ভোগের চেয়ে আল্লাহর দিকে তুলে নেওয়া অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মর্যাদা উন্নীত করা ছওয়াবের বিবেচনায় অনেক বড়। –[তাফসীরে কাবীর]

দৈহিকভাবে উপরে তুলে নেওয়া বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য এবং ইসলামের জন্য শর্ত হোক বা না হোক, মোটকথা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের এটাই নিকটতর অবশ্যই। -[তাফসীরে মাজেদী : ৪০২]

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا : অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা অতি পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।" ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদের দুর্বলতার প্রমাণ। -[মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৫০]

এখানে গুণবাচক শব্দ আযীয তথা প্রতাপান্বিত ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আপন নবীকে রক্ষা করতে এবং উর্ধ্বে তুলে নিতে অর্থাৎ শারীরিক এবং আত্মিক উভয় দিক থেকে উর্ধ্বে তুলে নিতে সক্ষম। আর গুণবাচক শব্দ হাকীম ব্যবহার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর দুশমনদের সঙ্গে তিনি যে আচরণ করছেন, তা নিতান্তই যুক্তিযুক্ত এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবিও তা-ই। -[তাফসীরে মাজেদী : ৪০৩]

قَوْلُهُ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهٖ : অর্থাৎ ইহুদিরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল।

এই আয়াতের مَوْتِهٖ অর্থাৎ 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দের দ্বারা এখানে ইহুদিদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদিই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলি অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোনো উপকার আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তাফসীরে যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهٖ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তাফসীর হলো আহলে কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদিরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকার করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা]। অপরদিকে খ্রিস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আ.)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবিদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদিদের মতোই হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না; বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে; কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনবে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো সহীহ আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদিদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া হতে সর্বপ্রকার কুফরি ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلَيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَتَكُوْنُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى يُعِيْدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (قُرْطُبِي)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরো বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার, যাতে বলা হয়েছে 'আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- "হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।" এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অত্র তাফসীর বিশ্বস্ত সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অত্র আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। উপরিউক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে অত্র আয়াত স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, অদ্যাবধি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হয়নি; বরং কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে তিনি আবার যখন আসমান থেকে সশরীরে অবতরণ করবেন এবং তাঁর অতরণের সাথে আল্লাহ তা'আলার যেসব নিগূঢ় রহস্য জড়িত রয়েছে তা যখন পূর্ণ এবং তাঁর দায়িত্ব সুসম্পন্ন হবে, তখন এ পৃথিবীর বুকেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর কবরের স্থানও নির্ধারিত রয়েছে।

সূরা 'যুখরুফ'-এর ৬১তম আয়াতেও এ সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে- وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ অর্থাৎ "হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব, তোমরা কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মান্য কর।" অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে إِنَّهُ 'নিশ্চয় তিনি' শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। অন্য আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগামনের খবর দেওয়া হয়েছে যার অর্থ আলামত বা লক্ষণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ خُرُوْجُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব কিয়ামতের অন্যতম আলামত। -[ইবনে কাসীর]

মোটকথা, উপরিউক্ত আয়াতের উভয় কেরাত অনুসারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস ও ইহুদিদের উপর পূর্ণ বিজয়ী হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامًا عَدْلًا (اِبْن كَثِيْر)

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, এ ধরনের মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতসমূহ আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) একত্র করেছেন। এ অধম সেটি আরবি ভাষায় সংকলণ করেছি। তিনি তার নামকরণ করেছেন اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِيْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ 'আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মসীহ' যা তৎকালেই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি হলব শহরের জনৈক প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ বর্ধিত ব্যাখ্যা ও টিকাসহ তা বৈরুত থেকে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের আকীদা অপরিহার্য, এটা অস্বীকারকারী কাফের : আলোচ্য আয়াত এ বিষয়ে একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তা ছাড়া সূরা আলে-ইমরানের তাফসীরেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান যুগের কোনো কোনো নাস্তিক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৫০-৫৫২]

قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا : কিয়ামতে হযরত ঈসা (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন : হযরত ঈসা (আ.) এখনও আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন। দাজ্জালের আবির্ভাবের পর তিনি পুনরায় পৃথিবীকে ফিরে আসবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.) জীবিত, তাঁর মৃত্যু হয়নি। কিয়ামত দিবসে হযরত ঈসা (আ.) তাদের কাজ-কর্ম ও অবস্থাদি প্রকাশ করে দেবেন যে, ইহুদিরা আমাকে অস্বীকার করেছিল ও আমার শত্রুতা করেছিল। আর খ্রিস্টানরা আমাকে আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করেছিল।

−[তাফসীরে উসমানী : ২২২]

قَوْلُهُ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ الخ : আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের অপকীর্তি ও তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহেও তাদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা এবং অন্য এক ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আখিরাতে তো তাদের নির্ধারিত শাস্তি হবেই তদুপরি তাদের গোমরাহীর কারণে ইহজগতেই অনেক পবিত্র বস্তু যা ইতিপূর্বে হালাল ছিল, শাস্তিস্বরূপ তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

−[মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৫৩]

যেভাবে ব্যক্তির বিকৃত মন সংশোধনের একটা উপায় এই যে, কোনো কোনো মুবাহ বা বৈধ বস্তু থেকেও তাকে বিরত রাখতে হয়, তেমনিভাবে যখন একটা জাতির মেজায বিকৃত হয়ে যায়, তখন তাদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে সব বৈধ বস্তুতে তারা অভ্যস্ত, তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে হয়। فَبِظُلْمٍ -এ ب অব্যয় কারণজ্ঞাপক অর্থাৎ তাদের জুলুমের কারণে। এ থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের উপর যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল, তা অকারণে নয়, বরং তাদের বাড়াবাড়ির কারণেই করা হয়েছিল। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, পাপের ফলে তরীকতের পথের পথিকের যে সংকুচিত অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাও এ ধরনেরই। −[তাফসীরে মাজেদী : ৪০৬]

অর্থাৎ তাদের শরিয়তে সুদ, ঘুষ, খিয়ানত ইত্যাদি আমদানির যেসব মাধ্যমকে হারাম করা হয়েছে, সেসব অবলম্বন করত যেসব নিয়ামত থেকে ইহুদিরা বঞ্চিত হয়, তা যা কিছু ছিল, এখানে সেসবের কারণ স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে। যথা− ১. তাদের ব্যক্তিগত জোর-জবরদস্তি, বাড়াবাড়ি এবং পাপাচার (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا) ২. তাদের সংক্রামক গোমরাহী-বিভ্রান্তি (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا) ৩. তাদের সুদ খাওয়া, আর তা-ও নিষিদ্ধ করার পর (وَأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ) অবৈধ আমদানি সম্পর্কে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করা (وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) −[তাফসীরে মাজেদী : ৪০৯]

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তেও কোনো কোনো দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা করা হয়েছে শারীরিক বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের জন্য কোনো দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

−[মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৫৪]

قَوْلُهُ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ الخ : বনী ইসরাঈলগণ সবাই এক ধরনের ছিল না : বনী ইসরাঈলে যাদের জ্ঞানে পরিপক্ক, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং যাঁরা ঈমানদার, তাঁরা কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জীল সবই বিশ্বাস করে। আর যাঁরা সালাত কায়েম রাখে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে তাঁদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি তাদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব। পক্ষান্তরে যারা প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। −[তাফসীরে উসমানী : ২২৪]

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে ঐসব ইহুদিদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কুফরি আকীদার উপর অনড় ছিল এবং বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। এখন ঐসব ব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে, যারা আহলে কিতাব ছিলেন সত্য; কিন্তু যখন নবীয়ে আখেরী যামান ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তাঁর সম্পর্কে তাদের কিতাবে [লিখিত] নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখে ঈমান এনেছিলেন। যেমন− রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে ঐসব লক্ষণ পুরোপুরি পরিদৃষ্ট হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, হযরত উসাইদ, হযরত সা'লাবা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। এই আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

−[মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৫৫]

অনুবাদ :

١٦٣. اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ج وَ كَمَا اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِبْنَيْهِ وَيَعْقُوْبَ ابْنِ اِسْحٰقَ وَالْاَسْبَاطِ اَوْلَادِهٖ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا اَبَاهُ دَاوٗدَ زَبُوْرًا بِالْفَتْحِ اِسْمٌ لِلْكِتَابِ الْمُؤْتٰى وَالضَّمِّ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مَزْبُوْرًا اَيْ مَكْتُوْبًا .

১৬৩. তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রেরণ করেছিলাম এবং ইবরাহীম তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক এবং ইসহাক তনয় ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ বংশধরগণ [ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মান (আ.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর] তার সুলায়মানের পিতা দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম। زَبُوْر -এর ز অক্ষরটি ফাতাহসহ পঠিত হলে তা তাঁকে প্রদত্ত কিতাবের নাম বলে বিবেচ্য হবে। আর পেশ সহকারে পাঠ হলে এটা مَصْدَرْ বলে বিবেচ্য হবে। অর্থ হলো مَزْبُوْر বা লিপিবদ্ধ বস্তু।

١٦٤. وَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط رُوِيَ اَنَّهُ تَعَالٰى بَعَثَ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ نَبِيٍّ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَاَرْبَعَةَ اٰلَافٍ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِيْ سُوْرَةِ غَافِرٍ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى بِلَا وَاسِطَةٍ تَكْلِيْمًا ج

১৬৪. আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বিবৃত করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বিবৃত করিনি। [শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী সূরা গাফিরে উল্লেখ করেছেন।] বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে চার হাজার ইসরাঈল গোত্রে আর অবশিষ্ট মানুষদের হতে হলো বাকি চার হাজার। এবং মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন।

١٦٥. رُسُلًا بَدَلٌ مِنْ رُسُلًا قَبْلَهُ مُبَشِّرِيْنَ بِالثَّوَابِ مَنْ اٰمَنَ وَمُنْذِرِيْنَ بِالْعِقَابِ مَنْ كَفَرَ اَرْسَلْنَاهُمْ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ مَقَالٌ بَعْدَ اِرْسَالِ الرُّسُلِ ط اِلَيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَبَعَثْنَاهُمْ لِقَطْعِ عُذْرِهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا فِيْ مُلْكِهٖ حَكِيْمًا فِيْ صُنْعِهٖ .

১৬৫. যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য পুণ্যফলের সুসংবাদ বাহী ও যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী রাসূল প্রেরণ করেছি رُسُلًا এটি পূর্বোল্লিখিত رُسُلًا -এর بَدَلْ। যাতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো দলিল কোনো কথা না থাকে এবং এই কথা না বলে যে, رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِهٖ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ [হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট কেন একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।] অর্থাৎ আমি তাদের অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী ও তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

١٦٦. وَنَزَلَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُوْدُ عَنْ نُبُوَّتِهِ ﷺ فَانْكَرُوْهُ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ يُبَيِّنُ نُبُوَّتَكَ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُعْجِزِ اَنْزَلَهٗ مُتَلَبِّسًا بِعِلْمِهٖ ج اَىْ عَالِمًا بِهٖ اَوْ وَفِيْهِ عِلْمُهٗ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط لَكَ اَيْضًا وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ط عَلٰى ذٰلِكَ .

১৬৬. ইহুদীদেরকে রাসূল ﷺ -এর নবী হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তা অস্বীকার করে। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমার প্রতি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই কুরআন তৎমাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন অর্থাৎ তোমার নবুয়ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন এটা তিনি জেনে-শুনে بِعِلْمِهٖ এটা এখানে উহ্য مُلْتَبِسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এতদসম্পর্কে অবহিত হয়ে অবতীর্ণ করেছেন। বা এই বাক্যটির মর্ম হলো তাতে তার জ্ঞান বিদ্যমান। এবং ফেরেশতাগণও তোমার পক্ষে সাক্ষী আর এতদ্বিষয়ে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

١٦٧. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَصَدُّوْا النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ بِكَتْمِهِمْ نَعْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ الْيَهُوْدُ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ .

১৬৭. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথে অর্থাৎ দীনে ইসলামের পথে রাসূল ﷺ -এর গুণাবলির বিবরণ গোপন করত মানুষকে বাধা দেয় অর্থাৎ ইহুদিরা [তারা] সত্য থেকে বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

١٦٨. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَظَلَمُوْا نَبِيَّهٗ بِكِتْمَانِ نَعْتِهٖ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا لا مِنَ الطُّرُقِ .

১৬৮. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে ও নবীর গুণাবলি গোপন করে তাঁর উপরে জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না; তাদেরকে কখনও কোনো পথপ্রদর্শন করবেন না।

١٦٩. اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ اَيِ الطَّرِيْقَ الْمُؤَدِّىْ اِلَيْهَا خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَآ اِذَا دَخَلُوْهَا اَبَدًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا هَيِّنًا .

১৬৯. জাহান্নামের পথ অর্থাৎ যে পথ পরিণামে তার দিকে নিয়ে যায় সে পথ ব্যতীত; যেখানে যখন প্রবেশ করবে তারা স্থায়ী হবে অর্থাৎ সেখানে স্থায়ীভাবে থাকাই তাদের জন্য নির্ধারিত। এবং এটা আল্লাহর পক্ষে অতি অনায়াসের, অতি সহজ।

١٧٠. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا بِهٖ وَاقْصِدُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ وَاِنْ تَكْفُرُوْا بِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا فَلَا يَضُرُّهٗ كُفْرُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهٖ بِهِمْ .

১৭০. হে লোকসকল! অর্থাৎ হে মক্কাবাসী রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যসহ আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তোমরা যে অবস্থায় আছ তদপেক্ষা তোমাদের জন্য মঙ্গল কামনা কর। আর তোমরা যদি তাঁকে অস্বীকার কর তবে তাঁর কোনোই ক্ষতি হবে না। কারণ, আসমান ও জমিনে যা আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সবকিছু আল্লাহর। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ও তাদের সাথে আচরণে তিনি প্রজ্ঞাময়।

١٧١. يَاَهْلَ الْكِتٰبِ الْاِنْجِيْلِ لَا تَغْلُوْا تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْلَ الْحَقَّ ط مِنْ تَنْزِيْهِهٖ عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَا اَوْصَلَهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ اَيْ ذُوْ رُوْحٍ مِّنْهُ ز اُضِيْفَ اِلَيْهِ تَعَالٰى تَشْرِيْفًا لَهٗ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ اِبْنَ اللّٰهِ اَوْ اِلٰهًا مَعَهٗ اَوْ ثَالِثَ ثَلٰثَةٍ لِاَنَّ ذَا الرُّوْحِ مُرَكَّبٌ وَالْاِلٰهُ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّرْكِيْبِ وَ عَنْ نِسْبَةِ الْمُرَكَّبِ اِلَيْهِ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلَا تَقُوْلُوْا الْاٰلِهَةُ ثَلٰثَةٌ ط اَللّٰهُ وَعِيْسٰى وَاُمُّهٗ اِنْتَهُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَاْتُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط مِنْهُ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط خَلْقًا وَمِلْكًا وَالْمِلْكِيَّةُ تُنَافِي الْبُنُوَّةَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا شَهِيْدًا عَلٰى ذٰلِكَ.

১৭১. হে কিতাবের অর্থাৎ ইঞ্জীলের অধিকারীগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না, সীমালঙ্ঘন করিও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অর্থাৎ শিরক করা ও সন্তান আরোপ করা হতে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য কথা আরোপ করিও না। মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট অর্পণ করেছেন। তাঁর সাথে সম্বন্ধিত করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে [রূহ]-এর অধিকারী এক সত্তা। তাঁর সম্মানার্থে কেবল তাঁকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তোমরা যে ধারণা কর তিনি আল্লাহর পুত্র বা তাঁর সাথে শরিক এক ইলাহ বা তিনের এক ইলাহ বা তিনের এক– তা নয়। কারণ রূহসম্মত বস্তু যৌগিক হয়ে থাকে আর যৌগিকতা এবং কোনো যৌগিক বস্তুর আরোপ করা হতে আল্লাহ হলেন অতি পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বলো না আল্লাহ, ঈসা ও তাঁর মাতা মিলে তিন ইলাহ। এটা হতে নিবৃত্ত হও এবং এটা অপেক্ষা তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর তা অর্থাৎ তাওহীদ অবলম্বন কর। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। সন্তান হওয়া হতে তিনি উর্ধ্বে; এটা থেকে তিনি সুপবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সকল কিছু আল্লাহর। আর মালিকানা ও সন্তান হওয়ার মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর এর উপর উকিল হিসেবে অর্থাৎ সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ : এখানে كَافٌ বর্ণটি উহ্য মাসদারের সিফত। তাকদীরী ইবারত এভাবে হবে– اِيْحَاءً مِثْلَ اِيْحَائِنَا আর مَا সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এটি مَصْدَرِيَّة হয় তাহলে عَائِدٌ আবশ্যক হবে না, আর যদি الذى এর অর্থে হয়, তাহলে عَائِدٌ উহ্য থাকবে। তাকদীরী ইবারত হবে এভাবে– كَالَّذِىْ اَوْحَيْنَاهُ اِلٰى نُوْحٍ

قَوْلُهٗ كَمَآ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) এখানে كَمَا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَوْحَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ -এর عَطْف হয়েছে اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ -এর সাথে, نُوْحٍ -এর সাথে নয়, অন্যথায় এতে তাকরার লাজেম আসবে।

قَوْلُهُ زَبُوْرًا بِالْفَتْحِ اِسْمُ الْكِتَابِ : زبور শব্দটির প্রথম বর্ণ তথা زَاء বর্ণে ফাতহাসহ فَعُوْلٌ-এর ওজনে পঠিত। مَفْعُوْلٌ-এর অর্থে। যেমন رَكُوْبٌ শব্দটি مَرْكُوْبٌ-এর অর্থে। আর এটি زَبَرَهُ [অর্থ كَتَبَهُ সে লিখল] থেকে নির্গত। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম। তাতে একশত পঞ্চাশটি সূরা ছিল। আর শব্দটি পেশ সহ زُبُوْر পঠিত হলে তা মাসদার হবে, مَزْبُوْر-এর অর্থে।

قَوْلُهُ وَاَرْسَلْنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رُسُلًا-এর নসব প্রদানকারী আমেল হলো اَرْسَلْنَا উহ্য ফে'ল।

قَوْلُهُ بِلَا وَاسِطَةٍ : এটি ঐ سُوَال مُقَدَّر-এর জবাব যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলে তো প্রত্যেক নবী থেকেই প্রমাণিত রয়েছে। তারপর ও হযরত মূসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : অন্যান্য নারীদের সাথে আল্লাহর কথা বলে (بِالْوَاسِطَةِ) পরোক্ষভাবে হয়েছে আর হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে।

قَوْلُهُ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো একটি আপত্তির নিরসন করা। তা হলো হেদায়েত এবং خُلُوْد তথা চিরস্থায়ী হওয়ার সময়টি এক নয়। অথচ حَالٌ এবং ذُوالْحَالُ-এর সময় বা কাল এক ও অভিন্ন হওয়া জরুরি।

উত্তর. জাহান্নামের প্রতি পথ প্রদর্শন নির্ধারিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بِهِ : এখানে মুফাসসির (র.) بِهِ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اٰمِنُوْا-এর مُتَعَلِّقْ - بِهِ উহ্য রয়েছে, خَيْرًا নয়। কেননা গোটা কুরআনে اٰمِنُوْا-এর مُتَعَلِّقْ সর্বদা بَاء হরফের সাথেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ : خَبَرٌ-এর নসব প্রদানকারী আমেল সম্পর্কে নাহু শাস্ত্রবিদগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম সিবওয়াই এবং খলীল (র.)-এর বক্তব্য হলো اِقْصِدُوْا কিংবা اَتُوْا ফে'ল উহ্য রয়েছে। আর ইমাম ফাররা (র.)-এর বক্তব্য হলো خَيْرًا **শব্দটি উহ্য মাসদারের সিফত** হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। اَىْ اٰمِنُوْا اِيْمَانًا يَكُنِ الْاِيْمَانُ خَيْرًا لَّكُمْ
উল্লিখিত তিনটি সূরতের মধ্যে তৃতীয়টি সর্বাধিক রাজেহ বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তারপর প্রথমটি এবং তারপর দ্বিতীয়টি।

قَوْلُهُ مِمَّا اَنْتُمْ : **এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে,** مِنْ تَفْضِيْلِيَّهُ **তার** مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ **সহ উহ্য রয়েছে।** সুতরাং এখন এ ইশকাল হবে না যে, اِسْم تَفْضِيْل **-এর ব্যবহার তিন পদ্ধতির কোন পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। অথচ** এখানে একটি পদ্ধতিও নেই।

قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُكُمْ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِنْ تَكْفُرُوْا শর্তের جَزَا উহ্য রয়েছে। আর উল্লিখিত ইবারত সে জাযার প্রতি দালালত করে; কিন্তু সেটি جَزَاء নয়। কেননা যদি فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-কে جَزَاء মানা হয় তাহলে تَرَتُّبُ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ না হওয়ার আপত্তি আসবে।

قَوْلُهُ الْاِنْجِيْلِ : **প্রশ্ন** 'আহলে কিতাবের' তাফসীর اَلْاِنْجِيْلِ দ্বারা কেন করা হলো? অথচ আহলে কিতাবের মধ্যে ইহুদিরাও শামেল আছে।

উত্তর. সামনে غُلُوٌّ فِى الدِّيْنِ-এর যে বর্ণনা আসছে তা জীবনে সঙ্গী এবং সন্তান থেকে মুক্ত। যার মেসদাক কেবল খ্রিস্টানরাই হতে পারে; ইহুদিরা নয়। (تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ)

قَوْلُهُ الْقَوْلَ : এখানে اَلْقَوْلَ উহ্য ধরার দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْحَقَّ উহ্য মওসূফের সিফত হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْصَلَهَا : **প্রশ্ন.** اَلْقَاهَا-এর তাফসীরে اَوْصَلَهَا উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর. যেহেতু اَلْقٰى-এর صِلَه হিসেবে اِلٰى আসতে পারে না, এজন্য এখানে ইঙ্গিত করা হলো যে, اَلْقٰى ফে'লটি اَوْصَلَ-এর অর্থ শামেল রাখে। যার কারণে صِلَه হিসেবে اِلٰى আনা শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ ذُو الرُّوْحِ : **প্রশ্ন** رُوْح-এর তাফসীর ذُوالرُّوْحِ তথা مُضَاف উহ্য ধরে করা হলো কেন?

উত্তর. এভাবে করার কারণ হলো, যাতে رَسُوْلُ اللّٰهِ-এর উপর رُوْح-এর ব্যবহার শুদ্ধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ عَنْ ذٰلِكَ وَاٰتُوْا : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِنْتَهُوْا-এর **মাফউল উহ্য রয়েছে।** আর خَيْرًا উহ্য ফেল اٰتُوْا-**এর কারণে** মানসূব হয়েছে। সুতরাং এ আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, خَيْر **থেকে বারণ করা আল্লাহ** তা'আলার শানের জন্য **উপযুক্ত** নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, **ইহুদিদের কিছু** নেতৃস্থানীয় লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে এ শর্ত করল যে, যেভাবে **হযরত মূসা (আ.)**-এর উপর একত্রে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল অনুরূপভাবে আপনি এমন কোনো লিখিত কিতাব নিয়ে **আসুন। তাহলে আমরা** ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তাদের এ প্রশ্নের ভিত্তি ছিল বিদ্বেষ ও হটকারিতা উপর। ইখলাসের উপর **ছিল না। এখানে প্রশ্ন** হয়- যদি ঈমান আনার জন্য আসমান থেকে লিখিত কিতাব নাজিল হওয়া আবশ্যক হয়, তাহলে হযরত মূসা (আ.)-**এর উপর অবতীর্ণ** একত্রে লিখিত কিতাব তাওরাত নাজিল হওয়ার পর তোমাদের পূর্বপুরুষরা তার উপর ঈমান আনেনি কেন? **অধিকন্তু তারা হযরত** মূসা (আ.)-এর কাছে তদাপেক্ষা বড় বিষয় **দাবি করেছিল।** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখার অবান্তর **দাবি করেছিল।** যার ফলে তাদের এ বেয়াদবির কারণে আসমান থেকে বিজলি এসে তাদেরকে ভস্ম করে দিয়েছিল।

উক্ত আয়াতসমূহে এ আপত্তিরই ভিন্ন আঙ্গিকে জবাব দেওয়া **হচ্ছে** যে, তোমরা যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর **প্রতি** ঈমান আনার জন্য এ শর্ত জুড়ে দিচ্ছ যে, আপনি আসমান থেকে একটি লিখিত কিতাব এনে দেখান, তোমরাই বল, যেসব বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে, তাঁদেরকে তোমরা নবী হিসেবে মান্য করে থাক। অথচ তাঁদের ব্যাপারে তোমরা এ দাবি পেশ কর **না।** সুতরাং যে দলিলের ভিত্তিতে তাঁদেরকে তো তোমরা নবী হিসেবে মান্য করে থাক, অর্থাৎ মুজেযা দেখে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর কাছেও তো অনুরূপ মুজেযা রয়েছে, তাহলে তাঁর উপর ঈমান নিয়ে এসো! কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, তোমাদের এ দাবি সত্য অন্বেষণের জন্য নয়, বরং হটকারিতা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে।

কুরআনে উল্লিখিত নবী রাসূলের নাম : কুরআনে কারীমে যেসব নবী রাসূলের নাম ও তাঁদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ২৪ কিংবা ২৫। ১. হযরত আদম (আ.) ২. হযরত ইদ্রীস (আ.) ৩. হযরত নূহ (আ.) ৪. হযরত হুদ (আ.) ৫. হযরত সালেহ (আ.) ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৭. হযরত লূত (আ.) ৮. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৯. হযরত ইসহাক (আ.) ১০ হযরত ইয়াকূব (আ.) ১১. হযরত ইউসুফ (আ.) ১২. হযরত আইয়ূব (আ.) ১৩. হযরত শুয়াইব (আ.) ১৪. হযরত মূসা (আ.) ১৫. হযরত হারূন (আ.) ১৬. হযরত ইউনুস (আ.) ১৭. হযরত দাউদ (আ.) ১৮ হযরত সুলাইমান (আ.) ১৯ হযরত ইলিয়াস (আ.) ২০. হযরত মাসীহ (আ.) ২১. হযরত যাকারিয়া (আ.) ২২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ২৩. হযরত ঈসা (আ.) ২৪. হযরত যুল কিফল (আ.) ২৫. হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

সকল নবী-রাসূলের মোট সংখ্যা : যেসব নবী রাসূলের নাম ও ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়নি, তাঁদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এক প্রসিদ্ধ হাদীসে এক **লক্ষ** চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। অপর হাদীসে আট হাজার বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনা দুর্বল বলে আখ্যায়িত। **কুরআন ও হাদীস দ্বারা শুধু** এতটুকু জানা যায় যে, বিভিন্ন সময় নবীগণ আগমন করেছিলেন এবং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর এসে সে ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পর যে কয়জন নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছে কিংবা ভবিষ্যতে করবে, তাদের সবাই মিথ্যুক ও দাজ্জাল বলে সাব্যস্ত। তাদেরকে যারা নবী হিসেবে বিশ্বাস করবে তারা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। -[জামালাইন ২/১৩১, ১৩২]

কতিপয় জরুরী টীকা :

ওহী প্রত্যাখ্যান মূলত কুফরি : এ দ্বারা জানা গেল যে, ওহী একান্তই মহান আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর বার্তা, যা নবীগণের নিকট প্রেরিত হয়। পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন মহান আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমন ওহীই মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। সেগুলো যে বিশ্বাস করে এটাকেও তার বিশ্বাস করা উচিত। এটাকে প্রত্যাখ্যান করে সে যেন প্রকারান্তরে সেগুলোর প্রত্যাখ্যানকারী হলো। হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তীদের সাথে তুলনা করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, হযরত আদম (আ.)-এর সময় হতে যে ওহী নাজিলের ধারা শুরু হয়, সেটা ছিল ওহীর সম্পূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা। হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত তার পূর্ণতা বিধান হয়। অর্থাৎ প্রথম অবস্থা ছিল নিছক শিক্ষাপর্ব। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে তা

পরিপূর্ণ হয়ে যেন পরীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল, যাতে অনুগতদেরকে পুরস্কৃত এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই মহামর্যাদাবান আম্বিয়ায়ে কেরামের ধারাও হযরত নূহ (আ.) হতেই শুরু হয়। ওহীর সাথে আবাধ্যাচরণকারীদেরকে সর্বপ্রথম শাস্তি দেওয়াও তাঁর আমল হতেই আরম্ভ হয়। সারকথা, পূর্বে মহান আল্লাহর আদেশ ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো না; বরং তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে করে অবকাশ দেওয়া হতো এবং বোঝানোরই চেষ্টা চালানো হতো। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করল, মহান আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে মানুষের কোনোরূপে অস্পষ্টতা থাকল না, তখন থেকে অবাধ্যদের উপর শাস্তি নাজিল করা শুরু হয়। সর্বপ্রথম তাঁর জমানায় মহাপ্লাবন হয়। তারপর হযরত নূহ (আ.), শুয়াইব (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের আমলে কাফেরদের উপর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আসে। প্রিয়নবী ﷺ -এর ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের ওহীর সাথে তুলনা করে কিতাবী ও মক্কা শরীফের মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর ওহীকে মানবে না, সে মহা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। -[তাফসীরে উসমানী: টীকা-২২৬]

ওহী বিভিন্ন প্রকার তাতে ঈমান রাখা ফরজ : হযরত নূহ (আ.)-এর পর যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেন, তাঁদের কথা اَلنَّبِيّٖنَ শব্দ দ্বারা] অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পর তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সুবিখ্যাত তাঁদের কথা বিশেষভাবে নমোল্লেখসহ বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা ঠিক সেই সকল ওহীর মতো সত্য ও তা স্বীকার করে নেওয়া সেই সব ওহীর মতোই জরুরি, যা মহা মর্যাদাবান ও সুপ্রসিদ্ধ নবীগণের প্রতি নাজিল হয়েছিল। আরো জানা গেল যে, নবীগণের প্রতি যে ওহী আসে তা কখনও ফেরেশতাগণ নিয়ে আসেন, কখনো তাদেরকে লিখিত কিতাবই দেওয়া হয়, আবার কখনো কোনোরূপ মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সরাসরিই নবীর সাথে কথা বলেন। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা যেহেতু মহান আল্লাহরই হুকুম, অন্য কারো নয়, তাই বান্দাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য একই রকম ফরজ, তা বান্দাদের নিকট পৌছার পদ্ধতি লিখিত হোক বা মৌখিক কিংবা হোক কিংবা হোক বার্তা আকারে। কাজেই, ইহুদিরা যে বলে, তুমি আসমান হতে তাওরাতের মতো একই সাথে গোটা একখানি কিতাব আনতে পারলে তোমাকে বিশ্বাস করব, নচেৎ নয়, এটা কত বড় ঈমানহীনতা ও নির্বুদ্ধিতা! ওহী যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তা অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন, তখন যে কোনো পদ্ধতিতেই নাজিল হোক না কেন তা মানতে দ্বিধা-সংশয় করা বা তা প্রত্যাখ্যান করা কিংবা একথা বলা যে, অমুক পদ্ধতিতে আসলে মানব, নয়তো মানব না- এটা প্রকাশ্য কুফরি ও সুস্পষ্ট আহমকী। -[তাফসীরে উসমানী: টীকা-২২৭]

قَوْلُهُ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ : নবী ও রাসূল পাঠানোর কারণ : মুমিনগণকে সুসংবাদ দান এবং কাফেরদরেকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একের পর এক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন কেউ এই অজুহাত দেখাতে না পারে যে, তুমি কিসে খুশি, কিসে নারাজ? তা আমরা জানতাম না। জানলে অবশ্যই সে অনুসারে চলতাম। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যখন নবীগণকে মুজেযাসহ পাঠালেন এবং তাঁরা সত্যের পথ দেখালেন, তখন আর কারো সত্য দীনে কবুল না করার কোনো অজুহাত শোনা যেতে পারে না; বরং সব রকমের অজুহাত-অভিযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা; বরং তিনি জবরদস্তি করলেই বা কে বাধা দিতে পারে? কিন্তু তা পছন্দ করেন না। -[তাফসীরে উসমানী : ২২৮]

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا : এ গুণটি উল্লেখ করে স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি সত্যিকার মালিক, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী; পয়গাম্বরদের প্রেরণ না করেও তিনি যে কোনো ওজর প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাকীমও। এ গুণটির উল্লেখ দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর পরিপূর্ণ হিকমত ও বিবেচনার দাবি এই যে, তিনি বাহ্যিক ওজরও বাকি থাকতে দেবেন না। -[তাফসীরে মাজেদী: টীকা ৪১৭]

قَوْلُهُ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ : এখানে لٰكِنْ অর্থ এখন যদি এরা, বিশেষত ইহুদিরা এতদসত্ত্বেও নবুয়তে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে না নেয়, তবে বর্ণনায় দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াত اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ আয়াতটি শ্রবণ করে ইহুদিরা বলেছিল আমরা তো তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য দেই না। اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ আয়াত নাজিল হলে কিছুলোক বলেছিল, আমরা তোমার পক্ষে এ সাক্ষ্য দেই না, তখন لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ আয়াতটি নাজিল হয়। বক্তব্যে কিছু কথা উহ্য রয়েছে, যা পরবর্তী বাক্য থেকে বুঝা যায়। কাফেররা বলে, হে মুহাম্মাদ ﷺ! তুমি যা কিছু বলছ, আমরা তার সাক্ষ্য দেই না, তাহলে কে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? -[তাফসীরে মাজেদী: টীকা ৪১৮]

জ্ঞানের সে পরিপক্কতাই কুরআনকে মুজেযায় পরিণত করেছে : اَللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহর সাক্ষ্য এ কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে وَاَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ এতে কুরআনের পরিপূর্ণতার গুণ প্রমাণ হয়। মু'তাযিলারা আল্লাহর যেসব গুণ অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাতের মুতাকাল্লিমীনরা এ আয়াত দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৪১৮]

قَوْلُهُ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ : অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর সাক্ষ্যের পর অন্য কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে না। وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ আল্লাহর সাক্ষ্য তো কুরআনের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে; কিন্তু ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের তাৎপর্য কি? সাধারণ তাফসীরকাররা বলেন যে, ফেরেশতারা এসব অবিশ্বাসীদের চেয়ে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ, তারা যখন রাসূলের পক্ষে সাক্ষ্য দান করেন, তখন অবিশ্বাসীদের আর কি মূল্য থাকতে পারে? তবে বক্তব্যের আর এটা দিক এও হতে পারে যে, প্রকৃতির রাজ্যের সমস্ত কর্মকাণ্ড ফেরেশতাদের দ্বারাই সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের কার্যত সাক্ষ্য যা মূলত ফেরেশতাদেরই সাক্ষ্য, তার সবটুকুই তো রাসূল, ইসলাম ও রাসূলের উপস্থাপিত দীনেরই সাক্ষ্য এবং তারই সহায়ক ও সমর্থক। بِاللّٰهِ শব্দে بَاء অব্যয়টি অতিরিক্ত। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৪২০]

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ : **যোগসূত্র :** ইতিপূর্বে ইহুদিদের একটি অন্যায় আবদারের জবাব দিয়ে নবুয়তে মুহাম্মাদীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এবার সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুয়তের প্রতি আস্থা ও ঈমান এবং তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করা সম্ভব, অন্য কোনো পন্থায় নয়। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৬১]

মহানবী ﷺ ও তাঁর কিতাবের প্রত্যায়ন এবং তার বিরুদ্ধবাদী তথা কিতাবীদের মত খণ্ডন ও তার পথভ্রষ্টতা প্রমাণ করার পর এবার সাধারণভাবে সকল মানুষকে ডাক দিয়ে বলা হয়েছে, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিকট সত্য দীন ও সত্য কিতাব নিয়ে আমার রাসূল এসে গেছেন। এখন তাঁর আনুগত্য করার মাঝেই তোমাদের কল্যাণ। আর যদি তাঁকে অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ, আসমান-জমিনের সমুদয় বস্তু তাঁরই। তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ। সবকিছুর পুরো হিসাব-নিকাশ হবে এবং তার সমুচিত বদলাও দেওয়া হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট বোঝা গেল, নবীর উপরে যে ওহী নাজিল হয়, তা মানা ফরজ এবং অস্বীকার করা কুফর। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২৩১]

قَوْلُهُ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ : **যোগসূত্র :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের সম্বোধন করে তাদের গোমরাহীর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবার খ্রিস্টানদের সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ও হযরত ঈসা মসীহ (আ.) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হচ্ছে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৬২]

নবী ও রাসূলগণকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা ফরজ এবং দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সরাসরি কুফরি : কিতাবীগণ তাদের নবী রাসূলের প্রশংসায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করত ও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তাদেরকে মহান আল্লাহ বলেছেন, দীনি বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না। যার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস আছে, তার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়। যতটুকু সত্য ও প্রমাণিত তার বেশি বলা অনুচিত। আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত সত্তা সম্পর্কেও কেবল তা-ই বল, যা সত্য ও প্রমাণিত। নিজেদের পক্ষ হতে কিছু বলো না। তোমরা একী সর্বনাশা কথা বলছ যে, যে ঈসা মহান আল্লাহর রাসূল এবং তিনি মহান আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট, তাঁকে ওহীর বিপরীতে মহান আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করছ ও তিন আল্লাহর প্রবক্তা হয়ে গেছে? এক আল্লাহ তো আল্লাহ স্বয়ং, দ্বিতীয় ঈসা এবং তৃতীয় মারইয়াম। তোমরা এসব থেকে নিবৃত্ত হও। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। কেউ তাঁর ছেলেও হতে পারে না। তাঁর সত্তা এসব হতে পূতপবিত্র। এসব বিভ্রান্তির উৎস হলো তোমাদের ওহী বিমুখিতা। তোমরা যদি ওহীর অনুসরণ করতে তাহলে কাউকে মহান আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করতে না এবং তিন আল্লাহর প্রবক্তা হয়ে প্রকাশ্য মুশরিক হতে না। পরন্তু, এখন আবার নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ﷺ ও কিতাব তথা শ্রেষ্ঠ কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে ডবল কাফের হতে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কিতাবীদের এক শ্রেণি তো হযরত ঈসা (আ.)-কে রাসূল বলেই স্বীকার করেনি, অধিকন্তু তাঁকে হত্যা করা পছন্দ করেছে। তাদের সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় তাঁকে মহান আল্লাহর পুত্র স্থির করেছে। উভয় শ্রেণিই কাফের। তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ ছিল ওহী থেকে সরে দাঁড়ানো। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুক্তি ওহীর অনুসরণেই মাঝে সীমাবদ্ধ।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা ২৩২]

দীনের ক্ষেত্রে غُلُوٌّ বা বাড়াবাড়ি করা এই যে, বিশ্বাস ও কর্মে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন-বিয়োজনকে স্থান দেওয়া, তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। أَهْلُ الْكِتٰبِ বলে এখানে ইঞ্জীল কিতাবধারী বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইহুদিদের আপত্তিকর বিষয়ের উল্লেখ করত সেসবের জবাব দিয়ে এখানে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হচ্ছে, যারা ইহুদিদের অতিরঞ্জনের বিপরীতে হ্রাস করারও চরম স্তরে উপনীত হয়েছিল। তারা হযরত ঈসা মাসীহকে একজন সৎ ও মকবুল বান্দার পরিবর্তে খোদা বা খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। হযরত থানভী (র.) বলেন, ইহুদিদের বাড়াবাড়ি ছিল জাহেরী বিধানের ক্ষেত্রে খুঁত খুঁজে বেড়ানো এবং বাহ্যিক দিক থেকে বিমুখতা। আর সত্যপন্থা হচ্ছে জাহের এবং বাতেনকে একত্র করা। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৪২৮]

قَوْلُهُ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ : ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম : আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غُلُوٌّ শব্দের অর্থ– সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন– اَلْغُلُوُّ فِى الدِّيْنِ هُوَ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْحَقِّ فِيْهِ অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে غُلُوٌّ [বাড়াবাড়ি] করার অর্থ– তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা হচ্ছে– আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে ইহুদিরা তাকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে স্বীকার করেনি, বরং তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উপর [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা] মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দা করেছে। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বারবার প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারূকে আযম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا تَطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ **অর্থাৎ 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম** (আ.)-এর **ব্যাপারে করেছে। খুব স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।'** ইমাম **বুখারী ও ইবনে মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।**

সারকথা, আল্লাহর বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহর রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহর কোনো বিশেষণে বিভূষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদি-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদি-খ্রিস্টানরা শুধু নবীদের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং এটা যখন তাদের স্বাভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবীদের সহচর অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল, পাদ্রী-পুরোহিতদেরও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করাও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবীদের অনুগত এবং তাদের শিক্ষার অনুসারী, না শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিতরূপে পরিগণিত হন। ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্মকর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কুরআন পাক ঘোষণা করছে– اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।" রাসূলকে তো কাদা বানিয়েছিলই, রাসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীদেরও পূজা করা শুরু করেছিল।

এর থেকে বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী ﷺ স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজের সময় রমীয়ে জামারাহ অর্থাৎ কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারে পাথরকুটি নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন- بِمِثْلِهِنَّ بِمِثْلِهِنَّ অর্থাৎ এ ধরনের মাঝারি আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। অতঃপর আরো বললেন- إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِىْ دِيْنِهِمْ অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থেকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল-

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমত হজের সময় যে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারি আকারের হওয়াই সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থি। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরিয়তের নির্ধারিত সীমা। সেটা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়ত যে কোনো কাজে সুন্নতসম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের সীমা : পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কুরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিয়ে করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন। বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনোটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। ইসলামি সমাজ -ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোনো মোহ ছিল না। এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুধাবন করতে অপারগ হওয়ায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا অর্থাৎ তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করছে যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা : ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলে পাক ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রকার বিদ'আতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ অর্থাৎ প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রাসূলে মকবুল ﷺ -এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোনো বিষয়কে ছওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরিয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতদেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রাসূলদের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আর আসল রূপরেখা কি ছিল? তা জানারও কোনো উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনো গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামি শরিয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তদীয় 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা : উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী করীম ﷺ -এর কঠোর হুঁশিয়ারি এবং শরিয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করেছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গানের কোনো প্রয়োজনই নেই। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। এ মনোভাবাপন্ন কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবি ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কুরআনের হাকিকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি 'অনুবাদ পুস্তক' পাঠ করেই নিজেকে কুরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোনো বিষয় বা শাস্ত্রের বই-পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারেনি। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোনো পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শোনা যায় না। এমন কি দর্জি-বিদ্যা বা পাক-প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোনো সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না, বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কুরআন-হাদীসকে এত হালকা মনে করেছে যে, এগুলো বোঝার জন্য কোনো ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যি পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক এমন গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, তাদের ধারণা, কুরআন পাক বোঝার জন্য তরজমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষীদের তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপর দিকে বহু মুসলমান অন্ধভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি ইলম-আমল, ইসলাহ ও পরহেজগারীর মাপকাঠিতে টেকেন কিনা? তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামি শরিয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব আল্লাহওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহওয়ালা লোকদের চিনতে হবে অর্থাৎ প্রথমে কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের চিনে নাও। অতঃপর দেখ, তাঁরা কুরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারা কুরআন হাদীসের রঙ্গে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ২, পৃ. ৫৬৬-৫৭০]

قَوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ : كلمة শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর কালিমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। যথা–

১. ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, কোনো শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী পুরুষের বীর্যের সম্মিলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ তা'আলার كُنْ [হও] নির্দেশ দেওয়া; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মলাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধু আল্লাহ তা'আলা এই কালেমাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মারইয়ামের কাছে পৌঁছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকরী ও বাস্তবায়িত হলো।

২. কারো মতে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর সু-সংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সু-সংবাদ দান করেছিলেন, সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা- إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ অর্থাৎ এবং যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন 'কালেমা' সম্পর্কে।

৩. কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَرُوْحٌ مِّنْهُ : এ শব্দের দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত হযরত ঈসা (আ.)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা-

১. কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোনো বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝানোর জন্য তাকে সরাসরি 'রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোনো দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং كُنْ নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি অতি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন মসজিদের সম্মানার্থে তাকে 'আল্লাহর মসজিদ' বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়, অথবা কোনো একান্ত অনুগত বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা বলা হয়। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আল্লাহর বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

২. কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন- وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কুরআনকেও 'রূহ' উপাধিত ভূষিত করা হয়েছে। কেননা কুরআন পাক হলো আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

৩. কেউ বলেন 'রূহ শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ হযরত ঈসা (আ.)-এর নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

৪. কারো অভিমতে- এখানে একটি ذُوْ শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে ছিল ذُوْ رُوْحٍ مِّنْهُ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ বিশিষ্ট। প্রাণবিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে সব প্রাণীই সমান। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

৫. আরেকটি অভিমত এই যে, رُوْحٌ [রূহ] শব্দ ফুঁ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গলাবন্ধে ফুঁ দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই ঈসা (আ.)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা : আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন যে, একদিন খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খ্রিস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হলো। সে বলল তোমাদের কুরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ সে কুরআনের رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআন পাকের অন্য আয়াত وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ পাঠ করলেন। এখানে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সবকিছুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যার অর্থ আসমানে ও জমিনে যা কিছু

আছে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতএব رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ, তবে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর অংশ [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক]। অতএব, হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষ কোনো মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খ্রিস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

قَوْلُهُ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ : কুরআন নাজিলের সমসাময়িককালে খ্রিস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীরি উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো– মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো– মসীহ খোদার পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্যের সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস তথা পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ.) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি আপনোদনের জন্য কুরআনে কারীমে প্রতিটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো হযরত ঈসা (আ.) তার মাতা হযরত মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত যা কিছু বলা হয় বা ধারণা পোষণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদিদের মতো অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খ্রিস্টানদের মতো অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তির দু'টি পরস্পরবিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খ্রিস্টানদের বিভিন্ন উপদলের ভ্রান্ত আকীদার ভিন্ন দিক ও তার মোকাবিলায় ইসলামি আকীদার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সবিস্তারে জানার জন্য মরহুম হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানুভী (র.) কর্তৃক সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'ইজহারুল হক' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বইটি মূল আরবি হতে উর্দু তরজমায় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসহ সম্প্রতি করাচী দারুল উলূম হতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৬৩-৫৬৬]

قَوْلُهُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا : অর্থাৎ আসমানে ও জমিনের উপর হতে নিচে পর্যন্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা একাই সকল কার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা : কোনো সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব একমাত্র বিবেক বর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৬৬]

অনুবাদ :

١٧٢. لَنْ يَّسْتَنْكِفَ يَتَكَبَّرَ وَيَأْنِفَ الْمَسِيْحُ الَّذِىْ زَعَمْتُمْ اَنَّهُ اِلٰهٌ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَسْتَنْكِفُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا عَبِيْدًا وَهٰذَا مِنْ اَحْسَنِ الْاِسْتِطْرَادِ ذِكْرٌ لِلرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّهَا اٰلِهَةٌ اَوْ بَنَاتُ اللّٰهِ كَمَا رَدَّ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى النَّصَارٰى الزَّاعِمِيْنَ ذٰلِكَ الْمَقْصُوْدُ خِطَابُهُمْ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا فِى الْاٰخِرَةِ.

১৭২. মসীহ যাকে তোমরা ইলাহ বলে ধারণা কর সে আল্লাহর দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না। এতে অহমিকা প্রদর্শন বা অহঙ্কর করে না। এবং আল্লাহর দরবারের ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও আল্লাহর দাস হওয়াতে লজ্জাবোধ করে না। আয়াতোক্ত ভঙ্গিটি একটি চমৎকার ও উত্তম প্রত্যুত্তর ভঙ্গি। পূর্বের বাক্যটিতে খ্রিস্টানদের যারা হযরত ঈসা সম্পর্কে ইলাহ হওয়ার ধারণা পোষণ করে ধারণার যেমন প্রত্যুত্তর দান করা হয়েছে। তেমনি এই স্থানে ফেরেশতাগণকে যারা উপাস্য এবং আল্লাহর কন্যা বলে ধারণা পোষণ করে তাদের প্রত্যুত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানে মূলত এদেরই সম্বোধন করা উদ্দেশ্য। **এবং কেউ তাঁর দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে ও অহমিকা প্রদর্শন করলে তিনি** পরকালে **তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।**

١٧٣. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ثَوَابَ اَعْمَالِهِمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْ عِبَادَتِهٖ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ مُؤْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ.

১৭৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পারিশ্রমিক অর্থাৎ তাদের কাজের পুণ্যফল প্রদান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দিবেন। এমন বস্তু দিবেন যা চোখ দেখেনি, কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানবের হৃদয়ে যার কল্পনাও উদয় হয়নি। কিন্তু যারা তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করে ও অহমিকা প্রদর্শন করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামাগ্নির শাস্তি প্রদান করবেন।

١٧٤. وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَلِيًّا يَدْفَعُهُ عَنْهُمْ وَّلَا نَصِيْرًا يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ.

১৭৪. এবং আল্লাহ ব্যতীত তাঁকে ছাড়া নিজেদের জন্য তারা কোনো অভিভাবক যে তাদের পক্ষ হতে তা প্রতিহত করবে এবং যে তাঁর হতে তা বাধা দিয়ে রাখবে এমন কোনো সহায় পাবে না।

١٧٥. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ حُجَّةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَهُوَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا وَهُوَ الْقُرْاٰنُ.

১৭৫. হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ দলিল এসেছে আর তা হলেন রাসূল ﷺ এবং আমি তোমাদের প্রতি **স্পষ্ট** স্বচ্ছ জ্যোতি অর্থাৎ আল কুরআন **অবতীর্ণ করেছি।**

١٧٦. فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصِمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا ط طَرِيْقًا مُّسْتَقِيْمًا هُوَدِيْنُ الْاِسْلَامِ.

১৭৬. যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাঁকেই অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে পরিচালিত করবেন।

١٧٧. يَسْتَفْتُوْنَكَ ط فِى الْكَلٰلَةِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُءٌ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ هَلَكَ مَاتَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ اَىْ وَلَا وَالِدٌ وَهُوَ الْكَلٰلَةُ وَلَهٗ اُخْتٌ مِنْ اَبَوَيْنِ اَوْ اَبٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ اَيِ الْاَخُ كَذٰلِكَ يَرِثُهَا جَمِيْعَ مَا تَرَكَتْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ فَلَا شَيْءَ لَهٗ اَوْ اُنْثٰى فَلَهٗ مَا فَضَلَ عَنْ نَصِيْبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الْاُخْتُ اَوِ الْاَخُ مِنْ اُمٍّ فَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا تَقَدَّمَ اَوَّلَ السُّوْرَةِ فَاِنْ كَانَتَا اَيِ الْاُخْتَانِ اثْنَتَيْنِ اَىْ فَصَاعِدًا لِاَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ جَابِرٍ وَقَدْ مَاتَ عَنْ اَخَوَاتٍ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط الْاَخُ وَاِنْ كَانُوْٓا اَيِ الْوَرَثَةُ اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ لِ اَنْ لَا تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ الْمِيْرَاثُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّهَا اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْفَرَائِضِ.

১৭৭. লোকেরা আপনার নিকট কালালা সম্পর্কে পরিষ্কার জানতে চায়। বলুন, কালালা সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে মারা গেলে اِمْرُءٌ এটা এখানে উহ্য এমন একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে مَرْفُوْع রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যে ক্রিয়াটির বিবরণ হলো পরবর্তী ক্রিয়া هَلَكَ সে যদি সন্তান ও পিতৃহীন হয় এমন ব্যক্তিকেই কালালা বলা হয় থাকে [এবং তার] আপন বা পিতা শরিক এক ভাগ্নী থাকে তবে তার [অর্থাৎ ভগ্নীর] জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং যদি সন্তানহীনা হয় তবে সে অর্থাৎ ভ্রাতা [তার] সাকুল্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যদি তার অর্থাৎ মৃতা ভগ্নীর পুত্র সন্তান থাকে তবে সে [ভ্রাতা] কিছুই পাবে না। আর যদি তার কন্যা সন্তান থাকে তবে তাকে [কন্যাকে] তার নির্ধারিত হিস্যা প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ সে [ভ্রাতা] পাবে। আর উক্তরূপ ভ্রাতা ও ভগ্নী যদি বৈপিত্রেয় হয় তবে তার [অর্থাৎ ভ্রাতার] অংশ হলো এক ষষ্ঠাংশ। সূরার প্রথমে এর উল্লেখ হয়েছে। তার অর্থাৎ ভগ্নীগণ দুই বা ততোধিক; কারণ, হযরত জাবির সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তিনি বহু ভগ্নী রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন; হলে তাদের জন্য তার অর্থাৎ ভ্রাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ হবে আর যদি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাই বোন উভয়ই থাকে তবে তাদের এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান হবে। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও সে জন্য আল্লাহ তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম-বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। মীরাছের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। শায়খাইন অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, ফারায়িয সম্পর্কে এ আয়াতটিই হলো সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَيَسْتَنْكِفْ : مُضَارِعْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ্। মাসদার হলো, اِسْتِنْكَافْ অর্থ, সে লজ্জাবোধ করে, ঘৃণা করে এবং সে অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। উক্ত শব্দটির মূলবর্ণ হলো نَكْفًا وَنَكَفًا (س، ن) نَكَفَ অর্থ– অপাত্রে অহঙ্কার করা।

قَوْلُهُ اَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ : اَلْمَلَائِكَةُ এর عَطْف হয়েছে اَلْمَسِيْحُ -এর সাথে। আবার এমনও হতে পারে যে, اَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ বাক্যাংশটি مُرَكَّب تَوْصِيْفِيْ হয়ে مُبْتَدَا হবে এবং لَا يَسْتَنْكِفُوْنَ তার উহ্য খবর।

قَوْلُهُ هٰذَا مِنْ اَحْسَنِ الْاِسْتِطْرَادِ : অর্থাৎ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ -এর সাথে اِسْتِطْرَاد اَحْسَنْ রয়েছে।

اِسْتِطْرَاد مُطْلَقْ -এর সংজ্ঞা : ذِكْرُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ لِمُنَاسَبَةٍ কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ উপলক্ষে অপাত্রে উল্লেখ করা।

اِسْتِطْرَادْ -এর দ্বিতীয় সংজ্ঞা : উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে অনুদ্দিষ্ট বিষয়টি আবশ্যক হয়ে যায়। اِسْتِطْرَادْ حَسَنْ বলা হয় দ্বিতীয় অর্থের জন্য [যেটি উদ্দিষ্ট হয়] প্রথম অর্থটিকে মাধ্যম বানানো। মুফাসসির (র.) এখানে هٰذَا مِنْ اَحْسَنِ الْاِسْتِطْرَادِ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, উল্লিখিত আয়াতে اِسْتِطْرَاد حَسَنْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَيْهِ : اَيْ اِلَى اللّٰهِ اَوِ الْاَقْرَانِ

قَوْلُهُ اوله الزَّاعِمِيْنَ ذٰلِكَ : এটি اَلنَّصَارٰى -এর সিফত। আর ذٰلِكَ দ্বারা খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তথা – رَبَّنِيَّتْ এবং اُلُوْهِيَّتْ تَثْلِيْث প্রতিটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا : এটি يَهْدِيْهِمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : নাজরান অধিবাসী নাসারাদের একটি দল রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ করল যে, আপনি আমাদের সাথীর বদনাম কেন করেন? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের সাথী কে? তারা বলল, হযরত ঈসা (আ.)। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তাঁর সম্পর্কে কি বলেছি? তারা বলল, আপনি তাঁকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর বান্দা হওয়া হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্য কোনো দোষের কিছু নয়। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

–[তাফসীরে খাযেন ও রুহুল মা'আনী]

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা হওয়ার মাঝে লজ্জাবোধ করেন না। শুধু তিনি-ই নন, বরং আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে না। আল্লাহর বান্দা হওয়া তো চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মানের বিষয়। অপমান ও লাঞ্ছনা তো রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার মাঝে। যেমন খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং উপাস্য এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা আখ্যা দিয়ে তাদের ইবাদত করতে শুরু করে দিয়েছে। –[জামালাইন ২/১৭৩]

নবীগণ শ্রেষ্ঠ নাকি ফেরেশতাগণ? কোনো কোনো মুফাসসির উক্ত আয়াতের অধীনে নবী এবং ফেরেশতাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনাও করেছেন। কেউ ফেরেশতাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, আবার কেউ নবীদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। প্রথম উক্তিটি মু'তাযিলা এবং কতিপয় আশাইরা মতাবলম্বীরা করে থাকে। দ্বিতীয় উক্তিটি অধিকাংশ আশাইরাদের। কিন্তু ইনসাফের কথা হলো, উক্ত আয়াতের সাথে এ আলোচনার কোনো সম্পর্কে নেই এবং এ আলোচনায় কোনো ফায়দাও নেই। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা আসেনি।

فَائِدَةٌ : اِسْتَدَلَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الْقَائِلُوْنَ بِتَفْضِيْلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ، وَهُمْ اَبُوْ بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيْ وَالْحَلِيْمِيْ مِنْ اَئِمَّةِ الْاَشْعَرِيَّةِ وَجُمْهُوْرِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَقَرَّرَ زَمَخْشَرِيُّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ بِمَا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ، وَاَطَالَ الْبَيْضَاوِيْ وَابْنُ الْمُنِيْرِ فِي الرَّدِّ عَلَى وَالْمُنْصِفُ يَرٰى اَنَّ التَّفَاضُلَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ مِنْ قَبِيْلِ الرَّجْمِ بِالْغَيْبِ.

–[জামালাইন ২/১৩৭, ১৩৮]

ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মু'তাযিলাদের বিশ্বাস : মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হলো, ফেরেশতারা নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাফসীরে কাশ্শাফের লেখক উক্ত আয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। মু'তাযিলদের দাবি উক্ত আয়াতের দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে مَقَام عَبْدِيَّة নাকচ করা হয়েছে এবং مَقَام اِبْنِيَّة সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর اِبْن তথা পুত্র যেহেতু পিতার অংশ হয়ে থাকে সেহেতু পুত্র প্রমাণিত হওয়া মানে আল্লাহর অংশ প্রমাণিত হওয়া।

দলিল : لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর মধ্যে لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ হলো مَعْطُوْف عَلَيْه এবং وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ হলো মা'তুফ। تَرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى কায়দা অনুসারে মা'তুফ আলাইহি-এর চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। যাতে মা'তুফটি মা'তুফ' আলাইহি-এর জন্য দলিলের স্থলে হয়। উক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ না করা হলো মা'তুফ আলাইহি এবং ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ না হওয়াটা হলো মা'তুফ। আর মু'তাযিলাদের বক্তব্য অনুযায়ী মা'তুফ আলাইহি শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। সে হিসেবে উক্ত বিধানের আলোকে মু'তাযিলাদের দৃষ্টিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না। কেননা ফেরেশতারা শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না। যেন ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ না করা হযরত ঈসা (আ.)-এর লজ্জাবোধ না করার দলিল। এ কারণেই বলা হয়- لَا تَسْتَنْكِفُ فُلَانٌ عَنْ خِدْمَتِىْ وَلَا اَبَاهُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আমার খেদমত করতে লজ্জাবোধ করে না, এমনকি তার পিতাও না। উক্ত দৃষ্টান্তে تَرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى পাওয়া গিয়েছে। কেননা পিতা পুত্র থেকে উত্তম হয়ে থাকেন। এ কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে لَا يَسْتَنْكِفُ فُلَانٌ عَنْ خِدْمَتِىْ وَلَا غُلَامُهُ বলা হয় না। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে- لَنْ يَّسْتَنْكِفَ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ الْوَزِيْرُ وَلَا السُّلْطَانُ কিন্তু এর উল্টোটি বলা হয় না। সুতরাং উক্ত বিধানোর আলোকে আয়াতের মর্ম হবে- لَا يَسْتَنْكِفُ الْمَسِيْحُ وَلَا مَنْ فَوْقَهُ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না এমনকি তাঁর চেয়ে সম্মানীরাও না।

মু'তাযিলাদের দলিল খণ্ডন : আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, খ্রিস্টানদের হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হওয়ার বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহর কন্যা হওয়া সংক্রান্ত মুশরিকদের বিশ্বাসটিকেও খণ্ডন করা হয়েছে। বস্তুত এটি মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডনের স্থান নয়। কেননা পূর্ব থেকে আলোচনা চলে আসছে খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে। সূরা যুখরূফে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ; বুঝা গেল, উক্ত আয়াতে ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ হওয়ার আলোচনাটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অন্যথায় প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল; হযরত ঈসা (আ.)-এর লজ্জাবোধ না হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা। যেন এরূপ বিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যা বিশ্বাস কর তা সঠিক নয়। কেননা পুত্র বা কন্যা [সন্তান] পিতার গোলাম হওয়াতে লজ্জাবোধ করে। আর হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না। যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হতেন, তাহলে আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করতেন। আর একই অবস্থা ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে। সুতরাং বোঝা গেল, مَعْطُوْف হিসেবে ফেরেশতাদের আলোচনা পরে করার দ্বারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। -[জামালাইন- ২/১৩৮, ১৩৯]

মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের বিষয় : মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, তাঁর ইবাদত ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা উচ্চ পর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। হযরত মাসীহ (আ.) ও ঘনিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে এ নি'য়ামতের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা জেনে নাও। তাঁরা কি এটাকে হেয় জ্ঞান করবে, বা করতে পারে? হ্যাঁ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা লজ্জার বিষয়ই বটে, যেমন, খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা মেনে নিয়ে তাদের ও দেব-দেবীর উপাসনা করছে। বস্তুত এদের জন্য রয়েছে অনন্ত শাস্তি ও লাঞ্ছনা। -[তাফসীরে উসমানী-২৩৪]

قَوْلُهُ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا : মহান আল্লাহর বন্দেগীতে উন্নাসিকতার ভয়াবহ পরিণতি : যেসব ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগীতে উন্নাসিকতা দেখাবে ও অহংকার করবে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। একদিন সকলকেই মহান আল্লাহর নিকট সমবেত হতে হবে। তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে মহান আল্লাহর বন্দেগী করেছে, তারা তাদের কাজের পরিপূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে; বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া অপেক্ষাও বেশি বড় বড় নিয়ামত তাদের দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেছে ও অহংকার দেখিয়েছে তারা মহা শাস্তিতে নিঃপতিত হবে। তাদের কোনো শুভার্থী ও সাহায্যকারী থাকবে না। মহান আল্লাহর শরিক বানিয়ে যাদের উপাসনা করেছিল, যদ্দরুন এই শাস্তি, সেই তারাও কোনো কাজে আসবে না। কাজেই, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ভালো করে বুঝে নিক যে, এ উভয় অবস্থার কোনটি তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং হযরত মাসীহ (আ.)-এর যথার্থ মর্যাদা কি? -[তাফসীরে উসমানী : ২৩৫]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : মহানবী ﷺ ও পবিত্র কুরআন : পূর্বে মহান আল্লাহর ওহী বিশেষত কুরআন মাজীদের মর্যাদা ও তার সত্যতার বিবরণ এবং তার অনুসরণ ও আনুগত্যের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহ ও তাঁর ছেলে বলে বিশ্বাস করে, তার উল্লেখপূর্বক প্রমাণ করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত আকীদা। অবশেষে এবার আবার সেই আসল ও জরুরি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদের নিকট বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ অর্থাৎ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ, যাঁর মুজেযাসমূহ ও ক্ষুরধার বক্তব্য যুক্তি বিরোধীদের মতবাদকে ধূলিস্যাত করে দিয়েছে ও সমুজ্জ্বল জ্যোতি তথা কুরআন মাজীদ পৌঁছে গেছে, যা হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। এখন আর কোনো দ্বিধা ও চিন্তার অবকাশ নেই। যে কেউ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, এই পবিত্র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে মহান আল্লাহর রহমত ও কৃপায় প্রবেশ করবে এবং সরাসরি তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে, যে এর বিপরীত করবে তাঁর পথভ্রষ্টতা ও দুর্ভোগ যে কতখানি, তা এর দ্বারাই অনুমান করে নিবে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৩৬]

قَوْلُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ- অকাট্য দলিল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মুজেযাসমূহ, তাঁর বিস্ময়কর কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রিসালতের অকাট্য দলিল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার পরে আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আবশ্যক হয় না। অতএব তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতে نُوْرٌ [নূর] শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

যেমন সূরা মায়িদার আয়াত قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল আলো এসেছে, আর তা হচ্ছে এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ কুরআন। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

এই আয়াতে যাকে 'কিতাবুন-মুবীন' বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে তাকেই 'নূরুম মুবীন' বলা হয়েছে। আবার নূর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কিতাব অর্থ আল-কুরআনও হতে পারে। -[রূহুল মা'আনী] তবে তার অর্থ এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবীয় দৈহিকতা হতে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৫৭৩]

قَوْلُهُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ : কালালার বিধান : সূরার শুরুতে মিরাসের আয়াতে কালালার মিরাস বর্ণিত হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এ আয়াত নাজিল হয়। 'কালালা' অর্থ- দুর্বল, অসহায়। এ স্থলে বোঝানো হয়েছে, যার পিতা ও সন্তান-সন্ততি নেই, যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে। পিতা ও আওলাদই আসল ওয়ারিশ। এ ওয়ারিশ যার নেই তার আপন ভাই-বোনকে সন্তান-সন্ততির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আপন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এ মর্যাদা পাবে। এক বোন হলে অর্ধেক, দুই বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ এবং

ভাই-বোন উভয় থাকলে ভাই দুই ভাগ, বোন এক ভাগ পাবে। যদি শুধু ভাই থাকে, বোন না থাকে, তবে সে বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাৎ তার কোনো অংশ নির্ধারিত নেই কারণ সে আসাবা যেমন আয়াতে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বাকি থাকল বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। সূরার শুরুতে তাদের মিরাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের অংশ নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ কোনো পুরুষ যদি এক বোন রেখে মারা যায়, পিতা ও সন্তান কিছুই না থাকে তবে সে বোন সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৩৭, ২৩৮]

যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কোনো মহিলা তার আপন বা বৈমাত্রেয় ভাই রেখো মারা গেল, তখন সে ভাই-ই বোনের সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী, যেহেতু সে 'আসাবা'। তার কোনো ছেলে সন্তান থাকলে কিছুই পাবে না। কন্যা থাকলে তার মিরাসের পর যা অবশিষ্ট থাকবে ভাই তার অধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তি বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন রেখে যায়, তবে তার জন্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত যেমন সূরার শুরুতে গেছে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৩৯]

বোনের সংখ্যা দুয়ের বেশি হলেও তারা দুই তৃতীয়াংশই পাবে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৪০]

কতক পুরুষ ও কতক নারী অর্থাৎ ভাইবোন উভয়ই যদি রেখে যায়, তবে ভাই দুই ভাগ ও বোন এক ভাগ পাবে, যেমন সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।, -[তাফসীরে উসমানী : ২৪১]

قَوْلُهُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا الخ : আল্লাহর নির্দেশ না মানার পরিণতি পথভ্রষ্টতা : মহান আল্লাহ পরম দয়ালু ও কৃপাময়। কেবল বান্দার হেদায়েতের জন্য এবং তাকে পথভ্রষ্টতা হতে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশদভাবে সঠিক বিধান বর্ণনা করেন। যেমন এ স্থলে কালালার মীরাস বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ নেই। তিনি তো অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। কাজেই, যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহের মূল্যায়ন করবেন না; বরং তাঁর আদেশ পাশ কাটিয়ে চলবে, তার দুর্ভাগ্যের কী কোনো পরীসীমা আছে? বোঝা গেল, যাবতীয় বিধান মেনে চলা বান্দার জন্য অপরিহার্য। যদি কোনো মামূলী ও খুঁটিনাটি বিষয়েও মহান আল্লাহর আদেশ থেকে সরে দাঁড়ায় তবে পথভ্রষ্টতা অনিবার্য। এখন যারা তাঁর পবিত্র সত্তা ও তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম অমান্য করে এবং নিজের খেয়াল খুশি ও বুদ্ধি-বিবেচনাকেই গুরু মেনে চলে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও হীনতা যে কোন পর্যায়ের তা এর দ্বারাই অনুমান করে নিন। -[তাফসীরে উসমানী : ২৪২]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দার হেদায়েতকে পছন্দ করেন। এবার তিনি বলেছেন তিনি সবকিছু সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। বোঝানো হলো, দীনি বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন জিজ্ঞেস করে নাও। এতদ্বারা বোঝা যায় কালালা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম যে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রচ্ছন্নভাবে তার প্রশংসা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আরো বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন, তোমরা জান না। তোমরা তো এতটুকু বলতে পার না যে, কালালা ও অন্যান্য অবস্থায় যার যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ কী? মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কী করে এর উপযুক্ত হতে পারে যে, তার উপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস দেখাবে? যারা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের স্তরভেদ নির্ণয় করার মতো যোগ্যতা রাখে না, তারা মহান আল্লাহর এক অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয় সত্তা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু বলে না দিলে কি-ই বা বুঝতে পারে? -[তাফসীরে উসমানী : ২৪৩]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ স্থলে কালালার বিধান ও তার শানে নুযূল বর্ণনা করার দ্বারা কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায়–

ক. পূর্বে যেন وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আয়াতটির বক্তব্য এবং তার পরে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে, কিতাবীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল, তদ্রূপ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ.... -এর পর ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে ওহী হতে পশ্চাদপসরণকারীদের পথভ্রষ্টতা ও মন্দ স্বভাব এবং ওহীর অনুসরণকারীগণের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়।

খ. এরই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা এই, আহলে কিতাব তো এই জঘন্যতম কাণ্ড করে বসে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পূতপবিত্র সত্তার জন্য সন্তান ও শরিক সাব্যস্ত করার মতো গুরুতর বিষয়কে নিজেদের ঈমান বানিয়েছে এবং মহান আল্লাহর ওহীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেছে; পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ -এর অবস্থা এই যে, ঈমান ও ইবাদতের মৌলিক

বিষয়গুলো তো বটেই এমনকি মিরাস, বিবাহ ইত্যাদি খুঁটিনাটি ও শাখাগত বিষয়েও তারা ওহীর সন্ধান ও প্রতীক্ষায় থাকেন। সর্ববিষয়ে তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক ও রুচি-মর্জিকে সিদ্ধান্তদাতা মনে করে না। একবারে যদি ভালো করে বুঝে না আসে তবে পুনর্বার এসে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয় এবং মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে নেয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক বুজুর্গের নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য ببیں تفاوت راہ کجاست تا بکجا অর্থাৎ লক্ষ্য করুন, পথের পার্থক্য কোথা হতে কোথা পর্যন্ত!

মহানবী ﷺ -ও ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ হতে কোনো আদেশ দিতেন না। কোনো বিষয়ে ওহীর আদেশ সামনে না থাকলে ওহী নাজিলের অপেক্ষা করতেন। ওহী আসলে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন।

এতদ্বারা পরিষ্কার জানা গেল যে, এক পবিত্র সত্তা ছাড়া সিদ্ধান্তদাতা আর কেউ নয়। বহু আয়াতেই إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'আদেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই' প্রভৃতি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন বাক্য রয়েছে। বাকি যা কিছু সবই মাধ্যম। তাদের দ্বারা অন্যের কাছে মহান আল্লাহর আদেশ পৌছান হয়। হ্যাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, কোন মাধ্যম নিকটতম, কোনটা দূরের। যেমন রাষ্ট্রীয় আইন প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও পদস্থ আমলা-কর্মকর্তা হতে নিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই মাধ্যম বিশেষ, কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে।

কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর ওহীকে ছেড়ে কোনো গোমরাহ যদি অন্য কারো কথা শোনে ও মানে তবে তার চেয়ে ঘোর পথভ্রষ্টতা আর কী হতে পারে?

তাছাড়া এ আলোচনার মাঝে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সম্পূর্ণ কিতাব একইবার অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ার মাঝে, যেমন কিতাবীরা দাবি করছে, সেই সৌন্দর্য নেই, যা প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী বারবার নাজিল হওয়ার মাঝে রয়েছে। কেননা এ অবস্থায় প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন হিসেবে জিজ্ঞেস করার সুযোগ থাকে এবং ওহী মারফত সে তার জবাব পেতে পারে। যেমন আলোচ্য স্থানসহ কুরআন মাজীদের আরো বহুস্থানে তাই হয়েছে। এ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হওয়া ছাড়াও এর সাথে এমন একটি গৌরবজনক বিষয় জড়িত রয়েছে, যা আর কোনো উম্মতের ভাগ্যে ঘটেনি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্মরণীয় হওয়ার সম্মান ও তাঁর সম্বোধন লাভের মহা মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। যেমন সাহাবীর শুভার্থে বা যার প্রশ্নের জবাবে কোনো আয়াত নাজিল হয়েছে সে সাহাবীর জন্য সেটা একটা পরম মর্যাদার বিষয় বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে যাঁর সমর্থনে ওহী নাজিল হয়েছে তাঁর মাহাত্ম্য ও সুনাম কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। কাজেই, কালালা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ করে সাধারণভাবে এরূপ সর্বপ্রকার প্রশ্নোত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের লক্ষ্যেই প্রশ্নের কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশ্ন কালালা সম্পর্কে এর দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদে আর কোথাও নেই, সেই সাথে উত্তরকেও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। [মহান আল্লাহ ভালো জানেন, তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শক]।

মোটকথা, ওহী যাবতীয় বিধানের উৎসমূল। এই অনুসরণের উপর হেদায়েত নির্ভরশীল। কুফর ও বিভ্রান্তি এরই বিরোধিতা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই বিরুদ্ধাচরণই ছিল মহানবী ﷺ -এর সময়ে ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, ও অপরাপর সমস্ত পথভ্রষ্টদলগুলোর গোমরাহীর মূল কারণ। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের বহু জায়গায় ওহীর অনুসরণ করার সুফল এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করার কুফল তুলে ধরেছেন। বিশেষত এ স্থলে তো পুরো দু'টো রুকু' এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই অবতীর্ণ করেছেন; আর তাও বিশদভাবে, উপমা -ইঙ্গিতের সাথে। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম বুখারী (র.) তাঁর হাদীসগ্রন্থে بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ [রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছিল] শিরোনামটির ভেতর إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ আয়াতটিকেও শিরোনামের অংশরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এই রুকুদ্বয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। যেন অর্থ দাঁড়াল– এ আয়াত হতে ওহী বিষয়ক আয়াতসমূহের শেষ পর্যন্ত [সবগুলো আয়াত আমার এ শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত]। আল্লাহ ভালো জানেন। –[তাফসীরে উসমানী : ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০]

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা মায়িদা, মদিনায় অবতীর্ণ

مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً اَوْ اِثْنَتَانِ اَوْ ثَلٰثٌ

আয়াত : ১২০/১২২/১২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط الْعُهُوْدِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَالنَّاسِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اَكْلًا بَعْدَ الذَّبْحِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ تَحْرِيْمُهُ فِيْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْاٰيَةُ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَّصِلًا وَالتَّحْرِيْمُ لِمَا عُرِضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اَيْ مُحْرِمُوْنَ وَنُصِبَ غَيْرَ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيْرِ لَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ مِنَ التَّحْلِيْلِ وَغَيْرِهِ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ :

১. হে বিশ্বাসী তোমরা অঙ্গীকার অর্থাৎ তোমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে বা লোকদের মধ্যে যে দৃঢ়বদ্ধ অঙ্গীকার করা হয়েছে তা পূরণ কর। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ এ আয়াতটিতে যেসব জন্তুর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত চতুষ্পদ আনআম অর্থাৎ উট, গরু, মেষ-ছাগল বিধিমতো জবাই করে আহার করা اِلَّا مَا يُتْلٰى এটা দ্বারা যদি حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -এ আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত হয় তবে এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যদি এর অর্থ এই করা হয় যে সাধারণ মৃত্যু ইত্যাদির কারণে যা অবৈধ তা ব্যতীত হবে اِسْتِثْنَاء -টি مُتَّصِلٌ বলেও বিবেচ্য হতে পারে। তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো তবে ইহরামরত অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না। حُرُمٌ : এটা مُحْرِمٌ বা ইহরামকারী [اِسْمِ فَاعِلٍ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غَيْرَ এটা لَكُمْ স্থিত ضَمِيْر বা সর্বনামের حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْب -রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা হালাল করা বা অন্য কিছু করার আদেশ দান করেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হতে পারে না।

٢. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ جَمْعُ شَعِيْرَةٍ اَيْ مَعَالِمَ دِيْنِهِ بِالصَّيْدِ فِي الْاِحْرَامِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ بِالْقِتَالِ فِيْهِ وَلَا الْهَدْيَ مَا اُهْدِيَ اِلَى الْحَرَمِ مِنَ النَّعَمِ بِالتَّعَرُّضِ لَهُ ـ

২. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা করো না شَعَائِرَ : এটা شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রতীক। অর্থাৎ ইহরামরত অবস্থায় শিকার করত তাঁর ধর্মীয় প্রতীকসমূহের পবিত্র মাসের অর্থাৎ উক্ত সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ করত, হাদীসমূহের অর্থাৎ যেসব পশু কুরবানীর উদ্দেশ্যে কাবায় প্রেরিত হয় সেসব পশুর কোনো ক্ষতি সাধন করত অবমাননা করো না।

وَلَا الْقَلَآئِدَ جَمْعُ قَلَادَةٍ وَهِيَ مَا كَانَ يُتَقَلَّدُ بِهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لِيَأْمَنَ اَيْ فَلَا تَتَعَرَّضُوْا لَهَا وَلَا صْحَابِهَا وَلَآ تَحِلُّوْا اٰمِّيْنَ قَاصِدِيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ بِاَنْ تُقَاتِلُوْهُمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا رِزْقًا مِّنْ رَّبِّهِمْ بِالتِّجَارَةِ وَرِضْوَانًا ط مِنْهُ بِقَصْدِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ بَرَاءَةٍ وَاِذَا حَلَلْتُمْ مِنَ الْاِحْرَامِ فَاصْطَادُوْا ط اَمْرُ اِبَاحَةٍ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شَنَاٰنُ بِفَتْحِ النُّوْنِ وَسُكُوْنِهَا بُغْضُ قَوْمٍ لِاَجْلِ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا م عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهٖ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ بِفِعْلِ مَا اُمِرْتُمْ بِهٖ وَالتَّقْوٰى ص بِتَرْكِ مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ وَلَا تَعَاوَنُوْا فِيْهِ حُذِفَ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِي الْاَصْلِ عَلَى الْاِثْمِ الْمَعَاصِيْ وَالْعُدْوَانِ ص التَّعَدِّيْ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط خَافُوْا عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ.

গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর الْقَلَائِدَ : এটা قلادة -এর বহুবচন। অর্থ– হার। অর্থাৎ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যেসব কুরবানির পশুর গলায় হরম শরীফের লতা গুল্মাদির দ্বারা হার পরানো হয়েছে, সেসব পশুর বা তাদের মালিকদের কোনোরূপ ক্ষতি করো না। এবং তাদের প্রভুর অনুগ্রহ অর্থাৎ বৈধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা অনুসন্ধান এবং নিজেদের ধারণানুসারে প্রভুর সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ বায়তুল হারাম অভিমুখীদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে তাদের অবমাননা করবে না। অর্থাৎ তাদের হত্যা করবে না। সূরা বারাআতে উল্লিখিত আয়াতের মর্মানুসারে এ বিধানটি মানসুখ বা রহিত বলে গণ্য। যখন তোমরা ইহরাম হতে হালাল হবে তখন শিকার করতে পারে। فَاصْطَادُوْا : اِبَاحَةٌ বা অনুমতি প্রদান অর্থে এখানে নির্দেশাত্মক বাক্যটির ব্যবহার হয়েছে। তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতে বাধা দেওয়ায় কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে, তাতে লিপ্ত না করে। شَنَاٰنُ : এটার [প্রথম] নূনটি ফাতাহ ও সাকিন উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অর্থ- বিদ্বেষ। তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে সৎকর্মে অর্থাৎ যা করতে তোমরা নির্দেশিত হয়েছ তা করাতে ও আত্মসংযমে অর্থাৎ যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করাতে এবং একে অন্যের সাহায্য করবে না لَا تَعَاوَنُوْا : এটাতে মূলত দু'টি تَاء -এর একটি লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। পাপে অবাধ্যাচরণে ও সীমা অতিক্রমণে অর্থাৎ আল্লাহর হুদূদ ও সীমালঙ্ঘন করায় এবং আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর। নিশ্চয় আল্লাহ যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمَائِدَةِ : এর বহুবচন مَوَائِدُ অর্থ– দস্তরখান।

قَوْلُهُ بِالْعُقُوْدِ : একবচন عَقْدٌ অর্থ– সুদৃঢ় চুক্তি। এখানে عَقْدٌ মাসদার হয়ে اِسْم হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بَهِيْمَةُ : এর বহুবচন بَهَائِمُ অর্থ– গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। بَهِيْمَةٌ শব্দটি اِبْهَامٌ থেকে নির্গত। যেহেতু চতুষ্পদ জন্তুর আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে থাকে সেহেতু তাকে بَهَائِمُ বলা হয়।

قَوْلُهُ اَنْعَامِ : এর একবচন نَعَمٌ অর্থ– ভেড়া, বকরি, গাভী, মহিষ, উট। اَنْعَامٌ -এর মাঝে উট শামিল হওয়া আবশ্যক। উটকে বাদ দিয়ে সমষ্টিগতভাবে অন্য প্রাণীকে اَنْعَامٌ বলা যাবে না। যেহেতু আরবদের নিকট উট অনেক বড় নিয়ামত তাই তাকে نَعَمٌ বলা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ أَكْلًا : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন. حِلَّتْ এবং حُرْمَتْ তথা বৈধ ও অবৈধ তো ক্রিয়ার গুণ। কিন্তু এখানে এতদুভয়কে জাত তথা জন্তুর গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে যা শুদ্ধ নয়।

উত্তর. এখানে أَكْلًا উহ্য ধরে এ প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ : اِسْتِثْنَاء-টি مُنْقَطِعٌ এজন্য যে مُسْتَثْنٰى مِنْه তথা بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ এবং مُسْتَثْنٰى তথা مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ এক জিনসভুক্ত নয়। مُسْتَثْنٰى مِنْه হলো ذَوَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর مُسْتَثْنٰى হলো اَلْفَاظْ-এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلًا : مُضَاف মুকাদ্দর ধরার সুরতে اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যটি مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে। তাকদীরী ইবারত এভাবে হবে- اَىْ اِلَّا مُحَرَّمًا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ আর مُحَرَّمْ দ্বারা اَلْاَنْعَامِ থেকে مَيْتَةٌ বা মৃত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لِمَا عُرِضَ مِنَ الْمَوْتِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উল্লিখিত জন্তুর حُرْمَتْ বা অবৈধ হওয়াটা তার সত্তাগত কারণে নয়, বরং মৃত্যুর কারণে طَارِئْ বা আপতিত।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ : এ জুমলাটি غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ-এর ضَمِيْر مُسْتَتِرْ থেকে حَالْ হয়েছে। যা لَكُمْ-এর যমীরের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ হলো ذُوالْحَالِ আর وَاَنْتُمْ حُرُمٌ হলো حَالْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল ও আলোচ্য বিষয় : এটি সূরা মায়িদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়িদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিকের সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.)-এর থেকে বর্ণিত আছে, সূরা মায়িদা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীয় পিঠে ছওয়ার ছিলেন। সাধারণত ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও চাপ অনুভূত হতো তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল এমন কি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিচে নেমে আসেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায়, এটি ছিল বিদায় হজের সফর। বিদায় হজ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ থেকে ফিরে আসার পর হুজুর ﷺ প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে মুহীত' গ্রন্থে বলেন, সূরা মায়িদার কিয়দাংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দাংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দাংশ বিদায় হজের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ, হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে কায়েস বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে-

اَلْمَائِدَةُ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ تَنْزِيْلًا فَاَحِلُّوْا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوْا حَرَامَهَا .

অর্থাৎ "সূরা মায়িদা কুরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হারাম মনে করো।"

তাফসীরে ইবনে কাসীর গ্রন্থে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একবার হজের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, জুবায়ের! তুমি কি সূরা মায়িদা পাঠ কর? তিনি আরজ করলেন, জী হ্যাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এটি কুরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো। সূরা মায়িদাতেও সূরা নিসার মতো মাসআলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান অভিন্ন। কেননা এ দুটি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ যথা তাওহীদ, রিসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়িদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা এ দু'টি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তরিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর হক, এতিমের হক, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন– يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" এ কারণেই সূরা মায়িদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি, বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন সে ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। –[মা'আরিফুল কুরআন ৩/১-২

অঙ্গীকার : اَلْعُقُوْدُ অর্থ– অঙ্গীকার। عَقْد শব্দটি খুবই প্রচলিত। এ শব্দটি শরিয়তের সব ধরনের অঙ্গীকারকে শামিল করে; চাই তার সম্পর্ক স্রষ্টার সঙ্গেই হোক বা সৃষ্টির সাথে। "ঐ সমস্ত অঙ্গীকার, যা তোমাদের মাঝে আল্লাহর সঙ্গে অথবা মানুষের মাঝে হয়ে থাকে।" –[ইবনে আব্বাস]

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণত অঙ্গীকার ঐ সব ব্যাপারে, যা শরিয়তের অঙ্গীকার। যথা রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, পাস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি মু'আমালাত ও আখলাকিয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত সবই এর মধ্যে এসে গেছে। হাসান বলেন, "এ হলো দীন সম্পর্কিত অঙ্গীকার, যেমন মানুষ অঙ্গীকার করে বেচা-কেনা লেনদেন, বিয়ে-শাদী, তালাক, পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-কৃষ্টি, মালিকানা-ইখতিয়ার প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে, যা শরিয়তের বহির্ভূত নয় একইভাবে, যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের অঙ্গীকার করে তাও এর মধ্যে শামিল।" –[কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী : ৪৬৫ টীকা ২]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ : অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এতে প্রথম يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবি। এরপর বলা হয়েছে أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ ; عُقُوْدُ শব্দটির عَقْد শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ– বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عَقْد বলা হয়। এভাবে عُقُوْد -এর অর্থ হয় عُهُوْد অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) উপরিউক্ত অর্থে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 'ইজমা' [ঐকমত্য] বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা অথবা না করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عَقْد عَهْد ও مُعَاهَدَة বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরি ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে, আয়াতে চুক্তি বলে কোন ধরনের চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তাফসীরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাজিলকৃত বিধি-বিধানে হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

তাফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, এখানে ঐসব চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পর একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন, এখানে শপথ ও অঙ্গীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহিলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ, রবী, কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদও এ কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরিউক্ত সব চুক্তি অঙ্গীকারই عُقُوْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন, যত প্রকার চুক্তি আছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন, এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। যথা–

১. পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণত ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার।

২. নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন– নিজ জিম্মায় কোনো বস্তুর মানত মানা অথবা কসমের মাধ্যমে কোনো কাজ নিজের উপর জরুরি করে নেওয়া।

৩. মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সেসব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারে আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলাও প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরিয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। -[মা'আরিফুল কুরআন ৩/৩-৪]

قَوْلُهُ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ : অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে উপরিউক্ত ব্যাপক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ যেসব জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بَهِيْمَةٌ [নির্বোধ প্রাণী] বলা হয়। কেননা মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مُبْهَمٌ তথা দুর্বোধ্য থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন, সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بَهِيْمَةٌ বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোনো প্রাণী মূলত বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোনো বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে স্তরের পার্থক্য অবশ্যই আছে। এগুলোর মধ্যে ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের মধ্যে আছে। এ কারণেই মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট হয়েছে, কিন্তু জন্তুরা আদিষ্ট হয়নি। অবশ্য নিজ নিজ প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জন্তু, এমন কি বৃক্ষ এবং প্রস্তুরকেও বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার গুণগান করে। বলা হয়েছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ ; বুদ্ধি না থাকলে এগুলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কিভাবে লাভ করতো এবং কেমন করেই বা তাঁর পবিত্রতা জপ করতো?

ইমাম শা'রানীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, বুদ্ধিহীনতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জীব-জন্তুর কাছে অস্পষ্ট থাকে বলেই এগুলোকে بَهِيْمَةٌ বলা হয় না; বরং এর কারণ এই যে, তাদের ভাষা মানুষ বুঝে না। তাদের কথা মানুষের কাছে অস্পষ্ট। মোটকথা, প্রত্যেক প্রাণীকেই بَهِيْمَةٌ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ- পালিত জন্তু। যেমন- উট, গরু, মহিলা, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে اَنْعَامٌ বলা হয়। بَهِيْمَةٌ শব্দের ব্যাপকতাকে اَنْعَامٌ শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, আট প্রকার গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عُقُوْدٌ শব্দ প্রয়োগ করে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, চাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরিয়তের নিয়ম অনুয়ায়ী তোমরা এগুলোকে জবাই করে খেতে পার।

তোমরা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশটি যথাযথ সীমার ভেতরে রেখে মেনে চল। অগ্নি-উপাসক ও মূর্তিপূজারীদের মতো সর্বাবস্থায় এসব জন্তুকে জবাই করা হারাম মনে করো না। এতে খোদায়ী প্রজ্ঞায় আপত্তি এবং খোদায়ী নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। অপরদিকে অন্যান্য মাংসভোজী সম্প্রদায়ের মতো বল্গাহীনভাবে যে কোনো জন্তুকে আহার্যে পরিণত করো না; বরং আল্লাহপ্রদত্ত আইন অনুযায়ী হালাল জন্তুসমূহের গোশত ভক্ষণ কর এবং হারাম জন্তু থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক জন্তুর স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে তার সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তুকেই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, যা খেলে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও আত্মিক চরিত্রের উপর কোনোরূপ মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। তিনি নোংরা ও অপবিত্র জন্তুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ এগুলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক অপকারী অথবা এতে মানব চরিত্র বিনষ্ট হয়। এ কারণেই ব্যাপক নির্দেশ থেকে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে- اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ সেসব জন্তু ছাড়া, যেগুলোর অবৈধতা কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে- غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ চারপেয়ে জন্তু ও বনের শিকার তোমাদের জন্য হালাল। কিন্তু তোমরা যখন হজ অথবা ওমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাক, তখন শিকার করা অপরাধ ও গুনাহ। -[মা'আরিফুল কুরআন -৩/৫-৬]

قَوْلُهُ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : অর্থাৎ সেসব জন্তু ছাড়া, যেগুলোর অবৈধতা কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন- মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি।

قَوْلُهُ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ : ইহরাম অবস্থায় শিকার : অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুও শিকার করা ইহরাম অবস্থায় হালাল নয়। اَلصَّيْدُ অর্থাৎ শিকার শব্দটির অর্থ হলো, ঐ সমস্ত জন্তু শিকার করা, যাদের গোশত খাওয়া হালাল। "এ স্থানে শিকার শব্দ দ্বারা ঐ প্রাণী শিকার করার অর্থ নেওয়া হয়েছে, যাদের গোশত খাওয়া বৈধ" [রাগিব]। এছাড়া সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক প্রাণীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর এদের মেরে ফেলাতে তা 'শিকার' পর্যায়ভুক্ত হবে না। صَيْد শব্দে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, শিকার ঐ সব জন্তুকে ধরা, যারা নিরীহ চতুষ্পদ বিশিষ্ট এবং যাদের ধরতে কোনোরূপ হিলা-বাহানার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গৃহপালিত জন্তু- ভেড়া, বকরি, গাভী, উট ইত্যাদি যা শিকার করা হয় না; বরং প্রত্যেহ তাদেরকে ধরে জবাই করে খাওয়া হয় ; এদের জবাই করাতে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ যা 'শিকার' করা হবে, তা ইহরামমুক্ত অবস্থায়ও শিকার করা হালাল, আর যা 'শিকার' পর্যায়ের নয় তা ইহরামমুক্ত বা ইহরামযুক্ত উভয় অবস্থাতেই মারা বৈধ। -[কুরতুবী]

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে না, হরম শরীফের সীমানার মধ্যে থাকবে না। চাই ইহরাম থাকুক বা না থাকুক। নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো শিকারযোগ্য জন্তুর হরম শরীফের সীমানার মধ্যে অবস্থান করা।

-[তাফসীরে মাজেদী : পৃ. ৪৬৬, টীকা ৪]

ইহরাম অবস্থায় কেবল স্থলের প্রাণী শিকার করা নিষেধ, জলজ প্রাণী শিকারের অনুমতি আছে। ইহরাম অবস্থায় সম্মান রক্ষার যখন এতটা গুরুত্ব যে, এ অবস্থায় শিকার করা নিষেধ, তখন হারাম শরীফের রক্ষার গুরুত্ব যে আরো কত বেশি হবে, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই ইহরাম অবস্থা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায় হারাম শরীফে প্রাণী শিকার করা হারাম। لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ দ্বারা এটাই বোঝা যায়। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৪৮৪, টীকা-৪]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ : হুকুম দানের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ : যেই মহান আল্লাহ সমগ্র মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আপন প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাদের মাঝে স্তর বিন্যাস করছেন, প্রত্যেক স্তরের মাঝে তার যোগ্যতা অনুসারে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও শক্তি নিহিত রেখেছেন এবং জীবন মৃত্যুর বিচিত্র ধরণ-ধারণা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, নিশ্চয় সেই মহান আল্লাহরই এ ইখতিয়ার আছে যে, তিনি নিজ অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নিরঙ্কুশ শক্তি অনুযায়ী সৃষ্টি নিচয়ের যাকে যার জন্য এবং যে অবস্থায় ইচ্ছা হালাল বা হারাম করবেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারো নেই, কিন্তু সকলেরই কাজের কৈফিয়ত চাওয়ার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৫]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। তা মেনে চলতে কারো টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এতে সম্ভবত এ রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে কিছু সংখ্যক জন্তু জবাই করে খাওয়ার অনুমতি প্রদান অন্যায় নয়। যে প্রভু এসব প্রাণী সৃজন করেছেন তিনিই পূর্ণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে এ আইন রচনা করেছেন। তিনিই কতিপয় নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের খাদ্য করেছেন। মাটি বৃক্ষ ও তরুলতার খাদ্য, বৃক্ষ জীব-জন্তুর খাদ্য এবং জীব-জন্তু মানুষের আহার্য মানুষের চাইতে সেরা জীব পৃথিবীতে নেই। কাজেই মানুষ কারো খাদ্য হতে পারে না।

-[মা'আরিফুল কুরআন খ.৩, পৃ. ৬]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ : যোগসূত্র : সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হালাল ও হারাম মেনে চলা সম্পর্কিত। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে এ অঙ্গীকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দফা বর্ণিত হচ্ছে। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অসম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। ২. স্বজন ও ভিন্নজন, শত্রু ও মিত্র সবার সাথে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা এবং অন্যায়ের প্রত্যুত্তর করার নিষেধাজ্ঞা। -[মা'আরিফুল কুরআন খ.৩, পৃ. ৬]

শানে নুযুল : কয়েকটি ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের হেতু। প্রথমে ঘটনাগুলো জেনে নেওয়া দরকার, যাতে আয়াতের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হোদায়বিয়ার ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালন করতে মনস্থ করেন। সেমতে তিনি সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মক্কাবাসীদের সংবাদ দেন যে, আমরা কোনোরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু ওমরা পালন করার জন্য আগমন করেছি। আমাদের মক্কা প্রবেশের অনুমতি দাও। মক্কার মুশরিকরা অনুমতি প্রদানে সম্মত হলো না এবং কঠোর ও কড়া শর্তাবলির অধীনে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করলো যে, আপাতত সবাই ইহরাম খুলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। আগামী বছর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আগমন করবে এবং মাত্র তিনদিন অবস্থান করে ওমরা পালন করে মক্কা ত্যাগ করবে। এ ছাড়া আরো এমন কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, যা মেনে নেওয়া বাহ্যত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও আত্মসম্মানের পরিপন্থি ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে সবাই মদীনায় ফিরে গেলন। অতঃপর সপ্তম হিজরির যিলকদ মাসে পুনরায় চুক্তির শর্তাবলির অধীনে এ ওমরা করা হয়। মোটকথা, হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং উপরিউক্ত অবমাননাকর শর্তাবলি সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে মক্কার মুশরিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কার মুশরিক হাতীম ইবনে হিন্দ পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় আগমন করে। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পর সে সঙ্গী লোকজন ও জিনিসপত্র মদীনার বাইরে রেখে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কপটতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করে। তার উদ্দেশ্যে ছিল যাতে মুসলমানরা তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করে। কিন্তু তার আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের বলে দিয়েছিলেন যে, আজ আমার কাছে এক ব্যক্তি আসবে। সে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে। হাতীম ফিরে যাবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি কুফর নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ফিরে গেছে। সে দরবার থেকে বের হয়ে হয়ে সোজা মদীনার বাইরে পৌঁছল এবং মদীনাবাসীদের বিচরণরত উট-ছাগল হাঁকিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সাহাবায়ে কেরাম এ সংবাদ অবগত হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে চলে যায়। এরপর হিজরতের সপ্তম বছরে যখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ওমরার কাযা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে 'লাব্বাইকা' ধ্বনি শুনে দেখলেন, সেই হাতীম ইবনে হিন্দ মদীনাবাসীদের কাছ থেকে চোরাই করা জন্তু জানোয়ার নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছে। তখন সাহাবায়ে কেরামের মনে ইচ্ছা জাগে আক্রমণ করে তার কাছ থেকে জন্তু-জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এর ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ করে দেওয়ার।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয় এবং প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আপন কাজ করতে থাকে। এমন কি, জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হজ ও ওমরা পালন করতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরামের মনে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনা জাগরিত হয়। তাঁরা ভাবতে থাকেন, এরা সম্পূর্ণ বৈধ ও সত্য পন্থায় ওমরা পালন করতে আমাদের বাধাদান করেছিল, আমরা তাদের অবৈধ ও ভ্রান্ত পন্থায় ওমরা ও হজ্জ পালনের সুযোগ দেব কেন? আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের জানোয়ার কেড়ে নেব এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) ইকরিমা ও সুদ্দীর বর্ণনার মাধ্যমে এসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন তোমাদের নিজ দায়িত্ব। কোনো শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে এ দায়িত্বে ত্রুটি করার অনুমতি নেই। নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহও বৈধ নয়। কুরবানির জন্তুকে হেরেমে পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়াও জায়েজ নয়। সেসব মুশরিক ইহরাম বেঁধে নিজ ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, যদিও কুফরের কারণে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, তথাপি আল্লাহর নিদর্শনাবলির সংরক্ষণ ও এগুলোর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের বাধা দান করা যাবে না। এছাড়া, যারা ওমরা করতে তোমাদের বাধা দিয়েছিল, তাদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে তাদের মক্কা প্রবেশ অথবা হজ্জব্রত পালনে বাধাদান করা বৈধ হবে না। কেননা, এভাবে তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পক্ষ থেকেও অন্যায় হয়ে যাবে। আর এটা ইসলামে বৈধ নয়।

–[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৭,৮,৯]

قَوْلُهُ لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ : "হে মুমিনগণ! অবমাননা করো না আল্লাহ তা'আলার [ধর্মীয়] নিদর্শনাবলির" [অর্থাৎ যেসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দেশ করেছেন, সেসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তৎপ্রতি বে-আদবী করো না। উদাহরণত হেরেম ও ইহরামের আদব এই যে, এতে শিকার করতে পারবে না। অতএব, শিকার করা বে-আদবী ও হারাম হবে]। এবং সম্মানিত মাসসমূহের [অবমানা করো না। অর্থাৎ এসব মাসে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না।] এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুর [অবমাননা করো না। অর্থাৎ এগুলোকে ছিনিয়ে নিও না] এবং ঐসব জন্তুর [অবমাননা করো না] যেগুলোর [গলায় এরূপ চিহ্নিতকরণের জন্য] কণ্ঠাভরণ রয়েছে [যে, এগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত; হেরেম শরীফে জবাই করা হবে] এবং ঐসব লোকের [অবমাননা করো না] যারা বায়তুল হারাম [অর্থাৎ কা'বাগৃহ] অভিমুখে যাচ্ছে এবং স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। [অর্থাৎ এসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে কাফেরদের সাথেও ফাসাদে জড়িত হয়ো না] এবং [পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে ইহরামের আদব রক্ষার্থে শিকার হারাম করা হয়েছিল, তা শুধু ইহরাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নতুবা] তোমরা যখন ইহরাম থেকে বের হয়ে আস, তখন [অনুমতি আছে} শিকার কর [তবে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করো না] ; এবং [পূর্বে যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তাতে] যারা [হোদায়বিয়ার বছরে] পবিত্র মসজিদ থেকে [অর্থাৎ পবিত্র মসজিদে যেতে] তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, [অর্থাৎ মক্কার কাফের সম্প্রদায়] সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে [শরিয়তের] সীমালঙ্ঘনে প্রবৃত্ত না করে [অর্থাৎ তোমরা উল্লিখিত নির্দেশসমূহের যেন বিরুদ্ধাচরণ না করে বস] এবং সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর [উদাহরণত উল্লিখিত নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে অপরকেও উৎসাহিত কর] এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না। [উদাহরণত কেউ উল্লিখিত নির্দেশসমূহের বিরোধিতা করলে তোমরা তার সাহায্য করো না]। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর [এতে বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়ে যায়]। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা [নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে কঠোর শাস্তিদাতা।

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ : অর্থাৎ হে মুমিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনাবলির অবমাননা করো না। এখানে شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ– চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شَعَائِرِ اِسْلَامْ তথা ইসলামের 'নিদর্শনাবলি' বলা হয়। যেমন নামাজ, আজান, হজ সুন্নতি দাড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর নিদর্শনাবলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও আতা (র.) থেকে বর্ণিত বাহরে মুহীত ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস (র.) এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই, আল্লাহর নিদর্শনাবলির অর্থ হলো– সব শরিয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরজ ও এগুলোর সীমা। আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর নিদর্শনালির অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলির এক অবমাননা এই যে, মূলতই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়ত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়ত এই যে, নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে– وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহ-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১০]

قَوْلُهُ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ : বছরের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত : সম্মানিত মাস চারটি। যেমন ইরশাদ হয়েছে– مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ [৯:৩৬]। যুলকা'দা, যুলহিজ্জা; মুহাররম ও রজব। এর সম্মান রক্ষার অর্থ এ সময় অন্যান্য মাস অপেক্ষা বেশি সৎকাজ ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং অন্যায় অপকার্য হতে বিরত থাকার চেষ্টা করা। বিশেষত হাজীদেরকে কষ্ট ক্লেশ দিয়ে হজ আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। এসব কাজ বছরের সব মাসেই জরুরি। তবে এ মাসগুলোতে এর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাকি এ সময়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান করা যাবে কিনা? এ সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম এবং ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে তো সর্বাবাদীসম্মত রায় হলো এ মাসগুলোতে তা নিষিদ্ধ নয়। সূরা তাওবায় ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আসবে। –[তাফসীরে উসমানী, টীকা-৭]

قَوْلُهُ اَلْهَدْىَ : অর্থাৎ কুরবানির পশু। কিন্তু এ শব্দটি ঐ কুরবানির পশুর জন্য খাস, যা কা'বায় প্রেরিত হয়;

اَلْهَدْىُ مُخْتَصٌّ بِمَا يُهْدٰى اِلَى الْبَيْتِ (رَاغِبْ)

قَوْلُهُ اَلْقَلَائِدَ : قَلَائِدُ শব্দটি قَلَادَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হার বা পট্টি, যা কুরবানির জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্ন স্বরূপ বেঁধে দেওয়া হতো, যাতে কুরবানির পশুরূপে সবাই চিনতে পারে এবং তার ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকে। সেই সাথে যারা দেখবে, তাদের মনে অনুরূপ কার্যের আগ্রহ সৃষ্টি করাও এর উদ্দেশ্য। কুরআন মাজীদ এ সবের সম্মান ও মর্যাদা বহাল রেখেছে এবং হাদী [কুরবানির জন্য প্রেরিত পশু] বা তার চিহ্নাদির অবমাননা নিষিদ্ধ করেছে। –[তাফসীরে উসমানী টীকা : ৮]

قَوْلُهُ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ : *দৃশ্যত এটা মুসলিমগণের বৈশিষ্ট্য। কাজেই কোনো নিষ্ঠাবান মুসলিম হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে* রওয়ানা হলে তাকে সম্মান কর। তার পথে বাধার সৃষ্টি করো না। মুশরিকরাও নিজেদের ধারণা মতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় বায়তুল্লাহর হজ আদায় করতে আসত। সে হিসেবে এ আয়াতের ব্যাপকতায় তারাও শামিল হয়ে থাকে তবে বলতে হবে এটা ইসলামের প্রথম দিকের কথা। পরবর্তীকালে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে– اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ মুশরিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে। –[তাফসীরে উসমানী পৃ.৯]

قَوْلُهُ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا : অর্থাৎ প্রথম আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকার করতে পারবে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১১]

فَاصْطَادُوْا শব্দটি اَمْر বা নির্দেশসূচক। কিন্তু অপরিহার্য অর্থ নয়; বরং এর অর্থ অনুমতি মাত্র। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এখন তোমাদের জন্য শিকার করায় দোষ নেই নিষেধাজ্ঞা না থাকায় নির্দেশ মুবাহ হয়ে গেছে। –[রূহুল মা'আনী] নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বৈধ করা হয়েছে। –[জাসসাস] তাদের থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় শিকার করা মুবাহ পর্যায়ের হয়েছে। –[মাদারিক] অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় তোমাদের জন্য যে শিকার হারাম ছিল, এমন আমি তা তোমাদের জন্য মুবাহ করে দিলাম। –[ইবনে কাসীর]। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, একটি মুবাহ কাজের জন্য নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার হওয়ায় বোঝা যায় যে, মুবাহ কাজটি পরিত্যাগ করলে তা নিষিদ্ধ বলে মনে হয়, সে মুবাহ কাজটি সম্পন্ন করা কাম্য। আর এর দ্বারা শরিয়তের ব্যাপারে যারা কঠোরতা আরোপ করেন, তাদের ভ্রান্তি উন্মোচিত করার মতো কঠোরতা আরোপ করে। –[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৪৩৮, টীকা ৭]

قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ : কোনো অবস্থাতেই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সকল নিদর্শনকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন হিজরি ৬ সালে মক্কায় মুশরিকরা সে সবগুলোর অমর্যাদা করেছিল। যুল ক'দাহ মাসে প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ প্রিয়নবী ﷺ ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হতে রওয়ানা হন। তাঁরা হুদাইবিয়া পর্যন্ত পৌঁছলে মুশরিকরা তাঁদেরকে এ ধর্মীয় কার্য পালনে বাধা দেয়। তাঁরা ইহরামের অবস্থা, পবিত্র কা'বার মর্যাদা, পবিত্র মাস কুরবানির পশু ও তার বিশেষ চিহ্ন [কিলাদা] কোনো কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেনি। মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির এ অবমাননা ও দীনি কার্য সম্পাদনে বাধা দানের কারণে এরূপ জালিম ও বর্বর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যে পরিমাণই ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রদর্শন করত তা ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তাপিত হয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অবকাশ ছিল। কিন্তু ইসলামের ভালোবাসা ও শত্রুতা উভয়ই 'ন্যায়-নিক্তি'তে পরিমিত। কুরআন মাজীদ এরূপ জালিম ও স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের মুকাবিলার ক্ষেত্রে নিজ আবেগ উত্তেজনা সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। ভালোবাসা ও শত্রুতার আতিশয্যে মানুষ সাধারণত সীমালঙ্ঘন করে বসে। তাই বলা হয়েছে, শত্রুতা যতই প্রচণ্ডতর হোক তার কারণে তোমরা যেন সীমলঙ্ঘন না করে ফেল এবং ন্যায়-নীতি বিসর্জন না দাও। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১]

قَوْلُهُ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কুরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি

হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা ব্যবস্থাপনা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরি করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোনো মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো-লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যই জরুরি নয়, মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরেই এ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী; বরং এরপরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ঈসালে ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ তা'আলার স্বীয় অসম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সামর্থ্য দ্বারা বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকদের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য সহযোগিতার দশাও তাই হতো; যা এ জগতে সাধারণত নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্ম বন্টন কোনো সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারাবিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা সে কারবারকেই নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছে।

যদি কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সরকার কর্ম বন্টন করতো এবং কোনো দলকে ছুতারের কাজের জন্য, কাউকে কর্মকারের কাজের জন্য, কাউকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য, কাউকে পানির জন্য এবং কাউকে খাদ্য সরবরাহের জন্য নিযুক্ত করতো, তবে কোন ব্যক্তি এ নির্দেশ পালনের জন্য দিনের শান্তি ও রাতের নিদ্রা নষ্ট করতে সম্মত হতো?

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানবকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার অন্তরে সে কাজের আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত করে দিয়েছেন। ফলে সে কোনোরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সে কাজকেই জীবনের একমাত্র করণীয় কাজ বলে মনে করে। এর দ্বারাই সে জীবিকা অর্জন করে। এ অটুট ব্যবস্থার ফলশ্রুতি এই যে, মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র কয়েকটি টাকা খরচ করলেই অনায়াসে অর্জিত হয়ে যায়। রাঁধা খাদ্য, সেলাই করা পোশাক, নির্মাণ করা আসবাবপত্র তৈরি করা গৃহ ইত্যাদি সবকিছু একজন মানুষ কিছু পয়সা ব্যয় করেই অর্জন করতে পারে। এ ব্যবস্থা না থাকলে একজন কোটিপতি মানুষ সমস্ত সম্পদ লুটিয়ে দিয়েও একদানা শস্য অর্জন করতে পারতো না। আপনি হোটেলে অবস্থান করে যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে– তার আটা আমেরিকার, ঘি পাঞ্জাবের, গোশত সিন্ধু প্রদেশের মসলা বিভিন্ন দেশের, থালা-বাসন ও আসবাবপত্র বিভিন্ন দেশের, খেদমতগার বেয়ারা-বাবুর্চি বিভিন্ন শহরের। তারা সবাই আপনার সেবায় নিয়োজিত। যে লোকমাটি [গ্রাস] আপনার মুখে পৌঁছে, তাতে লাখো যন্ত্রপাতি, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ কাজ করেছে। এর পরেই তা আপনার মুখরোচক হতে পেরেছে। আপনি ভোরবেলায় ঘর থেকে বের হন। তিন চার মাইল দূরে যেতে হবে– আপনার এতটুকু শক্তি অথবা সময় নেই। আপনি নিকটবর্তী কোনো স্থানে ট্যাক্সি, রিকশা অথবা বাস দাঁড়ানো দেখতে পাবেন, যার লোহা অস্ট্রেলিয়ার, কাঠ বার্মার,

যন্ত্রপাতি আমেরিকার, ড্রাইভার সীমান্ত প্রদেশের এবং কণ্ডাকটর যুক্ত প্রদেশের। চিন্তা করুন, এ কোন কোন জায়গার সাজ-সরঞ্জাম, কোন কোন জায়গার মানুষ আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান! আপনি কয়েকটি পয়সা দিয়ে তাদের সবার খেদমত হাসিল করতে পারেন। কোন সরকার তাদের বাধ্য করেছে এবং কোনো ব্যক্তি আপনার জন্য এগুলো সরবরাহ করতে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে? বলা বাহুল্য, এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থারই ফল। অন্তরের মালিক আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে এ আইন জারি করে দিয়েছেন।

আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আল্লাহর এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে কি করবে? তা নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব। এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মানবীয় স্বাধীনতা হরণ করতে হয়েছে। ফলে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং হাজারো মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে কঠিন উৎপীড়ন ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মেশিনের কলকব্জার মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে কোনো জায়গায় কোনো বস্তুর উৎপাদন বেড়ে গেলেও তা মানুষের মানবতা ধ্বংস করেই বেড়েছে। অতএব, সওদাটি যে সস্তা নয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থায় একদিকে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং অপরদিকে আল্লাহর বণ্টনের কারণে বিশেষ বিশেষ কাজ করতে বাধ্যও। এ বাধ্যবাধকতা যেহেতু স্বভাবজাত, এ কারণে কেউ একে জোর-জবরদস্তি মনে করতে পারে না। কঠোরতর পরিশ্রম এবং নিকৃষ্টতম কাজের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং চেষ্টা সহকারে তা অর্জন করার লোক সর্বত্র ও সর্বকালে পাওয়া যায়। কোনো সরকার যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করা শুরু করে, তবে তারা পালাতে থাকবে। মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাপনাকে তছনছও করে দিতে পারে।

এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি, যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালোমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভবও ছিল না। এখন অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা স্বীয় হেফাজতের জন্য বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে, যাতে এক দল অথবা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বণ্টন : আব্দুল করীম শাহরাস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে: প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশি ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে: প্রাচ্য, পশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর। প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতো থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এইভাবে যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ-গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এবং বংশ গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনূ হাশেম এক জাতি, বনূ তামীম অন্য জাতি এবং বনূ খোযাআহ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো! হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চ জাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যদের রক্তধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা এবং বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে দাঁড় করে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমন কি, মুসলমানরা ও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধির বিভাগই নয়, বরং তাদের মধ্যের ভাগফলকেও ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী

এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারি কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয় ও কুরআনী শিক্ষা : কুরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, "তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোনো আরবের অনারবের উপর অথবা কোনো শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ-ভীতি ও আল্লাহ আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কুরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই] ঘোষণা করে আবিসিনিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচু জাতের মানুষকে কুরাইশী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে , তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের পরিবারিক সম্পর্ককে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও সুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

"হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবশা থেকে এবং সুহায়েব রোম থেকে এলেন, অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার!" এমন কি, কুরআন পাক ঘোষণা করেছে- خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছ; কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হুনাইনের যুদ্ধে কুরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারি নিচে এসে গিয়েছিল। বদর, ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলি এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার এই যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ মূলনীতিই কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করেছে- تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর, পাপকর্মও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না।

চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতে কুরআন পাক একথা বলেনি যে, মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা কর এবং অন্যের করো না; বরং মুসলমানের সহযোগিতার যে আসল ভিত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতি তাকেই সহযোগিতার বুনিয়াদ করা হয়ছে।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায়কার্যে তারও সাহায্য করো না; বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তার প্রতি যথাযথ বিশুদ্ধ সাহায্য, যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا তাঁরা বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ। এটাই তাকে সাহায্য করা।

কুরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছেন। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার-উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بِرٌّ ও تَقْوٰى দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بِرٌّ শব্দের অর্থ- সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে فِعْلُ الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ সৎকর্ম এবং تَقْوٰى শব্দের অর্থ- تَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ অর্থাৎ মন্দ কাজ বর্জন। إِثْمٌ শব্দের অর্থ- যে কোনো পাপকর্ম, অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। عُدْوَانٌ শব্দের অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা। এখানে এর অর্থ হচ্ছে- অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহ্বানে যত লোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যত লোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গুনাহ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে কাসীর (র.) বর্ণিত তাবারানীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকরি ও পদ গ্রহণ করা হতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল মা'আনীতে فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে, অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্র করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআন ও সুন্নাহর এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে খাড়া করে দিয়েছিল এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা আল্লাহ-ভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞানোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোনো দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহবান-প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে بِرّ ও تَقْوٰى তথা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اِثْم ও عُدْوَانٌ তথা পাপ এবং অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সব দেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোজ রোজ বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, এর কারণ, দু'টি। যথা-

১. প্রচলিত সরকারগুলো কুরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে تَقْوٰى ও بِرّ অর্থাৎ সৎ কর্ম ও আল্লাহ-ভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করে, যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদি একবারও পরীক্ষামূলকভাবে হলেও এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং আল্লাহর কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি, আরাম আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

২. জনগণ মনে করে দিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়; বরং অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কুরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১২-১৮]

অনুবাদ

٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ اَىْ اَكْلُهَا وَالدَّمُ اَىِ الْمَسْفُوْحُ كَمَا فِى الْاَنْعَامِ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ بِاَنْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ الْمَيْتَةُ خَنِقًا وَالْمَوْقُوْذَةُ الْمَقْتُوْلَةُ ضَرْبًا وَالْمُتَرَدِّيَةُ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ اِلٰى سِفْلٍ فَمَاتَتْ وَالنَّطِيْحَةُ الْمَقْتُوْلَةُ بِنَطْحِ اُخْرٰى لَهَا وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ اَىْ اَدْرَكْتُمْ فِيْهِ الرُّوْحَ مِنْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ فَذَبَحْتُمُوْهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى اِسْمِ النُّصُبِ جَمْعُ نِصَابٍ وَهِىَ الْاَصْنَامُ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا تَطْلُبُوا الْقِسْمَ وَالْحُكْمَ بِالْاَزْلَامِ ط جَمْعُ زُلَمٍ بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا مَعَ فَتْحِ اللَّامِ قِدْحٌ بِكَسْرِ الْقَافِ سَهْمٌ صَغِيْرٌ لَا رِيْشَ لَهٗ وَلَا نَصْلَ وَكَانَتْ سَبْعَةً عِنْدَ سَادِنِ الْكَعْبَةِ عَلَيْهَا اِعْلَامٌ وَكَانُوْا يُحِيْبُوْنَهَا فَاِنْ اَمَرَتْهُمْ اِئْتَمَرُوْا وَاِنْ نَهَتْهُمْ اِنْتَهَوْا ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ وَنَزَلَ بِعَرَفَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ اَنْ تَرْتَدُّوْا عَنْهُ بَعْدَ طَمْعِهِمْ فِىْ ذٰلِكَ لَمَّا رَاَوْا مِنْ قُوَّتِهٖ ـ

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীবজন্তু, অর্থাৎ তা আহার করা, রক্ত অর্থাৎ বহমান রক্ত। যেমনটা সূরা আন'আমে উল্লেখ হয়েছে। শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গিকৃত পশু অর্থাৎ যা তিনি ব্যতীত অপর কিছুর নামে জবাই করা হয়েছে, [গলা চেপে মারা জন্তু] অর্থাৎ গলা টিপে যা মারা হয়েছে, আঘাতে মৃত জন্তু অর্থাৎ প্রহারে নিহত জন্তু, পতনে মৃত অর্থাৎ যা উপর হতে নীচে পড়ে মারা গিয়েছে তা, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু অর্থাৎ অপর কোনো জন্তুর শিঙ্গের আঘাতে যার মৃত্যু হয়েছে তা, হিংস্র পশুর ভক্ষণকৃত জন্তু: তবে যা তোমরা জবাই করে পবিত্র করে নিয়েছ অর্থাৎ উল্লিখিত ধরনের জন্তুসমূহের মধ্যে প্রাণ থাকতে যদি কোনোটিকে ধরতে পার আর তা জবাই করে নাও তবে তা হালাল। আর যা জবাই করা হয় মূর্তির নামে اَلنُّصُبُ : এটা نِصَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রতিমা। এবং ভাগ্য নির্ধারণ করা মীমাংসা ও বণ্টন অনুসন্ধান করা জুয়ার তীর দ্বারা। اَلْاَزْلَامُ : এটা زُلَمٌ -এর বহুবচন। زُلَمٌ শব্দটি ز -এ ফাতাহ বা পেশসহ এবং لَامٌ -এর ফাতাহসহ পঠিত, অর্থ– قِدْحٌ ; এটা ق -এ কাসরাসহ পঠিত। অর্থাৎ ছোট তীর যাতে কোনো পাখনা ও ফাল নেই। এসবই পাপ কাজ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি অবাধ্যাচার। জাহেলী যুগে কা'বার সেবায়েতের নিকট এ ধরনের সাতটি তীর ছিল। প্রত্যেকটিতে বিশেষ চিহ্ন প্রদত্ত ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তারা কার্য সম্পাদনের প্রয়াস পেত। যদি নির্দেশ পেত তবে তা করত, আর নিষেধ হলে তা হতে বিরত থাকত। বিদায় হজের বছর আরাফার ময়দানে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, আজ কাফেররা তোমাদের দীনের বিষয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ বহু কামনা থাকা সত্ত্বেও তারা এ ধর্মের শক্তি দর্শনে তোমাদের মুরতাদ বা বিধর্মী হয়ে যাওয়া সম্পর্কে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছে।

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ اَحْكَامَهُ وَفَرَائِضَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَهَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ بِاِكْمَالِهِ وَقِيْلَ بِدُخُوْلِ مَكَّةَ اٰمِنِيْنَ وَرَضِيْتُ اِخْتَرْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ مَجَاعَةٍ اِلٰى اَكْلِ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَاَكَلَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ مَائِلٍ لِاِثْمٍ مَعْصِيَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُ مَا اَكَلَ رَّحِيْمٌ بِهِ فِيْ اِبَاحَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْمَائِلِ لِاِثْمٍ اَيِ الْمُتَلَبِّسِ بِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيْقِ وَالْبَاغِيْ مَثَلًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْاَكْلُ ـ

সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন অর্থাৎ বিধিবিধান ও ফরজসমূহ পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম; নতুন কোনো হালাল বা হারামের বিধান নাজিল হবে না; এবং তা পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। কেউ কেউ বলেন এর মর্ম হলো, নিরাপদে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দান করত তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করলাম, মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে অবাধ্যচারের প্রতি আকর্ষিত না হয়ে, না বুঝে ক্ষুধার তীব্র তাড়ানায় যা হারাম করা হয়েছে তার কিছু আহার করতে বাধ্য হলে, ফলে আহার করে ফেললে তখন নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা সে আহার করে ফেলেছে তজ্জন্য ক্ষমাশীল এবং এ ধরনের ব্যক্তির জন্য তার অনুমতি প্রদানে পরম দয়ালু পক্ষান্তরে পাপের প্রতি আকর্ষণবশত অর্থাৎ তার সাথে বিজড়িত হয়ে, যেমন সে রাহাজানিকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী হয় আর সে উক্ত অবস্থায় নিপতিত হয় তবে তার জন্য সেটা আহার করা বৈধ নয়।

٤. يَسْـَٔلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا الْمُسْتَلَذَّاتُ وَصَيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ الْكَوَاسِبِ مِنَ الْكِلَابِ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ مُكَلِّبِيْنَ حَالٌ مِنْ كَلَّبْتُ الْكَلْبَ بِالتَّشْدِيْدِ اَرْسَلْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ مُكَلِّبِيْنَ اَيْ تُؤَدِّبُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز مِنْ اٰدَابِ الصَّيْدِ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ قَتَلْنَهُ بِاَنْ لَمْ يَاْكُلْنَ مِنْهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهَا وَعَلَامَتُهَا اَنْ تَسْتَرْسِلَ اِذَا اُرْسِلَتْ وَتَنْزَجِرَ اِذَا زُجِرَتْ ـ

৪. হে মুহাম্মাদ! লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী খাদ্যবস্তু বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভালো সুখাদ্য বস্তু এবং শিকারী পশুপাখী অর্থাৎ শিকারী কুকুর, হিংস্র জন্তু ও পাখী ইত্যাদি যাদেরকে তোমরা مُكَلِّبِيْنَ শিকার শিক্ষা দিয়েছে বা ভাব ও حَالٌ এটা অবস্থাবাচক পদ। তাশদীদসহ পঠিত (بَاب تَفْعِيْل) كَلَّبْتُ হতে গঠিত শব্দ। كَلَّبْتُ الْكَلْبَ অর্থ হলো কুকুরটি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলাম। যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিকার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন তাদের শিকার তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। تُعَلِّمُوْنَهُنَّ এটা مُكَلِّبِيْنَ -এর জমীর هُمْ -এর حَال ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ যেগুলোকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অনন্তর তারা যা তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা আহার কর। অর্থাৎ যদি শিকারের কিছু না খেয়ে তোমাদের জন্য রেখে দেয় তবে তা মেরে ফেললেও তোমরা আহার করতে পার। পক্ষান্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে তৎকর্তৃক শিকার আহার করা হালাল নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার আলামত হলো, তাকে দৌড়ালে দৌড়ে, থামালে থেমে যায়।

وَتَمْسِكُ الصَّيْدَ وَلَا تَاْكُلُ مِنْهُ وَاَقَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذٰلِكَ ثَلٰثُ مَرَّاتٍ فَاِنْ اَكَلَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلٰى صَاحِبِهَا فَلَا يَحِلُّ اَكْلُهُ كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَفِيْهِ اِنَّ صَيْدَ السَّهْمِ اِذَا اُرْسِلَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَصَيْدِ الْمُعَلَّمِ مِنَ الْجَوَارِحِ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص عِنْدَ اِرْسَالِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ

আর শিকার করে তা শিকারীর জন্য রেখে দেয় নিজে খেয়ে ফেলে না। ন্যূনপক্ষে তিনবার যদি এরূপ করে তবে তাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এটা যদি শিকারের কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার জন্য [শিকারীর জন্য] সে ধরেছে বলে বিবেচ্য হবে না এবং ওটা ভক্ষণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। সহীহাইনের [বুখারী, মুসলিমের] বর্ণনায়ও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ হয়েছে যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করে কিছু শিকার করা হলে ওটাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর শিকারের মতো বৈধ। এবং প্রেরণ করার সময় এতে আল্লাহর নাম নিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

৫. اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط الْمُسْتَلِذَّاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اَىْ ذَبَائِحُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى حِلٌّ حَلَالٌ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ اِيَّاهُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ الْحَرَائِرُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَّكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ مُتَزَوِّجِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ مُعْلِنِيْنَ بِالزِّنَا بِهِنَّ وَلَا مُتَّخِذِىْٓ اَخْدَانٍ ط اَخِلَّاءٍ مِنْهُنَّ تُسِرُّوْنَ بِالزِّنَا بِهِنَّ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ اَىْ يَرْتَدَّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ز الصَّالِحُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ اِذَا مَاتَ عَلَيْهِ ـ

৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস সুখাদ্য বস্তু বৈধ করা হলো। যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক জবাইকৃত জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ হালাল করা হলো এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। অর্থাৎ সেটা তাদেরকে আহার করানও বৈধ। আর বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা স্বাধীনা নারী তোমাদের জন্য বিবাহ করা বৈধ হয়েছে যদি তাদেরকে তাদের বিনিময় অর্থাৎ মোহর প্রদান কর। বিবাহের জন্য এটা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী রূপে যেন হয় ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়, প্রকাশ্যে জেনা করার জন্য নয় এবং উপপত্নী গ্রহণের এদেরকে বান্ধবীরূপে গ্রহণ অর্থাৎ এদের সাথে গোপন ব্যভিচার চালানোর জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে অর্থাৎ মুরতাদ ও বিধর্মী হয়ে গেলে তার ইতিপূর্বের সৎ কর্ম নিষ্ফল হবে। সেটা ধর্তব্য বলে বিবেচ্য হবে না এবং সেটার কোনো ছওয়াব বা পুণ্যফলও প্রদান করা হবে না। আর এ অবস্থায় যখন মারা যাবে তখন পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمَيْتَةُ : মৃত, ঐ জন্তু যা শরয়ী জবাই পদ্ধতি ব্যতীত কোনো দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়।

قَوْلُهُ اَكْلُهَا : এখানে مُضَاف মাহযূফ মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حِلَّتْ এবং حُرِّمَتْ -এর সম্পর্ক اِفْعَالٌ বা কর্মের সাথে হয়, জাত বা সত্তার সাথে নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُنْخَنِقَةُ : اِسْم فَاعِل وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِب -এর সীগাহ। اِنْفِعَالٌ - اِنْخِنَاقٌ / خَنْقًا (ن) خَنَقَ শ্বাসরোধ করে মারা, গলাটিপে হত্যা করা।

قَوْلُهُ اُهِلَّ : اَلْاِهْلَالُ অর্থ– رَفْعُ الصَّوْتِ বা আওয়াজ উঁচু করা। لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ -এর মধ্যে لَامْ -টি بَاءَ بِمَعْنٰى عِنْدَ -এর অর্থে; অর্থ হলো– مَا رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ ذَكَاتِهٖ بِاسْمِ غَيْرِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ اَلْمَوْقُوْذَةُ : وَقَذَ (ض) [আঘাত করা] থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। অর্থ– আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত।

قَوْلُهُ اَلْمُتَرَدِّيَةُ : تَرَدِّىْ (تَفَعُّلٌ) [নীচে পড়া, পতিত হওয়া] থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। অর্থ– উপর থেকে পড়ে মৃত জন্তু।

قَوْلُهُ اَلنَّطِيْحَةُ : فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে صِيْغَة صِفَتْ ইসমে মাফউল তথা مَنْطُوْحَةٌ -এর অর্থে। (ف،ن) نَطَحَ نَطْحًا -এর বকরি যা অন্যের শিঙ -এর আঘাতে মারা গেছে। অভিধানবিদদের কেউ কেউ বিশেষভাবে বকরির কথা বলেন না। অর্থাৎ যে কোনো জন্তু, যা অন্য জন্তুর শিঙের আঘাতে মারা গেছে।

প্রশ্ন: نَطِيْحَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওযনে এসেছে। আর فَعِيْلَةٌ -এর ওযনে مُذَكَّرْ وَ مُؤَنَّثْ উভয়টি একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে تَاء -এর প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর. نَطِيْحَة -এর تَاء -টি اِنْتِقَالٌ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ اِلَى الْاِسْمِيَّةِ -এর জন্য; تَانِيْث -এর জন্য নয়। যেমনটি ذَبِيْحَة -এর মধ্যে রয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْهُ : এখানে مِنْهُ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। **প্রশ্ন.** فَاَكَلَ السَّبُعُ -এর মর্ম হলো, যাকে হিংস্রপ্রাণী ভক্ষণ করেছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, হিংস্রপ্রাণী যা খেয়ে ফেলেছে তা তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর শেষ হয়ে যাওয়া বস্তুর সাথে বৈধ-অবৈধ হুকুমের কী সম্পর্ক?

উত্তর : মুসান্নিফ (রা.) এখানে مِنْهُ উল্লেখ করে সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, যে প্রাণীর কিছু অংশ হিংস্রপ্রাণী খেয়ে ফেলেছে, যার কারণে প্রাণীটি মারা গেছে, তা খাওয়া হালাল নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُتَرَدِّيَةُ : পতনে মৃত জন্তু। চাই তা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যাক বা কূপের মধ্যে পড়ে মারা যাক।

قَوْلُهُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ : এটি اَلْمُنْخَنِقَةُ এবং তার পরবর্তী বিষয় থেকে اِسْتِثْنَاء হয়েছে; ذَكَاة অর্থ হলো, জবাই করা।

قَوْلُهُ عَلٰى اِسْمِ النُّصُبِ : **প্রশ্ন.** اِسْم শব্দটি বৃদ্ধি করায় লাভ বা উপকারিতা কী?

উত্তর. এখানে اِسْم শব্দটি বৃদ্ধি করায় লাভ হলো, যাতে ذَبْح -এর صِلَه হিসেবে عَلٰى আসাটা শুদ্ধ হয়।

قَوْلُهُ رَضِيْتُ : এটি অবস্থার বিবরণ (بَيَان حَالٌ) -এর জন্য جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য। এর আতফ اَكْمَلْتُ -এর সাথে নয়। কেননা, তখন এটা আবশ্যক হবে যে, ইসলামের ব্যাপারে ধর্ম হিসেবে আজ রাজি হয়েছেন, পূর্বে রাজি ছিলেন না। অথচ ইসলাম পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ধর্ম এবং সকল নবীর দীন ছিল এ ইসলাম। رَضِيْتُ শব্দটি مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل আর তাহলে اَلْاِسْلَام আর دِيْنًا হলো তামীয।

قَوْلُهُ اِخْتَرْتُ : কেউ কেউ বলেছেন, رَضِيْتُ অর্থ হলো اِخْتَرْتُ যা দু'টি মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়। আর প্রথম মাফউল হলো اَلْاِسْلَام এবং দ্বিতীয় মাফউল হলো دِيْنًا সুতরাং এ সূরতে دِيْنًا -কে حَالٌ বা تَمْيِيْز আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।

قَوْلُهُ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ : مُتَجَانِفٍ শব্দটি بَاب تَفَاعُلٌ থেকে اِسْم فَاعِلٌ-এর সীগাহ্। অর্থ মন্দের প্রতি ধাবমান হয়, সত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। غَيْرَ শব্দটি حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ مَخْمَصَةٍ : এমন ক্ষুধা যাতে পেট লেগে যায়।

قَوْلُهُ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ : এ আয়াত পবিত্র কুরআনের তিন জায়গায় এসছে। এখানে, সূরা বাকারায় এবং সূরা নাহলে। কিন্তু সূরা বাকারা ছাড়া সব জায়গায় جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। এখানে মুফাসসির (রা.) فَاَكَلَهُ উল্লেখ করে جَوَاب شَرْط উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর গোশত মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর, যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কুরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর গোশতে কোনো শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে– তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা জবাই ব্যতীত কোনো রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন, একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী।
–[মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারা কুতনী, বায়হাকী]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত **দ্বিতীয় হারাম বস্তু** হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا বলায় বোঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা-ই হারাম; সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় হারাম বস্তু : শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বোঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ হারাম বস্তু : ঐ জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদিও জবাইয়ের সময়ও অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে জবাই করতো। অধুনা কোনো কোনো মূর্খ লোক পীর-ফকিরের নামে জবাই করে। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করে, তাই সাধারাণ ফিকহবিদরা একেও وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতদৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম হারাম বস্তু : مُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। অথবা নিজেই কোনো জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ হারাম বস্তু : مَوْقُوْذَةُ অর্থাৎ ঐ জন্তুর হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়েছে। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারালো অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও مَوْقُوْذَةُ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। مُنْخَنِقَةُ এবং مَوْقُوْذَةُ উভয়টি مَيْتَةُ তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েজ মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে তা খেতে পারব কিনা? তিনি উত্তরে বললেন, তীরের যে অংশ ধারালো নয়, যদি সেই অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা مَوْقُوْذَةُ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারালো অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলীতে মরে যায়, ফিকহবিদগণ সেটাকেও مَوْقُوْذَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন– اَلْمَقْتُوْلَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তা-ই مَوْقُوْذَةٌ অতএব হারাম। [জাসসাস]। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেকী (র.) প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। –[তাফসীরে কুরতুবী]

সপ্তম হারাম বস্তু : مُتَرَدِّيَةٌ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো পাহাড়, টিলা, উঁচু দালান থেকে পড়ে অথবা কূপে পড়ে মারা যায়। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোনো শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে গিয়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় مُتَرَدِّيَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো পাখীকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) এ বিষয়বস্তুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[জাস্‌সাস]

অষ্টম হারাম বস্তু : نَطِيْحَةٌ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোনো জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম হারাম বস্তু : ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোনো হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়।

উপরিউক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিধান বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনোটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর জবাই করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা মৃত ও রক্তকে জবাই করার সম্ভাবনা নেই এবং শূকর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে জবাই করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.), কাতাদা (র.) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটির ব্যাপারে নয় পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদাবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম হারাম বস্তু : ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর জবাই করা হয়। 'নুছুব' ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানি করত। এটাকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরিউক্ত সর্বপ্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কুরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ হারাম বস্তু : اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ হারাম اَزْلَامٌ শব্দটি زَلَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াতে যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটি نَعَمْ [হ্যাঁ] একটিতে لَا [না] এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোনো কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী? তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে তাকে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। এর বিনিময়ে খাদেম তুন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের গোশত বণ্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরিক হয়ে উট ইত্যাদি জবাই করে তার গোশত প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে ভাগ করত। ফলে জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বণ্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমরা বলেন, ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে যেমন– ভবিষ্যৎ-কথন বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

قَوْلُهُ اِسْتِقْسَامُ بِالْاَزْلَامِ : শব্দটি কখনো জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ণয় করা হয়। কুরআন পাক একে مَيْسِرٌ নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শা'বী (র.) বলেন– আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হতো, পারস্য ও রোমেও তেমনি দাবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হতো। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে অংশ নির্ধারণের ন্যায় এগুলো হারাম। –[তাফসীরে মাযহারী]

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বণ্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে– ذَالِكُمْ فِسْقٌ অর্থাৎ এ বণ্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে– اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ অর্থাৎ অদ্য কাফেররা তোমাদের দীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে বিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছরের বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলে ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামি আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

قَوْلُهُ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ .... وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا : এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে আরাফার দিন। এ দিনটি সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবার। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের 'জবলে রহমত' [রহমতের পাহাড়] -এর কাছে। এ স্থানটিই আরাফার দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময়টা ছিল আসরের পর, যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষত শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়ই দোয়া কবুলের সময়।

হজের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাহাবায়ে কেরামের সাথে জাবালে রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্র আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াত কুরআনের শেষ দিকের আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এর পর নাজিল হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে ছিলেন। কেননা দশম হিজরির ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউল তারিখে রাসূলে কারীম ﷺ ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের যে স্বাক্ষর বহন করে। এর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানবজাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহর নিয়ামত চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ.)-এর আমল থেকে যে সত্য ধর্ম ও আল্লাহর নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।

এতে যেমন সব নবী ও রাসূলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সৌভাগ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি সাথে সাথে সব উম্মতের বিপরীতে তাঁর উম্মতেরও স্বাতন্ত্র্যমূলক মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এ কারণেই একবার কতিপয় ইহুদি আলেম হযরত ফারূক (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আপনাদের কুরআনে এমন একটি আয়াত আছে, যা ইহুদিদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তারা অবতরণের দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসেবে উদযাপন করত। ফারূকে আযম প্রশ্ন করলেন, আপনাদের ইঙ্গিত কোনো আয়াতটির প্রতি? তারা উত্তরে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

হযরত ফারূকে আযম (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমরা জানি এ আয়াতটি কোনো জায়গায়, কোন দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, এ দিনটি ছিল আমাদের জন্য একসাথে দু'টি ঈদের দিন। একটি আরাফা ও অপরটি জুমুআ।

ঈদ ও উৎসবপর্ব উদযাপনের ইসলামি মূলনীতি : ফারূকে আযম (রা.)-এর এ উত্তরে একটি ইসলামি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ মূলনীতিটি বিশ্বের সব জাতি ও ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন করে। এসব দিন তাদের কাছে ঈদ অথবা উৎসবপর্বের মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে।

কোথাও কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা সিংহাসনারোহণ দিবস পালন করা হয় এবং কোথাও কোনো বিশেষ দেশ অথবা শহর বিজয় অথবা কোনো মহান ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। ইসলাম মূর্খতার যুগের যাবতীয় রীতিপ্রথা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি পরিত্যাগ করে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'খলীলুল্লাহ' উপাধি দান করা হয়েছে। কুরআন পাক وَاِذَا ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ বলে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা ও তাতে তাঁর সাফল্যের প্রশংসা করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস উদযাপন করা হয়নি এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও তদীয় জননীর জন্ম ও মৃত্যু দিবস অথবা কোনো স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়নি।

হ্যাঁ, তাঁর কাজকর্মের মধ্যে যেসব বিষয় ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেগুলোর শুধু স্মৃতিই সংরক্ষিত রাখা হয়নি; বরং সেগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ধর্মের অঙ্গ তথা ফরজ-ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কুরবানি, খাতনা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়াদৌড়ি, মিনার তিন জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ এগুলো সবই তাঁদের ক্রিয়াকর্মের স্মৃতি, যা তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় নফসের কামনা-বাসনা ও স্বভাবজাত দাবি পিষ্ট করে সম্পাদন করেছিলেন। এসব ক্রিয়াকর্ম প্রত্যেক যুগের মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

এমনিভাবে ইসলামের যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তাঁর জন্ম-মৃত্যু অথবা ব্যক্তিগত কোনো সাফল্যের স্মৃতিতে দিবস পালন করার পরিবর্তে তাঁর ক্রিয়াকর্মের দিবস পালন করা হয়েছে। তাও আবার কোনো বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- শবে-বরাত, রমযানুল মুবারক, শবে ক্বদর, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি। ঈদ মাত্র দুইটি, তাও খাঁটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত করা হয়েছে। প্রথম ঈদ পবিত্র রমজানের শেষে এবং হজের মাসগুলোর প্রারম্ভে এবং দ্বিতীয় ঈদ পবিত্র হজব্রত সমাপনান্তে রাখা হয়েছে।

মোট কথা, হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর উপরিউক্ত উত্তর থেকে বোঝা যায় যায় যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ন্যায় আমাদের ঈদ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অনুগামী নয় যে, যেদিনই কোনো বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিনকেই আমরা ঈদ দিবস হিসেবে উদযাপন করব। প্রাচীন জাহিলিয়াতের যুগে এ প্রথাই প্রচলিত ছিল আজকালকার আধুনিক জাহিলিয়াতও এ প্রথাটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কি অন্যান্য জাতির অনুকরণে মুসলমানরাও এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মদিবসে 'ঈদে-মীলাদ' উদযাপন করে। তাদের দেখে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিবসে 'ঈদে-মিলাদুন্নবী' নামে একটি নতুন ঈদ উদ্ভাবন করেছে। এ দিবসে বাজারে মিছিল বের করা, তাতে বাজে ও অশালীন কর্মকাণ্ড করা এবং রাতে আলোকসজ্জা করাকে তারা ইবাদত মনে করে থাকে। অথচ সাহাবী , তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজেকর্মে এর কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃত সত্য এই যে, যেসব জাতি প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর কীর্তির দিক দিয়ে কাঙাল, তাদের মধ্যে এসব দিবস পালনের রীতি প্রচলিত হতে পারে। সাবধান! নীলমণির মতো তাদের দু'চারটি ব্যক্তিত্ব এবং তাদের বিশেষ কীর্তিকেই স্মৃতিদিবস হিসেবে পালন করাকে তারা জাতীয় গৌরব বলে মনে করে।

ইসলামে এরূপ দিবস পালনের প্রথা চালু হলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও অধিক পয়গাম্বর রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই শুধু জন্ম নয়, বিস্ময়কর কীর্তিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটিই দিনই অক্ষয় কীর্তিতে ভাস্বর হওয়ার কারণে তা পালন করা দরকার। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যেসব প্রতিভা ও কীর্তির কারণে তিনি সমগ্র আরবে 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, সেগুলো কি উদযাপনের যোগ্য নয়? এরপর রয়েছে কুরআন অবতরণ, হিজরত, বদর যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য যুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে একটিও এমন নয় যে, তার স্মৃতি উদযাপন না করলে চলে। এমনিভাবে তাঁর হাজার হাজার মুজেযা ও স্মৃতি উদযাপনের দাবি রাখে। সত্য বলতে কি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক দিন নয় প্রত্যেক মুহূর্তেই স্মৃতি উদযাপনের যোগ্যতা রাখে।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর পর তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবী রয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন, তাঁর অনুপম জীবনযাত্রার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদের স্মৃতি উদযাপন না করলে তা অবিচার হবে নাকি? একবার এ প্রথা চালু হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম মনীষীবৃন্দ, আল্লাহর ওলীগণ, ওলামা ও মাশায়েখ, যাঁদের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে, স্মৃতি উদযাপনের তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা হবে নাকি? পক্ষান্তরে যদি স্থিরীকৃত হয় যে, সবারই স্মৃতি দিবস উদযাপন করা হবে, তবে সারা বছরের একটি দিনও স্মৃতি উদযাপন থেকে মুক্ত থাকবে না; বরং প্রতিদিনের প্রতি ঘণ্টায় কয়েকটি স্মৃতি ও কয়েকটি ঈদ উদযাপন করতে হবে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এ প্রথাকে জাহিলিয়াতের প্রথা আখ্যা দিয়ে বর্জন করেছেন। হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর উক্তি এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এবার আলোচ্য আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য শুনুন, এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। যথা– ১. দীনের পূর্ণতা। ২. নিয়ামতের সম্পূর্ণতা এবং ৩. ইসলামি শরিয়ত নির্বাচন।

দীনের পূর্ণতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্যকার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ বলেন, আজ সত্য দীনের যাবতীয় ফরজ- সীমা, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পূর্ণ করে দেওয়া হলো। এখন এতে কোনোরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা এবং হ্রাস করার সম্ভাবনা বাকি নেই। –[রূহুল মা'আনী]

এ কারণেই এ আয়াত অবতরণের পর কোনো নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। যে কয়েকখানি আয়াত এরপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হয় উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, না হয় পূর্ব বর্ণিত বিধি-বিধানের তাকিদ সম্বলিত।

তবে ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামগণ যদি নতুন ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রকাশ করেন, তবে তা উপরিউক্ত বর্ণনার নয়। কেননা কুরআন পাক যেমন বিধি-বিধানের সীমা, ফরজ ইত্যাদি বর্ণনা করেছে, তেমনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান প্রকাশ করা হবে, তা একদিক দিয়ে কুরআনেরই বর্ণিত বিধি-বিধান। কেননা এগুলো কুরআন বর্ণিত মূলনীতির অধীন।

সার কথা দীনের পূর্ণতার অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী এই যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এতে কোনোরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা নেই এবং রহিত হয়ে কম হওয়ারও আশঙ্কা নেই। কেননা এর পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সাথে সাথে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর ওহী ছাড়া কুরআনের কোনো নির্দেশ রহিত হতে পারে না। তবে ইজতিহাদের মূলনীতির অধীনে মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে যে বাহ্যিক পরিবর্ধন হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ধন নয়; বরং কুরআনী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মাত্র।

নিয়ামত সম্পূর্ণ করার অর্থ মুসলমানদের প্রাধান্য ও উত্থান এবং বিরুদ্ধবাদীদের পরাভূত ও বিজিত হওয়া। মক্কা বিজয়, মূর্খতা যুগের কু-প্রথার অবলুপ্তি এবং সে বছর হজে কোনো মুশরিকের যোগদান না করার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ লাভ করে। এখানে কুরআনের ভাষায় এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আয়াতে دِيْن -এর সাথে إِكْمَالْ শব্দটি এবং نِعْمَتْ -এর সাথে إِتْمَامْ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ إِكْمَالْ ও إِتْمَامْ উভয়টিকে বাহ্যত সমার্থবোধক মনে করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যা 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে ইমাম রাগেব ইস্পানী এভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো বস্তুর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় اِكْمَالٌ ও تَكْمِيْل এবং এক বস্তুর উপর অন্য বস্তুর আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় اِتْمَامٌ। সুতরাং اِكْمَالُ دِيْن -এর সারমর্ম এই যে, এ জগতে আল্লাহর আইন ও ধর্মের বিধি-বিধান প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ পূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং اِتْمَام نِعْمَتْ -এর অর্থ এই যে, এখন মুসলমানরা কারো মুখাপেক্ষী নয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রাধান্য, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, যা দ্বারা তারা সত্য ধর্মের বিধি-বিধানকে কার্যকরভাবে জারি ও প্রয়োগ করতে পারে।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে دِيْن -কে মুসলমানদের দিকে সম্বন্ধ করে دِيْنَكُمْ বলা হয়েছে এবং نِعْمَتْ -কে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করে نِعْمَتِيْ বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, دِيْن বা ধর্ম মুসলমানদের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং نِعْمَتْ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণত্ব লাভ করে। -[তাফসীরে আল-কাইয়্যিম : ইবনে কাইয়্যিম (র.)]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাও ফুঠে উঠেছে যে, অদ্য দীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের ধর্ম অপূর্ণ ছিল। বাহরে মুহীত গ্রন্থে কাফফাল মরওয়াযীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলের ধর্মই তাঁর যমানা হিসেবে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ যে যুগে যে পয়গাম্বরের প্রতি কোনো শরিয়ত বা ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ যুগ ও ঐ জাতি হিসেবে সে ধর্মই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ কথা ছিল যে, এ জাতি ও এ যুগের জন্য যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ, পরবর্তী যুগ ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের জন্য সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে না; বরং এ ধর্মকে রহিত করে অন্য ধর্ম ও শরিয়ত প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এর ব্যতিক্রম। এ শরিয়ত সর্বশেষ যুগে নাজিল হওয়ার কারণে সবদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনো বিশেষ যুগ, বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই; বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক জাতির জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন, যা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যাতে পারলৌকিক মুক্তি সীমাবদ্ধ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম একটি বড় অবদান এবং এ ধর্মটিই সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ। এরপর নতুন কোনো ধর্ম আগমন করবে না এবং এতে কোনোরূপ সংযোগজন-বিয়োজনও করা হবে না।

এ কারণেই আয়াতটি অবতরণের সময় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু হযরত ওমর ফারূক (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কান্নার কারণে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আপনি এ নশ্বর পৃথিবীতে আর বেশিদিন অবস্থান করবেন না। কেননা দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূলের প্রয়োজনও মিটে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ বক্তব্যের সত্যতা সমর্থন করেন। -[ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত]

সে মতে পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে, এর মাত্র একাশি দিন পর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইহজগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।
-[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/২০-২৯]

ইসলাম পরিপূর্ণ দীন-জীবনব্যবস্থা : এর সংবাদ ও ঘটনাবলিতে পূর্ণ সত্যতা বর্ণনায় পরিপূর্ণ প্রভাব এবং এর বিধানে পুরোপুরি ভারসাম্যতা বিদ্যমান। যেসব বিষয় পূর্ববর্তী কিতাব ও অন্যান্য আসমানি ধর্মে সীমিত ও অপূর্ণ ছিল, এ সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত দীন দ্বারা তার পূর্ণতা বিধান করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীস তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা বা কারণের ভিত্তিতে [কিয়াস দ্বারা] যে সমস্ত বিধান দিয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো সর্বদাই চলতে থাকবে। কিন্তু রদ-বদলের কোনোরূপ সুযোগ তাতে রাখা হয়নি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৯]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ : যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল ও হারাম জন্তুর বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শিকারী কুকুর ও বাজপাখি দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতে তারই উত্তরে বর্ণিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৩০]

পূর্বের আয়াতে বহু হারাম জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে হালাল জিনিস কি কি? তার উত্তরে দেওয়া হয়েছে যে, হালালের সীমারেখা তো সুবিস্তৃত। দৈহিক বা দীনী দিক থেকে ক্ষতিকারক কয়েকটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার তাবৎ পাক পবিত্র বস্তুই হালাল। শিকারী জন্তুর শিকার সম্পর্কে কেউ কেউ বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিল বলে আয়াতের পরবর্তী অংশে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩]

শানে নুযূল : মুসতারাকে হাকেম, ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে জারীর-এ আবূ রাফে কর্তৃক বর্ণিত শানে নুযুল উল্লেখ রয়েছে যাকে হাকেম (র.) বিশুদ্ধ বলেছেন। রেওয়ায়েতটির সারসংক্ষেপ হলো, একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। হুজুর ﷺ -এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে বললেন, যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা আসে না। খোঁজ করে জানা গেল, ঘরে কুকুরের একটি বাচ্চা ছিল। হুজুর ﷺ কুকুর ছানাটিকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এর ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক সাহাবা কুকুর দিয়ে শিকার করার হুকুম হুজুর ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। -[জামালাইন : ২/১৫৫]

শিকার ও শিকারী জন্তুর বিধান : শিকারী কুকুর, বাজ পাখী ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জীব কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে হালাল। যথা- ১. শিকারী জানোয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া। ২. তাকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া। ৩. শরিয়তে স্বীকৃত পন্থায় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যথা কুকুরকে শেখানো হবে যে, সে শিকার ধরে নিজে খাবে না; বাজকে তা'লীম দেওয়া হবে যে, তাকে ডাকা মাত্র চলে আসবে এমন কি তখন শিকারের পেছনে ধাবমান থাকলেও। কুকুর যদি শিকার ধরে নিজেই খায় কিংবা বাজ পাখীকে ডাকা হলে যদি না আসে তা হলে বুঝতে হবে- সে যখন তার কথা শুনছে না তখন শিকারও তার জন্য নয়; বরং নিজের জন্যই ধরেছে। একথাই হযরত শাহ সাহেব (র.) এভাবে লিখেন, সে যখন মানুষের চরিত্র শিখল, তখন যেন মানুষই তা জবাই করল। ৪. ছাড়ার সময় মহান আল্লাহর নাম নেওয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে ছাড়া। কুরআনের ভাষায়ই এ শর্ত চতুষ্ঠয় ব্যক্ত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে পঞ্চম আরো একটি শর্ত হলো শিকারী জীব কর্তৃক শিকারকে যখমও করতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। 'جَوَارِحُ' শব্দটির মূলধাতু 'جَرْحٌ' [যখম করা] দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে শিকারী প্রাণীর শিকার করা জীব হারাম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে জীব যদি মারা না গিয়ে থাকে এবং তাকে জবাই করে নেওয়া হয়, তবে হালাল। যেহেতু ইরশাদ হয়েছে- وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [যাকে হিংস্র পশু ভক্ষণ করেছে [তাও হারাম] তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ]। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২৪]

اَلْجَوَارِحُ শব্দটি جَارِحَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো সব শিকারী পশু বা জন্তু। চাই তা পশু হোক বা পাখী। শিকারী কুকুর বা বাজপাখী দ্বারা শিকার করানো হলে এরূপ শিকারকে সায়েদা বলে। -[রাগিব]

جَارِحَة নাম এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এরা শিকারকৃত জন্তুকে জখম করে ফেলে। কেউ কেউ বলেন, নখ বা থাবার আঘাতে জখম হওয়ার কারণে এরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। -[জাসসাস]

যখম হওয়ার কারণে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে, কেননা শিকারী জন্তু শিকার ধরার সময় তাকে যখম বা আহত করে ফেলে।-[খাযিন]

উত্তর থেকে দু'টি শর্ত বেরিয়ে এসেছে। প্রথমটি হলো : শিকারী জন্তু এমন, যাদের শিকার করা শিখানো হয়েছে, প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। ফকীহগণ এর দ্বারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ শর্তটি কেবল বন্য জন্তুর জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং গৃহপালিত জন্তুর বেলায়ও তা প্রযোজ্য। বস্তুত গৃহপালিত পশু যদি শিকার ধরার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত না হয়, তবে তার শিকারকৃত জন্তু হালাল হবে না। অবশ্য যে জন্তু [চাই সে বন্য হোক বা গৃহপালিত] প্রশিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হবে, তার কাজ শিকারীর কাজ হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো : শিকারী পশুকে শিকার ধরার জন্য লেলিয়ে দিতে হবে। এমন যেন না হয় যে, সে নিজে শিকার ধরে এনে তোমাদের সামনে রেখে দিয়েছে। وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ এ বাক্যটি তারকীব বা বাক্য-বিন্যাসের দিক দিয়ে اَلطَّيِّبَاتُ শব্দের সাথে সম্পৃক্ত এবং صَيْد শব্দটি مُضَاف এখানে উহ্য আছে যা اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ -এ বাক্যটির সাথে সম্পৃক্ত [কাশশাফ]। আর ঐ জন্তুর শিকার, যাকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ। -[কুরতুবী]

مُكَلِّبِيْنَ -এর একটা অর্থ হলো কুকুরকে শিক্ষা দানকারী এবং দ্বিতীয় অর্থ হলো: শিকারের উপর আক্রমণকারী। এ দু'টি অর্থের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই। আরবি ভাষা- ভাষীরা দু'টি অর্থই গ্রহণ করেছেন। শিকারী কুকুরকে যাকে শিকার ধরা শিখায়, তাকে 'মুকাল্লাব' বলা হয়। -[তাফসীরে মাজেদী : ২/৪৭৫]

قَوْلُهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ : অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে পবিত্র বস্তুর ব্যবহার ও শিকার ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন না হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ পার্থিব স্বাদ-আহলাদে নিবিষ্ট হয়ে এবং শিকার ইত্যাদি কাজে মগ্ন হয়ে মহান আল্লাহ ও আখিরাত ভুলে বসে। তাই সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল যে, মহান আল্লাহকে ভুলো না। মনে রেখ, হিসাবের দিন বেশি দূরে নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রাশি ও সে অনুপাতে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তোমাদের প্রিয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২৫]

قَوْلُهُ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ : অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হলো। 'আজ' বলে ঐ দিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দশম হিজরির বিদায় হজের আরাফার দিন। উদ্দেশ্যে এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হলো। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ আয়াতে طَيِّبَاتٌ অর্থাৎ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থাৎ আল্লাহ হালাল করেন তাদের জন্য طَيِّبَاتٌ এবং হারাম করেন خَبَائِثُ ; এখানে طَيِّبَاتٌ -এর বিপরীতে خَبَائِثُ ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طَيِّبَاتٌ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خَبَائِثُ নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

পবিত্র কুরআন এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে : بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানবচরিত্র প্রভাবান্বিত হয় তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানি যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই পবিত্র কুরআন বলে- يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

বিশেষ করে গোশত মানবদেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে গোশত চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে গোশত থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরিয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ বাক্যটিতে হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখানে দেখতে হবে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোনো শর্ত আছে কিনা যে, প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, নাকি বিকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী এবং ঈসা ও মারইয়াম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? কুরআনের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য কোনো ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট, যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথভ্রষ্টতায় পতিত থাকে।

পবিত্র কুরআন যাদের আহলে কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ অর্থাৎ এরা নিজেদের ঐশীগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদিরা হযরত ওযাইর (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهٗ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ : এতদসত্ত্বেও যখন কুরআন তাদের আহলে কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে; বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না কেন।

ইমাম জাস্সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তাওরাত পাঠ করে এবং ইহুদিদের শনিবারকে পবিত্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? হযরত ফারূকে আযম (রা.) উত্তরে লিখে পাঠালেন, তাদেরকে আহলে কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে।
-[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/ ৩৭-৩৯]

قَوْلُهٗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ .... اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহের বিধান : অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতী সাধ্বী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে আহলে কিতাবদের সতী সাধ্বী **মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল। এখানে উভয় স্থলে** مُحْصَنٰتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি অভিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে **এর অর্থ দু'টি। যথা- ১. স্বাধীন ও মুক্ত**-এর বিপরীতে রয়েছে ক্রীতদাসী। ২. সতী-সাধ্বী মহিলা। আভিধানিক দিক দিয়ে **এখানে উভয় অর্থই বোঝানো যেতে পারে**। এখানে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে مُحْصَنٰتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- স্বাধীন ও **মুক্ত মহিলা। অতএব, বাক্যের সারমর্ম** এই যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের জন্য হালাল, ক্রীতদাসী হালাল নয়।

কিন্তু অধিক সংখ্যক আলেম এ **বিষয়ে একমত যে, সতী-সাধ্বী** মহিলা হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম; **বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও উপযুক্ত** বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ করা কিংবা আহলে কিতাব মহিলাকে, **সর্বক্ষেত্রে সতী**-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক **সম্পর্ক স্থাপন করা** কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাজ নয়।

অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্তু হলো এই যে, **মুসলমানের** জন্য কোনো মুসলমান মহিলাকে অথবা আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহলে কিতাব নয়, এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হলো।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ই আহলে কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া বর্তমানকালের আর কোনো সম্প্রদায়ই আহলে কিতাব নয়। অগ্নিউপাসক অথবা মূর্তিপূজক হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণিভুক্ত। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন কোনো গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবি করে, যার ঐশীগ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহলে কিতাব। বলা বাহুল্য, তাওরাত ও ইঞ্জীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষ আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ামত পানাহার করে। কিন্তু জন্তু জানোয়ার ছাড়া অন্য কোনো জন্তু পানাহারে সময় এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই যে, 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'বিসমিল্লাহ' বলেই পানাহার করতে হবে নতুবা হালাল হবে না। বড় জোর প্রত্যেক বস্তু পানাহারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলে জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর রহস্য কি?

চিন্তা করলেই পার্থক্য ফুঠে উঠে। প্রাণীদের প্রাণ এক দিক দিয়ে সব সমান। তাই এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করবে এবং জবাই করে খেয়ে ফেলবে, বাহ্যত তা বৈধ হওয়া সমীচীন নয়। এখন যাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এটি একটি বিরাট নিয়ামত বলতে হবে। অতএব, জন্তু জবাই করার সময় কল্পনায় এ নিয়ামতের উপলব্ধি ও শোকর আদায়কে জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, দানা, ফল ইত্যাদি এর বিপরীত। এগুলো সৃজিতই হয়েছে যাতে মানুষ এগুলোকে কেটে-পিষে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাই, শুধু বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব পর্যায়ে রাখা হয়েছে; ওয়াজিব বা জরুরি করা হয়নি।

এর আরো একটি কারণ এই যে, মুশরিকরা জন্তু জবাই করার সময় দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতো। এ প্রথা জাহেলিয়্যাত যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামি শরিয়ত তাদের এই কাফেরসুলভ প্রথাকে একটি চমৎকার ইবাদতে রূপান্তরিত করে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে জরুরি সাব্যস্ত করেছে। ভ্রান্ত নামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাম প্রস্তাব করাই ছিল এ মুশরিকসুলভ প্রথা মিটাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। নতুবা প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া ছিল সুকঠিন। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৩৩-৩৭]

قَوْلُهُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ : অর্থাৎ আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে 'খাদ্য' বলতে জবাই করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারকা, ইবরাহীম, কাতাদা, সুদ্দী, যাহহাক, মুজাহিদ (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে কিতাব, মূর্তি উপাসক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে জবাই করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোনো লোকের কাছ থেকে যে কোনো বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানদের জন্য খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যথা- ১. কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় আহলে কিতাব কারা? ২. কিতাব বলে কোন কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? ৩. আহলে কিতাব হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরি কি না? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোনো লিখিত পাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐসব ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর কিতাব হওয়া কুরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর, হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেগুলোকে আল্লাহর প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, তারাই আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে যা আল্লাহর কিতাব বলে কুরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেরূপ কোনো কিতাবের অনুসারীরা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরিক, অগ্নি উপাসক, মূর্তিপূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'সাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। যেসব আলেমের মতে যারা হযরত দাউদ (আ.)-এর যাবুরের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যাবূর কিতাবের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি, তাঁরা এদের মূর্তি ও অগ্নি-উপসাকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহলে কিতাব বলা যায় তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি। তাদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

এখানে দেখতে হবে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোনো শর্ত আছে কিনা যে, প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, নাকি বিকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী এবং ঈসা ও মারইয়াম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? কুরআনের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য কোনো ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট, যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথভ্রষ্টতায় পতিত থাকে।

পবিত্র কুরআন যাদের আহলে কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهٖ অর্থাৎ এরা নিজেদের ঐশীগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদিরা হযরত ওযাইর (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهٗ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ : এতদসত্ত্বেও যখন কুরআন তাদের আহলে কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে; বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না কেন।

ইমাম জাস্সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তাওরাত পাঠ করে এবং ইহুদিদের শনিবারকে পবিত্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? হযরত ফারূকে আযম (রা.) উত্তরে লিখে পাঠালেন, তাদেরকে আহলে কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে।

-[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/ ৩৭-৩৯]

قَوْلُهٗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ .... اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহের বিধান : অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতী সাধ্বী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে আহলে কিতাবদের সতী সাধ্বী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল। এখানে উভয় স্থলে مُحْصَنَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি অভিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে এর অর্থ দু'টি। যথা- ১. স্বাধীন ও মুক্ত-এর বিপরীতে রয়েছে ক্রীতদাসী। ২. সতী-সাধ্বী মহিলা। আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয় অর্থই বোঝানো যেতে পারে। এখানে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে مُحْصَنَاتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- স্বাধীন ও মুক্ত মহিলা। অতএব, বাক্যের সারমর্ম এই যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের জন্য হালাল, ক্রীতদাসী হালাল নয়।

কিন্তু অধিক সংখ্যক আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সতী-সাধ্বী মহিলা হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম; বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ করা কিংবা আহলে কিতাব মহিলাকে, সর্বক্ষেত্রে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাজ নয়।

অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্তু হলো এই যে, মুসলমানের জন্য কোনো মুসলমান মহিলাকে অথবা আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহলে কিতাব নয়, এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হলো।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ই আহলে কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া বর্তমানকালের আর কোনো সম্প্রদায়ই আহলে কিতাব নয়। অগ্নিউপাসক অথবা মূর্তিপূজক হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণিভুক্ত। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন কোনো গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবি করে, যার ঐশীগ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহলে কিতাব। বলা বাহুল্য, তাওরাত ও ইঞ্জীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে

বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া যাবূর ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা জগতে কোথাও বিদ্যমান নেই এবং এগুলোর অনুসরণ করে বলে কেউ দাবিও করে না। বর্তমান যুগে 'বেদ', 'গ্রন্থসাহেব', 'যরথুস্ত্র' ইত্যাদিও পবিত্র কিতাব বলে কথিত হয়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নায় এগুলোর ওহী ও ঐশীগ্রন্থ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। সম্ভবত যাবূর ও ইবরাহিমী সহীফার বিকৃত রূপ, যা কালচক্রে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে, এরূপ নিছক সম্ভাবনাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকে একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাদের সাথেই মুসলমানদের বিয়ে হালাল। অন্য কোনো ধর্মালম্বী মহিলার সাথে, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়, ততক্ষণ মুসলমানের বিয়ে হারাম।

পবিত্র কুরআনের আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ আয়াতে এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোনো মুশরিক মহিলাকে ততক্ষণ বিয়ে করো না, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়। আহলে কিতাব ছাড়া বর্তমান জগতের সব সম্প্রদায়েই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কোনো মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। অপরটি সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াত, যাতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েজ।

তাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় আয়াতের মর্ম এই সাব্যস্ত করেছেন যে, নীতিগতভাবে মুশরিক মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ না হওয়া উচিত। কিন্তু সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব মহিলাদের ক্ষেত্র ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাদের ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মহিলার সাথে মুসলমান হওয়া ব্যতীত মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। এখন রইল ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাদের ব্যাপার। কোনো কোনো সাহাবীর মতে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর মতও তাই। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার উক্তি সুস্পষ্ট– وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ অর্থাৎ "মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না।" তারা মারইয়াম তনয় ঈসাকে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ ও পরওয়ারদিগার সাব্যস্ত করে। এর চাইতে বড় শিরক আর কোনটি তা আমার জানা নেই। একবার মায়মূন ইবনে মিহরান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে দেশে বসবাস করি, সেখানে অধিকাংশই আহলে কিতাব। আমরা তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে এবং তাদের জবাই করা জন্তু খেতে পারি কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উত্তরে উপরিউক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। একটিতে মুশরিক মহিলাদের বিয়ে করা হারাম বলা হয়েছে এবং অপরটিতে আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল বর্ণিত হয়েছে।

মায়মূন ইবনে মিহরান বললেন, পবিত্র কুরআনের এ দু'টি আয়াত আমিও পাঠ করি এবং জানি। আমার প্রশ্ন এই যে, উভয় আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য শরিয়তের নির্দেশ কি? উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) পুনরায় আয়াত দু'টি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বললেন না। মুসলিম আলেমরা এর অর্থ এই ধরেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হলেও এ বিয়ের ফলে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য বরং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে, তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতেও আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুচিত।

হযরত জাস্‌সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে শাকীক ইবনে সালামার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) মাদায়েন পৌঁছে জনৈক ইহুদি স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। হযরত ফারুকে আযম (রা.) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পত্র লিখে বললেন, স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিয়ে দাও। হযরত হুযাইফা উত্তরে লিখলেন যে, সে কি আমার জন্য হারাম? খলীফা উত্তরে লিখে পাঠালেন যে, আমি হারাম বলি না, কিন্তু ইহুদি স্ত্রীলোকরা সাধারণভাবে সতী-সাধ্বী নয়। তাই আমার আশঙ্কা যে, এ পথে তোমাদের পরিবারেও না অশ্লীলতা ও ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করবে। কিতাবুল আসার গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান এ ঘটনাকে ইমাম আবূ হানীফার অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বার হযরত ফারুকে আযম (রা.) হুযাইফাকে যে পত্র লিখেন তার ভাষা ছিল এরূপ–

اَعْزِمُ عَلَيْكَ اَنْ لَا تَضَعَ كِتَابِيْ حَتّٰى تُخَلِّيَ سَبِيْلَهَا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَقْتَدِيَكَ الْمُسْلِمُوْنَ فَيَخْتَارُوْا نِسَاءَ اَهْلِ الذِّمَّةِ لِجَمَالِهِنَّ وَكَفٰى بِذَالِكَ فِتْنَةً لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পাঠান্তে এ পত্র রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দাও। আমার আশঙ্কা হয় অন্য মুসলমানরাও না আবার তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ফলে তারা রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জিম্মি আহলে কিতাব মহিলাদের মুসলমান মহিলাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করবে। মুসলমান মহিলাদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছু হবে না। −[কিতাবুল আসার পৃ. ১৫৬]

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র.) বলেন, হানাফী মাযহাবের ফিকহবিদরা এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এ বিয়েকে হারাম বলেন না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে মাকরূহ মনে করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন: শুধু হুযাইফা নন, তালহা এবং কা'ব ইবনে মালেক (র.) ও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরাও সূরা মায়িদার আয়াতদৃষ্টে আহলে কিতাব মহিলাদের পাণি গ্রহণ করেন। খলীফা ফারূকে আযম (র.) সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং তালাক দানের নির্দেশ দেন।

ফারূকে আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোনো ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলা মুসলমানের সহধর্মিণী হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, সে যুগে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচার থাকলে অথবা আমাদের পরিবার কলুষিত হয়ে পড়বে কিংবা তাদের রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মানুষ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে; ফলে মুসলমান মহিলারা বিপদে পতিত হবে, এটিই ছিল তখনকার যুগের একমাত্র আশঙ্কা। কিন্তু ফারূকে আযমের দূরদর্শী দৃষ্টি এতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই উপরিউক্ত সাহাবীদের তালাক দানে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালকার চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকত, তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন? প্রথমত আজকাল যারা আদমশুমারীর খাতায় নিজেকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান নামে লিপিবদ্ধ করায়, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রিস্টবাদ ও ইহুদিবাদকে অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) ও মূসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল মনে করে না। বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা পুরোপুরি নাস্তিক। শুধু জাতিগত অথবা প্রথাগতভাবে নিজেকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বলে।

এমতাবস্থায় তাদের স্ত্রীলোক মুসলমানের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদেরকে মুসলমান পরিবারে স্থান দেওয়া গোটা পরিবারের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। এই যুগে এ পথে ইসলাম ও মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, একটি মেয়ে গোটা একটা মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছে। এগুলো এমন বিষয় যে, কোনো সচেতন মানুষই অন্যদেরকে এরূপ সুযোগ দিতে পারে না।

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আজকালকার তথাকথিত আহলে কিতাব স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকাই মুসলমানদের উচিত। আয়াতের শেষাংশে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আহলে কিতাব স্ত্রীলোকদের রাখতেই চাও, তবে নিয়মিত বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে রাখ। তাদের মোহর ইত্যাদি প্রাপ্য পরিশোধ কর। তাদেরকে পরিচারিকা হিসেবে রাখা এবং ব্যভিচারে ব্যবহার করা হারাম। −[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ৫০-৫৪]

قَوْلُهُ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ : **বিবাহের মূল লক্ষ্য চরিত্র রক্ষা :** পূর্বে যেমন নারীর চারিত্রিক পবিত্রতার কথা বলা হয়েছিল তেমনি এ স্থলে পুরুষকে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বজায় রাখতে আদেশ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে− اَلطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ 'সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।' [সূরা নূর : ২৬] এ দ্বারা আরো জানা গেল যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে বিবাহের লক্ষ্য অমূল্য চরিত্রকে রক্ষা করা এবং বিবাহের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা; কাম প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সুধা চরিতার্থ নয়। −[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৩২]

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব : নিকাহ ইসলামের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়; বরং একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা। এর উপকারিতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অপরিসীম। তাই নিকাহ বা শাদীর জন্য উর্দূ ভাষায় আরেকটি শব্দ 'খানা-আবাদী বা 'গৃহ-আবাদ' আছে। বিরান ঘর এবং উজাড় গৃহ এর দ্বারাই আবাদ হয়। ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল এ কারণেই বৈধ হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর আসল মাকসুদ হবে একটা খান্দানের গোড়া পত্তন করা এবং পরস্পর সম্পর্কের দ্বারা স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করা। যারা নিজেদেরকে সৃষ্টি-কালচার ও তাহযীব-তামাদ্দুনের দাবিদার বলে মনে করে, কিন্তু আসলে তারা জাহিল বা অজ্ঞ, তাদের সমাজে এ ধরনের বিবাহের ব্যবস্থা ছাড়া আরো দু'ধরনের নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যবস্থা আগে থেকে প্রচলিত আছে এবং তা এখনো চালু আছে। এর একটা ব্যবস্থা হলো স্পষ্ট ব্যভিচার। নারী ব্যভিচার করার জন্য স্বাধীন থাকে এবং একে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজ তাকে এ থেকে বাধা দেয় না এবং রাষ্ট্রও কোনো আপত্তি করতে পারে না। যখন ইচ্ছা তখন কোনো পুরুষ তার কাছে যায় এবং নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে তার অঙ্গে পানি স্খলিত করত মুখ কালো করে ফিরে আসে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো গোপন প্রেম, অর্থাৎ যেখানে পবিত্রতা বলে কিছু নেই। এখানে ভদ্র ও বেশ্যার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। অবশ্য এ ধরনের গোপন প্রণয় সাধারণে বেশি প্রচার না হওয়ায় সবাই স্ব-স্ব মর্যাদায় সমাজে বসবাস করে। কোনো কেলেংকারী প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ বিষয়টি অনেকেই জানে; কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে তা ছড়ানো হয় না। ইসলাম এ দু'টি সভ্য অপরাধকে সমাজের অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং নারী ও পুরুষের মাঝে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। আর বিয়ে -শাদী গোপনে হয় না, বরং প্রকাশ্যে হয়। এখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তাঁর মাধ্যমে একজন পুরুষ খেদমতের জিম্মাদারী কবুল করে নেয়। উভয়ের মাঝে পারস্পরিক হক প্রতিষ্ঠিত হয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। তারা উভয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের চড়াই-উতরাই পার হওয়ার জন্য যথাসাধ্য ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে। আর এসব অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষীর উপস্থিতিতে। مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ -এ বাক্যটি ব্যবহারের দ্বারা কুরআন মাজীদ দাম্পত্য জীবনের যে সুউচ্চ ও সম্মানিত পদ্ধতি পেশ করেছে, এখানে কোনো জড় সভ্যতা আজও পৌছতে পারেনি। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা -৩৩]

অনুবাদ :

٦. يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا قُمْتُمْ اَىْ اَرَدْتُمُ الْقِيَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اَىْ مَعَهَا كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ اَىْ اَلْصِقُوا الْمَسْحَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اِسَالَةِ مَاءٍ وَهُوَ اِسْمُ جِنْسٍ فَيَكْفِىْ اَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهٖ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رح وَاَرْجُلَكُمْ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى اَيْدِيَكُمْ وَالْجَرُّ عَلَى الْجِوَارِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط اَىْ مَعَهُمَا كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَانِ فِىْ كُلِّ رِجْلٍ عِنْدَ مَفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْاَيْدِىْ وَالْاَرْجُلِ الْمَغْسُوْلَةِ بِالرَّاْسِ الْمَمْسُوْحِ يُفِيْدُ وُجُوْبَ التَّرْتِيْبِ فِىْ طَهَارَةِ هٰذِهِ الْاَعْضَاءِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رح وَيُؤْخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوْبُ النِّيَّةِ فِيْهِ كَغَيْرِهٖ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط فَاغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ مُسَافِرِيْنَ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤئِطِ اَىْ اَحْدَثَ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ سَبَقَ مِثْلُهٗ فِىْ اٰيَةِ النِّسَاءِ .

৬. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে অর্থাৎ দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে আর তোমরা যদি মুহদাস বা অজুহীন হও তখন তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত অর্থাৎ কনুইসহ; সুন্নায় এ কথা বিবৃত হয়েছে। এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে । بِرُءُوْسِكُمْ -এর بَاء -টি اِلْصَاقٌ বা লেপটানো, লাগানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পানি না বহিয়ে মাসাহকে এর সাথে লাগাও। এটি اِسْم جِنْس বা জাতিবাচক বিশেষ্য। সুতরাং যতটুকু হলে 'মাসাহ' হয়েছে বলে বলা যাবে এখানে ততটুকু করাই যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে। সামান্য কয়টি চুল হলো এর পরিমাণ। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। **এবং তোমাদের পা** اَرْجُلَكُمْ : এটি اَيْدِيَكُمْ -এর সাথে عَطْف হিসেবে مَنْصُوْب বা ফাতাহযুক্তরূপে আর جَرٌّ عَلَى الْجِوَارِ অর্থাৎ প্রতিবেশী শব্দটি [بِرُءُوْسِكُمْ] -এর جَرّ বা কাসরার সাথে সামঞ্জস্যকল্পে এটি কাসরাযুক্তরূপেও পঠিত রয়েছে। গ্রন্থি পর্যন্ত সুন্নায় বিবৃত হয়েছে গ্রন্থিসহ ধৌত করবে। জংঘা ও পায়ের সংযোগস্থলে যে দু'টি হাড় বাইরের দিকে উঁচু হয়ে থাকে সে দু'টিকে كَعْب বা গ্রন্থি ও গোড়ালীর হাড় বলা হয়। এখানে হাত ও পা অর্থাৎ অজুতে যে দু'টি অঙ্গের সম্পর্ক হলো ধৌত করার সাথে এতদুভয়ের মাঝে মাসাহ করার সাথে সম্পর্কিত মাথার বিধান উল্লেখ করায় প্রমাণ হয় যে, অজুর সময় এগুলোর মধ্যে تَرْتِيْب বা আনুপূর্বিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখা ওয়াজিব। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। হাদীসে আছে যে, অন্যান্য ইবাদতের মতো অজুতেও নিয়ত করা ওয়াজিব। যদি তোমরা জুনুবী থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। অর্থাৎ গোসল করে নিবে। যদি তোমরা পীড়িত হও অর্থাৎ এতটুকু অসুস্থ হও যে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর বলে প্রতিভাত হয় অথবা পর্যটনে থাক অর্থাৎ মুসাফির হও অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে আগমন করে অর্থাৎ তোমাদের কেউ 'মুহদাস' বা অজুহীন হয় অথবা তোমরা স্ত্রী-সংগত হও সূরা নিসায় এতাদৃশ আয়াতের উল্লেখ হয়েছে।

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً بَعْدَ طَلَبِهِ فَتَيَمَّمُوْا اِقْصِدُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ مِنْهُ ط بِضَرْبَتَيْنِ وَالْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الْمُرَادَ اِسْتِيْعَابُ الْعُضْوَيْنِ بِالْمَسْحِ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ضَيْقٍ بِمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالذُّنُوْبِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ بِبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّيْنِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعَمَهٗ ـ

এবং অনুসন্ধান করেও পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির অর্থাৎ পবিত্র মাটির তায়াম্মুম করবে, ইচ্ছা করবে এবং সেটা দু'বার কনুইসহ তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে; بِوُجُوْهِكُمْ-এর بَاء-টি اِلْصَاقْ বা মিলানো, লেপটানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে যে, মাসাহ -এর বেলায় উভয় অঙ্গ اِسْتِيْعَابْ বা সম্পূর্ণ আবেষ্টন করে নিতে হবে। অজু গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদির বিধান ফরজ করত আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, অসুবিধায় ফেলতে চান না [বরং তিনি তোমাদেরকে] পাপ ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র করতে চান এবং দীনের বিধানসমূহ বর্ণনা করে দিয়ে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা তাঁর নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَىْ اَرَدْتُّمُ الْقِيَامَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ দ্বারা বোঝা যায় যে, নামাজ শুরু করার পর 'তাহারাত' আবশ্যক। অথচ নামাজ শুরু করার পূর্বেই 'তাহারাত' অর্জন করা জরুরি।

উত্তর. আয়াতে বর্ণিত শব্দ اِذَا قُمْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِذَا اَرَدْتُّمُ الْقِيَامَ অর্থাৎ যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা কর তখন 'তাহারাত' হাসিল কর।

প্রশ্ন. এখানে আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, قُمْتُمْ বলে اَرَدْتُّمْ উদ্দেশ্য নেওয়ার মাঝে সামঞ্জস্যতা কী?

উত্তর. এখানে مُسَبَّبْ বলে سَبَبْ মুরাদ নেওয়া হয়েছে। যেহেতু اِرَادَةْ হলো قِيَامْ বা দণ্ডায়মান হওয়ার سَبَبْ এবং قِيَامْ হলো مُسَبَّبْ তাই এখানে قِيَامْ বলে اِرَادَةْ মুরাদ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে নিম্নোক্ত سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব স্বরূপ।

প্রশ্ন. উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যখনই নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে তখনই 'তাহরাত' অর্জন করতে হবে। চাই পূর্বে তাহারাত থাক বা না থাক। আসলেই কি বিষয়টি এমন?

উত্তর. অজু তথা তাহারাত ঐ সময় আবশ্যক যখন তাহারাত না থাকবে। এর প্রতি আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা উত্তম।

قَوْلُهٗ اَلْمَرَافِقِ : এটি مِرْفَقٌ-এর বহুবচন। অর্থে ঐ জোড়া যা বাহু এবং কালাইয়ের মাঝে অবস্থিত। যাকে বাংলায় কনুই বলে।

قَوْلُهٗ اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ : কেউ বলেন, এখানে بَاء অতিরিক্ত। কেউ বলেন تَبْعِيْض -এর জন্য। ইবনে হিশাম এবং জমখশরী বলেন, اِلْصَاقْ-এর জন্য। অর্থাৎ পূর্ণ মাথা কিংবা আংশিক মাথার সাথে মাসাহকে সম্পৃক্ত করে দাও। ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.) সতর্কতামূলক اِسْتِيْعَابْ বা পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) اَقَلْ مِقْدَارْ

বা সর্বনিম্ন পরিমাণকে ওয়াজিব বলেছেন। কেননা এটা মাসাহ -এর নিশ্চিত পরিমাণ। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা ওয়াজিব বলেছেন। তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন- إِنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ - اَلنَّاصِيَةُ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ وَهُوَ بِقَدْرِ الرَّأْسِ অর্থাৎ হাদীসে আছে রাসূল ﷺ نَاصِيَةٌ তথা মাথার অগ্রভাগে মাসাহ করেছেন।

قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ : অর্থাৎ أَرْجُلَكُمْ -এর মাঝে দু'টি কেরাত রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি হচ্ছে, لَامٌ বর্ণে ফাতহাসহ। এটি নাফে ইবনে আমের, কাসাই এবং হাফস (র.) হযরত আসেম থেকে বর্ণনা করেন।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ : এটি অন্যান্য কারী সাহেবদের মতে। এ ইখতেলাফের কারণে পা ধৌত করা কিংবা মাসাহ করার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে ধৌত করা ওয়াজিব এবং শীয়াদের মতে মাসাহ করা ওয়াজিব। আর দাউদ ইবনে আলী এবং যায়দিয়া ফেরকার নিকট ধৌত এবং মাসাহ উভয়ের মাঝে সমন্বয় করার মতো প্রদান করে।

قَوْلُهُ وَالْجَرُّ لِلْجِوَارِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন. অনেক কারী সাহেব أَرْجُلَكُمْ -এর মাঝে لَامٌ বর্ণে কাসরা দিয়ে পড়ে থাকেন। جَرٌّ দিয়ে পড়ার সূরতে رُؤُسِكُمْ -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে মাসাহর হুকুম হবে। অথচ এ মাযহাব খারেজী এবং শিয়াদের। যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাবের পরিপন্থি।

উত্তর : أَرْجُلَكُمْ -এর মাঝে لَامٌ বর্ণে কাসরা দিয়ে পড়ার কারণ جَوَارٌ বা প্রতিবেশির প্রতি লক্ষ্য রাখা مَجْرُوْر -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে নয়। কুরআন এবং আরবদের ভাষায় এরূপ ব্যবহারের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا : যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের [illegible] জীবন ও পানাহার সম্পর্কিত হালাল বস্তুসমূহের আলোচনা ছিল। যা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। সুতরাং [illegible] নিয়ামতদাতার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর কৃকজ্ঞতা আদায়ের একটি পদ্ধতি হলো [illegible] বা পবিত্রতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তাহারাতের জন্যও তার পদ্ধতি জানা আবশ্যক। এ [illegible] পদ্ধতিও বর্ণনা করা হচ্ছে। -[জামালাইন ২/১৬৬]

[illegible] তে ভূষিত করা হলো তা শোনামাত্র একজন ভদ্র ও সত্যনিষ্ঠ [illegible] হয়ে উঠবে। স্বভাবতই তাঁর ইচ্ছা জাগবে সেই [illegible] নিতে কৃপা স্বীকার এবং চরম বন্দেগী ও [illegible] দেওয়ার ইচ্ছা করবে তথা সালাত [illegible] ও স্বভাবতই পছন্দনীয় [illegible] তা এক পর্যায়ে মানুষকে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি হতে দূরে সরিয়ে পাশবিক গুণাবলির নিকটবর্তী করে দেয়। অজু ও গোসলের সমস্ত কারণ সেইসব উপভোগেরই অনিবার্য সৃষ্টি। কাজেই তোমাদের মনোলোভা বস্তুসমূহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যখন আমার দিকে আমার ইচ্ছা করবে তখন প্রথম পাশবিকতার প্রভাবাদি ও পানাহার ইত্যাদি হতে সৃষ্ট মলিনতা হতে পবিত্র হয়ে নাও। এ পবিত্রতা অজু ও গোসল দ্বারা অর্জিত হয়। অজু দ্বারা মুমিনের দেহই যে পাক-সাফ হয় তা নয়, বরং যথানিয়মে অজু করলে তার পানির ফোটার সাথে গুনাহও ঝরে যায়। -[তাফসীরে উসমানী: টীকা-৩৪]

নামাজের জন্য অজু অপরিহার্য : ঘুম থেকে জাগ বা পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে সালাত আদায়ার্থে উঠ। প্রথমে অজু করে লও। তবে অজু করা জরুরি তখনই, যখন প্রথম থেকে অজু না থাকে। আয়াতের শেষে এসব বিধানের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে- وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ তবে তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান।' এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দরবারে স্থান দেওয়ার জন্যই হাত মুখ ইত্যাদি ধোয়াকে আবশ্যিক করেছেন। যদি এ পবিত্রতা পূর্ব থেকে অর্জিত থাকে এবং তা ভঙ্গের কোনো কারণ না পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে পবিত্রকে পুনরায় পবিত্র করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে পবিত্রতার্জনকে আবশ্যিক করা হলে উম্মত অসুবিধায় পড়ে যেত। ইরশাদ হয়েছে- مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ حَرَجٍ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা

তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।" হ্যাঁ, অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা, জ্যোতির্ময়তা এবং উদ্যম অর্জনের জন্য তাজা অজু করা হলে সেটা মোস্তাহাব। সম্ভবত এ জন্যই إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ আয়াতের অঙ্গ বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যা দ্বারা প্রত্যেকবার সলাত আদায়ে যাওয়ার সময় নতুন অজু করার প্রতি উৎসাহ পাওয়া যায়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৩৫]

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজের ইরাদা কর, অথচ অজু নেই أَيْ إِذَا أَرَدْتُمْ যখন তোমরা ইরাদা করবে। অর্থাৎ যখন তোমরা দাঁড়াবার ইরাদা করবে, কাজের ইরাদার দ্বারা আসল কাজের কথা বলা হয়েছে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য। অজু অবস্থায় নেই বা অজু নষ্ট হয়ে গেছে। এ বাক্যটি উহ্য ধরে নেওয়া হয়েছে। এটা সর্ববাদী অভিমত। এজন্য অজু থাকার পর আবার অজু করা নামাজের জন্য জরুরি নয়। আয়াতে প্রকাশ্য অর্থ যে ব্যক্তি নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তার জন্য অজু করা ওয়াজিব, যদি সে মুহদাস বা অপবিত্র না হয়: কিন্তু ইজমা বা সর্ববাদী অভিমত এর বিপরীত। সাধারণত আমি এর দ্বারা কয়েদ বা শর্তের ইরাদা করেছি। আসল অর্থ হলো– যখন তোমরা নাপাক অবস্থায় নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.), আবূ মূসা (রা.), জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), উবায়দা সালমানী, আবূ আলীয়া, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, ইবরাহীম ও হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, যদি শরীর অপবিত্র না হয়, তবে সব সালাতের জন্য অজু করা ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। বস্তুত নতুন অজুর ফজিলত খুব বেশি- তা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাধারণ আমল এরূপ ছিল। সুতরাং এবং এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করা মোস্তাহাব। মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে নতুনভাবে অজু করা অতীব উত্তম। হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন অজু করতেন। আর তাদের এ আমল মোস্তাহাব হিসেবে পরিগণিত। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি তাদেরকে সব সালাতের সময় অজু করার নির্দেশ দিতাম। এসব বর্ণনায় জানা যায় যে, সব নামাজের জন্য অজু করা মোস্তাহাব, যদি নামাজি অপবিত্র না হয়। ইবনে সিরীন (র.) বলেন, খুলাফায়ে রাশেদীন সব নামাজের জন্য অজু করতেন। তারা এ নির্দেশকে মোস্তাহাব, হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ সাহাবী যাদের মধ্যে ইবনে ওমর (রা.)-ও শামিল, তাঁরা ফজিলতের আশায় সব নামাজের জন্য অজু করতেন এবং নবী কারীম ﷺ -ও এরূপ করতেন। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৩৫]

قَوْلُهُ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ : এখন অজুর আরকান [বিধান] বর্ণিত হচ্ছে। অন্য ধর্মের বিপরীতে ইসলাম অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হাসিলের সাথে সাথে বাহ্যিক ও শারীরিক পবিত্রতার জন্য তাগিদ দেয়। আর ইসলাম তার মৌলিক ইবাদত নামাজের উর্ধ্বে অজু করা আবশ্যক মনে করে। অজু ছাড়া নামাজ হয় না। হুকুম আহকামের আয়াতগুলো কুরআনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আলেমদের অভিমত এই যে, এই আয়াতগুলো কুরআন মজীদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসাইলের আয়াত। এর অধিকাংশই ইবাদত সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম, যা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমন কি এ একটা আয়াত থেকে কোনো কোনো আলেম ও ফকীহ আটশত এমন কি হাজার হাজার মাসআলা বের করেছেন। একজন আলেম বলেন, এর মধ্যে এক হাজার মাসআলা আছে। আমাদের মদীনার সাথীগণ এটা অন্বেষণ করা শুরু করেন এবং তারা আটশো মাসআলা পর্যন্ত পৌছান; কিন্তু তারা হাজারে পৌছতে পারেননি। অজুর মধ্যে কেবল চারটি জিনিস ফরজ, আর এগুলো এ আয়াতে বর্ণিত আছে। যথা– ১. فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করবে। ২. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ কনুইসহ হাত ধৌত করবে। ৩. وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ তোমাদের মাথা মাসাহ করবে। অথবা পানি ভেজা হাত মাথায় বুলাবে। ৪. وَ(اغْسِلُوْا) أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থাৎ টাখনুসহ পা ধৌত করবে। এছাড়া আর যা আছে; যথা কুলি করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, গরগরা করা ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু আছে সুন্নত এবং কিছু মোস্তাহাব। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবে আছে। তাফসীরে এর বিবরণের প্রয়োজন নেই। অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি দেওয়া, ধৌত করা, ময়লা, সাফ করা ইত্যাদি কাজে যত হিকমত বা গুঢ় রহস্য আছে এবং শরীরের জন্য কল্যাণকর যা এতে রয়েছে, হুজুরে ক্বালব বা একাগ্রতা সৃষ্টিতে যা সহায়ক এসব ব্যাপারে লিখতে গেলে একটা আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন পড়বে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করবে। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট চেহারা ধোয়ার অর্থ হলো, তার উপর পানি ঢেলে দিয়ে হাত ফেরাতে হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট চেহারার উপর কেবল পানি ফেলে দিলেই হবে হাত দিয়ে মলার বা রগড়াবার দরকার নেই। চেহারা ধৌত করার জন্য, তার উপর পানি দেওয়া এবং হাত দিয়ে মলা আমাদের নিকট খুবই জরুরি। অন্যেরা বলেন, এটাই আমাদের সাথী ও সর্বস্তরের ফকীহদের অভিমত যে, চেহারার উপর পানি দেওয়াই যথেষ্ট হাত দিয়ে রগড়ানোর দরকার নেই।

قَوْلُهُ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ : এবং তোমাদের হাতগুলো কনুইসহ ধৌত করবে। اِلٰى শব্দটি শেষ অবস্থা বা প্রান্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এর সীমানার বর্ণনা আয়াতে আছে। কেননা اِلٰى শব্দের আগেও পরে যা আছে, তা একত্র করতে হবে, বা আলাদা রাখতে হবে। অভিজ্ঞ ব্যাকরণবিদের অভিমত হলো, পরে বর্ণিত জিনিস যদি পূর্বে বর্ণিত জিনিসের অনুরূপ হয়, তবে তা পূর্বের সাথে একত্র করতে হবে। আর যদি ভিন্ন হয়, তবে তা বহির্ভূত থাকবে। কেননা اِلٰى শব্দের পরে যা বর্ণিত হয়, তা যদি তার পূর্বের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সীবাওয়াইহ ও অন্যান্যদের এটাই অভিমত। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৩৬]

قَوْلُهُ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ : [বা অন্য কোনো উপায়ে গোসল নষ্ট হয়ে যায় এবং গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়] لٰمَسْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা স্পর্শ কর। এখানে স্পর্শ করা অর্থ হলো: স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। সাহাবা, তাবেয়ীনের মতে এবং অভিধানে এর অর্থ এরূপই। স্পর্শ করার অর্থ হলো, সহবাস করা। স্পর্শ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সহবাসের প্রতি। হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মূসা (রা.), হাসান, উবায়দা ও শা'বী (র.) বলেন, স্পর্শ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সহবাসের প্রতি। যদি কেউ পড়ে اَوْ لَمَسْتُمْ অথবা তোমরা স্পর্শ কর [নারীদের], এখানে স্পষ্ট যে, স্ত্রীদের সাথে সহবাস বুঝানো হয়েছে। কেননা স্পর্শ, দু'জন না হলে সম্ভব নয়, খুব কম জিনিসেই এটা হতে পারে। –[তাফসীরে মাজেদী: টীকা-৩৮]

তায়াম্মুমের বিধান : অজু ও গোসলের সবধরনের প্রয়োজনীয়তার সাথে এটা সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যখন পানি ব্যবহারে সক্ষম হবে না, চাই তা অসুখের কারণে হোক, বা দূরত্বের কারণে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন। এর অর্থ হলো: যদি তোমরা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও। সর্দি লাগার ভয়, রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা , পানি আনা খুবই কষ্টকর, এসবের হুকুম পানি না পাওয়ার হুকুমের মধ্যে শামিল। হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, একদা হযরত আমর ইবনে আস (রা.) তাঁর সাথে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করেন। কেননা পানি ব্যবহারে তাঁর সর্দি লাগার আশঙ্কা ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা বৈধ রেখেছেন। আমর ইবনে আস (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সর্দি লাগার ভয়ে, পানি থাকা সত্ত্বেও তিনি তায়াম্মুম করেন। আর এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ তাকে অনুমতি দেন। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সর্দির কারণে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মাদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে গোসল করতে ভয় পায়, তার জন্য ক্ষতির ভয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ। তায়াম্মুম করার পর নামাজের জামাতে শামিল হওয়ার অনুমতি হাদীসে আছে। ইমরান ইবনে হুসাইন এর হাদীসে আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে আলাদা দেখতে পেলেন, তিনি সকলের সাথে নামাজ আদায় করলেন না। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! জামাতের সাথে নামাজ পড়তে কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? তখন সে সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, কিন্তু আমার কাছে কোনো পানি নেই। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমার জন্য পবিত্র মাটিই যথেষ্ট ছিল। বুখারী শরীফে এটা উল্লেখ আছে। উম্মতের ফকীহগণ, যাঁদের উম্মতের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী বলা যেতে পারে, তারা ব্যাপারটি পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন। পানি তো পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মূল্য খুব বেশি। আর যদি এরূপ অল্প পানি অবশিষ্ট থাকে যে, অজু করার ফলে পান করার জন্য কোনো পানি থাকবে না, এ ধরনের সব ক্ষেত্রে পানি অবশিষ্ট থাকা না থাকার হুকুম এবং তায়াম্মুম করা দুরস্ত হবে। আমাদের সাথীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা তার পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট হবে, কোনো ক্ষতি ব্যতিরেকে, তবে সে তা করবে। আর যদি তার সাথে পানি থাকে, অথচ সে পানি ব্যবহারে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা সে বহু মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও পানি পাবে না, এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করবে। আর এ ব্যাপারে তার কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই।

–[তাফসীরে মাজেদী: টীকা-৩৯]

قَوْلُهُ صَعِيْدًا طَيِّبًا : তায়াম্মুমের বর্ণনা এবং তায়াম্মুম করার নিয়ম সূরা নিসার সংশ্লিষ্ট আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। صَعِيْدًا طَيِّبًا অর্থাৎ পবিত্র মাটি দিয়ে। صَعِيْدًا -এর অর্থ হলো– মাটি জাতীয় জিনিস। যে জিনিসে মাটির অংশ থাকবে, তা এ হুকুমের মধ্যে শামিল। صَعِيْدٌ মাটির নাম। কাজেই মাটি জাতীয় জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, জমিনের মাটি, বালি ও পাথর ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪০]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ "যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর"-এর তাৎপর্য : পূর্বের রুকূতে যে নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা হয়েছিল তা শুনে বান্দার মনে আলোড়ন জেগে উঠল সেই সত্যিকার অনুগ্রহদাতার বন্দেগী করার জন্য পত্রপাঠে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিলেন, তাঁর দরবারে হাজিরা দিতে হলে কীভাবে পাক-পবিত্র হয়ে দিতে

হবে। এ শিক্ষা দানও একটা নিয়ামত হলো। আর পানি ও মাটির ব্যবহার দ্বারা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা সাধন করা আরো এক নিয়ামত। তাই ইরশাদ হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আগের ঐসব নিয়ামত স্মরণ করার পূর্বে এ নতুন নিয়ামতরাজির, যা অজুর বিধান প্রসঙ্গে প্রদত্ত হলো, শোকর আদায় করা উচিত। সম্ভবত এ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ থেকেই হযরত বিলাল (রা.) তাহিয়্যাতুল অজুর সন্ধান পেয়েছেন। এ মধ্যবর্তী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন করার পর পূর্বের আয়াতে বর্ণিত সেই মহা অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজিকে পুনরায় সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে বান্দা নিজ প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান হতে ইচ্ছা করেছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৪২]

قَوْلُهُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهِ : আল্লাহর রবুবিয়াতের অঙ্গীকার : مِيْثَاقَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অঙ্গীকার। এর দ্বারা কোনো অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে? এক দলের অভিমত হলো: এর অর্থ আলেম আরওয়াহ বা রূহের জগতের সেই অঙ্গীকার, যা সমস্ত বনী আদম থেকে আল্লাহর রব হওয়া সম্পর্কে গৃহীত হয়েছিল। মুজাহিদ, কালবী ও মুকাতিল (র.) বলেন, এ হলো সে অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের [রূহদের] থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যখন তিনি তাদেরকে আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছিলেন। মানুষের আত্মার মাঝে স্বভাবগতভাবে আল্লাহর সন্ধান লাভের জন্য যে ব্যাকুলতা আছে; এ হলো সে অঙ্গীকারের বাহ্যিকরূপ। কিন্তু এখানকার সম্বোধনটি সমস্ত মানুষ জাতির জন্য নয়, বরং এখানে কেবলমাত্র ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। সে জন্য সহজ ও সরলভাবে এ অঙ্গীকারের অর্থ হলো তা, যা একজন কালিমা পাঠকারী ইসলাম কবুল করার সময় করে থাকেন; অর্থাৎ ইসলামের হুকুম-আহকাম প্রতিপালনের জন্য ব্যাপক অঙ্গীকার। কথিত আছে- মীসাক হলো মুমিনের অঙ্গীকার, যার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। এর চাইতে হৃদয়গ্রাহী তাফসীর হলো- مِيْثَاقَكُمْ বা তোমাদের অঙ্গীকার এর অর্থ হচ্ছে- ঐ বায়'আত ও ইতা'আত [অনুসরণ], যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং বিশিষ্ট তাবেয়ী সুদ্দী (র.) ও অন্যান্যদের থেকে এরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরীনের অভিমত; যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সুদ্দী (র.) প্রমুখ। তারা বলেন, এ হলো সেই ওয়াদা ও অঙ্গীকার, যা তাঁরা মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে আকাবার রাতে এবং গাছের নীচে শ্রবণ ও অনুসরণ দ্বারা সুখে ও দুঃখে সর্ববস্থায় মেনে চলার জন্য করেছিলেন। এ হলো সেই অঙ্গীকার, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাদের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনবেন এবং মানবেন। এ হলো সে অঙ্গীকার, যা তারা শুনবেন ও মানবেন বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়আতের সময় স্বীকার করে নিতেন, তাদের ভালো ও মন্দ সর্বাস্থায়। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত। এরূপ অঙ্গীকার তো নিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের শান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এর সম্পর্ক নিজের জাতের দিকে করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন- اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ বরং তারা আল্লাহর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে, যদিও তারা আসলে বায়'আত গ্রহণ করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাথের অঙ্গীকারকে, তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তাবেয়ী সুদ্দী (র.) থেকে এরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে যে, এ মীসাক বা অঙ্গিকারের অর্থ হলো: ইসলামের সত্যতার জ্ঞানজাত ও লিখিত দলিল। যুক্তিবাদীগণ সাধারণত এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুদ্দী (র.) বলেন, মীসাকের অর্থ হলো, জ্ঞানজাত ও শরিয়তের ঐ সমস্ত দলিল প্রমাণ, যা আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও দীনের বিধি-বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অধিকাংশ যুক্তবাদীদের অভিমত এরূপ। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪৫]

قَوْلُهُ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ : "আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদান"-এর মর্মকথা : এর আগের আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি ও নিজেদের ওয়াদা অঙ্গীকার স্মরণ করতে আদেশ করা হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে, কেবল মুখে স্মরণ করা নয়, বরং কার্যকর পন্থায় তার প্রমাণ দিতে হবে। এ আয়াতে এরই প্রতি সজাগ করা হয়েছে যে, তোমরা যদি মহান আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ ও নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার বিস্মৃত না হয়ে থাক, তবে তোমাদের কর্তব্য সেই সত্যিকার অনুগ্রকারীর হক আদায় ও নিজেদের প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করার নিমিত্ত সদাসর্বদা কোমর বেঁধে থাকা এবং নিয়ামতের প্রকৃত মালিক মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে কোনো আদেশ আসামাত্র তা তা'মীল করার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। সেই সাথে মহান আল্লাহর হকের সঙ্গে মাখলুকের হক আদায়েও পূর্ণ যত্নবান থাকা। قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ -এর মাঝে হক্কুল্লাহ এবং شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ -এর মাঝে হক্কুল ইবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পারার শেষেও এ রকমের একটি আয়াত আছে। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, সেখানে بِالْقِسْطِ -কে لِلّٰهِ -এর আগে আনা হয়েছে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, সেখানে বহু দূর হতে হক্কুল ইবাদের আলোচনা চলে আসছিল, আর এখানে প্রথম থেকেই

হক্কুল্লাহর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ হিসেবে সেখানে بِالْقِسْطِ -কে এবং এখানে لِلّٰهِ -কে প্রথমে আনা স্থানোপযোগী হয়েছে, তাছাড়া এখানে বিদ্বিষ্ট শত্রুর সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। তাই ইনসাফের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আর সূরা নিসায় রয়েছে পছন্দনীয় বস্তুর উল্লেখ। তাই সেখানে সবচেয়ে প্রিয়তমের তথা মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করানো হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা ৪৫]

قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا : সুবিচার ও ন্যায়-নীতি : বস্তুত হক আদায়ের দ্বিতীয় নাম হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। اَلَّا تَعْدِلُوْا - اِعْدِلُوْا বা সুবিচার না করা; সুবিচার করবে; অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে প্রথমে বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফী করতে মানা করা হয়েছে; পরে বলা হচ্ছে: পরিপূর্ণ ইনসাফ কায়েম করবে। شَنَاٰنُ قَوْمٍ বা কোনো কাওমের প্রতি বিদ্বেষ। মুসলমান হওয়ার কারণে যে কাওমের সাথে মুসলমানদের দুশমনী বা শত্রুতা হবে; উল্লেখ্য যে, তারা হবে ইসলামের দুশমন কাফের সম্প্রদায়। সুতরাং বলা হলো: দুশমনদের হক আদায়েও যেন ত্রুটি না করা হয়। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! দুনিয়ার এমন কোন আইন পাওয়া যাবে, সেখানে তাদের শত্রু ও বিদ্রোহীদের হক আদায়ে এমন উদারতা দেখিয়েছে। ফকীহগণ আয়াত থেকে এরূপ [নির্দেশ] বের করেছেন যে, কাফেরদের কুফরি তাদেরকে এ সুযোগ থেকে মাহরূম করনি, তাদের হক পরিবর্তন করা যাবে; বরং তাদের হক আদায় করতে হবে। আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরের কুফরি তাদের উপর ইনসাফ করতে বাধা দেয় না। আর যখন কাফেরের সাথে ইনসাফ করা জরুরি, তখন কুফরি থেকে কম স্তরের জিনিস, তথা ফাসেক ও বেদয়াতীদের সাথে কেন ইনসাফ করা যাবে না? যখন বিদ্রোহী ও খোদাদ্রোহীদের সাথে ইনসাফ করা জরুরি, তখন তাওহীদ ও রিসালাত স্বীকারকারীদের সাথে ইনসাফ করা আরো অধিক জরুরি নয় কী? বড় বড় ব্যাখ্যাকারগণ বার বার এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এতে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে যে, কাফের– যারা আল্লাহর শত্রু, তাদের সাথে ইনসাফ করার নির্দেশ যদি এরূপ হয়, তবে মুমিনদের সাথে কি ধরনের ইনসাফ করা প্রয়োজন। আয়াতে মুমিনদের হক ইনসাফের সাথে আদায়ের নির্দেশ আছে, যখন আল্লাহ কাফেরদের প্রতিও ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। ভীষণ ক্রোধের সময় কে নিজেকে সংযত রাখতে পারে। এখানে এ ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমাদের অন্তরে যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, তা যেন তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ না করে। আদল ও ইনসাফ সর্বাবস্থায় যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্ররোচিত করার অর্থ হলো– মুশরিকদের প্রতি তোমাদের ক্রোধ যেন ইনসাফ বহির্ভূত না হয়; এমতাবস্থায় তোমরা তাদের সাথে এমন কাজ করে বসবে, যা বৈধ নয়। প্রথমে তাদেরকে এমন বিদ্বেষ পরিহার করতে বলা হয়েছে, যা ইনসাফ না করতে উদ্বুদ্ধ করে, পরে বাক্যের ধারা পরিবর্তন করে তাদেরকে স্পষ্টভাবে 'আদল' বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, কাজের ব্যাপারে স্বভাবের চাহিদা মতো আমল না করা একটি মুজাহাদা। এখানে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
–[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪৮]

قَوْلُهُ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى : তাকওয়ার অর্থ ও অর্জনের উপায় : যেসব জিনিস শরিয়তে নিষিদ্ধ বা কোনো প্রকারের ক্ষতিকারক তা পরিহার করে চলার দ্বারা মানব মনে যে এক জ্যোতির্ময় অবস্থা বলিয়ান হয়ে উঠে তার নাম তাকওয়া। তাকওয়া অর্জন করার বহু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উপায় উপকরণ আছে। যাবতীয় সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রকে তাকওয়া হাসিলের মাধ্যম ও উপকরণরূপে গণ্য করা যায়। তবে আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদল ও কিসত অর্থাৎ দোস্ত ও দুশমনের প্রতি সমান ইনসাফ করা এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও শত্রুতার ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, এ মহৎ গুণই তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও নিকটতম মাধ্যমসমূহের অন্যতম। এজন্যই বলা হয়েছে– هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -এর আদল [ন্যায়পরায়ণতা], যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। এর চর্চা দ্বারা দ্রুত তাকওয়ার অবস্থা অর্জিত হয়।
–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৪৭]

আদল ইনসাফ মুত্তাকীদের সবচেয়ে বড় গুণ : যেই আদল ও ইনসাফকে কোনো রকমের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ব্যাহত করতে না পারে এবং যা অবলম্বন করলে মানুষের জন্য মুত্তাকী হওয়া সহজ হয়ে যায়, তা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর শাস্তির চিন্তা اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -এর বিষয়বস্তুকে পুন:পুন: স্মরণ করার দ্বারা এই ভীতি জাগরিত হয়। যখন কোনো মুমিনের অন্তরে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকবে যে, আমার কোনো প্রকাশ্য ও গোপন কাজ মহান আল্লাহর অগোচরে থাকে না। তখন মহান আল্লাহর ভীতিতে তার অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকবে, যার ফলশ্রুতিতে যেসব ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফের পথ অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য গোলামের মতো প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে সে যে প্রতিদান লাভ করবে তা সামনের وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৪৮]

পরীক্ষার নম্বর, সনদ, সার্টিফিকেট ও নির্বাচনে ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত : পরিশেষে এখানে আরেকটি বিষয় জানা জরুরি। তা এই যে, আজকাল 'শাহাদাত' তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মুকদ্দমায় কোনো বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত যদি ডাক্তার কোনো রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকরি করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গুনাহ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়া একটি শাহাদাত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশি নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধী হয়ে যাবে। এমনিভাবে আইন সভা ও কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হয়ে থাকে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হারজিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনো পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়। কখনো চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনো সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনো চিন্তা করে না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে যাকে শাফাআত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কুরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, তাকে সুপারিশকৃত ব্যক্তির পুণ্য থেকে অংশ দেওয়া এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটপ্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোটদাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সেই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা এ ওকালতি এমন সব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরিক। কাজেই কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে বসবে।

মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। যথা– ১. সাক্ষ্যদান। ২. সুপারিশ করা এবং ৩. সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমন বিরাট ছওয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশত অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৫৯-৬১]

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا : এর দ্বারা পূর্ববর্তী দলের বিপরীতে সেই দলের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা কুরআন মাজীদের এমন সব সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নিদর্শনকে অস্বীকার করে, সত্য পথের সঠিক সন্ধান দেওয়ার জন্য যা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৫০]

قَوْلُهٗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ : অর্থাৎ জাহান্নামের অধিবাসী। এখানে অধিবাসী বলতে কিছুদিনের জন্য নয়; বরং তারা চিরদিন এবং চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৫১]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا الخ : সূরা মায়িদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন- وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ। এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ শরিয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। এ কারণেই اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরিউক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলাকৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে, একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তাফসীরবিদরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকে হযরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত আছে, কোনো এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নিচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হাত করে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল, এখন আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন, আল্লাহ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ বাক্য বিনিময় হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারি কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের ডেকে ঘটনা শোনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনো তাঁর পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না।

কোনো কোনো সাহাবী থেকে এ আয়াতের তাফসীরে প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মকদ্দমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নযীরের ইহুদিদের বস্তিতে যান। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহশ নামক এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পেছনে দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গাম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

এসব ঘটনায় কোনো বৈপরীত্য নেই, সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাজতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- اِتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ; এতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাজতের আসল কারণ হচ্ছে, তাকওয়া তথা আল্লাহর উপর নির্ভর করা। যে কোনো জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে এভাবে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হবে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৬৩, ৬৪]

অনুবাদ :

٧. وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمِيْثَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ لا عَاهَدَكُمْ عَلَيْهِ إِذْ قُلْتُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ بَايَعْتُمُوْهُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ز فِيْ كُلِّ مَا تَأْمُرُ بِهٖ وَتَنْهٰى مِمَّا نُحِبُّ وَنَكْرَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط فِيْ مِيْثَاقِهٖ أَنْ تَنْقُضُوْهُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ فَبِغَيْرِهٖ أَوْلٰى .

৭. ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ তা স্মরণ কর। এবং তোমরা যখন রাসূল ﷺ -কে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণের সময় বলেছিলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে যে নির্দেশ দেন এবং আমাদের প্রিয় ও অপ্রিয় যে বস্তু আপনি নিষেধ করেন তা সম্পূর্ণ মেনে নিলাম তখন তিনি তোমাদেরকে যে চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন, যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলেন তাও স্মরণ কর। এবং আল্লাহকে তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিষয়ে ভয় কর। বক্ষে যা আছে অর্থাৎ অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ে তো তিনি আরো বেশি অবহিত হবেন।

٨. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ قَائِمِيْنَ لِلّٰهِ بِحُقُوْقِهٖ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ز بِالْعَدْلِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ شَنَاٰنُ بُغْضُ قَوْمٍ أَيِ الْكُفَّارِ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا ط فَتَنَالُوْا مِنْهُمْ لِعَدَاوَتِهِمْ إِعْدِلُوْا قف فِي الْعَدُوِّ وَالْوَلِيِّ هُوَ أَيِ الْعَدْلُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; তার হকসমূহের বিষয়ে সুদৃঢ় থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার না করার ব্যাপারে উত্তেজিত না করে, প্ররোচিত না করে এবং তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তাদের কোনো অন্যায় ক্ষতি করো না। শত্রু ও মিত্র সকলের প্রতি সুবিচার করবে, এটি অর্থাৎ এ সুবিচার করা তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহর তার খবর রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদের তার প্রতিফল দান করবেন।

٩. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا وَعْدًا حَسَنًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ .

৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত।

١٠. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ .

১০. আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাই প্রজ্বলিত জাহান্নামের অধিবাসী।

١١. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ هُمْ قُرَيْشٌ أَنْ يَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ لِيَفْتِكُوْا بِكُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَعَصَمَكُمْ مِمَّا أَرَادُوْا بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

১১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় অর্থাৎ কুরাইশগণ তোমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতে চাইলে অর্থাৎ অকস্মাৎ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে হাত চালাতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের সংযত করেছিলেন। তোমাদের বিরুদ্ধে তারা যা করতে চেয়েছিল তা হতে তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেন। আল্লাহকে ভয় কর আর আল্লাহরই প্রতিই বিশ্বাসীগণ নির্ভর করুক।

١٢. وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ج بِمَا يُذْكَرُ بَعْدُ وَبَعَثْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اَقَمْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط مِنْ كُلِّ سِبْطٍ نَقِيْبٌ يَكُوْنُ كَفِيْلًا عَلٰى قَوْمِهٖ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ تَوْثِقَةً عَلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ط بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ نَصَرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا بِالْاِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِهٖ لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقِ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ اَخْطَاَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالسَّوَاءُ فِي الْاَصْلِ الْوَسَطُ ـ

১২. আল্লাহ নিম্নবর্ণিতভাবে বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। بَعَثْنَا -এখানে নাম পুরুষ হতে প্রথম পুরুষে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। অর্থ– প্রেরণ করেছিলাম। প্রতিটি উপগোত্রের একেকজন নেতা ছিল। এরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব গোত্রের পক্ষ হতে এ অঙ্গীকার পূরণের জামিনদার ছিল। বিষয়টি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল। আর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, আমি সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি তোমরা لَئِنْ -এর لَامْ -টি এখানে قَسَمٌ বা শপথ অর্থবোধক। সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর, তাদেরকে সম্মান কর, সাহায্য কর এবং তাঁর পথে ব্যয় করত আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই তোমাদের দোষ মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এর এ অঙ্গীকারের পরও কেউ যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে তবে সে নিশ্চয় সরল পথ হারাল। সত্য পথের বিষয়ে ভুল করে ফেলল। اَلسَّوَاءُ -এর মূল অর্থ হলো, মাঝামাঝি।

١٣. فَبِمَا نَقْضِهِمْ قَالَ تَعَالٰى فِيْمَا نَقْضِهِمْ مَا زَائِدَةٌ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ اَبْعَدْنَاهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج لَا تَلِيْنُ لِقَبُوْلِ الْاِيْمَانِ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ الَّذِيْ فِي التَّوْرٰىةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَغَيْرِهٖ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ لا الَّتِيْ وَضَعَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا اَيْ يُبَدِّلُوْنَهٗ ـ

১৩. কিন্তু তারা উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে مَا : এটা এখানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি। আমার রহমত হতে বিদূরিত করে দিয়েছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। ফলে ঈমান গ্রহণের জন্য তা আর কোমল হয় না। তারা তাওরাতে রাসূল ﷺ -এর বিবরণ সম্বলিত ও অন্যান্য বিষয়ে যে শব্দাবলি ছিল সেগুলো স্থানচ্যুত করে। অর্থাৎ যে অর্থে আল্লাহ তা'আলা তা রক্ষিত করেছিলেন সেটাকে পরিবর্তন করে।

وَنَسُوْا تَرَكُوْا حَظًّا نَصِيْبًا مِّمَّا ذُكِّرُوْا أُمِرُوْا بِهٖ ج فِي التَّوْرٰىةِ مِنْ اِتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَزَالُ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَطَّلِعُ تَظْهَرُ عَلٰى خَائِنَةٍ اَيْ خِيَانَةٍ مِّنْهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَغَيْرِهٖ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ مِمَّنْ اَسْلَمَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ ـ

এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল নির্দেশিত হয়েছিল সেটার এক অংশ ভুলে গিয়েছে। অর্থাৎ তাওরাতে রাসূল কারীম ﷺ -এর অনুসরণ সম্পর্কে যা নির্দেশ করা হয়েছিল তা পরিহার করে বসেছে। তুমি এখানে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। সর্বদা তদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত সকলকেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পারে, এদের মাঝে তার প্রকাশ ঘটতে দেখবে। خَائِنَةٍ : এটা এখানে مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল অর্থে ব্যবহৃত এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে خِيَانَةٍ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। এদেরকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করার বিধানটি অস্ত্র ধারণ সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে।

١٤. وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ كَمَا اَخَذْنَا عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ الْيَهُوْدِ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فِي الْاِنْجِيْلِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَغَيْرِهٖ وَنَقَضُوا الْمِيْثَاقَ فَاَغْرَيْنَا اَوْقَعْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط بِتَفَرُّقِهِمْ وَاخْتِلَافِ اَهْوَائِهِمْ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تُكَفِّرُ الْاُخْرٰى وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ فِي الْاٰخِرَةِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ ـ

১৪. যারা বলে 'আমরা খ্রিস্টান' مِنَ الَّذِيْنَ এটা اَخَذْنَا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যেমন ইহুদি সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু ইঞ্জীলে ঈমান আনয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গেছে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসেছে। [সুতরাং] পরস্পরে অনৈক্য ও স্বার্থের সংঘাতের ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি, সৃষ্টি করে রেখেছি। ফলে, এদের একদল অপর দলকে কাফের বলে অভিহিত করে থাকে। তারা যা করত শীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে পরকালে তা জানিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন।

١٥. يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى قَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلُنَا مُحَمَّدٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ تَكْتُمُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ كَاٰيَةِ الرَّجْمِ وَصِفَتِهٖ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط مِنْ ذٰلِكَ فَلَا يُبَيِّنُهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ اِلَّا افْتِضَاحُكُمْ قَدْ جَاۤءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَّكِتٰبٌ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ لا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ـ

১৫. হে কিতাবীগণ! অর্থাৎ হে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়! আমার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের নিকট আগমন করেছেন। তোমরা কিতাবের অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলের যা লুকিয়ে রাখতে গোপন রাখতে যেমন রাজম অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করত হত্যা করার বিধান এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহ সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং তার অনেকাংশ উপেক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশ করার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ না থাকে তবে কেবল তোমাদের লজ্জা দেওয়ার জন্য তিনি তা প্রকাশ করেন না। আল্লাহর নিকট হতে এ জ্যোতি: অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ ও স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন এক কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট এসেছে।

١٦. يَّهْدِيْ بِهِ اَيْ بِالْكِتَابِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ بِاَنْ اٰمَنَ سُبُلَ السَّلٰمِ طُرُقَ السَّلَامَةِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ بِاِذْنِهٖ بِاِرَادَتِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ.

১৬. ঈমান আনয়ন করত যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এটা দ্বারা অর্থাৎ এ কিতাব দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিতে স্বত:প্রণোদিতভাবে অন্ধকার হতে অর্থাৎ কুফরি হতে বের করে আলোর দিকে অর্থাৎ ঈমানের দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে দীনে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেন। سُبُلَ السَّلَامِ অর্থ– শান্তির পথসমূহ।

١٧. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط حَيْثُ جَعَلُوْهُ اِلٰهًا وَهُمُ الْيَعْقُوْبِيَّةُ فِرْقَةٌ مِّنَ النَّصَارٰى قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ اَيْ يَدْفَعُ مِنَ عَذَابِ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ط اَيْ لَا اَحَدَ يَمْلِكُ ذٰلِكَ وَلَوْكَانَ الْمَسِيْحُ اِلٰهًا لَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَاءَهٗ قَدِيْرٌ.

১৭. যারা বলে, মারইয়াম তনয় মসীহ-ই আল্লাহ অর্থাৎ তাকে যারা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছেই। এরা হলো ইয়াকুবিয়্যা নামে খ্রিস্টানদের একটি দল বল, মারইয়াম তনয় মসীহ, তার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেওয়ার শক্তি কার আছে? অর্থাৎ তাঁর আজাবকে প্রতিহত করার ক্ষমতা আর কার আছে? না, কারো সে শক্তি নেই। মসীহ যদি ইলাহ হতো তবে নিশ্চয় তার সে ক্ষমতা থাকতো। আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে অর্থাৎ যাতে চান তাতে শক্তি রাখেন।

١٨. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى اَيْ كُلٌّ مِّنْهُمَا نَحْنُ اَبْنٰٓؤُ اللّٰهِ اَيْ كَاَبْنَائِهٖ فِى الْقُرْبِ وَالْمَنْزِلَةِ وَهُوَ كَاَبِيْنَا فِى الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاَحِبَّآؤُهٗ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط اِنْ صَدَقْتُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَلَا يُعَذِّبُ الْاَبُ وَلَدَهٗ وَلَا الْحَبِيْبُ حَبِيْبَهٗ وَقَدْ عَذَّبَكُمْ فَاَنْتُمْ كَاذِبُوْنَ.

১৮. ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই বলে– আমরা আল্লাহর পুত্র অর্থাৎ নৈকট্য ও মর্যাদায় আমরা তাঁর পুত্রের মতো আর স্নেহ ও বাৎসল্যে তিনি আমাদের পিতার মতো ও তাঁর প্রিয়। হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বল, তোমরা যদি এ কথায় সত্য হয়ে থাক, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? কেননা পিতা তার পুত্রকে এবং প্রিয়জন তার প্রেমাস্পদকে তো আজাব দেয় না, অথচ তিনি তোমাদের বহুবার আজাব দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা মিথ্যাবাদী।

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ خَلَقَ ط مِنَ الْبَشَرِ لَكُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبَهُ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ .

বরং আল্লাহ যাদের অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে তোমরাও মানুষ। সুতরাং তাদের জন্য যা তোমাদের জন্য তা-ই, আর তাদের উপর যা বর্তায় তোমাদের উপরও তা-ই বর্তাবে। তিনি যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যাকে শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এর উপর কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সর্বাভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন। اَلْمَصِيْرُ অর্থ– প্রত্যাবর্তন স্থল।

١٩. يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا مُحَمَّدٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ شَرَائِعَ الدِّيْنِ عَلٰى فَتْرَةٍ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الرُّسُلِ اِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيْسٰى رَسُوْلٌ وَمُدَّةُ ذٰلِكَ خَمْسُمِائَةٍ وَتِسْعٌ وَّسِتُّوْنَ سَنَةً لِ اَنْ لَا تَقُوْلُوْا اِذْ عُذِّبْتُمْ مَا جَاءَنَا مِنْ زَائِدَةٌ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط فَلَا عُذْرَ لَكُمْ اِذًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُكُمْ اِنْ لَمْ تَتَّبِعُوْهُ .

১৯. হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণ বন্ধ থাকার পর অর্থাৎ তাতে বিরতির পর আমার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের নিকট আগমন করেছেন। সে তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্মের বিধানসমূহ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে যাতে তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হওয়ার সময় এ কথা বলতে না পার যে, কোনো সংবাদ বহনকারী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেনি। اَنْ -এর পূর্বে একটি হেতুবোধক لَامْ উহ্য রয়েছে। এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী এসেছে। مِنْ بَشِيْرٍ -এর مِنْ -টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। সুতরাং এখন আর তোমাদের কৈফিয়তের কিছু নেই। রাসূল ﷺ ও ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাঝে কোনো নবী আসেননি। আর এর মুদ্দত ছিল, পাঁচশত উনসত্তর বছর। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তোমরা যদি তাঁর অনুসরণ না কর তবে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানও এর [আল্লাহর শক্তির] অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَقِيْبٌ : বহুবচন, نُقَبَاءُ অর্থ– নেতা, প্রতিনিধি, জাতির অবস্থা পর্যবক্ষেণকারী। এটি فَعِيْلٌ -এর ওজনে فَاعِلٌ -এর অর্থে।

قَوْلُهُ لَئِنْ اَقَمْتُمْ : لَامْ হরফটি কসম উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিতকারী। اِنْ হলো شَرْط -এর জন্য। তাকদীরী ইবারত হবে– وَاللّٰهِ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ আর لَاُكَفِّرَنَّ হলো جَوَاب قَسَمْ যা جَوَاب شَرْط -এর স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ عَزَّرْتُمُوْهُمْ : تَعْزِيْرٌ থেকে مَاضِى جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ্ وَاوْ হলো اِشْبَاعٌ -এর জন্য। অর্থ– তোমরা দুশমনের মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য করবে।

قَوْلُهُ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ : এটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য। ইহুদিদের হৃদয়ের রূঢ়তা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ خِيَانَةٍ : ইশারা করা হয়েছে যে, خَائِنَةٍ শব্দটি فَاعِلٌ -এর ওজনে মাসদার। যেমন আ'মাশের কেরাতে شَافِيَةٌ ও عَاقِبَةٌ শব্দদ্বয়ে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ضَائِنَةٍ -এর স্থলে خِيَانَةٍ পড়েছেন। এছাড়াও আয়াতের অন্যান্য শব্দ তথা فَاعْفُ عَنْهُمْ -ও এর দিকে ইঙ্গিতবহন করে। এবং مِنْهُمْ

قَوْلُهُ بِاٰيَةِ السَّيْفِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো এ আয়াত- اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

قَوْلُهُ اَغْرَيْنَا : اَيْ اَلْصَقْنَا وَاَلْزَمْنَا শব্দটি اِغْرَاءٌ থেকে مَاضِىْ جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ্। অর্থ- আমরা ফেলে দিয়েছি, জুড়ে দিয়েছি।

قَوْلُهُ بَيْنَهُمْ : هُمْ যমীর নাসারাদের বিভিন্ন ফেরকার দিকে ফিরেছে। আর তারা হলো- ১. نَسْطُوْرِيَّةْ যাদের আকীদা হলো, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। ২. يَعْقُوْبِيَّةْ : যাদের বিশ্বাস হলো, হযরত ঈসা (আ.)-ই খোদা। ৩. مَلْكَانِيَّةْ : যাদের বিশ্বাস হলো খোদা হলো তিন জনের সমষ্টি।

قَوْلُهُ كَاٰيَةِ الرَّجْمِ : এটি ইহুদিদের كِتْمَانٌ বা কিতাবের বিধান গোপন করার উদাহরণ। আর নাসারাদের গোপন করার উদাহরণ হলো مُبَشِّرًا مِّنْ بَعْدِهٖ اسْمُهٗ اَحْمَدُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الخ : হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র হতে বারজন প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। তাফসীরবেত্তাগণ তাওরাতের বরাতে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ গোত্রকে অঙ্গীকার পূরণে তাকিদ করা ও তাদের অবস্থার তত্ত্বাবধান করা। কৌতূহলের ব্যাপার হলো, হিজরতের পূর্বে আকাবার রজনীতে মদীনা শরীফের আনসারগণ যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন তখন তাদের মধ্যে দ্বাদশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ বারজনই আপন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মহানবী ﷺ -এর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ -এ উম্মত সম্পর্কে যে খলীফাগণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাদের সংখ্যাও বনী ইসরাঈলের উক্ত প্রতিনিধিবর্গের সমান। তাফসীরবেত্তাগণ তাওরাত হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বলেছিলেন, আমি তোমার বংশধরগণের মধ্যে বারজন নেতা সৃষ্টি করব। সম্ভবত এর দ্বারা সেই দ্বাদশ খলীফার কথাই বোঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ জাবের ইবনে সামুরার হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ৫৩]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছিল। এ আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও তার পরিণতির আলোচনা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি ভয়াবহ হয়ে থাকে।

ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ : উক্ত আয়াতে ইহুদিদের দুটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যথা-

১. হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরে অবস্থানকালীন সময়ে বনী ইসরাঈল শাম থেকে হিজরত করে মিশরে বসবাস করা শুরু করে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে ফেরাউন ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বনী ইসরাঈলকে নিয়ে শামে চলে আসুন। যেহেতু আদ জাতির কিছু অবশিষ্ট লোক শাম দখল করেছিল তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন যুদ্ধ করে তা মুক্ত করে সেখানে বসবাস করুন। আদ জাতির মধ্যে আমালিক নামক একজন লোক ছিল। শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারীরা যেহেতু তার বংশধর ছিল তাই তাদেরকে আমালিকা বলা হয়। আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকজন বেশ উঁচু-লম্বা ও দুর্ধর্ষ ছিল। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের বারো কবীলা থেকে বারো জন লোক নির্বাচন করেছিলেন, যাদেরকে নিজ কবীলার ধর্মীয় এবং আখলাকী তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যখন তিনি শামের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন এই বারোজনকে আগে পাঠিয়ে দিলেন আমালিকাদের অবস্থা জেনে আসার জন্য। যাওয়ার সময় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমালিকার শৌর্য-বীর্য ও শক্তিমত্তার এমন কথা এসে বনী ইসরাঈলের কাছে বর্ণনা করবে না, যা শুনে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। ফলে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। আমলিকার হাল অবস্থা জেনে এসে বারোজনের মধ্যে দশজনই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। নিজের কবীলার কাছে আসল অবস্থা ফাঁস করে দেয়। যার কারণে বনী ইসরাঈল মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যুদ্ধে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের সে অঙ্গীকার ভঙ্গের বর্ণনা এসেছে।

২. দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল তাওরাতের বিধান মান্য করার ব্যাপারে। এতে নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাকার বন্দেগী অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তারা সেগুলো পালন করেনি। সুরা আলে ইমরানে সেসবের বিবরণ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে পূর্বের সে অঙ্গীকার পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, উক্ত অঙ্গীকার মোতাবেক ইহুদিদের প্রতি হযরত ঈসা এবং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর অনুসরণ আবশ্যক ছিল। কিন্তু তারা তা পূরণ করেনি। প্রকারান্তরে তারা তাওরাতের

অনুসারী নয়। কেননা তাওরাতের যে সকল আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) ও আখেরী নবী ﷺ -এর গুণাবলি ও আলামত বর্ণনা করা হয়েছিল সেগুলো তারা পাল্টে ফেলেছে। শাব্দিক ও অর্থগত তাহরীফ বা বিকৃতি ঘটিয়েছে। –[জামালাইন ২/১৭৩, ১৭৪]

قَوْلُهُ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ : এ সম্বোধন হয়তো বার নেতাকে করা হয়েছে, তখন অর্থ হবে, তোমরা নিজ দায়িত্ব পালন কর, আমার সাহায্য ও অনুগ্রহ তোমাদের সাথে রয়েছে; সমস্ত বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সাথে। অর্থাৎ তোমরা কখনই আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। তোমরা প্রকাশ্যে ও বা গোপনে যা কিছু করবে তা সদা-সর্বত্র আমি দেখছি। কাজেই, যা করবে সাবধানে করবে। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-৫৪]

আল্লাহর সঙ্গে থাকার ধারণা খোদাভীরু একটি জাতির জন্য কত দৃঢ় মনোবল সৃষ্টির সহায়ক, তা বলাই বাহুল্য। এরপর আত্মা শক্তিশালী হয় এবং প্রশান্তি লাভ করে। এ ধারণার পর পরাজয়ের কোনো সম্ভাবনাই সামনে আসে না। আজ যদি কোনো 'ভাইসরয়' সাধারণ কোনো নাগরিককে বলে: 'ঘাবড়াবে না, আমি তোমার সাথে আছি' এমতাবস্থায়, তার শক্তিসাহস কতই না বৃদ্ধি পাবে! বস্তুত এখানে সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, মালিকুল মুলক, আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ যখন তাঁর সাথে থাকার কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তখন এর চাইতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্তর আর কি হতে পারে? এটা এক ধরনের ব্যাখ্যা। এখন অন্যরূপ তাফসীর হলো– যখন আল্লাহ সঙ্গী হিসেবে থাকেন, তখন কোনো বান্দা কি গুনাহ করতে পারে? নিজের চাইতে শ্রেয় বা বড় কোনো তদারককারী যখন উপস্থিত থাকেন, তখন তার সামনে আমরা কোনোরূপ ভুলত্রুটি ও অপরাধমূলক কিছু করতে সাহসী হই না। এমতাবস্থায় সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন সঙ্গে থাকেন, এরপরও কি কোনোরূপ অন্যায়-অপকর্ম করা যায়? বস্তুত গুনাহে ভীতি প্রদর্শন বা নেক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ যাই হোক না কেন, আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন। এরূপ ধারণা করা খুবই উপকারী মহৌষধ। সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, مَعِيَّتْ বা সঙ্গে থাকার অর্থ দৈহিক সঙ্গে থাকা নয়, যেমন বড়দেহী সৃষ্টজীব একে অপরের সাথে মেলামেশা করে; বরং এই সঙ্গতা হচ্ছে জ্ঞান, শক্তি ও সাহায্যের আবেষ্টনীর। অর্থাৎ আমি তোমাদের সঙ্গী জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে। আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনি এবং তোমাদের কাজকর্ম দেখি। আর তোমাদের হৃদয়ের গোপন খবরও আমি জানি। তোমাদের এসব কাজের বিনিময় দানে আমি সক্ষম। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা এবং আবেষ্টনী দ্বারা। আর এ মা'ইয়্যাতের (مَعِيَّتْ) দ্বারা বুঝা যায় বড় ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা। অর্থাৎ আমি তোমাদের সাহায্যকারী ও উপকারী। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৫৮]

قَوْلُهُ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর পর যত রাসূলই আসবেন তোমরা তাঁদের বিশ্বাস করবে, তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। প্রাণ দিয়েও এবং অর্থ সম্পদ দিয়েও। –[তাফসীরে উসমানী, টীকা-৫৫]

قَوْلُهُ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : মহান আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার তাৎপর্য : আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার অর্থ, তাঁর দীন ও তাঁর নবীর সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা। ঋণদাতার আশা থাকে, তার টাকা তার হাতে ফিরে আসবে। গ্রহীতাও ঋণ পরিশোধকে নিজ দায়িত্ব মনে করে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহরই দেওয়া জিনিস থেকে যা তাঁর পথে ব্যয় করা হবে তা কখনো হারিয়ে যাবে না, কিংবা হ্রাসও পাবে না। আল্লাহ তা'আলা কোনো চাপের মুখে নয়; বরং নিছক নিজের অনুগ্রহ বশেই এটা নিজ দায়িত্বে জরুরি করে নিয়েছেন যে, সে জিনিস বিরাট প্রবৃদ্ধির সাথে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৫৬]

ইরশাদ হচ্ছে– وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহকে ঋণদান কর উত্তম ঋণ।" উত্তম ঋণের অর্থ ঐ ঋণ, যা আন্তরিকতা সহকারে দান করা হয় যাতে কোনো জাগতিক স্বার্থ জড়িত না থাকে। আল্লাহর পথে প্রিয়বস্তু দান করা এবং অকেজো ও বেকার বস্তু দান না করাও উত্তম ঋণের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে ঋণদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা ঋণকে আইনত, সাধারণের প্রথাগত এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে অবশ্য পরিশোধযোগ্য মনে করা হয়। এমনিভাবে এরূপ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে যে, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে। স্বতন্ত্রভাবে ফরজ জাকাত উল্লেখ করার পর এখানে উত্তম ঋণ উল্লেখ করাতে বোঝা যায় যে, উত্তম ঋণ বলে অন্যান্য সদকা-খয়রাতকে বোঝানো হয়েছে। এতে আরো বোঝা যায় যে, শুধু জাকাত প্রদান করেই মুসলমান আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। জাকাত ছাড়াও কিছু আর্থিক দায়িত্ব বহন করা তার উপর জরুরি। কোথাও মসজিদ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা এবং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় বহন না করলে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য। পার্থক্য এতটুকু যে, জাকাত ফরজে আইন আর এগুলো হলো ফরজে কেফায়া।

ফরজে কেফায়ার অর্থ এই যে, সমাজের কিছু লোক অথবা কোনো দল এসব প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে অন্য সব মুসলমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। আর যদি কেউ এসব প্রয়োজন না মিটায়, তবে সবাই গুনাহগার হয়। আজকাল দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসাসমূহের যে দুরবস্থা তা একমাত্র তারাই জানে, যারা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুসলমানরা জানে যে, জাকাত প্রদান করা তাদের উপর ফরজ, তা জানা সত্ত্বেও কম সংখ্যকই পুরোপুরি হিসাব করে পুরোপুরি জাকাত প্রদান করে। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, এরপর তাদের কোনো আর দায়িত্ব নেই। তারা মসজিদ এবং মাদরাসার প্রয়োজনেই জাকাতের অর্থ পেশ করে। অথচ জাকাত ছাড়াই এসব ফরজ মুসলমানদের দায়িত্ব আরোপিত। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আরো অনেক আয়াত বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

অঙ্গীকারের প্রধান দফা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা অঙ্গীকার মেনে চললে প্রতিদানে তোমাদের অতীত সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে চিরস্থায়ী শান্তি ও আরামের জান্নাতে রাখা হবে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি কেউ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তবে সে স্বচ্ছ ও সরল পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হয়। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ৩৬৮]

قَوْلُهُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ : বনী ইসরাঈল কোনো কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেনি। এরূপ দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ় অঙ্গীকারের পরও যারা নিজেদেরকে মহান আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা হিসেবে প্রমাণ না দিয়ে বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে লেগে পড়ে, তারা সাফল্য ও মুক্তির সরল পথ হারিয়ে ফেলেছে। বলা যায় না, তারা ধ্বংসের কোন গহ্বরে নিপতিত হবে। এখানে যেসব বিষয়ে বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সালাত আদায়, জাকাত প্রদান, নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং জানমাল দিয়ে তাদের সাহায্য করা। এর মধ্যে প্রথমটি দৈহিক ইবাদত, দ্বিতীয়টি বৈষয়িক, তৃতীয় আত্মিক ও মৌখিক আর চতুর্থটি প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়টিরই নৈতিক সম্পূরক। এগুলোর উল্লেখ দ্বারা যেন ইঙ্গিত করে দেওয়া হলো যে, জানমাল, দেহমন প্রতিটি বিষয় দ্বারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দাও। কিন্তু বনী ইসরাঈল বেছে বেছে প্রতিটির বিপরীত আচরণ করল। কোনো কথা ও অঙ্গীকারে স্থির থাকল না। এ বিশ্বাস হননের যে পরিণাম তাদের ভোগ করতে হয়, তা সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে উসমান : টীকা-৫৭]

قَوْلُهُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ الخ : অর্থাৎ "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোনো কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফফিফীনে رَانَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ "কুরআনি আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বলেন, মানুষ প্রথমে যখন কোনো পাপকাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কালো দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপকাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গুনাহের কারণে একটি কালো দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মতো হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং তাতে কোনো জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে, পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোনো সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا কোনো পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না; বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা যা সে ইহকালেই লাভ করে। কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন– إِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَإِنَّ جَزَاءَ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا অর্থাৎ পুণ্যকাজের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিদান এই যে, এরপর সে আরো পুণ্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। এমনিভাবে পাপ কাজের একটি তাৎক্ষণিক সাজা এই যে, এক পাপের পর অন্তর আরো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, পুণ্যকাজ পুণ্যকাজকে এবং পাপকাজ পাপকাজকে আকর্ষণ করে।

বনী ইসরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহর কালামকে তারা স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে। কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও একথা কিছু স্বীকার করে। –[তাফসীরে উসমানী]

এ আত্মিক সাজার ফলশ্রুতি এই যে, وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা দ্বারা লাভবান হওয়ার কথা ভুলে গেল। এরপর আল্লাহ বলেন, তাদের এ সাজা এমনভাবে তাদের গলার হার হয়ে গেল যে, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আপনি সর্বদাই তাদের কোনো না কোনো প্রতারণার বিষয় অবগত হতে থাকবে।
–[মা'আরিফুল কুরআন -৩/৭০,৭১]

قَوْلُهُ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ : অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ফেরেববাজীর ধারা আজও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণেই আপনি সর্বদা তাদের কোনো না কোনো প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে চলেছেন। –[তাফসীরে উসমান : টীকা-৬৩]

قَوْلُهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ : অল্প কয়েকজন ছাড়া। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) প্রমুখ। এঁরা পূর্বে আহলে কিতাব ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান। –[মা'আরিফুল কুরআন ৩/৭১]

قَوْلُهُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ : এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের যেসব কুকীর্তি ও অসচ্চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাদেরকে কাছে আসতেও নিষেধ করতে পারতেন। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ **অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের কুকীর্তি মার্জনা করুন। তাদের থেকে দূরে সরে থাকুন।** কেননা আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। **উদ্দেশ্য এই যে, তাদের এসব অবস্থা সত্ত্বেও আপনি স্বভাবগত চাহিদা** অনুযায়ী পরিচালিত হবেন না। অর্থাৎ ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবেন না তথা তাদের কঠোরতা ও অচেতনতার কারণে যদিও ওয়াজ এবং উপদেশও কার্যকরী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তথাপি উদারতা ও সচ্চরিত্রতা এমন পরশ পাথর, যার পরশে অচেতনদের মধ্যেও চেতনা সঞ্চারিত হতো পারে। তারা সচেতন হোক না বা না হোক, আপনার নিজ চরিত্রও ব্যবহার ঠিক রাখা জরুরি। সদ্ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। এর দৌলতে মুসলমানরা অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন ৩/৭২]

قَوْلُهُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ : অর্থাৎ এটাই যখন তাদের চিরায়ত স্বভাব, আর তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি তৎপরতার পেছনে পড়ার ও প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব, তাদেরকে উপেক্ষা করুন ও ক্ষমা করে দিন। তাদের মন্দ আচরণের বদলা উত্তম আচরণ ও সদয় ব্যবহার দ্বারা প্রদান করুন। হয়তোবা এর দ্বারা তারা কিছুটা প্রভাবিত হবে। হযরত কাতাদা (রা.) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াতটি قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা যুদ্ধের আদেশ দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, এরূপ সম্প্রদায়ের সাথে কখনো কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা ও উপেক্ষা এবং মনোজয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।
–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৬৫]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ : [আর নেক কাজের মধ্যে এটাও একটা যে শরীয়ত সম্মত বিনা প্রয়োজনে কাউকে অপমান ও অপদস্থ না করা]। مُحْسِنِيْنَ অর্থ– নেককার। আরবী ভাষায় اِحْسَانٌ শব্দটি কেবল নেক আমল ও নেককাজ করার অর্থ ব্যবহৃত হয়। উর্দু ভাষায় ইহসান [অনুগ্রহ] যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা **এর অনুরূপ নয়। অভিজ্ঞ আলেমগণ** এ থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, এমন কাফের, যারা দ্বীনের অস্বীকারকারী, খিয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, তাদের ক্ষমা করা যখন নেক কাজ, তখন **মুসলমানদের ক্ষমা করলে তার ফজিলত তো অবর্ণনীয়; স্মরণীয় যে, খিয়ানতকারী** কাফেরকে ক্ষমা করাই ইহসান; এতদ্ব্যতীত, অন্যদের **ক্ষমা করার ফজীলত আরো অধিক। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৬৬]**

قَوْلُهُ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى : নাসারা শব্দের ব্যাখ্যা : নাসারা (نَصَارٰى) -এর মূল হয়তো نَصْرٌ যার অর্থ সাহায্য করা অথবা نَاصِرَة যা **শাম দেশের [সিরিয়ার] অন্তর্গত একটি জনপদের** নাম, যেখানে হযরত মাসীহ (আ.) বাস করতেন। এ কারণেই তাঁকে মাসীহ নাসিরী **বলা হয়। যারা নিজেদের নাসারা** বলত, তারা যেন দাবি করত, আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীন ও নবীর সাহায্যকারী এবং মাসীহ নাসিরী (আ.)-এর অনুসারী। এ মৌলিক দাবি ও আখ্যাগত দর্প সত্ত্বেও দীনের ব্যাপারে তারা যে নীতি অবলম্বন করেছিল, তা সামনে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৬৬]

قَوْلُهُ اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ : অর্থাৎ ইহুদিদের মতো তাদের থেকেও অঙ্গীকার নেওয়া হয়। কিন্তু তারাও অঙ্গীকার লঙ্ঘন ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্বসূরীদের চেয়ে কিছু কম করেনি। তারাও সেই সব অমূল্য উপদেশ দ্বারা একটুও উপকৃত হয়নি, যার উপর ছিল তাদের মুক্তি সাফল্যের ভিত্তি; বরং তাদের ধর্মের সারবত্তা সেই উপদেশগুলোকেই তারা বাইবেল থেকে চিরতরে মুছে ফেলে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৬৭]

قَوْلُهُ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الخ : আসমানি সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম : নাসারাদের নিজেদের মধ্যে বা ইহুদি ও নাসারার মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল। আসমানি সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার যে অপরিহার্য পরিণাম দেখা দেওয়ার ছিল, তা ঠিকই দেখা দিল। অর্থাৎ ওহীর আসল জ্যোতিই যখন তাদের মাঝে থাকল না, তখন তারা আন্দাজ-অনুমান ও কুপ্রবৃত্তির অন্ধকারে একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ শুরু করে দিল। ধর্ম থাকল না, কিন্তু ধর্মীয় বিবাদ রয়ে গেল। অসংখ্য দল-উপদল গজিয়ে উঠল। তারা অন্ধকারে একে অন্যের সাথে লড়াই করতে লাগল। এই দলীয় সংঘাত শেষ পর্যন্ত মারাত্মক শত্রুতা ও ভয়াবহ বিদ্বেষে পর্যবসিত হলো। কোনোই সন্দেহ নেই আজ মুসলিম উম্মাহর মাঝেও অনেক মতভেদ ও বিভক্তি এবং ধর্মীয় সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলার ওহী বর্তমান ও শরিয়তী কানুনও আলহামদুলিল্লাহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত সেহেতু বহু মতভেদ সত্ত্বেও উম্মাহর একটি বৃহত্তম দল সর্বদা সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকবে। পক্ষান্তরে ইহুদি নাসারার মতভেদ কিংবা প্রটেস্টান্ট-ক্যাথলিক ইত্যাদি দলগুলো নিজেদের মধ্যকার সংঘাতে কোনো দলই সত্যের রাজপথে না আজ প্রতিষ্ঠিত আছে, না কিয়ামত পর্যন্ত কখনো প্রতিষ্ঠিত হতো পারবে। কেননা তারা তাদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রান্ত কর্মপন্থা দ্বারা ওহীর আলোকধারা দূরীভূত করে ফেলেছিল, অথচ সে আলো ব্যতিরেকে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর আইন-কানুন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান করতে পারে না। এখন তারা যতদিন সেই বিকৃত বাইবেলের আঁচল আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ কুটীল চক্রবাক ও ভিত্তিহীন মত-মতান্তর এবং দলগত হিংসা-বিদ্বেষের ঘোর অন্ধকার হতে বের হয়ে সত্যের পথ দেখতে পাওয়া ও স্থায়ী মুক্তির রাজপথে চলতে পারা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বাকি যারা আজ নামমাত্র ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টান ধর্মের ধ্বজাধারী, মাসীহ শব্দ বা বর্তমান বাইবেলকে যারা নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ব্যবহার করছে, সেই সব নাসারার কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। আর যদি ধরে নেওয়া হয়, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা, একের বিরুদ্ধে অন্যের গোপন ষড়যন্ত্র, এমন কি প্রকাশ্য রণোন্মাদনার কথা ওয়াকিফহাল মহলের অজানা নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ৬৮]

بَيْنَهُمْ অর্থ- তাদের মাঝে। অর্থাৎ নাসারাদের বিভিন্ন কাওমের মাঝে। ইশারা হচ্ছে, নাসারাদের আভ্যন্তরীণ দীনি কোন্দল মাসীহদের মধ্যে যত রকমের ফিরকা আছে এবং তাদের মাঝে প্রচলিত যেসব জটিল মতভেদ আছে, বাইরে থেকে তা অনুমান করা খুবই কঠিন। এর সাথে বর্তমানে ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি শামিল করা হয়, তবে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট! জার্মানীর তিক্ততা ফ্রান্সের সাথে। বৃটেনের হিংসা-বিদ্বেষ রাশিয়ার প্রতি, ফ্রান্সের বৈরীতা স্পেনের সাথে, ইটালীর প্রতি আমেরিকার বিদ্বেষ ইত্যাদি। এছাড়া আভ্যন্তরীণ পার্থিব সংঘর্ষ ও সংঘাত যে কি ধরনের আছে, তার তো হিসেব নেই। আয়াতাংশ- اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ মানে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ সব সময়, ভবিষ্যতেও। কুরআন মাজীদ স্পষ্ট যে, বাক্যটি মানুষ জাতির বাকধারা অনুযায়ী আনা হয়েছে। বাক্যের কিয়ামত পর্যন্ত এর অর্থ হলো- যতদিন এ পৃথিবী থাকবে। কুরআন মাজীদে ইবলীসের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ লা'নত বা অভিশাপ তার উপর সব সময় থাকবে। এ অর্থ নয় যে, সে হাশরের দিনের পর লা'নত থেকে মুক্ত হবে। এ জন্য নব্য ভ্রান্ত একজন ব্যাখ্যাদাতা, এ আয়াতের শেষে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, নাসরারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকবে। আর এরূপ ধারণাও করা যেতে পারে যে, কোনো সময় হয়তো তারা সবাই ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যাবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, গুনাহ ও অপরাধ যেমন আখিরাতে শাস্তির কারণ হবে, তদ্রূপ তা দুনিয়াতেও শাস্তির কারণ হতে পারে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৬৯]

قَوْلُهُ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ : এ শব্দের সম্বোধন ইহুদি-নাসারার প্রতি। অর্থাৎ এতটা রদবদলের পরও যার আগমনী বার্তা কোনো না কোনো পর্যায়ে তোমাদের কিতাবে আছে, সেই আখেরী নবী এসে গেছেন। তাঁর মুখে আল্লাহ তা'আলা আপন কালাম নাজিল করেছেন। হযরত মাসীহ (আ.) যেসব বিষয়ে অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন তিনি তার পূর্ণতা বিধান করেছেন। তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কথা তোমরা গোপন করতে এবং যা রদবদল করে প্রচার করতে, তন্মধ্যে যা কিছু জরুরি তা এই মহানবী ﷺ প্রকাশ করেন এবং যেসব বিষয়ে কোনো প্রয়োজন নেই তা উপেক্ষা করেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৭১]

قَوْلُهُ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ : তিনি অনেক ব্যাপার উপেক্ষা করেন। এ আয়াতের উদ্দেশ্য তারা, যাদের ব্যাপারে তিনি উপেক্ষা করতেন। এদের ব্যাপার উল্লেখ হলে গুনাহগারদের অপদস্থ করা ছাড়া, শরিয়তের কোনো উপকার এতে নেই; [তাই তা স্পষ্ট করে বলা হলো না]। বস্তুত তা উল্লেখ করা হলো না, কেননা এতে দীনের প্রচারের কোনো স্বার্থ নেই। তা বর্ণনা করা হয়নি, কেননা এতে দীনের কোনো উপকার নেই, শরিয়তের হুকুম জিন্দা করার এবং বিদয়াতকে মিটিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এ আয়াত আল্লাহওয়ালাদের জন্য দলিল যে, যতক্ষণ দীনের উপকারে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করবে না এবং শত্রুতার দ্বারা আত্মার ক্রোধ প্রকাশ করবে না।
-[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৭২]

قَوْلُهُ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ : সম্ভবত নূর দ্বারা খোদ রাসূলে কারীম ﷺ -কে এবং কিতাবুম মুবীন দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানরা যে মহান আল্লাহর ওহীকে বিলুপ্ত করে আন্দাজ-অনুমান ও খেয়াল-খুশির অন্ধকারে ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের গভীর খাদে পড়ে রয়েছে, বর্তমান অবস্থায় যা থেকে বের হয়ে আসা কিয়ামত পর্যন্ত কখনই সম্ভব নয়, তাদেরকে বলে দিন, মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় আলো এসেছেন তোমরা চিরমুক্তির সঠিক পথে যদি চলতে চাও, তবে এ আলোতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ কর। শান্তির মুক্ত পথ পেয়ে যাবে এবং অন্ধকার হতে বের হয়ে আলোর ধারায় স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারবে। আর যার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে পথ চলছ তাঁরই সাহায্যে অনায়াসে সরল পথ অতিক্রম করতে পারবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৭২]

قَوْلُهُ يَهْدِىْ بِهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ : অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করে এবং সেই চিন্তা ও ধ্যানে মশগুল থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর। এ থেকে এ সত্য প্রকাশিত হয় যে, তারাই হেদায়েতের রাস্তার সন্ধান পেয়েছে, যারা তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। سُبُلَ السَّلَامِ মানে 'শান্তির পথ।' পূর্ণ শান্তি দৈহিক আত্মিক দিক দিয়ে কেবল জান্নাতে পৌঁছানোর পরেই হাসিল হবে। সেই জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা হলো, আকীদা দুরস্ত হওয়া এবং নেক আমল করা। শান্তির রাস্তা চিরস্থায়ী শান্তিধামে নিয়ে পৌঁছায়, আর তা হলো, জান্নাত। বলা হয়েছে- তা হলো জন্নাতে পৌঁছাবার রাস্তা। بِهِ শব্দের মধ্যে সর্বনামটি كِتَابٌ শব্দের দিকে ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ স্পষ্ট কিতাব দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। স্পষ্টত জানা যায় যে, ه সর্বনামটি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিতবহ। اَىْ بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৭৪]

قَوْلُهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ : খ্রিস্টানদের নির্ভেজাল কুফরি বিশ্বাস হলো, মাসীহ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ নয়। বলা হয়ে থাকে, এটা খ্রিস্টানদের মধ্যে ইয়াকুবিয়্যা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাদের মতে, মহান মাসীহ (আ.)-এর কায়াধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন [নাউযুবিল্লাহ]। অথবা আয়াতের মর্ম এই যে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় যখন মসীহ সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের [মা'বুদ হবার] আকীদা পোষণ করে আবার সেই সাথে মুখে তাওহীদের শ্লোগান দেয় যে, আল্লাহ একই, তখন এ উভয় বিশ্বাসের অনিবার্য ফল দাঁড়ায়, তাদের মতে আল্লাহ মাসীহ ছাড়া কেউ নয়। যে অর্থই নেওয়া হোক, এ বিশ্বাস নির্জলা কুফর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা ৭৩]

قَوْلُهُ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ .... وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا : মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর মতো মনে করার অসারতা : ধরে নাও যদি সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ মাসীহ (আ.) মারইয়াম (আ.) এবং আগে পরের সমস্ত জগদ্বাসীকে একত্র করে একই মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে চান, তবে তোমরাই বল, কে তাঁর হাত ধরে রাখতে পারে? অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যতের সমুদয় মানুষকেও যদি একত্র করে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহ এক নিমিষে সকলকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে সকলের সম্মিলিত শক্তি ও এক আল্লাহর ইচ্ছাকে ক্ষণিকের জন্যও মুলতবি করতে সক্ষম হবে না। কেননা সৃষ্টজীবের শক্তি আল্লাহর দেওয়া এবং তাও সীমিত, অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল শক্তির আধার এবং তাঁর শক্তি অসীম। তাঁর শক্তির সম্মুখে সৃষ্টিমালার শক্তি নিতান্তই অসহায়। যাদেরকে রদ করে এ বক্তব্য রাখা হয়েছে, খোদ তারাও একথা স্বীকার করে; বরং খোদ মাসীহ ইবনে মারইয়ামও যাঁকে তারা আল্লাহ সাব্যস্ত করছে, একথা স্বীকার করতেন। কাজেই, মারকাসের ইঞ্জীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর এ উক্তি বিদ্যমান যে, 'হে পিতা! সবকিছু তোমার শক্তির অধীন। তুমি আমা হতে এ [মৃত্যুর] পেয়ালা হটিয়ে দাও- আমি যেভাবে চাই সেভাবে নয়; বরং যেভাবে তোমার ইচ্ছা।' কাজেই যেই মাসীহকে তোমরা আল্লাহ বল এবং তার যে জননী তোমাদের বিশ্বাস মতে আল্লাহর মা হলো, তারা দু'জনও গোটা বিশ্ববাসীর সাথে মিলে মহান আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে অসহায় প্রমাণিত হলো। এবার নিজেরাই চিন্তা কর মাসীহ বা তাঁর মা কিংবা অন্যান্য মাখলুক সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের [মা'বুদ হবার] দাবি করাটা কত বড় ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যা আমরা هَلَاكٌ [ধ্বংস]-কে মৃত্যু অর্থে গ্রহণ করেছি, তবে جَمِيْعًا শব্দটির কিঞ্চিত ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। শব্দটির যে অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি তা আরবি ভাষাবিদদের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি

সঙ্গতিপূর্ণ। তবে এটাও সম্ভব যে, এ আয়াতে هَلَاكٌ -কে মৃত্যু অর্থে নেওয়া হবে না, যেমন আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, অনেক সময় هَلَاكٌ -এর অর্থ হয় কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, যেমন– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ মহান আল্লাহর সত্তা ব্যতিরেকে সবকিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে থাকে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি হযরত মাসীহ, তাঁর মা এবং বিশ্বের সকলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, তা হলে কে আছে যে তার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? কবি বলেছেন–

اوست سلطاں هرچه خواهد آں کند * عالمے را در دمے ویراں کند۔

অর্থাৎ তিনিই মহারাজ, যা ইচ্ছা তাই করেন। সারা বিশ্বকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারেন।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে নবীগণের সম্পর্কে এমন কথা বলেন, যাতে উম্মত তাদেরকে বান্দা হওয়ার সীমারেখা হতে উপরে তুলে না নেয়। নয়তো মহান আল্লাহর নিকট তাদের যে মর্যাদা ও সমাদর সে সৃষ্টিতে তাঁরা এরূপ সম্ভাষণের বহু ঊর্ধ্বে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৭৪]

وَأُمَّهُ অর্থাৎ "এবং তার মাতা"। মাসীহের সঙ্গে তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ হলো, মাসীহদের বিরাট এক অঞ্চলে তিনিও খোদার সাথে খোদায়িত্বের শরিক। লাখো নয়, বরং কোটি কোটি মাসীহদের বিশ্বাস, তিনিও খোদার আসনে আসীন [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা]। এ ব্যাপারে আসল ঘটনা জানার জন্য মৎ-প্রণীত ইংরেজী তাফসীর দ্রষ্টব্য।

–[তাফসীরে মাজেদী, ৭৮ নং টীকার অংশবিশেষ]

قَوْلُهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ : মাসীহীদের আকীদা : হযরত মাসীহ (আ.) বিনা বাপে পয়দা হয়েছেন। আর এর দ্বারা তারা দলিল নিয়ে থাকে যে, এ ধরনের জ্ঞানবহির্ভূত অস্তিত্বকে কিভাবে ইনসান বা মানুষ মনে করা যেতে পারে? তিনি অবশ্যই মানুষের ঊর্ধ্বে, আল্লাহর সৃষ্টিতে শরিক। এখানে এ অভিমতের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বাবস্থায় সব কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যদি কোনো মাখলুককে তাঁর সৃষ্টি-বিধানের সাধারণ নিয়মের বাইরে সৃষ্টি করেন, তা দিয়ে সে মাখলুকের খোদা হয়ে যাওয়া বা সে সৃষ্টজীব না হওয়া কিরূপে বুঝা যায়। يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। তিনি যা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে করতে চান, সেভাবেই করেন। তিনি মাখলুককে সাধারণ নিয়ম মোতাবেক সৃষ্টি করতে পারেন এবং নিয়মের বাইরেও সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর এ সৃষ্টি করার শক্তি কোনো অবস্থার সাথে বা কোনো বিধানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি মাধ্যমসহ এবং মাধ্যম ব্যতিরেকে সমভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। কোনো সময় তিনি আসল থেকে সৃষ্টি করেন এবং কোনো সময় তা বাদ দিয়ে। তিনি কখনো একইরূপ জিনিস থেকে, তার অনুরূপ জিনিস সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টজীবের অনেক কিছু কোনো মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেন, আবার কখনো তা মাধ্যম সহকারে সৃষ্টি করেন। তাঁর সৃষ্টি সব একই ধরনের নয়, বরং সৃষ্টির সময় তিনি যেভাবে চান, তা সেভাবে সৃষ্টি করেন। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৮১]

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মিথ্যা দাবি– "তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন" : সম্ভবত তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান এই জন্য বলে যে, তাদের বাইবেলে আল্লাহ ইসরাঈল [ইয়াকুব (আ.)]-কে নিজের পুত্র এবং নিজে তার পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে থাকে। এভাবে ইসরাঈলের বংশধর এবং মাসীহের উম্মত হওয়ার কারণেই খুব সম্ভব তারা নিজেদের সম্পর্কে أَبْنَاءُ اللَّهِ [আল্লাহর সন্তান] শব্দ ব্যবহার করেছে। এটাও সম্ভব যে, সন্তান বলে আল্লাহর খাস বান্দা ও প্রিয়পাত্র বোঝাচ্ছে, যেন প্রিয়পাত্র হিসেবে সন্তানতুল্য। এ হিসেবে أَبْنَاءُ -এর মর্ম أَحِبَّاءُ -এর অনুরূপ।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয় : সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ছেলে হওয়া সৃষ্টির পক্ষে যেহেতু অসম্ভব ও সুস্পষ্টরূপে বাতিল এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব, যেমন ইরশাদ হয়েছে– يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ অর্থাৎ তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। –[সূরা মায়িদা : রুকু-৮], সেহেতু এ বাক্যে প্রথমে প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবিকেই রদ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও জঘন্য রকম পাপাচারের দরুন ইহজগতেও নানাভাবে লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে নিপতিত এবং আখিরাতেও স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ততা তাদের রয়েছে, যা যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত ও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তাদের মতো পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কেও বিবেকবান লোক কি মুহূর্তের জন্যও এ ধারণা রাখতে পারে যে, তারা মহান আল্লাহর প্রিয় ও আপনজন হবে? মহান আল্লাহর সাথে কারো রক্তের সম্পর্ক তো নেই, তার ভালোবাসাও কেবল আনুগত্য ও সৎকর্ম দ্বারাই লাভ করা যেতে

পারে। কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির উপযুক্ত এরূপ ঘোর অপরাধীদের তো লজ্জা করা উচিত যে, কী করে তারা نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهٗ **-এর দাবি করে?** হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে তার ঔরসজাতই ছিল, অথচ তার সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ঘোষণা **দিয়ে দিয়েছেন–** اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তো অসৎকর্মশীল।
–[সূরা হুদ : রুকূ– ৪ ; তাফসীরে উসমানী : টীকা, ৭৭-৭৮]

قَوْلُهٗ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا : অর্থাৎ আমাদের আদেশ-নিষেধ অত্যন্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে **খুলে বর্ণনা** করেন। এ রুকুর শুরুতে বনী ইসরাঈলের [ইহুদি-নাসারার] নানা রকম অপকর্ম ও নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরে অবশেষে বলা হয়েছে, এখন তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছেন, যিনি তোমাদের অন্যায়-অপকর্ম তুলে ধরে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যেতে চান। তারপর জানিয়ে দেওয়া হয় হেদায়েতের এ আলো অর্জন দু'টো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা–

১. আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ হতে এ পর্যন্ত এরই বর্ণনা ছিল।
২. সকল নবীর সেরা নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন, যিনি পূর্ববর্তী সকল নবীর গুণাবলির ধারক এবং সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ শরিয়তের ব্যাখ্যাতা। আলোচ্য আয়াত يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ -এর মাঝে এ বিষয়েরই বর্ণনা করা হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৮২]

قَوْلُهٗ جَاءَكُمْ كم بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কে? হযরত মাসীহ (আ.) এরপর প্রায় ছয়শ' বছর পর্যন্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনধারা বন্ধ ছিল। দু'একটি জায়গা বাদ দিলে সমগ্র **বিশ্ব অজ্ঞানতা, আখিরাত সম্পর্কে** উদাসীনতা ও জীবন ভোগের স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত ছিল। হেদায়েতের আলোকবর্তিকা নিভে গিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার, নৈরাজ্য ও **ধর্মহীনতার ঘনঘটা আকাশ বলয়কে** আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ পরিস্থিতি নিখিল বিশ্বের সংশোধন ও সংস্কার সধানার্থে **আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী সায়্যিদুল মুরসালীন** ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি অজ্ঞদেরকে **সাফল্য ও মুক্তির পথ দেখান, উদাসীনদেরকে নিজ সতর্কবাণী দ্বারা জাগ্রত করেন এবং হতোদ্যমদেরকে** সুসংবাদ শুনিয়ে **উদ্দীপিত করে তোলেন। এভাবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মহান আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেল, তা কেউ** মানুক আর না **মানুক। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-৮৩]**

قَوْلُهٗ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ : فَتْرَتٌ **-এর শাব্দিক অর্থ–** মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোনো কাজকে বন্ধ করে দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদরা فَتْرَتٌ -এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গাম্বরদরে আগমন পরম্পরা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষ নবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فَتْرَتٌ -এর জমানা।

فَتْرَتٌ -এর জমানা কতটুকু : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর **মাঝখানে** এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গাম্বরদের আগমন একাদিক্রমে **অব্যাহত** ছিল। এতে **কখনো বিরতি** ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গাম্বর এ সময়ে **প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও** অনেক পয়গাম্বর আগমন করেছিলেন। অতপর হযরত ঈসা (আ.)-এর **জন্ম** ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর **নবুয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচশ'** বছরকাল পয়গাম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল। এ **সময়টিকেই** فَتْرَتٌ তথা বিরতির সময় বলা হয়। **এর আগে কখনো** এত **দীর্ঘ** সময় **পয়গাম্বরদের** আগমন বন্ধ ছিল না। হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং **হযরত ঈসা ও শেষ নবী হযরত** মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে **সময়ের পরিমাণ** কমবেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বুখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতক্রমে **বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা** ও শেষ নবী ﷺ -এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো পয়গাম্বর **প্রেরিত হননি। বুখারী** ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى অর্থাৎ আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে– لَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোনো পয়গাম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়েছে।

বিরতির সময় খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তার নবুয়তকাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে, পরে নয়।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান : আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রাসূল, পয়গাম্বর অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের শরিয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোনো কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আজাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কিনা?

অধিকাংশ ফিকহবিদ বলেন, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদের প্রতি কোনো পয়গাম্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌঁছেনি বলে তাদের ওজর পেশ করার কোনো যুক্তি ছিল কি?

উত্তর. হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের **ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল।** কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল কপি কারো কাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত : আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা পয়গাম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তার আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোনো আলো ছিল না। আল্লাহর সৃষ্ট মানব আল্লাহর সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপুজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহিলিয়্যাতের যুগে এহেন পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণে ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেনদেন, সামাজিকতাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও তাঁর পয়গাম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোনো চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মুমূর্ষ রোগী শুধু আরোগ্য লাভই করে না, বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্বে কারো মনে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকার বিরাজ করেছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে যে, অতীতে যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মু'জিযা একদিকে রেখে একা এ মু'জিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৭৮-৮০]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : [আর এতো হলো তাঁরই কুদরতের একটি প্রকাশ। তিনি শত শত বছর পর এমন একজন পয়গাম্বর পাঠালেন, যিনি সব পয়গাম্বরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ]। আয়াতের এ অংশে বোঝা যায় যে, তিনি তোমাদের দাবি নস্যাৎ করার জন্য এই পয়গাম্বরকে পাঠিয়েছেন। অবশ্য যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে এছাড়া অন্যভাবেও তিনি দলিল পেশ করতে পারতেন। আর তোমাদের শ্বাস ফেলারও অবকাশ হতো না। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯০]

অনুবাদ :

٢٠. وَ اذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَىْ مِنْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا ق أَصْحَابَ خَدَمٍ وَحَشَمٍ وَاٰتٰكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى وَفَلْقِ الْبَحْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ـ

২০. এবং স্মরণ কর মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর তিনি তোমাদের মধ্য হতে فِيْكُمْ এর فِىْ [মধ্যে] অব্যয়টি এখানে مِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী করেছেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি লোক-লস্কর ও চাকর-নওকরের অধিকারী করেছেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেননি যেমন, মান্না, সালওয়া, সমুদ্র বিদারণ ইত্যাদি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন।

٢١. يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُطَهَّرَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ أَمَرَكُمْ بِدُخُوْلِهَا وَهِيَ الشَّامُ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى أَدْبَارِكُمْ تَنْهَزِمُوْا خَوْفَ الْعَدُوِّ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ فِيْ سَعْيِكُمْ ـ

২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তোমাদেরকে যেখানে অর্থাৎ শামে প্রবেশ করতে নির্দেশ করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না অর্থাৎ শত্রুর ভয়ে হার মেনে নিয়ো না নতুবা তোমাদের প্রচেষ্টায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

٢٢. قَالُوْا يٰمُوْسٰى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ مِنْ بَقَايَا عَادٍ طِوَالًا ذَوِىْ قُوَّةٍ وَإِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دٰخِلُوْنَ لَهَا ـ

২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত লম্বা লম্বা, প্রচণ্ড শক্তিমত্তার অধিকারী, আদ জাতির অবশিষ্ট এক সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না; তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে তবে আমরা তাতে প্রবেশ করব।

٢٣. قَالَ لَهُمْ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ مُخَالَفَةَ أَمْرِ اللّٰهِ وَهُمَا يُوْشَعُ وَكَالِبُ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَعَثَهُمْ مُوْسٰى فِيْ كَشْفِ أَحْوَالِ الْجَبَابِرَةِ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا بِالْعِصْمَةِ فَكَتَمَا مَا اطَّلَعَا عَلَيْهِ مِنْ حَالِهِمْ إِلَّا عَنْ مُوْسٰى بِخِلَافِ بَقِيَّةِ النُّقَبَاءِ فَأَفْشَوْهُ فَجَبُنُوْا ـ

২৩. যারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় করছিল তাদের মধ্যে দু'জন অর্থাৎ ইয়ূশা ও কালাব, যেসব গোত্র নেতাকে হযরত মূসা (আ.) ঐ শক্তি মদমত্ত সম্প্রদায়ের হালচালের খোঁজ খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন এরা দু'জন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা হযরত মূসা (আ.) ব্যতীত অন্য সকলের নিকট হতে উক্ত শত্রু সম্প্রদায়ের যে অবস্থা ও শক্তি দর্শন করে এসেছিলেন তা গোপন রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে অন্য গোত্রনেতারা তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। ফলে বনী ইসরাঈল তাদের শক্তির কথা শুনে সাহস শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। যাদের প্রতি আল্লাহ পাপ হতে হেফাজত করত অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বলল−

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج بَابَ الْقَرْيَةِ وَلَا تَخْشَوْهُمْ فَإِنَّهُمْ اَجْسَادٌ بِلَا قُلُوْبٍ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ ج قَالَا ذٰلِكَ تَيَقُّنًا بِنَصْرِ اللّٰهِ وَاِنْجَازِ وَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ .

তোমরা এ জনপদের দ্বারে প্রবেশ কর, এদের ভয় করো না। এরা প্রাণহীন গুটিকয়েক শরীর মাত্র। প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর ওয়াদা পূরণের প্রতি নিরঙ্কুশ প্রত্যয় হেতু তারা এ কথা বলতে পেরেছিলেন। আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।

٢٤. قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هُمْ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ عَنِ الْقِتَالِ .

২৪. তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে ততদিন সেখানে আমরা প্রবেশ করবই না। তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে এদের সাথে যুদ্ধ কর, আমরা যুদ্ধ না করে এখানেই বসে থাকব।

٢٥. قَالَ مُوْسٰى حِيْنَئِذٍ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اِلَّا اَخِيْ وَلَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا فَاُجْبِرُهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ فَافْرُقْ فَافْصِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ .

২৫. সে অর্থাৎ মূসা তখন বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। আমরা দু'জন ব্যতীত আর কারো উপর আমার এমন ক্ষমতা নেই যে, তাকে আনুগত্যের জন্য বাধ্য করতে পারি। সুতরাং তুমি আমাদেরও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফারাক করে দাও, ফয়সালা করে দাও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ مِنْكُمْ : প্রশ্ন. فِيْكُمْ -এর তাফসীর مِنْكُمْ দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর. كُمْ -এর মধ্যে বাস্তবিক ظَرْف হওয়ার যোগ্যতা নেই।

قَوْلُهُ الْمُقَدَّسَةُ : অর্থ– পবিত্র।

قَوْلُهُ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীর মধ্যে সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না, বরং মান্না-সালওয়ার কারণে আংশিক বা আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল।

قَوْلُهُ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا : এ বাক্যটির ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা আছে। ১. جُمْلَهْ دُعَائِيَّةٌ হতে পারে। এ সুরতে এটি جُمْلَهْ مُعْتَرِضَةٌ হবে। ২. جُمْلَهْ خَبَرِيَّةٌ হতে পারে। এ সুরতে এটি رَجُلَانِ -এর দ্বিতীয় সিফত হবে।

قَوْلُهُ بَابَ الْقَرْيَةِ : اَلْبَابَ -এর তাফসীর بَابُ الْقَرْيَةِ দ্বারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْبَابْ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ -টি مُضَافْ اِلَيْهِ -এর عِوَضْ বা বদলে এসেছে।

قَوْلُهُ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ : এখানে واو -টি হলো اِسْتِيْنَافِيَّهْ -এর وَاوْ এবং বাক্যটি مُسْتَانِفَهْ আর فَاءْ বর্ণটি اَمْرْ مَحْذُوْفْ -এর জবাবের স্থানে। তাকদীরী ইবারত হবে تَنَبَّهُوْا فَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ এখানে

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلُوْا হলো -এর مُتَعَلِّقْ مُقَدَّمْ আর إِنْ كُنْتُمْ হলো شَرْطْ এবং جَوَابُ شَرْطْ উহ্য রয়েছে। যার প্রতি পূর্বের **বাক্য তথা** **تَوَكَّلُوْا** ইঙ্গিত বহন করে।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيْ وَأَخِيْ : جُمْلَهْ مُسْتَأْنِفَهْ -টি আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করার জন্য **ব্যবহৃত হয়েছে।** **قَالَ** হলো **قَوْل** আর তার পরবর্তী বাক্যটি তার مَقُوْلْ আর لَا أَمْلِكُ হলো إِنَّ -এর খবর। إِلَّا হরফে ইস্তেসনা **حَصَرْ বা** সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্য এসেছে আর نَفْسِيْ হলো মাফউলেবিহী।

قَوْلُهُ وَإِلَّا أَخِيْ : أَخِيْ শব্দটির পূর্বোল্লেখিত نَفْسِيْ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরের পূর্বে لا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَخِيْ : এতে رَفْع, نَصَبْ এবং جَرْ তিন ধরনের ই'রাব হওয়ার অবকাশ আছে। যথা– ১. যদি أَمْلِكُ -এর ضَمِيْر مُسْتَتَرْ -এর সাথে عَطْف হয় তাহলে رَفْع হবে। ২. যদি إن -এর সাথে عَطْف হয় তাহলে نَصَبْ হবে। ৩. আর যদি مَجْرُوْر -এর সাথে عَطْف হয় তাহলে مَجْرُوْر হবে।

قَوْلُهُ يَتِيْهُوْنَ : এটি (ض) تِيْهٌ থেকে مُضَارِعْ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ্। অর্থ– উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে।

قَوْلُهُ لَا تَاْسَ : তুমি চিন্তা করো না, দু:খ করো না। تَاْسَ শব্দটি (س) أَسًى মাসদার হতে مُضَارِعْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ্। মূলত تَاْسٰى ছিল। لَائِ نَهِيْ -এর কারণে يَاءْ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ الخ : হযরত মূসা (আ.)-এর বাণী : হযরত মূসা (আ.)-এর এ বক্তৃতা সে সময়ের, যখন বনী ইসরাঈলরা মিশরীয়দের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে সিনাই প্রান্তরে স্বাধীনভাবে বসবাস করছিল। হযরত মূসা (আ.), যিনি তাদের দীনি নবীও ছিলেন এবং দুনিয়ার লিডারও ছিলেন, তাদেরকে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বলেছেন– তোমরা ফিলিস্তিনে ফিরে চলো এবং সেখান থেকে অত্যাচারী 'আমালিকা' সম্প্রদায়কে বের করে দিয়ে তোমরা সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করো। ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণ এবং বাস্তব নিদর্শনের নিরিখে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলগণ মিশর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৪০ সনে বেরিয়ে আসে এবং ফিলিস্তিনের উপর ইসরাঈলী আক্রমণ সংঘটিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ সনে। এ হিসেবে হযরত মূসা (আ.)-এর বক্তৃতার সময়কাল ছিল এর মাঝখানের কোনো এক সময়। সম্ভবত এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ সময়ের ঘটনা। যেমন তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ১ম অধ্যায় পাঠে জানা যায়। তিনি জর্ডান নদীর তীরে মুআব নামক ময়দানে, মিশর থেকে বেরিয়ে আসার চল্লিশতম বছরের, ১১তম মাসের, ১ম তারিখে এ বক্তৃতা দেন। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯১]

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা : তাফসীরে মূযিহুল কুরআনে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মভূমি ত্যাগ করে মহান আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েন এবং শামদেশে [সিরিয়ায়] এসে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘকাল যাবত তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। সহসা আল্লাহ তা'আলা তাকে সুসংবাদ দিলেন, পৃথিবীতে তোমার বংশধরগণের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে। আমি তাদেরকে শামদেশের কর্তৃত্ব দেব এবং তাদেরকে নবুয়ত, দীন, কিতাব ও রাজত্বের অধিকারী করব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময় এ ওয়াদা পূর্ণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্ব হতে মুক্তি দান করেন এবং ফিরাউনকে ডুবিয়ে মারেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেন, তোমরা আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে শাম দেশ জয় করে নাও। তারপর সে দেশ তোমাদেরই হবে। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র হতে বার জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, তোমরা শামে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি জেনে এসো! তারা এসে সে দেশের গুণগান করল এবং সেই সাথে সেখানকার অধিবাসী আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার কথাও প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা বনী

ইসরাঈলের কাছে সে দেশের সমৃদ্ধি বর্ণনা করো, কিন্তু আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার কথা ব্যক্ত করো না। তাদের মধ্যে দু'জন হযরত মূসা (আ.)-এর আদেশ পালন করে। বাকি দশজন অমান্য করে। বনী ইসরাঈল সব শুনে হীনমন্যতা দেখাতে লাগল। তারা চাইল আবার মিশরে ফিরে যাবে। এ ভুলের মাশুলে শাম বিজয়ে তাদের চল্লিশ বছর বিলম্ব ঘটল। এ দীর্ঘ সময় তারা মরুভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে কাটাল। ইতোমধ্যে তাদের সে প্রজন্মের সকলেই মারা গেল। কেবল উপযুক্ত দুই প্রতিনিধি তখনও বেঁচেছিলেন। তাঁরা হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং তাঁদের হাতেই সিরিয়া বিজিত হলো।

−[তাফসীরে উসমানী : টীকা ৮৫]

قَوْلُهُ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ : দুনিয়াত ক্ষতি তো স্পষ্ট যে, বাদশাহী এবং এমন বড় বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হবে। আর আখিরাতের ক্ষতি হলো, জিহাদের হুকুম অমান্য করার জন্য আখেরাতে এর ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, গুনাহের কারণে কখনো কখনো শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যায়। −[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯৫]

আমালিকা জাতি : এরা ছিল কাওমে 'আমালিকাহ'। এরা ছিল খুবই শক্তিশালী এবং যুদ্ধবাজ জাতি। এরা বনী ইসরাঈলদের অতি পুরাতন শত্রু। 'তাওরাত' এবং 'তারিখে ইসরাঈল' এদের রক্তপাতের কাহিনীতে রঞ্জিত। তাওরাতে এ কাওম সম্পর্কে বনী ইসরাঈলদের ভাষায়, এরূপ বর্ণিত আছে, আমাদের এমন শক্তি নেই যে, আমরা তাদের উপর আক্রমণ করবো। কেননা তারা আমাদের চাইতে শক্তিশালী। −[গণনা পুস্তক ১৩ : ৩২] এ জমিন, যার গোপন সংবাদ নেওয়ার জন্য আমি গিয়েছিলাম, এমনই জমিন, যা তার বাসিন্দাদের গিলে ফেলে। আর যাদেরকে আমি সেখানে দেখেছি, তারা সবাই খুবই শক্তিশালী। আমি সেখানে 'বনী ইনাক' গোত্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি, তারা শক্তিশালী বংশের লোক। আমরা তাদের দৃষ্টিতে ফড়িং স্বরূপ ছিলাম। আর সত্য বলতে কি, আমরা এরূপই ছিলাম [গণনা পুস্তক ১৩ : ৩২]

جَبَّارِيْنَ শব্দটি মোটাসোটা, নাদুশ-নুদুশ ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য। বস্তুত এখানকার অর্থ হলো اَىْ عِظَامَ الْاَجْسَامِ طُوْلًا [দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে লম্বা চওড়া দেহবিশিষ্ট। −[কুরতুবী]

জাব্বার ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দেহ খুব উঁচু হয়, মোটাতাজা শক্তিশালী হয়। −[তাফসীরে কাবীর]

ইহুদিদের বর্ণনায় জানা যায় যে, তারা ছিল দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট। এছাড়া তাদের ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। তাদের সম্পর্কে আল কুরআনে যে جَبَّارٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা খোদ তাওরাতেও উল্লেখ আছে। যেমন উপরের আলোচনায় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। −[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯৬]

قَوْلُهُ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ : 'তাওয়াক্কুল'-এর মর্ম : বৈধ আসবাব-উপকরণ পরিহার করা 'তাওয়াক্কুল' নয়। তাওয়াক্কুল অর্থ, কোনোও ভালো কাজের লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চরিত্র করা, তারপর তা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা; নিজ প্রচেষ্টায় দর্পিত না হওয়া। বৈধ আসবাব উপকরণ ছেড়ে দিয়ে বসে বসে আশার জাল বোনা, কোনো আল্লাহ-নির্ভরতা নয়; বরং আত্মহনন মাত্র। −[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৯৫]

قَوْلُهُ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ : এটা সেই জাতির উক্তি, যারা দাবি করে نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ অর্থাৎ আমরা মহান আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন। বস্তুত তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতা ও চিরায়ত হঠকারিতা দৃষ্টে এরূপ উক্তি অস্বাভাবিক কিছু নয়। −[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ৯৬]

অনুবাদ :

٢٦. قَالَ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهَا أَيِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ يَتَحَيَّرُوْنَ فِى الْأَرْضِ ط وَهِىَ تِسْعَةُ فَرَاسِخَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) فَلَا تَأْسَ تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِقِيْنَ رُوِىَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ اللَّيْلَ جَادِّيْنَ فَإِذَا أَصْبَحُوْا إِذَا هُمْ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ ابْتَدَؤُوْا مِنْهُ وَيَسِيْرُوْنَ النَّهَارَ كَذٰلِكَ حَتّٰى انْقَرَضُوْا كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْعِشْرِيْنَ قِيْلَ وَكَانُوْا سِتَّمِائَةِ أَلْفٍ وَمَاتَ هٰرُوْنُ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِى التِّيْهِ وَكَانَ رَحْمَةً لَهُمَا وَعَذَابًا لِأُوْلٰئِكَ وَسَأَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَأَدْنَاهُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ وَنُبِّئَ يُوْشَعُ بَعْدَ الْأَرْبَعِيْنَ وَأُمِرَ بِقِتَالِ الْجَبَّارِيْنَ فَسَارَ بِمَنْ بَقِىَ مَعَهُ وَقَاتَلَهُمْ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَوَقَفَتْ لَهُ الشَّمْسُ سَاعَةً حَتّٰى فَرَغَ عَنْ قِتَالِهِمْ وَرَوَى أَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهِ حَدِيْثَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلٰى بَشَرٍ إِلَّا لِيُوْشَعَ لَيَالِىَ سَارَ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ .

২৬. তাকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তবে এটা অর্থাৎ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল। তারা পৃথিবীতে অস্থির হয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ স্থানটির পরিসর ছিল মাত্র নয় ফারসাখ। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না, চিন্তিত হয়ো না। বর্ণিত আছে যে, তারা প্রতি রাতে নয়া উদ্যমে যাত্রা করত। কিন্তু সকাল হলে দেখত, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই তারা পড়ে রয়েছে। দিনেও আবার তদ্রূপ হতো। শেষ পর্যন্ত যাদের বয়স ত্রিশ বছরের কম ছিল তারা ব্যতীত সবাই সেখানে মারা যায়। বলা হয়, তাদের তখন সংখ্যা ছিল ছয়শ' হাজার। সেখানেই হযরত হারূন ও হযরত মূসা (আ.) ইন্তেকাল করেন। অবশ্য এ অবস্থাটি তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে ছিল রহমত স্বরূপ আর ওদের ক্ষেত্রে ছিল আজাব স্বরূপ। হাদীসে আছে মৃত্যুর সময় হযরত মূসা আল্লাহর দরবারে মিনতি করেছিলেন, একটি ঢিল নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় পবিত্র ভূমির ততটুকু নিকট যেন আল্লাহ তাঁকে পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ তাঁকে ততটুকু নিকট করে দিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত ইউশা নবী হন। তিনি ঐ অত্যাচারী প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হন। তখন তিনি যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়েই যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। ঐদিন ছিল জুমাবার। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তাঁদের জন্য কিছুক্ষণ গতিরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ফলে তাঁরা ঐদিনই যুদ্ধ শেষ করতে সক্ষম হন। হযরত আহমাদ তৎপ্রণীত মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, [পূর্ববর্তী নবীদের যুগে] হযরত ইউশা ব্যতীত আর কোনো মানুষের জন্য সূর্যের গতিরুদ্ধ হয়নি। তাঁর জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রার সময় সূর্যের গতিরুদ্ধ করা হয়েছিল।

٢٧. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ عَلٰى قَوْمِكَ نَبَاَ خَبَرَ ابْنَىْ اٰدَمَ هَابِيْلَ وَقَابِيْلَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاُتْلُ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ كَبْشٌ لِهَابِيْلَ وَزَرْعٌ لِقَابِيْلَ فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَهُوَ هَابِيْلُ بِاَنْ نَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاَكَلَتْ قُرْبَانًا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط وَهُوَ قَابِيْلُ فَغَضِبَ وَاَضْمَرَ الْحَسَدَ فِىْ نَفْسِهِ اِلٰى اَنْ حَجَّ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ لَاَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ لِمَ قَالَ لِتَقَبُّلِ قُرْبَانِكَ دُوْنِىْ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

২৭. হে মুহাম্মাদ আদমের দু'পুত্র হাবীল ও কাবীলের সংবাদ বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে অর্থাৎ তোমার সম্প্রদায়কে যথাযথভাবে শোনাও। بِالْحَقِّ : এটা اُتْلُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। যখন তারা উভয়েই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি করেছিল। হাবীলের পক্ষ হতে ছিল একটি মেষ আর কাবীলের পক্ষ হতে ছিল কিছু শস্য। তখন একজনের অর্থাৎ হাবীলের কুরবানি কবুল হলো, আকাশ হতে অগ্নিখণ্ড এসে তা দগ্ধ করে দিল এবং অন্যজনের অর্থাৎ কাবীলের [কুরবানী] কবুল হলো না। এতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে এবং হযরত আদমের হজ্বযাত্রা পর্যন্ত সে এ বিদ্বেষ মনে গোপন করে রাখে। সে তাকে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। সে [হাবীল] বলল, কেন? সে [কাবীল] বলল, তোমার কুরবানি হলো আর আমারটা হলো না। অপরজন বলল, আল্লাহ মুত্তাকীগণের কুরবানিই কবুল করেন।

٢٨. لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ بَسَطْتَ مَدَدْتَ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ط اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ فِىْ قَتْلِكَ.

২৮. যদি তুমি لَئِنْ -এর لَامْ -টি قَسْمِيَّةٌ বা শপথ অর্থব্যঞ্জক। আমাকে হত্যা করার জন্য হাত উঠাও, আমার প্রতি হাত সম্প্রসারিত কর তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না। তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

٢٩. اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ تَرْجِعَ بِاِثْمِىْ بِاِثْمِ قَتْلِىْ وَاِثْمِكَ الَّذِىْ ارْتَكَبْتَهُ مِنْ قَبْلُ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ج وَلَا اُرِيْدُ اَنْ اَبُوْءَ بِاِثْمِكَ اِذَا قَتَلْتُكَ فَاَكُوْنَ مِنْهُمْ قَالَ تَعَالٰى وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ج

২৯. তুমি আমার অর্থাৎ আমাকে হত্যার ও পূর্বেকৃত তোমার পাপসহ ফিরে যাও, প্রত্যাবর্তন কর অনন্তর অগ্নিবাসী হও এটাই আমি কামনা করি। তোমার পাপসহ আমি প্রত্যাবর্তন করতে চাই না। যদি তোমাকে আমি হত্যা করি তবে আমিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এটাই জালেমদের কর্মফল।

٣٠. فَطَوَّعَتْ زَيَّنَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَاَصْبَحَ فَصَارَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بِقَتْلِهِ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَيِّتٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَحَمَلَهُ عَلٰى ظَهْرِهِ.

৩০. অতপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, এ কর্মটিকে তার সামনে আকর্ষণীয় করে ধরল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে, সে তাঁকে হত্যা করত, ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু এখন আর কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কারণ পৃথিবীতে আদম সন্তানের এটা ছিল প্রথম মৃত্যু। তাই সে তাকে পিঠে বহন করে ঘুরতে লাগল।

٣١. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ يَنْبُشُ التُّرَابَ بِمِنْقَارِهٖ وَرِجْلَيْهِ وَيُثِيْرُهٗ عَلٰى غُرَابٍ اٰخَرَ مَيِّتٍ مَعَهٗ حَتّٰى وَارَاهُ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ يَسْتُرُ سَوْءَةَ جِيْفَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ عَنْ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ لا عَلٰى حَمْلِهٖ وَحَفَرَ لَهٗ وَوَارَاهُ.

৩১. অনন্তর আল্লাহ ত'আলা এক কাক পাঠালেন, যে তার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় আচ্ছাদিত করা যায় এটা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। এটা চঞ্চু ও পায়ের নখের সাহায্যে মাটি খুড়ে অপর একটি মৃত কাকের উপর ঢেলে ওটাকে ঢেকে দিয়েছিল। সে বলল, হায়! আমি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাইয়ের মরদেহ গোপন করতে পারি। তারপর সে ওটা পিঠে বহন করার দরুন অনুতপ্ত হলো। যা হোক পরে সে গর্ত খনন করে ঐ লাশ গোপন করল

٣٢. مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج الَّذِىْ فَعَلَهٗ قَابِيْلُ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ اَىِ الشَّانُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلَهَا اَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ اَتَاهُ فِى الْاَرْضِ مِنْ كُفْرٍ اَوْ زِنًا اَوْ قَطْعِ طَرِيْقٍ وَنَحْوِهٖ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا بِاَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَصَوْنِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ اَىْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز الْمُعْجِزَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ مُجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ بِالْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

৩২. এ কারণে অর্থাৎ কাবীলের এ কাজের দরুন বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, اَنَّهٗ -এর ضَمِيْرْ বা সর্বনামটি شَانْ বা অবস্থাব্যাঞ্জক। অপর কোনো প্রাণ হত্যা বা দুনিয়াতে কুফরি, ব্যভিচার, রাহাজানি ইত্যাদি করত ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ভিন্ন কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে অর্থাৎ হত্যা হতে বিরত থাকলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রাণের হুরমত ও মর্যাদা বিনষ্ট করা বা রক্ষা করা হিসেবে এ বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে। তাদের নিকট অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ মুজেযাসহ আগমন করেছিল; কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ার অপব্যবহারকারীই রয়ে গেল। অর্থাৎ কুফরি, হত্যা ইত্যাদি কাজ করে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবেই তারা রয়ে গেল।

٣٣. وَنَزَلَ فِي الْعُرَنِيِّيْنَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ مَرْضَى فَأَذِنَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَّخْرُجُوا إِلَى الْإِبِلِ وَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ إِنَّمَا جَزَٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ بِمُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ أَنْ يُّقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَيْ أَيْدِيْهِمُ الْيُمْنٰى وَأَرْجُلُهُمُ الْيُسْرٰى أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ط أَوْ لِتَرْتِيْبِ الْأَحْوَالِ فَالْقَتْلُ لِمَنْ قَتَلَ فَقَطْ وَالصَّلْبُ لِمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَالْقَطْعُ لِمَنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَالنَّفْيُ لِمَنْ أَخَافَ فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَنَّ الصَّلْبَ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقَتْلِ وَقِيْلَ قَبْلَهُ قَلِيْلًا وَيُلْحَقُ بِالنَّفْيِ مَا أَشْبَهَهُ فِي التَّنْكِيْلِ مِنَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ ذٰلِكَ الْجَزَاءُ الْمَذْكُوْرُ لَهُمْ خِزْيٌ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ هُوَ عَذَابُ النَّارِ.

৩৩. উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় আসে। তারা ছিল **অসুস্থ। তখন রাসূল** ﷺ তাদেরকে উষ্ট্র-চারণক্ষেত্রে গিয়ে **[ঔষধ হিসেবে] উষ্ট্রের দুধ** ও প্রস্রাব পান করতে অনুমতি **দেন। পরে এরা সুস্থ হয়ে** উক্ত চারণক্ষেত্রের রাখালদেরকে হত্যা **করে উটগুলো** নিয়ে পালিয়ে যায়। [রাসূল ﷺ এদেরকে **ধরে এনে** শাস্তি প্রদান করেছিলেন।] এদের বিষয়ে **আল্লাহ** তা'আলা নাজিল করেন– যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাহাজানি করত দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে او [অথবা] শব্দটি অবস্থার প্রেক্ষিতে শাস্তির বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। যে ব্যক্তি কেবল হত্যাকাণ্ড করেছে তার শাস্তি হলো হত্যা; আর যে ব্যক্তি হত্যা ও ছিনতাই উভয় অন্যায় করছে তার শাস্তি হলো ক্রুশবিদ্ধ করা; যে ব্যক্তি কেবল ছিনতাই করেছে হত্যা করেনি তার **শাস্তি হলো হস্ত-পদ ব্যবচ্ছেদকরণ**; আর যে ব্যক্তি শুধু ভীতি প্রদান করেছে তার শাস্তি হলো নির্বাসন। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এটাই। তবে তাঁর অধিকতর সঠিক অভিমত হলো, এ ধরনের অপরাধীকে হত্যা করত তিন দিন পর্যন্ত শূলে লটকিয়ে রাখা হবে। কেউ কেউ বলেন, হত্যার পূর্বে কিছুক্ষণ শূলে লটকানো হবে। নির্বাসনদণ্ডের অনুরূপ যেসব সম্মানসম্পন্ন দণ্ড রয়েছে, যেমন বন্দী করা ইত্যাদিও এর শামিল বলে বিবেচ্য। এটাই অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্তি দুনিয়ায় তাদের লাঞ্ছনা অবমাননা এবং তাদের জন্য পরকালেও রয়েছে মহা শাস্তি। অর্থাৎ জাহান্নামের আজাব।

٣٤. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ الْمُحَارِبِيْنَ وَالْقُطَّاعِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ مَا اَتَوْهُ رَحِيْمٌ بِهِمْ عُبِّرَ بِذٰلِكَ دُوْنَ فَلَا تَحُدُّوْهُمْ لِيُفِيْدَ اَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِتَوْبَتِهِ اِلَّا حُدُوْدَ اللّٰهِ دُوْنَ حُقُوْقِ الْاٰدَمِيِّيْنَ كَذَا ظَهَرَ لِىْ وَلَمْ اَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِذَا قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ يُقْتَلُ وَيُقْطَعُ وَلَا يُصْلَبُ وَهُوَ اَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَلَا تُفِيْدُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ اَصَحُّ قَوْلَيْهِ اَيْضًا ـ

৩৪. তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা অর্থাৎ রাহাজানিকারী ও যুদ্ধকারীদের মধ্যে যারা তওবা করবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। জেনে রাখ যা তারা করেছে তৎপ্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু। এখানে لا تحدوهم অর্থাৎ "তওবা করলে এদের উপর হদ আরোপ করো না" এ কথা না বলে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' ভঙ্গিতে বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তওবার মাধ্যমে কেবল আল্লাহর হকই রহিত হতে পারে; এতে মানুষের হক মাফ হয়ে যাবে না। আমি এর **এতটুকুই মর্মোদ্ধার করতে পেরেছি। মুফাসসিরগণের কেউ এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন বলে দেখিনি। যদি কেউ হত্যা ও ছিনতাই উভয় ধরনের অপরাধ করে তবে তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর** অধিকতর সঠিক অভিমত হলো তাকে অঙ্গচ্ছেদ ও হত্যা উভয় ধরনের শাস্তি প্রদান করা হবে। তাকে শূলে চড়ানো হবে না। ইমাম শাফেয়ীর অধিকতর সঠিক অভিমত হলো, আয়ত্তাধীন হওয়ার পর যদি সে তওবা করে তবে তাতে কোনো লাভ হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُتْلُ : অর্থ– পড়, তেলাওয়াত কর। تِلَاوَةٌ মাসদার থেকে وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهُ تَبُوْءَ : এটি (ن) بَوْءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ– তুমি অর্জন করবে, তুমি ফিরবে।

قَوْلُهُ طَوَّعَتْ : تَطْوِيْعٌ মাসদার থেকে مَاضِىْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। সে আগ্রহ জাগিয়েছে, সে রাজি করেছে, সে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে সহজ করে দিয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন]

قَوْلُهُ سَوْءَةَ : اَىْ حَمَلَ الْجَسَدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ অর্থাৎ স্বীয় ভাই হাবীলের লাশকে নিজের পিঠে বহন করে ঘুরছিল এবং দাফনের পদ্ধতি না জানা থাকার কারণে লজ্জিত হয়েছে। حَمَلَهٗ -এর আরেকটি মর্ম এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, حَمَلَهٗ -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো قَتَلَ তখন তরজমা হবে কাবীলকে তার নফস স্বীয় ভ্রাতা হাবীলকে হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার কারণে সে লজ্জিত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا : এর সম্পর্ক হলো كَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -এর সাথে। অর্থাৎ যে একটি প্রাণ হত্যা করে তার মানহানি করল, সে যেন সকল প্রাণের মানহানি করল।

قَوْلُهُ وَصَوْنِهَا : এর সম্পর্ক فَكَاَنَّمَا اَحْيَى النَّاسَ جَمِيْعًا -এর সাথে। অর্থাৎ যেন সে একটি প্রাণ রক্ষা করে সকল মানুষের প্রাণকে বাঁচিয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَصَوْنِهَا : এ জুমলাটি لَفّ نَشْر مُرَتَّبْ হিসেবে হয়েছে।

قَوْلُهُ عُرَنِيِّيْنَ : এটি عَرَبِىٌّ-এর বহুবচন। এটি আরবের একটি গোত্র عُرَيْنَةَ -এর দিকে সম্পৃক্ত ; عُرَنِيِّيْنَ -এর মধ্যে يَاء হলো نَسْبِىْ যেমন جُهَيْنِىْ শব্দটি جُهَيْنَة গোত্রের দিকে নিসবত হয়েছে। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ اَوْ لِتَرْتِيْبِ الْاَحْوَالِ : অর্থাৎ اَوْ শব্দটি কুরআনের যেখানেই এসেছে সেখানে تَخْيِيْر -এর জন্য এসেছে। শুধুমাত্র এখানে তা تَرْتِيْب -এর জন্য এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتْلُ : এর عَطْف হয়েছে পূর্বের উহ্য اُذْكُرْ -এর সাথে। اَىْ اُذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর মাঝে সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্পষ্ট। তাহলে مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর মাঝে জিহাদ থেকে কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জীবন বাঁচানোর আলোচনা রয়েছে আর مَعْطُوْف -এর মাঝে অন্যায়ভাবে প্রাণ হত্যার আলোচনা রয়েছে। উভয়টিই অপরাধ ও গুনাহ।

قَوْلُهُ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ : এর দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর দুই ঔরসজাত পুত্র হাবীল ও কাবীলকে বুঝানো হয়েছে। কাবীল ছিল বড় ছেলে। তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল কৃষিকর্ম। আর হাবীল ছিল ছোট। তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল পশু পালন। হাসান (র.) বলেন, উক্ত ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক। কেননা এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে যে, হত্যাকারী লাশ দাফনের পদ্ধতি জানত না। একটি কাকের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে দাফন কার্য সম্পন্ন করে। যদি তা বনী ইসরাঈলের ঘটনা হতো তাহলে দাফনের পদ্ধতি জানা থাকার কথা ছিল। কেননা ইতিপূর্বে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকবে।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ : [হে আমার পয়গাম্বর!] عَلَيْهِمْ তাদের কাছে। এর সর্বনামটি কাদের দিকে ইঙ্গিতবহ? আহলে কিতাব এবং বিশেষ করে আহলে কিতাবদের মাঝে যারা বিদ্বেষপরায়ণ তাদের দিকে ইঙ্গিতবহ। যেমন বলা হয়েছে– وَاتْلُ عَلٰى اَهْلِ الْكِتَابِ আহলে কিতাবদেরকে শোনান। –[তাফসীরে কাবীর]

এসব বিদ্রোহী, বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের কাছে বর্ণনা করুন। –[ইবনে কাসীর] এসব ইহুদিদের কাছে বর্ণনা করুন, যারা তাদের হাত তোমাদের প্রতি উঠাতে চায়। –[ইবনে জারীর] কিন্তু সব মানুষের প্রতি সম্বোধনটি হতে পারে। যথা وَاتْلُ عَلَى النَّاسِ মানুষকে শোনান। –[তাফসীরে কাবীর]

ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো দু'টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। যথা– ১. বংশমর্যাদা কোনো কাজে আসে না। সে-ই আল্লাহর কাছে মকবুল, যে তাঁর হুকুমের অনুসারী হয়। ২. বিদ্বেষবশত মানুষ কত জঘন্য শয়তানি কাজ 'অন্যায়'-ই না করে বসে! اِبْنَىْ اٰدَمَ মানে আদম (আ.)-এর দুই পুত্র। এঁরা হলেন- হাবিল ও কাবীল। তাওরাতে কায়েন ও হাবিল উল্লেখ আছে। কাবীল ছিল বড় এবং হাবিল ছিল ছোট। তাওরাতের বর্ণনায় জানা যায় যে, কাবীল ছিল কৃষিজীবী এবং হাবিল ভেড়া বকরি চরাতো এবং ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। بِالْحَقِّ অর্থাৎ যথাযথভাবে। উহ্য বাক্যটি এরূপ– مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ - تِلَاوَةً مُتَلَبِّسَةً بِالْحَقِّ وَالصِّحَّةِ অর্থাৎ সঠিকভাবে, সঠিক ও সত্যভাবে শোনান। –[কাশ্‌শাফ]

তাজ্জবের ব্যাপার নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো কুরআনের বর্ণিত এ ঘটনা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য। তাওরাত গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় এ কাহিনীটি সত্য মিথ্যা মিশ্রিত নয়। বিশিষ্ট মুফাসসির ইমাম রাযী (র.) অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন; অর্থাৎ কুরআনের এ কাহিনী, কুরআনের অন্যান্য কাহিনীর ন্যায় হেদায়েতের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। পুরানো জাহেলিয়্যাত ও আধুনিক জাহেলিয়্যাতের ন্যায় কাহিনী কেবল কাহিনীর জন্য, আর্ট কেবল আর্টের জন্য; কুরআন মাজীদের মাকসুদ তা নয়। অর্থাৎ তা নির্ভরযোগ্য, অধিকাংশ গল্পকারের ন্যায় তা আমোদ-ফূর্তির উপকরণ নয়, যার মধ্যে কোনো ফায়দা বা উপকার নেই, বরং তা অবান্তর কথা মাত্র। –[তাফসীরে কাবীর]

আর একথাটি এ কাহিনীর সাথে কেবল সম্পৃক্ত নয়, বরং কুরআন মাজীদে বর্ণিত সমস্ত কিসসা-কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হলো– উপদেশ, নসিহত ও হেদায়েত গ্রহণ ও কবুল করা। এ থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, কুরআনে কিসসা কাহিনী বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো– উপদেশ গ্রহণ করা, তা কেবল কাহিনী-ই নয়। –[তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১০৪]

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য : তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ

মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনোরূপ মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ থাকা এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়া উচিত নয়।

পবিত্র কুরআন শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ; দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে– إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ; তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে– ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ এসব জায়গায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাথে حَقّ শব্দ ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, ঘটনাবলি বর্ণনায় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। জগতে রেওয়ায়েত ও বর্ণনার ভিত্তিতে যেসব অনিষ্ট দেখা দেয়, সাধারণত সেগুলোর মূল কারণ ঘটনাবলি বর্ণনায় অসাবধানতা। সামান্য শব্দ ও ভঙ্গির পরিবর্তনে ঘটনার বিবরণ বিকৃত হয়ে যায়। এ অসাবধানতার কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও শরিয়ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলি কতিপয় ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক গল্প-গুজবের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। আয়াতে بِالْحَقِّ শব্দযোগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা পবিত্র কুরআনের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্যত নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলি যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ আল্লাহর ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর পবিত্র কুরআন পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন– إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারো নৈকট্যলাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে কুরবান বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় কুরবান ঐ জন্তুকে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানির ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) একে পূর্ববর্তী পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনা : যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আসেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা-এরূপ যমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। তখন ভ্রাতা -ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে হযরত আদম (আ.)-এর শরিয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনীরূপে গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমা সুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়ামানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ.) তাঁর শরিয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানি গৃহীত হবে, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। হযরত আদম (আ.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানিই গৃহীত হবে।

তৎকালে কুরাবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা অবতীর্ণ হয়ে কুরবানিকে ভস্মীভূত করে তা আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি ভস্মীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করতো। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটিকে ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল– لَاَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত্য বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল– إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ম

এই যে, তিনি আল্লাহভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানিও গৃহীত হতো। তুমি তা করনি, তাই কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

এ বাক্যে হিংসুটের হিংসার প্রতিকার বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসাকারী যখন দেখে যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, যা সে প্রাপ্ত হয়নি, তখন একে নিজ কর্মদোষ ও গুনাহের ফলশ্রুতি মনে করে গুনাহ থেকে তওবা করা উচিত। অন্যের নিয়ামত আপনোদনের চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হবে বেশি। কারণ, আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়া আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল।

সৎকর্ম গৃহীত হওয়া আন্তরিকতা ও আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল : এখানে হাবিল ও কাবিলের কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যে, সৎকর্ম ও ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ ভীতির উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, তার সৎকর্মও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলেমগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত ইবাদতকারী ও সৎকর্মীদের জন্য চাবুক স্বরূপ। এজন্যই হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) অন্তিম মুহূর্তে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি তো সারা জীবন সৎকর্ম ও ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এখন কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, তোমরা তো একথা বলছ, আর আমার কানে আল্লাহ তা'আলার এ বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ; আমার কোনো ইবাদত গৃহীত হবে কিনা? তা আমার জানা নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, **আল্লাহ তা'আলা আমার কোনো সৎকর্ম** গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হবে আমার **জন্য একটি বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণে পরিণতি হয়ে** আমার অধিকারে এসে গেলেও **আমি তাকে কিছুই মনে করব না।**

হযরত আবুদারদা (রা.) বলেন, যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আমার একটি নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে, তবে আমার জন্য এটি হবে সমগ্র বিশ্ব ও তার অগণিত নিয়ামতের চাইতেও উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) কোনো এক ব্যক্তিকে পত্র মারফত নিম্নোক্ত উপদেশাবলি প্রেরণ করেন, আমি জোর দিয়ে বলছি যে, তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন কর। এছাড়া কোনো সৎকর্ম গৃহীত হয় না। আল্লাহভীরু ছাড়া কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না এবং এটি ছাড়া কোনো কিছুর ছওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক; কিন্তু একে কাজে পরিণত করে এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহভীতির সাথে ছোট সৎকর্মও ছোট নয়। যে সৎকর্ম গৃহীত হয়ে যায়, তাকে কেমন করে ছোট বলা যায়। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ৯৮-১০১]

قَوْلُهُ قُرْبَانًا : এখানে قُرْبَانًا [কুরবানি] শব্দের প্রচলিত অর্থ জবাই করা নয়; বরং শাব্দিক অর্থ খুবই গুরুত্ববহ; যথা- মানত করা। যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়, তাই-ই কুরবানি [রাগিব]। যে জবাই ও কুরবানির দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা হয়, তার নামই কুরবানি [কবীর]। যে ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের নৈকট্য হাসিল করার ইচ্ছা করা হয়, তাই কুরবান [জাস্‌সাস]। قُرْبَانٌ বিশেষ্য জাতীয় শব্দ। এক বা দ্বিবচনে এর প্রয়োগ এরূপই হয়ে থাকে। বিশেষ্য জাতীয় শব্দ এক বা দ্বিবচনের জন্য ব্যবহার হতে পারে। -[তাফসীরে কবীর, তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১০৫]

হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ও আনুষঙ্গিক তাৎপর্য : হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসজাত ছেলে হাবীল ও কাবীলের ঘটনা তাদেরকে শোনাও। কেননা সে ঘটনায় মহান আল্লাহর কাছে এক ভাইয়ের সমাদর ও তার তাকওয়া পরহেজগারীর কারণে তার প্রতি অপর ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে অন্যায় রক্তপাতের কী পরিণাম তাও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বের রুকুতে বলা হয়েছিল, বনী ইসরাঈলকে যখন অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে। এবার হাবীল ও কাবীলের ঘটনাটি মূলত এ বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুত্তাকী ও মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। তাদেরকে তা থেকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সাবধান ও নিষেধ করা হয়েছিল। তথাপি তাদেরকে সর্বদাই সে কাজে কীরূপ কৃতসংকল্প ও তৎপর লক্ষ্য করা যায়! তারা পূর্বেও বহু নবীকে হত্যা করেছে। আজও মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নবীর বিরুদ্ধে কেবল হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কী রকম জঘন্য চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন জালিম ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে আত্মরক্ষা করা, অপর দিকে নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষের প্রাণনাশ ও গ্রেফতারের চক্রান্ত করা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এর

উপর আবার তারা দাবি করে আমরা মহান আল্লাহর ছেলে ও তাঁর প্রিয়জন। এ বক্তব্য অনুযায়ী কাবীল ও হাবীলের কাহিনী এবং সে প্রসঙ্গে مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ আয়াত উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ, যা পরবর্তী আয়াত وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -এর মাঝে ব্যক্ত হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৯৯]

قَوْلُهٗ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ الخ : হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে তার জন্য সেই জালিমকে হত্যা করার অনুমতি আছে। তবে ধৈর্যধারণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আর এটা সে আক্রমণকারী মুসলিম হলে তখনকার কথা। পক্ষান্তরে যেকানো প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের মাঝে শরয়ী কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সেখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা জায়েজ নয়, যেমন কাফের ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা। ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ আর যারা কখনো বিদ্রোহের সম্মুখীন হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

-[সূরা শূরা, তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১০৩]

قَوْلُهٗ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ : অর্থাৎ তোমার ভয়ে নয়; বরং মহান আল্লাহকে ভয় করে আমি তোমাকে অনুরোধ করি শরিয়তের সীমারেখা **অনুযায়ী যতক্ষণ সম্ভব তুমি ভাইয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করো না।** আইয়ূব সুখতিয়ানী (র.) বলতেন, **উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এ আয়াতের নির্দেশ পালন করে দেখিয়েছেন, তিনি হলেন তৃতীয় খলীফা** হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)। -[ইবনে কাসীর] **তিনি আপন শিরচ্ছেদ হতে দিয়েছেন, তবু নিজ ইচ্ছায় কোনো একজন** মুসলিমের আঙ্গুলও কাটা যেতে দেননি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৪]

قَوْلُهٗ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓءَ بِاِثْمِىْ الخ : হত্যাকারীর উপর নিহতের পাপ চাপিয়ে দেওয়া হবে, **নিজের অন্যান্য পাপের** সাথে আমাকে হত্যা করার পাপও অর্জন করে নাও। ইবনে জারীর (র) মুফাসসিরগণের ঐকমত্য বর্ণনা করেন যে, এটাই بِاِثْمِىْ -এর অর্থ। আর যারা বলেন, কিয়ামতের দিন মজলুমের গুনাহের বোঝা জালিমের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের সে বক্তব্যও এক পর্যায়ে সঠিক। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সেটা এ আয়াতের ব্যাখ্যা নয়। এবার হাবীলের বক্তব্যের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার গুনাহ নিজ মাথায় চাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক, তবে আমিও সিদ্ধান্ত করেছি আত্মরক্ষার কোনো উপায় অবলম্বন করব না। যাতে করে আইনের উর্ধ্বে উচ্চতর আদর্শ বর্জনের অভিযোগও আমার উপর না বর্তায়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৫]

হত্যাকারীর পরিণতি : পার্থিব ক্ষতি তো এই যে, যার দ্বারা তার বাহুবল বৃদ্ধি পেত, এমন একজন শক্তিমান ভাইকে সে হারাল এবং শেষ পর্যন্ত নিজে উন্মাদ হয়ে মারা গেল। হাদীসে আছে জুলুম ও আত্মীয়তা ছেদন, এমন দুটি পাপ, যার শাস্তি আখিরাতের আগে ইহজগতেই ভোগ করতে হয়। আর পরকালীন ক্ষতি এই যে, দুনিয়ার জুলুম আত্মীয়তা বিচ্ছেদ, ইচ্ছাকৃত হত্যা ও নিরাপত্তাহীনতার দুয়ার খুলে দেওয়ার কারণে এক তো সে এসব গুনাহের শাস্তির উপযুক্ত হলো, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতেও এ প্রকারের যত পাপাচার দুনিয়ার সংঘটিত হবে, প্রথম উদ্ভাবক হিসেবে সে তার সবগুলোতে অংশীদার থাকবে, যেমন হাদীসে স্পষ্ট আছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৮]

লাশ মাটিতে দাফনের প্রচলন : এর আগে আর কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি। তাই হত্যা করার পর সে বুঝতে পারল না লাশ কী করবে? অবশেষে সে দেখল, একটি কাক মাটি খুড়ছে বা অন্য একটি মরা কাককে মাটি সরিয়ে তাতে লুকাচ্ছে । তখন তার কিছুটা হুঁশ হলো যে, আমিও তো ভাইয়ের লাশ দাফন করে ফেলতে পারি। সেই সঙ্গে অনুতাপও হলো যে, বিবেক-বুদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববোধে আমি এ তুচ্ছ প্রাণীটি অপেক্ষাও অধম হয়ে গেলাম? সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা একটি মামুলী প্রাণী দ্বারা এ জন্যই তাকে সচেতন করেছেন যে, সে নিজ পাশবিকতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষণিক লজ্জিত হোক। পশুপাখীর মধ্যে কাকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজ ভাইদের লাশ মুক্ত স্থানে পরিত্যাক্ত দেখলে প্রচণ্ড হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৯]

قَوْلُهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ : অনুতাপ তো কেবল সেটাই কাজে আসে যার সাথে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা, বিনয় ও সমতা এবং প্রতিবিধানের ফিকির থাকে। এখানে তার মন:স্তাপ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে ছিল না; বরং এর কারণ ছিল নিজের দূরবস্থা, সে হত্যা করার পর যার সম্মুখীন হয়েছিল। -[তাফসীরে উসমানী: টীকা- ১১০]

লাঞ্ছনা ও ক্ষতি এর থেকে আর বেশি কী হতে পারে যে, সে দুনিয়াতে সর্বপ্রথম খুন করে এবং মানুষ খুন তথা স্বীয় ভাইয়ের খুনের অপরাধে অপরাধী হয়। ফলে সে আখিরাতে কঠোর আজাবের হকদার হয়। فَاَصْبَحَ অর্থাৎ সে হয়ে গেল। এখানে اَصْبَحَ শব্দের অর্থ– কতল বা হত্যা রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছিল, তা নয়; বরং এর অর্থ হলো– কোনো এক সময়ে। হত্যা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দিনরাতের যে সময়েই তা হোক না কেন, এ শব্দের দৃষ্টিতে তা হয় জায়েজ। اَصْبَحَ শব্দটি صَارَ শব্দের অনুরূপ অর্থাৎ হয়ে গেল। আরবি ভাষা-ভাষীদের কাছে এরূপ প্রচলন আছে। কেউ কেউ এ বাকধারার অর্থ বুঝতে ভুল করে। যেমন বর্ণিত আছে اَصْبَحَ অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড রাতে সংঘটিত হয়েছিল; বরং এর অর্থ হলো অনির্ধারিত সময়, তা দিনেও হতে পারে এবং রাতেও সংঘটিত হতে পারে। আরব ভাষা-ভাষীরা এরূপই অর্থ নিয়ে থাকেন। –[জাসসাস] তোমরা কি দেখ না, তারা اَمْسٰى - اَضْحٰى، ظَلَّ ও بَاتَ এ শব্দগুলোর অর্থ صَارَ বা হয়ে গেল নিয়ে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১১৫]

قَوْلُهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ : অর্থাৎ অন্যায় হত্যাকাণ্ডের মাঝে যে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষতি রয়েছে এবং যে অশুভ পরিণতি তা বয়ে আনে, তার দরুন এমন কি খোদ ঘাতকও অনেক সময় নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতাপদগ্ধ হতে থাকে। এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে এ বিধান দেই যে......। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১১]

قَوْلُهُ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ : দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি বহু রকমে হতে পারে। যেমন সত্যপন্থিদেরকে সত্য দীনে বাধা প্রদান, নবীগণের অবমাননা কিংবা নাউযুবিল্লাহ মুরতাদ হয়ে গিয়ে নিজ অস্তিত্ব দ্বারা অন্যকে মুরতাদ হতে প্ররোচিত করা ইত্যাদি।
–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১২]

قَوْلُهُ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا এক ব্যক্তি হত্যা সকলকে হত্যার সমতুল্য : এ আয়াতের উপর এরূপ প্রশ্ন হতে পারে যে, এক ব্যক্তির হত্যাকারী, কিরূপে সকল মানুষের হত্যাকারীর সমান হতে পারে? আয়াতে فَكَاَنَّمَا [অর্থাৎ সে যেন করলো]। শব্দের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রশ্ন আর থাকে না। এরূপ ইরশাদ হয়নি যে, একজনকে হত্যাকারী এবং সকলকে হত্যাকারী কানুন বা আইনের দৃষ্টিতে সমান। আদালতের কানুন ও নিয়মের দৃষ্টিতে উভয়ই সমান তা বলা হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হলো হত্যাকারীর স্বভাবের উপর আলোকপাত করা। যে জালিম ও অত্যাচারী বিনা কারণে এবং বিনা দোষে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন নাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তবে এ দুঃসাহস এবং নাফসের পাপিষ্ঠতা পারলে সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করে ফেলবে। এখানে তার দৃষ্টিতে আসল উদ্দেশ্যে হলো শরিয়তের কানুনের অমর্যাদা করা এবং তা অবমাননার জন্য দুঃসাহস দেখানো। এ হিসেবে যে, সে হারামভাবে রক্ত প্রবাহের পর্দা বিদীর্ণ করেছে এবং কতলের প্রচলন ঘটিয়েছে এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে এ নিয়ম চালু করেছে। –[বায়যাভী]

এক ব্যক্তির হত্যাকারীকে সকল মানুষের হত্যাকারীর সাথে এজন্য তুলনা করা হয়েছে যে, হত্যার কাজকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যাতে বুঝানো যায়। –[তাফসীরে কাবীর]

বর্ণিত আছে, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি একজনকে খুন করা হালাল বা বৈধ মনে করলো , সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করা হালাল মনে করলো; কেননা, সে শরিয়তের বিধানকে অস্বীকার করেছে।

মহানবী ﷺ -এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে একস্থানে উল্লেখ আছে যে, সারা পৃথিবীর যেখানেই কোনো না-হক হত্যা সংঘটিত হয়, তার শাস্তির একটা অংশ কাবিলের আলমানামায় লিখিত হয়। কেননা এ ধরনের জুলুম ও অত্যাচারের সর্বপ্রথম স্থপতি সে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না। এরূপ করলে হযরত আদম (আ.)-এর প্রথম পুত্রের উপর এর একটা অংশ চলে যাবে। কেননা, সে-ই ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কতলের ধারা প্রবাহিত করে। –[বুখারী শরীফ, কিতাবুল আম্বিয়া। আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং তাঁর বংশধরগণ অধ্যায়]

বর্তমান তাওরাতে মানুষ হত্যার অপরাধ সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মানুষের খুন বা রক্ত প্রবাহিত করবে, অন্য মানুষের দ্বারা তার রক্ত প্রবাহিত করানো হবে। কেননা মানুষকে তাঁর সুরতে সৃষ্টি করেছেন। –[আদি পুস্তক ৯ : ৬]। কিন্তু তালমুদে, [কুরআনের ইংরেজী ভাষ্যকার রাডবীলের বর্ণনানুসারে] নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি বর্ণিত আছে : যে কেউ একজন ইসরাঈলীকে হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ মনে করা হবে যে, সে যেন ইসরাঈল বংশের সকলকে হত্যা করলো।

একটি সহীহ হাদীসে এ মর্মে উদ্ধৃত আছে, যা একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজের প্রচলন করবে এবং তার পর আমল করবে, সে তার বিনিময় লাভ করবে এবং সেই কাজের আমল অন্য যারা করবে, তাদের

আমলের সমপরিমাণ বিনিময়ও সে পাবে; এমতাবস্থায় তাদের আমলের বিনিময় কম দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি একটি খারাপ কাজের প্রচলন করে এবং নিজে তা আমল করে, তার বিনিময় সে পাবে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের কাজের হিসেবে সেও এর একটা হিস্‌সা পাবে। এমতাবস্থায় তাদের গুনাহের প্রতিফল কম দেওয়া হবে না। হাদীসে যদি এরূপ ব্যাখ্যা নাও থাকতো, তবুও এই মাসআলাটি যথাস্থানে জ্ঞান ও বিবেকসম্মত। এখানে أَحْيَاهَا শব্দের অর্থ জীবিত করা নয়; বরং এর অর্থ হলো– মৃত্যু থেকে বাঁচানো এবং ধ্বংসকর কারণ থেকে দূরে রাখা। যেমন মুজাহিদ বলেন– نَجَّاهَا مِنَ الْهَلَاكَةِ অর্থাৎ সে যেন ধ্বংস থেকে তাকে রক্ষা করলো, যে ব্যক্তি তার কতল থেকে রক্ষা পেল। প্রাণ রক্ষা করা– এর অর্থ হলো ধ্বংস থেকে রক্ষা করা। যেমন জ্বালানো, ডুবানো, প্রচণ্ড ক্ষুধা, প্রচণ্ড শীত, গরম ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। এই বাঁচানো বা রক্ষা করা তখনই প্রশংসার দাবিদার ও বিনিময় পাওয়ার যোগ্য হবে, যখন সে বাঁচানো হবে না-হক খুন থেকে। পক্ষান্তরে, বাঁচানোকে যদি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে কিসাস ইত্যাদির সময় যদি কাউকে ওয়াজিব খুন থেকে বাঁচানো হয়, তবে তা হবে গুনাহ এবং হারামের উপর সাহায্য করার মতো। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১২০,১২১]

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তি ভঙ্গ করাই হলো সীমালংঘন : বনী ইসরাঈলের বহু লোক এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও দ্ব্যর্থহীন আদশোবলি শুনেও নিজেদের জুলুম নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘন হতে নিবৃত্ত হয়নি। নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করা ও নিজেদের মধ্যে খুন-খারাবি করা তাদের চিরায়ত স্বভাব। আজও তারা শেষ নবী ﷺ -কে [নাউযুবিল্লাহ] হত্যা বা উৎপীড়ন করার এবং মুসলিমগণকে হেনস্থা করার জন্য সর্বতোভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তারা এতটুকুও উপলব্ধি করে না যে, তাওরাতের বিধান অনুসারে যে কোনোও একজন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করাটা এতবড় অপরাধ যে, ঘাতক বিশ্বের সমগ্র মানুষের হত্যাকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়, তখন বিশ্ব-মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা সমাদৃত ও পবিত্র মানব সমাজকে হত্যা ও উৎপীড়ন করা, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও লড়াই করতে বদ্ধপরিকর হওয়া মহান আল্লাহর নিকট কত বড় জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহর দূতগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো খোদ মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর! সম্ভবত এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে সেইসব লোকের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাক ও নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে লড়াই করে বা পৃথিবীতে নানা রকম অশান্তি বিস্তারে 'সীমালঙ্ঘনকারী' সাব্যস্ত হয়। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-১১৫]

ثُمَّ শব্দটি কখনো কখনো দূরের অর্থ প্রকাশ করে। –[রূহুল মা'আনী] বস্তুত এখানকার অর্থ হলো পয়গাম্বরদের আগমনের কারণে যে ফল ও লাভ হয়, এখানে তার কিছুই হয়নি; বরং উল্টো ফল দেখা যায়।

لَمُسْرِفُوْنَ অবশ্যই তারা সীমালঙ্ঘনকারী। اِسْرَافٌ শব্দের সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও গুনাহ শামিল। এর তাৎপর্য হলো পয়গাম্বররা আগমন করা সত্ত্বেও অধিকাংশ ইসরাঈল খোদায়ী বিধানের লাগাতার বিরোধিতা করতে থাকে। সব কাজে বাড়াবাড়ি করাই হলো اِسْرَافٌ [রূহ] অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই ছিল সীমা অতিক্রমকারী, আল্লাহর হুকুম তরককারী। –[কুরতুবী]

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারী এবং নিজেদের প্রবৃত্তির সেবাদাস, নিজেদের নবীদের খেলাফকারী। তাদের এসব কাজ ছিল জমিনের মধ্যে তাদের বাড়াবাড়ির শামিল। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১২৩]

এখানে এ ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য : এখানে হাবীল ও কাবিলের ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদেরকে তাদের চক্রান্ত ও হিংসার প্রতি খুব সূক্ষ্মভাবে নিন্দা করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ইহুদিদের একটি দল রাসূল ﷺ এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীকে খাবারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং সংগোপনে এ চক্রান্ত করেছিল যে, তাঁদের প্রতি অতর্কিত হামলা করবে। এভাবে তারা ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে চক্রান্তের কথা তাঁর নবীকে জানিয়ে দেন। ফলে তিনি তাদের দাওয়াতে শরিক হননি। তাদের এ চক্রান্ত একমাত্র এ জন্য ছিল যে, আখেরী জমানার নবী বনী ইসরাঈলের মাঝে না এসে বনী ইসমাঈলে কেন এলেন? অথচ তারা তাঁর নবী হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জানত। –[জামালাইন-২/১৮৬]

قَوْلُهُ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ : শানে নুযূল : উকাল এবং উরায়না থেকে কিছু লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় এলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যানুকূল হলো না। [তাই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ তাদেরকে মদীনার বাইরে অবস্থিত সদকার উটের আস্তাবলে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তোমরা সেখানে গিয়ে উটের দুধ এবং পেশাব পান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ করে দিবেন। রাসূল ﷺ -এর কথামতো তারা আমল করল। অল্প দিনেই তারা

সুস্থ হয়ে যায়। সুস্থ হওয়ার পর তাদের দুর্মতি হলো। উট ও আস্তাবলের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী হযরত ইয়াসার (রা.)-এর চোখ উপড়ে ফেলে এবং পরে তাকে হত্যাও করে। তারপর উটগুলো নিয়ে নিজেদের দেশের দিকে রওয়ানা হলো এবং মুরতাদ হয়ে গেল। মদীনায় এ সংবাদ পৌঁছল। নবী কারীম ﷺ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে সরদার নিযুক্ত করে কিছুসংখ্যক সাহাবীকে প্রেরণ করলেন তাদেরকে ধরে আনার জন্য। অবশেষে তারা ধরা পড়ে। তারপর অপরাধীদের সকলের চোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং হত্যা করে ফেলা হয়। -[জামালাইন ২/১৮৬]

কুরআনি আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে আল্লাহভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মতো কুরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালকল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোনো আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কুরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতের অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরিয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরিয়তের পরিভাষার কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'পাকিস্তান দণ্ডবিধি' ও 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়তে এরূপ নয়। ইসলামি শরিয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত অর্থাৎ দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানানোর পূর্বে প্রথমত একথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, এসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানি করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' [আল্লাহর হক] এবং 'হক্কুল ইবাদ [বান্দার হক] দু'ই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহর হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধিবিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত একথা জানা জরুরি যে, ইসলামি শরিয়ত বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামি সরকার যদি শরিয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েজ। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামি দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোনো শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, যেসব শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' তথা 'দণ্ড' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম। যথা-

১. যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এর বহুবচন 'হুদূদ'।
২. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরিয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কিসাস'। কুরআন পাক হুদূদ ও কিসাস পূর্ণ ব্যাখ্যাসহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতেরও উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কুরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, যেস জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা দণ্ড। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরিয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরিয়তের বিধিবিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোনো সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোনো পার্থক্য হয় না এবং কোনো শাসক ও বিচারক তা ক্ষমা করতে পারে না। **শরিয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি :** ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ এ চারটির শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোনো শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গুনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যেও শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়। কিন্তু হুদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুটিই নাজায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদূদের শাস্তি সাধারণত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলিও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলির মধ্য থেকে যদি কোনো একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রয়োজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরিয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোনো সন্দেহ অথবা কোনো শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রয়োজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরিয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত দৈহিক ও শারীরিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হবে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোনো ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে। কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মতো কুরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হদূদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণত যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রয়োজ্য হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কিসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। জখমের কিসাসও তদ্রূপ।

পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কিসাস অপ্রয়োজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করেন দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে, এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোনো শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

এ পর্যন্ত হুদূদ, কিসাস, তা'যীরাত প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ ও তৎসংক্রান্ত জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হলো। এবার এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও হুদূদের বিবরণ শুনুন। প্রথম আয়াতে যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম ও মুকাবিলা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করার অর্থ কি এবং এরা কারা? مُحَارَبَةٌ শব্দটি حَرْبٌ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ হলো– ছিনিয়ে নেওয়া। বাচন পদ্ধিতিতে এ শব্দটি سِلْمٌ অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, حَرْبٌ -এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার করা। একথা জানা যে, বিক্ষিপ্ত

চুরি, হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না; বরং কোনো সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী দল ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাজে প্রবৃত্ত হলেই জননিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকহবিদরা ঐ দল অথবা ব্যক্তিদের এ শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ডাকাতি করে এবং শক্তির জোরে সরকারের আইন ভঙ্গ করতে চায়। শব্দান্তরে তাদেরকে ডাকাত দল অথবা বিদ্রোহী দল বলা যায়। সাধারণ চোর, পকেটমার প্রমুখ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আলোচ্য আয়াতে مُحَارَبَةٌ অর্থাৎ সংগ্রাম করাকে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, অথচ ডাকাত অথবা বিদ্রোহীদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে। এর কারণ এই যে, কোনো শক্তিশালী দল যখন শক্তির জোরে রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তখন বাহ্যত জনগণের সাথে সংঘর্ষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে। রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ ও রাসূলের আইন কার্যকর থাকবে, তখন এ সংঘর্ষও আল্লাহ ও রাসূলের বিপক্ষেই গণ্য হবে।

সারকথা এই যে. প্রথম আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ঐসব ডাকাত ও বিদ্রোহীদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং প্রকাশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার চেষ্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অর্থ লুণ্ঠন করা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই مُقَاتَلَةٌ ও مُحَارَبَةٌ শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। مُقَاتَلَةٌ শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাতে কেউ নিহত হোক বা না হোক এবং অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে مُحَارَبَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি সহকারে অশান্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করা।

এ অপরাধের শাস্তি কুরআন পাক স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহর হক অর্থাৎ গভর্নমেন্টবাদী অপরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে। শরিয়তের পরিভাষায় একেই 'হদ' বলা হয়। এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি। আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا ...... مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ : অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। প্রথমোক্ত তিন শাস্তিতে بَابُ تَفْعِيْل থেকে مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার পৌন:পুনিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ক্রিয়াপদে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অথবা শূলে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেওয়া সাধারণ শাস্তির মতো নয় যে, যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে; বরং এ অপরাধ দলের মধ্য থেকে একজনে করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা গোটা দলেরই হস্তপদ কেটে দেওয়া হবে।

এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শাস্তি কিসাস হিসেবে নয় যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ করলেও তা মাফ হবে না। بَابُ تَفْعِيْل থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই বোঝা যাচ্ছে।

ডাকাতির এ চারটি শাস্তি, اَوْ [অথবা] শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি যেমন কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে থেকে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কর্ম বণ্টনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহবিদদের একটি দল প্রথমোক্ত অর্থ ধরে মত প্রকাশ করেছেন যে, শরিয়তের পক্ষ থেকে শাসক ও বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ডাকাত দলের শক্তি এবং অপরাধের তীব্রতা ও লঘুতা দৃষ্টে তিনি শাস্তি চতুষ্টয় অথবা যে কোনো একটি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.), আতা (রা.) দাউদ (র.), হাসান বসরী (র.), যাহহাক (র.), নাখায়ী (র.), মুজাহিদ (র.), এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবও তাই। ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফেয়ী (র.), আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), এবং একদল সাহাবী ও তাবেয়ী اَوْ শব্দটিকে কর্ম বণ্টনের অর্থে ধরে নিয়ে বলেছেন যে, আয়াতে রাহাজানির বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীস থেকেও তাঁদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বুরদা আসলামীর সাথে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সে সন্ধি ভঙ্গ করে এবং মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসরমান একটি কাফেলা লুট করে। এ ঘটনার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) রাহাজানির শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়, যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ করে, তাকে শূলে চড়াতে হবে। যে শুধু হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে। যে শুধু অর্থ লুট করে তার হস্তপদ বিপরীত দিক

থেকে কর্তন করতে হবে। ডাকাত দলের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায়, তার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। পক্ষান্তরে যে হত্যা ও লুণ্ঠন কিছুই করেনি, শুধু ভীতি প্রদর্শন করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, তাকে দেশান্তরিত করতে হবে। যদি ডাকাতদল ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো মুসলিম অথবা অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে এবং অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাদের শাস্তি হবে أَنْ يُقَتَّلُوْا অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলেও তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন উভয় অপরাধই সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি হবে। يُصَلَّبُوْا অর্থাৎ সাবইকে শূলে চড়ানো হবে। এর ধরন হবে এই যে, জীবিতাবস্থায় শূলে চড়িয়ে পরে বর্শা ইত্যাদি দ্বারা তার পেটে চিরে দেওয়া হবে। যদি ডাকাতদল শুধু অর্থ লুট করে, তবে তাদের শাস্তি হবে أَنْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ অর্থাৎ ডান হাত কব্জি থেকে এবং বাম পা গিঁট থেকে কেটে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও যদি কিছু লোক অর্থ লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে তবুও সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা দলের অন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতার ভরসায়ই তারা এ কাজ করে। তাই অপরাধে সবাই সমান অংশীদার। যদি ডাকাতদল হত্যা ও লুণ্ঠনের পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে তাদের সাজা হবে أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

একদল ফিকহবিদের মতে দেশ থেকে বহিষ্কার করার অর্থ এই যে, তাদেরকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামি রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, যে জায়গায় ডাকাতির আশঙ্কা ছিল, সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর ফয়সালা এই যে, অপরাধীকে এখান থেকে বের করে অন্য শহরে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে যেহেতু সে সেখানকার অধিবাসীদেরকেও উত্যক্ত করবে, তাই এ জাতীয় অপরাধীকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে। অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এটাই তার পক্ষে দেশ থেকে বহিষ্কার। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এ ফয়সালাই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকাল এ জাতীয় সশস্ত্র আক্রমণে শুধু লুটতারাজ, হত্যা ইত্যাদি হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনাই ঘটে থাকে। পবিত্র কুরআনের وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا। বাক্যে এ জাতীয় সব অপরাধই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় সশস্ত্র আক্রমণকারীরা কোন শাস্তির যোগ্য?

উত্তর এই যে, **এক্ষেত্রে বিচারক শাস্তি চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে অবস্থানুযায়ী যে কোনো একটি শাস্তি জারি করবেন।** যদি ব্যভিচারের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যভিচারে হদ জারি করবেন।

এমনিভাবে শুধু কিছু লোককে জখম করে থাকলে জখমের কিসাস জারি করা হবে। শেষ আয়াতে বলা হয়েছে- ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ দুনিয়াতে প্রদত্ত এ শাস্তি হচ্ছে তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা। আখিরাতের শাস্তি হবে আরো কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বোঝা যায় যে, তওবা না করলে জাগতিক হুদূদ, কিসাস ইত্যাদি দ্বারা পরকালের শাস্তি মাফ হবে না, হ্যাঁ, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাঁটি মনে তওবা করলে পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا আয়াতে একটি ব্যতিক্রমের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, ডাকাত ও বিদ্রোহীদল যদি সরকারি লোকদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে শক্তি-সামর্থ্য বহাল থাকা অবস্থায় তওবা করে এবং ডাকাতি ও রাহাজানি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে হদ প্রযোজ্য হবে না। এ ব্যতিক্রমটি হুদূদের সাধারণ আইন থেকে ভিন্নধর্মী। কেননা চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধী খাঁটি মনে তওবা করলেও হদ মাফ হয় না। যদিও আখিরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। একদিকে ডাকাতদের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এদের একজনের অপরাধে গোটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়। তাই অপরদিকে ব্যতিক্রমের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে হালকা করেও দেওয়া হয়েছে যে, তওবা করলে জাগতিক শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা এই যে, একটি শক্তিশালী দলকে বশে আনা সহজ কাজ নয়। তাই তাদের সামনে সত্যোপলব্ধির দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে তারা তওবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এছাড়া আরো একটি উদ্দেশ্যে এই যে, মৃত্যুদণ্ড নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত শাস্তি। ইসলামি আইনের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এ শাস্তির প্রয়োগ যেন যথাসম্ভব কম হয়। অথচ ডাকাতির ক্ষেত্রে একটি দলকে হত্যা করা জরুরি হয়ে পড়ে। তাই ডাকাতদের সামনে সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সুযোগের কারণেই আলী আসাদী নামক জনৈক দুর্ধর্ষ ডাকাত ডাকাতি থেকে তওবা করতে সক্ষম হয়েছিল।

আলী আসাদী মদীনার অদূরে একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরি করে পথিকদের অর্থসম্পদ লুট করতো। একদিন কাফেলার মধ্যে থেকে জনৈক কারীর মুখে সে এ আয়াত শুনতে পেল- يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ [হে আমার অনাচারী বান্দারা! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।] সে কারীর কাছে পৌঁছে আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতে

অনুরোধ করল। পুনর্বার আয়াতটি শুনেই সে তরবারির কোষবদ্ধ করে রাহাজানি থেকে তওবা করলো এবং মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে উপস্থিত হলো। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তার হাত ধরে তাকে মারওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে বললেন, আপনি তাকে কোনো শাস্তি দিতে পারবে না।

সরকার তার অপতৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিল। ফলে তার সুমতি দেখে সবাই সন্তুষ্ট হলো। হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে হারেসা ইবনে বদর বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যা ও লুটতরাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুদিন পরই তওবা করে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি।

এখানে স্মর্তব্য যে, হদ মাফ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বান্দার যেসব হক সে নষ্ট করে, তাও মাফ হয়ে যায়; বরং এরূপ তওবাকারী যদি কারো অর্থসম্পদ হরণ করে থাকে এবং জীবিত থাকে, তবে তা ফেরত দেওয়া জরুরি এবং কাউকে হত্যা অথবা জখম করে থাকলে তার কিসাস জরুরি। অবশ্যই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। কারো পার্থিব ক্ষতি করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের মাযহাব তাই। এছাড়া বান্দার পাওনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা স্বয়ং তওবার একটি অঙ্গ। এটা ছাড়া তওবা পূর্ণ হয় না। তাই কোনো ডাকাতকে তওবাকারী বলে তখনই গণ্য করা হবে, যখন সে বান্দার পাওনাও পরিশোধ করে দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১০২-১১০]

قَوْلُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا : "দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়"-এর মর্ম : অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এখানে অশান্তি সৃষ্টি দ্বারা ডাকাতি ও লুটতরাজ করা বুঝিয়েছেন। তবে আয়াতের শব্দকে ব্যাপকার্থে রেখে দিলে বিষয়বস্তু অধিকতর প্রশস্ত হয়ে যায়। বিশুদ্ধ হাদীসে আয়াতের যে শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে, তারও চাহিদা হলো শব্দকে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা দেশে অশান্তি বিস্তার করা- এ দুটো এমনই ব্যাপক কথা যে, কাফেরদের আক্রমণ, ধর্মদ্রোহিতা, লুটতরাজ, ডাকাতি, অন্যায়ভাবে জানমালের ক্ষতিসাধন, অপরাধী কার্যক্রমের ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তির প্রোপাগাণ্ডা ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর প্রত্যেকটিই এমন অপরাধ যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিবার্যভাবে সম্মুখে বর্ণিত শাস্তি চতুষ্টয়ের যে কোনো একটির উপযুক্ত হয়ে যায়। -[তাফসীর উসমানী : টীকা-১১৬]

ডাকাতদের চারটি অবস্থা হতে পারে : যথা- ১. কেবল হত্যা করেছে, লুটতরাজ করেনি ২.হত্যা ও লুট উভয়ই করেছে ৩. মালামাল লুট করেছে, খুন-খারাবি করেনি, ৪. কোনটিই করতে পারেনি, তার আগেই ধরা পড়ে গেছে। এ চারও অবস্থায় চার প্রকারের শাস্তি আবর্তিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সামনে বর্ণিত হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১৯]

قَوْلُهُ اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا الخ : চার ধরনের শাস্তি : এখানে চার প্রকারের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে এবং চারটি শাস্তি চার স্থানের জন্য নির্ধারিত। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কথা হলো- ইমামকে এ চারটি শাস্তির মধ্য হতে সব ধরনের অপরাধের জন্য যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদিও কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত এরূপ। অধিকাংশের মত হলো- এই সমস্ত শাস্তি অপরাধের মাত্রা হিসেবে প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার বা সদিচ্ছা হিসেবে নয়। -[মা'আলিম]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মাজলায, কাতাদা, হাসান (র.)-সহ একদল বলেন, অপরাধের ধরন ও মাত্রা হিসেবে শাস্তি হতে হবে। -[বাহর]

এর অর্থ হলো, অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আল্লাহ-ই ভালো জানেন। -[হিদায়া]

শাস্তির ধারা বর্ণনার মাঝে যে বারবার اَوْ [অথবা] শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা এখতিয়ারের জন্য আসেনি, বরং তা তাফসীলের অর্থ প্রকাশের জন্য আনা হয়েছে। আয়াতের মধ্যে যে اَوْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা ব্যাখ্যার জন্য। -[বায়যাভী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আতা (র.)-এর বর্ণনায় বলেন, এখানে اَوْ শব্দটি এখতিয়ারের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'বয়ান' বা স্পষ্ট বর্ণনার জন্য এসেছে। কেননা হুকুম আহকামগুলো বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। -[কবীর]

يُقَتَّلُوْا অর্থাৎ তাদের হত্যা করা হবে। এ শাস্তিটি তার জন্য, যখন ডাকাতি করার সময় কেউ কাউকে হত্যা করে ফেলবে, কিন্তু তার ধনসম্পদ নিতে পারবে না। تَقْتِيْل শব্দটি تَفْعِيْل থেকে এসেছে। সে কারণে তার অর্থ হবে, হত্যা বা কিসাসের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। এর দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাই শরিয়তের হক। এটি 'ওয়ালী' [বা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক] মাফ করে দিলে তা মাফ হবে না। তাদেরকে 'হদ' প্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে। যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ালীরা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তাদের এ ক্ষমা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা শরিয়তের হক। -[হিদায়া]

রাহাজানি ছিনতাই অপরাধ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কেবল ক্ষতিকারক নয়, বরং তা সমাজে শান্তির জন্যও একটি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। কাজেই 'ফরিয়াদীর' আবেদনে এ ধরনের মামলা প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

يُصَلَّبُوْا অর্থাৎ তাদের শূলেবিদ্ধ করা হবে। এ শূলেবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড তখন দিতে হবে, যখন কোনো ব্যক্তি রাহাজানি বা ছিনতাই করার সময় হত্যা ও লুণ্ঠন এ দুধরনের অপরাধে অপরাধী হবে। হানাফী মাযহাবে শূলের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হবে কিনা, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র.) বলেন, এটাই প্রকাশ্য অভিমত যে, শূলেদণ্ড দেওয়া না দেওয়া ইমাম বা নেতার ইচ্ছা। কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে যে, শূলেদণ্ড দেওয়া বা না দেওয়া এটা ইমামের এখতিয়ার। এটিই স্পষ্ট অভিমত। –[হিদায়া]

স্পষ্ট অভিমত এই যে, শূলে শাস্তি দেওয়া না দেওয়া এটা বিচারকের ইচ্ছাধীন, যদি তিনি চান, তবে এরূপ করতে পারেন এবং না-ও করতে পারেন এবং কেবল কতলের ফয়সালাও দিতে পারেন। –[মাবসূত]

তবে ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) অভিমত হলো এ ধরনের অপরাধীদের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কারণ প্রথমত এটা আল কুরআনের বিধান। দ্বিতীয়ত এ ধরনের শাস্তির যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহলো প্রকাশ করে দেওয়া, যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকে। হযরত আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এটা পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা, এটা কুরআনের নির্দেশ। আর এ ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ করে দেওয়া, যাতে অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। –[হিদায়া]

হযরত আবু ইউসুফ (র.) আরো বলেন ইমামের জন্য শূলীদণ্ড মওকুফ করা ঠিক হবে না; কেননা এর উদ্দেশ্য হলো– অন্যেরা যাতে হুঁশিয়ার হয়ে যায়, সে জন্য প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। –[মাবসূত]

হিদায়া গ্রন্থের লেখক বলেন, কতলের দ্বারাই তো প্রকাশ ও প্রচার হয়ে যায়, তবে শূলীতে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিলে, তা আরো ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সে জন্য বিষয়টি ইমাম বা বিচারকের এখতিয়ারে ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের অভিমত হলো, কতলের দ্বারাই প্রচার ও প্রকাশ হয়ে যায়, কিন্তু শূলীদণ্ডে মৃত্যু দিলে তা আরো ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তবে এ ব্যাপারে এখতিয়ার হলো বিচারকের। –[হিদায়া]

قَوْلُهُ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ : কাটা হবে তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। **অর্থাৎ ডান হাত** এবং বাম পা কাটা যাবে। এ শাস্তি ঐরূপ অপরাধের জন্য, যখন মাল লুণ্ঠন করা হবে, তবে প্রাণহানি ঘটবে না। **এরূপে শাস্তির** ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) **বলেন, যখন কতল অথবা শূলীদণ্ডের শাস্তি স্ব-স্ব** অপরাধের কারণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে; তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার মতো শাস্তি প্রয়োগের দরকার নেই। কেননা **শাস্তির বড় বিধান** প্রয়োগের পর ছোট বিধান প্রয়োগের প্রশ্নই উঠে না। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি চুরি এবং জেনার অভিযোগে **অভিযুক্ত হয়;** এমতাবস্থায়, সে কেবল জেনার দণ্ড ভোগ করবে এবং পাথর মেরে তাকে মারার পর আর হাত কাটার আলাদা **শাস্তির প্রয়োজন** থাকে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা এবং শূলে দেওয়া, এটা সংখ্যায় দু'টি শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তার হাত পা কেটে হত্যা করা বা শূলে চড়িয়ে হত্যা করা– এটা একটা শাস্তি মাত্র। যদিও শাস্তির বিধানটি কঠিন, তবে তা এজন্য যে, তার অপরাধটিও গুরুতর। আর অন্যায় ও অপরাধের ভয়াবহতা এই যে, অপরাধী হত্যা ও লুণ্ঠন দু'টি কাজ করে সর্বসাধারণের শান্তি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করেছে। এ সমস্ত ব্যাখ্যা হিদায়াসহ অন্যান্য ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে।

قَوْلُهُ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ : অর্থাৎ দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ শাস্তি ঐ অবস্থার প্রেক্ষিতে, যখন জানমাল কিছুই লুণ্ঠিত হয়নি; বরং এ ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রাক্কালে গ্রেফতার হয়েছে। দেশ থেকে বের করে দেওয়ার অর্থ হলো– ১. নির্বাসিত করা। ২. স্বাধীনভাবে চলাফেরাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অর্থাৎ তার স্বাধীনতা হরণ করতে হবে এবং তাকে 'কয়েদখানা' বা 'জেলখানায়' আটকে রাখতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং অভিধানেও এর সমর্থন দেখা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দেশ থেকে বহিষ্কার করার অর্থ হলো: তাকে বন্দী করে রাখা। এটাই অধিকাংশ আভিধানবিদের অভিমত। –[তাফসীরে কাবীর]

আমাদের নিকট বহিষ্কারের অর্থ হলো, তাকে আটক করে রাখা বা জেলে দেওয়া। আরবি ভাষা-ভাষীরা اَلنَّفْيُ [বহিষ্কার] শব্দটি এরূপ অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। কেননা, সে ব্যক্তি তখন তার ঘরবাড়িও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ قِيْلَ نَفْيُهُمْ اَنْ يُخْلَوْا فِي السِّجْنِ : কথিত আছে, তাদের বের করে দিবে, অর্থাৎ [illegible] তাদের [illegible] করা হবে –তাফ. কিন্তু হানাফী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত হলো, দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলে সে অপরাধী

হয়তো অন্য কোনো মুসলিম অধ্যুষিত শহরে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে ফিতনা-ফাসাদ ঘটাতে থাকবে। আর যদি সে কোনো অমুসলিম অধ্যুষিত শহরে চলে যায়, তবে সে সেখানে গিয়ে ইসলামের দুশমনদের হাতকে শক্তিশালী করবে। কাজেই, এখানে বহিষ্কারের অর্থ হলো, তাকে আটকে রাখা, কয়েদ করে রাখা। মাবসূত, হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই চারটি অবস্থা ব্যতিরেকে, পঞ্চম অবস্থাটি এরূপ হতে পারে যে, ডাকাতদল কাউকে কেবল 'যখম' করে ছেড়েছিল, এমতাবস্থায় এ হুকুম হবে সাধারণ 'যখমের' অনুরূপ। এখানে 'কিসাস' বা মুক্তিপণ দিয়ে এবং কাউকে জামিন রেখে সে মুক্ত হতে পারবে এবং এটি 'হক্কুল ইবাদ' বা 'বান্দার হক' হওয়ার কারণে ক্ষমাও পেতে পারে।

প্রগতিবাদী ও আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা যাদের অপর নাম হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার সেবাদাস, তারা হয়তো ইসলামি সাজার কঠোরতা দেখে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু সব ধরনের তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে গিয়ে যদি কার্যকারিতা ও বাস্তবতার নিরীখে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে যে, যে দেশে আইন শিথিল করে শাস্তি হ্রাস করা হয়েছে, সেখানে অপরাধ প্রবণতা ও অশান্তি কোন ধরনের? পক্ষান্তরে সে জাতির অবস্থা কিরূপ, যেখানে এখানো ইসলামি বিধান মতো 'শাস্তি ও হদ' কায়েমের প্রথা প্রচলিত আছে? আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের রেকর্ড সংখ্যক অপরাধের তুলনায় নজদ, হিজাজ ও ইয়ামনে সংঘটিত অপরাধ কিরূপ? Gunmen এবং Gangster এর ন্যায় পরিভাষা প্রত্যহ কোথায় তৈরি হচ্ছে? লুটতরাজ, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন-খারাবি তো আরবের বেদুঈনরা করতো, কিন্তু আজকের তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার ডাকাতদের সাথে কি তাদের তুলনা করা যায়? এটা তো বাস্তব ঘটনা, খুবই বাস্তব, সরল মনে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃত ও জ্ঞানসম্মত ব্যাপার এই যে, ইসলাম জীবন -জিন্দেগী ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য যে সুন্দর বিধান দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনোপকরণের জন্য যে ব্যবস্থা সহজতর করেছে- এর পরও যদি কোনো জালিম আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি বিশেষ না-শুকরি প্রকাশ করে, সাধারণ মানুষের শান্তিময় জীবন যাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর বান্দাদের জানমাল জোর করে কেড়ে নিতে চায়; আর পাশব-প্রবৃত্তির সীমাহীন দাপট দেখায় এ ধরনের পশু চরিত্রের পশুদের শাস্তিও হলো খুবই গুরুতর। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১২৫]

قَوْلُهُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : [আর যেন এমন মনে না করা হয় যে, এ ধরনের অপরাধীদের জন্য দুনিয়ার শাস্তিই যথেষ্ট।] এখান থেকে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ মাসআলা বের করেছেন যে, গুনাহের কাফফারার জন্য 'হদ' জারি করাই যথেষ্ট নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, তার উপর 'হদ' কায়েম করলে, তা হবে গুনাহ বা অপরাধের কাফফারাস্বরূপ হবে না। -[জাসসাস]

এ আয়াতটি তার জন্য মজবুত দলিল, যে বলে : 'হদ' কায়েমের ফলে আখিরাতের শাস্তি মওকুফ হবে না। -[রূহুল মা'আনী]

মালেকী মাযহাবের ইমামদের অভিমতও এরূপ। যখন কোনো যোদ্ধাদল [ডাকাত] বের হয় এবং কাফেলার লোকদের সাথে মারামারি করে, এমতাবস্থায় কোনো ডাকাত যদি কাফেলার কাউকে হত্যা করে এবং তাদের কেউ নিহত না হয়, তবে ডাকাতদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। -[তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী : টীকা- ১২৭]

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ : অপরাধ থেকে তওবা করা : [কেননা আল্লাহ তওবাকারীদের উপর থেকে 'হদ'ও মার্জনা করে দেন]। এখন না তাদের হাত-পা কাটা যাবে, না তাদের শূলিতে চড়ানো যাবে এবং না তাদের দেশ থেকে বের করা যাবে। এই সমস্ত নির্ধারিত শাস্তি, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্থিরকৃত, তওবা করার পর সব মওকুফ হয়ে যাবে এবং এখন আর কোনো দাবি-দাওয়া ইসলামি হুকুমতের পক্ষ থেকে থাকবে না। অবশ্য মৃতদের ওয়ারিশ ও দাবিদারদের এ ব্যাপারে এখতিয়ার থাকবে যে, হয় তারা মাফ করে দিবে, নয়তো মালের দ্বারা সন্ধি করে নিবে। চাইলে খুনের বদলা খুন চাইতে পারে; তবে ব্যাপারটি এখন কেবল বান্দাদের মাঝেই সীমিত। তওবা করার পর যদি কাউকে গ্রেফতার করা হয়, এমতাবস্থায় যে, সে ইচ্ছা করেই খুন করেছিল নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজনরা চাইলে তাকে খুনও করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারে। কেননা তওবা করার পর তার উপর আর কোনো 'হদ' কায়েম করা যাবে না। -[হিদায়া]

উপরিউক্ত আয়াতে যখন 'হদ' মওকুফ করা হয়েছে, এমতাবস্থায় লোকদের হক ওয়াজিব হয় তার মালে, দেহে এবং আহত হওয়ার কারণে। -[জাস্‌সাস]

যদি সে হত্যা করে থাকে, তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়রা তাকে হত্যা করতে পারে। আর যদি তারা ইচ্ছা করে, তবে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারে। কেননা, এ হত্যা হবে কিসাসস্বরূপ। এমতাবস্থায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার সাথে সন্ধি করা শুদ্ধ হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

٣٥. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ خَافُوْا عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ وَابْتَغُوْآ اُطْلُبُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ مَا يُقَرِّبُكُمْ اِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهٖ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ ـ

৩৫. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। এবং তাঁর প্রতি অসিলা তালাশ কর। অর্থাৎ যেসব আনুগত্যের কাজ তাঁর নৈকট্যলাভের সহায়ক সেগুলোর অনুসন্ধান **কর এবং** তাঁর ধর্মকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে **তাঁর পথে জিহাদ** কর যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে **পার। সফলকাম** হতে পার।

٣٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ ثَبَتَ اَنَّ لَهُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৩৬. যারা সত্য প্রত্যা**খ্যান করেছে** কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের **জন্য দুনিয়া**তে যা কিছু আছে এবং সমপরিমাণ আরো **কিছু যদি** তাদের হয়ে যায় আর সবকিছু যদি তার **পণস্বরূপ দিয়ে** দেয় তবুও তাদের নিকট হতে তা **গৃহীত হবে না এবং** তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

٣٧. يُرِيْدُوْنَ يَتَمَنَّوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ دَائِمٌ ـ

৩৭. তারা অগ্নি হতে **বের হতে চাইবে,** কামনা করবে; কিন্তু তারা তা **থেকে বের হওয়ার** নয় এবং তাদের জন্য স্থায়ী অর্থাৎ **চিরকালের শাস্তি** রয়েছে।

٣٨. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اَلْ فِيْهِمَا مَوْصُوْلَةٌ مُبْتَدَأٌ وَلِشِبْهِهٖ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِىْ خَبَرِهٖ وَهُوَ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا اَىْ يَمِيْنَ كُلٍّ مِّنْهُمَا مِنَ الْكُوْعِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الَّذِىْ يُقْطَعُ فِيْهِ رُبْعُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا وَاَنَّهٗ اِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى مِنْ مَفْصِلِ الْقَدَمِ ثُمَّ الْيَدُ الْيُسْرٰى ثُمَّ الرِّجْلُ الْيُمْنٰى وَبَعْدَ ذٰلِكَ يُعَزَّرُ جَزَآءً نَصَبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا عُقُوْبَةً لَّهُمَا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ خَلْقِهٖ ـ

৩৮. পুরুষ কিংবা **নারী চুরি করলে** তাদের হস্ত কর্তন কর। অর্থাৎ **প্রত্যেকের ডান হাত** কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলবে। **اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ :** এতদুভয়ের اَلِفْ وَلَامْ অক্ষরদ্বয় مَوْصُوْلَةٌ **বা সংযোজক** অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা مُبْتَدَأٌ **বা উদ্দেশ্য**। যেহেতু শর্তের মর্মের সাথে **এর সাদৃশ্য বিদ্যমান** সেহেতু এর خَبَرٌ বা বিধেয় فَاقْطَعُوْا -তে فَ ব্যবহার করা হয়েছে সুন্নায় বর্ণিত **আছে যে, এক** দিনারের চার ভাগের একভাগ বা **ততোধিক মূল্যের** দ্রব্য চুরিতে হস্তকর্তন করার বিধান **প্রযোজ্য হবে। একবার** শাস্তিভোগ করার পর পুনরায় **যদি চুরি করে** তবে গোড়ালী পর্যন্ত পদচ্ছেদন **করা হবে। পুনর্বার** করলে বাম হাত; পুনর্বার করলে ডান **পা কর্তন** করা হবে। এর পরও যদি চুরি করে তবে **কাজি** বিবেচনামত শাস্তি প্রদান করবেন। ওদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ; এটা আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড। এটা তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ। جَزَآءً : শব্দটি مَصْدَرٌ বা সমধাতুজ কর্মরূপে مَنْصُوْبٌ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর বিষয়ে পরাক্রমশালী এবং তাঁর সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাময়।

৩৯. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ رَجَعَ عَنِ السَّرِقَةِ وَاَصْلَحَ عَمَلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فِى التَّعْبِيْرِ بِهٰذَا مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ الْاٰدَمِىِّ مِنَ الْقَطْعِ وَرَدِّ الْمَالِ نَعَمْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهُ اِنْ عُفِىَ عَنْهُ قَبْلَ الرَّفْعِ اِلَى الْاِمَامِ سَقَطَ الْقَطْعُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ -

৩৯. কিন্তু সীমালঙ্ঘনের পর কেউ তওবা করলে, চুরি হতে ফিরে গেলে এবং নিজের কাজে সৎপরায়ণ হলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।] পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি এ স্থানেও এ ধরনের বাক্য ভঙ্গিমা দ্বারা বুঝা যায় যে, তওবা করা দ্বারা হস্তকর্তন ও চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়ার বিষয়ে বান্দার হক রহিত হয় না। তবে সুন্নায় বিবৃত হয়েছে যে, বিচারকের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে যদি হকদার তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে হস্তকর্তনের বিধান তার উপর হতে রহিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

٤٠. اَلَمْ تَعْلَمْ اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّقْرِيْرِ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ تَعْذِيْبَهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ط الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ التَّعْذِيْبُ وَالْمَغْفِرَةُ -

৪০. তুমি কি জান না যে, اَلَمْ : এখানে تَقْرِيْر বা বিষয়টির সুসাব্যস্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যাকে তিনি শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন এবং যাকে তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। শাস্তি প্রদান ও ক্ষমা প্রদর্শনও তাঁর এ শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

٤١. يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ صُنْعُ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ يَقَعُوْنَ فِيْهِ بِسُرْعَةٍ اَىْ يَظْهَرُوْنَهُ اِذَا وَجَدُوْا فُرْصَةً مِنْ لِلْبَيَانِ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ بِاَلْسِنَتِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَالُوْا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج قَوْمٌ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ الَّذِى افْتَرَتْهُ اَحْبَارُهُمْ سِمَاعَ قَبُوْلٍ سَمّٰعُوْنَ مِنْكَ لِقَوْمٍ لِاَجْلِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لا مِنَ الْيَهُوْدِ لَمْ يَاْتُوْكَ ط وَهُمْ اَهْلُ خَيْبَرَ زَنٰى فِيْهِمْ مُحْصِنَانِ فَكَرِهُوْا رَجْمَهُمَا -

৪১. হে রাসূল! যারা মুখে বলে অর্থাৎ কথায় বলে বিশ্বাস করেছি; কিন্তু অন্তর তাদের বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ মুনাফিকগণ ও যারা ইহুদি হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে তৎপর, তাতে দ্রুত গিয়ে নিপতিত হয়; সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ কর তারা অর্থাৎ তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। مِنْ এটা بَيَانِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। بِاَفْوَاهِهِمْ : এটা قَالُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল অর্থাৎ এদের ধর্মীয় নেতারা যে মিথ্যা রচনা করে তা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা তা শ্রবণ করে لِقَوْمٍ -এর ل -টি হেতুবোধক। এ ইহুদিদের যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি অর্থাৎ খায়বারবাসীগণ। তারা তাদের জন্য অর্থাৎ সে সম্প্রদায়ের পক্ষে তোমার কথা শুনতে কান পেতে থাকে। মূলত বিষয়টি ছিল এই যে, খায়বারবাসীদের মধ্যে দুই বিবাহিত ইহুদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের ধর্মীয় বিধানানুসারে রাজম অর্থাৎ তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি দান করাটা তাদের পছন্দ হলো না।

فَبَعَثُوْا قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حُكْمِهِمَا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ الَّذِيْ فِي التَّوْرٰىةِ كَاٰيَةِ الرَّجْمِ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ج الَّتِيْ وَضَعَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا اَيْ يُبَدِّلُوْنَهٗ . يَقُوْلُوْنَ لِمَنْ اَرْسَلُوْهُمْ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا الْحُكْمَ الْمُحَرَّفَ اَيِ الْجَلْدَ اَيْ اَفْتَاكُمْ بِهٖ مُحَمَّدٌ فَخُذُوْهُ فَاقْبَلُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ بَلْ اَفْتَاكُمْ بِخِلَافِهٖ فَاحْذَرُوْا ط اَنْ تَقْبَلُوْهُ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ اِضْلَالَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط فِيْ دَفْعِهَا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط مِنَ الْكُفْرِ وَلَوْ اَرَادَهٗ لَكَانَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ج ذُلٌّ بِالْفَضِيْحَةِ وَالْجِزْيَةِ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

তখন তারা ইহুদি কুরাইযা গোত্রকে এ বিষয়ে বিধান দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করে। তাওরাতের শব্দসমূহকে যেমন 'রাজম' সম্পর্কিত আয়াত ইত্যাদি তারা স্থানচ্যুত করে। যেভাবে আল্লাহ ব্যবহার করেছিলেন সেভাবে না করে এগুলো বিকৃত ও পরিবর্তিত করে। যাদেরকে পাঠিয়েছিল তাদেরকে বলে, এ প্রকার যদি বিধান দেয় অর্থাৎ বিকৃত বিধান অনুসারে মুহাম্মাদ ﷺ -ও যদি এদের সম্পর্কে বেত্রাঘাতের বিধান দেয় তবে তা গ্রহণ করো, মেনে নিও আর যদি সে রকম না দেয় বরং এর বিপরীত বিধান দেয় তবে তা গ্রহণ করা হতে সাবধান থেকো। আল্লাহ যাকে ফেতনায় লিপ্ত করতে চান অর্থাৎ পথভ্রান্ত করতে চান তার জন্য আল্লাহর নিকট তা প্রতিহত করার বিষয়ে তোমার কিছুই করার নেই। এরা তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ কুফরি হতে বিশুদ্ধ করতে চান না। যদি চাইতেন তবে নিশ্চয় তা হতো। অবমাননা ও জিযিয়া কর আরোপের মাধ্যমে তাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি।

٤٢. سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِهَا اَيِ الْحَرَامِ كَالرِّشٰى فَاِنْ جَآءُوْكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ج هٰذَا التَّخْيِيْرُ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ اَلْاٰيَةَ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ اِذَا تَرَافَعُوْا اِلَيْنَا وَهُوَ اَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَلَوْ تَرَافَعُوْا اِلَيْنَا مَعَ مُسْلِمٍ وَجَبَ اِجْمَاعًا وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط وَاِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ الْعَادِلِيْنَ فِي الْحُكْمِ اَيْ يُثِيْبُهُمْ .

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অতি আগ্রহী এবং অবৈধ ভক্ষণে যেমন ঘুষ ইত্যাদিতে অতিশয় আসক্ত। اَلسُّحْتُ -এর ح -তে পেশ ও সাকিনসহ পঠিত। অর্থ– হারাম, অবৈধ। اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ এদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করে দিয়ো- এ আয়াতটির মাধ্যমে এ এখতিয়ার সম্বলিত বিধানটি 'মানসুখ' বা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা যদি আমাদের নিকট বিচার নিয়ে আসে তবে মীমাংসা করে দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকতর বিশুদ্ধ মত এটাই। আর যদি কোনো মুসলিমকে জড়িত করে তবে মীমাংসা করে দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়ের ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে অর্থাৎ বিচার মীমাংসায় যারা ন্যায় অবলম্বন করে তাদেরকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে পুণ্যফল দান করবেন।

٤٣. وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ بِالرَّجْمِ اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ اَىْ لَمْ يَقْصِدُوْا بِذٰلِكَ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ بَلْ مَا هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنْ حُكْمِكَ بِالرَّجْمِ الْمُوَافِقِ لِكِتَابِهِمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط التَّحْكِيْمِ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৪৩. তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যাস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, আর তাতে রয়েছে রাজ্ম সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ? অর্থাৎ এ বিচার প্রত্যাশায় তাদের মূল উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান নয়, বরং তারা অধিকতর সহজ বিধানের প্রত্যাশী। এরপরও অর্থাৎ তাওরাতের পর বিধানের সাথে সাম স্যপূর্ণ 'রজম' বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার রায় দানের পরও তারা তোমার মীমাংসা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা উপেক্ষা করে। আসলে এরা বিশ্বাসীই নয়। كَيْفَ এ প্রশ্নবোধকটি এ স্থানে تَعَجُّبْ বা বিস্ময় প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثَبَتَ : প্রশ্ন. لَوْ اَنَّ لَهُمْ -এর মাঝে ثَبَتَ উহ্য মানার কারণ কী?

উত্তর. لَوْ হরফে শর্ত نَقْل -এর শুরুতে আসে। এখানে যদি ثَبَتَ ফে'লটি উহ্য না ধরা হতো তাহলে لَوْ শব্দটি হরফের শুরুতে আসা লাজেম হতো। সেহেতু এখানে ثَبَتَ ফে'লটি উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْ فِيْهِمَا مَوْصُوْلَةٌ : অর্থাৎ اَلسَّارِقُ اَلسَّارِقَةُ -এর اَلِفْ لَامْ -টি مَوْصُوْلَهْ হিসেবে এসেছে। অর্থের ক্ষেত্রে اَلَّذِىْ سَرَقَ وَالَّتِىْ سَرَقَتْ হবে। আর ইসমে মাউসুল مُبْتَدَأْ এবং শর্তের অর্থ পোষণ করে বিধায় তার খবরটি فَاقْطَعُوْا জাযার অর্থ পোষণ করে বিধায় তার শুরুতে فَاءْ এসেছে।

قَوْلُهُ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ : অর্থাৎ جَزَاءً শব্দটি مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। اَىْ يُجْزَوْنَ جَزَاءً

نَكَالْ : এরূপ শক্তিকে বলা হয় যা থেকে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

فِى التَّعْبِيْرِ بِهٰذَا : অর্থাৎ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ -এর জবাবে فَلَا تَحَرَّوْا বলা হয়নি; বরং فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তওবার কারণে حُقُوْقُ الْعِبَادِ বা বান্দার হক ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি ক্ষমা করবেন, যা حُقُوْقُ اللّٰهِ -এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি তথা হাত কর্তন এবং চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়াটা ক্ষমা করবেন না।

قَوْلُهُ لَا يَحْزُنْكَ صُنْعُ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, حُزْنْ وَمَلَالْ দুঃখ ও পেরেশানীর সম্পর্কে ذَاتْ বা সত্তার সাথে নয়; বরং فِعْلْ বা কর্মের সাথে হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই মুফাসসির (র.) এখানে صُنْعُ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ سَمّٰعُوْنَ : এটি مُبْتَدَأْ مَحْذُوْفْ -এর খবর। اَىْ هُمْ سَمّٰعُوْنَ

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ : اَىْ مِنْ بَعْدِ تَحَقُّقِ مَوَاضِعِهِ الَّتِىْ وَضَعَ اللّٰهُ অর্থাৎ শব্দের মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও শব্দকে তার যথার্থ মর্ম থেকে সরিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ خِزْىٌ : خِزْىٌ অর্থ– লাঞ্ছনা।

اَلسُّحْتُ : অর্থ– হারাম। এটি سُحْتَهٗ থেকে নির্গত। এটা সে সময় বলা হয় যখন কোনো বস্তুকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা হয়। হারাম মাল যেহেতু سُحُوْتُ الْبَرَكَةِ বা বরকত উপড়ে ফেলে তাই তাকে سُحْتْ বলা হয়।

اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ : অর্থাৎ তারা বড় হারামখোর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ : যোগ সূত্র ও আলোচনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তি এবং তার বিস্তারিত বিধি উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী তিন আয়াতের পর চুরির শাস্তি বর্ণিত হবে। মাঝখানে তিন আয়াতে আল্লাহভীতি, ইবাদত ও জিহাদের প্রতি উৎসাহদান এবং কুফরি, নাফরমানি ও পাপের ধ্বংসকারিতা বিবৃত হয়েছে। কুরআনের এ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কুরআন শাসকের ভঙ্গিতে শুধু দণ্ড ও শাস্তির আইন ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত থাকার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ ও পরকালের ভয় এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও প্রশান্তিকে কল্পনায় উপস্থিত করে অপরাধীদের অন্তরকে অপরাধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এ কারণেই অধিকাংশ অপরাধ ও দণ্ডবিধির সাথে সাথে اِتَّقُوا اللّٰهَ [আল্লাহকে ভয় কর] ইত্যাদি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এখানেও প্রথম আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত اِتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর ভয়ই মানুষকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। وَسِيْلَةٌ শব্দটি وَسْلٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س, ص উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وَصْلٌ -এর অর্থ যে কোনোরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وَسْلٌ -এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।

–[সিহাহ, জওহরী, মুফারাতাদুল কুরআন]

তাই وَصْلَةٌ ও وَصِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে। পক্ষান্তরে وَسِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। –[লিসানুল আরব, মুফারাদাতুল কুরআন]

وَسِيْلَةٌ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وَسِيْلَةٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর, হযরত আতা (র.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১১১, ১২২]

আখিরাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা : তাওহীদ ও রিসালতের ন্যায় প্রত্যাবর্তনের স্থান ও আখিরাতের ব্যাপারেও মূর্খ লোকেরা অসংখ্য ভুলের মাঝে লিপ্ত। তাদের একটা বড় গলদ হলো সেখানকার কাজকর্ম ও আচার-আচরণকে তারা দুনিয়ার কাজকর্ম ও আচরণের অনুরূপ মনে করে। যেমন– এখানকার অফিস আদালতে, দফতরে দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে কাজকর্ম করা যায়, যেখানেও এরূপ নজর-নিয়াজ ও ঘুষ-রিশওয়াত দিয়ে সব কাজ সেরে নেওয়া যাবে এবং প্রত্যেক গুনাহ ও অপরাধের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করলেই রিপোর্ট পক্ষে চলে আসবে। কুরআন মাজীদে এ 'বিশ্বখ্যাত' ত্রুটিকে বারবার উল্লেখ করে এর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আখিরাতে কুফরির ফিদইয়া বা কাফ্ফারা কোনো ধনসম্পদ দিয়ে আদায় করা যাবে না।

اَنَّ لَهُمْ নিশ্চয় তাদের জন্য অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের জন্য যদি এ পরিমাণ ধনসম্পদ হয়। مَعَهٗ তার সাথে এখানকার ه সর্বামটি مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا অর্থাৎ জমিনে যা আছে তা সব একসাথে এ বাক্যের প্রতি ইঙ্গিতবহ। لَوْ যদি; এ শব্দটি যে বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তার অর্থ হয় এমন একটি কল্পনাপ্রসূত কথা, যা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। বস্তুত, এখানেও সে অর্থ যে, এ কল্পনাপ্রসূত ব্যবস্থার দ্বারাও আজাব থেকে কেউ নাজাত বা মুক্তি পাবে না। مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا যা কিছু জমিনে আছে সবই। এর মধ্যে ঐ সমস্ত কিছু এসে গিয়েছে, যা মানুষ কল্পনা করতে পারে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৩৩]

قَوْلُهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ : শানে নুযুল : মাখযুম বংশের যে নারীর চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেই ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ফতহে মক্কার সময় একজন মাখযুমী মহিলা চুরি করেছিল। মহিলা যেহেতু সম্ভ্রান্ত বংশের ছিল তাই কুরাইশদের পক্ষে তার হাত কর্তন করা কঠিন হলো। তাই কুরাইশরা হযরত উসামা ইবনে যায়দের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর কাছে সুপারিশ করালো। রাসূল ﷺ সুপরিশ শুনে রাগ হলেন এবং বললেন, আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডের বেলায়ও সুপারিশ করা হচ্ছে? যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরির দায়ে ধরা পড়তো

তাহলেও তার হাত কাটা যেতো। তারপর তিনি মহিলার হাত কাটার নির্দেশ জারি করলেন। হাত কাটার পর মহিলাটি নবীজী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আমার তওবা কি কবুল হবে? নবীজী ﷺ বললেন, তুমি আজ এমন নিষ্পাপ হয়ে গেছো যেন তোমার মায়ের পেট থেকে আজ ভূমিষ্ট হয়েছো। -[জামালাইন -২/১৯৪]

চোরের শাস্তি ও তার যৌক্তিকতা : চোরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা চোরাই মালের বদলে নয়; বরং তার চুরিকার্যের দণ্ড। যাতে সে নিজে এবং অন্যান্য লোক সতর্ক হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, যেখানেই এ দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়, সেখানে দু'চার জনের শাস্তির পর চুরির দুয়ারই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। আজ তথাকথিত সভ্যতার দাবিদারগণ এ রকম শাস্তিকে বর্বরতা আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু চুরিকার্য যদি তাদের নিকট কোনো সভ্য কর্ম না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চিত বলা যায়, তাদের কোনো সভ্য দণ্ডবিধি এ অসভ্য কর্ম তৎপরতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হতে পারে না। কোনো লঘু অমানবিকতা অবলম্বনে যদি বহু সংখ্যক চোরকে সভ্য করে তোলা যায়, তবে সভ্যতার ধ্বজাধারীদের তো এ ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, বর্বরতা দ্বারা তাদের সভ্যতার মিশনে সাহায্য লাভ হয়। কিছু সংখ্যক নামধারী তাফসীরবেত্তাও চেষ্টা চালাচ্ছে হস্তচ্ছেদনের এ শাস্তিকে চুরির সর্বশেষ শাস্তি সাব্যস্ত করতে। তার আগে লঘু শাস্তি আরোপের অধিকার খোদ শরিয়তের পক্ষ হতে লাভ করা যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, না কুরআন মাজীদে চুরি কর্মের জন্য এর চেয়ে লঘু শাস্তি কোথাও পাওয়া যায়, না নবুয়তি যুগ বা সাহাবায়ে কেরামের আমলে তার কোনো দৃষ্টান্তের হদীস মিলে। কোনো লোক কি এ দাবি করতে পারে যে, এ সুদীর্ঘকালে যত চোর ধরা পড়েছে তাদের একজনও প্রাথমিক পর্যায়ের চোর ছিল না, যার উপর অন্তত বৈধতা বর্ণনার জন্য হলেও হস্তচ্ছেদন অপেক্ষা লঘুতর কোনো প্রাথমিক শাস্তি আরোপ করা যেত?

অতীতে কোনো এক ধর্মদ্রোহী চুরির এ দণ্ড সম্পর্কে এরূপ কথাও বলেছিল যে, শরিয়ত যেখানে এক হাতের দিয়ত নির্ধারণ করেছে পাঁচশ' দীনার, সেখানে এরূপ মূল্যবান হাতকে পাঁচ-দশ টাকা চুরির অপরাধে কী করে কাটা যেতে পারে? জনৈক প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ তাঁর জ্ঞানগর্ভ জবাবে কী সুন্দর বলেছেন- إِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ اَمِيْنَةً كَانَتْ ثَمِيْنَةً فَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ 'হাত যখন বিশ্বস্ত ছিল, তখন তার ঠিকই মূল্য ছিল, কিন্তু সে যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল, তখন মূল্যও হারিয়ে ফেলল।"

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১২৬]

আল্লাহর পরিচয় : عَزِيْزٌ অর্থ- মহাপরাক্রমশালী। এ গুণবাচক শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ-ই সর্বশক্তিমান। তিনি যেরূপ ইচ্ছা, অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেন। কেউ তাঁর উপর প্রতিবাদ করতে পারে না। حَكِيْمٌ অর্থ- হিকমতওয়ালা। এ গুণবাচক শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমই মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে খালি নয়। এজন্য তিনি চুরির শাস্তি তা-ই নির্ধারণ করেছেন, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জীবনের জন্য মহা উপকারী। ইমাম রাযী (র.) এখানে আসমাঈ-এর সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, একদা আমি জনৈক বেদুঈনের সামনে 'সূরা মায়িদা' তেলাওয়াত করি। তখন এ আয়াত আসলে ভুলবশত আমার মুখ দিয়ে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বা অধিক ক্ষমাশীল, করুণাময় বেরিয়ে যায়। তখন সে বেদুঈন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এটি কার কথা? আমি বলি, এ হলো 'কালামে ইলাহী' বা আল্লাহর কালাম। তখন সে বলে, আয়াতটি দ্বিতীয়বার পড়ুন। আমি আয়াতটি আবার পড়ি এবং বুঝতে পারি যে, عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর পরিবর্তে আমার মুখ থেকে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বেরিয়ে গেছে। তখন বেদুঈন বলেন, এখন আপনি ঠিকভাবে পড়েছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিরূপে জানলে? জবাবে বলে, বাক্যের ধারায় আমি বুঝতে পেরেছি। এখানে যখন শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, তখন 'বালাগাত' বা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -এর পরিবর্তে عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

-[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৩৭]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ : যোগসূত্র : সূরা মায়িদার তৃতীয় রুকু থেকে আহলে কিতাবদের আলোচনা চলছিল। মাঝখানে তাদের কিছু কিছু আলোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছিল। এখানে পুনরায় আহলে কিতাবদের সম্পর্কেই সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টান দুই সম্প্রদায় ছাড়াও আরেকটি সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এরা ছিল প্রকৃত পক্ষে ইহুদি কিন্তু কপটতাপূর্বক মুসলমান হয়েছিল। তারা মুসলমানদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করত, অথচ স্বধর্মালম্বী ইহুদিদের মধ্যে বসে ইসলামও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করত। আলোচ্য তিনটি আয়াত এ তিন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এরা আল্লাহ তা'আলার বিধান ও নির্দেশের বিপরীতে স্বীয় কামনা-বাসনা ও বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান ও

নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় বাসনার ছাঁচে ঢেলে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছনা ও অশুভ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদের জন্য কতিপয় মৌলিক বিধান ও নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে।

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকরী ইহুদি গোত্রসমূহে সংঘটিত দু'টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়। একটি ঘটনা ছিল হত্যা ও কিসাস বিষয়ক এবং অপরটি ছিল ব্যভিচার ও তার শাস্তি সংক্রান্ত। ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, ইসলাম পূর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে অন্যায়-অত্যাচারের রাজত্ব চলছিল। সবল দুর্বলকে এবং উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখত। সবল-সম্ভ্রান্তের জন্য ছিল ভিন্ন আইন। বর্তমানকালেও সভ্যতার দাবিদার অনেক দেশে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রচলিত রয়েছে। মানবতার দিশারী রাসূলে কারীম ﷺ -ই এসব স্বাতন্ত্র্য, চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকারে সমতা ঘোষণা করেছেন এবং মানব ও মানতাকে মনুষ্যত্বের সবক দিয়েছেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের পূর্বে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহুদিদের দু'টি গোত্র বনী কুরাইযা ও বনী নযীরের বসতি ছিল। তন্মধ্যে বনী কুরাইজার তুলনায় বনী নযীর শক্তি, শৌর্যবীর্য, অর্থ ও সম্মান বেশি ছিল। ফলে তারা প্রায়ই বনী কুরাইযার প্রতি অন্যায় অবিচার করত এবং তারা তা নির্বিবাদে সহ্য করত। এমন কি, তারা বনী কুরাইযাকে এ অবমাননাকর চুক্তি করতেও বাধ্য করল যে, যদি বনী নযীয়ের কোনো ব্যক্তি বনী কুরাইযার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে তাদের কিসাস অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ লওয়ার অধিকার থাকবে না; বরং মাত্র সত্তর ওসক খেজুর রক্ত বিনিময়স্বরূপ প্রদান করা হবে [আরবি ওজনে ওসক একটি পরিমাণ, যা আমাদের ওজনে প্রায় পাঁচ মণ দশ সেরের সমান]। এ রক্ত বিনিময়ের পরিমাণ হবে বনী নযীরের রক্ত বিনিময়ের দ্বিগুণ। অর্থাৎ একশ' চল্লিশ ওসক খেজুর। শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তি মহিলা হলে তার বিনিময়ে বনী কুরাইযার একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার বিনিময়ে বনী কুরাইযার দু'জন পুরুষকে হত্যা করা হবে। বনী নুযাইয়েরর ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে বনী কুরাইযার স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। বনী নযীরের কারও এক হাত কাটা হলে বিনিময়ে বনী কুরাইযার দু'হাত এবং এক কানের বিনিময়ে দু'কান কাটা হবে। ইসলামের পূর্বে এ গোত্রদ্বয়ে এ আইনই প্রচলিত ছিল। দুর্বলতাবশত বনী কুরাইযা তাই মানতে বাধ্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরতের পর মদীনা যখন দারুল ইসলামে পরিণত হলো, এ গোত্রদ্বয় তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কোনো চুক্তি হলেও ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু তারা দূরে থেকেই ইসলামের ন্যায়বিচার ও সাধারণ সহজবোধ্যতা নিরীক্ষণ করে বনী কুরাইযার কাছে দ্বিগুণ রক্ত বিনিময় দাবি করল। বনী কুরাইযা ইসলামে দীক্ষিত ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাদের কোনো চুক্তিও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক ছিল। তারা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টে জানত যে, মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পার্থিব লোভের কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করতো না। তারা আরো দেখছিল যে, ইসলাম মানবিক সমতা, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী। তারাই বনী নযীরের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। তারা একথা বলে দ্বিগুণ রক্ত বিনিময় দিতে অস্বীকার করল যে, আমরাও তোমরা একই পরিবারভুক্ত, একই দেশের বাসিন্দা এবং একই ইহুদি ধর্মাবলম্বী। আমাদের দুর্বলতা ও তোমাদের জবরদস্তির কারণে এতদিন আমরা যেসমস্ত অন্যায় চুক্তি মেনে চলেছি এখন থেকে তা আর মানব না।

এ উত্তর শুনে বনী নযীর উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলো। কিন্তু কতিপয় প্রবীন লোকের পরামর্শক্রমে স্থির হলো, ব্যাপারটির ফয়সালার জন্য উভয় পক্ষ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর শরণাপন্ন হবে। বনী কুরাইযা মনে মনে তাই চাচ্ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, মহানবী ﷺ বনী নযীরের উৎপীড়ন নীতি বহাল রাখবেন না। বনী নযীর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েও গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা মকদ্দমা উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই কিছুলোককে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বধর্মাবলম্বী ইহুদি। কিন্তু কপটতাপূর্বক ইসলাম প্রকাশ করে মহানবী ﷺ -এর নিকট আসা যাওয়া করত। বনী নযীরের উদ্দেশ্য ছিল, তার মকদ্দমা ও ফয়সালার পূর্বে এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর মনোভাব ও মতবাদ জেনে নেওয়া। তারা গুরুত্ব সহকারে বলে দিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের পক্ষে রায় দেন, তবে তা মেনে নেব, অন্যথায় মেনে নেওয়া অঙ্গীকার করব না।

এ ঘটনাটি ইমাম বগভী (র.) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসনদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর সারমর্ম বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ব্যভিচার সংক্রান্ত। ইমাম বগভীর বর্ণনা মতে, এ ঘটনাটি ঘটে খায়বরের ইহুদিদের মধ্যে। তাওরাত নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী উভয়কে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা করা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তারা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইহুদিরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাদের শাস্তি লঘু করতে চাইল। তারা জানত যে, ইসলামে মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা আছে। তাই তারা মনে করল যে, এ শাস্তির ব্যাপারেও ইসলামের বিধান কঠের না হয়ে নরমই হবে। সে মতে খায়বরের ইহুদিরা বনী কুরাইযাকে অনুরোধ করল, যাতে তারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে দেয়। অপরাধীদ্বয়কেও তারা সাথে সাথে পাঠিয়ে দিল। তাদেরও উদ্দেশ্যে ছিল, যদি তিনি কোনো লঘু শাস্তির রায় দেন, তবে মেনে নেওয়া হবে, অন্যথায় অস্বীকার করা হবে। বনী কুরাইযা প্রথমে ইতস্তত করল, কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর একথাই স্থির হলো যে, কয়েকজন সর্দার অপরাধীদ্বয়কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাবে এবং তাঁকে দিয়েই এর ফয়সালা করাবে।

সে মতে কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদলে অপরাধীদ্বয়কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, যদি বিবাহিত পুরষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি কি? মহানবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার ফায়সালা মেনে নেবে কি? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। ঠিক সে মুহূর্তেই ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে হবে। তারা এ ফয়সালা শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। জিবরাঈল (আ.) মহানবী ﷺ -কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন, আমার এ ফয়সালা মানা না মানার জন্য ইবনে সূরিয়াকে বিচারক নির্ধারণ কর। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) ইবনে সূরিয়ার পরিচয় ও গুণাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে দিলেন। তিনি আগত প্রতিণিধিদলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঐ শ্বেতকায় এক চোখ অন্ধ যুবককে চেন কি, যে ফাদাকে বসবাস করে এবং যাকে ইবনে সুরিয়া বলা হয়? সবাই বলল, চিনি। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তাকে কিরূপ মনে কর? তারা বলল, ভূপৃষ্ঠে তার চাইতে বড় কোনো ইহুদি আলেম নেই। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন।

ইবনে সূরিয়ার আগমনের পর রাসূলে কারীম ﷺ তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বর্ণিত মাসআলায় তাওরাতের নির্দেশ কি? সে বলল, আপনি আমাকে যে সত্তার কসম দিয়েছেন, আমি তারই কসম খাচ্ছি। যদি আপনি কসম না দিতেন এবং মিথ্যা কথা বললে তাওরাত আমাকে পুড়িয়ে দেবে এ আশঙ্কা না থাকত, তবে আমি এ সত্য প্রকাশ করতাম না। সত্য বলতে কি, তাওরাতেও এ নির্দেশই রয়েছে যে, অপরাধীদ্বয়কে প্রস্তর মেরে হত্যা করতে হবে।

মহানবী ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা কি কারণে তাওরাতের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কর? ইবনে সূরিয়া বলল, আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের জনৈক রাজকুমার ব্যভিচারের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আমরা তাকে খাতির করে ছেড়ে দিলাম, প্রস্তর মেরে হত্যা করলাম না। কিছুদিন একজন সাধারণ লোক এ অপরাধে অভিযুক্ত হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে চাইল, কিন্তু অপরাধীর পক্ষে একদল লোক বেঁকে বসল। তারা বলল, তাকে শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে হলে আগে রাজকুমারকে দিতে হবে, নতুবা আমরা তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতে দেব না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, সবার পক্ষে গ্রহণীয় একটি লঘু শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার এবং তাওরাতের নির্দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। সে মতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ব্যভিচারের অপরাধীকে কিছু মারপিট করে মুখে চুনকালি মাখিয়ে মিছিল বের করতে হবে। বর্তমানে এ শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১২৩ -১২৬]

قَوْلُهُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ : অর্থাৎ আপনি এমন লোকদের কথায় ব্যথিত হবেন না, يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ [হে আমার রাসূল!] কুরআন মাজীদ, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উল্লেখ কেবলমাত্র اَلرَّسُوْلُ ও اَلنَّبِيُّ হিসেবে এসেছে, যা তৃতীয় পুরুষ; এবং দ্বিতীয় পুরুষ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ ও اَيُّهَا النَّبِيُّ হিসেবে উল্লেখ হওয়ার কারণে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, এখন আর কোনো ব্যক্তি নবুওয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব আসবে না। يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ তারা দৌড়ে গিয়ে কুফুরীতে আপতিত হয়। অর্থাৎ তারা কুফরীর প্রতি অধিক আগ্রহশীল। يُسَارِعُوْنَ - مُضَارِعْ صِيْغَةْ مُسَارَعَهْ بَابُ শব্দটি مُفَاعَلَةْ-এর ওযনে এসেছে, অর্থ হলো, তারা কুফরির প্রতি এমনই আগ্রহশীল যে, তারা দৌড়ে একে অন্যের আগে যেতে চায়। ইমাম (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ [হে আমার নবী!] এ সম্বোধনটি বারবার এসেছে; কিন্তু يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ হে আমার রাসূল! আপনি পৌঁছে দিন, যা নাজিল করা হয়েছে আপনার প্রতি। এ ধরনের সম্বোধনে তাজিম ও সম্মান প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের সম্বোধন তাশরীফ ও তা'জীমের জন্য হয়ে থাকে।

–[তাফসীরে কাবীর]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এ আয়াতে তরিকতপন্থিদের আসল অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে, তারা যেন নাফরমানদের ব্যাপারে বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪২]

قَوْلُهُ سَمّٰعُوْنَ : এর অর্থ অত্যধিক শ্রবণকারী, যে অপরের কথা শোনার জন্য কান পেতে রাখে। অনেক সময় এর দ্বারা গোয়েন্দাগিরিও বোঝানো হয়। আবার কখনো অধিক গ্রহণকারীরও বোঝানো হয়, যেমন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ -এর মাঝে শোনা অর্থ গ্রহণ করাই বোঝানো হয়েছে। মুফাস্‌সির (র.) এখানে প্রথম অর্থ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এটাকে দ্বিতীয় অর্থে নিয়েছেন। সে হিসেবে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থ– মিথ্যা ও অসত্যকে অত্যধিক গ্রহণ ও মান্যকারী। سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ যারা নিজেরা তোমার কাছে না এসে এদেরকে পাঠিয়েছে সেই দ্বিতীয় দলের কথা এরা খুব বেশি মানে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩২]

قَوْلُهُ لِلْكَذِبِ : মুনাফিক ও ইহুদি এ ধরনের লোকদের বৈশিষ্ট্য একই। তা হলো এরা মিথ্যা ও বাতিল বিষয়কে খুব খেয়াল করে শোনে এবং তা কবুল করে নেয়। سَمّٰعُوْنَ শব্দের মূলধাতু হলো سَمِعَ ; যার অর্থ– কবুল করা, গ্রহণ করা। আরবি ভাষায় এ ধরনের ব্যবহার খুব বেশি। যেমন– وَالسَّمْعُ يَسْتَعْمِلُ وَيُرَادُ مِنْهُ الْقَبُوْلُ শোনা, এর অর্থ হলো কবুল করা। –[তাফসীরে কাবীর] পাদ্রীরা যা মনগড়া কথা বলতো, তা তারা কবুল করে নিত। –[বায়যাভী]

لِلْكَذِبِ অর্থাৎ মিথ্যার জন্য। এখানে অর্থ হলো মিথ্যার কারণে। অর্থাৎ তারা এজন্য খবর শুনতো যে, যাতে তারা মিথ্যা বলতে পারে এবং ভিত্তিহীন প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে। অর্থাৎ তারা আপনার থেকে এজন্য কথাবার্তা শ্রবণ করে, যাতে তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে পারে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪৪]

قَوْلُهُ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ : [অহংকার ও হিংসার কারণে]। 'তারা আপনার থেকে অহংকার ও বিদ্বেষের কারণে দূরে দূরে থাকে। অর্থাৎ এদের কিছু এমন, যারা অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে আপনার কাছে আসে না, যেমন খায়বরের ইহুদিরা। আর কিছু এমন, যারা আপনার মজলিসে আসে; কিন্তু সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তারা গুপ্তচর হিসেবে আসে, যাতে অন্যের কাছে অবান্তর কথা পৌঁছাতে পারে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪৫]

قَوْلُهُ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ : ইহুদি প্রসঙ্গ : এখানে বড় ও বিশিষ্ট ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। যারা শত্রুতাবশত, অহংকার হেতু নিজেরা তো নবীর দরবারে হাজির হতো না, কিন্তু যখনই সুযোগ পেত, তখনই তাদের কাছে সংরক্ষিত আল্লাহর কালামকে বিকৃত করতো দ্বিধাবোধ করতো না। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদিরা তাদের মধ্যে সংঘটিত এক জেনাকারের মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করে। তখন তিনি বলেন, তাওরাতে জেনাকারকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ মওজুদ আছে, সে মুতাবিক শাস্তি দিয়ে দাও। তখন সে জালেমরা তা গোপন করে ফেলে।
–[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪৬]

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا : অর্থাৎ তা মেনে নেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করবে না। يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ তারা বলতো। অর্থাৎ এরা তাদের ঐসব লোককে বলতো, যাদেরকে তারা নবী কারীম ﷺ -এর মজলিসে প্রেরণ করতো। هٰذَا অর্থাৎ এই হুকুম। আসল আসমানি হুকুম বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনগড়া যেসব কথা বলতো فَخُذُوْهُ অর্থাৎ তা মানার জন্য অঙ্গীকার করবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, আয়াতে সে ব্যক্তির নিন্দা করা হচ্ছে, যে জ্ঞানীদের সংস্পর্শে এজন্য আসে না যে, সে মাসআলার উপর আমল করবে, বরং তারা তাদের সোহবতে এ উদ্দেশ্যে আসে যে, যদি তাদের মর্জি মুতাবিক কিছু কথাবার্তা পায় তবে তা দিয়ে বদনাম সৃষ্টি করবে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪৪৭]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ : মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করে না, হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা, কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনো কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অস্তিত্বপ্রাপ্ত হতে পারে না। এটা এমনই এক মূলনীতি যা অস্বীকার করা স্বীকার করা অপেক্ষা ঢের শক্ত। মনে করুন, এক ব্যক্তি চুরি করতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা সে চুরি না করুক। এখন সে যদি ভালো ও মন্দ কোনোটিরই ইচ্ছা না করে, তবে তাতে মহান আল্লাহর বেকারত্ব, ঔদাসিন্য ও নির্বুদ্ধিতা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। এসব দিকে চিন্তা করার পর শেষ পর্যন্ত এটাই মানতে হবে যে, কোনো জিনিসই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না; বিষয়টি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কিত আলোচনাও অত্যন্ত দীর্ঘ। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৫]

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ : যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি তারা কারা এবং কেন? প্রথমে ইহুদি ও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিশেষভাবে কয়েকটি কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা– সর্বদা মিথ্যা ও ভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট হওয়া, সত্যপন্থিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, কূটীল চরিত্র ও দুষ্টমতিদের সহযোগিতা করা, হেদায়েতের বাণীকে বিকৃতাকারে পেশ করা এবং নিজের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোনো সত্য কথাকে গ্রহণ না করা। যে জাতির মাঝে এসব চরিত্র পাওয়া যাবে তাকে সেই রুগ্ণ ব্যক্তির সাথে তুলনা করতে পারেন, যে না ওষুধ পথ্য ব্যবহার করবে, না ক্ষতিকর দ্রব্যাদি পরিহার করে চলবে। সর্বদা ডাক্তার-চিকিৎসককে ঠাট্টা-উপহাস করাই তার কাজ। কেউ সুপরামর্শ দিলে তাকে গালাপাল শুনতে হবে। ব্যবস্থা পত্র ছিঁড়ে ফেলা বা তাতে রদবদল করা তার স্বভাব। সেই সঙ্গে তার অঙ্গীকার সে ওষুধ, তা রুচি মর্জির পরিপন্থি হবে, তা কস্মিনকালেও ব্যবহার করবে না। এমতাবস্থায় কোনো ডাক্তার যা হেকীম, তা যদি তার পিতাও হয়, যদি চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, এরূপ রোগীকে তার স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতার পরিণাম ভোগ করতে দেওয়া হোক, তবে কি সেটাই চিকিৎসকের নির্দয়তা বা অবহেলা সাব্যস্ত হবে, নাকি তাকে খোদ রোগীর আত্মহত্যা মনে করা হবে? এমতাবস্থায় সে রোগী যদি মারা যায় তবে এ বলে চিকিৎসককে অভিযুক্ত করা যাবে না যে, সে চিকিৎসা করে তা সুস্থ করতে চায়নি কেন? বরং রোগীর উপরই অভিযোগ আসবে যে, সে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করেছে এবং চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় চিকিৎসককে বাধাগ্রস্ত করেছে। ঠিক এভাবেই এখানে ইহুদিদের দুষ্কর্ম, স্বেচ্ছারিতা ও হঠকারিতার উল্লেখপূর্বক যে বলা হলো [مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান] এবং اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ [এরাই তারা যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি] এর অর্থ এটাই যে, তাদের অযোগ্যতা ও অপকর্মের কারণে মহান আল্লাহ তাদের উপর থেকে আপন কৃপাদৃষ্টি তুলে নিয়েছেন। এরপর আর তাদের সুপথে আসার ও পবিত্রতা ধারণ করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজেই আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে কষ্ট দিবেন না। ইরশাদ হয়েছে– وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ [যারা কুফরের দিকে ধাবিত হয় তাদের জন্য দুঃখ করবেন না] । যদি প্রশ্ন করা হয়, মহান আল্লাহর তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তাদের যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম জবরদস্তিমূরক দমন করে দিয়ে তাদেরকে বাধ্য করে দিতেন, যাতে স্বেচ্ছাচারিতা করতেই না পারে। তা আমরাও স্বীকার করি মহান আল্লাহর অপর শক্তির সামনে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا "তোমার প্রতিপালক চাইলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ঈমান আনত।"-[সূরা ইউনুস: ৯৯]

কিন্তু দুনিয়ার সামগ্রিক নীতিই রাখা হয়েছে কাউকে ভালো-মন্দ কোনো কাজে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করা হবে না। যদি কেবল ভালো কাজে সকলকে বাধ্য করে দেওয়া হতো, তবে বিশ্বসৃষ্টির লক্ষ্যই পূর্ণ হতো না এবং আল্লাহ তা'আলার বহু গুণ এমন রয়ে যেত, যা প্রকাশের কোনো স্থান পাওয়া যেত না, যেমন ক্ষমা, সহনশীলতা, শাস্তি দান, প্রবল পরাক্রম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিকানা ইত্যাদি। অথচ বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ছিল তাঁর সমস্ত গুণাবলিকে প্রকাশ করা। যে কোনো ধর্ম বা কোনো মানুষ, যে মহান আল্লাহকে স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ কর্তা মনে করে, সে শেষতক বিশ্বসৃষ্টির এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য দেখাতে পারবে না। لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا [তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে কে উত্তম। –[সূরা মূলক] এর চেয়ে বেশি আলোচনার সুযোগ এখানে নেই; বরং এতটুকুও আমাদের মূল বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৬]

قَوْلُهُ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : আখিরাতের আজাবের প্রকাশ তো আখিরাতেই হবে। কিন্তু দুনিয়ার অপমান, অপদস্থতা, লাঞ্ছনার আজাব কিছুদিনের মধ্যেই সংঘটিত হয়, যা দোস্ত ও দুশমন সবাই তাদের চোখ দিয়ে অবলোকন করে। মুনাফিকদের নিফাক একে একে প্রকাশ পেয়েছে; ফলে সমাজে তারা অপমান অপদস্থ হয়েছে। এখন থাকলো ইহুদিদের কথা। সে ব্যাপারে দেখা যায় যে, তাদের বৃহৎ ও শক্তিশালী সম্প্রদায় বনূ নযীর, বনূ কুরাইযা, বনূ কায়নুকা, তারা সবাই বন্দী হয়েছে, নির্বাসিত হয়েছে এবং নিহত হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৫০]

قَوْلُهُ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ : অর্থাৎ মিথ্যা শ্রবণে খুবই আগ্রহশীল। এখানে ইহুদিদের বিশেষ ও সাধারণ সব ধরনের লোকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। سَمْعٌ অর্থ– শ্রবণ; এখানে শ্রবণের সাথে মিথ্যা ও বাতিল গ্রহণ করার ব্যাপারও আছে। এ শব্দটি একটু আগের আয়াতে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ তাকিদের জন্য শব্দটি আবার আনা হয়েছে। كَرَّرَهٗ تَاكِيْدًا تَعْظِيْمًا বিশেষ তাকিদ ও সম্মানের জন্য শব্দটি পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে। كَرَّرَ لِلتَّاكِيْدِ শব্দটি তাকিদের জন্য পুনরায় আনা হয়েছে। اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ اَوِ السُّحْتُ الْحَرَامُ হারাম ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত। সব ধরনের হারাম খাদ্যের জন্য سُحْتٌ শব্দটি ব্যবহার হয়। مَا خَبُثَ مِنَ الْمَكَاسِبِ যে উপার্জন অবৈধ অথবা হারাম, তাই سُحْتٌ –[কামূস]

وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ যে উপার্জন বৈধ নয়, তাই সুহত [মাদরিক]। এখানে অর্থ হলো, রিশওয়াত বা ঘুষ। এ অর্থই তার জন্য এখন খাস। রিশওয়াতকে-ই সুহত বলা হয়। –[তাজ, রাগিব] হারামভাবে যা নেওয়া হয়, তাকে রিশওয়াত বলে। –[তাফসীরে কাবীর] হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। هُوَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ -এটি [সুহত] হুকুমের দিক দিয়ে রিশওয়াত বা ঘুষের মতো। –[মাদারিক]। هُوَ الرِّشْوَةُ -এ হলো [সুহত] রিশওয়াত বা ঘুষের সমতুল্য।

এ বিশেষ গুণটি ছিল বিশিষ্ট ও বড় বড় ইহুদিদের যারা ঘুষের বিনিময়ে উল্টাপাল্টা হুকুম-আহকাম বর্ণনা করতো এবং মাসআলা-মাসাইল পরিবর্তনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের কাছে যে আসমানি কিতাব আছে [তাওরাত], তাতে তাদের ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ঘুষ গ্রহণ না করা সম্পর্কে এরূপ হুকুম আছে; তোমাদের সব ফিরকার মধ্যে কাজী নিয়োগ করবে। তারা যেন ইনসাফের সাথে লোকদের মাঝে বিচার করে। তোমরা বিচারের সময় মকদ্দমা পরিবর্তন করবে না। তোমরা পক্ষপাতিত্ব করবে না এবং রিশওয়াত বা ঘুষ গ্রহণ করবে না। কেননা ঘুষ বিবেকবান লোকদের চোখকে অন্ধ করে দেয় এবং সত্যবাদী লোকদের কথাকে ফিরিয়ে দেয়। [দ্বিতীয় বিবরণ, ১৬: ১৮, ১৯]। কিন্তু তাদের বুজুর্গরা 'তালমুদে' এরূপ হুকুম রেখেছিল যে, যখন কোনো মকদ্দামায় এক দল ইসরাঈলী হয় এবং অপরদল গায়রে ইসরাঈলী; এমতাবস্থায় ইসরাঈলীদের পক্ষে যদি ইহুদি শরিয়ত মুতাবিক ফয়সালা করা সম্ভব হয়, তবে তা করবে এবং এরূপ বলে দাও যে, এটাই আমাদের কানুন। আর যদি তাদের সে ফায়সালা গায়রে ইসরাঈলী কানুনের অনুরূপ হয়, তবে তা করে দেবে এবং গায়রে ইসরাঈলীদের বলবে, এটাই তোমাদের গ্রন্থ মুতাবিক ফয়সালা। আর যদি সে ফয়সালা দু'টি নিয়মের কোনো একটির সাথে না মিলে, তখন বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করবে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বলেন, আল্লাহর উক্ত আয়াতে 'রহমতের' দলিল আছে। কেননা এখানে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, অধিক খারাপ অভ্যাস ও গুনাহের কারণে। ছোট গুনাহের কারণে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়নি, যার থেকে সাধারণত অভ্যাসগত কারণে কেউ মুক্ত হতে পারে না। এ হলো তরবিয়তকারী মাশায়েখে কেরামের অবস্থা যে, তারা সামান্য অপরাধকেও উপেক্ষা করেন। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৫১]

قَوْلُهُ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ : চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ, দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরো একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে, اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ তারা سُحْت [সুহ্‌ত] খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে– فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তা'আলা আজাব দ্বারা তোদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা.), ইবরাহীম নখয়ী (র.), হাসান বসরী (র.) মুজাহিদ (র.), কাতাদা (র.) ও যাহ্‌হাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্‌ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে সমাজে ঘুষ চালু হয়ে যায়, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয় পড়লে কারো জানমাল ও ইজ্জত আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে সুহ্‌ত আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালি বা মধ্যস্থতা করে।

শরিয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত জায়েজ নয়, সে কাজের পারিশ্রামিক গ্রহণ করা। উদাহরণত যে কাজ করা কোনো ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে কাজের জন্য কোনো পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারি কর্মকর্তা ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট কোনো লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা-ই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারো কাছে থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোনো পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ। রোজা নামাজ, হজ তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এর জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকহবিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কুরআন শিক্ষাদান করা ও নামাজের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে ন্যায়সঙ্গত কাজও করে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারো অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরিউক্ত গুনাহ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহর নির্দেশের বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদের এ থেকে রক্ষা করুন!

–[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৩৩, ১৩৪]

قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ : [আপনাকে দু'টি ব্যাপারেই ইখতিয়ার-স্বাধীনতা দেওয়া হলো, আপনি যা ভালো মনে করেন, তা করবেন]। فَإِنْ جَاءُوكَ যদি তারা আপনার কাছে আসে কোনো ব্যাপার বা মোকদ্দমা নিয়ে। এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তো মদীনার বাদশা এবং দুনিয়ার দিক দিয়ে ক্ষমতাবান নির্দেশদাতা। এজন্য ইহুদিরা অবশ্যই তাদের ব্যাপারগুলো তাঁর সামনে আনতে বাধ্য ছিল। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে এরূপ ছিল যে, শরিয়তে মুহাম্মাদী শরিয়তে ইহুদি থেকে অনেক সহজ ছিল। এজন্য মদীনার বহু ইহুদি তাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে আসতো। জিম্মিদের ব্যাপারে ফায়সালা করা ইসলামের আমীরের জন্য ওয়াজিব, অন্যান্য কাফেরের জন্য ওয়াজিব নয়, কেবল জায়েজ মাত্র, তাও প্রয়োজন, কল্যাণ ও মঙ্গলের খাতিরে। যেমন বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইখতিয়ার যে, কাফেরদের ব্যাপারে ফয়সালা করা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয়, যদি তারা যিম্মী না হয়, বরং তাদের মাঝে হুকুম দেওয়া জায়েজ, যদি আমরা তা দিতে চাই। এ ইখতিয়ার কেবল তাদের জন্য খাস, যাদের ব্যাপারে তাদের কোনো জিম্মাদারী নেই।

[এখন সেসব ন্যায়বিচারের নিয়ম-কানুন ইসলামের কানুনের অন্তর্ভুক্ত]। وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ -যদি আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করেন; এবং নবী কারীম ﷺ -এর এ উপেক্ষা অবশ্যই দীনের কোনো কল্যাণের খাতিরেই হতো فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا -তবে তারা কখনো আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ জন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না যে, নাখোশ হয়ে এরা আপনার সাথে কোনোরূপ শত্রুতা করবে। بِالْقِسْطِ ন্যায়মতে; যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, যা কুরআনে আছে এবং ইসলামি শরিয়তের বিধানে আছে। ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা এ ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে যে, জিম্মি নয়– এরূপ কাফেরদের ব্যাপারে ফয়সালা বা বিচার করা যেতে পারে এবং নাও করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ফয়সালা করতেই হয়, তবে এটা জরুরি যে, তা শরিয়তের কানুনের আওতায় করতে হবে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ১৫২,১৫৩]

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবেত্তা হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য এ ইখতিয়ার ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। তারপর ইসলাম যখন শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন ইরশাদ হয়– وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ। অর্থাৎ "শরিয়তের কানুন অনুযায়ী তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করুন।" পাশ কাটিয়ে চলা ও উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৭]

قَوْلُهُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : কুরআন মাজীদ বারংবার এ বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, একজন লোক যতই দুষ্ট ও জালিম হোক না কেন, তার ক্ষেত্রেও তোমার ন্যায়ের আচল যেন বে-ইনসাফীর ছিটাফোঁটা দ্বারা কালিমালিপ্ত না হতে পারে। এটাই একমাত্র নীতি যা দ্বারা আসমান জমিনের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকতে পারে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৮]

[আর আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন, স্পষ্ট যে, তাদেরকে তিনি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দেন]। এখানে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যত অপরাধী-ই হোক না কেন, আপনি তাদের ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের উপর স্থির থাকবেন, তা থেকে বিচ্যুত হবেন না। بِالْحَقِّ অর্থাৎ সত্যসহ এবং ইনসাফের সাথে, যদিও তারা কুফরির মধ্যে থাকে সত্যপথ বিচ্যুত হয়ে। –[তাফসীরে মাজেদী: টীকা-১৫৪]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমের মকদ্দমা বিধি : এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদালতে মকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদিরা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ জিম্মিও ছিল না। তবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে 'যুদ্ধ নয়' মর্মে চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে শরিয়ত অনুযায়ী তাদের মকদ্দমার ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা জিম্মি হলে এবং ইসলামি আদালতে মকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরজ হতো; নির্লিপ্ত থাকা জায়েজ হতো না। কেননা তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মুসলমান ও জিম্মির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ তারা আপনার কাছে মকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি শরিয়ত অনুযায়ী তার

ফয়সালা করে দিন। এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা জিম্মি নয়, বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোনো চুক্তি করেছে। যেমন বনী কুরাইযা ও বনী নযীর। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা জিম্মি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মকদ্দমার নিজ শরিয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযূলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত বিনিময়ের মকদ্দমা এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মকদ্দমা। এ জাতীয় সাধারণ আইনে শ্রেণি অথবা ধর্মের কারণে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি হস্তকর্তন শুধু মুসলমানদের বেলাই প্রযোজ্য নয়; বরং দেশের যে কোনো বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামি আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরি নয়।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিয়ে শুদ্ধ ছিল, তিনি তা বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নিপূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরায় ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি ছিল। মহানবী ﷺ জানতেন যে, অগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভাগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনো তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি; বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোটকথা, ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এসব ব্যাপারে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে। তবে যদি তারা উভয় পক্ষ মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামি আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। কেননা তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন।

قَوْلُهُ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ : আয়াতে নবী কারীম ﷺ -কে ইসলামি আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের; যাতে কোনো সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয় অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্য আসে। এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরিয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল তারা সবাই ছিল মুনাফিক। ইহুদিদের সাথে এদের গোপন যোগসাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। -[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১২৯,১৩০]

قَوْلُهُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ : অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- তারা আপনাকে বিচারক বানায়; অথচ যেই তাওরাতকে আসমানি কিতাব বলে তারা বিশ্বাস করে তার ফয়সালায় তারা রাজি হয় না। বাস্তবিকপক্ষে তাদের ঈমান নেই কোনোটির উপরই, না পাক কুরআনের উপর, না তাওরাতের উপর। সামনের রুকুতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রশংসাপূর্বক সতর্ক করা হয়েছে যে, তা এতো উত্তম ও হেদায়তপূর্ণ কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এ অপদার্থরা তার মূল্যায়ন করেনি। উপরন্তু তারা তাকে এমনভাবেই নষ্ট করে ফেলে যে, আজ আসল কিতাবের কোনো হাদীসই পাওয়া যায় না। অবশেষে, আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে সর্বশেষে সেই কিতাব নাজিল করলেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মূল বক্তব্যের সংরক্ষক ও সমর্থক। এর স্থায়ী হেফাজতের দায়িত্ব প্রেরণকারী নিজ জিম্মায় রেখে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা তাঁরই। -[তাফসীরে উসমানী : পৃ. ১৩৯]

অনুবাদ :

٤٤. إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَنُوْرٌ بَيَانٌ لِلْأَحْكَامِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا انْقَادُوْا لِلّٰهِ لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَحْبَارُ الْفُقَهَاءُ بِمَا أَيْ بِسَبَبِ الَّذِيْ اسْتُحْفِظُوْا اسْتَوْدَعُوْهُ أَيْ اسْتَحْفَظَهُمُ اللّٰهُ إِيَّاهُ مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ أَنْ يُّبَدِّلُوْهُ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج أَنَّهُ حَقٌّ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ أَيُّهَا الْيَهُوْدُ فِيْ إِظْهَارِ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْشَوْنِ فِيْ كِتْمَانِهِ وَلَا تَشْتَرُوْا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط مِنَ الدُّنْيَا تَأْخُذُوْنَهُ عَلٰى كِتْمَانِهَا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ بِهِ.

৪৪. আমিই তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। তাতে ছিল গুমরাহী হতে সৎপথের পথনির্দেশ ও আলো অর্থাৎ বিধানসমূহের বিবরণ এর মাধ্যমে ইসরাঈল গোত্রের নবীগণ যারা ছিলেন অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত ইহুদিদেরকে বিধান দিত। এবং রাব্বানীগণ অর্থাৎ তাদের বিদ্বানগণ ও আহ্বায়কগণও অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল بِمَا -এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। তাদের মধ্যে ওটা সংরক্ষণ করা হয়েছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর হেফাজতকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এ সত্য এতদসম্পর্কে তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং হে ইহুদিগণ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রশংসা সম্বলিত বিবরণ, রাজম সম্পর্কিত আয়াত ইত্যাদি যা কিছু তোমাদের নিকট রয়েছে তার প্রকাশ করতে মানুষকে ভয় করো না, তা গোপন করার ব্যাপারে; বরং আমাকে ভয় কর! দুনিয়ার নগণ্য মূল্য যা গোপন করত তোমরা উপার্জন কর তার বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রয় করো না, পরিবর্তন করো না। **আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।**

٤٥. وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَيْ التَّوْرٰىةِ أَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ لا إِذَا قَتَلَتْهَا وَالْعَيْنَ تُفْقَأُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ يُجْدَعُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ تُقْطَعُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ تُقْلَعُ بِالسِّنِّ لا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالْجُرُوْحَ بِالْوَجْهَيْنِ قِصَاصٌ ط أَيْ يُقْتَصُّ فِيْهَا.

৪৫. তাদের জন্য তাতে অর্থাৎ তাওরাতে বিধান ফরজ করে দিয়েছিলাম যে প্রাণের অর্থাৎ কোনো প্রাণ যদি অন্য কোনো প্রাণকে হত্যা করে তবে এর বদলে ঐ প্রাণ হত্যা করা হবে, চোখ গলিয়ে দেওয়া হবে চোখের বদলে, নাকের বদলে নাক কেটে দেওয়া হবে, কানের বদলে কান বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়ে ফেলা হবে। اَلْاُذُنَ، اَلْاَنْفَ، اَلْعَيْنَ، اَلسِّنَّ : এ চারটি অপর এক কেরাতে رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত রয়েছে। এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। اَلْجُرُوْحَ এটা رَفْع [পেশ] ও نَصْب [যবর] **উভয়রূপে** পঠিত রয়েছে।

إِذَا أَمْكَنَ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَمَا لَا يُمْكِنُ فِيْهِ الْحُكُوْمَةُ وَهٰذَا الْحُكْمُ وَإِنْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ مُقَرَّرٌ فِيْ شَرْعِنَا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ أَيْ بِالْقِصَاصِ بِأَنْ مَكَّنَ مِنْ نَفْسِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ط لِمَا أَتَاهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে জখমের অনুরূপ জখম করা সম্ভব যেমন হাত-পা, পুরুষাঙ্গ ইত্যাদিতে তা করা হবে। আর যেসব স্থানে তা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে সুবিচারের ভিত্তিতে মীমাংসা দেওয়া হবে। উল্লিখিত বিধান তাদের জন্য ছিল বটে তবে আমাদের শরিয়তেও তা বিদ্যমান রাখা হয়েছে। অনন্তর কেউ এতে অর্থাৎ কিসাসের জন্য নিজেকে 'সাদকা' করলে অর্থাৎ নিজেকে সমর্পণ করলে তাতে সে যে পাপ করেছে তার কাফ্ফারা হবে। কিসাস ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

٤٦. وَقَفَّيْنَا اتَّبَعْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ أَيِ النَّبِيِّيْنَ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَنُوْرٌ لا بَيَانٌ لِلْأَحْكَامِ وَمُصَدِّقًا حَالٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْأَحْكَامِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ط

৪৬. তাদের অর্থাৎ নবীদের পিছনে প্রেরণ করেছিলাম, অনুবর্তী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসাকে তার সম্মুখে অর্থাৎ তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম; তাতে ছিল গুমরাহী হতে সুপথের নির্দেশ এবং আলো অর্থাৎ বিধিবিধানসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ। এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের অর্থাৎ এর বিধিবিধানসমূহের সমর্থকরূপে এবং সাবধানীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশরূপে। مُصَدِّقًا শব্দটি حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

٤٧. وَقُلْنَا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ يَحْكُمَ وَكَسْرِ لَامِهِ عَطْفًا عَلٰى مَعْمُوْلِ اٰتَيْنٰهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

৪৭. আর বলেছিলাম, ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অর্থাৎ যেসব বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। لِيَحْكُمَ এটা অপর এক কেরাতে اٰتَيْنٰهُ ক্রিয়ার مَعْمُوْلٌ -এর সাথে عَطْفٌ বা অব্যয় হিসেবে نَصْبٌ [যবর] এবং لَامٌ -এ কাসরা সহকারে পঠিত রয়েছে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী।

٤٨. وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ يَامُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا شَاهِدًا عَلَيْهِ وَالْكِتٰبِ بِمَعْنَى الْكُتُبِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِذَا تَرَافَعُوْا اِلَيْكَ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَادِلًا عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ اَيُّهَا الْاُمَمُ شِرْعَةً شَرِيْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط طَرِيْقًا وَاضِحًا فِى الدِّيْنِ تَمْشُوْنَ عَلَيْهِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً عَلٰى شَرِيْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَّلٰكِنْ فَرَّقَكُمْ فِرَقًا لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰيكُمْ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ لِيَنْظُرَ الْمُطِيْعَ مِنْكُمْ وَالْعَاصِىَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط سَارِعُوْآ اِلَيْهَا اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا بِالْبَعْثِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَيَجْزِىْ كُلًّا مِّنْكُمْ بِعَمَلِهٖ.

৪৮. হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব আল কুরআন সত্যসহ بِالْحَقِّ শব্দটি اَنْزَلْنَا ক্রিয়াপদের সাথে مُتَعَلِّقٌ। এর সামনে অর্থাৎ এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের অর্থাৎ কিতাবসমূহের সমর্থক ও তার সংরক্ষকরূপে সাক্ষীরূপে। সুতরাং কিতাবীরা যদি তোমার নিকট বিচার উত্থাপন করে তবে আল্লাহ তোমার নিকট যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি করো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা হতে ফিরে গিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। হে উম্মতবর্গ! তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত বিধান ও পথ ধর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট পথ যার উপরে তোমরা চলবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন অর্থাৎ একই শরিয়তের অনুসারী করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের যা অর্থাৎ যে বিভিন্ন শরিয়ত ও ধর্মমত দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কে আনুগত্যশীল এবং কে অবাধ্য? তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদেরকে পৃথক পৃথক করে রেখেছেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর দ্রুত ধাবমান হও, পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা ধর্মের বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।

٤٩. وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ لِ اَنْ لَا يَّفْتِنُوْكَ يُضِلُّوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط

৪৯. কিতাব অবতীর্ণ যেন তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে, পথভ্রষ্ট না করে।

অনুবাদ :

٤٤. اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَنُوْرٌ بَيَانٌ لِلْاَحْكَامِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ مِنْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا انْقَادُوْا لِلّٰهِ لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ وَالْاَحْبَارُ الْفُقَهَاءُ بِمَا اَىْ بِسَبَبِ الَّذِىْ اسْتُحْفِظُوْا اِسْتَوْدَعُوْهُ اَىْ اِسْتَحْفَظَهُمُ اللّٰهُ اِيَّاهُ مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ اَنْ يُّبَدِّلُوْهُ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج اَنَّهُ حَقٌّ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ اَيُّهَا الْيَهُوْدُ فِىْ اِظْهَارِ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْشَوْنِ فِىْ كِتْمَانِهِ وَلَا تَشْتَرُوْا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط مِنَ الدُّنْيَا تَاْخُذُوْنَهُ عَلٰى كِتْمَانِهَا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ بِهٖ ـ

৪৪. আমিই তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। তাতে ছিল গুমরাহী হতে সৎপথের পথনির্দেশ ও আলো অর্থাৎ বিধানসমূহের বিবরণ এর মাধ্যমে ইসরাঈল গোত্রের নবীগণ যারা ছিলেন অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত ইহুদিদেরকে বিধান দিত। এবং রাব্বানীগণ অর্থাৎ তাদের বিদ্বানগণ ও আহ্বায়কগণও অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল بِمَا -এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। তাদের মধ্যে ওটা সংরক্ষণ করা হয়েছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর হেফাজতকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এ সত্য এতদসম্পর্কে তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং হে ইহুদিগণ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রশংসা সম্বলিত বিবরণ, রাজ্‌ম সম্পর্কিত আয়াত ইত্যাদি যা কিছু তোমাদের নিকট রয়েছে তার প্রকাশ করতে মানুষকে ভয় করো না, তা গোপন করার ব্যাপারে; বরং আমাকে ভয় কর! দুনিয়ার নগণ্য মূল্য যা গোপন করত তোমরা উপার্জন কর তার বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রয় করো না, পরিবর্তন করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

٤٥. وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَىِ التَّوْرٰىةِ اَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ لا اِذَا قَتَلَتْهَا وَالْعَيْنَ تُفْقَأُ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ يُجْدَعُ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ تُقْطَعُ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ تُقْلَعُ بِالسِّنِّ لا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فِى الْاَرْبَعَةِ وَالْجُرُوْحَ بِالْوَجْهَيْنِ قِصَاصٌ ط اَىْ يُقْتَصُّ فِيْهَا ـ

৪৫. তাদের জন্য তাতে অর্থাৎ তাওরাতে বিধান ফরজ করে দিয়েছিলাম যে প্রাণের অর্থাৎ কোনো প্রাণ যদি অন্য কোনো প্রাণকে হত্যা করে তবে এর বদলে ঐ প্রাণ হত্যা করা হবে, চোখ গলিয়ে দেওয়া হবে চোখের বদলে, নাকের বদলে নাক কেটে দেওয়া হবে, কানের বদলে কান বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়ে ফেলা হবে। اَلْاُذُنَ، اَلْاَنْفَ، اَلْعَيْنَ، اَلسِّنَّ : এ চারটি অপর এক কেরাতে رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত রয়েছে। এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। اَلْجُرُوْحَ এটা رَفْع [পেশ] ও نَصْب [যবর] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ بِالْقِصَاصِ بِاَنْ مَكَّنَ مِنْ نَفْسِهٖ : এ তাফসীর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মতে। অন্যথায় ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে تَصَدَّقَ -এর অর্থ হলো– ক্ষমা করা। অর্থাৎ নিহতের ওয়ারিশগণ হত্যাকারীর কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া তাদের পক্ষে সদকা।

قَوْلُهُ قُلْنَا : এখানে قُلْنَا উহ্য ধরার কারণ হলো قَفَّيْنَا -এর সাথে عَطْف সহীহ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِنَصَبِ لِيَحْكُمَ : لَامْ كَىْ -এর পর اَنْ مُقَدَّرَهْ -এর কারণে يَحْكُمَ মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفًا عَلٰى مَعْمُوْلِ اٰتَيْنَا : আর সে উহ্য مَعْمُوْل হলো اٰتَيْنَاهُ هُدًى وَمَوْعِظَةً -এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ হওয়ার কারণে মানসূব। তাকদীরী ইবারত হবে– وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ لِلْهُدٰى وَالْمَوْعِظَةِ وَحُكْمُهُمْ بِهٖ

قَوْلُهُ اَنْ : এটা হেতুবোধক এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে لِ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَفْتِنُوْكَ : এর পূর্বে একটি 'না'। সূচক শব্দ لَا উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার সপ্তম রুকু। এতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ বিষয়টিকে সূরা মায়িদার প্রথম থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর প্রেরিত বিধিবিধানের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চিরাচরিত বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ রুকুতে আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের অধিকারী ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে তাদের এ অবাধ্যতা ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে প্রথম দুই আয়াতে সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'কিসাস' সম্পর্কে কতিপয় বিধান উল্লেখ করেছেন। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, তা কিসাস সম্পর্কেই ছিল অর্থাৎ বনী নুযাইর রক্ত বিনিময় ও কিসাসের ব্যাপারে সমতায় বিশ্বাসী ছিল না; বরং বনী কুরাইযাকে নিজেদের চাইতে কম রক্ত বিনিময় গ্রহণ করতে বাধ্য করত। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের আইন প্রয়োগ করার জন্য ইহুদিদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে, তাদেরকে কাফের ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে ইঞ্জীলধারী খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে অন্য আইন প্রয়োগ করার কারণে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে তাদেরকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে মুসলমানদের এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আহলে কিতাবদের এ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে এবং নাম-যম ও অর্থের লোভে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলি পরিবর্তন না করে অথবা আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে স্বরচিত আইন যেন প্রয়োগ না করে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তা এই যে, মৌলিক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারে যদিও সব পয়গাম্বর একই পথের অনুসারী, কিন্তু আল্লাহর রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক পয়গাম্বরকে তাঁর জমানার উপযোগী শরিয়ত দান করা হয়েছে, যাতে অনেক শাখাগত বিধিবিধান ভিন্নতর রাখা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পয়গাম্বরকে প্রদত্ত শরিয়ত তাঁর আমলে উপযোগী ও অবশ্য পালনীয় ছিল এবং যখন তা রহিত করে অন্য শরিয়ত আনা হলো, তখন তাই উপযোগী ও অবশ্যপালনীয় হয়ে গেছে। এতে শরিয়তসমূহের বিভিন্নতা ও পরিবর্তিত হতে থাকার একটি বিশেষ রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৩৭]

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ : অর্থাৎ আমি তাওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তাওরাতের শরিয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তাওরাতের কোনোরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না; বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধিবিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তাওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ .... وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ : অর্থাৎ তাওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যতদিন তার শরিয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গাম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহওয়ালা ও আলেমরা সবাই এ তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন।

এ বাক্যে পয়গাম্বরদের প্রতিনিধিদের দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ رَبَّانِيُّوْنَ এবং দ্বিতীয় ভাগ اَحْبَارُ ; رَبَّانِيُّ শব্দটি رَبٌّ -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহওয়ালা [আল্লাহভক্ত।]। اَحْبَارُ শব্দটি حِبْرٌ -এর বহুবচন। ইহুদিদের বাকপদ্ধতিতে তালিমকে حِبْرٌ বলা হতো। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহর জরুরি বিধিবিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবেন। নতুবা ইলম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোনো ব্যক্তি আল্লাহভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে ইলম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরি ফরজ ও ওয়াজিবের উপর আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহভক্ত ও আলেমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরি হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশির ভাগ ইবাদত, আমল ও জিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু ইলম হাসিল করে ক্ষান্ত হয়, তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ আল্লাহভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পরদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরিয়তের নির্দেশাবলি বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশির ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশি সময় ব্যয় করে না, তাকে حِبْرٌ বা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরিয়ত ও তরিকত এবং আলেম ও মাশায়েখের মৌলিক অভিন্নতাও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলেম ও সুফী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যত পৃথক পৃথক বলে মনে হয়।

قَوْلُهُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ : অর্থাৎ এসব পয়গাম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণির প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ তাওরাতের নির্দেশাবলি প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের হেফাজত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হলো যে, তাওরাত একটি ঐশীগ্রন্থ, পথপদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ওলামা, যাঁরা এর হেফাজত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদিদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে, তোমরা পূববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাওরাতের হেফাজত করার পরিবর্তে এর বিধিবিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তাওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী ﷺ -এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদিদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– পার্থিব নাম-যশ ও অর্থলিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রতবোধ করছ। কারণ এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদি জনগণ তোমাদের পেছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড় লোকদের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে তাওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বর্তনাম যুগের ইহুদিদেরকে বলা হয়েছে– فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা এমর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে জরুরি মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না; বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি হলো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব।

قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .... وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ : এরপর এখানে তাওরাতের বরাত দিয়ে কিসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি ইহুদিদের জন্য তাওরাতে এ বিধান অবতরণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে। বনী কুরাইযা ও বনী নযীরের একটি মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী নযীর গায়ের জোরে বনী কুরাইযাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী নযীরের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী নযীরের কোনো ব্যক্তি বনী কুরাইযার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে কিসাস নয়, শুধু রক্ত বিনিময় দেওয়া হবে। তাও বনী নযীরের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ জাহিলিয়্যাতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তাওরাতেও কিসাসও রক্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে উপস্থিত করে।

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ : অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম। তারা আল্লাহর বিধানে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতের প্রথমে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরবর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তাওরাতের মতোই হেদায়েত ও জ্যোতি।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কুরআন হলো তাওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক : পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতরণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত ইঞ্জীলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে। কারণ যখন তাওরাতের অধিকারীরা তাওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কুরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবিদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী ﷺ -কে তাওরাতধারী ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহপ্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদিদের কতিপয় আলেম মহানবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানেন আমরা ইহুদিদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তাহলো এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মকদ্দমা রয়েছে, আমরা মকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা হুজুরে পাক ﷺ -কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোনো ফয়সালা দেবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না? এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

পয়গাম্বরগণের বিভিন্ন শরিয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সকল নবী যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও শরিয়তসমূহও যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরিয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যক শ্রেণির জন্য একটি বিশেষ শরিয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ রয়েছে। যদি আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরিয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন

ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন নতুন গ্রন্থ ও শরিয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরিয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে, এর বিপক্ষে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না। শরিয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট তাৎপর্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য-অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিকির ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যেও নয়; বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে– আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই সে সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, যে সময়ে নামাজ পড়লে ছওয়াব তো দূরের কথা, উল্টা পাপের বোঝাই ভারি হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এ সময়ে রোজা রাখা নিশ্চিত গুনাহ। ৯ জিলহজ ছাড়া অন্য কোনোদিন কোনো মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্র হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাবে কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ জিলহজ তারিখে এটি সর্ববৃহৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন ও যেখানে নিষেধ করা হয় তখন সেখানে তাই হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়; বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্রপথেই বিদআত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তা-ই। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন পয়গাম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতরণ করে মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো একটি কাজ অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়; বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরিয়তসমূহের পার্থক্যের আর একটি বড় তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক স্তরের মানুষের মন-মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। আর কালের পরিবর্তন মানব স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহর রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধিবিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' [রদকারী আদেশ] ও 'মনসুখ' [রদকৃত আদেশ] -এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এলো, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশত কোনো নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুঁশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন; বরং শরিয়তসমূহে নাসিখ ও মনসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মতো। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিনদিন এ ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখে দেবে, তখন অমুক ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে; বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রটিই নির্ভুল ও জরুরি ছিল এবং পরবর্তী অবস্থায় পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ :

১. প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদিদের দায়েরকৃত মকদ্দমায় মহানবী ﷺ ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তাওরাতের শরিয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তসমূহের বিধিবিধানকে যদি কুরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন, ইহুদিদের মকদ্দমায় কিসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তাওরাতেও ছিল এবং অতঃপর কুরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

২. দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কিসাস সম্পর্কিত বিধান তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, সেগুলো

আমাদের শরিয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওরাতের অনুসারীদের তাওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদের ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ এ গ্রন্থদ্বয়ও তার শরিয়ত মহানবী ﷺ -এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, আজও সেগুলোর অনুসরণ করা জরুরি।

৩. আল্লাহর প্রেরিত বিধিবিধান সত্য নয়, এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

৪. ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম; বিশেষত আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

৫. আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গাম্বর ও তাঁদের শরিয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন; কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধিবিধান এবং এ পার্থক্য বিরাট তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল।

–[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৪১-১৪৭]

قَوْلُهُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ : অর্থাৎ তাদেরকে তাওরাত সংরক্ষণের জিম্মাদার বানানো হয়েছিল। কুরআন মাজীদের মতো إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ আমিই তাঁর সংরক্ষণকারী এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কাজেই ওলামায়ে কেরাম ও পণ্ডিতগণ যতদিন নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ততদিন তাওরাত সংরক্ষিত ও অনুসৃত ছিল। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াদার ধর্মযাজকদের হাতে তা বিকৃত হয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪২]

قَوْلُهُ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا : **অর্থাৎ মানুষের ভয় ও পার্থিব** লালসায় আসমানি কিতাবে রদবদল করো না ও তার বিধান ও সংবাদসমূহ **গোপন রেখো না। মহান আল্লাহর শাস্তি ও** প্রতিশোধকে **ভয় কর। তাওরাতের মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা তুলে ধরার পর এ বক্তব্য হয়তো সেই সব ইহুদি ধর্মযাজক ও** নেতৃবর্গকে **লক্ষ্য করে রাখা হয়েছে, যারা কুরআন নাজিলের সময় বর্তমান ছিল।** কেননা তারা রাজমের বিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা নবী কারীম ﷺ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গোপন করতো ও তার অর্থের নানা রকম অপব্যাখ্যা করাত। মাঝখানে মুসলিম উম্মাহকে নসিহত করা হয়েছে, তোমরা অপরাপর জাতির মতো কারো ভয়ে বা অর্থ ও মর্যাদার লোভে পড়ে নিজেদের আসমানি কিতাবকে নষ্ট করো না। কাজেই মহান আল্লাহর প্রশংসা এ উম্মত তাদের কিতাবের একটি হরফও লাপাত্তা করেনি। তারা আজ অবধি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর বিকৃতি সাধন ও রদবদলের প্রচেষ্টা হতে তাকে রক্ষা করে এসেছে এবং সর্বদাই করে যাবে। [ইনশাআল্লাহ] –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৩]

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ : مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ [আল্লাহ যা নাজিল করেছেন] মুতাবিক বিধান না দেওয়ার অর্থ খুব সম্ভব কিভাবে ঘোষিত নির্দেশের অস্তিত্বই অস্বীকার করে দেওয়া এবং তদস্থলে নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য বিধান প্রণয়ন করে নেওয়া। যেমন ইহুদিরা রজমের বিধান সম্পর্কে করেছিল। তো এরূপ লোকের কাফের হওয়ার মাঝে কি সন্দেহ থাকতে পারে? পক্ষান্তরে, এর অর্থ যদি হয় আল্লাহর দেওয়া বিধানের সত্যতা বিশ্বাস করার পর কার্যত তার পরিপন্থি ফয়সালা দান, তা হলে 'কাফের' অর্থ হবে কর্মগত কাফের। অর্থাৎ তার কর্মগত অবস্থা কাফেরদের মতো।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৪]

قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الخ : কিসাসের এ বিধান ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে। উসূল শাস্ত্রের বহু আলেম স্পষ্ট বলেছেন, কুরআন মাজীদ বা নবী করীম ﷺ পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের কোনো বিধান বর্ণনা করে থাকলে তা এ উম্মতের জন্যও অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হবে। যদি না রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও তার কোনোরূপ নিন্দা বা সংশোধন করে থাকেন। অর্থাৎ বিনা রদ ও প্রত্যাখ্যানে তা শোনানো মূলত গ্রহণ করে নেওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

–[তাফসীর উসমানী : টীকা ১৪৫]

قَوْلُهُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ : অর্থাৎ আঘাতের বদলা মার্জনা করে দেওয়ার দ্বারা আহত ব্যক্তির পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। বহু হাদীসে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। কতক মুফাসসির এ আয়াতকে আঘাতকারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ আহত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপমোচন হয়ে যাবে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই বেশি গ্রহণযোগ্য। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৬]

قَوْلُهُ وَقَضَيْنَا عَلَى اٰثَارِهِمْ .... بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ : অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) খোদ নিজের মুখেও তাওরাতের তাসদীক করতেন এবং তাঁকে দেওয়া কিতাব ইঞ্জীল ও তাওরাতের সমর্থন করতেন। হেদায়েত ও আলো হিসেবে ইঞ্জীলের ধরন-ধারণ তাওরাতেরই অনুরূপ। বিধানের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিল। যেমন لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ পার্থক্য তাওরাতের তাসদীক করার পরিপন্থি নয়। যেমন আজ আমরা কুরআনকে বিশ্বাস ও কেবল তারই বিধানকে স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আলহামদু লিল্লাহ সমস্ত আসমানি কিতাব সম্পর্কেও বিশ্বাস পোষণ করি যে তা সব মহান আল্লাহরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৯]

এই সত্যতা বর্তমান যুগে পরিবর্তিত ইঞ্জীল গ্রন্থেও হযরত ঈসা (আ.)-এর জবানীতে অবশিষ্ট আছে– "তোমরা এরূপ মনে করবে না যে, আমি তাওরাত অথবা অন্যান্য নবীদের কাছে প্রেরিত কিতাব মানসুখ বা বাতিল করার জন্য আগমন করেছি, বরং আমি পরিপূর্ণ করার জন্য এসেছি।" –[মথি, ৫; ১৭]। اٰثَارِهِمْ -এ هُمْ সর্বনামটি বনু ইসরাঈল যুগের নবীদের প্রতি ইঙ্গিতসূচক। অর্থাৎ ঐ সমস্ত নবীগণ, যারা আপনার পূর্বে ঈমান এনেছিল, হে মুহাম্মাদ।

قَوْلُهُ وَقَفَّيْنَا عَلَى اٰثَارِهِمْ : আমরা পাঠিয়েছিলাম তাদের পশ্চাতে, অর্থাৎ তাঁদের পদচিহ্নের উপর পিছে পিছে পাঠিয়েছিলাম। এ বাক্যে এ কথার প্রতি ইশারা হলো যে, হযরত ঈসা (আ.) সেরূপ একজন নবী ছিলেন, যেরূপ তাঁর পূর্বে বনূ ইসরাঈলের মধ্যে নবী হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রাপ্ত ওহী অন্যান্য নবীদের ব্যক্তিত্ব ও ওহীর মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য ছিল না। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৭১]

قَوْلُهُ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ : ইঞ্জীল নাজিল হওয়ার সময় যেসব খ্রিষ্টান বর্তমান ছিল হয়তো তাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে। অথবা কুরআন নাজিলের সময় যেসব খ্রিস্টান উপস্থিত ছিল, তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইঞ্জীলে যা কিছু নাজিল করেছেন, অবিকল সে অনুযায়ী যেন তারা বিধান দেয়। অর্থাৎ আখেরী জমানার নবী ও পবিত্র ফারকালীত সম্পর্কে ইঞ্জীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ভাষায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যে গোপন করার বা তার অবাস্তব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা না করে। সেই মহান দিশারী ও শ্রেষ্ঠ সংস্কারক সম্পর্কে মাসীহ (আ.) বলে গেছেন, সে আত্মা এসে তোমাদেরকে সত্যতার সব পথ জানিয়ে দেবেন, তারই অস্বীকৃতিতে বদ্ধপরিকর হয়ে নিজের স্থায়ী ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্যতা ছাড়া আর কি হতে পারে? পবিত্র মাসীহ (আ.) ও তার প্রতিপালকের আনুগত্য করার কি এটাই অর্থ? –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ১৫০]

قَوْلُهُ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ الخ : مُهَيْمِنٌ -এর একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যথা– বিশ্বস্ত, বিজয়ী ফয়সালাদাতা, রক্ষক ও সাক্ষী। এর প্রতিটি অর্থ হিসেবে কুরআন কারীমে যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের 'মুহাইমিন' তা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা যে আমানত তাওরাত, ইঞ্জীল প্রভৃতি গ্রন্থে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তা আরো অতিরিক্ত বিষয়ের সাথে কুরআন মাজীদে সংরক্ষিত আছে, যাতে কোনো প্রকার খেয়ানত ঘটেনি। কিছু কিছু শাখাগত বিষয় সেই কাল বা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল সেগুলোকে কুরআন রহিত করে দিয়েছে। তার যেসব বিষয়বস্তু অপূর্ণ ছিল কুরআন তার পূর্ণতা বিধান করেছে এবং যে অংশ সে সময়ের দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন ছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

শানে নুযূল : ইহুদিদের মধ্যে নিজেদের ক্ষণিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে ছিল তাদের বড় বড় পণ্ডিত ও নেতৃবর্গ। তারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে এসে বিবাদ-নিষ্পত্তির আবেদন জানাল। তারা এও বলল যে, আপনি জানেন ইহুদি জাতির অধিকাংশ আমাদের অধীন ও অনুগত। আপনি আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিলে আমরা মুসলিম হয়ে যাব এবং তার ফলশ্রুতিতে গোটা ইহুদি জাতি ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। মহানবী ﷺ এই উৎকোচমূলক ইসলাম গ্রহণ কবুল করলেন না। তিনি তাদের খেয়াল-খুশি মেনে নিতে সাফ অস্বীকৃতি জানালেন। তারই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাসীর]

পূর্ববর্তী টীকায় আমরা এ আয়াতের যে শানে নুযূল লিখেছি, তা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রিয়নবী ﷺ তাদের খেয়াল খুশি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার আগে নয়, বরং পরেই এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। কাজেই বলতে হবে এ আয়াত তাঁর স্থিতিশীলতার সমর্থন ও ভবিষ্যতেও নিষ্পাপের মর্যাদায় স্থিরপদ থাকতে অনুপ্রাণিত করার জন্য নাজিল হয়েছে। যারা এ প্রকার আয়াতকে নবী কারীম ﷺ-এর নিষ্পাপগুণের বিরুদ্ধে মনে করে, তারা নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধির অধিকারী। এক তো, কাউকে কোনো কাজে নিষেধ করলে সেটা এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত আম্বিয়ায়ে কেরাম যে নিষ্পাপ তার অর্থ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা তাঁদের দ্বারা ঘটতেই পারে না। অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পর্কে একথা জানার পর যে, সে কাজ মহান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাঁরা কখনই তাতে লিপ্ত হতে পারে না। কখনো ভুলে বা ইজতিহাদ ও রায় নির্ধারণগত ত্রুটিবশত উত্তমের স্থলে অধম গ্রহণ করলে বা অপ্রিয়কে প্রিয় জেনে করে ফেললে, সেটা নিষ্পাপের পরিপন্থি নয়। পরিভাষায় এর নাম 'যাল্লাৎ' অর্থাৎ ফসকে যাওয়া। যেমন হযরত আদম (আ.) ও অপরাপর কতক নবীর ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ [সূরা মায়িদা :৪৮] وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ [সূরা মায়িদা : ৪৯] প্রভৃতি আয়াতসমূহের মর্ম উপলব্ধি করতে কোনোরূপ জটিলতা থাকবে না।

কেননা এসব আয়াতে কেবল এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে যে, আপনি ঐসব অভিশপ্তদের বাক চাতুর্যে প্রভাবিত হবেন না এবং এমন কোনো রায় গ্রহণ করবেন না, যা দ্বারা অনিচ্ছাজনিতভাবে হলেও তাদের খেয়াল খুশির দৃশ্যতা অনুবর্তন হয়ে যায়। উদাহরণত আলোচ্য আয়াত যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, ইহুদিরা কিরূপ প্রতারণামূলক একটা প্রস্তাব মহানবী ﷺ -এর সম্মুখে পেশ করেছিল যে, তাদের মত অনুযায়ী রায় প্রদান করলে সমস্ত ইহুদি মুসলিম হয়ে যাবে। তারা জানত, তাঁর কাছে ইহজগতে ইসলামের চেয়ে বেশি আর কোনো জিনিস নেই। এরূপ ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ স্থিরপদ ব্যক্তির পক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, তাদের তুচ্ছ একটা ইচ্ছা পূরণ করলে যখন এত বড় দীনি স্বার্থসিদ্ধ হয়,. তখন দোষ কী? এরূপ বিপজ্জনক ও পিচ্ছিল স্থানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর অসাধারণ তাকওয়া ও অভাবিত বিচক্ষণতা তো আয়াত নাজিলের আগেই তাদের ছল-চাতুরী প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু ধরে নিন যদি এরূপ নাও হতো, তথাপি আয়াতের বক্তব্য বিষয়, যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, মহানবী ﷺ -এর নিষ্পাপ গুণের পরিপন্থি ছিল না। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা ১৫১-১৫৩]

قَوْلُهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ : অর্থাৎ শরিয়তসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য দেখে অযথা প্রশ্ন ও কুটিল তর্কে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করো না। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য সন্ধানীদের উচিত কাজের মাঝে নিজ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করা এবং আসমানি শরিয়ত যেসব আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে তার জন্য তৎপর থাকা। [তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৫৬]

قَوْلُهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ : [এ দুনিয়াতে] بَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ তাদের কোনো পাপের কারণে। এখানে পাপ বা অন্যায়ের অর্থ হলো, ইহুদিদের কুরআনের ফয়সালা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ অমান্য করা। পবিত্র, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া গুনাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কুফরি ও খারাপ আকীদার শাস্তি আখিরাতের জন্য রাখা হয়েছে, কিন্তু এ দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য শাস্তি তারা এ দুনিয়াতেই পাবে। বস্তুত ইহুদিদের কয়েদ করা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং কতল বা হত্যা করার শাস্তি সবই এ দুনিয়াতেই দেখেছে। مِنْ বা 'কোনো' শব্দটি ব্যবহারের কারণে মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যেমনটা নাকেরা বা অনির্দিষ্টসূচক শব্দ ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এখানে এ সন্দেহ রয়েছে যে, মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং গুনাহে বেশি বেশি লিপ্ত হলে, বড়ত্ব মহত্ত্ব কিরূপে প্রকাশ পায়। فَاِنْ تَوَلَّوْا যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; এই মুখ ফিরানো হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুকুম থেকে যা কুরআনের নির্দেশের বাস্তবরূপ। যেমন তাফসীরে বায়যাভীতে আছে- যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় নাজিলকৃত আল্লাহর হুকুম থেকে এবং তারা ইরাদা করে অন্য কিছুর। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৮৬]

قَوْلُهُ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ : জাহেলী যুগের রীতিনীতি কাম্য নয় : [অথচ তারা সে যুগ থেকে নিজেরা পরিত্রাণ চাইতো] এখানে ইহুদি ও নাসারাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যে ইসলামি কানুন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, এরূপ করা তো ইচ্ছাকৃতভাবে জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তনের শামিল। যে কানুনের ভিত আদল ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা তো হলো খোদায়ী কানুন ইসলাম। পক্ষান্তরে জাহেলী যুগের কাওমের বিধান বাস্তবায়ন তো এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল [আর আরব জাহেলী ও যুগেও তারা এর বাইরে ছিল না।] যে, অত্যাচারীর সাথী হবে; শক্তিমানকে আরো শক্তিশালী করবে এবং মজলুম ব্যক্তিদের কোনো খোঁজ খবর নেবে না। এমন কি ইহুদিরা আহলে কিতাব এবং শরিয়তের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও, প্রচলিত রীতি-নীতির প্রভাবে তারা এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিল যে, তাদের দু'টি দল বনু নযীর ও বনু কুরাইযা, যারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো; এর মধ্যে বনু নযীর অধিক প্রভাশালী হওয়ার কারণে তারা এ নিয়ম করে নিয়েছিল যে, হত্যা বা অন্য কোনো অপরাধের কারণে দিয়্যতস্বরূপ যে অর্থ তারা নিজেরা আদায় করতো, তার দ্বিগুণ অর্থ [একই ধরনের অপরাধের জন্য] তারা বনূ কুরাইযা থেকে উসূল করতো!

اَلْجَاهِلِيَّةُ শব্দের উপর টীকা সূরা আলে ইমরান ১৫৪ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। জাহেলী যুগের কানুন হিসেবে ঐসব কানুন বিবেচিত হবে, যা খোদায়ী ও আসমানি কানুনের বিপরীত মানুষের তৈরি মতবাদ মাত্র। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিস্তারিতভাবে তাদের সমালোচনা করেছেন, যারা খোদায়ী কানুনের মোকাবিলায় তাকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বেদখল করেও অন্যান্য কাওমের রীতি-নীতি চালাতো। অথবা তারা মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত বিষয়কে গ্রাহ্য করতো। আর এ ধরনের লোকদের স্পষ্ট কাফের বলা হয়েছে, যাদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি যদিও দীর্ঘ তবুও নিম্নোক্ত বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য "আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন, যারা আল্লাহর সুদৃঢ় হুকুম থেকে বেরিয়ে যায়, যা সব ধরনের কল্যাণের আধার, সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে নিষেধকারী, মানুষের অভিমত ও অভিলাষের বিরুদ্ধে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, ঐসব পরিভাষার বিরোধী, যা মানুষেরা মনগড়া বানিয়ে নেয়, আল্লাহর শরিয়তের সুদৃঢ় কোনো দলিল ব্যতিরেকে; যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা এর দ্বারা গোমরাহী, পথভ্রষ্টতার বিচার করতো, যা তারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছামতো বানিয়ে নিয়েছিল। যেমন তাতারী শাসকবর্গ তাদের দেশ শাসনের জন্য নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছিল, যা তারা নিজের দেশে তৈরি করেছিল। তাদের জন্য যে গ্রন্থ তৈরি করে নিয়েছিল, তা পরিপূর্ণ ছিল এমন হুকুম-আহকাম দিয়ে, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শরিয়তের বিধি-বিধান থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। যথা– ইহুদি, নাসারা, মিল্লাতে ইসলামিয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে এমন অনেক হুকুম আছে , যা তারা কেবল প্রবৃত্তি পরায়ণতার জন্য গ্রহণ করেছিল। ফলে তা তাদের নবীর শরিয়ত হিসেবে পেশ করতো এবং কিতাবুল্লাহ সুন্নতে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর হুকুমের বিপরীতে দাঁড় করাতো। যে এরূপ করবে, সে কতলের উপযোগী হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং এছাড়া অন্য কোনো কিছুর দ্বারা ফায়সালা করা যাবে না, চাই তা কম সম্পর্কে হোক, বা বেশি সম্পর্কে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৮৮]

قَوْلُهُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ : আল্লাহর শরিয়তের বিধানের বাইরে ন্যায়নিষ্ঠ, হিকমতপূর্ণ, সঠিক ও উপযোগী কানুন আর কি হতে পারে? এ সোজা কথাটি কেবল তারাই বুঝতে পারে, যাদের জ্ঞান শিরক ও নাস্তিকের রং থেকে মুক্ত, পরিষ্কার এবং ঈমান ইয়াকীনের আলোকে সমুজ্জ্বল। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা– ১৮৯]

অনুবাদ :

٥١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ ـ تُوَالُوْنَهُمْ وَتُوَادُّوْنَهُمْ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ لِاتِّحَادِهِمْ فِى الْكُفْرِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ط مِنْ جُمْلَتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بِمُوَالَاتِهِمُ الْكُفَّارَ.

৫১. হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু। কারণ কুফরি মতাদর্শে তারা এক। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। অর্থাৎ তাদের গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচ্য হবে। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥٢. فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ضَعْفُ اِعْتِقَادٍ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ الْمُنَافِقِ يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ فِىْ مُوَالَاتِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مُعْتَذِرِيْنَ عَنْهَا نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ يَدُوْرُ بِهَا الدَّهْرُ عَلَيْنَا مِنْ جَدْبٍ اَوْ غَلَبَةٍ وَلَا يَتِمُّ اَمْرُ مُحَمَّدٍ فَلَا يَمِيْرُوْنَا قَالَ تَعَالٰى فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ بِالنَّصْرِ لِنَبِيِّهِ بِاِظْهَارِ دِيْنِهِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ بِهَتْكِ سِتْرِ الْمُنَافِقِيْنَ وَافْتِضَاحِهِمْ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ مِنَ الشَّكِّ وَمُوَالَاةِ الْكُفَّارِ نٰدِمِيْنَ.

৫২. যাদের অন্ত:করণে ব্যাধি রয়েছে অর্থাৎ যাদের বিশ্বাস দুর্বল যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তুমি তাদেরকে এদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে দ্রুত ধাবমান দেখতে পাবে। এ বিষয়ে অজুহাত দেখিয়ে তারা বলে, আমরা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটনার আশংকা করি অর্থাৎ সময়ের আবর্তনে দুর্ভিক্ষ বা শত্রুর বিজয় লাভ ইত্যাদির কারণে আমাদের উপর বিপদ নেমে আসবে, পক্ষান্তরে মুহাম্মাদের বিষয়টিও পূর্ণতা লাভ করবে না; এমতাবস্থায় এদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখলে আমাদেরকে কে খেতে-পরতে দেবে! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধর্মের প্রকাশ ঘটিয়ে নবীকে সাহায্য করত বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে মুনাফিকদের আবরণ উন্মোচন ও এদেরকে লাঞ্ছিত করত এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা অর্থাৎ যে সন্দেহ ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব গোপন রেখেছে তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

٥٣. وَيَقُوْلُ بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا بِوَاوٍ وَدُوْنِهَا وَبِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يَاْتِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِبَعْضِهِمْ اِذَا هُتِكَ سِتْرُهُمْ تَعَجُّبًا.

৫৩. এবং বলবে يَقُوْلُ -এর পূর্বে وَاوْ সহ এবং وَاوْ ব্যতিরেকে পাঠ রয়েছে এটা اِسْتِيْنَافْ অর্থাৎ নতুন বাক্যরূপে رَفْعْ [পেশ] সহকারে পঠিত হতে পারে। আর يَاْتِىَ ক্রিয়ার সাথে عَطْف বা অব্যয়রূপে نَصْبْ [যবর] সহও পঠিত হতে পারে। মুমিনগণ যখন তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবে তখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাদের কাউকেও–

اَهٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لا غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط فِى الدِّيْنِ قَالَ تَعَالٰى حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ الصَّالِحَةُ فَاَصْبَحُوْا فَصَارُوْا خٰسِرِيْنَ الدُّنْيَا بِالْفَضِيْحَةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالْعِقَابِ.

এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে শপথ করত যে, ধর্ম বিশ্বাসে তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাদের সৎ কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়েছে; বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ফলে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়ে এবং পরকালে শাস্তিগ্রস্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

٥٤. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ بِالْفَكِّ وَالْاِدْغَامِ يَرْجِعْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ اِلَى الْكُفْرِ اِخْبَارٌ بِمَا عَلِمَ تَعَالٰى وُقُوْعَهٗ وَقَدْ اِرْتَدَّ جَمَاعَةٌ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بَدَلَهُمْ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ لا قَالَ ﷺ هُمْ قَوْمُ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِىْ صَحِيْحِهٖ اَذِلَّةٍ عَاطِفِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ اَشِدَّاۤءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ط فِيْهِ كَمَا يَخَافُ الْمُنَافِقُوْنَ لَوْمَ الْكُفَّارِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنَ الْاَوْصَافِ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ كَثِيْرُ الْفَضْلِ عَلِيْمٌ بِمَنْ هُوَ اَهْلُهٗ.

৫৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ স্বধর্ম হতে কুফরিতে ফিরে গেলে يَرْتَدَّ এটা اِدْغَام অর্থাৎ সন্ধিভূত আকারে ও এটা ব্যতীত উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اَعِزَّة অর্থ– কঠোর। এ আয়াতটিতে মূলত ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের পর এক দল লোক ইসলাম ত্যাগ করত মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ এদের স্থলে এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তাঁকে যারা ভালোবাসবে; তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল দয়াপরবশ ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং মুনাফিকরা যেমন কাফেরদের নিন্দার ভয় করে তারা তেমন কোনো নিন্দুকের ভয় করবে না। হাকিম (র.) তৎপ্রণীত সহীহে বর্ণনা করেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবূ মূসা আশ'আরীর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, তার সম্প্রদায় হবে এ সম্প্রদায় এটা অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, অপার অনুগ্রহের অধিকারী তিনি এবং কে তার যোগ্য তৎসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

٥٥. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمَنَا هَجَرُوْنَا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ خَاشِعُوْنَ اَوْ يُصَلُّوْنَ صَلٰوةَ التَّطَوُّعِ.

৫৫. একবার হযরত ইবনে সালাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোষ্ঠী তো আমাকে ত্যাগ করেছে। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়। رَاكِعُوْنَ এখানে এর মর্ম হলো যারা বিনত বা যারা নফল সালাত আদায় করে।

٥٦. وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيُعِيْنُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ لِنَصْرِهٖ اِيَّاهُمْ اَوْقَعَهُ مَوْقِعَ فَاِنَّهُمْ بَيَانًا لِاَنَّهُمْ مِنْ حِزْبِهٖ اَىْ اَتْبَاعِهٖ ـ

৫৬. কেউ আল্লাহ ও তার রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অনন্তর তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করলে আল্লাহর দলই তো এদেরকে আল্লাহর সাহায্যের কারণে বিজয়ী হবে। এরাই আল্লাহর দল অর্থাৎ তাঁর অনুসারী, এ কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে اِنَّهُمْ [নিশ্চয় তারা] -এর স্থলে [اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর দল.......] বলে বর্তমান বাক্যভঙ্গিমা গ্রহণ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُوَالُوْنَهُمْ وَتُوَادُّوْنَهُمْ : تُوَالُوْنَهُمْ মূলত تُوَالِيُوْنَهُمْ ছিল। يَاءٌ -এর উপর পেশ কঠিন বিধায় সে -لَامٌ -কে দেওয়া হয়েছে। এখন وَاوٌ এবং يَاءٌ দু'টি বর্ণ সাকিন অবস্থায় একত্র হওয়ার কারণে يَاءٌ -কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে এবং لَامٌ -এর কাসরা বিলুপ্ত হয়ে تُوَالُوْنَهُمْ হয়ে গেছে।

تُوَادُّوْنَ মূলত تُوَادِدُوْنَ ছিল। دَالٌ -কে دَالٌ -এর মাঝে ইদগাম করার ফলে تُوَادُّوْنَ হয়েছে। উভয়টি مُضَارِعْ جَمْعْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهُ اَوْلِيَاءَ : এটি وَلِيٌّ -এর বহুবচন। وَلِيٌّ -এর বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন মহব্বতকারী, বন্ধু, সাহায্যকারী, নিকটবর্তী প্রতিবেশি, মিত্র অনুসারী ইত্যাদি। এজন্য কোনো একটি অর্থ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মুফাসসির (র.) تُوَادُّوْنَ বলে অর্থ শনাক্ত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ : ইহুদি-নাসারাদের থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে কঠোরতা বর্ণনা করার জন্য এ জুমলাটি আনা হয়েছে। মর্ম হলো– حُكْمُهٗ كَحُكْمِهِمْ

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ : এটি اِنَّهُمْ مِنْهُمْ -এর ইল্লত।

قَوْلُهُ يُسَارِعُوْنَ : এটি قُلُوْبِهِمْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ دَائِرَةٌ : বিপর্যয়, বিপদ। এটি دَوْرٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো, ঘোরাফেরা করা دَائِرَةٌ শব্দটি এমন সিফতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর مَوْصُوْفٌ উল্লেখ থাকে না। دائرة মওসূফ। তার সিফত হলো يَدُوْرُ بِهَا

قَوْلُهُ الْمِيْرَةُ : مِيْرَةٌ অর্থ– খাদ্য, শস্য। اَىْ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى الْمِيرة অর্থাৎ ইহুদি-নাসারা আমাদেরকে খাদ্য দিবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ : প্রথম আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না। এরপর যদি কোনো মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোনো ইহুদি অথবা খ্রিস্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

শানে নুযূল : তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোনো বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য

করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদিরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশি দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরাইযার এসব ইহুদি একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ গ্রহণ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে সামেত প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদিদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ কারণেই বলল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেন– فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا مِنْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবি ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে, এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবি করত? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছে, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পরে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্য ধর্ম ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ কররেছেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না, হতে পারে না। কারণ এর হেফাজতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাজত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ তা'আলার কাজ কোনো ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়িকাঠও পঁচে গলে মাটি হতে থাকে। কবি চমৎকার বলেছেন– اِنَّ الْمَقَادِيْرَ اِذَا سَاعَدَتْ * اَلْحَقَتِ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন অক্ষম ও অকর্মণ্য ব্যক্তি দ্বারা সক্ষম ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির কাজ উদ্ধার করে নেয়।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলিও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মাকবূল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও নিজেরাও আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবেন। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত। যথা–

১. আল্লাহর সাথে তাদের ভালোবাসা। একে কোনো না কোনো স্তরের মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালোবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালোবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালোবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণত আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতের ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

২. তাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা; কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শোনানোরও কোনো বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালোবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে– قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, যে দল সুন্নত বিরোধী কাজকর্ম ও বিদআত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

উপরিউক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ এখানে اَذِلَّةٌ কামূস অভিধানের বর্ণনানুযায়ী ذَلِيْلٌ কিংবা ذَلُوْلٌ শব্দের বহুবচন হতে পারে। আরবি ভাষায় ذَلِيْلٌ শব্দের অর্থ তাই, যা উর্দু ইত্যাদি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে অর্থাৎ 'হীন'। ذَلُوْلٌ শব্দের অর্থ– নম্র ও সহজসাধ্য; যাকে সহজে বশ করা যায়। তাফসীরবিদগণের মতে আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে اَعِزَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عَزِيْزٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর দীনের শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্র করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালোবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্তা ও সত্তাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীনের খাতিরে নিবেদিত। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ ও রাসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতহে উল্লিখিত اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুরও তাই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমত বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না, জেল-জুলুম, যখম হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারো ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশ এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে এগুলোর অর্জন করতে পারে না।

-[মা'আরিফুল কুরআন ৩/১৫১-১৫৬]

ইসলামের স্থায়িত্ব ও হেফাজত সম্পর্কে অভাবনীয় ভবিষ্যদ্বাণী : পূর্বের আয়াতগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের পরিণামে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে বসত। যেমন- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ নেহায়েত দৃঢ়তা ও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে এসব লোক নিজেদের ক্ষতি করবে, ইসলামের কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ধর্মত্যাগীদের পরিবর্তে বা তাদের মোকাবিলায় এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাঁদের অন্তরে থাকবে মহান আল্লাহর প্রেম আর মহান আল্লাহও তাদের ভালোবাসবেন। তারা মুসলিমগণের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ও শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় হবে। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি ও সাহায্যক্রমে প্রতি যুগেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে আসছে। ধর্মদ্রোহিতার সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনা দেখা দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফত কালে। কয়েক রকমের মুরতাদ ইসলামের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর ঈমানী হিম্মত, অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের আত্মত্যাগী ও প্রেমিকসুলভ খেদমত সে আগুনকে নিভিয়ে দেন এবং সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুনভাবে ঈমান ও ইখলাসের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আজও আমরা দেখতে পাই, যখনই কিছু সংখ্যক মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হতে শুরু করে, তখন তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক এবং তাদের তুলনায় শিক্ষিত অমুসলিমকে ইসলাম তার মজ্জাগত আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারা নিজের দিকে টেনে আনে। আর মুরতাদদের মুণ্ডপাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একদল বিশ্বস্ত ও ত্যাগী মুসলিমকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা মহান আল্লাহর পথে কারো তিরস্কার ও গালমন্দের বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৬৮]

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিমদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ইসলামের হেফাজত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ তা'আলা উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী একটি দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের সেই দল, যারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই : সর্বপ্রথম মুসায়লামাতুল কায্যাব মহানবী ﷺ -এর সাথে নবুয়তে অংশীদারিত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী ﷺ -এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে, যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি না হতো তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদী ছিল। তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই নবীজী ﷺ ইন্তেকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়েমেন মুজাজ গোত্রের সরদার আসওয়াদ আনাসী নবুয়তের দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দমন করার জন্য ইয়েমেনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষদিকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। বনী আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ নবুয়ত দাবি করে বসে।

উপরিউক্ত তিনটি গোত্র হুজুরে আকরাম ﷺ রোগশয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে ইসলামি আইন অনুযায়ী জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুজুর ﷺ -এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামি দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে– এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সামনে এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, যার ফলে জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন, 'যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামি আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্র করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।'

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন। এ কারণেই হযরত আলী মুর্তযা (রা.), হাসান বসরী (র.), যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই এই নয় যে, অন্য কোনো দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন; বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কুরআনি নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর হাতে নিহত হলো এবং তাঁর দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদের মোকাবিলায়ও হযরত খালিদ (রা.)-ই গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আওয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আনাসীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয় বার্তা, যা চরম সংকট মুহূর্তে খলীফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য জাকাত অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন। এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ [নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী।] আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মোকাবিলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কুরআন পাক বর্ণনা করেছেন, তা সবই হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

অর্থাৎ প্রথমত আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ভালোবাসেন। দ্বিতীয়ত তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসেন। তৃতীয়ত তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর। চতুর্থত তাঁদের জিহাদ নিশ্চিতরূপেই আল্লাহর পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামি জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-দতবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হবে না, বরং এ সবই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরিউক্ত চার আয়াতে মুসলমানদের কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও অতঃপর তাঁর রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশালী। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই সম্পর্ক, পৃথক কিছু নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমান সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়, সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ অর্থাৎ প্রথমত তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামাজ পড়ে। দ্বিতীয়ত স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করে। তৃতীয়ত তারা বিনম্র ও বিনয়ী, স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য وَهُمْ رَاكِعُوْنَ -এ رُكُوْعٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে রুকুর অর্থ পারিভাষিক রুকু, যা নামাজের একটি রোকন يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ -এর পর وَهُمْ رَاكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাজকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামাজ থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নামাজ পড়ে, কিন্তু তাদের নামাজে রুকু নেই। রুকু একমাত্র ইসলামি নামাজেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন, এখানে 'রুকু' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ নত হওয়া, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরে মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়্যান এবং কাশ্শাফ গ্রন্থে যামাখশারী (র.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল কুরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্ব করে না; বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকুতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকু অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামাজ শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মেটাবেন, এতটুকু দেরি করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তিনি তা মূল্যায়ন করেছেন।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামাজ ও জাকাতের পাবন্দি করে। বস্তুত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রা.) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য সাব্যস্ত হবেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে- اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে, আপনি তাকে শত্রু মনে করুন! হযরত আলী (রা.)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলি ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক। সাহাবায়ে কেরাম এবং সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোনো এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (র.)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনিও আয়াতের মিসদাক বা লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কুরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহর দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহর দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবার উপর জয়ী হয়েছে। যে শক্তিই পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কিসরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নামনিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহর এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৫৬-১৬০]

'আওলিয়া' শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য : اَوْلِيَاءُ শব্দটি وَلِيٌّ-এর বহুবচন, যার অর্থ বন্ধু, আত্মীয়, সাহায্যকারী **ইত্যাদি। ইহুদি ও নাসারা** এবং সূরা নিসার বর্ণনা অনুযায়ী কোনো কাফেরের সাথেই মুসলিমগণ বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করবে **না। এখানে লক্ষণীয় যে, বন্ধুত্ব,** ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার, সন্ধি, ন্যায় ও ইনসাফ ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা বিষয়। মুসলিমগণ ভালো **মনে করলে বৈধ পন্থায় যে কোনো কাফেরদের সাথে চুক্তি** বদ্ধ হতে পারেন।

ইরশাদ হয়েছে- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ **অর্থাৎ** তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে **ঝুঁকবেন ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন। -[সূরা আনফাল : ৬১]**

ন্যায় ও ইনাসাফের নির্দেশ মুমিন কাফের প্রতিটি মানুষের সাথেই সমান, যেমনটা পূর্বের আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেছে। ভদ্রতা, সদাচরণ বা সমাদর ইত্যাদি কেবল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করে না, এমন কাফেরদের সাথেই প্রযোজ্য। যেমনটা সূরা মুমতাহানায় স্পষ্ট আছে। বাকি مُوَالَاةٌ অর্থাৎ বন্ধুত্বসুলভ নির্ভরতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য-সহযোগিতা জাতীয় সম্পর্ক কোনো কাফেরের সাথে হতে পারে না। তাদের সাথে এটা করার অধিকার কোনো মুসলিমের নেই, তবে বাহ্যিক ধরন-ধারণে বন্ধুত্ব মনে হয়, এরূপ সম্পর্ক যা اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলাম ও মুসলিমগণের সামগ্রিক অবস্থার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, এরূপ সাধারণ সাহায্য-সহযোগিতার অনুমতি আছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের কারো কারো পক্ষ হতে এ ক্ষেত্রে যে অসাধারণ কড়াকড়ির কথা বর্ণিত আছে, তাকে ক্ষতির চোরাই পথ বন্ধকরণ ও অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৬২]

قَوْلُهٗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ : অর্থাৎ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও আভ্যন্তরীণ হিংসা-বিদ্বেষ সত্ত্বেও তারা একে অপরের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রাখে। ইহুদি ইহুদির এবং খ্রিস্টান খ্রিষ্টানের মিত্র। মুসলিম জাতিকে মুকাবিলায় সমস্ত কাফের একে অপরের মিত্র ও সহযোগী। اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ সব কাফের একই জাতি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা ১৬৩]

٥٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا مَهْزُوًّا بِهٖ وَلَعِبًا مِّنَ لِلْبَيَانِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْجَرِّ وَالنَّصَبِ اَوْلِيَاۤءَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ مُوَالَاتِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ صادقين فى ايمانكم .

অনুবাদ :

৫৭. হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা مِنَ الَّذِيْنَ -এর مِنْ শব্দটি بَيَانِيَّةٌ অর্থাৎ বিবরণমূলক। তোমাদের দীনকে উপহাস অর্থাৎ উপহাসের বস্তু ও ক্রীড়ারূপে গ্রহণ করেছে তাদেরকে ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অর্থাৎ মুশরিক ও অংশীবাদীদেরকে, اَلْكُفَّارَ শব্দটি مَنْصُوْب ও مَجْرُوْر উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে সত্যবাদী হও তবে এদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করত আল্লাহকে ভয় কর।

٥٨. وَ الَّذِيْنَ اِذَا نَادَيْتُمْ دَعَوْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ بِالْاَذَانِ اتَّخَذُوْهَا اَىِ الصَّلٰوةَ هُزُوًا مَهْزُوًّا بِهَا وَّلَعِبًا ط بِاَنْ يَّسْتَهْزِءُوْا بِهَا وَيَتَضَاحَكُوْا ذٰلِكَ الْاِتِّخَاذُ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ .

৫৮. এবং তোমরা যখন আজানের মাধ্যমে সালাতের জন্য ডাক আহ্বান কর তখন তারা তাকে সালাতকে হাস্যাস্পদ, উপহাস্য বস্তু, ক্রীড়া-কৌতুকরূপে বানিয়ে নেয় অর্থাৎ তাকে নিয়ে তারা ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-তামাশা করে। এটা এ হাসি-তামাশারূপে পরিণত করা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

٥٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِمَنْ تُؤْمِنُ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ فَلَمَّا ذَكَرَ عِيْسٰى قَالُوْا لَا نَعْلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمْ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ تُنْكِرُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لا اِلَى الْاَنْبِيَاۤءِ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ عَطْفٌ عَلٰى اَنْ اٰمَنَّا الْمَعْنٰى مَا تُنْكِرُوْنَ اِلَّا اِيْمَانَنَا وَمُخَالَفَتَكُمْ فِىْ عَدَمِ قَبُوْلِهٖ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْفِسْقِ اللَّازِمِ عَنْهُ وَلَيْسَ هٰذَا مِمَّا يُنْكَرُ .

৫৯. ইহুদিরা একবার রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, কোন কোন নবীর উপর আপনি বিশ্বাস রাখেন। তখন তিনি.....بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ পূর্ণ এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এতে হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ এলে এরা বলল, আপনার এ ধর্ম অপেক্ষা মন্দ আর কোনো ধর্ম আছে কিনা? আমরা জানি না। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– বল হে কিতাবীগণ! আমরা আল্লাহতে ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে নবীগণের প্রতি [অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, এটা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও।] অন্য কোনো কারণে তোমরা আমাদেরকে অস্বীকার করছ না। এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।........اِنَّ اَكْثَرَكُمْ পূর্বোল্লিখিত اٰمَنَّا -এর সাথে এর عَطْفٌ হয়েছে। আয়াতটির মর্ম হলো, তোমরা আমাদের ঈমান গ্রহণকেই অস্বীকার করছে। ঈমান গ্রহণ না করার মাধ্যমে তোমাদের এ বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো এ ফিসক। অর্থাৎ এ বিরুদ্ধাচরণই 'ফিসক' নামে অভিহিত অথচ ঈমান আনয়ন এমন বিষয় নয় যা অস্বীকার করা যায়।

٦٠. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ أُخْبِرُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ أَهْلِ ذٰلِكَ الَّذِي تَنْقِمُونَهُ مَثُوبَةً ثَوَابًا بِمَعْنَى جَزَاءً عِنْدَ اللّٰهِ ط هُوَ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ أَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ بِالْمَسْخِ وَ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ ط الشَّيْطَانَ بِطَاعَتِهِ وَرَاعٰى فِيْ مِنْهُمْ مَعْنٰى مَنْ وَفِيْمَا قَبْلَهُ لَفْظَهَا وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ بَاءِ عَبُدَ وَاِضَافَتِهِ اِلٰى مَا بَعْدَهُ اِسْمُ جَمْعٍ لِعَبْدٍ وَنَصْبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْقِرَدَةِ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا تَمْيِيْزٌ لِاَنَّ مَاْوٰهُمُ النَّارُ وَاَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَاَصْلُ السَّوَاءِ الْوَسَطُ وَذِكْرُ شَرٍّ وَاَضَلُّ فِيْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِمْ لَا نَعْلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمْ .

৬০. বল, আমি কি তোমাদেরকে এটা অর্থাৎ যার প্রতি তোমরা বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন তার অপেক্ষা, আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট পরিণামের নিকৃষ্ট প্রতিদানের অধিকারীর সংবাদ দিব? খবর বলব? সে হলো যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, অর্থাৎ স্বীয় রহমত হতে বিতাড়িত করেছেন, যার উপরে তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছে, যাদের কিছু সংখ্যককে তিনি বিকৃত করে বানর ও কিছু সংখ্যককে শূকর করেছেন এবং যারা তাগুতের অর্থাৎ শয়তানের আনুগত্য প্রদর্শন করে ও তার উপাসনা করে। مِنْهُمْ -এর সর্বনাম هُمْ -টিতে مَنْ-এর মর্মের ও পূর্ববর্তী শব্দসমূহে مَنْ-এর শাব্দিক আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। عَبَدَ এটা অপর এক কেরাতে عَبُدَ -এর اِسْمُ جَمْعٍ হিসেবে ب -এ পেশ ও পরবর্তী শব্দ [اَلطَّاغُوْتَ] -এর প্রতি اِضَافَتْ সম্বন্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পূর্বোল্লিখিত قِرَدَةً -এর সাথে عَطْف বা مَنْصُوْب..... [যবরযুক্ত] ব্যবহৃত হয়েছে। [তারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট] مَكَانًا এটা تَمْيِيْز বা স্বাতন্ত্র্যবোধক পদ। কারণ জাহান্নাম হলো এদের আবাসস্থল এবং সরল পথ হতে সত্য পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত। এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। سَوَاءَ : এর মূলত অর্থ হলো মাঝামাঝি। এ আয়াতে তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট আর কোনো ধর্মের কথা আমরা জানি না; ইহুদিদের এ উক্তির মোকাবিলায় شَرٌّ [অধিক নিকৃষ্ট] ও اَضَلُّ [অধিক সত্যপথ বিচ্যুত] এ শব্দ দু'টির উল্লেখ করা হয়েছে।

٦١. وَاِذَا جَآءُوْكُمْ اَيْ مُنَافِقُوا الْيَهُوْدِ قَالُوْآ اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْآ اِلَيْكُمْ مُتَلَبِّسِيْنَ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكُمْ مُتَلَبِّسِيْنَ بِهٖ ط وَلَمْ يُؤْمِنُوْا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ مِنَ النِّفَاقِ .

৬১. তারা অর্থাৎ ইহুদি মুনাফিকরা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তারা তোমাদের নিকট অবিশ্বাসসহ আসে এবং তোমাদের নিকট হতে ওটা নিয়েই বের হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমান গ্রহণ করে না। তারা যা অর্থাৎ যে মুনাফেকী গোপন করে আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। بِالْكُفْرِ এটা এখানে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। بِهٖ এটা এখানে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٦٢. وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ اَيِ الْيَهُوْدِ يُسَارِعُوْنَ يَقَعُوْنَ سَرِيْعًا فِي الْاِثْمِ الْكَذِبِ وَالْعُدْوَانِ الظُّلْمِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط الْحَرَامَ كَالرُّشٰى لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَمَلُهُمْ هٰذَا .

৬২. তাদের অর্থাৎ ইহুদিদের অনেককেই তুমি পাপে অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণে সীমালঙ্ঘনে জুলুমে ও অবৈধ ভক্ষণে হারাম দ্রব্য ভক্ষণে যেমন ঘুষ ইত্যাদিতে তৎপর দেখবে, দ্রুত গিয়ে নিপতিত হতে দেখবে। তারা যা করে তা অর্থাৎ তাদের এ কর্ম কত নিকৃষ্ট!

٦٣. لَوْلَا هَلَّا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ مِنْهُمْ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ الْكَذِبَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ تَرْكَ نَهْيِهِمْ.

৬৩. তাদের রাব্বানীগণ ও ফকীহগণ কেন তাদেরকে পাপকথা অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা অর্থাৎ তাদের এ নিষেধ কার্য পরিহার করা কত নিকৃষ্ট। لَوْلَا এটা حَرْفُ تَنْبِيْه অর্থাৎ সতর্ককারী শব্দ هَلَّا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٤. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَمَّا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا اَكْثَرَ النَّاسِ مَالًا يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط مَقْبُوْضَةٌ عَنْ اِدْرَارِ الرِّزْقِ عَلَيْنَا كَنَوْا بِهِ عَنِ الْبُخْلِ تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى غُلَّتْ اُمْسِكَتْ اَيْدِيْهِمْ عَنْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتٰنِ مُبَالَغَةٌ فِى الْوَصْفِ بِالْجُوْدِ وَثُنِّىَ الْيَدُ لِاِفَادَةِ الْكَثْرَةِ اِذْ غَايَةُ مَا يَبْذُلُهُ السَّخِيُّ مِنْ مَالِهٖ اَنْ يُعْطِىَ بِيَدَيْهِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط مِنْ تَوْسِيْعٍ وَتَضْيِيْقٍ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ط لِكُفْرِهِمْ بِهٖ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تُخَالِفُ الْاُخْرٰى كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَىْ لِحَرْبِ النَّبِىِّ ﷺ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ لا اَىْ كُلَّمَا اَرَادُوْهُ رَدَّهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ط اَىْ مُفْسِدِيْنَ بِالْمَعَاصِىْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ يُعَاقِبُهُمْ.

৬৪. মদীনার ইহুদিরা ছিল ধনী সম্প্রদায়। কিন্তু রাসূল ﷺ -কে অস্বীকার করার কারণে তারা অভাব ও কষ্টে নিপতিত হয়ে তখন তারা নিম্নের উক্তিটি করেছিল। ইহুদিরা বলে, আল্লাহ বদ্ধহস্ত। তিনি আমাদেরকে প্রচুর জীবিকা প্রদান করা হতে হাত গুটিয়ে রেখেছেন। এ বাক্যটি দ্বারা তারা কৃপণতার দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছে। অথচ আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন [তাদের হাতই বদ্ধ] অর্থাৎ ভালো কাজ করা হতে অবরুদ্ধ। এ বাক্যটি তাদের প্রতি বদ দোয়া স্বরূপ। এবং তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত। না, বরং আল্লাহর উভয় হাতই যুক্ত। يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ আল্লাহ অতি দানশীল, বদান্যতার গুণ আল্লাহ তা'আলার মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে এ ধরনের বাগভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণের আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য এখানে يَدْ শব্দটিকে تَثْنِيَةٌ বা দ্বি-বচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, দাতা হিসেবে যে মহান সে যখন প্রদান করে দুই হাত পূর্ণ করেই দেয়। যেভাবে তার ইচ্ছা তিনি দান করেন। কারো জন্য প্রশস্ততা বিধান আবার কারো জন্য সংকীর্ণ করা। সুতরাং তাঁর উপর কোনো অভিযোগ হতে পারে না। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ আল-কুরআন তা অস্বীকার করায় তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই; তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছে। ফলে তাদের প্রতিটি দল অপর দলের সাথে মতবিরোধ করে থাকে। যতবার তারা যুদ্ধের অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন। অর্থাৎ যতবারই তারা যুদ্ধ লাগানোর প্রয়াস পায় ততবারই তিনি এদেরকে প্রতিহত করেন। আর তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়। পাপকর্ম করে তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

٦٥. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا بِمُحَمَّدٍ وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ .

৬৫. কিতাবীগণ যদি মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করত এবং কুফর হতে বেঁচে থাকত তাহলে তাদের পাপ মোচন করতাম এবং তাদেরকে সুখ-জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

٦٦. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِمَا وَمِنْهُ الْاِيْمَانُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنَ الْكِتٰبِ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط بِاَنْ يُّوَسِّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ وَيُفِيْضَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْهُمْ اُمَّةٌ جَمَاعَةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط تَعْمَلُ بِهٖ وَهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ بِئْسَ مَا يَعْمَلُوْنَ .

৬৬. তারা যদি তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুসারে কাজ করত ও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতো মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপনও এর অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে যা অর্থাৎ যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যদি সুদৃঢ় থাকতো তাহলে তারা উপর নীচ সবদিক হতে খাদ্য লাভ করতো। অর্থাৎ তাদের রিজিক প্রশস্ত করে দেওয়া হতো এবং সবদিক হতে প্রাচুর্যের ঢল বইয়ে দেওয়া হতো। তাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় একদল এমন যারা মধ্যপন্থী; অর্থাৎ এরা তা অনুসারে কাজ করে। তারা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ। তারা রাসুল ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট ও কত মন্দ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تَتَّخِذُوْا : لَا تَتَّخِذُوْا فِعْلُ مُضَارِعٍ مَجْزُوْمٌ بِلَا তার সাথে যমীর হলো فَاعِلْ আর اَلَّذِيْ হলো ইসমে মাউসূল। فেয়েল এবং ফায়েল। دِيْنَكُمْ হলো মাফউলে বিহী। هُزُوًا হলো مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ এবং لَعِبًا হলো মাতুফ। مَعْطُوفْ এবং مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ মিলে দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে صِلَةٌ হয়েছে صِلَةٌ এবং مَوْصُوْلَةٌ মিলে لَا تَتَّخِذُوْا ফে'লের প্রথম মাফউল। اَوْلِيَاءَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। لَا تَتَّخِذُوْا ফে'লের, ফায়েল ও মাফউল মিলে جَوَابُ نِدَا হয়েছে। اِذَا তার مُنَادٰى এবং جَوَابُ نِدَا মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়ে قُلْ উহ্য ফে'লের مَقُوْلَةٌ

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا بِهٖ : অর্থাৎ هُزُوًا মাসদার হয়ে مَفْعُوْلٌ -এর অর্থে।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ : جَرٌّ হবে اَلَّذِيْنَ -এর সাথে عَطْفٌ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ النَّصْبُ : আর নসব হবে اَلَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا -এর সাথে عَطْفٌ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ وَاِذَا الَّذِيْنَ نَادَيْتُمْ الخ : পূর্ববর্তী বাক্যটির উপর এর عَطْفٌ হয়েছে তা বুঝানোর জন্য তাফসীরে وَاو -এর পর اَلَّذِيْنَ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُمْ : এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

قَوْلُهُ تَنْقِمُوْنَ : তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কর, দুশমনি রাখ, দোষ অন্বেষণ কর, সমালোচনা কর। نَقْمٌ থেকে নির্গত مُضَارِعٌ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ -এর সীগাহ্‌।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى مَا تُنْكِرُوْنَ اِلَّا اِيْمَانَنَا : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, هَلْ تَنْقِمُوْنَ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامٌ -টি হলো اِنْكَارِىْ বা অস্বীকৃতি প্রকাশক।

قَوْلُهُ ثَوَابًا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَثُوْبَةً শব্দটি مَصْدَرٌ مِيْمِىْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; ظَرْف হিসেবে নয়।

قَوْلُهُ وَذِكْرُ شَرٍّ وَ اَضَلُّ فِىْ مُقَابَلَةِ الخ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। **প্রশ্ন.** شَرٌّ এবং اَضَلُّ শব্দদ্বয় ইসমে তাফযীলের সীগাহ। যার জন্য مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ -এর প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত আয়াতে ইহুদিরা হলো مُفَضَّلٌ এবং মুসলমানগণ হলো مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ আর مُفَضَّلٌ এবং مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ মূলগুণে (نَفْس وَصْف) শরিক থাকে। সুতরাং ইহুদি এবং মুসলমানগণ نَفْس شَرَارَتْ এবং ضَلَالَتْ -এর ক্ষেত্রে শরিক হবে। যদিও ইহুদিরা মুসলমানের চেয়ে অগ্রগামী হবে। অথচ এটা বাস্তবতা পরিপন্থি।

উত্তর : এখানে شَرَارَتْ এবং ضَلَالَتْ ব্যবহার করা হয়েছে مُقَابَلَة এবং مُشَاكَلَة হিসেবে। কেনন ইহুদিরা বলেছিল– لَا نَعْلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمْ পবিত্র কুরআনে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন جَزَآءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মাঝে জুলুমের جَزَآء -কে مُشَاكَلَة হিসেবে سَيِّئَة বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় জবাব : কখনো اِسْمُ تَفْضِيْل নফসে যিয়াদতী বর্ণনা করার জন্যও আসে।

مُقْتَصِدٌ : সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا : ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করতো : পূর্বের আয়াতগুলোতে মুসলিমগণকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ বাকভঙ্গিতে সে নিষেধাজ্ঞাকেই জোরদার করা হয়েছে এবং সে বন্ধুত্বের প্রতি ঘৃণা জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে তার নিজ দীন অপেক্ষা সম্মানী ও মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না। তাই তাকে বলা হয়েছে, ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকরা তোমাদের দীন নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করে। তাদের মধ্যে যারা চুপচাপ, তারাও এসব অপকার্য দেখে নিন্দা প্রকাশ করে না; বরং খুশি হয়। কাফেরদের এসব বালখিল্যসুলভ ও ন্যাক্কারজনক তৎপরতার কথা জেনেও কোনো একজন মুসলিম, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র আল্লাহভীতি ও নামমাত্র ঈমানী চেতনা আছে, তাদের সাথে এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে এবং বন্ধুত্বসুলভ আচার-আচরণ বজায় রাখতে প্রস্তুত থাকতে পারে কি? তাদের কুফর ও হঠকারিতা এবং ইসলাম বিদ্বেষের বিষয়টি যদি বাদও রাখা যায়, তবুও সরল সঠিক দীনের সাথে তাদের ঠাট্টা উপহাস তাদের সাথে সম্পর্ক পরিহারের একটি বড় কারণ হতে পারে, আর এতদসঙ্গে অন্যান্য কারণ তো রয়েছেই।

আজান নিয়েও ছিল ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের গাত্রদাহ : তোমরা আজান দিলে তাদের গাত্রদাহ হয় এবং তারা ঠাট্টা-মশকারা শুরু করে দেয়। এটা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আজানের শব্দাবলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ, তাওহীদের ঘোষণা, নবী করীম ﷺ -এর রিসালতের সাক্ষ্য, যিনি সাবেক সকল নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, সর্বপ্রকার ইবাদতের সমন্বিতরূপ যেই সালাত এবং যা চূড়ান্ত পর্যায়ের বন্দেগীর নিদর্শন, তার প্রতি আহ্বান এবং দোজাহানের সাফল্য ও পরম কামিয়াবী অর্জনের বলিষ্ঠ ডাক। এর মধ্যে এমন কি আছে, যা হাসি-ঠাট্টার উপযুক্ত? এরূপ পুণ্য ও সত্য-ন্যায়ের আওয়াজকে উপহাস করা কেবল তারই কাজ হতে পারে, যার মস্তিষ্ক বুদ্ধি-বিবেক হতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য এবং ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার মতো জ্ঞান যার বিলকুল নেই। রেওয়ায়েতে আছে মদীনায় জনৈক খ্রিস্টান ছিল, সে যখন আজানের 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি শুনত, তখন বলত قَدْ حُرِّقَ الْكَاذِبُ। মিথ্যুক জ্বলে গেল বা জ্বলে যাক। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে তার নিজের অবস্থার সঙ্গে উক্তিটি বেজায় সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কেননা সে দুর্মুখ ছিল মিথ্যুক। ইসলামের ক্রমবিস্তার দেখে সে প্রতিনিয়ত দগ্ধিভূত হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন একটি মেয়ে আগুন নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। সে সপরিবারে ঘুমে অচেতন ছিল। মেয়েটির হাত থেকে তার অগোচরে ক্ষণিক অঙ্গার পড়ে যায় এবং তাতেই লোকজনসহ গোটা ঘর জ্বলে ভস্ম হয় যায়। এভাবে আল্লাহ [illegible]

মিথ্যাবাদী কিভাবে দোজখের আগুনের পূর্বে এ দুনিয়ার আগুনেই দগ্ধ হয়। আজান নিয়ে উপহাস সম্পর্কে বিশুদ্ধ সূত্রে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ হুনাইন জয় করে ফিরেছিলেন। পথে হযরত বিলাল (রা.) আজান দেন। কয়েকটি কিশোর তা নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিল এবং আজানের শব্দগুলো সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবূ মাহযূরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে ডেকে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আবূ মাহযূরার অন্তরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মক্কার মুয়াযযিন নিযুক্ত করলেন। এভাবে মহান আল্লাহর কুদরতে নকল আমলে পরিণত হলো। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৩,১৭৪]

قَوْلُهُ يَآ اَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا : আজান নিয়ে বিদ্রূপকারীরা ছিল মূলত নির্বোধ ও নাফরমান : কোনো কাজের নিন্দা ও উপহাস দু'কারণে হতে পারে। হয়তো সে কাজটিই উপহাসযোগ্য অথবা কর্তা নিজে উপহাসের পাত্র। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, আজান এমন কোনো কাজ নয়, যার উপহাস কেবল তরল প্রকৃতির বা নির্বোধ শ্রেণির লোক ছাড়া আর কেউ করতে পারে। আর আয়াতে আজানদাতার মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্নের ঢংয়ে সচেতন করা হয়েছে যে, বিদ্রূপকারীরা, যারা ভাগ্যক্রমে আহলে কিতাব ও শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দাবি করে, সামান্য একটু চিন্তা করে ইনসাফের সাথে বলুক, মুসলিমগণের প্রতি তাদের এতো আক্রোশ কেন? তারা কি আমাদের এমন কোনো দোষ ত্রুটি দেখতে পায়, যা প্রকৃতই ঠাট্টাযোগ্য? অবশ্য এটা স্বতন্ত্র কথা যে, আমরা এক ও লা-শারীক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি, তাঁর অবতীর্ণ সমস্ত আসমানি কিতাব ও তাঁর পাঠানো সকল নবী-রাসূলের প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান রাখি। এর বিপরীতে ঠাট্টাকারীদের অবস্থা হলো, তারা না মহান আল্লাহর প্রকৃত ও খাঁটি তাওহীদের উপর কায়েম আছে, না সকল নবী-রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এবার তোমরাই ইনসাফের সাথে বল, যারা চরম পর্যায়ের নাফরমান, তারা মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সম্পর্কে টু শব্দটি করার এবং তাদের নিন্দা-উপহাস করার অধিকার তাদের কোথায় আছে? –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৫]

قَوْلُهُ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ : আজান নিয়ে ঠাট্টা-মশকারাকারীরাই নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা এবং যে কোনোকালে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, খাঁটি মনে তাতে বিশ্বাস রাখাই যদি তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলিমগণের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ ও বড় দোষ হয়ে থাকে, আর সে কারণেই তোমরা তাদেরকে নিন্দা উপহাসের পাত্র বানিয়ে থাক, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একদল লোকের সংবাদ জানাই, যারা নিজ অন্যায়-অনাচার ও অপবিত্রতার কারণে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও গজবের নিদর্শন অদ্যাবধি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। ধোঁকাবাজী, অশ্লীলতা ও লোভ-লালসার শাস্তি স্বরূপ তাদের মধ্যে অনেককে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়। আর যারা মহান আল্লাহর বন্দেগী পরিহার করে শয়তানের দাসত্ব অবলম্বন করেছে, ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে সেই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও পথহারা সম্প্রদায়ই প্রকৃত অর্থে তোমাদের গালমন্দ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপযুক্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, তোমরা নিজেরাই সেই লোক। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৬]

قَوْلُهُ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ নির্ভেজাল কপট ও বিধর্মী ব্যতীত কেউ ইসলাম ও আজান নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে না : উল্লিখিত বিদ্রূপকারীদের মধ্যে এখানে বিশেষ এক শ্রেণির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা পেছনে ইসলামের নিন্দা ও মুসলিমগণকে উপহাস করতো, কিন্তু নবী করীম ﷺ বা খাঁটি মুসলিমগণের সামনে এসে কপটভাবে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিত। অথচ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এক মুহূর্তেও ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। কারণ নবী করীম ﷺ -এর ওয়াজ-নসিহতও তাদের মাঝে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। তারা কি মুখে ইসলাম ও ঈমান শব্দ উচ্চারণ করে মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবে? যেই মহান আল্লাহ দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞাতা এবং মনের সকল গোপন কথা ও লুক্কায়িত রহস্য সম্পর্কে অবগত, তাঁর সম্পর্কে যদি তাদের এ ধারণা হয়ে থাকে যে, কেবল শাব্দিক ঈমান দ্বারাই তাঁকে খুশি করে নেবে, তবে এর চেয়ে বেশি আর কোন কাজ ঠাট্টাযোগ্য হতে পারে? এ আয়াত থেকে যেন ইহুদি-নাসারার সেই সব বিদ্রূপাত্মক কাজ-কর্মের বর্ণনা শুরু হলো, যেগুলো জ্ঞাত হওয়ার পর মুসলিমগণকে ব্যঙ্গ করার পরিবর্তে বরং তাদের নিজেদেরই নিজেদের ব্যঙ্গ করা উচিত। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এ বিষয়েরই অবশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৭]

قَوْلُهُ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ইহুদিদের চারিত্রিক বিপর্যয় : প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদিদের চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে। যদিও সাধারণভাবে ইহুদিদের অবস্থা তাই ছিল তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভালো লোকও ছিল। কুরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য كَثِيرًا [অনেক] শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণ إِثْم [পাপ] শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায়, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোনো কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনোরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদিদের কু-অভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে- يُسَارِعُوْنَ فِي الْإِثْمِ [তারা দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়]। সৎকর্মে পয়গাম্বর ও ওলীগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও কুরআন বলেছে। يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৬৫]

قَوْلُهُ لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ الخ : আলেম ও দরবেশ শ্রেণির গাফলতির কারণে জনগণ বিপদের সম্মুখীন হয়; আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের আম-জনসাধারণ পাপাচারে নিমজ্জিত হয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থাৎ দরবেশ ও আলেম শ্রেণি বোবা শয়তান বনে যায়, এ অবস্থাই হয়েছিল বনী ইসরাঈলের। সাধারণ লোক পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর বিধান ভুলে গিয়েছিল। মাশায়েখ ও আলেম নামে যারা পরিচিত ছিল তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ নিষেধ করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ পার্থিব লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি-পরবশতায় তারা আওয়ামকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাখলুকের ভয় বা দুনিয়ার লালসা তাদের হক কথা বলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ নীরব দর্শন ও ঢিলেমির কারণেই পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, তাই উম্মতে মুহাম্মাদিকে কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সতর্ক করা হেয়েছে যে, কোনো সময়ই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের এই গুরুদায়িত্ব আদায়ে যেন গাফলতি না হয়, তা যে কোনো ব্যক্তিরই বিরুদ্ধে যাক না কেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৯]

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ الخ মহান আল্লাহ সম্পর্কে আহলে কিতাবের ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তি এবং এর পরিণতি : নবী কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবকালে অন্যায়-অনাচার, কুফর, অবাধ্যতা, ব্যভিচার, অবৈধাহার ইত্যাদি দুষ্কৃতির আবিলতায় আহলে কিতাবের অন্তর এতটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে ধৃষ্টতা প্রদর্শনেও তারা দ্বিধা করতো না। তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা একজন মামুলী মানুষের স্তরে নেমে এসেছিল। তাঁর শানে তারা অবলীলায় এমন সব উক্তি আরোপ করত, যা শুনলে যে কারও শরীর শিউরে উঠবে। কখনো বলত- إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ অভাবগ্রস্ত, আমরা অভাবমুক্ত। কখনো তাদের মুখ থেকে বের হতো- يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর হাত রুদ্ধ। এরও অর্থ ওটাই যে إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ দ্বারা তারা যা বোঝাতো, অর্থাৎ আল্লাহ পাক অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর ভাণ্ডারে আর কিছু নেই [না'উযুবিল্লাহ], অথবা غُلَّ يَدُ দ্বারা কার্পণ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ অভাবী তো নন, তবে আজকাল ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে গেছেন। -[না'উযুবিল্লাহ]

যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, এ কুফরি বাক্যের উদ্দেশ্য, কুফর ও অবাধ্যতার শাস্তিতে আল্লাহ তা'আলা যখন এ অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ ও অভাব-অভিযোগ চাপিয়ে দিলেন, তখন যেখানে তাদের উচিত ছিল নিজেদের অন্যায়-অনাচার উপলব্ধি করা ও সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া, সেখানে তারা উল্টা আল্লাহ তা'আলার শানে গোস্তাখী শুরু করে দিল। তাদের মনে এ ধারণা জেগে থাকবে যে, আমরা নবীগণের বংশধর, বরং মহান আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলাম। আর এখন এ কি শুরু

হয়ে গেল, পৃথিবীতে ইসমাঈলের বংশধরগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এ দিকে বিশ্ববিজয়, ওদিকে আসমানি বরকতধারা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ইসরাঈলের বংশধর। আল্লাহ পাক ছিল আমাদের; আর আমরা তাঁর। আজ আমরা লাঞ্ছিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা তো আজও সেই ইসরাঈলের বংশধর এবং তাঁর সন্তান ও প্রিয়পাত্রই আছি, যেমন আগে ছিলাম। তথাপি কেন এ অবস্থা? সম্ভবত আমরা যে মহান আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন [না'উযুবিল্লাহ] তাঁর ভাণ্ডারে অভাব দেখা দিয়েছে কিংবা তিনি ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে গেছেন। নির্বোধেরা এতটুকু বুঝল না যে, মহান আল্লাহর ভাণ্ডার অসীম-অফুরান। তাঁর গুণাবলি অপরিবর্তনীয় ও অপরিসীম। যদি [নাউযুবিল্লাহ] তাঁর ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যেত কিংবা সৃষ্টির প্রতিপালন ও কল্যাণ সাধন হতে তিনি হাত গুটিয়ে নিতেন, তাহলে নিখিল বিশ্বের চিরায়ত নিয়ম-শৃঙ্খলা কী করে প্রতিষ্ঠিত থাকত? আখেরী নবী ও তাঁর সঙ্গি-সাথীদের যে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উত্থান তোমরা চাক্ষুষ দেখছ, তখন এটা কার হাতের অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হতো? অতএব, তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁর হাত রুদ্ধ হয়নি। অবশ্য ধৃষ্টতা ও অপকর্মের অশুভ পরিণামে আল্লাহ তা'আলার যে লা'নত ও অভিশাপ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর সুপ্রশস্ত জমিনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। ভবিষ্যতে তা আরো বেশি সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। নিজেদের দুরবস্থাকে মহান মহান আল্লাহর দুর্দিনের ফল বলে বিবেচনা করা তোমাদের চরম অপোগণ্ডতা। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা -১৮০]

মহান আল্লাহর সত্তা তাঁর শানের মুতাবিক : আল্লাহ তা'আলার জন্য যেখানে হাত, পা, চোখ ইত্যাদি শব্দাবলি আরোপ করা হয়েছে, তাদ্বারা ভুলেও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, [না'উযুবিল্লাহ] তিনি মানুষের মতো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সত্তা, অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান ইত্যাদি যেমন কোনো দৃষ্টান্ত, তুলনা ও স্বরূপ সম্পর্কে যেমন এর বেশি কিছুই বলা যায় না। জনৈক কবি বলেছেন–

اے برتر از خیال وقیاس وگماں ووهم * وزهر چه گفته اند شنیدیم وخوانده ایم

منزل تمام گشت وبیایاں رسید عمر * ما همچناں در اول وصف تو مانده یم

অর্থাৎ "হে ঐ সত্তা, যিনি ধারণা, অনুমান, কল্পনা ও অনুভূতির ঊর্ধ্বে। যে যা কিছু বলেছে, যা শুনেছি ও পড়েছি সব কিছুরই ঊর্ধ্বে। সফরের মঞ্জিল শেষ হয়ে গেল, জীবন পৌঁছে গেছে অন্তিম, আমরা তোমার প্রথম গুণেই রয়ে গেছি এখনও স্বপ্নচারী।"

আলোচ্য শব্দ ও বিশেষণগুলোকেও অনুরূপ মনে করতে হবে। সারকথা আল্লাহ তা'আলার সত্তা যেমন নিরুপম, তেমনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন, হাত ইত্যাদি গুণাবলির অর্থও তাঁর মহান সত্তা ও শানের মুতাবিক এবং আমাদের ধারণা ও ক্ষমতা-বলয় এবং বর্ণনা শক্তির আয়ত্ত বহির্ভূত। ইরশাদ হচ্ছে- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ অর্থাৎ তাঁর মত নেই কোনো বস্তু, তিনি শ্রবণকারী, দ্রষ্টা। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'হাতের অর্থ করেছেন দক্ষিণা ও দণ্ডের হাত। অর্থাৎ আজকাল মহান আল্লাহর দক্ষিণার হাত উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এবং দণ্ডের হাত বনী ইসরাঈলের উপর উন্মুক্ত, যেমন সম্মুখের আয়াতসমূহের ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১২৮]

قَوْلُهُ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ : পার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণ পরীক্ষা এবং অবকাশ : কখনো কারো প্রতি, কি পরিমাণ ব্যয় করা দরকার তা তিনিই ভালো জানেন। তিনি কখনো অনুগত বান্দাকে পরীক্ষা বা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে অভাব-অনটনেও ফেলেন, কখনো আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ পরকালীন নিয়ামতের আগে পার্থিব কল্যাণের দুয়ারও খুলে দেন। এর বিপরীতে একজন অপরাধী পাপিষ্টের উপর অনেক সময় আখিরাতের শাস্তির পূর্বে পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ নিপতিত করা হয়, আবার কখনো প্রাচুর্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে অতিরিক্ত অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে সে মহান আল্লাহর উপর্যুপরি অনুগ্রহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজ অন্যায়-অপরাধের উপর কিছুটা অনুতপ্ত হয় অথবা নিজ দুর্ভাগ্যের পাল্লা ভালো রকমে বোঝাই করে চরম শাস্তির উপযুক্ত হয়। এই বিভিন্ন রকমের অবস্থা ও উদ্দেশ্যে এবং রকমারি রহস্যের বর্তমানে কে সমাদৃত আর কে বিতাড়িত? সে ফয়সালা আল্লাহ কর্তৃক অবহিতকরণ কিংবা বাইরের অবস্থা ও লক্ষণের ভিত্তিতে সাধিত হতে পারে। যেমন- এ চোরের হাত কাটা হলো, আবার ডাক্তার এক রোগীর হাত কেটে দিল। আমরা বাইরের লক্ষণ ও অবস্থা দেখে উভয়ের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, একজনের হাত কাটা হয়েছে শাস্তি স্বরূপ এবং অন্যজনের চিকিৎসা ও অনুকম্পা স্বরূপ। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৮৩]

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ الخ : আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরোপুরি পালন করার উপায় : ولو انهم اقاموا التوراة الخ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও আল্লাহভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদিরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عَمَلٌ তথা পালন করার পরিবর্তে اِقَامَتْ তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোনো রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকে। যেমন কোনো স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনো দিকে ঝুঁকে থাকবে না; বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদিরা আজও তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন পাকের নির্দেশাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে ত্রুটিপূর্ণ এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্মরূপে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে উপর নিচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিজিক বর্ষিত হবে। উপর নিচের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিজিকপ্রাপ্ত হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ইহুদিদের কুকর্ম এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলির পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসারপ্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কুরআনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকাশ্য নির্দেশাবলি দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করেছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্য এ ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদও আরাম আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরো বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথাও জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদির জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হতো। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভ করেছে। যেমন- আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে সেই ইহকালে অবশ্যম্ভাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ এখানে কোনো সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে। তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অটনের আকারেও। পয়গাম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ ধন-দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদিদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদির অবস্থা নয়; বরং مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছেন। তবে তাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিকারী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান ছিল, এরপর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৭৩, ১৭৪]

٦٧. يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ جَمِيْعَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَلَا تَكْتُمْ شَيْئًا مِنْهُ خَوْفًا اَنْ تُنَالَ بِمَكْرُوْهٍ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ اَىْ لَمْ تَبْلُغْ جَمِيْعَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ لِاَنَّ كِتْمَانَ بَعْضِهَا كَكِتْمَانِ كُلِّهَا وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اَنْ يَّقْتُلُوْكَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحْرَسُ حَتّٰى نَزَلَتْ فَقَالَ انْصَرِفُوْا عَنِّىْ فَقَدْ عَصَمَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَوَاهُ الْحَاكِمُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

অনুবাদ :

৬৭. হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার যাবতীয় সবকিছু প্রচার কর। বিপদ ঘটবে- এ আশঙ্কায় কোনো কিছু গোপন করবে না। যদি না কর অর্থাৎ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার যাবতীয় সকল কিছু যদি প্রচার না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না। কারণ কতক অংশ গোপন করার অর্থ হলো সবটাই গোপন করা। মানুষ তোমাকে হত্যা করে ফেলবে তা হতে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। হাকিম বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ -কে পাহারা দেওয়া হতো। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। رِسَالَةٌ : শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٦٨. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ الدِّيْنِ مُعْتَدٍّ بِهٖ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ط بِاَنْ تَعْمَلُوْا بِمَا فِيْهِ وَمِنْهُ الْاِيْمَانُ بِىْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج لِكُفْرِهِمْ بِهٖ فَلَا تَاْسَ تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِكَ اَىْ لَا تَهْتَمَّ بِهِمْ .

৬৮. বল, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইঞ্জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত অর্থাৎ এতদনুসারে কাজ না করা পর্যন্ত; আর এটার মধ্যে আমার প্রতি ঈমান আনয়নও অন্তর্ভুক্ত। তোমরা কিছুর উপরই নও। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কোনো ধর্মের উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত নও। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা অস্বীকার করার কারণে তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই। সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য অর্থাৎ তারা ঈমান আনয়ন না করলে তাদের জন্য দুঃখ করো না, বিষণ্ন হয়ো না। এদের জন্য তুমি চিন্তিত হয়ো না।

٦٩. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا هُمُ الْيَهُوْدُ مُبْتَدَأٌ وَالصّٰبِئُوْنَ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ وَالنَّصٰرٰى وَيُبْدَلُ مِنَ الْمُبْتَدَأِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَدَالٌّ عَلٰى خَبَرِ اِنَّ .

৬৯. বিশ্বাসীগণ, ইহুদিগণ, সাবিয়ী ইহুদিদের একটি গোত্র ও খ্রিস্টানগণ তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে আখিরাতে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। اَلَّذِيْنَ هَادُوْا الخ : এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। مَنْ اٰمَنَ الخ ; এটা উক্ত مُبْتَدَأٌ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। فَلَاخَوْفٌ الخ : এটা উক্ত مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ বা বিধেয় এবং اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর اِنَّ -এর خَبَرٌ বা বিধেয়ের উপর ইঙ্গিতবহ।

٧٠. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ط كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ مِنَ الْحَقِّ كَذَّبُوْهُ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا مِنْهُمْ يَقْتُلُوْنَ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَالتَّعْبِيْرُ بِهٖ دُوْنَ قَتَلُوْا حِكَايَةً لِلْحَالِ الْمَاضِيَةِ لِلْفَاصِلَةِ.

৭০. বনী ইসরাঈলের নিকট হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের মধ্য হতে কোনো রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু সত্য নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত হয়নি তখন তারা তা অস্বীকার করেছে। তাদের কতজনকে তো মিথ্যাবাদী বলে আর তাদের কতজনকে হত্যা করে যেমন হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করে। আয়াতসমূহের **অন্তমিল** রক্ষা এবং অতীতে সংঘটিত ঘটনাটির **ঘটমান চিত্র** ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এখানে قَتَلُوْا [অতীতকালব্যঞ্জক শব্দ] -এর স্থলে يَقْتُلُوْنَ [বর্তমানকাল] ব্যবহার করা হয়েছে।

٧١. وَحَسِبُوْا ظَنُّوْا اَلَّا تَكُوْنَ بِالرَّفْعِ فَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَالنَّصْبِ فَهِيَ نَاصِبَةٌ اَيْ تَقَعُ فِتْنَةٌ عَذَابٌ بِهِمْ عَلٰى تَكْذِيْبِ الرُّسُلِ وَقَتْلِهِمْ فَعَمُوْا عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يُبْصِرُوْهُ وَصَمُّوْا عَنْ اِسْتِمَاعِهٖ ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَابُوْا ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا ثَانِيًا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ط بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيْرِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ.

৭১. তারা মনে করেছিল কোনো বিপদ হবে না; অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার ও তাদেরকে হত্যার দরুন তাদের উপর কোনো আজাব হবে না বলে তারা ভেবেছিল। ফলে তারা সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা আর দেখতে পায়নি এবং তা শ্রবণ করা হতে বধির হয়ে পড়েছিল। অতঃপর তারা যখন অনুতপ্ত হলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় বারের জন্য **তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল।** তারা যা করে আল্লাহ তা অবলোকন করেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিবেন। اَلَّا تَكُوْنَ : এটা رَفْعٌ [পেশ] সহযোগে হলে اَنْ শব্দটি مُثَقَّلَةٌ [তাশদীদসহ রূঢ় রূপ] হতে مُخَفَّفَةٌ [তাশদীদহীন লঘুরূপে] রূপান্তরিত বলে বিবেচ্য হবে। আর তা نَصَبٌ [যবর] সহযোগে পঠিত হলে اَنْ -টি نَاصِبَةٌ [নসব দানকারী اَنْ] বলে বিবেচ্য হবে। كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ : এটা عَمُوْا وَ صَمُّوْا -স্থিত ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনাম [هُمْ] -এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ।

٧٢. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط سَبَقَ مِثْلُهٗ وَقَالَ لَهُمُ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ط فَاِنِّيْ عَبْدٌ وَلَسْتُ بِاِلٰهٍ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فِى الْعِبَادَةِ غَيْرَهٗ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مَنَعَهٗ اَنْ يَّدْخُلَهَا وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ زَائِدَةٌ اَنْصَارٍ يَمْنَعُوْنَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

৭২. যারা বলে, আল্লাহই মারইয়াম তনয় মসীহ তারা নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে। এরূপ আয়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অথচ মসীহ এদেরকে বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহরই ইবাদত কর। কেননা, আমি ইলাহ নই; একজন দাস মাত্র। কেউ ইবাদত ইত্যাদিতে আল্লাহর শরিক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। অর্থাৎ তার জন্য তাতে প্রবেশ রুদ্ধ করে দিবেন। তার আবাস হলো জাহান্নাম; সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। যে আল্লাহর আজাব হতে তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে। مِنْ اَنْصَارٍ : এতে مِنْ -টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٧٣. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ اٰلِهَةٍ ثَلٰثَةٍ ـ اَىْ اَحَدُهَا وَالْاٰخَرَانِ عِيْسٰى وَاُمُّهٗ وَهُمْ فِرْقَةٌ مِنَ النَّصَارٰى وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ مِنَ التَّثْلِيْثِ وَلَمْ يُوَحِّدُوْا لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىْ ثَبَتُوْا عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ وَهُوَ النَّارُ ـ

৭৩. যারা বলে আল্লাহ তো তিন ইলাহর তৃতীয় ইলাহ। অর্থাৎ তিনি এদের একজন। বাকি দু'জন হচ্ছেন ঈসা ও তাঁর মাতা। এরা হলো খ্রিস্টানদের অন্যতম একটি সম্প্রদায়। তারা তো কুফরি করেছেই। যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ হতে নিবৃত্ত হয়ে একত্ববাদের অনুসারী না হলে তাদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ তাতে কায়েম হয়ে রয়েছে তাদের উপর মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামাগ্নির শাস্তি আপতিত হবেই।

٧٤. اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ط مِمَّا قَالُوْهُ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِمَنْ تَابَ رَحِيْمٌ بِهٖ ـ

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তারা যা বলে তা হতে তাঁর নিকট ক্ষমা করবে না? আল্লাহ তো যারা তওবা করে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

٧٥. مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ط قَدْ خَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط فَهُوَ يَمْضِىْ مِثْلُهُمْ وَلَيْسَ بِاِلٰهٍ كَمَا زَعَمُوْا وَاِلَّا لَمَا مَضٰى وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ط مُبَالَغَةٌ فِى الصِّدْقِ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ط كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْبَشَرِ وَمَنْ كَانَ كَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا لِتَرْكِيْبِهٖ وَضُعْفِهٖ وَمَا يَنْشَأُ مِنْهُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ اُنْظُرْ مُتَعَجِّبًا كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى كَيْفَ يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ ـ

৭৫. মারইয়াম-তনয় মসীহ তো একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন, অতীত হয়েছেন। তাদের মতো তিনিও একদিন গত হয়ে যাবেন। তাদের ধারণা সত্য নয়, তিনি ইলাহ নন। যদি ইলাহ হতেন তবে নিশ্চয় গত হতেন না। আর তার মাতা সত্যনিষ্ঠা রমণী, সত্যবাদিতার চরমে অধিষ্ঠিতা মহিলা ছিল। অন্যান্য মানুষের মতো তারা উভয়েও আহার করত আর যে এধরনের হবে সে যৌগিকতা, মানবিক দুর্বলতা ও মল-মূত্রাদির মতো অশুচিতা নির্গমনের দরুন ইলাহ হতে পারে না। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য কর, তাদের জন্য আমার একত্ববাদ সম্পর্কে আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। দেখ, তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও কিভাবে সত্য হতে বিমুখ হয়ে, মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। اَنّٰى : এটা এখানে كَيْفَ কিভাবে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٦. قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ط وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِكُمْ الْعَلِيْمُ بِاَحْوَالِكُمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ ـ

৭৬. বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা যার নেই? আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা অতি শুনেন এবং তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অতি অবহিত। دُوْنِ اللّٰهِ : অর্থ আল্লাহ ব্যতীত। اَتَعْبُدُوْنَ : এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি এখানে اِنْكَار অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِاَنَّ كِتْمَانَ بَعْضِهَا كَكِتْمَانِ كُلِّهَا : এটি رِسَالَاتْ শব্দকে বহুবচন ব্যবহারের ইল্লত। অর্থাৎ রিসালতের কিয়দাংশ অস্বীকার গোটাটাকে অস্বীকারের নামান্তর।

قَوْلُهُ اَنْ يَقْتُلُوْا : এ জুমলাটি উহ্য ধরার উদ্দেশ্য হলো একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাব প্রদান করা। **প্রশ্ন :** আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -এর মর্ম তো হলো আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে মানুষের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখাবেন। অথচ মানুষের পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ **অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন।** যেমন গাযওয়ায়ে উহুদে তাঁর চেহারা মুবারক আহত হওয়া, তাঁর সম্মুখভাগের দাঁত মুবারক ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি।

উত্তর : আয়াতে বর্ণিত হেফাজত দ্বারা উদ্দেশ্য কতল বা হত্যা করা থেকে সুরক্ষিত রাখা। **সাধারণ হেফাজত** উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এখন কোনো প্রশ্ন থাকল না।

قَوْلُهُ مِنَ الدِّيْنِ مُعْتَدِيْهِ : এটি একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাব। **প্রশ্ন : ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের** ব্যাপারে এটা বলা শুদ্ধ নয় যে, তোমরা কোনো বস্তুর উপর নও। কেননা তারা যে ধর্মের উপর ছিল তাও তো কোনো একটি বস্তু ছিল।

উত্তর : উক্ত বাক্যে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, شَيْئٌ বা বস্তু দ্বারা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম উদ্দেশ্যে, নিজেদের মনগড়া ধর্ম নয়।

قَوْلُهُ الصّٰبِئُوْنَ : এটি صَابِئٌ-এর বহুবচন। ইসমে ফায়েল। অর্থ– দীন থেকে নির্গমনকারী। যখন কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো তখন আরবরা বলত– قَدْ صَبَأَ সে দীন থেকে বেরিয়ে গেছে। এ দলটিকে صَابِئٌ এজন্য বলা হয় যে, তারা ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্ম থেকে বেরিয়ে তারকারাজির পূজা-পার্বনে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের কেন্দ্রভূমি ছিল حَرَّانْ [হাররান]। আবূ ইসহাক সাবী এ দলের সাথে সম্পর্ক রাখত।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এ জুমলার নয়টি তারকীব হতে পারে। তন্মধ্যে সহজ তিনটি তারকীব প্রদত্ত হলো–

১. اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, নাসেব। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اٰمَنُوْا সেলাহ। صَلَى এবং مَوْصُوْلْ মিলে اِنَّ-এর ইসিম فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এটি জুমলা হয়ে اِنَّ-এর উহ্য খবর।

২. وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَاوْ হলো اِسْتِيْنَافِيَّةٌ আর اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। هَادُوْا সেলাহ। صِلَةٌ এবং مَوْصُوْلْ মিলে আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ وَالصَّابِئُوْنَ হলো مَعْطُوْف ; مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف وَالنَّصَارٰى মা'তূফ এখন তিন مَعْطُوْف মিলে مُبْدَلْ مِنْهُ হয়েছে। مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ জুমলা হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْهِ আর وَعَمِلَ صَالِحًا হলো مَعْطُوْف এখন مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ মিলে بَدَلْ তারপর مُبْدَلْ مِنْهُ ـ بَدَلْ মিলে মুবতাদা। فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ জুমলা হয়ে মুবতাদার খবর।

৩. اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اٰمَنُوْا হলো সেলাহ। সেলাহ-মাওসূল মিলে মা'তূফ আলাইহি। وَاوْ আতেফা। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। هَادُوْا সেলাহ। ইসমে মাওসূল এবং সেলাহ মিলে মা'তূফ আলাইহি। وَاوْ عَاطِفَةٌ الصَّابِئُوْنَ মা'তূফ আলাইহি এবং মা'তূফ। وَاوْ হরফে আতফ। اَلنَّصَارٰى মা'তূফ। তিন মা'তূফ মিলে مُبْدَلْ مِنْهُ আর مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ হলো بَدَلْ ; বদল-মুবদাল মিনহু মিলে اِنَّ-এর ইসিম। فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ হলো اِنَّ-এর খবর।

قَوْلُهُ كَذَّبُوْهُ : এটি كُلَّمَا-এর উহ্য جَزَاءٌ

قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيْرُ بِهِ : অর্থাৎ এখানে مَاضِىْ-এর সীগাহ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে مُضَارِعٌ-এর সীগাহ। এর একটি কারণ হলো حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٌ হিসেবে করা হয়েছে। আরেকটি কারণ হলো, فَاصِلَةٌ বা আয়াতের শেষ ছন্দ মিলের জন্য।

قَوْلُهُ تَقَعُ : এতে ইশারা করা হয়েছে যে, تَكُوْنُ **শব্দটি** تَامَّةٌ **সুতরাং** তার খবরের প্রয়োজন নেই। فِتْنَةٌ হলো تَكُوْنُ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيْرِ : অর্থাৎ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ -**এর যমীর থেকে** بَدْلُ الْبَعْضِ হয়েছে। এও হতে পারে যে, كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ হলো أُولٰئِكَ উহ্য মুবাতাদার খবর।

قَوْلُهُ فِرْقَةٌ مِنَ النَّصَارٰى : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা রয়েছে যে, **হযরত ঈসা (আ.)**-কে যারা ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ বলে তারা নাসারাদের একটি ফেরকা। এছাড়াও নাসারাদের আরো ফেরকা রয়েছে **যারা হযরত ঈসা (আ.)**-কে ইলাহ মনে করে। সুতরাং উভয় কথায় কোনো বৈপরীত্ব থাকলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ الخ : প্রচারকার্যের তাগিদ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতদ্বয়ের এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকুতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বক্রতা, **বিপথগামিতা, হঠকারিতা** এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও **সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে** মহানবী ﷺ নিরাশ হয়ে পড়তেন। কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকাজে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় **প্রতিক্রিয়া এরূপ** হতে পারতো যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনে **পরওয়া না করে প্রচারকাজে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ** থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের **সম্মুখীন** হতে **হতো। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভালো, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে** এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা **হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং** আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য, এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌঁছতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গাম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজের সময় মহানবী ﷺ -এর একটি উপদেশ : বিদায় হজের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিকে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিকে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গাম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন– اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবীরা স্বীকার করলেন, জী হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছে, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণির লোককে বোঝানো হয়েছে। যথা– ১. যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। ২. যারা তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌঁছানোর পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট **আমানতের ন্যায়** অনুভব করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে যতা**সাধ্য চেষ্টা করেছেন**। যদি কোনো বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন তবে **মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা** দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন, যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। **সহীহ বুখারীতে হযরত** মুআজ (রা.)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে اَخْبَرَ بِهٖ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا **অর্থাৎ** এ আমানত না পৌঁছানোর কারণে গুনাহগার হওয়ার ভয়ে হযরত মুআজ (রা.) **হাদীসটি** মৃত্যুর সময় **বর্ণনা করেছেন।** وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া **হয়েছে যে, যত** বিরোধিতাই করুক, **শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ** করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী ﷺ -এর সাথে **সাথে থাকতেন** এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। **কারণ, এ দায়িত্ব** স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন।

হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে দারুন ভয়ের **সঞ্চার হয়েছিল।** কারণ চতুর্দিক থেকে হয়তো সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা কররবে। অতঃপর যখন এ **আয়াত** অবতীর্ণ হলো, তখন ভয়ভীতি দূর হয়ে **অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়।**

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর প্রচারকাজে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -**এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম** হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনোরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থি নয়। -[**মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৭৪, ১৭৫**]

قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ : যোগসূত্র : পূর্বে আহলে কিতাবদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের **বর্তমান** তরিকা, যা সত্য বলে তারা দাবি করে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা অসার; মুক্তির জন্য এটা যথেষ্ট নয়, বরং মুক্তি **ইসলামের উপরই নির্ভরশীল।** এতদসত্ত্বেও তাদের কুফরকে আঁকড়ে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সান্ত্বনার বিষয়বস্তু **বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানে বিশেষ** সম্পর্ক ও প্রয়োজন হেতু প্রচার কার্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৭৬]

قَوْلُهُ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ : কাফেরদের জন্য দুঃখ করবে না : হুজুর ﷺ অধিক দয়া-মমতাপ্রবণ হওয়ার কারণে কাফেরদের অবস্থা দর্শনে খুবই চিন্তান্বিত ও পেরেশান **থাকতেন। তাঁকে বলা** হচ্ছে- আপনি এতো চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। তারা তো তাদের বিদ্রোহ ও শত্রুতার কারণে আজাবের **উপযুক্ত বা** হকদার হয়েছে। কাজেই সহমর্মিতা বিবেচনার কোনো অবকাশ নেই। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা **দেওয়া হয়েছে,** তাঁকে চিন্তিত বা চিন্তান্বিত হতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা, তা ছিল তাঁর জন্য সান্ত্বনা, তাঁকে চিন্তিত হতে নিষেধ **করা হয়নি। কেননা** চিন্তামুক্ত হওয়া তাঁর জন্য সম্ভব ছিল না; বরং তাঁকে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে এবং অধিক পেরেশানী প্রকাশ **করতে নিষেধ করা** হয়েছে। আপনি তাদের উপর লা'নত ও আজাব নাজিল হওয়ার কারণে আফসোস করবেন না। কেননা তারা **কাফের, ফলে আজাব ও লা'নতের** হকদার। -[তাফসীরে কাবীর]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, যারা সত্য দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের ব্যাপারে বেশি চিন্তা করবেন না, যেমন অধিক স্নেহপ্রবণ লোকেরা করে থাকে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-২৩৭]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ الخ : এতে সহজবোধ্যতার কারণে কিছু **শব্দকে** আগেপিছে করা হয়েছে। **এছাড়া আর কোনো পার্থক্য** নেই।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য অর্জন সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল : উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারো বংশগত **ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্য নেই। যে** ব্যক্তি **পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস** ও সৎকর্ম **অবলম্বন** করবে, সে পূর্বে যাই থাক **আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা** সুস্পষ্ট যে, **কুরআন** অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার **মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত** ও ইঞ্জীলেও এরই **নির্দেশ** রয়েছে এবং কুরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই **অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কুরআন** অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -**এর** নবুওয়ত প্রাপ্তির পর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -**এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তাওরাত,** ইঞ্জীল ও যাবূরের অনুসরণ **বিশুদ্ধ হতে** পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, **এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যারা** মুসলমান হবে, তারাই পরকালে **মুক্তি ও ছওয়াবের** অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, **এরা কুফর ও পাপের** পথে থেকে এ যাবত ইসলাম ও **মুসলমানদের বিরুদ্ধে** যেসব হীন চক্রান্ত করেছে মুসলমান **হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে?** আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, **অতীত সব গুনাহ** ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা **শঙ্কিত ও দুঃখিত** হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের **উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।** কেননা আয়াতে যে স্তরের ঈমান **ও আনুগত্য কামনা করা** হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ **স্তরের প্রতি** যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু **তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল।** কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোনো শাসনকর্তা অথবা বাদশা এরূপ স্থলে বলে থাকেন, আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যেই আনুগত্য করবে সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমার যে কৃপাদৃষ্টি তা কোনো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরিউক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ তিনটি। যথা– আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। এ আয়াত সে ক্ষেত্রে নয় ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহ্বান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে রাসূল অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুষ্ঠুরূপে উল্লিখিত না হওয়ার কোনো সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কুরআনও তার শত শত আয়াতে রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিকে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল ও রাসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোনো ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, 'প্রত্যেক বিজ্ঞ ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মূর্তিপূজারী হিন্দু থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে; পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়।' [নাউযুবিল্লাহ]

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কুরআন পাঠের শক্তি এবং কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কুরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করতে খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। যারা কুরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লিখিত হলো–

ঈমানে মুফাসসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার শেষভাগে কুরআনের ভাষা এরূপ– كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ অর্থাৎ সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি এভাবে যে, তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে আমরা কোনোরূপ পার্থক্য করি না। এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঈমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে একথাও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো একজন অথবা কয়েকজন পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কখনো মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সমস্ত পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই শর্ত। যদি একজন রাসূলও বিশ্বাস থেকে বাদ পড়েন, তবে এরূপ ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ـ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং রাসূলদের অস্বীকার করে, আল্লাহ এবং রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় [অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পয়গাম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না] এবং যারা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে অন্য কোনো রাস্তা করে নিতে চায়, তবে বুঝে নাও যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِيْ অর্থাৎ আজ হযরত মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে– এরূপ বলা কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ নয় কি?

এছাড়া যে কোনো যুগে যে কোনো ধর্ম পালন করাই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শেষ নবী ﷺ -এর আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণ এবং এক শরিয়তের পর অন্য শরিয়ত প্রেরণ করা অর্থহীন। প্রথম রাসূল যে শরিয়ত ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন

করেছিলেন, তাই যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য রাসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল? বড়জোর এমন একদল লোক থাকাই যথেষ্ট **হতো, যারা সেই শরিয়ত** ও গ্রন্থের হেফাজত করতেন এবং তা পালন করতে ও করাতে সচেষ্ট হতেন; সাধারণভাবে যা প্রত্যেক **উম্মতের আলেমরা করে** থাকেন। এমতাবস্থায় কুরআন পাকের এ উক্তির কি মানে হয় যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا [**অর্থাৎ আমি** তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরিয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ করেছি?]

এরপর এর কি বৈধতা থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ রিসালত ও কুরআনে অবিশ্বাসী ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতির সাথে **শুধু প্রচার যুদ্ধই** করেননি; বরং তরবারির যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন? ঈমানদার ও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু **আল্লাহর প্রতি** এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট হতো, তবে বেচারা ইবলীস কোন পাপে বিতাড়িত হলো? **আল্লাহর প্রতি কি** তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধান্বিত অবস্থায় إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ [পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত] বলে পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল।

বাস্তব সত্য এই যে, এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে ঐসব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে করে যে, দীন বিজাতিকে উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কুরআন পাক প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছে যে, অমুসলমানদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, মানবতা ইত্যাদি সবকিছুই করা দরকার, কিন্তু ধর্মের চতু:সীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দেখাশোনার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নয়। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস একেবারেই উল্লেখ করা না হতো, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং এ আয়াতেও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে যাতে আল্লাহর নির্দেশিত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বস স্থাপন করা হয়। কুরআনের এ পরিভাষায় নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে- فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস যেরূপ ছিল, একমাত্র সেরূপ বিশ্বাসই 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাসের বড় স্তম্ভই যে 'রাসূলের প্রতি বিশ্বাস' ছিল একথা কারো অজানা নয়। তাই مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দের মধ্যে 'রাসূলের প্রতি বিশ্বাস' ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৮০-১৮৩]

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ : كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের রাসূল যখন কোনো নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচি বিরুদ্ধ হতো, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করতো এবং পয়গাম্বরদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করতো এবং কাউকে হত্যা করতো। এটি ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতো। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোনো সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন বিদ্রোহের কুপরিণাম কখনো সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর হুঁশিয়ারি থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত কাজ তাই করতে থাকে। এমন কি, কতক পয়গাম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বাদশা বখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। হযরত ঈসা (আ.)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৮৪]

قَوْلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ : অর্থাৎ হযরত মসীহ, রূহুল কুদস ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মারইয়াম ও আল্লাহ সবাই আল্লাহ। [নাঊযুবিল্লাহ] তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তাঁরা তিনজনই এক; একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তি বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসকে তারা জটিল ও স্বার্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারো বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভুত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।

মসীহ (আ.)-এর উপাস্যতা খণ্ডন : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ অন্যান্য পয়গাম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি, যা উপাস্য হওয়ার

লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আ.) যিনি তাঁদের মতোই একজন মানুষ স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীব-জন্তু থেকে সে পরাঙমুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত কিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌছে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মাসীহ ও মারইয়ামের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি– মসীহ ও মারইয়াম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোনো বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানবমণ্ডলীর মতো স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগত থেকে পরাঙমুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থি যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে। [নাউযুবিল্লাহ]

হযরত মারইয়াম (আ.) পয়গাম্বর ছিলেন নাকি ওলী? : হযরত মারইয়ামের পয়গাম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صِدِّيْقَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন নবী নন। কারণ প্রশংসার স্থলে সাধারণত উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نَبِيَّةٌ বলা হতো । অথচ বলা হয়েছে صِدِّيْقَةٌ এটি ওলীত্বের একটি স্তর। –[রূহুল মা'আনী, সংক্ষেপিত]

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيْ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ মহানবী ﷺ -এর পূর্বে পুরুষদের কাছেই ওহী প্রেরিত হয়েছে। [সূরা ইউসুফ : রুকু:১২] –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৮৭, ১৮৮]

قَوْلُهُ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ : বনী ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাঁদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল যারা তাদের অক্ষ জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ অর্থাৎ কোনো কোনো পয়গাম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেলে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর পয়গাম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কাউকে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌছে পয়গাম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে– لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ যেসব বনী ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে। এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রিস্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদিদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ অর্থাৎ ইহুদিরা বলে যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র।

غُلُوٌّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণত পয়গাম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করা হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালঙ্ঘন।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি : পয়গাম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করা বনী ইসরাঈলের এ পরস্পরবিরোধী দু'টি কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে– اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনো মিথ্যাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালঙ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বনী ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গাম্বরের সাথে করেছে অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে যেসব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেওয়া হয়েছে, তা ধর্ম ও ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এদিক সেদিক হলেই মানুষ পথভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ : এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু রয়েছে। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলি শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তার জন্য দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রাসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো গ্রন্থ তা যতই সর্ববিষয় সম্বলিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না; বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য দু'টি উপায় রেখেছেন– আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গাম্বরগণ তাদের উত্তরসূরী আলেম ও মাশায়েখ এরা সবাই এ মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ বাক্যটিকে ভুল অর্থে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে রাসূলকে বরং পীরদেরকে ও 'আলেমুল গায়েব' এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপূজা ও কবরপূজা আরম্ভ করেছে, অপরদিকে আল্লাহর রাসূলকে শুধু একজন পত্র বাহককে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গাম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফের বলা হয়েছে তেমনি তাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহর সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে– لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ আয়াতটি এ বিষয়বস্তুর ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রাসূল ও তাঁদের উত্তরসূরীদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলির অধিকারী মনে করা আরো গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় : আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তাফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকিদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ধর্মের মাঝে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যামাখশারী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে ভিক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকরা এবং ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলায় ফিকহবিদরা এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরিউক্ত তাফসীরবিদের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি, তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তাফসীরবিদরা বলেন, এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কুরআন ও সুন্নাহর মাসআলার যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী এবং তাবেয়ীদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে– وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন ৩/১৯০-১৯৩]

অনুবাদ :

٧٧. قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَا تَغْلُوْا تُجَاوِزُوْا الْحَدَّ فِىْ دِيْنِكُمْ غُلُوًّا غَيْرَ الْحَقِّ بِاَنْ تَضَعُوْا عِيْسٰى اَوْ تَرْفَعُوْهُ فَوْقَ حَقِّهٖ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاۤءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ بِغُلُوِّهِمْ وَهُمْ اَسْلَافُهُمْ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَالسَّوَاۤءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ.

৭৭. বল, হে কিতাবীগণ! অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ, তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না, غَيْرَ الْحَقِّ : এটি এখানে উহ্য مَصْدَرْ বা ক্রিয়ামূল। غُلُوْ -এর صِفَتْ বা বিশেষণ এটা বোঝানোর জন্য তাফসীরে غُلُوًّا -এর উল্লেখ করা হয়েছে। সীমালঙ্ঘন করো না। যেমন, হযরত ঈসা (আ.)-কে নীচু মনে করো না বা তাঁকে স্বীয় স্থান হতে উর্ধ্বেও তুলো না। আর যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে বাড়াবাড়ির কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষগণ এবং অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। اَلسَّوَاۤءُ -এর আসল অর্থ হলো মাঝামাঝি।

٧٨. لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ بِاَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَّهُمْ اَصْحَابُ اَيْلَةَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط بِاَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوْا خَنَازِيْرَ وَهُمْ اَصْحَابُ الْمَائِدَةِ ذٰلِكَ اللَّعْنُ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম-তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। দাউদ আয়লা অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা বানরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। [সূরা মায়িদার শেষে এদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।] আর মায়িদাওয়ালাদের বিরুদ্ধে হযরত ঈসা (আ.) বদদোয়া করলে তারা শূকরে পরিণত হয়েছিল। এটা অর্থাৎ এ অভিশাপ এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।

٧٩. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ اَىْ لَا يَنْهٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْ مُّعَاوَدَةِ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ فِعْلُهُمْ هٰذَا.

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা হতে তার অভ্যাস হতে তারা পরস্পরকে একে অন্যকে বারণ করতো না নিষেধ করতো না। তারা যা করতো তা অর্থাৎ তাদের এ কর্ম কত নিকৃষ্ট।

٨٠. تَرٰى يَا مُحَمَّدُ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ بُغْضًا لَكَ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ لِمَعَادِهِمِ الْمُوْجِبِ لَهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ.

৮০. হে মুহাম্মাদ! তাদের অনেককে তুমি তোমার প্রতি বিদ্বেষবশত মক্কার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট যা অর্থাৎ যে কাজ তারা তাদের পরকালের জন্য আগে পাঠিয়েছে। তা আখিরাতে তাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর শাস্তিতে তারা স্থায়ী হবে।

٨١. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَىِ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ خَارِجُوْنَ عَنِ الْإِيْمَانِ .

৮১. তারা আল্লাহ, নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না; কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী, ঈমানের সীমার বাইরে।

٨٢. لَتَجِدَنَّ يَا مُحَمَّدُ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ج مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِتَضَاعُفِ كُفْرِهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَانْهِمَاكِهِمْ فِىْ اِتِّبَاعِ الْهَوٰى وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ أَىْ قُرْبُ مَوَدَّتِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ عُلَمَاءَ وَرُهْبَانًا عُبَّادًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ الْحَقِّ كَمَا يَسْتَكْبِرُ الْيَهُوْدُ وَأَهْلُ مَكَّةَ .

৮২. হে মুহাম্মাদ! অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মক্কার অংশীবাদীদেরকেই অজ্ঞানতা, কুফরির আধিক্য এবং রিপু-প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণে এদের মগ্নতার দরুন এদেরকে তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং **যারা বলে 'আমরা খ্রিস্টান'** মানুষের মধ্যে **তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখতে পাবে। এটা** অর্থাৎ বিশ্বাসীদের নিকটতর **বন্ধুরূপে হওয়া** এ কারণে যে তাদের মধ্যে অনেক **পণ্ডিত ও সংসারমুক্ত লোক** অর্থাৎ ইবাদতকারী রয়েছে **আর তারা** ইহুদি ও মক্কাবাসীদের মতো আল্লাহর ইবাদত করা হতে **অহংকারও করে না।** بِأَنَّ : এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَيْلَةَ : তাবরিয়া সাগরের তীরে অবস্থিত একটি জনপদ।

قَوْلُهُ مُعَاوَدَةً : এটি একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব। প্রশ্নটি হলো, مُنْكَرٌ বা মন্দকাজ করার পর তা থেকে নিষেধ করার না কোনো উপকারিতা আছে না তা কোনো যৌক্তিক বিষয়। কেননা যে জিনিস সংঘটিত হয়ে গেছে তা নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। এখানে مُعَاوَدَةً মুযাফকে মাহযূফ মেনে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে مُنْكَرٌ বা মন্দকাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ فِعْلُهُمْ : এটি مَا -এর বয়ান।

قَوْلُهُ هٰذَا : এটি مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ

قَوْلُهُ مِنْهُمْ : اَىْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ الْمُوْجِب : প্রশ্ন এখানে اَلْمُوْجِبُ উহ্য ধরার কী প্রয়োজনীয়তা ছিল? **উত্তর :** এ জন্য যে, اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِ আর مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِ ফায়েলের بَيَانٌ হয়ে থাকে। আর سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ বাক্যটি مَا قَدَّمَتْ -এর বয়ান হওয়া সহীহ হবে না যতক্ষণ اَلْمُوْجِبُ মুযাফকে মাহযূফ ধরা না হবে। কেননা مَا قَدَّمَتْ আহলে কিতাবের ফেয়েল এবং سَخِطَ আল্লাহর ফেয়েল। সুতরাং হামল শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ قِسِّيْسِيْنَ : রোমীয় ভাষায় এর অর্থ হলো আলেমগণ। পণ্ডিতবর্গ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম : দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে **বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর** অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে প্রথমত হযরত দাউদ (আ.)-এর মুখে, যার ফলে তাদের **আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে শূকরে পরিণত হয়।** অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষাজনিত এ অভিসম্পাত তাদের **ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয়** যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোনো কোনো **তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এখানে স্থা**নোপযোগিতার কারণে মাত্র দুজন পয়গাম্বরের ভাষ্যে তাদের উপর অভিসম্পাত **বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে** তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা **(আ.) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী হযরত** মুহাম্মাদ ﷺ -এর বক্তব্যে। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গা**ম্বরের উক্তির মাধ্যমে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত** হয়েছে, যারা পয়গাম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে **সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে অংশীদার** করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। -[**মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৯৩**]

قَوْلُهُ لَا يَتَنَاهَوْنَ : এর দু'টি **অর্থ হতে পারে ক. বিরত হতো না। -[রুহুল মা'আনী] খ. একে অন্যকে বাধা দিতো না।** এটাই প্রসিদ্ধ। **যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে পাপাচার ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না তখন সর্বগ্রাসী শাস্তির আশঙ্কা থাকে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২০৯]**

قَوْلُهُ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ : এ হলো তাদের আজাব যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ যে আল্লাহ রাগান্বিত তাদের উপর, এখানে اَنْ শব্দটি مَوْصُوْلَةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে কারণে। -[জুমাল] مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ যা তারা পাঠিয়েছে তাদের আগে অর্থাৎ নিজেদের আমল কুফরি আকাঈদ, যার প্রতিফল তারা আখিরাতে ভোগ করবে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ২৬৫]

قَوْلُهُ النَّبِيُّ : এর দ্বারা কতক তাফসীরবেত্তা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং আর কতিপয়ে হযরত নবী করীম ﷺ -কেও বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, ঐসব ইহুদিরা যদি বাস্তবিকই হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা ও শিক্ষামালায় বিশ্বাস থাকত, তবে হযরত মূসা (আ.) যার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেই আখেরী নবীর বিরুদ্ধে তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতো না, অথবা তারা যদি নবী কারীম ﷺ -এর প্রতি নিষ্ঠাবান বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে ইসলামের দুশমনদের সাথে যোগসাজশ করার মতো অপতৎপরতা তাদের দ্বারা সংঘটিত হতো না। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হিসেবে আয়াতের সম্পর্ক ইহুদি ও মুনাফিকদের সাথে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২১২]

নাসারাদের ইসলামপ্রীতি : এখানে নাসারাদের ইসলামের সাথে সম্পর্কের দিকে দিয়ে নিকটবর্তী হওয়ার দু'টি কারণ **বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো তাদের মাঝে জ্ঞান**-পিপাসু, রাত্রি জাগরণকারী জ্ঞানী ব্যক্তি ও দুনিয়াত্যাগী দরবেশরা আছেন। **দ্বিতীয়ত তাদের অন্তরে বিনয়-নম্রতা** বিরাজমান। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য, ঐ প্রকৃত ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাধারণ মাসিহী, **বিশেষত ফিরিঙ্গী কাওম এখানে** উদ্দেশ্য হতেই পারে না। কেননা, উপরিউক্ত দু'টি গুণের অভাব এদের মাঝে আছে; বরং এর **অর্থ হলো সে পুরাতন** 'নাসারা কাওম' [Nazarenes]।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা এ জন্য যে, অর্থাৎ এসব নাসারাদের ইসলামের সাথে নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণ।

قَوْلُهُ قِسِّيْسِيْنَ : قَسٌّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো রাত্রিতে কোনো বস্তু অন্বেষণ করা। যেমন উল্লেখ আছে قَسٌّ -এর **আসল অর্থ হলো,** 'কোনো বস্তু রাত্রিতে তালাশ ও অন্বেষণ করাকে قَسٌّ বলা হয়। –[রাগিব] আর নাসারা আলেমগণ যেহেতু রাত্রি **জাগরণকারী** আবিদ ছিলেন, তাই তাদেরকে قِسِّيْسٌ বলা হয়। [ইমাম রাগিব (র.) বলেন,] قِسِّيْسٌ হলো নাসারা সর্দারদের **মাঝের** আলেম ও আবিদ ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য ভাষা বিজ্ঞানদের এরূপ মতও বর্ণিত আছে যে, قِسِّيْسٌ শব্দটি আরবি শব্দ, যা সুরিয়ানী বা ল্যাটিন ভাষা থেকে এসে আরবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অভিজ্ঞ আলেমগণ এ আয়াত থেকে এ তত্ত্ব বের করেছেন যে, বিনয় ইত্যাদি উত্তম গুণাবলি সব সময়ই মর্যাদার দাবি রাখে, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, এমন কি তা নাসারাদের কাছে পাওয়া গেলেও। যেমনটা উল্লেখ আছে। এ আয়াত এ কথার দলিল যে, বিনয়, 'ইলম ও আমলে উৎকর্ষ লাভ করা এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতা পরিহার করা প্রশংসনীয় কাজ, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন। –[রূহুল মা'আনী]

এ আয়াত একথার দলিল যে ইলমের মর্যাদা হলো হেদায়েতের রাস্তার নির্দেশক এবং উত্তম পরিণতির সহায়ক। –[বাহর]

তাফসীরে মাদারিকে উল্লেখ আছে যে, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়– ইলম খুবই উপকারী বস্তু, তা কল্যাণের রাস্তা দেখায়, যদিও তা জ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিতদের ইলম হয়। এরূপ আখিরাতের ইলম, যদিও তা সংসার ত্যাগী দরবেশ এবং অহংকারমুক্ত কোনো নাসারার ইলমও হয়।

হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জ্ঞান ও আখলাকের উপর আমলের বিরাট প্রভাব আছে। যে জন্য তরিকতের মাশায়েখগণ আমলের উপর ইলম ও আখলাকের গুরুত্বও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-২৭০]

জ্ঞাতব্য : বর্তমান ফিরিঙ্গি কওম তো নিজেদেরকে প্রকাশ্যভাবে মাসীহী হিসেবে স্বীকার করে না, নাসারা বলা তো দূরের কথা! আধা নাস্তিক ও আধা মুশরিক কওমের নাসারাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই; কাজেই তাদের বন্ধুত্বের বা শত্রুতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

اَلْجُزْءُ السَّابِعُ : সপ্তম পারা

অনুবাদ :

٨٣. نَزَلَتْ فِيْ وَفْدِ النَّجَّاشِيِّ الْقَادِمِيْنَ مِنَ الْحَبْشَةِ قَرأَ عَلَيْهِمْ ﷺ سُوْرَةَ يٰسٓ فَبَكَوْا وَاَسْلَمُوْا وَقَالُوْا مَا اَشْبَهَ هٰذَا بِمَا كَانَ يَنْزِلُ عَلٰى عِيْسٰى قَالَ تَعَالٰى وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ مِنَ الْقُرْاٰنِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِنَبِيِّكَ وَكِتَابِكَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ الْمُقِرِّيْنَ بِتَصْدِيْقِهِمَا ـ

৮৩. একবার হাবশা হতে সম্রাট নাজাশীর প্রতিনিধি হিসেবে একদল লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে আসে। তিনি তাদেরকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনান। এটা শুনে তারা কেঁদে ফেলে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ঐ সময় বলেছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার সাথে এটা কত সাদৃশ্যপূর্ণ। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন যে সত্য তারা উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে! তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। তোমার নবী ও কিতাব সত্য বলে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর। এতদুভয়ের সত্যতা যারা স্বীকার করেছে তাদের।

٨٤. وَقَالَ فِيْ جَوَابِ مَنْ عَيَّرَهُمْ بِالْاِسْلَامِ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ الْقُرْاٰنِ اَىْ لَا مَانِعَ لَنَا مِنَ الْاِيْمَانِ مَعَ وُجُوْدِ مُقْتَضِيْهِ وَنَطْمَعُ عَطْفٌ عَلٰى نُؤْمِنُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ ـ

৮৪. এবং তারা বলেছিল, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ইহুদিরা তাদেরকে লজ্জা দিলে তারা উত্তরে বলেছিল, আল্লাহ ও আমাদের নিকট আগত সত্যে কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন না করার কি আছে? অর্থাৎ ঈমান আনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের ঈমান আনয়নের পথে কোনো বাধা নেই। এবং আমাদের প্রভু আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অর্থাৎ মু'মিনদের সাথে জান্নাতে অন্তর্ভুক্ত করুন এ প্রত্যাশা না করার কি কারণ থাকতে পারে? وَنَطْمَعُ পূর্বোল্লিখিত نُؤْمِنُ -এর সাথে এর عَطْفٌ বা অন্বয় সাধিত হয়েছে।

٨٥. قَالَ تَعَالٰى فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ بِالْاِيْمَانِ ـ

৮৫. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এবং তাদের এ কথার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এটা ঈমানের বিষয়ে আন্তরিকতা পোষণকারীদের পুরস্কার।

٨٦. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ـ

৮৬. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে তারাই অগ্নিবাসী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذَا سَمِعُوْا : শুরুর وَاو টি যদি اِسْتِيْنَافِيَّةٌ ধরা হয় তাহলে এটি كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ হবে। মুফাসসির (র.) قَالَ تَعَالٰى **বলে এ তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত** করেছেন। আর যদি وَاو টি عَاطِفَةٌ হয় তাহলে তার عَطْف [সম্পর্ক] হবে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ **-এর সাথে।** اَىْ ذٰلِكَ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

قَوْلُهُ رَبَّنَا اٰمَنَّا : এটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ যা একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে যখন **তাদের সে অবস্থা হতো তখন** তারা কি বলত? তার জবাব হলো- يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا

قَوْلُهُ مُقْتَضِيْهِ : অর্থাৎ যেহেতু ঈমানের مُوْجِبْ বিদ্যমান রয়েছে এবং সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহ তাদের মাঝে রয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى نُؤْمِنُ : অর্থাৎ نَطْمَعُ -এর আতফ نُؤْمِنُ -এর সাথে। এটি مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ -এর খবর নয়। اَىْ **نَحْنُ نَطْمَعُ কেননা,** হযফ হওয়াটা জাহেরের খেলাফ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ الخ : এ প্রত্যয়নকারী ব্যক্তি কারা ছিলেন? হাদীস ও জীবনচরিতের **পুস্তকাদি থেকে** সর্বসম্মতভাবে জানা যায় যে, এঁরা হলেন আবিসিনিয়ার বাদশা **নাজাশী [মৃ.** ৯ হিজরি] এবং তাঁর পরিষদবর্গ। এঁরা সত্য **মনীষী** ছিলেন। নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে যখন মক্কা মুয়াযযমা থেকে **একদল সাহাবীকে** হাবশাতে হিজরত করতে বলেন, তখন ঘটনাক্রমে হযরত জাফর তাইয়্যার (রা.) নাজাশীর ফরমায়েশ অনুযায়ী **পরিপূর্ণ দরবারে** সূরা মরিয়মের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শুনান। ফলে নাজাশী এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত সকলে অভিভূত হয়ে **কান্নায় ভেঙ্গে** পড়েন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতটি নাজাশী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শানে নাজিল হয়। ইবনে **হিশাম বলেন,** আল্লাহর শপথ! নাজাশী এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে, তাঁর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার সঙ্গী-সাথীরাও **এমনভাবে কাঁদেন যে,** তাঁদের মাসহাফসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, যখন তাঁরা শুনেন যা তাঁদের কাছে তেলাওয়াত **করা হয়। অতঃপর নাজাশী বলেন, নিশ্চয় এটা** এবং যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.) একই উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে।

قَوْلُهُ مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ : যা নাজিল হয়েছে রাসূলের প্রতি। এটি ছিল সূরা মরিয়মের আয়াত। তিনি তাঁর সামনে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ এর প্রথম থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর হযরত জাফর (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন তাঁদের সামনে আরো কুরআন তেলাওয়াত করেন। তখন তিনি সূরা মরিয়ম পাঠ করেন।

قَوْلُهُ اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ : তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত। اِفَاضَةٌ অর্থাৎ অশ্রু অধিক প্রবাহিত হয়। কুরতুবী (র.) বলেন, উত্তম ফায়েজ হলো যখন তা অধিক হয় এবং প্রবাহিত হয়, যেমন পানির প্রবাহ। জ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া এরূপই হয়ে থাকে। তারা হা-হুতাশ করে না, কিন্তু তাদের অশ্রু নির্গত হতে থাকে। তিনি আরো বলেন, এ হলো বিজ্ঞজনদের অবস্থা যে, তারা ক্রন্দন করে, কিন্তু চিল্লাচিল্লি করে না; তারা প্রার্থনা করে, কিন্তু চিৎকার করে না।

قَوْلُهُ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ الخ : এজন্য যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করেছে। সত্য কথার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অশ্রু বিগলিত হওয়া এবং ক্রন্দন করা যেন সালেহীন বা নেককারদের রীতি। তাওরাতে আছে, সবলোক **শরিয়তের কথা** শুনে ক্রন্দন করত। অতিরিক্ত হাসি যেমন অমনোযোগিতার প্রমাণ; তেমনি কলবের ভীতি-**সন্ত্রস্ততা নিদর্শন হলো জীবন্ত** আত্মা বা রূহের। اَلْحَقُّ শব্দটি আনার তাৎপর্য হলো, ইঞ্জীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর **জবানীতে আখেরী নবী আসার** যে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত আছে, তার ব্যাখ্যা 'রূহে হক' বা 'সত্য আত্মার' দ্বারা করা হয়েছে।

মুরশিদ হাকীমুল উম্মত থানবী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা সুফিদের 'অজদ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'অজদ' নাম হলো অনিচ্ছাকৃত **প্রশংসিত** অবস্থার। فَاكْتُبْنَا তালিকাভুক্ত করুন আমাদের। এখানে اَلْكِتَابُ -এর **অর্থ** হলো- স্থিরভাবে বানিয়ে দেওয়া বা **করে দেওয়া।** কুরতুবী (র.) বলেন, فَاكْتُبْنَا -এর অর্থ হলো- আমাদের তার অন্তর্ভুক্ত যা লেখা হয়ে গেছে। اَلشَّاهِدِيْنَ **সাক্ষ্যবহনের** শামিল অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মদ ﷺ যে সত্য **নবী** এর সাক্ষী। আবূ আলী বলেন, যারা **সাক্ষ্য দেয়** আপনার নবী কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদন করে।

قَوْلُهُ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ : এজন্য যে, তারা সত্যকে চিনেছে। এখানে প্রথম مِنْ শব্দটি سَبَبٌ বা কারণের জন্য **ব্যবহৃত হয়েছে** এবং দ্বিতীয় مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা 'হকের কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাবার শুরু **অর্থে এবং দ্বিতীয়টি কিছু** বা কতকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -[মাজেদী টীকা- ২৭১]

অনুবাদ :

٨٧. وَنَزَلَ لَمَّا هَمَّ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَنْ يُّلَازِمُوْا الصَّوْمَ وَالْقِيَامَ وَلَا يَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلَا يَاْكُلُوا اللَّحْمَ وَلَا يَنَامُوْا عَلَى الْفِرَاشِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط تَتَجَاوَزُوْا اَمْرَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .

৮৭. কতিপয় সাহাবী একবার সংকল্প করেন যে, তাঁরা সর্বদা রোজা রাখবেন আর সালাত ও ইবাদত-বন্দেগি করবেন, কখনো নারী ও সুগন্ধির নিকটবর্তী হবেন না, মাংস আহার করবেন না ও বিছানায় শয়ন করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করেছেন সে সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ লঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

٨٨. وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص مَفْعُوْلٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُوْرُ قَبْلَهٗ حَالٌ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ .

৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে আহার কর حَلٰلًا এটা مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারক। তৎপূর্ববর্তী جَارْ مَجْرُوْرْ অর্থাৎ مِمَّا হলো حَالٌ । তার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট رَزَقَكُمْ এবং ভয় কর আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

٨٩. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ الْكَائِنِ فِىْ اِيْمَانِكُمْ هُوَ مَا يَسْبِقُ اِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْقِ كَقَوْلِ الْاِنْسَانِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ عَاقَدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج عَلَيْهِ بِاَنْ حَلَفْتُمْ عَنْ قَصْدٍ فَكَفَّارَتُهٗ اَىِ الْيَمِيْنِ اِذَا حَنَثْتُمْ فِيْهِ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ مِنْهُ اَهْلِيْكُمْ اَىْ اَقْصَدِهٖ وَاَغْلَبِهٖ لَا اَعْلَاهُ وَلَا اَدْنَاهُ .

৮৯. তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না। নিরর্থক কসম হলো, যা শপথের ইচ্ছা ছাড়াই মুখ হতে নিসৃত হয়ে পড়ে। যেমন– কেউ কথা বলতে বলতে বলে ফেলল, لَا وَاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! এটা নয়। بَلٰى وَاللّٰهِ অর্থাৎ হ্যাঁ আল্লাহর কসম। কিন্তু যেসব শপথে তোমরা গ্রন্থি বাঁধ। অর্থাৎ যা ইচ্ছাকৃতভাবে কর। عَقَّدْتُّمْ এটা তাশদীদসহ বাবে تَفْعِيْل ও তাশীদবিহীন بَابْ ضَرَبَ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে বাবে مُفَاعَلَةٌ - عَاقَدْتُّمْ রূপেও পঠিত রয়েছে। সেসবের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অনন্তর এটার অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করলে এর কাফফারা হলো তোমরা তোমাদের জন্য পরিজনদেরকে যা খেতে দাও তার মধ্যম ধরনের দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান। অর্থাৎ প্রত্যেক দরিদ্রকে সে ধরনের খাদ্য হতে এক মুদ পরিমাণ প্রদান করতে হবে। সাধারণভাবে যা প্রচলিত এবং যা মধ্যম ধরনের তা হলেই হবে। একেবারে উচ্চশ্রেণির বা একেবারে নিম্নশ্রেণির যেন না হয়।

أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً كَقَمِيْصٍ وَعِمَامَةٍ وَإِزَارٍ وَلَا يَكْفِي دَفْعُ مَا ذُكِرَ إِلَى مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَوْ تَحْرِيْرُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ط مُؤْمِنَةٍ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ وَاحِدًا مِمَّا ذُكِرَ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ ط كَفَّارَتُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ط وَحَنِثْتُمْ وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ إِنْ تَنْكُثُوْهَا مَا لَمْ تَكُنْ عَلَى فِعْلِ بِرٍّ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَكَذٰلِكَ أَيْ مِثْلَ مَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ عَلَى ذٰلِكَ ـ

অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান। অর্থাৎ যতটুকু পরিমাণ কাপড় পরিচ্ছদ বলে গণ্য, যেমন– একটি জামা, পাগড়ি ও লুঙ্গি দান করা। উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ একজনকে দিলে যথেষ্ট হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। কিংবা একজন দাস মুক্ত করা। **স্বাধীন করা। হত্যা ও জিহার সম্পর্কিত** কাফফারার **সময় যেমন মু'মিন দাস মুক্ত করার** বিধান বিদ্যমান **তেমনি مُطْلَقٌ অর্থাৎ শর্তমুক্ত বিষয়টি** مُقَيَّدٌ অর্থাৎ **শর্তযুক্ত বিষয়ের** উপর প্রয়োগ করার নীতি অনুসারে **এখানেও কাফফারার** ক্ষেত্রে দাসটিকে মু'মিন বা **বিশ্বাসী হতে হবে। উল্লিখিত** বিষয়সমূহের কোনো একটির **যার সামর্থ্য নেই** তার জন্য তার কাফফারা হলো **তিন দিন রোজা রাখা**। বাহ্যতই বুঝা যায় অবিচ্ছিন্ন **ও একাধারে এ দিনসমূহের** রোজা জরুরি নয়। এটাই ইমাম **শাফেয়ী (র.) -এর** অভিমত। এটা অর্থাৎ উল্লিখিত বিধান **হলো তোমরা শপথ** করত ভঙ্গ করলে উক্ত **শপথের কাফফারা। শপথ যদি** কোনো সংক্রান্ত **না হয় তবে সেটা ভঙ্গ করা হতে** তোমরা তোমাদের **শপথ** রক্ষা কর। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন তেমন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৯০. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمُسْكِرُ الَّذِي يُخَامِرُ الْعَقْلَ وَالْمَيْسِرُ الْقِمَارُ وَالْأَنْصَابُ الْأَصْنَامُ وَالْأَزْلَامُ قِدَاحُ الْإِسْتِقْسَامِ رِجْسٌ خَبِيْثٌ مُسْتَقْذَرٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط الَّذِي يُزَيِّنُهُ فَاجْتَنِبُوْهُ أَيِ الرِّجْسَ الْمُعَبَّرَ بِهِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ تَفْعَلُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

৯০. হে বিশ্বাসীগণ! মদ অর্থাৎ যাতে জ্ঞান বিলোপ হওয়ার **ক্ষমতা বিদ্যমান সেই ধরনের নেশাকর পানীয়,** মায়সির **অর্থাৎ জুয়া** দেব-মূর্তি **প্রতিমা শর** অর্থাৎ ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু মন্দ ও হেয় বস্তু শয়তানের কার্য। অর্থাৎ এমন কার্য শয়তান যা তোমাদের সামনে সুশোভিত করে তুলে ধরে। সুতরাং তোমরা ওটা অর্থাৎ رِجْسٌ বা কলুষিত বস্তু বলে অভিহিত এ জাতীয় বস্তুতে লিপ্ত হওয়া বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

٩١. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إِذَا أَتَيْتُمُوهُمَا لِمَا يَحْصُلُ فِيهِمَا مِنَ الشَّرِّ وَالْفِتَنِ وَيَصُدَّكُمْ بِالْاِشْتِغَالِ بِهِمَا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج خَصَّهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيمًا لَهَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ عَنْ إِتْيَانِهِمَا أَيْ إِنْتَهُوا ـ

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা অর্থাৎ যদি তোমরা এতদুভয় কার্য কর তবে তার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়; কারণ এ ধরনের কার্য দ্বারা অন্যায় ও বিশৃঙ্খলাই ঘটে এবং তোমাদরেকে এতদুভয়ের নেশায় মগ্ন করত আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে ফিরিয়ে রাখতে চায়। এরপরও কি তোমরা এগুলোতে লিপ্ত হওয়া হতে নিবৃত্ত হওয়ার নয়? অর্থাৎ তোমরা নিবৃত্ত হও। আল্লাহর স্মরণ ও সালাতের অধিক গুরুত্বের দরুন এখানে বিশেষভাবে এ দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٢. وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ج الْمَعَاصِي فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ الْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ وَجَزَاؤُكُمْ عَلَيْنَا ـ

৯২. তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং পাপকার্য হতে সতর্ক হও; তোমরা যদি আনুগত্য প্রদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। অর্থাৎ তার কাজ হলো স্পষ্টভাবে **প্রচার করে দেওয়া** আর তোমাদের শাস্তি বিধান **সে আমার কাজ।**

٩٣. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا أَكَلُوا مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ إِذَا مَا اتَّقَوْا **الْمُحَرَّمَاتِ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا أَثْبَتُوا عَلَى التَّقْوٰى وَالْإِيمَانِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوا ط الْعَمَلَ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بِمَعْنٰى أَنَّهُمْ يُثِيبُهُمْ ـ**

৯৩. যারা ঈমান আনে ও **সৎকর্ম করে তারা** মদ, **জুয়া হারাম হওয়ার পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে আহার করেছে তজ্জন্য তাদের কোনো পাপ নেই** যদি তারা নিষিদ্ধ **কার্যসমূহ হতে বেঁচে থাকে,** বিশ্বাস স্থাপন করে অর্থাৎ **ঈমান** ও তাকওয়ার উপর কায়েম থাকে অতঃপর সাবধান হয় ও আমল ভালো করে এবং আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পুণ্যফল দান করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَفْعُولٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ قَبْلَهُ حَالٌ : অর্থাৎ حَلٰلًا طَيِّبًا মওসূফ সিফত মিলে كُلُوا-এর مَفْعُولٌ আর مِمَّا رَزَقَكُمْ - حَلٰلًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَالٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে। তাকদীরী ইবারত এভাবে– كُلُوا شَيْئًا حَلٰلًا مِمَّا رَزَقَكُمْ بِهِ কেননা, مما رزقكم মূলত نَكِرَةٌ-এর صِفَتٌ হওয়ার কারণে حَالٌ مُقَدَّمٌ হয়ে حَالٌ হয়েছে। طَيِّبًا حَالٌ كَوْنِهِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতে এ তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ الْكَائِنُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِي أَيْمَانِكُمْ হলো اَللَّغْوِ-এর সিফত; حَالٌ নয়। অথবা فِي أَيْمَانِكُمْ **এটা** এখানে উহ্য اَلْكَائِنُ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ مَا يَسْبِقُ اِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব।

قَوْلُهُ بِمَا عَقَّدْتُّمْ : اَیْ وَثَقْتُمْ بِالنِّيَّةِ وَالْقَصْدِ অর্থাৎ নিয়ত এবং ইচ্ছার মাধ্যমে যা দৃঢ় করেছ। শব্দটি تَعْقِيْد মাসদার থেকে مَاضِىْ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ -এর সীগাহ। তোমরা গিট লাগিয়েছ, মজবুত করেছ।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَقَّدْتُّمْ -এর مَا টি হলো مَوْصُوْلَهْ এবং عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ জুমলা হয়ে সেলাহ। আর যখন সেলাহ জুমলা হয় তখন তাতে যমীর عَائِدْ হওয়া জরুরি হয়। আর সেটি হলো عَلَيْهِ।

قَوْلُهُ حَنِثْتُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শুধু কসম কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ বা কারণ নয়; বরং কসম ভঙ্গ করা হলো কাফফারার সবব।

قَوْلُهُ مُؤْمِنَة : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে।

قَوْلُهُ مُدٌّ : এক মুদের পরিমাণ ৬৮ তোলা ৩ মাশা অথবা **৭৯৬ গ্রাম ৬৮ মিলিগ্রাম।**

قَوْلُهُ كَفَّارَتُهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَصِيَامُ হলো مُبْتَدَأٌ আর كَفَّارَةٌ হলো তার উহ্য খবর।

قَوْلُهُ حَيْثُ مُسْتَقْذَر : اَلرِّجْسُ -এর অর্থ অধিকাংশের মতে نَجَسْ বা অপবিত্র। আর কেউ কেউ বলেন, رِجْس শব্দটি অর্থগতভাবে اِسْمُ جَمْعٍ আর এ কারণেই مُفْرَدْ হওয়া সত্ত্বেও مُتَعَدِّدْ -এর খবর হয়েছে। মুফাসসির (র.) এখানে مُسْتَقْذَرٌ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, رِجْس দ্বারা উদ্দেশ্য طَبْعِىْ বা প্রকৃতিগত অপবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়, বরং عَقْلِىْ অপবিত্রতা উদ্দেশ্য। ইমাম জুযায (র.) বলেন, رِجْس [ر বর্ণে ফাতহা এবং কাসরা উভয়ভাবেই] প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়।

قَوْلُهُ الرِّجْس : এটি একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব।

প্রশ্ন. اِجْتَنِبُوْهُ -এর যমীরটি مُتَعَدِّدْ অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত চারটি বস্তুর প্রতি ফিরেছে। অথচ যমীর হলো একবচনের।

উত্তর. একবচনের যমীরের مَرْجَعْ হলো اَلرِّجْس যা اِسْمُ جَمْعٍ হওয়ার কারণে হুকুমের ক্ষেত্রে مُتَعَدِّدْ [একাধিক]। মুফাসসির (র.) بِالْاِشْتِغَالِ ، اِذَا اَتَيْتُمُوْهُمَا ، اَنْ تَفْعَلُوْهُ এ তিনটি জুমলা বৃদ্ধি করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, আদেশ এবং নিষেধের সম্পর্ক اَفْعَالْ তথা ক্রিয়ার সাথে হয়ে থাকে; ذَاتْ এবং عَيْن -এর সাথে হয় না।

قَوْلُهُ ثَبَتُوْا : মুফাসসির (র.) এখানে ثَبَتُوْا বৃদ্ধি করেছেন تَكْرَارْ -এর আপত্তি দূর করার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ : অর্থাৎ ইহজীবনে তার কোনো কাফফারা নেই, যেমন মুনআকিদা [ভবিষ্যতের কোনো কাজ করা না করার ইচ্ছাকৃত শপথ] এর ক্ষেত্রে কাফফারা আছে। لَغْو তথা নিরর্থক শপথের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। উপরে বৈধ বস্তু নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। শপথও যেহেতু নিষিদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি, তাই এ স্থলে শপথের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। -[উসমানী : টীকা- ২১৬]

قَوْلُهُ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ : অর্থাৎ শপথ ভাঙ্গার পর এর কাফফারা দেওয়া হয়। আহার্য দানের ক্ষেত্রে এ এখতিয়ার আছে যে, ইচ্ছা করলে দশজন দরিদ্রকে বাড়িতে বসিয়েও খাওয়াতে পারে, আর ইচ্ছা করলে ফিতরার সমপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বা তার মূল্য এক একজন দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করতে পারে। -[উসমানী : টীকা- ২১৭]

قَوْلُهُ اَوْ كِسْوَتُهُمْ : শরীরের অধিকাংশ ঢেকে যায়- এ পরিমাণ বস্ত্র, যেমন এক জোড়া জামা-পায়জামা বা লুঙ্গি ও চাদর। -[উসমানী : টীকা- ২১৮]

قَوْلُهُ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : একজন গোলাম আজাদ করা। এতে মু'মিন হওয়ার শর্ত নেই। -[উসমানী : টীকা ২১৯]

قَوْلُهُ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ : **অর্থাৎ** একাধারে তিনদিন রোজা রাখবে। সামর্থ্য না থাকার অর্থ নেসাবের মালিক না হওয়া। –[**উসমানী : টীকা**– ২২০]

قَوْلُهُ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ : শপথ রক্ষার অর্থ নিষ্প্রয়োজনে কথায় কথায় শপথ না করা। এ অভ্যাস ভালো নয়। আর **শপথ করে ফেললে** যথাসাধ্য তা পূর্ণ করা কর্তব্য। কোনো কারণে ভেঙ্গে ফেললে কাফফারা আদায় জরুরি। এসবগুলো শপথ **রক্ষার অন্তর্ভুক্ত**। –[উসমানী : টীকা ২২১]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ : এটা কতবড় অনুগ্রহ যে, আমরা উপাদেয় বস্তু পরিহার করতে চাইলে তিনি তা নিষেধ করে দিয়েছেন। আবার কেউ ভুলে শপথের মাধ্যমে কোনো উত্তম বস্তু নিজের উপর নিষিদ্ধ করে ফেললে শপথ রক্ষার সাথে তা হালাল করার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। –[উসমানী : টীকা– ২২২]

قَوْلُهُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ : اَنْصَابٌ ও اَزْلَامٌ-এর ব্যাখ্যা এ সূরারই শুরুতে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ -এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। –[উসমানী : টীকা– ২২৩]

আল্লামা যামাখশারী এখানে একটি প্রশ্ন করেছেন যে, প্রথম আয়াতে মদ ও জুয়ার উল্লেখ انصاب [মূর্তি পূজার বেদী] ও ازلام। [ভাগ্য নির্ধারক তীর]-এর সাথে করা হয়েছে, আর বর্তমানে আয়াতে এ দুটির উল্লেখ আলাদাভাবে কেন করা হয়েছে? তিনি নিজেই এর জবাব এরূপ দিয়েছেন যে, এ আয়াতে **কেবল মুসলমানদেরকে** সম্বোধন করা হয়েছে, আর উদ্দেশ্য হলো তাদের মদ ও জুয়া থেকে বিরত রাখা। **পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী আয়াতে যে চারটি বস্তুকে** একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ হলো মুসলমানদের মদ ও **জুয়ার প্রতি অধিক ঘৃণা সৃষ্টি করা। কেননা এটা এমন একটি** ঘৃণ্য কাজ, যা জাহিলি যুগের লোকেরা ও মুশরিকরা করত। [তাফসীরে কাশ্‌শাফে উল্লেখ আছে–] মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার তাকিদস্বরূপ 'আনসাব' ও 'আযলাম' -এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এসব হলো জাহিলি যুগের ক্রিয়াকর্ম এবং মুশরিকদের কাজ। পরে এ দুটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মদ ও জুয়া যে হারাম তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। –[মাজেদী : টীকা– ২৮৭]

মদপানের নিষিদ্ধতা : মদ সম্পর্কে এ আয়াতের পূর্বে কিছু আয়াত নাজিল হয়েছিল। সর্বপ্রথম নাজিল হয়– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ 'লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি।' –[সূরা বাকারা : ২১৯]

এ আয়াতে মদ হারাম হওয়ার প্রতি যদিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু মদ্যপান ত্যাগ করার সরাসরি আদেশ যেহেতু ছিল না তাই হযরত ওমর (রা.) বললেন, اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বিষয়টি পুরোপুরি বর্ণনা করুন।' তখন দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।' –[সূরা নিসা : ৪৩]

এ আয়াতেও মদ পানের কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই যদিও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এটা এ কথার ইঙ্গিত করছিল যে, শীঘ্রই মদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আরবে মদ পানের রেওয়াজ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। এটা সহসা ছেড়ে দেওয়া তাদের অবস্থানুযায়ী সহজসাধ্য ছিল না। তাই অত্যন্ত প্রজ্ঞাজনোচিতভাবে পর্যায়ক্রমে প্রথমে তাদের অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে নিষেধাজ্ঞার বিধানটি তাদের জন্য অনায়াসসাধ্য করে তোলা হয়েছে। কাজেই হযরত ওমর (রা.) দ্বিতীয় আয়াতটি শুনেও পূর্বের মতো বললেন, اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا অবশেষে সূরা মায়িদার বক্ষ্যমাণ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিমা পূজার মতো এ ঘৃণ্য বস্তুও পরিহার করতে আদেশ করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) আয়াতসমূহের শেষ অংশ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ অর্থাৎ 'তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?' শোনামাত্রই চিৎকার

করে উঠলেন, إِنْتَهَيْنَا إِنْتَهَيْنَا [আমরা নিবৃত্ত হলাম, নিবৃত্ত হলাম]। তখন প্রত্যেকে মদের মটকা ভেঙ্গে ফেলল। শুঁড়িখানা ধ্বংস করে দিল। মদিনার অলিগলিতে পানির মতো মদের ঢল বয়ে গেল। সমগ্র আরব এ ঘৃণ্য পানীয় পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর মারেফাত এবং নববী আনুগত্য ও মহব্বতের শারাবান তাহুরা পানে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সমস্ত অনিষ্টের উৎসমূল ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে মহানবী ﷺ -এর জিহাদ এমনই ফলপ্রসূ হলো যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না! মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত দেখুন আল কুরআন এতদিন পূর্বে এত কঠোরভাবে যে বস্তু নিষিদ্ধ করেছিল, এতদিন পর সবচেয়ে বড় মদ্যপ দেশ আমেরিকা ইত্যাদি বৃহৎ শক্তিবর্গ তার ক্ষতি ও অনিষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে। আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা ২২৪]

মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ : মদ পানের কারণে বুদ্ধি-বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে অনেক সময় মদখোর উন্মাদ হয়ে যায় এবং তখন নিজেরাই বিবাদ-কলহ শুরু করে দেয়। এমনকি কখনো নেশার ঘোর কেটে যাওয়ার পরও সে দ্বন্দ্বের রেশ বাকি থেকে যায়। পরিণামে স্থায়ী শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে। জুয়ারও এ একই অবস্থা বরং কিছু বেশিই। হারজিতের কারণে তাতে প্রচণ্ড মারামারি ও অনর্থের সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবে শয়তান তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার দরুন সুযোগ পেয়ে যায়। এ তো ছিল বাহ্য ক্ষতির দিক। আর এর অভ্যন্তরীণ ক্ষতি এই যে, মানুষ এসবে লিপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত-বন্দেগি হতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল হয়ে পড়ে। চাক্ষুস দর্শন ও অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী। দাবা খেলোয়াড়দেরকেই দেখুন না, সালাত আদায় আর কি, পানাহার ও ঘরবাড়ির কোনো খবর থাকে না। এসব বস্তু যখন এত কিছু বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতির উৎস তখন একজন মুসলিম কি এসব পরিহার না করে পারে? –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২২৫]

قَوْلُهُ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا الخ : কোনো জিনিসের উপকার ক্ষতি যদি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে নাও পার তবুও মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অবশ্যই তামিল কর। আইন অমান্য কখনোই করো না। অন্যথায় আমার নবী তো মহান আল্লাহর বিধানাবলি স্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেনই, অমান্য করার পরিণাম কি হবে তা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা ২২৬]

অনুবাদ :

٩٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمْ لَيَخْتَبِرَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ يُرْسِلُهُ لَكُمْ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيِ الصِّغَارَ مِنْهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ الْكِبَارَ مِنْهُ وَكَانَ ذٰلِكَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ فَكَانَتِ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ تَغْشَاهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ ج حَالٌ اَيْ غَائِبًا لَمْ يَرَهُ فَيَجْتَنِبُ الصَّيْدَ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّهْيِ عَنْهُ فَاصْطَادَهُ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত দ্বারা যেসব ছোট প্রাণী ও বর্শা দ্বারা যেসব বড় প্রাণী শিকার করা যায় সে বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের কাছে ঐসব প্রাণী প্রেরণ করে তোমাদেরকে যাচাই করে দেখবেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যতই অবহিত হন কে তাঁকে অদৃশ্য অবস্থায়ও ভয় করে। بِالْغَيْبِ এটা حَالٌ। অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থায় তাকে না দেখেও ভয় করে এবং শিকার হতে বিরত থাকে। এরপর অর্থাৎ নিষেধ করার পরও কেউ সীমালঙ্ঘন করলে এবং শিকার করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সাহাবীগণ ছিলেন সে সময় ইহরামরত। বন্যপ্রাণী ও পক্ষীকুল তাঁদের হওদার নিকট এসে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করছিল।

٩٥. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط مُحْرِمُوْنَ بِحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ بِالتَّنْوِيْنِ وَرَفْعِ مَا بَعْدَهُ اَيْ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ هُوَ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اَيْ شِبْهَهُ فِي الْخِلْقَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِاِضَافَةِ جَزَاءٍ يَحْكُمُ بِهِ اَيْ بِالْمِثْلِ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ لَهُمَا فِطْنَةٌ يُمَيِّزَانِ بِهَا اَشْبَهَ الْاَشْيَاءِ بِهِ وَقَدْ حَكَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ فِيْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بِبَقَرَةٍ ـ

৯৫. হে বিশ্বাসীগণ! ইহরামে থাকাকালে অর্থাৎ হজ বা ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরামরত অবস্থায় তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা বধ করলে তার বিনিময় হলো অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির উপর যা বিনিময় ধার্য হবে তা হলো যা বধ করল তার অনুরূপ অর্থাৎ গঠন প্রকৃতির দিক হতে তার সদৃশ্যযুক্ত গৃহপালিত জন্তু جَزَاءٌ এতে তানভীন ও পরবর্তী শব্দটি (مِثْلُ) তে رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে পরবর্তী শব্দটির দিকে اِضَافَتْ অর্থাৎ সম্বন্ধিত করেও এটা পঠিত রয়েছে। যার ফয়সালা করবে অর্থাৎ অনুরূপ হওয়ার ফয়সালা দেবে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বান দুজন লোক যারা হবে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন। ফলে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণী সম্পর্কে তারা ফয়সালা দিতে সক্ষম হতে পারবে। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ওমর এবং হযরত আলী (রা.) উটপাখির ক্ষেত্রে উট, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা.) বন্যগরু ও গাধার ক্ষেত্রে গাভী,

وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْفٍ فِى الظَّبْىِ بِشَاةٍ حَكَمَ بِهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا فِىْ الْحَمَّامِ لِاَنَّهُ يَشْبَهُهَا فِى الْعَبِّ هَدْيًا حَالٌ مِنْ جَزَاءٍ بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَىْ يُبْلَغُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيْهِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ عَلٰى مَسَاكِيْنِهِ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُذْبَحَ حَيْثُ كَانَ وَنَصْبُهُ نَعْتًا لِمَا قَبْلَهُ وَاِنْ اُضِيْفَ لِاَنَّ اِضَافَتَهُ لَفْظِيَّةٌ لَا تُفِيْدُ تَعْرِيْفًا فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ كَالْعُصْفُوْرِ وَالْجَرَادِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ اَوْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْجَزَاءِ وَاِنْ وَجَدَهُ هِىَ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ مِمَّا يُسَاوِىْ الْجَزَاءَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِاِضَافَةِ كَفَّارَةِ لِمَا بَعْدَهُ وَهِىَ لِلْبَيَانِ اَوْ عَلَيْهِ عَدْلُ مِثْلِ ذٰلِكَ الطَّعَامِ صِيَامًا يَصُوْمُهُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَاِنْ وَجَدَهُ وَجَبَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ لِيَذُوْقَ وَبَالَ ثِقَلِ جَزَاءِ اَمْرِهِ الَّذِىْ فَعَلَهُ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ قَبْلَ تَحْرِيْمِهِ وَمَنْ عَادَ عَلَيْهِ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ ذُوْ انْتِقَامٍ مِمَّنْ عَصَاهُ وَاُلْحِقَ بِقَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا فِيْمَا ذُكِرَ الْخَطَأُ ـ

হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আউফ (রা.) হরিণের ক্ষেত্রে বকরি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ কবুতরের ক্ষেত্রেও তা অর্থাৎ বকরি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কারণ মুখ না ডুবিয়ে পানি পান করার মধ্যে এদের সাদৃশ্য বর্তমান। ওটা কা'বাতে প্রেরিত বা কুরবানিস্বরূপ। هَدْيًا এটা جَزَاءٌ -এর حَالٌ। অর্থাৎ সেটা হরম শরীফে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই এটাকে জবাই করা হবে এবং তথাকার দরিদ্রদের মধ্যে তা সদকা করা হবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে জবাই করলে জায়েজ হবে না। بَالِغَ এটা পূর্ববর্তী শব্দ (هَدْيًا) -এর বিশেষণরূপে مَنْصُوْب [যবরযুক্ত] হয়েছে। এখানে পরবর্তী শব্দ (الْكَعْبَة) -এর দিকে এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ হলেও সেটা لَفْظِى বা শাব্দিক ও বাহ্যিক। সুতরাং ওটা مَعْرِفَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্টবাচক শব্দ বলে বিবেচ্য নয়। সুতরাং هَدْيًا শব্দটি نَكِرَةٌ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট হলেও এটা (بَالِغَ الْكَعْبَةِ) সেটা (هَدْيًا) -এর বিশেষণ হতে পারে। শিকার যদি এমন হয় গৃহপালিত পশুর মধ্যে যার সদৃশ কোনো প্রাণী নেই যেমন– চড়ুই, পতঙ্গ ইত্যাদি হলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অথবা তার উপর ধার্য হবে কাফফারা। ওটা হলো দরিদ্রকে অন্নদান অর্থাৎ বিনিময় মূল্যে যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায় সে পরিমাণ খাদ্য এবং উক্ত শহরের সাধারণ খাদ্য হিসেবে যা প্রচলিত তাই এক একজন দরিদ্রকে এক মুদ [অর্থাৎ প্রায় ১৮ লিটার] পরিমাণে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাদৃশ্য আছে এমন বিনিময় পাওয়া গেলেও এ কাফফারা দেওয়া যেতে পারে। كَفَّارَةٌ অপর এক কেরাতে এটা পরবর্তী শব্দ (طَعَامٌ) -এর প্রতি اِضَافَةٌ অর্থাৎ সম্বন্ধ সহকারে পঠিত রয়েছে। আর এ اِضَافَةٌ টি এখানে بيانية বা বিবরণমূলক। কিংবা তার উপর ধার্য হবে উক্ত খাদ্যের সমপরিমাণ সিয়াম পালন করা। প্রতি মুদ [অর্থাৎ প্রায় ১৮ লিটার] পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে একদিন রোজা রাখবে। দরিদ্রদেরকে অন্নদানের সামর্থ্য থাকলেও সে সিয়াম পালন করতে পারবে। তার উপর কাফফারার এ বিধান ধার্য করা হয়েছে যাতে সে তার কৃত কর্মের কুফল বিনিময়ের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। যা গত হয়েছে অর্থাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যে শিকার করেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেউ ওটা পুনরায় করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী তাঁর বিষয়ে তিনি ক্ষমতাশালী এবং অবাধ্যচারীদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ইচ্ছাকৃত শিকার করার ক্ষেত্রে যেসব বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে ভুল করে শিকার করার ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য হবে।

٩٦. أُحِلَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالًا كُنْتُمْ أَوْ مُحْرِمِيْنَ صَيْدُ الْبَحْرِ أَنْ تَأْكُلُوْهُ وَهُوَ مَا لَا يَعِيْشُ إِلَّا فِيْهِ كَالسَّمَكِ بِخِلَافِ مَا يَعِيْشُ فِيْهِ وَفِي الْبَرِّ كَالسَّرَطَانِ وَطَعَامُهُ مَا يَقْذِفُهُ إِلَى السَّاحِلِ مَيْتًا مَتَاعًا تَمْتِيْعًا لَكُمْ تَأْكُلُوْنَهُ وَلِلسَّيَّارَةِ ج الْمُسَافِرِيْنَ مِنْكُمْ يَتَزَوَّدُوْنَهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ وَهُوَ مَا يَعِيْشُ فِيْهِ مِنَ الْوَحْشِ الْمَأْكُوْلِ أَنْ تَصِيْدُوْهُ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط فَلَوْ صَادَهُ حَلَالٌ فَلِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ـ

৯৬. হে লোক সকল! তোমরা ইহরামরত অবস্থায় হও বা হালাল অবস্থায় তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার অর্থাৎ সেসব প্রাণী পানি ব্যতীত জীবন ধারণ করতে সক্ষম নয় যেমন মৎস্য ও তার খাদ্য অর্থাৎ যা কূলে নিক্ষিপ্ত হয় মৃত অবস্থায় তা ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে। তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমরা তা আহার করবে এবং পর্যটকদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের মুসাফিরের জন্য; তারা এটা পাথেয় হিসেবে নেবে ভোগ উপভোগ্য বস্তু হিসেবে। আর যেসব প্রাণী জল ও স্থল উভয় স্থানেই জীবন ধারণ করতে পারে যেমন কাঁকড়া সেগুলো এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামরত থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার অর্থাৎ আহার করা বৈধ এ ধরনের যেসব বন্য জন্তু স্থলে জীবন ধারণ করে সেগুলো শিকার করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুন্নায় বিবৃত হয়েছে যে, কোনো হালাল ব্যক্তি যদি তা শিকার করে তবে ইহরামরত ব্যক্তির জন্যও তা আহার করা বৈধ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে।

٩٧. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ الْمُحَرَّمَ قِيَمًا لِلنَّاسِ يَقُوْمُ بِهِ أَمْرُ دِيْنِهِمْ بِالْحَجِّ إِلَيْهِ وَدُنْيَاهُمْ بِأَمْنِ دَاخِلِهِ وَعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَجَبْيِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ قِيَمًا بِلَا أَلِفٍ مَصْدَرُ قَامَ غَيْرُ مُعْتَلٍّ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ بِمَعْنَى الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٌ قِيَامًا لَهُمْ بِأَمْنِهِمُ الْقِتَالَ فِيْهَا ـ

৯৭. আল্লাহ তা'আলা বায়তুল হারাম পবিত্র কা'বা ঘর মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটার হজ করার মাধ্যমে তাদের দীন ও ধর্মীয় কল্যাণের আর এতে প্রবেশকারী ব্যক্তির নিরাপত্তালাভ, কোনো বিষয়ে তাকে উত্যক্ত না করার বিধান এবং এখানে যাবতীয় ফল আমদানির ব্যবস্থার মধ্যে তাদের জাগতিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পবিত্র মাস অর্থাৎ জিলকদ, জিলহজ, মহররম, রজব এ নিষিদ্ধ মাসসমূহেও যুদ্ধবিগ্রহ হতে নিরাপদ থাকার দরুন তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

وَالْهَدْىَ وَالْقَلَائِدَ ط قِيَامًا لَهُمْ بِأَمْنِ صَاحِبِهِمَا مِنَ التَّعَرُّضِ لَهُ ذٰلِكَ الْجَعْلُ الْمَذْكُوْرُ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ فَاِنْ جَعَلَهُ ذٰلِكَ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ لَكُمْ اَوْ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْكُمْ قَبْلَ وُقُوْعِهَا دَلِيْلٌ عَلٰى عِلْمِهٖ بِمَا فِى الْوُجُوْدِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ ـ

কুরবানির জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারণ করেছেন। কেননা এর মাধ্যমে মালিকগণ দুষ্কৃতিকারীদের উত্ত্যক্তি হতে নিরাপদ থাকতে পারে। এটা অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে নির্ধারণ এ হেতু যে তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য ও তোমাদের হতে অকল্যাণ দূর করার জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তা'আলা করেছেন, এরূপ কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় সবকিছুই তাঁর জ্ঞান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। قِيَامًا এটা অপর এক কেরাতে قَامَ ক্রিয়ার مَصْدَرْ অর্থাৎ ক্রিয়ামূলরূপে مُعْتَلْ عَيْن হিসেবে اَلِفْ ব্যতীত قِيَمًا আকারে পঠিত রয়েছে।

৯৮. اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِاَعْدَائِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

৯৮. জেনে রাখ, আল্লাহ তাঁর শত্রুদের শাস্তিদানে অতি কঠোর এবং বন্ধুদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও তাদের সম্পর্কে পরম দয়ালু।

৯৯. مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْاِبْلَاغُ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ تُظْهِرُوْنَ مِنَ الْعَمَلِ وَمَا تَكْتُمُوْنَ تُخْفُوْنَ مِنْهُ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

৯৯. প্রচার করাই কেবল অর্থাৎ তোমাদের নিকট কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়াই রাসূলের কর্তব্য। তোমরা যা প্রকাশ কর। অর্থাৎ যেসব কাজ প্রকাশ্যে কর ও গোপন কর অর্থাৎ অপ্রকাশ্যে কর আল্লাহ তা জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেবেন।

১০০. قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ الْحَرَامُ وَالطَّيِّبُ الْحَلَالُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ط فَاتَّقُوا اللّٰهَ تَرْكَهُ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ ـ

১০০. বল, মন্দ অর্থাৎ হারাম এবং ভালো অর্থাৎ হালাল এক নয় যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তি সম্পন্নরা তা বর্জন করত আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত অর্থাৎ সফলকাম হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ بِالْغَيْبِ শব্দটি مَنْ মাওসূল থেকে حَالْ হয়েছে, يَخَافُهُ -এর যমীর থেকে নয়। তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা غَائِبْ হওয়া লাযেম আসবে। غَائِبْ দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আর بِالْغَيْبِ শব্দটি غَائِبًا -এর সাথে, আর لَمْ يَرَهُ শব্দটি بِالْغَيْبِ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ : এখানে فَعَلَيْهِ বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, جَزَاءٌ সর্বদা জুমলা হয়ে থাকে অথচ এখানে জুমলা হয়নি। উত্তরের সারকথা হলো, এখানে জাযাটি হলো عَلَيْهِ جَزَاءٌ বা জুমলা।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهِ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ : প্রশ্ন. ذَوَا عَدْلٍ হলো يَحْكُمُ -এর ফায়েল। অথচ সিফতের ফায়েল হওয়া সহীহ নয়।
উত্তর. يَحْكُمُ -এর ফায়েল উহ্য রয়েছে। তা হলো رَجُلَانِ মাহযূফ মেনে সে জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ মাওসূফ সিফত মিলে يَحْكُمُ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ وَاِنْ وَجَدَهُ اَىِ الْجَزَاءَ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَوْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ -এর মাঝে اَوْ টি تَخْيِيْر -এর জন্য تَرْتِيْب -এর জন্য নয়।

قَوْلُهُ وَهِىَ لِلْبَيَانِ : অর্থাৎ كَفَّارَةٌ শব্দটি طَعَامٌ -এর দিকে ইযাফতের সুরতে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةٌ হবে। যেমন- خَاتَمُ فِضَّةٍ -এর মাঝে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ تَاكُلُوْهُ : صَيْدُ الْبَحْرِ -এর তাফসীর تَاكُلُوْهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَيْد দ্বারা উদ্দেশ্য শিকারি জন্তু। শিকার কর্মটি নয়। কেননা তার সাথে اَكْل শব্দ উহ্য ধরা জরুরি। কেননা কোনো প্রাণী নিজের জাতের দিক দিয়ে حِلَّتْ এবং حُرْمَتْ -এর গুণে গুণান্বিত হয় না; বরং حِلَّتْ وَحُرْمَتْ فِعْل -এর সাথে مُتَّصِفْ হয়। এ কারণেই মুফাসসির (র.) تَاكُلُوْا শব্দটি উহ্য ধরেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ تَصِيْدُوْهُ : এতেও একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَفْس صَيْد বা শুধুমাত্র صَيْد -এর حِلَّتْ এবং حُرْمَتْ -এর কোনো মর্ম নেই; বরং فِعْل صَيْد হলো হারাম।

قَوْلُهُ يَقُوْمُ بِهِ : মুফাসসির (র.) قِيَامًا -এর তাফসীর يَقُوْمُ بِهِ -এর দ্বারা করে এ আপত্তির জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, قِيَامًا -এর حَمْل - كَعْبَةَ الْبَيْتِ -এর উপর সঠিক নয়।

قَوْلُهُ عَيْنُهُ مُعْتَلٌ : অর্থাৎ قِيَامًا মূলত قِوَامًا ছিল। কাসরার পর وَاوْ হওয়ার কারণে তা يَاءْ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ الْاَشْهُرَ الْحُرُمَ : وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর তাফসীর اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর اَلِفْ لَامْ টি جِنْس -এর জন্য এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ الخ : শানে নুযূল : বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, মদ হারাম করার আয়াত নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরামে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যারা নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার আগে মদ পান করেছেন এবং সে অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছেন তাদের কি অবস্থা হবে? উহুদের যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবী মদপান করার পর শরিক হয়েছিলেন এবং পেটে মদ থাকা অবস্থায়ই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২২৭]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ الخ : ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : পূর্বের রুকূতে উত্তম বস্তু নিষিদ্ধকরণ ও সীমালঙ্ঘন হতে বিরত থাকার আদেশ দানের পর এমন কতিপয় বস্তু পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা স্থায়ীভাবে হারাম। এ রুকূতে স্থায়ীভাবে হারাম নয় এমন কিছু জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এগুলোর নিষিদ্ধতা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সীমিত, যেমন ইহরাম অবস্থায় শিকার করা। বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুগত বান্দাদের জন্য এটা একটা পরীক্ষা যে, ইহরাম অবস্থায় যখন শিকার জন্তু তার সামনে থাকে এবং অতি সহজেই সে তা ধরতে বা মারতে পারে, তখন এমন কে আছে, যে আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে ও তাঁর আদেশ পালনে রত হয় এবং সীমালঙ্ঘন তথা আদেশ অমান্য করার শাস্তিকে প্রচণ্ড ভয় করে। 'আসহাবুস সাবত' [শনিবার সংশ্লিষ্ট জাতি]-এর ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু শনিবারের মাঠ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রতারণা ও ছলচাতুরীর সঙ্গে সে আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চরম লাঞ্ছনাকর শাস্তি নাজিল করেন। অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীরও খানিকটা পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। হুদাইবিয়ায় যখন এ আদেশ নাজিল হয়, তখন ধারে-কাছেই বিপুল পরিমাণ শিকার জন্তু ছিল ইচ্ছা করলেই হাতে ধরা বা শরবিদ্ধ করা যেত। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণ প্রমাণ করে দেখালেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় দুনিয়ার আর কোনো জাতি তাদের সমান কৃতকার্য হতে পারেনি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২২৮]

قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ الخ : জেনেশুনে বধ করার অর্থ নিজের ইহরাম অবস্থা এবং এ অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা মনে থাকা সত্ত্বেও শিকার করা। এখানে শুধু জেনেশুনে শিকার করলে তখনকার বিধান বলা হয়েছে যে, তার সে কাজের বিনিময় দিতে হবে, আর আল্লাহ তা'আলা যে শাস্তি দান করবেন, সে তো স্বতন্ত্র রয়েছেই। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ অর্থাৎ কেউ পুনরাবৃত্তি করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন। আর যদি কেউ ভুলবশত শিকার করে, তবে তারও বদলা একই, তবে আল্লাহ তা'আলা তার শাস্তি মওকুফ করবেন।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৩১]

ইহরাম অবস্থায় শিকারের মাসআলা : হানাফী মাযহাবে মাসআলা হলো, ইহরাম অবস্থায় কেউ শিকার জন্তু ধরলে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। মেরে ফেললে দুজন বিবেচক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং সে মূল্যের গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি কোনো পশু কিনে কা'বার নিকট অর্থাৎ হারাম এলাকার ভিতের নিয়ে জবাই করতে হবে। তার গোশ্‌ত নিজে খাওয়া যাবে না। সে মূল্যের খাদ্যশস্য কিনে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করলেও চলবে কিংবা যতজন দরিদ্রের মাঝে তা বণ্টন করা যেত সে পরিমাণ রোজাও রাখা যেতে পারে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৩২]

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ : অর্থাৎ আদেশ নাজিলের আগে বা প্রাক-ইসলামি যুগে কেউ এ কাজ করে থাকলে তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, অথচ ইসলামের আগেও আরবগণ ইহরাম অবস্থায় শিকার কার্যকে অন্যায় মনে করত, যে হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ অযৌক্তিক ছিল না যে, তোমাদের ধারণায় যে কাজ অপরাধ ছিল তা করলে কেন?

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৩৩]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ : অর্থাৎ কোনো অপরাধী তার হাত থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং ইনসাফ ও সামগ্রিক কল্যাণ দৃষ্টে যে অপরাধ শাস্তিযোগ্য আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৩৪]

قَوْلُهُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ الخ : হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের শিকার অর্থাৎ মাছ হালাল আর সমুদ্রের খাবার অর্থাৎ যে মাছ পানি থেকে আলাদা হয়ে মরে গেছে সে শিকার করেনি তাও হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের উপকারার্থে এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাছে কেউ মনে করে বসে এটা হজের বদৌলতে হালাল হয়েছে, তাই যোগ করে দিয়েছেন অপরাপর মুসাফিরদের জন্যও। মাছ পুকুরে থাকলেও তা সমুদ্রেরই শিকার বলে গণ্য। এ তো ইহরাম অবস্থায় শিকারের বিধান জানা গেল। ইহরাম অবস্থায় লক্ষ্য থাকে মক্কা মুকাররমা। এ নগরী ও এর আশেপাশে সর্বদাই শিকার জন্তু বধ নিষিদ্ধ, এমনকি তাকে তাড়ানো বা ভড়কানোও। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৩৫]

قَوْلُهُ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِلنَّاسِ : **পবিত্র কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য :** কা'বা শরীফ ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠার উপায়। হজ ও ওমরা এমন দুটি ইবাদত যা সরাসরি কা'বার সাথে সম্পৃক্ত। সালাতের জন্যও কা'বার দিকে মুখ করা শর্ত। এভাবে কা'বা মানুষের ধর্মীয় বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার উপায় হলো। তারপর হজ ইত্যাদির মৌসুমে সমগ্র বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিম যখন সেখানে সমবেত হয় তখন নানারকম ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা যে স্থানকে حَرَمًا اٰمِنًا 'নিরাপদ ও পবিত্র স্থান' বানিয়েছেন। ফলে মানুষই নয়, বরং পশুপাখি পর্যন্ত সেখানে নিরাপত্তা লাভ করে। প্রাক-ইসলামি যুগে, যখন রক্তপাত ও হানাহানি একটা মামুলি বিষয় ছিল, তখনও একজন মানুষ সেখানে তার পিতার ঘাতককে পর্যন্ত কিছু বলতে পারত না। বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ এটা দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায় যে, এর তরুলতাহীন প্রান্তরে কোত্থেকে এত বিপুল পরিমাণ পানাহার সামগ্রী ও উৎকৃষ্টমানের ফলমূলের সমাহার ঘটে। এসব কিছুই قِيٰمًا لِلنَّاسِ -এর ফলশ্রুতি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মহান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্বেই এটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্ব মানবতার জন্য সার্বজনীন ও স্থায়ী হেদায়েতের ফল্গুধারা এখান থেকেই উৎসারিত হবে এবং মানব জাতির মহান সংস্কারক দো-জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বাসভূমি হওয়ার মহামর্যাদা বিশ্বজগতের মধ্যে কেবল এখানের পবিত্র মাটিই লাভ করেছে। এসব দিকে লক্ষ্য করেও কা'বাকে قِيٰمًا لِلنَّاسِ

বলা যেতে পারে। কেননা কা'বা বিশ্ব মানবতার জন্য নৈতিক পরিশোধন, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা বিধান ও হেদায়েতের জ্ঞান রশ্মির কেন্দ্রবিন্দু। কোনো জিনিসেরই প্রতিষ্ঠাতার কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া বিদগ্ধ সত্য-সন্ধানীদের মতে قِيَامًا لِلنَّاسِ -এর অর্থ এই যে, কা'বা শরীফের অস্তিত্বই নিখিল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার অসিলা। যতদিন কা'বাগৃহ ও তার মর্যাদা রক্ষাকারীদের অস্তিত্ব থাকবে নিখিল বিশ্বও ততদিন থাকবে অস্তিত্বমান, যেদিন বিশ্বজগতকে ধ্বংস করাই হবে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সেদিন এই 'বায়তুল্লাহ' নামক পবিত্র স্থানকেই সর্বাগ্রে তুলে নেওয়া হবে, যেমন জগৎ সৃজনের সূচনাও হয়েছিল এ গৃহের নির্মাণ দ্বারা। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ মক্কা শরীফে অবস্থিত গৃহকেই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম স্থাপিত করা হয়। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে [যুস-সাবীকাতাইন নামক] এক কৃষ্ণাঙ্গ কা'বাগৃহের পাথর একটি একটি করে উৎপাটিত করবে। বিশ্বজগতকে যতদিন বিদ্যমান রাখা মহান আল্লাহ তা'আলার কাম্য হবে, ততদিন যত বড় শক্তিধরই হোক, কারো পক্ষে কা'বাকে ধ্বংস করার মতো কদর্য অভিপ্রেত চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না। 'আসহাবে ফীল' বা হস্তিবাহিনীর ঘটনা কে না শুনেছে? তারপরও প্রত্যেক যুগে কত জাতি ও কত ব্যক্তি এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে, কিন্তু এটা মহান আল্লাহর সংরক্ষণ ও ইসলামের সত্যতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন যে, বাহ্য কোনো উপকরণ ও ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ সে ইবলিসী দুরভিসন্ধিতে সফলকাম হতে পারেনি এবং হতেও পারবে না। হ্যাঁ, কা'বার ইমারত ধ্বংস করার পথে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, তখন মনে করতে হবে বিশ্ববিনাশের ফরমানও এসে গেছে। দুনিয়ার সরকারগুলোও নিজ রাজধানী ও রাজ প্রাসাদ সংস্কার বা স্থানান্তর করতে চায় তখন সাধারণ শ্রমিক দ্বারাই তা ভেঙ্গে ফেলার কার্যসাধন করা হয়। সম্ভবত ইমাম বুখারী (র.) এ জন্যই بَابُ جَعَلَ كَعْبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ الاية অনুচ্ছেদে 'যুস-সাবীকাতাইন' -এর হাদীস উদ্ধৃত করে قِيَامًا لِلنَّاسِ -এর ঐ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। আমাদের উস্তাদ ও এ তরজমাকারী হযরত শায়খুল হিন্দ (র.) বুখারী শরীফের দরসে এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোদ্দাকথা, আলোচ্য আয়াতে ইহরামকারীর বিধান বর্ণনা করার পর কা'বা শরীফের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা উদ্দেশ্য। তারপর কা'বা ও ইহরামের সামঞ্জস্যে নিষিদ্ধ মাস, হাদী ও কালাইদের কথাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন এ সূরারই শুরুতে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا -এর সাথে غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ الْقَلَائِدَ -কেও যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৬]

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : অর্থাৎ ইহরাম অবস্থা বা কা'বা ইত্যাদির মর্যাদা সম্পর্কে যেসব বিধান দেওয়া হলো, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে মনে রাখবে মহান আল্লাহর শাস্তি **অত্যন্ত কঠিন। আর ভুলে কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে যদি কাফফারা** ইত্যাদি দ্বারা তার প্রতিবিধান করে নাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি **মহান ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।** -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৮]

قَوْلُهُ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ : মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর বিধান ও বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়ে নিজ দায়িত্ব আদায় করেছেন। ফলে বান্দার উপর মহান আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন তোমরা প্রকাশ্য গোপনে যেমন কাজই করবে, তা মহান আল্লাহর সামনে। হিসাব-নিকাশকালে তিনি তার বিন্দুটি পর্যন্ত তোমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৯]

قَوْلُهُ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ : এ রুকূর পূর্বের রুকূতে বলা হয়েছিল, উত্তম ও হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করো না; বরং বিধিসম্মতভাবে তা ভোগ কর। সে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ করার পর মদ প্রভৃতি অপবিত্র ও ঘৃণ্য বস্তুর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়। সে প্রসঙ্গেই ইহরামরত ব্যক্তির শিকারকে হারাম করা হয়েছে। অর্থাৎ মদ, মৃত জন্তু ইত্যাদি যেমন ঘৃণ্য বস্তু ইহরামরত ব্যক্তির শিকারকেও তদ্রূপ মনে কর। ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করার পর এবার সতর্ক করার হয়েছে যে ভালো ও মন্দ বস্তু কখনো এক সমান হতে পারে না। অল্প বস্তু যদি ভালো ও হালাল হয়, তা বিস্তর মন্দ ও হারাম বস্তু অপেক্ষা উত্তম। বুদ্ধিমানের উচিত সর্বদা উত্তম ও হালাল বস্তু গ্রহণ করা; ঘৃণ্য ও হারাম বস্তু যত বেশি মনমুগ্ধকরই হোক না কেন, তার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করা। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪০]

অনুবাদ :

١٠١. وَنَزَلَ لَمَّا اَكْثَرُوْا سُؤَالَهُ ﷺ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ تُظْهَرَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ اَىْ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ تُبْدَ لَكُمْ ط الْمَعْنٰى اِذَا سَاَلْتُمْ عَنْ اَشْيَاءَ فِىْ زَمَنِهِ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ بِاِبْدَائِهَا وَمَتٰى اَبْدَاهَا سَاءَتْكُمْ فَلَا تَسْئَلُوْا عَنْهَا عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط عَنْ مَسْاَلَتِكُمْ فَلَا تَعُوْدُوْا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

১০১. কতিপয় লোক এমন ছিল যারা রাসূল ﷺ -কে অনর্থক অনেক ধরনের প্রশ্ন করতে থাকত। এ সংশ্রবে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে, হে বিশ্বাসীগণ! সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করো না যা উদ্‌ঘাটিত হলে প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে যেহেতু সেটা তোমাদের জন্য কষ্টকর প্রতিপন্ন হবে। কুরআন অবতরণের কালে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর জীবনকালে তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর জীবনকালে আল কুরআন যে সময় অব-তীর্ণ হচ্ছে এমতাবস্থায় যদি কোনো বিষয় উদ্‌ঘাটনের প্রার্থনা তোমরা কর আর তিনি তা উদ্‌ঘাটন করে দেবেন তখন তোমাদের জন্য তা ক্লেশকর হবে। সুতরাং সকল বিষয় সম্পর্কে অনর্থক তোমরা প্রশ্ন করো না। আল্লাহ তা অর্থাৎ তোমাদের এ নানা প্রশ্ন উত্থাপন ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এর আর পুনরাবৃত্তি করো না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

١٠٢. قَدْ سَاَلَهَا اَىِ الْاَشْيَاءَ قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ اَنْبِيَاءَهُمْ فَاُجِيْبُوْا بِبَيَانِ اَحْكَامِهَا ثُمَّ اَصْبَحُوْا صَارُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ بِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ بِهَا.

১০২. তোমাদের পূর্বেও তো এর অর্থাৎ এসব বিষয় সম্পর্কে এক সম্প্রদায় তাদের নবীগণকে প্রশ্ন করেছিল। তাঁরা এসব কিছুর বিধান পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতঃপর এতদনুসারে কাজ করা পরিত্যাগ করত এতদসম্পর্কেও তারা কাফের হয়ে যায়।

١٠٣. مَا جَعَلَ شَرَعَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ كَمَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُوْنَهُ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِىْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلَا يَحْلِبُهَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِىْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَىْءٌ.

১০৩. বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ও হাম এর বিধান আল্লাহ দেননি। জাহিলি যুগের লোকেরা এসব করত। ইমাম বুখারী হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহিলি যুগে যে উষ্ট্রী ও ছাগী ইত্যাদির দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হতো তাকে বহীরা বলা হতো। এরপর কেউই এর দুগ্ধ দোহন করত না। আর কিছু প্রাণী তারা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত। এতে কেউ আর আরোহণ করত না এবং তার দ্বারা কোনো বোঝা বহন করত না। একে তারা সায়িবা বলে অভিহিত করত।

وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تَبْكُرُ فِيْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ بِأُنْثٰى ثُمَّ تُثَنِّىْ بَعْدَهٗ بِأُنْثٰى وَكَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَلَتْ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامُ فَحْلُ الْاِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُوْدَ فَاِذَا قَضٰى ضِرَابَهٗ وَدَعُوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمُّوْهُ الْحَامِيَ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط فِيْ ذٰلِكَ وَنِسْبَتِهٖ اِلَيْهِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّ ذٰلِكَ افْتِرَاءٌ لِاَنَّهُمْ قَلَّدُوْا فِيْهِ اٰبَاءَهُمْ .

ওয়াসীলা বলা হতো ঐসব উষ্ট্রীকে যা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়বারই মাদি বাচ্চা প্রসব করে। এগুলোকেও তারা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত। মাঝে কোনোরূপ নর বাচ্চা না হয়ে পরপর নিরবচ্ছিন্নভাবে যেহেতু মাদি বাচ্চা প্রসব করত সেহেতু তাকে ওয়াসীলা [অর্থাৎ মিলিত] বলা হতো। হাম হচ্ছে পুরুষ উষ্ট্র। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রজননক্রিয়া তার দ্বারা সম্পাদন হলে তাকেও তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত, বোঝা বহন ইত্যাদির কাজে তাকে আর ব্যবহার করা হতো না। তাকে তারা হামীও বলত। এসব বিষয়ে এবং এগুলোকে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণই আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না যে, এটা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ। কারণ তারা এ বিষয়ে পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণ করে মাত্র।

١٠٤. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ اَىْ اِلٰى حُكْمِهٖ مِنْ تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمْتُمْ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط مِنَ الدِّيْنِ وَالشَّرِيْعَةِ قَالَ تَعَالٰى اَحَسْبُهُمْ ذٰلِكَ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ .

১০৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, অর্থাৎ তোমরা নিজেরা যা নিষিদ্ধ করে রেখেছ তা বৈধ করার বিধানের দিকে এস, তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে যাতে পেয়েছি অর্থাৎ যে ধর্ম ও বিধিবিধানে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কী! যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না ও সত্যের দিকে পরিচালিতও ছিল না, তথাপি তোমরা তদ্রূপ ধারণা কর? أ এ প্রশ্নবোধক অক্ষরটি এখানে اِنْكَارٌ অর্থাৎ অস্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٥. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج اَىْ احْفَظُوْهَا وَقُوْمُوْا بِصَلَاحِهَا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط

১০৫. হে বিশ্বাসীগণ! নিজেদের বিষয় নিয়ে তোমরা থাক। অর্থাৎ নিজেদের রক্ষা কর ও তার সংশোধন কল্পে সচেষ্ট হও তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

قِيْلَ الْمُرَادُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ غَيْرُهُمْ لِحَدِيْثِ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِئْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَاْىٍ بِرَاْيِهٖ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হলো কিতাবীদের মধ্যে যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয় তবে এ অবস্থায় কোনো ক্ষতি হবে না। অপরাপর ভাষ্যকারগণ বলেন, কিতাবী বা যারা কিতাবী নয় সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। কেননা হযরত আবূ ছা'লাবা আল খুশানী (রা.) বর্ণনা করেন, এ আয়াতটি সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তখন ইরশাদ করেছিলেন, সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম হতে নিষেধ করতে থাক। যখন দেখবে কৃপণতার আনুগত্য হবে, প্রবৃত্তি অনুসৃত হবে, দুনিয়াদারির প্রাধান্য ঘটবে, প্রত্যেকেই নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে ভাববে তখন তুমি নিজেকে নিয়ে কর্তব্যরত থাকবে। হাকিম প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন এবং তোমাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন।

١٠٦. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اَىْ اَسْبَابُهٗ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ لِيَشْهَدْ وَاِضَافَةُ شَهَادَةٍ لِبَيْنَ عَلَى الْاِتِّسَاعِ وَحِيْنَ بَدْلٌ مِنْ اِذَا اَوْ ظَرْفٌ لِحَضَرَ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اَىْ غَيْرِ مِلَّتِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُوْنَهُمَا تُوْقِفُوْنَهُمَا صِفَةُ اٰخَرٰنِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ اَىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَيُقْسِمٰنِ يَحْلِفَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِيْهِمَا وَيَقُوْلَانِ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ بِاللّٰهِ ثَمَنًا عِوَضًا نَأْخُذُهٗ بَدْلَهٗ مِنَ الدُّنْيَا بِاَنْ نَحْلِفَ بِهٖ اَوْ نَشْهَدَ كَذِبًا لِاَجْلِهٖ ـ

১০৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। মৃত্যুর কারণ ও লক্ষণসমূহ দেখা দেয় তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এ বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ অর্থাৎ বিবরণমূলক বাক্য হলেও এখানে اَمْرٌ বা অনুজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা সাক্ষ্য রাখ। شَهَادَةٌ এখানে اِتِّسَاعٌ অর্থাৎ ব্যাকরণগত সুপ্রশস্ত অবকাশ বিদ্যমান থাকায় তৎপরবর্তী শব্দ بَيْنِكُمْ -এর প্রতি এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ হতে পেরেছে। حِيْنَ এটা পূর্বোল্লিখিত اِذَا -এর بَدْلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। অথবা حَضَرَ ক্রিয়াটির ظَرْفٌ অর্থাৎ কালাধিকরণ পদ। তোমরা পৃথিবীতে পর্যটনরত থাকলে অর্থাৎ সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ব্যতীত অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য লোকদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে অর্থাৎ এ দুজনের বিষয়ে তোমাদের যদি কোনোরূপ দ্বিধা হয় তবে সালাতের পর অর্থাৎ আসরের সালাতের পর তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে, তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে। تَحْبِسُوْنَهُمَا এটা اٰخَرٰنِ -এর صِفَتْ । অনন্তর তারা আল্লাহর নামে কসম করবে, শপথ করবে এবং বলবে আমরা তার অর্থাৎ আল্লাহর নামের কোনো মূল্য নেব না অর্থাৎ এর জন্য মিথ্যা শপথ বা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করত তদস্থলে দুনিয়ার কোনো বিনিময় গ্রহণ করব না।

وَلَوْ كَانَ الْمُقْسَمُ لَهُ أَوِ الْمَشْهُوْدُ لَهُ ذَا قُرْبٰى قَرَابَةٍ مِنَّا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ أَمَرَنَا بِإِقَامَتِهَا إِنَّآ إِذًا إِنْ كَتَمْنَاهَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ.

যদি সে অর্থাৎ যার পক্ষে শপথ করা হচ্ছে বা যার পক্ষে সাক্ষ্য দান করা হচ্ছে সে আমাদের নৈকট্যের অধিকারী আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন তা গোপন করব না। তাহলে অর্থাৎ গোপন করলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

١٠٧. فَإِنْ عُثِرَ اِطَّلَعَ بَعْدَ حَلْفِهِمَا عَلٰٓى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا أَىْ فِعْلًا مَا يُوْجِبُهُ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ كِذْبٍ فِى الشَّهَادَةِ بِأَنْ وُجِدَ عِنْدَهُمَا مَثَلًا مَا اتُّهِمَا بِهِ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا ابْتَاعَاهُ مِنَ الْمَيِّتِ أَوْ أَوْصٰى لَهُمَا بِهِ فَاٰخَرَانِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا فِىْ تَوَجُّهِ الْيَمِيْنِ عَلَيْهِمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْوَصِيَّةُ وَهُمُ الْوَرَثَةُ وَيُبْدَلُ مِنْ اٰخَرَانِ الْأَوْلَيٰنِ بِالْمَيِّتِ أَىِ الْأَقْرَبَانِ إِلَيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الْأَوَّلِيْنَ جَمْعُ أَوَّلٍ صِفَةٌ أَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ عَلٰى خِيَانَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَيَقُوْلَانِ لَشَهَادَتُنَا يَمِيْنُنَا أَحَقُّ أَصْدَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يَمِيْنِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا تَجَاوَزْنَا الْحَقَّ فِى الْيَمِيْنِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

১০৭. যদি উদ্‌ঘাটিত হয় যে, অর্থাৎ তাদের শপথ করার পর একথা প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন পাপে বিজড়িত হয়েছে অর্থাৎ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান বা খেয়ানত ইত্যাদি অবলম্বন করত, পাপযোগ্য কাজ করেছে বলে প্রকাশ পায়। যেমন, তাদের নিকট এমন কিছু আলামত পাওয়া গেল যা দ্বারা তাদেরকে সন্দেহ করা যায় আর তারা দাবি করল যে মৃত ব্যক্তির নিকট হতে তারা তা ক্রয় করে নিয়েছে বা মৃত ব্যক্তি তাদের জন্যই তা অসিয়ত করে দিয়েছে ইত্যাদি। তবে যাদের বিরুদ্ধে অসিয়তের হকদার হওয়ার দাবি উঠেছে তাদের অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের মধ্য হতে উক্ত দুজন সাক্ষীর বিরুদ্ধে কসম দেওয়ার জন্য নিকটতম অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়, اَلْاَوْلَيٰنِ এটা اٰخَرَانِ -এর بَدَلْ। অপর এক কেরাতে এটা اَوَّلْ -এর বহুবচন اَوَّلِيْنَ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা اَلَّذِيْنَ -এর صِفَتْ বা তার بَدَلْ বলে বিবেচ্য হবে। দুজন স্থলবর্তী হবে এবং উক্ত দু-সাক্ষীর খেয়ানত সম্পর্কে আল্লাহর নামে শপথ করবে। বলবে আমাদের সাক্ষ্য অর্থাৎ আমাদের শপথ অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য তাদের শপথ হতে অধিকতর হক অর্থাৎ সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘনকারী নই অর্থাৎ শপথ করার মধ্যে আমরা সত্য লঙ্ঘন করিনি করলে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

তাহকীক ও তারকীব

[illegible]

قَوْلُهُ [illegible] : اَشْيَاءُ মূলত شَيْئَاءُ ছিল। فُعَلَاءُ -এর ওজনে। حَمْرَاءُ -এর মতো। আরবদের নিকট দুই হামযার মধ্যখানে اَلِفْ [illegible] কঠিন। যার কারণে প্রথম হামযাকে [যা লাম কালিমা] قَلْبِ مَكَانِىْ করে شِيْن -এর পূর্বে আনা হয়েছে। এখন তার ওজন لَفْعَاءُ -এর ওজনে اَشْيَاءُ হয়েছে। এখন এটি اَلِفْ تَانِيْث مَمْدُوْدَةٌ -এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়ে গেছে। -[ই'রাবুল কুরআন]

قَوْلُهُ إِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ : এখানে إِنْ হরফে শর্ত। تُسْئَلُوا হলো فِعْل شَرْط তারপর عَنْهَا হলো تَسْئَلُوا -এর مُتَعَلِّق আর هَا যমীর উপরোল্লিখিত أَشْيَاءَ -এর দিকে ফিরেছে। আর حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ হলো تَسْئَلُوا -এর ظَرْف এবং تُبْدَلَكُمْ হলো جَوَابْ شَرْط -

قَوْلُهُ الْمَعْنَى إِذَا سَئَلْتُمْ : এ ইবারতটুকু উল্লেখ করে মুসান্নিফ (র.) একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে দুটি جُمْلَةٌ نَهِيٌّ এবং جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ রয়েছে। جُمْلَةٌ نَهِيٌّ টি আগে এসেছে। অথচ তা উভয়টি জুমলার পরে হওয়ার কথা। আর দুটি جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ -এর মধ্যে প্রথমটি পশ্চাতে আর দ্বিতীয়টি অগ্রে আসা উচিত। এখানে نَهِيٌّ -কে আগে আনা হয়েছে اِهْتِمَام زَجْر -এর কারণে। আর এ تَقْدِيْم ও تَاخِيْر অর্থগতভাবে হয়েছে। কেননা, وَاوْ তারতীবের তাকাজা করে না।

قَوْلُهُ إِذَا سَئَلْتُمْ عَنْ أَشْيَاءَ : এটি দ্বিতীয় জুমলার মর্ম। আর مَتَى اَبْدَاهَا سَائَتْكُمْ হলো প্রথম জুমলার মর্ম।

قَوْلُهُ فَلَا تَسْئَلُوْا عَنْهَا : এটি نَهِيٌّ -এর মর্ম।

قَوْلُهُ إِذَا سَئَلْتُمْ عَنْ أَشْيَاءَ : এটি مُبْتَدَأٌ مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنَى الشَّرْطِ বা এমন মুবতাদা যা শর্তের অর্থ পোষণকারী। আর يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ عَنْ اِبْدَائِهَا হলো তার জাযা।

قَوْلُهُ عَنْ مَسْئَلَتِكُمْ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَنْهَا -এর যমীর مَسْئَلَةٌ -এর দিকে ফিরেছে। আর এটি يَسْئَلُوْنَ থেকে বুঝে আসে।

قَوْلُهُ شَرَعَ : جَعَلَ -এর তাফসীর شَرَعَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, جَعَلَ ফে'লটিতে شَرَعَ -এর অর্থ রয়েছে বিধায় এটি এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী।

قَوْلُهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ : এখানে مِنْ হরফটি অতিরিক্ত। بَحِيْرَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে মাফউলের অর্থে। তার শেষে নিয়মবহির্ভূত تَا যোগ করা হয়েছে। এজন্য যে, তা وَصْفِيَّتْ থেকে اِسْمِيَّتْ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যার কারণে جَامِدْ হয়ে গেছে।

بَحِيْرَةٌ -এর সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের অনেক মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী উক্তি হলো, যদি কোনো উষ্ট্রী পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করত এবং প্রতিবারই বাচ্চাটি নর হতো তাহলে সে উষ্ট্রীর কান ছেদন করে তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। তার উপর আরোহণ করা হারাম মনে করা হতো এবং কেউ প্রাণীটিকে কোথাও পানাহার করতে বাধা দিত না। [ই'রাবুল কুরআন, দারবীশ] তাফসীরে উসমানীতে বলা হয়েছে– ওই পশু যার দুধ তারা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত, নিজেরা ব্যবহার করত না।

–[তাফসীরে উসমানী : ২/৫৮৮]

قَوْلُهُ سَائِبَةٌ : এটি سَابَ يَسِيْبُ [মুক্ত করা] থেকে اِسْمُ فَاعِلْ -এর সীগাহ। তার ধরন এই ছিল যে, জাহিলি যুগে এভাবে মানত করা হতো যে, যদি আমি অমুক সফর থেকে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারি কিংবা রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে পারি তাহলে আমার উষ্ট্রীটি মুক্ত করে দেব। এভাবে ছেড়ে দেওয়া উষ্ট্রীকে سَائِبَةٌ বলা হতো। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ الْبِكْرُ : [ب ও ك বর্ণে যবর দিয়ে] যুবতী উষ্ট্রী। تَبْكُرُ فِيْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ بِالْاُنْثٰى اَيْ تَلِدُ فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ بِالْاُنْثٰى ঐ যুবতী উষ্ট্রী যা প্রথম বাচ্চা নর প্রসব করেছে।

قَوْلُهُ وَصِيْلَةٌ : ঐ যুবতী উষ্ট্রী যার প্রথম বাচ্চা মাদি হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাচ্চাও মাদি হয়েছে। যেহেতু সে ক্রমান্বয়ে দুটি মাদি বাচ্চা প্রসব করেছে তাই তাকে وَصِيْلَةٌ বলা হতো। এরূপ উষ্ট্রীকে আরবে মূর্তির নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার থেকে কোনো খেদমত নেওয়া হতো না।

قَوْلُهُ حَامٍ : حَمٰى يَحْمِىْ حَمْيًا وَحِمْيَةً [বারণ করা] থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। কেউ কেউ বলেন, حَامْ বলা হয় ঐ উষ্ট্রীকে যার গর্ভ থেকে দশটি বাচ্চা হয়েছে। যেন তার পিঠ পরিবহন থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।

اَىْ لَا يُرْكَبُ وَلَا يُحْمَلُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَاءٍ وَلَا مَرْعًى

তাফসীরে উসমানীতে রয়েছে– এমন নর উট, যা সুনির্ধারিত সংখ্যায় সংগম করেছে। একেও তারা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত।

قَوْلُهُ وَاِضَافَةُ شَهَادَةِ لِبَيْنَ عَلَى الْاِتِّسَاعِ : অর্থাৎ যরফকে فَاعِلٌ -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে اِتِّسَاعٌ বা আরবি ব্যকরণের অবকাশ থাকার কারণে। তাই এ আপত্তি করা যাবে না যে, মাসদার **ইযাফত হয় ফয়েল** কিংবা মাফউলের দিকে এখানে ব্যতিক্রম করা হলো কেন?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ : পূর্ববর্তী রুকূর সারকথা ছিল দীনি **বিধানে** বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য হতে বাধা দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তা নিজের উপর **হারাম সাব্যস্ত করো না**। আর যেসব বস্তু ঘৃণ্য ও হারাম, তা হারাম স্থায়ীভাবেই হোক, কিংবা বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ সময়ে তা থেকে **সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক**। এ আয়াতসমূহে সতর্ক করা হয়েছে যে, শরিয়ত যা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেনি, সে সম্পর্কে অনর্থক ও **নিষ্প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করো না**। বৈধাবৈধকরণ সম্পর্কে বিধানদাতার স্পষ্ট উক্তি যেমন হেদায়েত ও ব্যুৎপত্তির অসিলা, তেমনি তার নীরবতাও **রহমত** ও সুবিধার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার জ্ঞান ও **প্রজ্ঞাক্রমে যে বস্তু বৈধ বা অবৈধ করেছেন** তা চিরদিনের **জন্য বৈধ বা অবৈধ** হয়ে গেছে আর যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন **তার মাঝে সুযোগ ও প্রশস্ততা রয়ে গেছে। মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরাম** তাকে ইজতিহাদ **করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা তা করা, না করার** ব্যাপারে আজাদ রয়ে গেছি। **এখন যদি এরূপ বিষয়ে অনর্থক** খোঁড়াখুঁড়ি ও **প্রশ্নোত্তরের দরজা খুলে দেওয়া হয়, আর এদিকে কুরআন** মাজীদও অবতরণমান এবং বিধান প্রদানের দ্বারও উন্মোচিত, তাহলে **যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে প্রশ্নের উত্তরে** এমন কোনো বিধান নাজিল করা হবে যারপর যদ্দরুন তোমাদের এ স্বাধীনতা এবং ইজতিহাদের সুযোগ আর থাকবে না। তখন যে জিনিস নিজেরা চেয়ে এনেছ, তা যদি পালন করতে না পার, তবে লজ্জার শেষ থাকবে না। মহান আল্লাহ তা'আলার চিরায়ত নীতি এরূপই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিষয়ে যখন অতিরিক্ত প্রশ্ন ও খোঁড়াখুঁড়ি করা হয় এবং অর্থহীন সম্ভাবনা ও ফাঁকফোকড় বের করা হয়, তখন ওদিক থেকে কঠোরতাও বৃদ্ধি পায়। কেননা এরূপ প্রশ্নমালা দ্বারা এটাই ফুটে উঠে যে, প্রশ্নকর্তাদের নিজেদের উপর আস্থা আছে যে বিধানই দেওয়া হবে, তা পালনের জন্য তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত। বান্দার নিকট দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা দৃষ্টে এরূপ দাবি কখনই সমীচীন নয়। তথাপি এ দাবির কারণে সে এর উপযুক্ত হয়ে যায় যে, উপর থেকে বিধানের কিছুটা কঠোরতা আরোপ করা হবে এবং সে নিজেকে যতটা যোগ্য জাহির করবে সে অনুযায়ী পরীক্ষাও ততটা কঠিন করে দেওয়া হবে। কাজেই গরু জবাই সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের ঘটনায় এমনই হয়েছিল।

হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, হে মানুষ! মহান আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! প্রতি বছর? তিনি বললেন, আমি হ্যাঁ বললে প্রতি বছরই ফরজ হয়ে যেত, কিন্তু তখন তোমাদের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হতো না। আমি যে বিষয়ে তোমাদের স্বাধীন ছেড়ে দেই, তোমরাও সে বিষয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। আরেক হাদীসে ইরশাদ করেন, মুসলিমগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি বড়ই অপরাধী যার প্রশ্নের কারণে এমন জিনিস হারাম হয়ে যায় যা পূর্বে হারাম ছিল না। মোদ্দাকথা, এ আয়াত শরয়ী বিধানাবলি সম্পর্কে এরূপ অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিজ্ঞাসাপত্রের দ্বার রুদ্ধ করে। **বাকি যেসব** হাদীসে আছে, কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর কাছে খুঁটিনাটি বিষয়ে অর্থহীন প্রশ্ন করত এবং তাদেরকে তা **থেকে নিবৃত্ত করা** হয়, সেসব হাদীস আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থি নয়।

আমরা لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ -এর اَشْيَاءَ শব্দকে ব্যাপক মনে করি, যা বিধিবিধান ও ঘটনাবলি উভয়কে শামিল করে। অনুরূপ تَسُؤْكُمْ [illegible] **এটাও** ব্যাপক অর্থ সংবলিত। অর্থ হবে এই যে, বিধিবিধান ও ঘটনাবলি কোনো বিষয়েই তোমরা অনর্থক প্রশ্ন **করবে না।** [illegible] **যে** জবাব দেওয়া হবে, তা তোমাদের ভালো লাগবে না। যেমন কোনো কঠিন বিধান আসল, কিংবা **কোনো শর্ত বৃদ্ধি করা হলো, অথবা** এমন কোনো ঘটনা প্রকাশ পেল যা দ্বারা তোমাদের তিরস্কার করা হলো। এসবই تَسُؤْكُمْ -এর **অন্তর্ভুক্ত। বাকি প্রয়োজনীয় বিষয়ে** জিজ্ঞাসা করা বা কোনো প্রমাণভিত্তিক সন্দেহ নিরসনার্থে প্রশ্ন করা দূষণীয় নয়।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৪১]

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا : এর অর্থ হয়তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা সেসব বিষয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি যখন যে বিষয়ে কোনো বিধান দেননি, তখন মানুষ সে সম্পর্কে স্বাধীন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে কোনো ধরপাকড় করবেন না। উসূলে ফিকহের কোনো কোনো ইমাম এরই থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, সবকিছু মূলত বৈধ। অথবা এর অর্থ তোমরা পূর্বে এরূপ অর্থহীন যত প্রশ্ন করেছ তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে সতর্ক থেক। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪২]

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ : এক তো এগুলো ছিল শিরকের নিদর্শন। সেই সঙ্গে যেই পশুর গোশ্‌ত বা দুধ কিংবা যাকে সওয়ারি ইত্যাদির কাজে লাগানো আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন তার বৈধাবৈধের বিষয়ে নিজেদের পক্ষ হতে শর্তারোপ করা যেন নিজেদেরকে বিধানদাতার সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করারই নামান্তর। এর উপরও বড় জুলুমের কথা ছিল এই যে, নিজেদের এ অংশীবাদীমূলক রসম-রেওয়াজকে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করত। এরই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এসব কুসংস্কার কখনই মহান আল্লাহ তা'আলা স্থির করেননি। তাদের পূর্বপুরুষেরা মহান আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করেছিল। সেটাকেই অধিকাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীন আম লোকে কবুল করে নেয়। মোটকথা এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, নিষ্প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে শরয়ী বিধানকে কঠিন করে তোলা যেমন গুরুতর অপরাধ, তার চেয়ে শতগুণ বড় অপরাধ বিধানদাতার আদেশ ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কোনো জিনিসের বৈধাবৈধ নিরূপণ করা। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪৪]

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ الخ : অজ্ঞ লোকদের সবচেয়ে বড় দলিল এটাই হয়ে থাকে যে, যে কাজ বাপদাদার আমল হতে চলে আসছে তার বিপরীত কীরূপে করা যায়? তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে যদি ধ্বংস গহ্বরে গিয়ে পতিত হয়, তবু কি তোমরা তাদেরই পথে চলবে? হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বাপের সম্পর্কে যদি জানা থাকে সে হকপন্থি ও ইলমের অধিকারী ছিল, তবে তার পথ অনুসরণ করবে, অন্যথায় সেটা পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ কারো অন্ধ অনুসরণ তা যেমনই হোক এটা কখনই জায়েজ নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪৫]

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ الخ : অর্থাৎ এত কিছু উপদেশ আদেশ সত্ত্বেও কাফেররা যদি অংশিবাদীমূলক রুসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তোমরা বেশি দুঃখ করো না। কারো পথভ্রষ্টতা দ্বারা তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা সরল পথে থাক। সরল পথ তো এটাই যে, মানুষ ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করবে, নিজে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকবে অন্যকেও বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তবু যদি তারা বিরত না হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা বোঝা নিতান্তই ভুল যে, এক ব্যক্তি যদি নিজের নামাজ-রোজা ঠিক রাখে, তবে আমর বিল মা'রূফ না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। اِهْتِدَاءٌ [সরল পথে থাকা] শব্দের মাঝে সৎকাজের আদেশসহ যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য শামিল। এ আয়াতে বক্তব্যের লক্ষ্য যদিও বাহ্যত মুসলিমগণের দিকে, কিন্তু এর দ্বারা সেসব কাফেরদেরও সতর্ক করা উদ্দেশ্য যারা বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ তোমাদের বাপ-দাদা যদি সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে থাকে, তবে জেনেশুনে তাদের অনুসরণে তোমরা কেন নিজেদের ধ্বংস করছ? তাদের ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা কর। লাভ-লোকসান বুঝতে চেষ্টা কর। বাপ-দাদা যদি পথভ্রষ্ট হয় এবং তাদের সন্তানবর্গ তাদের বিপরীতে সৎপথপ্রাপ্ত হয় তবে পূর্বপুরুষের এ বিরোধিতা তাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকারক হবে না। কোনো অবস্থাতেই বাপ-দাদার পথের বাইরে পা রাখা যাবে না, রাখলে নাক কাটা যাবে এটা একটা অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। বুদ্ধিমানের উচিত নিজ পরিণাম চিন্তা করা। পূর্বাপরের সকলেই যখন মহান আল্লাহর সামনে একত্র হবে তখন প্রত্যেকেই নিজ কর্ম ও পরিণতি দেখতে পাবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪৬]

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট; অন্যরা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থি। সেসব আয়াত সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি সৎকাজে আদেশ দান -এর পরিপন্থি নয়। তোমরা যদি

সৎকাজে আদেশ দান পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তাফসীর বাহরে মুহীতে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে- তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জিহাদ এবং সৎকাজে আদেশ দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। কুরআনের إِذَا اهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ দানের কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। -[মা'আরিফ- ৩/২৩০]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ শানে নুযূল : এ আয়াতসমূহের শানে নুযূল এই যে, বুদাইল নামক এক মুসলিম তামীম ও আদী নামক দুজন খ্রিস্টানের সাথে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া যায়। সেখানে পৌঁছার পর বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে তার অর্থ- সম্পত্তির একটি তালিকা লিখে মালামালের মধ্যে রেখে দেয়। সঙ্গীদ্বয়কে সে এর কিছুই অবগত করেনি। রোগ যখন তীব্রাকার ধারণ করে তখন সে সঙ্গীদ্বয়কে বলল, আমার যাবতীয় মালামাল ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দিও। তারা সে মতে সব মাল এনে ওয়ারিশদের নিকট হস্তান্তর করল। কিন্তু সোনার কারুকাজ করা একটি রূপার পেয়ালা তারা সরিয়ে রাখল। মালামালের মধ্যে ওয়ারিশরা উপরিউক্ত তালিকাটি পেয়ে গেল। তারা অছিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করল, মৃত ব্যক্তি কি তার কোনো মাল বিক্রয় করেছে কিংবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু ব্যয় হয়ে গেছে কি? তারা নেতিবাচক উত্তর দিল। শেষ পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট মামলা রুজু হলো। ওয়ারিশদের কিছু সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় অছিদ্বয় হতে এই মর্মে শপথ নেওয়া হলো যে, তারা মৃত ব্যক্তির মালামালে কোনো প্রকার খেয়ানত করেনি এবং তারা কোনো কিছু লুকায়নি। শপথের ভিত্তিতে তাদের পক্ষেই রায় দেওয়া হলো। কিছুদিন পর তথ্য পাওয়া গেল তারা মক্কা শরীফের জনৈক স্বর্ণকারের কাছে পেয়ালাটি বিক্রয় করে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, আমরা মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে এটি কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষী না থাকায় প্রথমে আমরা এর উল্লেখ করিনি, পাছে আমাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়। ওয়ারিশরা পুনরায় নবী করীম ﷺ -এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। এবার পূর্বাবস্থার বিপরীতে অছিদ্বয় ক্রয় সম্পর্কে বাদী এবং ওয়ারিশগণ বিবাদী হলো। সাক্ষী না থাকায় মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম দুজন ওয়ারিশ শপথ করল যে, পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির মালিকানায় ছিল। খ্রিস্টান দুজন মিথ্যা শপথ করেছে। কাজেই যে মূল্যে তারা পেয়ালাটি বিক্রয় করেছিল অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম তা ওয়ারিশদের পরিশোধ করা হলো। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৫৪]

قَوْلُهُ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ : অর্থাৎ সালাতুল আসরের পর। এটা লোক সমাবেশ ও দোয়া কবুলের সময়। হয়তো ভয়ে মিথ্যা শপথ হতে বিরত থাকবে। অথব যে কোনো সালাতান্তে কিংবা অছির ধর্মানুযায়ী সালাতের পর।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৫১]

اَلْمَعْنٰى لِيُشْهِدِ الْمُحْتَضَرُ عَلٰى وَصِيَّتِهٖ اِثْنَيْنِ اَوْ يُوْصِىْ اِلَيْهِمَا مِنْ اَهْلِ دِيْنِهٖ اَوْ غَيْرِهِمْ اِنْ فَقَدَهُمْ لِسَفَرٍ وَنَحْوِهٖ فَاِنِ ارْتَابَ الْوَرَثَةُ فِيْهِمَا فَادَّعَوْا اَنَّهُمَا خَانَا بِاَخْذِ شَيْءٍ اَوْ دَفْعِهٖ اِلٰى شَخْصٍ زَعَمَا اَنَّ الْمَيِّتَ اَوْصٰى لَهٗ فَيَحْلِفَانِ الخ فَاِنِ اطَّلَعَ عَلٰى اَمَارَةِ تَكْذِيْبِهِمَا فَادَّعَيَا دَافِعًا لَهٗ حَلَفَ اَقْرَبُ الْوَرَثَةِ عَلٰى كِذْبِهِمَا وَصِدْقِ مَا ادَّعَوْهُ وَالْحُكْمُ ثَابِتٌ فِى الْوَصِيَّيْنِ مَنْسُوْخٌ فِى الشَّاهِدَيْنِ وَكَذَا شَهَادَةُ غَيْرِ اَهْلِ الْمِلَّةِ مَنْسُوْخَةٌ وَاعْتِبَارُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ لِلتَّغْلِيْظِ وَتَخْصِيْصُ الْحَلْفِ فِى الْاٰيَةِ بِاثْنَيْنِ مِنْ اَقْرَبِ الْوَرَثَةِ لِخُصُوْصِ الْوَاقِعَةِ الَّتِىْ نَزَلَتْ لَهَا وَهِىَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ خَرَجَ مَعَ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ بَدَاءٍ وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ فَمَاتَ السَّهْمِىُّ بِاَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهٖ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَرُفِعَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ فَاَحْلَفَهُمَا ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالَ ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِىٍّ فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الثَّانِيَةُ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ اَوْلِيَاءِ السَّهْمِىِّ فَحَلَفَا .

অনুবাদ :

যাহোক এ আয়াত দুটির মর্ম হলো মরণমুখ ব্যক্তি তার অধর্মাবলম্বী দুব্যক্তিকে বা সফর ইত্যাদির কারণে অধর্মাবলম্বী না পেলে অন্য কোনো ধর্মের দু-ব্যক্তিকে তার এ অসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য রাখবে বা এ দুজনকে অসিয়ত করে যাবে। পরে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের যদি এ দু-ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ হয় এবং দাবি করে যে, এরা এ সামগ্রী হতে কিছু আত্মসাৎ করে নিয়েছে বা অমুক এক ব্যক্তিকে তারা কিছু দিয়ে দিয়েছে যার সম্পর্কে তাদের দুজন বলে যে, মৃত ব্যক্তি তার পক্ষেও অসিয়ত করে গিয়েছে তবে তারা দুজন শপথ করবে। আর উক্ত দু-সাক্ষীর মিথ্যাচারের যদি কোনো আলামত পাওয়া যায় এবং মৃত ব্যক্তি তাদেরকে প্রদান করেছে বলে তারা দাবি করে তবে মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় এদের মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার এবং নিজেদের দাবির সত্যতা সম্পর্কে হলফ করবে। উক্ত বিধানটি অছিদের ক্ষেত্রে এখনও বিদ্যমান তবে সাক্ষীগণ এবং অপর ধর্মাবলম্বীর সাক্ষী গ্রহণের ক্ষেত্রে মানসূখ অর্থাৎ রহিত বলে বিবেচ্য। বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশার্থে আসরের সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঘটনাটির প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল সে ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়াতটিতে মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকট দুজন আত্মীয়দের সাক্ষ্য দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো, ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, সাহম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তামীম আদ্দারী ও আদী ইবনে বাদ্দা নামক দু খ্রিস্টান ব্যক্তির সাথে সফরে যাত্রা করে। পথে ঐ সাহমী ব্যক্তি এমন এক স্থানে মারা যায় যেখানে কোনো মুসলিম ব্যক্তি ছিল না। ঐ দু খ্রিস্টান ব্যক্তি বাড়ি ফিরে সাহমীর আত্মীয়বর্গের নিকট তার দ্রব্যসামগ্রী যা ছিল ফেরত দেয়। কিন্তু সোনার জড়োয়া কাজ করা একটি রৌপ্যের পেয়ালা তাতে না পেয়ে তার আত্মীয়স্বজন রাসূল ﷺ -এর নিকট এ বিষয়টি উত্থাপন করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তদনুসারে তাদেরকে হলফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে মক্কায় এক ব্যক্তির নিকট ঐ পেয়ালাটি পাওয়া যায়। সে বলল, আমি তামীম ও আদীর নিকট হতে এটা ক্রয় করেছি। তখন দ্বিতীয় আয়াতটি নাজিল হয়। তদনুসারে উক্ত মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ দুই আত্মীয় হলফ করে।

وَفِى رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ مِنْهُمْ فَحَلَفَا وَكَانَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ فَمَرِضَ فَاَوْصٰى اِلَيْهِمَا وَاَمَرَهُمَا اَنْ يُّبْلِغَا مَا تَرَكَ اَهْلَهُ فَلَمَّا مَاتَ اَخَذَ الْجَامَ وَدَفَعَا اِلٰى اَهْلِهِ مَا بَقِىَ ـ

তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, আমর ইবনুল আস এবং অপর এক ব্যক্তি হলফ করে। তারা দুজন উক্ত মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় ছিল। **অন্য একটি** বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সাহমী ব্যক্তিটি **রোগাক্রান্ত হয়ে** পড়ে। তখন সে তার সঙ্গী উক্ত **দুজনকে অসিয়ত করে যায়** এবং তার জিনিসপত্র **আত্মীয়স্বজনের নিকট পৌঁছিয়ে** দিতে অনুরোধ করে। **সে মারা গেলে তারা উক্ত রৌপ্যের** পেয়ালাটি গোপন করে বাকি জিনিসপত্র **ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিল**।

١٠٨. ذٰلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ رَدِّ الْيَمِيْنِ عَلَى الْوَرَثَةِ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ يَّاْتُوْا اَىِ الشُّهُوْدُ اَوِ الْاَوْصِيَاءُ بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا الَّذِىْ تَحْمِلُوْهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْفٍ وَلَا خِيَانَةٍ اَوْ اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ يَخَافُوْا **اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط عَلَى الْوَرَثَةِ الْمُدَّعِيْنَ فَيَحْلِفُوْنَ عَلٰى خِيَانَتِهِمْ** وَكِذْبِهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ وَيَغْرَمُوْنَ فَلَا يَكْذِبُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَالْكِذْبِ وَاسْمَعُوْا ط مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهِ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ الْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهِ اِلٰى سَبِيْلِ الْخَيْرِ ـ

১০৮. এটা অর্থাৎ পুনরায় ওয়ারিশানের **হলফ** নেওয়ার উল্লিখিত বিধান তাদের অর্থাৎ সাক্ষীগণ কিংবা অছিগণের যথাযথ সাক্ষ্য দানের অর্থাৎ যে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করছে তাতে কোনোরূপ বিকৃতি বা খেয়ানত প্রদর্শন না করত যথাযথভাবে তা বহন **করার** ও তা প্রদানের এবং শপথের পর পুনরায় **বাদীপক্ষ ওয়ারিশানের** শপথ নেওয়া হবে এ ভয়ের **অধিকতর সম্ভাবনা**। অর্থাৎ তারা এদের খেয়ানত ও মিথ্যাচার সম্পর্কে শপথ করবে। এতে তারা অপমানিত হবে এ ভয়ে তারা মিথ্যা না বলার অধিক সম্ভাবনা। খেয়ানত ও মিথ্যাচার বর্জন করত আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি যার নির্দেশ করেন তা শোনার মতো শোন! আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ যারা তাঁর আনুগত্যের গণ্ডি হতে বের হয়ে গিয়েছে তাদেরকে সৎপথে **মঙ্গল ও কল্যাণের পথে** পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى : অর্থাৎ শেষে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মর্ম।

قَوْلُهُ لِيَشْهَدَ الْمُحْتَضَرَ : এ ইবারতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি اَمْرٌ বা নির্দেশজ্ঞাপক। অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির উচিত নিজের অসিয়তের উপর দুজনের সাক্ষী রাখা।

قَوْلُهُ اَوْ يُوْصِىْ اِلَيْهِمَا : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতের দুটি তাফসীর রয়েছে। তাফসীরে **খাজিনের** ইবারত এই- وَاخْتَلَفُوْا فِىْ هٰذَيْنِ الْاِثْنَيْنِ فَقِيْلَ هُمَا الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلٰى وَصِيَّةِ الْوَصِىِّ وَقِيْلَ هُمَا وَصِيَّانِ لِاَنَّ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمَا وَلِاَنَّهُ تَعَالٰى قَالَ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ وَالشَّاهِدُ لَا يُلْزَمُهُ الْيَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে? কেউ বলেন, اِثْنَيْنِ দ্বারা ঐ দুই সাক্ষী উদ্দেশ্য, যাকে অসিয়তকারী **মৃত্যুর** সময় সাক্ষী রেখে গেছে। কেউ বলেন, যার ব্যাপারে অসিয়ত করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য। কেননা উক্ত ঘটনা এদের **ব্যাপারেই** ঘটেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, সাক্ষীদের উপর তো কসম আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় সুরতে شَهَادَةُ অর্থ হবে উপস্থিত থাকা। **যেমন বলা হয়**- شَهِدْتُّ وَصِيَّةَ فُلَانٍ اَىْ حَضَرْتُهَا

قَوْلُهُ اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ : اَوْ يَخَافُوْا পূর্বোল্লিখিত اَدْنٰى -এর সাথে এর عَطْف হয়েছে এটা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তাফসীরে ... -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٠٩. اُذْكُرْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهِمْ مَاذَا اَىِ الَّذِىْ اُجِبْتُمْ ط بِهٖ حِيْنَ دَعَوْتُمْ اِلَى التَّوْحِيْدِ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ط بِذٰلِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ وَذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمُهُ لِشِدَّةِ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَفَزَعِهِمْ ثُمَّ يَشْهَدُوْنَ عَلٰى اُمَمِهِمْ لَمَّا يَسْكُنُوْنَ .

১০৯. স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করবেন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এবং তারা যে জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনা করে জিজ্ঞাসা করবেন, যখন তোমরা তাওহীদের দিকে ডাক দিলে তখন তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে? مَاذَا -এর ذَا টি اَلَّذِىْ [যা اِسْمُ مَوْصُوْل অর্থাৎ সংযোজক সর্বনাম] অর্থে ব্যবহৃত, এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে اَلَّذِىْ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, এতদসম্পর্কে আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে অর্থাৎ বান্দা হতে যা গায়েব এতদসম্পর্কে অবহিত। প্রথমে কিয়ামতের মারাত্মক বিভীষিকা দর্শনে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার দরুন তারা এ সম্পর্কে ভুলে যাবেন। পরে যখন আত্মস্থ হবেন এবং তাদের স্বস্তি ফিরে আসবে তখন অবশ্য তারা স্ব-স্ব উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন।

١١٠. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ م بِشُكْرِهَا اِذْ اَيَّدْتُّكَ قَوَّيْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ن جِبْرَئِيْلَ تُكَلِّمُ النَّاسَ حَالٌ مِنَ الْكَافِ فِىْ اَيَّدْتُّكَ فِى الْمَهْدِ اَىْ طِفْلًا وَّكَهْلًا ج يُفِيْدُ نُزُوْلَهُ قَبْلَ السَّاعَةِ لِاَنَّهُ رُفِعَ قَبْلَ الْكُهُوْلَةِ كَمَا سَبَقَ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ كَصُوْرَةِ الطَّيْرِ وَالْكَافُ اِسْمٌ بِمَعْنٰى مِثْلِ مَفْعُوْلٌ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ بِاِرَادَتِىْ .

১১০. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত স্মরণ কর; পবিত্র আত্মা দ্বারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দ্বারা আমি তোমাকে সমর্থন জুগিয়েছিলাম, শক্তিশালী করেছিলাম। দোলনায় থাকা অবস্থায় অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে। تُكَلِّمُ النَّاسَ এটা اَيَّدْتُّكَ -এর كَ [অর্থ- তুমি] -এর حَالٌ । এ বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় তাঁর আগমন হবে। কেননা, সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ হয়েছে যে, বৃদ্ধাবস্থায় পৌছার পূর্বেই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কাদা-মাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ রূপ আকৃতি গঠন করতে كَهَيْئَةِ -এর كَ টি এখানে مِثْل [অর্থ- মতো] অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় اِسْم অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে গণ্য। এটা এখানে مَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মকারক। এবং তাতে ফুৎকার দিতে ফলে আমার অনুমতিক্রমে আমার অভিপ্রায়ে তা পাখি হয়ে যেত।

وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى مِنْ قُبُوْرِهِمْ اَحْيَاءً بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ حِيْنَ هَمُّوْا بِقَتْلِكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ مَا هٰذَآ الَّذِيْ جِئْتَ بِهِ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ اَيْ عِيْسٰى ـ

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করত কবর হতে বের করতে; আমি তোমা হতে বনী ইসরাঈলকে যখন তারা তোমাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল তখন নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ অর্থাৎ মু'জিযাসহ এসেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বলেছি; এটা অর্থাৎ তুমি যা নিয়ে এসেছ তা তো স্পষ্ট জাদু। سِحْرٌ এটা অপর এক কেরাতে سَاحِرٌ [জাদুকর অর্থে ব্যবহৃত।] এমতাবস্থায় এটা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে।

١١١. وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَمَرْتُهُمْ عَلٰى لِسَانِهِ اَنْ اَيْ بِاَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ج عِيْسٰى قَالُوْآ اٰمَنَّا بِهِمَا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ـ

১১১. যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ওহী করেছিলাম, অর্থাৎ তারা ঈসার জবানিতে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূল ঈসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তখন তারা বলেছিল আমরা তোমাদের উভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসমর্পণকারী। اَنْ এটা এখানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٢. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ اَيْ يَفْعَلُ رَبُّكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَنَصْبِ مَا بَعْدَهُ اَيْ تَقْدِرُ اَنْ تَسْاَلَهُ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط قَالَ لَهُمْ عِيْسٰى اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ اِقْتِرَاحِ الْاٰيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

১১২. স্মরণ কর হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি এতে সক্ষম يَسْتَطِيْعُ এটা অপর এক কেরাতে ت [অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে] সহযোগে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পরবর্তী শব্দ [رَبَّكَ] مَنْصُوْبٌ [ফাতাহযুক্ত] পঠিত হবে। মর্ম হবে– হে ঈসা! তুমি কি এ বিষয়ে তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাতে পার? আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে? অর্থাৎ তিনি কি এটা করবেন? ঈসা তাদেরকে বলেছিল এ ধরনের আলৌকিক নিদর্শন তলব করা সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

١١٣. قَالُوْا نُرِيْدُ سُؤَالَهَا مِنْ اَجْلِ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ تَسْكُنَ قُلُوْبُنَا بِزِيَادَةِ الْيَقِيْنِ وَنَعْلَمَ نَزْدَادَ عِلْمًا اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اَنَّكَ قَدْ صَدَقْتَنَا فِيْ اِدِّعَاءِ النُّبُوَّةِ وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

১১৩. তারা বলেছিল যে, আমরা এ জন্য তার প্রার্থনা করি চাই যে, তার কিছু আহার করব এবং এতে প্রত্যয়ের প্রবৃদ্ধিতে আমাদের চিত্তপ্রশান্তি ঘটবে, আমাদের শান্তি লাভ হবে। আমরা জানতে পারব অর্থাৎ এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে যে তুমি নবুয়ত দাবির বিষয়ে আমাদের সাথে সত্য বলেছ এবং আমরা হব তার সাক্ষী। اَنْ قَدْ এটা اَنْ শব্দটি এখানে مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ রূঢ়রূপ [তাশদীদসহরূপ] হতে পরিবর্তিত হয়ে مُخَفَّفَةٌ বা লঘুরূপে [তাশদীদহীন রূপে] ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٤. قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا اَىْ يَوْمَ نُزُوْلِهَا عِيْدًا نُعَظِّمُهُ وَنُشَرِّفُهُ لِّاَوَّلِنَا بَدَلٌ مِنْ لَنَا بِاِعَادَةِ الْجَارِ وَاٰخِرِنَا مِمَّنْ يَّأْتِىْ بَعْدَنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ج عَلٰى قُدْرَتِكَ وَنُبُوَّتِىْ وَارْزُقْنَا اِيَّاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ .

১১৪. মরিয়াম তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর। এটা অর্থাৎ এটা অবতরণের দিনে আমাদের যারা প্রথমে ও যারা পরে অর্থাৎ বর্তমানে যারা আছে ও পরে যারা আসবে সকলের জন্য হবে আনন্দ উৎসব। অর্থাৎ এটাকে আমরা সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করব। لِّاَوَّلِنَا এতে লাম حَرْف جَارّ -এর পুনরাবৃত্তিসহ এটা لَنَا -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তোমরা হরফ হতে তোমার কুদরত ও আমার নবুয়তের নিদর্শনস্বরূপ এবং তা দ্বারা আমাদেরকে জীবিকা দান কর; আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

١١٥. قَالَ اللّٰهُ مُسْتَجِيْبًا لَهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْكُمْ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ نُزُوْلِهَا مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ فَنَزَلَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهَا سَبْعَةُ اَرْغِفَةٍ وَسَبْعَةُ اَحْوَاتٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا حَتّٰى شَبِعُوْا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) وَفِىْ حَدِيْثٍ اُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا فَاُمِرُوْا اَنْ لَّا يَخُوْنُوْا وَلَا يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا فَرُفِعَتْ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ .

১১৫. আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করত বললেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব। مُنَزِّلُهَا এটা তাশদীদহীন ও তাশদীদসহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কিন্তু এরপর অর্থাৎ এটা প্রেরণের পর তোমাদের মধ্যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দেব না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অনন্তর আকাশ হতে ফেরেশতাগণ খাঞ্চাসহ অবতরণ করেন। তাতে ছিল সাতটি রুটি ও সাতটি মৎস্য। তারা তা পরম পরিতৃপ্তির সাথে আহর করল। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, রুটি ও গোশ্তসহ আকাশ হতে খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদেরকে এতে খেয়ানত করতে এবং আগামীর জন্য সঞ্চয় করে রাখতে নিষেধ করল এবং আগামীর জন্যও সঞ্চয় করে রাখল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তা উঠিয়ে নিলেন। আর এরা আজাবস্বরূপ বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهِمْ : এ ইবারতটি একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব। **প্রশ্ন.** আল্লাহ তা'আলা তো হলেন عَلَّامُ الْغُيُوْبِ সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তাঁর তো কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। তারপরও তিনি কেন প্রশ্ন করলেন?

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেননি; বরং ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে করেছেন। যেমনটি وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -এর মাঝে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىِ الَّذِىْ : এটিও একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব। **প্রশ্ন.** إذْ ইসমুল ইশারা مَحْسُوسْ বা অনুভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তার مُشَارٌ اِلَيْهِ টি غَيْر مَحْسُوسِىْ বিষয়ের জবাব হয়েছে। **উত্তর.** এখানে إذْ ইসমুল ইশারাটি اَلَّذِىْ তথা اِسْمِ مَوْصُوْل -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمُهُ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। **প্রশ্ন.** আম্বিয়া (আ.)-এর তাওহীদের দাওয়াতে উম্মতেরা দুনিয়াতে কি জবাব দিয়েছিল তা তো তাদের জানা থাকা উচিত ছিল। তারপরও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে তাঁরা কেন বলবেন, আমাদের জানা ছিল না যে, উম্মত আমাদের কি জবাব দিয়েছিল। এর দ্বারা তো মিথ্যা বলা লাযেম আসে, যা নবীদের শানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাও কি আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে।

উত্তর. জানার অস্বীকার করাটা তাদের মিথ্যার কারণে নয়; বরং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কারণে হবে। কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের উপর এমন ভীতির সঞ্চার হবে যে, নবীরা পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এ জবাবটি দুর্বল জবাব। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) উক্ত আপত্তির জবাবে বলেছেন, নবীদের উক্ত জবাব আল্লাহর আদব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য হবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ -এর প্রশ্নের জবাবে বলতে اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অথচ অনেক বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান থাকত।

قَوْلُهُ طِفْلًا : فِى الْمَهْدِ -এর ব্যাখ্যায় طِفْلًا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَهْد দ্বারা শিশুকাল উদ্দেশ্য। সরাসরি কোল উদ্দেশ্য নয়। কেননা আয়াতে مَهْد -এর মোকাবিলায় كَهْلًا শব্দ এসেছে। এখানে জ্ঞানের অপূর্ণতা ও পূর্ণতার সময় বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا : এখানে مَا বা না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ اَكْمَهَ : মায়ের পেট থেকে যে অন্ধ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। জন্মান্ধ।

قَوْلُهُ اَمَرْتُهُمْ عَلٰى لِسَانِهٖ : এটি একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব। **প্রশ্ন.** হাওয়ারীরা তো নবী ছিলেন না। তারপরও তাদের প্রতি ওহী প্রেরণের মর্ম কি?

উত্তর : এখানে সরাসরি ওহী উদ্দেশ্য নয়; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مِنْ اَجَلِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ نَاْكُلَ এখানে مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ .... اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : হাশরের ভয়াল দিনে যখন মহা প্রতাপশালী আল্লাহর চরম রুদ্ররূপের প্রকাশ ঘটবে, বড় বড় ব্যক্তিদেরও যখন হুঁশ থাকবে না এবং উচ্চস্তরের নবীগণের মুখে শুধু ধ্বনিত হবে, হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! তখন প্রচণ্ড ভয় ও ত্রাসে আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে لَا عِلْمَ لَنَا 'আমরা কিছুই জানি না' ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না। অবশেষে নবী কারীম ﷺ -এর অসিলায় যখন সকলের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত ও কৃপা দৃষ্টি হবে, তখন কিছু বলার হিম্মত হবে। হযরত হাসান (র.), হযরত মুজাহিদ (র.) প্রমুখ হতে এরূপই বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে لَا عِلْمَ لَنَا -এর অর্থ হে আল্লাহ! তোমার পরিপূর্ণ সর্বব্যাপী জ্ঞানের সামনে আমাদের কিছুই জানা নেই। এটা যেন মহান আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে আদব ও বিনায়াত্মক জবাব। ইবনে জুরাইজের মতে এর অর্থ– আমরা জানি না আমাদের পেছনে তারা কি না কি করছে। আমরা তো কেবল সেই সব কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারি যেগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ্যে হতো। পশ্চাতের ও গোপনীয় অবস্থাসমূহের জ্ঞান একমাত্র عَلَّامُ الْغُيُوْبِ [অদৃশ্যের জ্ঞাতা]-ই রাখেন। সামনের রুকুতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানিতে যে উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে– وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا তা দ্বারা শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হয়। সহীহ হাদীসে আছে, হাউজে কাওসারের তীরে প্রিয়নবী ﷺ যখন কতক লোক

সম্পর্কে বলবেন, هٰؤُلَاءِ أَصْحَابِيْ **এরা আমার দলের**। তখন জবাব দেওয়া হবে, لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ অর্থাৎ আপনি **জানেন না। আপনার পরে এরা কি সব কাণ্ড করেছে।** –[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৫৮]

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الخ ঈসা ইবনে মরিয়মের কতিপয় স্পষ্ট মু'জিযা : কোলে **বসে তিনি যে কথা বলেন,** তার বিবরণ সূরা মরিয়মে আসবে اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِيَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা তিনি **আমাকে কিতাব দিয়েছেন।** আশ্চর্যের বিষয় খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহ (আ.)-এর শৈশবকালীন কথা বলা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ **করেনি। অবশ্য** এটা উল্লেখ করেছে যে, তিনি বারো বছর বয়সে ইহুদিদের সামনে এমন বিজ্ঞজনোচিত দলিল প্রমাণ পেশ **করেন, যা শুনে** পণ্ডিতবর্গ নিরুত্তর ও বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায় এবং শ্রোতাগণ উল্লাসে বাহ বাহ করে উঠে।

এমনিতে তো আম্বিয়ায়ে কেরামের সকলেই বরং অনেক মু'মিন সাধারণও আপন আপন অবস্থা অনুযায়ী 'রূহুল কুদ্স' দ্বারা সাহায্য **প্রাপ্ত হন।** কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর অস্তিত্বই তো হয়েছিল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ফুঁক দ্বারা, যদ্দরুন বিশেষ ধরনের **প্রকৃতিগত সম্বন্ধ** ও সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবীগণের কতককে কতকের উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ . (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)

রূহের জগতে 'রূহুল কুদ্স' -এর দৃষ্টান্ত বস্তুজগতের বিদ্যুৎ শক্তির কেন্দ্র সদৃশ মনে করতে পারেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্ধারিত পরিচালক নিয়ম অনুসারে যখণ বিদ্যুৎ চালু করে এবং যেসব বস্তুতে বিদ্যুৎ পৌছানোর উদ্দেশ্যে সংযোগ দেয় তখন মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ ও থেমে থাকা মেশিনগুলো তীব্র শক্তিতে ঘুরতে থাকে। কোনো রোগীর উপর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্ধারিত অবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও নিথর শিরাগুলো বিদ্যুৎস্পর্শের সাথে সাথে নড়াচড়া শুরু করে দেয় ও তৎপর হয়ে উঠে। অনেক সময় ডাক্তার তো এ পর্যন্ত দাবি করে বসেছে যে, বৈদ্যুতিক শক্তি আরোপ দ্বারা সব রকমের রোগই ভালো করা যেতে পারে। [ফারীদ ওয়াজদী, দায়িরাতুল মা'আরিফ] যখন এ মামুলি বস্তু জাগতিক বিদ্যুতেরই এ অবস্থা, তখন চিন্তা করে দেখুন রূহানী জগরেত সেই বিদ্যুৎ যার কেন্দ্র হচ্ছে কুদ্স, তার কি পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা রূহুল কুদসের সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর মহান সত্তার সম্বন্ধ এমনই এক বিশেষ ধরনের ও বিশেষ নিয়মে স্থাপিত করেছেন, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ্য বিজয়, জিতেন্দ্রিয়তা ও জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণরূপে। তাঁর রূহুল্লাহ উপাধি, শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের একই রকম কথপোকথন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জীবন সঞ্চারের উপযুক্ত মাটির কায়া তৈরি ও তাতে মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জীবাত্মার ফুৎকার, হতাশ ব্যাধিগ্রস্তদেরকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কোনো রকম প্রাকৃতিক আসবাব-উপকরণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নির্দোষ করে তেলা এমনকি মৃত লাশের মাঝে মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পুনর্বার আত্মা প্রত্যানয়ন, বনী ইসরাঈলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর আকাশে উত্তোলন এবং এত সুদীর্ঘ আয়ুর কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর পবিত্র জীবনে দেখা না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সেই বিশেষ সম্পর্ক হতেই সৃষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধরন ও বিশেষ নিয়মে তাঁর ও রূহুল কুদসের মাঝে স্থাপিত করেছেন। প্রত্যেক নবীর সাথেই আল্লাহ তা'আলার কিছু স্বতন্ত্র আচার-আচরণ হয়ে থাকে। তার কারণ ও রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সেই আল্লামুল গুয়ূব-ই রাখেন। ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় সেই স্বতন্ত্র আচার-আচরণসমূহই শাখাগত শ্রেষ্ঠত্ব (فَضَائِلُ جُزْئِيَّةٌ) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এর দ্বারা কারো সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। উলূহিয়্যাত [মাবুদ হওয়া] প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা।

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ -এর মাঝে خَلْقٌ শব্দটি কেবল বাহ্য আকার-আকৃতি দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ প্রকৃত অর্থে খালিক [স্রষ্টা] সেই সত্তা ছাড়া আর কেউ নয়; যিনি اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির সুন্দরতম কর্তা। এ কারণেই এ স্থলে بِاِذْنِيْ **অর্থাৎ 'আমার হুকুমে'** শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা আলে ইমরানে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানিতে এর

পুনরাবৃত্তি করানো হয়েছে। যাহোক এখানে এবং সূরা আলে ইমরানে যেসব আলৌকিক বিষয়কে হযরত মাসীহ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা কেবল সেই ধর্মদ্রোহীই করতে পারে, যে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির অধীন মনে করে। বাকি যারা মহান আল্লাহর 'কুদরতি কানুন' শিরোনামের অধীনে মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলিকে অস্বীকার করতে চায়, আমি স্বতন্ত্র এক রচনায় তাদের জবাব দিয়েছি। তা পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ সব রকমের সংশয়-সন্দেহের নিরসন হবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৬১]

قَوْلُهُ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا الخ : **অর্থাৎ পরীক্ষা** করার জন্য নয়; বরং বরকতের আশায় যাচনা করছি, যাতে গায়েব থেকে বিনা মেহনতে রুজি আসতে থাকে এবং আমরা প্রশান্ত চিত্ত ও একাগ্রতার সাথে ইবাদতে লিপ্ত থাকতে পারি। আর আপনি জান্নাতের নিয়ামত ইত্যাদির সম্পর্কে যেসব গায়বি সংববাদ দান করেন, একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেখে সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ প্রত্যয় লাভ হয়। সেই সঙ্গে চাক্ষুস সাক্ষীরূপে আমরা তার সাক্ষ্য প্রদান করতে পারি, যাতে সর্বদা এ মু'জিযা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। কতক তাফসীরবেত্তা উদ্ধৃত করেছেন, হযরত মাসীহ (আ.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা মহান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ত্রিশ দিন রোজা রেখে, যাই প্রার্থনা করবে মঞ্জুর হবে। হাওয়ারীগণ রোজা রাখল এবং খাঞ্চা প্রার্থনা করল। এটাই وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا - এর অর্থ মহান আল্লাহই ভালো জানেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৬৬]

قَوْلُهُ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا الخ : **অর্থাৎ যেদিন আকাশ থেকে খাদ্য ভরতি খাঞ্চা** অবতীর্ণ হবে। সেদিন আমাদের আগের **পরের সকলের জন্যই ঈদ হয়ে থাকবে। আমরা সর্বদা জাতীয় পর্ব হিসেবে তা উদ্‌যাপন করব**। এ **ব্যাখ্যা অনুযায়ী تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا -এর বক্তব্যটি ঠিক এ রকমের যেমন- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটির সম্পর্কে** বুখারী **শরীফে ইহুদিদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছিলেন- اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ اٰيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا অর্থাৎ তোমরা এমন একটি** আয়াত পাঠ কর, যেটি আমাদের সম্পর্কে নাজিল হলে আমরা তাকে ঈদরূপে গ্রহণ করতাম। উক্ত আয়াতকে ঈদ বানানোর অর্থ যেমন আয়াত নাজিলের দিনকে ঈদ বানানো [অন্যান্য রেওয়ায়েতে বা স্পষ্টরূপে আছে]। মায়িদাহ [খাঞ্চা]-কে ঈদ বানানোর অর্থও তেমনি বুঝে নিতে পারেন। বলা হয়, সে খাঞ্চা রবিবার দিন অবতীর্ণ হয়েছিল, যা খ্রিস্টানদের কাছে মুসলিমগণের জুমা বারের মতো সাপ্তাহিক ঈদ। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৬৭]

অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করা উচিত নয় : নিয়ামত যখন অসাধারণ ও অভিনব হবে, তখন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গুরুত্বও সাধারণ অপেক্ষা বেশিই হবে বৈ কি! আবার অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও হবে অসাধারণ ও ভিন্নধর্মী। 'মূযীহুল কুরআনে' আছে, কেউ বলেন, সে খাঞ্চা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল। তারপর তাদের কতিপয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ কেবল দরিদ্র ও অভাবীদেরকেই খেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বিত্তবান ও সুখিরাও খেতে শুরু করে। পরিণামে প্রায় আশিজন লোক শূকর ও বানর হয়ে যায়। পূর্বে এ শাস্তি ইহুদিদের দেওয়া হয়েছিল। পরে আর কেউ ভোগ করেনি। কেউ বলেন, খাঞ্চা নাজিল হয়নি, বরং সতর্কবাণী শুনে তারা ভয় পেয়ে যায়, পুনরায় আর প্রার্থনা করেনি। কিন্তু নবীর দোয়া বৃথা যেতে পারে না এবং পবিত্র কুরআনে তার উদ্ধৃতিও তাৎপর্যহীন নয়। এ দোয়ার ফলেই সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মত সর্বদা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করে আসছে। আর তাদের মধ্যে যে কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে অর্থাৎ একাগ্র মনে ইবাদতে নিবিষ্ট হবে না; বরং পাপ কর্মে অর্থ ব্যয় করবে, আখেরাতে সে সর্বাধিক শাস্তি ভোগ করবে। এতে মুসলিমগণের জন্য শিক্ষা হলো যে, অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করবে না, কেননা তার কৃতজ্ঞাত আদায় অত্যন্ত কঠিন। বরং বাহ্য আসবাব-উপকরণ নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকবে। এটাই উত্তম। এ ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে কারো সাহায্য-সহযোগিতা কাজে আসে না।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭০]

অনুবাদ :

١١٦. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اَىْ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِعِيْسٰى فِى الْقِيٰمَةِ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهٖ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ عِيْسٰى قَدْ اُرْعِدَ سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ مِنَ الشَّرِيْكِ وَغَيْرِهٖ مَا يَكُوْنُ مَا يَنْبَغِىْ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ط خَبَرُ لَيْسَ وَلِىَ لِلتَّبْيِيْنِ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا اُخْفِيْهِ فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ط اَىْ مَا تُخْفِيْهِ مِنْ مَعْلُوْمَاتِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ.

১১৬. আর স্মরণ কর, আল্লাহ তা'আলা বললেন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঈসাকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ বলবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আ-মাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে তুমি ম-হমান্বিত, তোমার কোনো অংশী হওয়া ইত্যাদি বিষয় হতে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়, উচিত নয়। بِحَقٍّ এটা لَيْسَ -এর خَبَرْ যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরে যা আমি গোপন করি তা তুমি অবগত কিন্তু তোমার অন্তরে তুমি যেসব জ্ঞান গোপন করে রেখেছ তা আমি অবগত নই। তুমি তো অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

١١٧. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ وَهُوَ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا رَقِيْبًا اَمْنَعُهُمْ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ قَبَضْتَنِىْ بِالرَّفْعِ اِلَى السَّمَاءِ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط الْحَفِيْظَ لِاَعْمَالِهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مِنْ قَوْلِىْ لَهُمْ وَقَوْلِهِمْ بَعْدِىْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ شَهِيْدٌ مُطَّلِعٌ عَالِمٌ بِهٖ.

১১৭. তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি। সেটা এই যে, তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, পরিদর্শক। তারা অন্যায় যা কিছু বলত তা হতে আমি তাদেরকে বারণ করতাম। যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে আমাকে [পৃথিবী হতে] আকাশে উঠিয়ে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের উপর নিগাহবান, তাদের কার্যকলাপের সংরক্ষক। এবং তাদেরকে আমি কি বলেছি আর আমার উত্থাপনের পর আমার সম্পর্কে তারা কি বলেছে ইত্যাদি সব বিষয়ে তুমিই সাক্ষী। অর্থাৎ এতদবিষয়ে তুমিই অবহিত এবং তোমারই জানা আছে সব।

١١٨. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ أَيْ مَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَأَنْتَ مَالِكُهُمْ تَتَصَرَّفُ فِيهِمْ كَيْفَ شِئْتَ لَا إِعْتِرَاضَ عَلَيْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ أَيْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ الْحَكِيمُ فِي صُنْعِهِ.

১১৮. তাদের মধ্যে যারা কুফরির উপর প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে তুমি যদি শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। তুমি তাদের অধিকর্তা। সুতরাং যদৃচ্ছা তাদের সাথে ব্যবহার করার অধিকার তোমার সংরক্ষিত। এতে কারো কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে যদি ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, তোমার বিষয়ে তুমি ক্ষমতাবান এবং তোমার কার্যকলাপে প্রজ্ঞাময়।

١١٩. قَالَ اللّٰهُ هٰذَا أَيْ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ فِي الدُّنْيَا كَعِيْسٰى صِدْقُهُمْ ط لِأَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوْا عَنْهُ ط بِثَوَابِهِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَلَا يَنْفَعُ الْكَاذِبِيْنَ فِي الدُّنْيَا صِدْقُهُمْ فِيْهِ كَالْكُفَّارِ لِمَا يُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْعَذَابِ.

১১৯. আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এই সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যেদিন দুনিয়াতে যারা সত্যবাদী ছিল যেমন হযরত ঈসা (আ.) তারা স্বীয় সত্যবাদিতার জন্য উপকৃত হবে। কেননা আজ প্রতিদান প্রাপ্তির দিন। তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। তাদের আনুগত্য দর্শনে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও প্রতিদান পেয়ে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা মহাসফলতা। কিন্তু পৃথিবীতে যারা ছিল মিথ্যাবাদী, যেমন কাফেরগণ, এখানে তাদের সত্যবাদী হওয়াতে কোনো উপকার আসবে না। কেননা, আজাব দর্শন মাত্র সবাই ঈমান নিয়ে আসবে। আর এ ঈমান আনার কোনো মূল্য নেই।

١٢٠. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ خَزَائِنِ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِهَا وَمَا فِيْهِنَّ ط أَتٰى بِمَا تَغْلِيْبًا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ إِثَابَةُ الصَّادِقِ وَتَعْذِيْبُ الْكَاذِبِ وَخَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ تَعَالٰى فَلَيْسَ عَلَيْهَا بِقَادِرٍ.

১২০. আসমান ও জমিন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই অর্থাৎ বৃষ্টি, বৃক্ষলতা, জীবনোপকরণ ইত্যাদি সব কিছুর ভাণ্ডারই তাঁর এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। সত্যবাদীকে পুণ্য ফল দান করা আর মিথ্যাবাদীকে শাস্তি প্রদানও তাঁর শক্তির অন্তর্ভুক্ত। বিবেকের যুক্তির আলোকে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় সত্তা তাঁর শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার সত্তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই। مَا فِيْهِنَّ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিহীন প্রাণীর সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে مَا -এর ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ يَقُوْلُ : قَالَ -এর তাফসীরে মুযারের সীগাহ يَقُوْلُ ব্যবহার করে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, পূর্বাপর দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লিখিত কথাবার্তা কিয়ামতের দিন হবে। আর قَالَ দ্বারা বোঝা যায় যে, তা দুনিয়াতে হয়ে গেছে। তাই يَقُوْلُ উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিলেন যে, মাযী মুযারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهٖ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُؤَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা তো হলেন– عَلَّامُ الْغُيُوْبِ সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার গোপন নয়। হযরত ঈসা (আ.) তার উম্মতকে কিছু বলা বা না বলাও তাঁর জ্ঞানের অধীনে। তারপরও তিনি কেন প্রশ্ন করলেন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্ন জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাঁর উম্মতকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে করেছেন। তাই কোনো ইশকাল থাকল না।

قَوْلُهُ لِقَوْمِهٖ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে বোঝানো হয়েছে যে, ত্রুটি-বিচ্যুতি উম্মতের পক্ষ থেকে হয়েছে। নবীর পক্ষ থেকে নয়।

قَوْلُهُ وَلِىْ لِلتَّبْيِيْنِ : এখানে ঐসব লোকের মতের খণ্ডন করা হয়েছে যারা لِىْ কে حَقٌّ -এর সাথে সম্পৃক্ত মনে করেন। খণ্ডন এভাবে যে, جَارٌ এবং مَجْرُوْرٌ -এর صِلَةٌ আগে আসতে পারে না।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ اِلَى السَّمَاءِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে تَوَفِّىْ অর্থ মৃত্যু নয়। কেননা تَوَفِّىْ অর্থ হলো اَخْذُ الشَّيْءِ وَافِيًا কোনো কিছুকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। মৃত্যুও তার একটি রূপ। সুতরং এখন এ আপত্তি শেষ হলো যে, বাহ্যত বুঝে আসে, تَوَفَّيْتَنِىْ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য। অথচ হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু আসেনি।

قَوْلُهُ وَخَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ تَعَالٰى : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর মাঝে তো আল্লাহ তা'আলাও দাখেল আছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলাকে যদি কোনো شَيْءٌ -এর অন্তর্ভুক্ত না মানা হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা لَا شَيْءَ বা কোনো কিছু না হওয়া লাজেম আসে। যা সুস্পষ্ট ভ্রান্ত কথা। তাই আল্লাহ তা'আলাকে বস্তুর অংশ মনে করা আবশ্যক। আবার كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল। সে হিসেবে তাঁরও মৃত্যুবরণ করা লাজেম আসে। এর সমাধান কি?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা বস্তুর অন্তর্ভুক্ত তবে অন্যান্য বস্তুর মতো নয়। এজন্য আকল বা বিবেক আল্লাহ তা'আলার জাতকে সকল বস্তু হতে আলাদা ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান তবে নিজের যাতে ক্ষমতাবান নয়। কেননা قُدْرَتْ বা ক্ষমতার সম্পর্ক তো مُمْكِنَاتْ -এর সাথে হয়ে থাকে, وَاجِبَاتُ وَمُحَالَاتْ -এর সাথে নয়। সুতরাং شَيْءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে (جُمَلْ) كُلُّ مَوْجُوْدٍ يُمْكِنُ اِيْجَادُهٗ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ الخ : অর্থাৎ আমি এরূপ ঘৃণ্য উক্ত কীরূপে করতে পারতাম! আপনার সত্তা এর থেকে পবিত্র যে, উলূহিয়্যাত ইত্যাদিতে কাউকে আপনার শরিক স্থির করা হবে। আপনি যাকে নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন সে কোনো অন্যায় কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। কাজেই আপনার পবিত্রতা ও আমার নিষ্পাপ অবস্থা এ উভয়ের চাহিদা হলো, আমি কখনো এরূপ ঘৃণ্য কথা বলতে পারি না। সব দলিল-প্রমাণ বাদ দিয়ে শেষ কথা হলো, আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে তো কোনো কিছু থাকতে পারে না। যদি বাস্তবিকই আমি এরূপ বলতাম, তবে আপনার তো জানার কথা। আপনি স্বয়ং জানেন আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে এরূপ কোনো কথা বলিনি। এমনকি আমার

অন্তরে এরূপ পূতিগন্ধময় বিষয়ের বুদবুদও কখনো জাগেনি। আপনার কাছে আমার বা অন্য কারো মনের কল্পনা, ধারণা কোনো কিছুই গোপন নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭২]

قَوْلُهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ : আমি আপনার নির্দেশ হতে এক চুলও বিচ্যুত হইনি, আমার উলূহিয়্যাতের তালিম আমি কি করে দিতে পারি? বরং আমি তো তাদেরকে আপনারই বন্দেগীর প্রতি ডেকেছি এবং সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছি যে, আমার ও তোমাদের সকলেরই প্রতিপালক সেই এক আল্লাহ, যিনি একাই ইবাদতের উপযুক্ত। আধুনিক বাইবেলেও এ বিষয় সম্পর্কে বহু সুস্পষ্ট নির্দেশনা মওজুদ রয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭৩]

قَوْلُهُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

আমি যে কুল মাখলুককে কেবল আপনার তাওহীদ ও বন্দেগির প্রতি দাওয়াত দিয়েছি তাই নয়, যতদিন তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর রেখেছি ও তত্ত্বাবধানরত থেকেছি, যাতে কেউ ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও অমূলক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটিয়ে না বসে। হ্যাঁ, তাদের মাঝে আমার অবস্থানের যে মেয়াদ আপনার অনাদি জ্ঞানে স্থিরীকৃত ছিল, তা পূর্ণ করার পর আপনি যখন আমাকে তাদের মাঝ থেকে তুলে নেবেন। যেমন اَلتَّوَفِّىْ -এর মূলধাতু ও مَا دُمْتُ فِيْهِمْ -এর শর্তারোপ দ্বারা প্রতীয়মান হয়] তারপর তা শুধু আপনিই তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে পারতেন ও তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারতেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে সক্ষম নই। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭৪]

قَوْلُهُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ আপনি নিজ বান্দাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দিলে সেটা সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ন্যায় ভিত্তিকই হবে। আর যদি ক্ষমা করে দেন, সে ক্ষমাও দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত হবে না মোটেই। কেননা আপনি عَزِيْزٌ পরাক্রান্ত। কোনো অপরাধী আপনার ক্ষমতার আওতা হতে পালিয়ে যেতে পারে না যে, আপনি তাদের কাবুতে পাবেন না। আর যেহেতু আপনি حَكِيْمٌ [প্রজ্ঞাময়]-ও তাই কোনো অপরাধীকে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন সেও সম্ভব নয়। মোটকথা তাদের সম্পর্কে আপনি যে ফয়সালাই করবেন তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও পরাক্রান্তসুলভই হবে। হযরত মাসীহ (আ.)-এর বক্তব্য যেহেতু হাশরের ময়দানে হবে, যেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনোরূপ সুপারিশ ও কৃপা প্রার্থনা চলবার নয়, তাই তিনি عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর স্থলে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু] ইত্যাদি বিশেষণের উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহলোকে নিজ প্রতিপালকের নিকট আরজ করেছিলেন, رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! এস প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। কাজেই যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -[সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৬]

অর্থাৎ এখনও সুযোগ আছে আপনি আপন করুণায় তাদেরকে ভবিষ্যতে তওবা করতে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনের তৌফিক দিয়ে পেছনের পাপরাশি ক্ষমা করে দিতে পারেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭৫]

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন‘আম মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ الْاٰيَاتِ الثَّلٰثَ وَاِلَّا قُلْ تَعَالَوْا الْاٰيَاتِ الثَّلٰثَ وَهِىَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ اَوْ سِتٌّ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً

কিন্তু وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ থেকে তিন আয়াত পর্যন্ত এবং قُلْ تَعَالَوْا থেকে তিন আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. اَلْحَمْدُ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتٌ لِلّٰهِ وَهَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ لِلْاِيْمَانِ بِهٖ اَوْ لِلثَّنَاءِ بِهٖ اَوْ هُمَا اِحْتِمَالَاتٌ اُفِيْدُهَا الثَّالِثُ قَالَهُ الشَّيْخُ فِيْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمَا اَعْظَمُ الْمَخْلُوْقَاتِ لِلنَّاظِرِيْنَ وَجَعَلَ خَلَقَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط اَىْ كُلَّ ظُلْمَةٍ وَنُوْرٍ وَجَمْعُهَا دُوْنَهُ لِكَثْرَةِ اَسْبَابِهَا وَهٰذَا مِنْ دَلَائِلِ وَحْدَانِيَّتِهٖ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَعَ قِيَامِ هٰذَا الدَّلِيْلِ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ يُسَوُّوْنَ بِهٖ غَيْرَهٗ فِى الْعِبَادَةِ ـ

২. هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهُ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ط لَكُمْ تَمُوْتُوْنَ عِنْدَ اِنْتِهَائِهٖ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى مَضْرُوْبٌ عِنْدَهٗ لِبَعْثِكُمْ ثُمَّ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْكُفَّارُ تَمْتَرُوْنَ تَشُكُّوْنَ فِى الْبَعْثِ بَعْدَ عِلْمِكُمْ اَنَّهٗ اِبْتَدَأَ خَلْقَكُمْ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ فَهُوَ عَلَى الْاِعَادَةِ اَقْدَرُ ـ

অনুবাদ :

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই বিদ্যমান। اَلْحَمْدُ - হামদ হলো, মহৎ ও সুন্দর গুণাবলির সংকীর্তন। এ আয়াতের মাধ্যমে ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য হামদ সম্পর্কিত সংবাদ প্রদান, না প্রশংসা কীর্তন, না এতদুভয়েই এর উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে আশ্ শায়খ আল মহাল্লী সূরা কাহফে এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলোর মধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। দর্শকদের সামনে এ দুটি যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে কলেবর সর্ববৃহৎ সেহেতু এখানে এ দুটিকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সৃষ্টি করেছেন সকল প্রকার অন্ধকার ও আলো। اَلظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ -অন্ধকার সৃষ্টির কারণ যেহেতু একাধিক সেহেতু এখানে اَلظُّلُمَاتُ [অন্ধকার রাশি] শব্দটি جَمْع অর্থাৎ বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এরূপ নয় বিধায় اَلنُّوْرُ [আলো] শব্দটিকে جَمْع অর্থাৎ বহু-বচনরূপে ব্যবহার করা হয়নি। এসব কিছুই তাঁর একত্বের প্রমাণবহ। এ প্রমাণসমূহের পরও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। ইবাদত ও উপাসনার ক্ষেত্রে অন্যকে তাঁর সাথে সমান করে ধরে।

২. তিনিই তোমাদের আদি পিতা আদমকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করতঃ তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জন্য এক কাল নির্ধারিত করেছেন। যার অন্তে তোমাদের মৃত্যু ঘটে। আর তোমাদের পুনরুত্থানের জন্যও তাঁর নিকট নির্ধারিত কাল, সুনির্দিষ্ট সময় বিদ্যমান। হে কাফেরগণ! এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। অর্থাৎ তোমরা জান যে, তিনিই শুরুতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি প্রথম সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন, তিনি তো তা পুনরায় করতে অধিকতর পারঙ্গম। এরপরও তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ করছ?

٣. وَهُوَ اللّٰهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعِبَادِ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تَجْهَرُوْنَ بِهِ بَيْنَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ـ

৩. আসমান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ। তিনিই সকল ইবাদতের যোগ্য। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে তোমরা যা অপ্রকাশ্যে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর তিনি তা জানেন। এবং তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ তোমরা যা কর এতদসম্পর্কে তিনি অবহিত।

٤. وَمَا تَاْتِيْهِمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ مِنْ زَائِدَةٌ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ـ

৪. তাদের প্রতিপালকের এমন কোনো আল কুরআনের আয়াত তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট উপস্থিত হয় না যা হতে তারা মুখ না ফিরায়। مِنْ اٰيَةٍ এখানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত।

٥. فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ بِالْقُرْاٰنِ لَمَّا جَاۤءَهُمْ ط فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا عَوَاقِبُ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ

৫. সত্য অর্থাৎ আল কুরআন যখন তাদের নিকট এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার যথার্থ পরিণাম তার শীঘ্র অবহতি হবে।

٦. اَلَمْ يَرَوْا فِىْ اَسْفَارِهِمْ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا كَمْ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ مَكَّنّٰهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ مَكَانًا فِى الْاَرْضِ بِالْقُوَّةِ وَالسَّعَةِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ نُعْطِ لَكُمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاۤءَ الْمَطَرَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ص مُتَتَابِعًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ تَحْتَ مَسَاكِنِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمُ الْاَنْبِيَاۤءَ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ـ

৬. শাম ইত্যাদি অঞ্চলের পরিভ্রমণে তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে, কত অতীত জাতিকে বিনাশ করেছি; তাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি ও প্রাচুর্যে এমনভাবে স্থান দিয়েছিলাম, এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকে করিনি, সে শক্তি ও প্রাচুর্য তোমাদেরকে দেইনি। এবং তাদের উপর মুষলধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে আকাশ অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে অর্থাৎ তাদের আবাসমূহের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। আতঃপর তাদের পাপের দরুন অর্থাৎ নবীগণকে অস্বীকার করার দরুন তাদেরকে আমি বিনাশ করেছি এবং তাদের পর নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। كَمْ -এটা এখানে خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক; অর্থ-কত। لَكُمْ -এটাতে غَيْب বা নামপুরুষ হতে اِلْتِفَات বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

٧. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا مَكْتُوْبًا فِىْ قِرْطَاسٍ رَقٍّ كَمَا اقْتَرَحُوْهُ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ اَبْلَغُ مِنْ عَايَنُوْهُ لِاَنَّهُ اَنْفٰى لِلشَّكِّ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ تَعَنُّتًا وَعِنَادًا ـ

৭. যদি তাদের আবদারানুসারে কাগজে পত্রে লিপিবদ্ধ কিতাবও তোমার প্রতি অবতারণ করতাম আর তারা যদি তা হাত দ্বারা স্পর্শও করত তবু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ জেদ ও বিদ্বেষ বশত বলত এটা স্পষ্ট জাদু ব্যতীত কিছুই নয়। عَايَنُوْهُ অর্থাৎ তারা যদি তা সামনে দেখত- এটা না বলে তারা যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করত- ধরনের বাক্য ভঙ্গিমা ব্যবহার করা অধিকতর অলঙ্কার সম্মত হয়েছে। কেননা, সন্দেহ দূরীকরণার্থে এটা অধিক কার্যকারী। اِنْ এটা এখানে 'না'বোধক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨. وَقَالُوا لَوْلَا هَلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَلَكٌ ط يُصَدِّقُهُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا كَمَا اقْتَرَحُوْهُ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا لَقُضِيَ الْأَمْرُ بِهَلَاكِهِمْ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ كَعَادَةِ اللّٰهِ فِيْمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ إِهْلَاكِهِمْ عِنْدَ وُجُوْدِ مُقْتَرِحِهِمْ إِذَا لَمْ يُؤْمِنُوْا ـ

৮. তারা বলে, তার নিকট অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার সমর্থকরূপে [কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না?] لَوْلَا-এটা এখানে تَنْبِيْه বা সতর্কবাচক শব্দ هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি তাদের দাবি অনুসারে আমি ফেরেশতাও প্রেরণ করতাম তবুও তারা বিশ্বাস আনত না ফলে তাদের ধ্বংসের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যেত আর পূর্ববর্তী উম্মতগণের দাবি অনুসারে নিদর্শন আসার পরও ঈমান গ্রহণ না করায় তাদেরকে ধ্বংস করার মতো আল্লাহর চিরায়ত নিয়ম হিসেবে এদেরকেও ধ্বংস করে দেওয়া হতো। তওবা বা অজুহাত পেশেরও তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না;

٩. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ أَيِ الْمُنْزَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا لَجَعَلْنٰهُ أَيِ الْمَلَكَ رَجُلًا أَيْ عَلٰى صُوْرَتِهٖ لِيَتَمَكَّنُوْا مِنْ رُؤْيَتِهٖ إِذْ لَا قُوَّةَ لِلْبَشَرِ عَلٰى رُؤْيَةِ الْمَلَكِ وَلَوْ أَنْزَلْنٰهُ وَجَعَلْنٰهُ رَجُلًا لَلَبَسْنَا شَبَّهْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ بِأَنْ يَقُوْلُوْا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ

৯. যদি তাকে অর্থাৎ এদের প্রতি প্রেরিতজনকে ফেরেশতা করতাম তবে তাকে ঐ ফেরেশতাকে মানুষরূপেই প্রেরণ করতাম। অর্থাৎ তাকে দর্শন করার জন্য মানুষ আকারেই তাকে তখন প্রেরণ করতে হতো। কেননা ফেরেশতাকে স্বআকৃতিতে দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তখন অর্থাৎ ফেরেশতাকে যদি মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করতাম তখনও সে বিভ্রমেই তাদেরকে ফেলতাম সে সন্দেহেই তাদেরকে ফেলতাম যে বিভ্রম এখন তারা নিজেদের উপর সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ তখনও এরা বলত, তিনি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নন।

١٠. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْقُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ ـ

১০. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে; পরিণামে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা অর্থাৎ তা আবার বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। অর্থাৎ তা এদের উপরই আপতিত হয়েছে, তেমনিভাবে যারা আপনার সাথে বিদ্রূপ করে তাদের উপরও তা আপতিত হবে। এ আয়াতটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هَلِ الْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِذٰلِكَ : এ প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (ثَابِتٌ) দ্বারা যে ثُبُوْتُ حَمْدٍ -এর সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. হয়তো এ কথার সংবাদ দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি হলো اَزَلِيْ এবং اَبَدِيْ এবং এর উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হওয়ার কারণে اِسْتِمْرَارْ -এর উপর দালালত করেছে। এ সুরতে জুমলাটি শব্দগত এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই خَبَرِيَّةٌ হবে।

২. অথবা, উদ্দেশ্য হবে اِنْشَاءُ حَمْدٍ এটাকে মুফাসসির (র.) اَوِ الثَّنَاءُ بِهٖ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এ সুরতে জুমলাটি শব্দগতভাবে خَبَرِيَّةٌ হবে এবং অর্থগতভাবে اِنْشَائِيَّةٌ হবে।

৩. উভয়টিই উদ্দেশ্য হবে। এটাকে তিনি أَوْ هُمَا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। এ সুরতে উভয় অর্থেই হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর প্রথম সুরতে সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাকীকত এবং إِنْشَاءُ حَمْدٍ-এর ক্ষেত্রে মাজায বা রূপক অর্থে হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে إِنْشَاءُ حَمْدٍ-এর ক্ষেত্রে হাকীকত এবং সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে রূপক অর্থে হবে। সারকথা হলো, প্রথম দুই সুরতের মধ্যে একটিতে জুমলার ব্যবহার মৌলিকভাবে হবে এবং অপরটিতে بِالتَّبَعِ বা অনুগামী হিসেবে হবে। আর তৃতীয় সুরতে উভয় জুমলার ব্যবহার بِالْأَصْلِ বা মূল হিসেবে হবে। এজন্যই তৃতীয় সুরতটি প্রথম দুই সুরতের চেয়ে অধিক উপকারী। কেননা, উভয়টির মাঝে মূল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهُ خَلَقَ : جَعَلَ-এর ব্যাখ্যায় خَلَقَ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جَعَلَ ফে'লটি এখানে خَلَقَ وَاَنْشَأَ -এর অর্থে। صَيَّرَ-এর অর্থে নয়। আর এ কারণেই এটি একটি মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِكَثْرَةِ اَسْبَابِهَا : ظُلُمْتُ -এর সবব যেহেতু অনেকগুলো এজন্য ظُلُمَاتٌ-কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর نُوْرٌ-এর প্রকার যেহেতু একটি তাই তাকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَوَاقِبُ : **প্রশ্ন.** এখানে عَوَاقِبُ মুযাফকে মাহযূফ মানার দ্বারা কী ফায়দা? **উত্তর.** এজন্য যে, মূল اَنْبَاءٌ বা সংবাদ তো দুনিয়াতেই জানা যাবে। তবে তার পরিণতি ও ফলাফল আখেরাতে জানা যাবে। এ কথা বুঝানোর **জন্য** عَوَاقِبُ **শব্দটি উহ্য ধরা হয়েছে।**

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اَنْفَى لِلشَّكِّ : অর্থাৎ مُعَايَنَةٌ -এর স্থলে لَمْسٌ শব্দ ব্যবহার نَفِىْ شَكٍّ **তথা সন্দেহ দূরীকরণে** অধিক কার্যকরী। কেননা দেখার ক্ষেত্রে তো **কখনো জাদু এবং নজরবন্দীর ধোঁকাও থেকে থাকে। কিন্তু** لَمْسٌ **বা স্পর্শ** করে অবগত **লাভ করার মাঝে ধোঁকা ও ভুলের আশঙ্কা থাকে না।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আন‘আমের বৈশিষ্ট্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত ব্যতীত গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তাসবীহ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তাফসরীবিদদের মধ্যে মুজাহিদ, কালবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় এ কথাই বলেন।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ الخ : আবূ ইসহাক ইসফারায়িনী বলেন, এ সূরাটিতে তাওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, 'সর্বাধিক প্রশংসা আল্লাহর জন্য' এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞতার বাহক, তিনিই হামদ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سَمَاوَاتٌ শব্দটিকে বহুবচনে এবং اَرْض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট; তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

এমনিভাবে ظُلُمَاتٌ শব্দটি বহুবচনে এবং نُوْرٌ শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نُوْرٌ বলে বিশুদ্ধ ও **সরল পথ** ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظُلُمَاتٌ বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য।

-[তাফসীরে মাযহারী ও বাহরে মুহীত]

এখানে এ **বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য** যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خَلَقَ শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর **উদ্ভব করাকে** جَعَلَ শব্দের **মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।** এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও **ভূমণ্ডলের মতো স্বতন্ত্র ও** স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং **পরনির্ভর**, আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে **উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে,** এ

জগতে অন্ধকার হলো আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। যেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যে একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুঁশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি-উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দুজন– ইয়াযদান ও আহরামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আল্লাহর অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রিস্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক' -এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা তা আল্লাহর বন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানব জাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ তা'আলা 'আশরাফুল মখলূকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হলো, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি পোকা-মাকড়কেও সিজদার যোগ্য উপাস্য, রুজিদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরিউক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করা যায়? প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎবিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে এক বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে।

–[তাফসীরে মাজহারী]

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দুটি মনজিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগৎ-সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে, ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন, বরং এদিক দিয়ে মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা সে সর্বদা, সর্বত্র আশেপাশে আদম সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থাৎ আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্ট জীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশপাশে প্রত্যক্ষ করে وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কেয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা

মনস্তাত্ত্বিক ও স্বভাবিক বিষয়। তাই কিয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। এটা অনুচিত।

قَوْلُهُ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ الخ : এ আয়াতে প্রথম দুআয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

قَوْلُهُ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ : এ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্য যে কোনো নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তাভাবনা করে না।

قَوْلُهُ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ : এ আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে : অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কুরআন হতে পারে এবং নবী করীম ﷺ -এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে। কেননা, মহানবী ﷺ আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী ﷺ কোনো মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মী [নিরক্ষর] উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়স এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায় যে, তিনি কোনো দিন কবিতা বা কাব্যচর্চার দিকে আকৃষ্ট হননি এবং কখনো বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হননি। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পরদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মোকাবিলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলংকারবিদদের চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী ﷺ -কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, অথচ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস তাদের কারও হলো না।

এভাবে নবী করীম ﷺ এবং কুরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে হাজারো মু'জিযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে– فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা, তাঁর আনীত হেদায়েত, কিয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোনো উপকার হবে না, কেননা সেটা কর্মজগৎ নয়– প্রতিদান দিবস। আল্লাহ তা'আলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহর নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/২৫৬-৬০]

قَوْلُهُ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহর বিধান ও পয়গাম্বরদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকারী উপদেশ। 'জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক' জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কুরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে

অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি; বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গুনাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিসসা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ঔষুধের স্থলে ব্যবহার করা হয়, না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবত এ কারণেই কুরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতো নয় যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কুরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি; বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোনো কাহিনী কখনো স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোনো কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরি, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যলোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মা-সংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবসীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে- كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক 'কারনকে' [অর্থাৎ সম্প্রদায়কে] আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। قَرْنٌ শব্দের অর্থ একাধিক। সমসাময়িক লোকসমাজকেও قَرْنٌ বলা হয় এবং সুদীর্ঘ কালকেও قَرْنٌ বলা হয়। দশ বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَرْنٌ শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোনো কোনো ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে : মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন : তুমি এক 'কার্‌ন' দোয়া পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ 'বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী ﷺ জনৈক বালককে দেন যে, তুমি এক 'কার্‌ন' জীবিত থেক। বালকটি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিল। خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম 'এক কার্‌ন' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গাম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মতো শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতির ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

قَوْلُهُ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতে পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

এমনিতেও আল্লাহ তা'আলার এ শক্তি-সামর্থ্য আমরা প্রতিয়িনত প্রত্যক্ষ করে থাকি। দৈনিক লাখো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু কারও স্থান অপূর্ণ থাকে না। কোনো জায়গায় জনবসতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সে জায়গা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। একবার আরাফাতের ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে চিন্তাস্রোত এদিকে প্রবাহিত হলো যে, আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে এ জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ বিদ্যমান ছিল না এবং তাদের স্থলে প্রায় সমসংখ্যক অন্য মানুষ ছিল, কিন্তু আজ তাদের কোনো চিহ্নই নেই। এভাবে প্রতিটি জনসমাবেশকে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে মিলিয়ে দেখলে প্রতিটি জনসমাবেশই কার্যকারী উপদেশদাতা দৃষ্টিগোচন হয়। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

قَوْلُهُ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ الخ : এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবি পেশ করে বসল। সে বলল, আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে, হে আব্দুল্লাহ! রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল, আপনি এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছিল। জাতির এহেন হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতামাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়তো তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এ কারণেই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, তাদের এসব দাবি-দাওয়া কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া করছে, আপনার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য তার চাইতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের সামনে এলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। উদাহরণত তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি যদি আকাশ থেকে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতরণ করে দেই, শুধু তাই নয়, তারা যদি তা স্বচক্ষে দেখেও নেয় এবং ভেলকি সৃষ্টির আশঙ্কা দূরীকরণার্থ হাতে স্পর্শও করে নেয় তবুও একথাই বলে দেবে যে, إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা প্রকাশ্যে জাদু বৈ কিছু নয়। কারণ, হঠকারিতাবশতই তারা এসব দাবি-দাওয়া করছে।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا الخ : এ আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। **পূর্বোল্লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নজর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ (রা.) একবার একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমরা আপনার** প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসেন। **গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দেবে যে,** এ গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষে থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফিলরা এসব দাবি-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহর আইন এই যে, কোনো জাতি কোনো পয়গাম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোনো মু'জিযা দাবি করে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণের সামান্য বিলম্বও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আজাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে– لَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মতো মু'জিযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই, তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ : পূর্বোক্ত প্রশ্নের আরেকটি উত্তর এ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবি করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.) বহুবার মহানবী ﷺ -এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে। এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে, স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গাম্বরদের এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আজাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহর বিধানাবলি প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না।

অনুবাদ :

١١. قُلْ لَهُمْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ الرُّسُلَ مِنْ هَلَاكِهِمْ بِالْعَذَابِ لِتَعْتَبِرُوْا .

১১. এদেরকে বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দেখ যারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল শাস্তিস্বরূপ কী ধ্বংসকর পরিণাম তাদের ঘটেছে।

١٢. قُلْ لِمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِلّٰهِ ط اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرِهِ كَتَبَ قَضٰى عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط فَضْلًا مِنْهُ وَفِيْهِ تَلَطُّفٌ فِىْ دُعَائِهِمْ اِلَى الْاِيْمَانِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لِيُجَازِيَكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ ط اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْآ اَنْفُسَهُمْ بِتَعْرِيْضِهَا لِلْعَذَابِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১২. বল, আসমান ও জমিনে যা আছে তা কার? তারা যদি না বলে তবে তুমিই বল, তা আল্লাহরই। কেননা, এটা ব্যতীত এর আর কোনো জবাব নেই। তিনি অনুগ্রহ করত দয়া করা নিজের কর্তব্য বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। স্থির করেছেন। এ বাক্যটিতে তাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে কোমলতা প্রকাশ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দানের জন্য তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। এতে কোনো দ্বিধা কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করত নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا এটা مُبْتَدَأٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্য فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এটা خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয়।

١٣. وَلَهُ تَعَالٰى مَا سَكَنَ حَلَّ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اَىْ كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَمَالِكُهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا يُقَالُ الْعَلِيْمُ بِمَا يُفْعَلُ .

১৩. রাত্রি ও দিবসে যা কিছু থাকে অবস্থান করে তা তাঁরই অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের তিনিই প্রভু, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই অধিকর্তা। যা বলা হয় তা তিনি শুনেন, যা করা হয় তা তিনি খুবই জানেন।

١٤. قُلْ لَهُمْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا اَعْبُدُهُ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُبْدِعِهِمَا وَهُوَ يُطْعِمُ يَرْزُقُ وَلَا يُطْعَمُ ط يُرْزَقُ لَا قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ قِيْلَ لِىْ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهٖ .

১৪. এদেরকে বল, আমি কি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এতদুভয়ের নমুনাবিহীন নির্মাতা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? অর্থাৎ অন্য কারও উপাসনা করব? না, তা করতে পারি না। তিনিই খাদ্য দান করেন, জীবিকা দান করেন তাঁকে কেউ খাদ্য দান করে না জীবিকা দান করে না। বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহর প্রতি নিজেকে যারা সমর্পণ করে তাদের মধ্যে যেন আমিই প্রথম হই এবং আমাকে বলা হয়েছে তাঁর সাথে কখনও তুমি অংশী স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

١٥. قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ بِعِبَادَةِ غَيْرِهٖ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ .

১৫. বল, আমি যদি অন্যের উপাসনা করত আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে মহা এক দিনের অর্থাৎ কিয়ামত দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

١٦. مَنْ يُّصْرَفْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ اَيْ الْعَذَابُ وَلِلْفَاعِلِ اَيْ اللّٰهُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوْفٌ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ط تَعَالٰى اَيْ اَرَادَ لَهُ الْخَيْرَ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ النَّجَاةُ الظَّاهِرَةُ ـ

১৬. সেদিন যাকে তা হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দয়া প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ তিনি তার কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায় করলেন। আর এটাই স্পষ্ট সফলতা। সুপ্রকাশ্য মুক্তি। يُصْرَفْ এটা مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে যার হতে শাস্তি ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। আর مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্যরূপে পঠিত হলে এটার কর্তা হবেন আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ফিরিয়ে রেখেছেন। এমতাবস্থায় اَلْعَذَاب শব্দটির প্রতি ইঙ্গিতবহ সর্বনামটি উহ্য বলে বিবেচ্য হবে।

١٧. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ بَلَاءٍ كَمَرَضٍ وَفَقْرٍ فَلَا كَاشِفَ رَافِعَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ كَصِحَّةٍ وَغِنًى فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ مَسُّكَ بِهٖ وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى رَدِّهٖ عَنْكَ غَيْرُهٗ ـ

১৭. আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে কষ্টে ফেললে যেমন– অসুস্থতা, দারিদ্রতা ইত্যাদি তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী নিবারণকারী কেউ নেই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে যেমন সুস্বাস্থ্য, সচ্ছলতা ইত্যাদি দান করলে তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। **তোমাকে ক্লেশ বা কল্যাণ দানও তাঁর এ ক্ষমতাভুক্ত জিনিস। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমার হতে এটা রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না।**

١٨. وَهُوَ الْقَاهِرُ الْقَادِرُ الَّذِيْ لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ مُسْتَعْلِيًا فَوْقَ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِيْ خَلْقِهٖ الْخَبِيْرُ بِبَوَاطِنِهِمْ كَظَوَاهِرِهِمْ ـ

১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী ক্ষমতাশালী। কেউই তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়। তিনি তাঁর সৃষ্ট বিষয়ে প্রজ্ঞাময় এবং তাদের বাইরের মতো আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত।

١٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِئْتِنَا بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ فَاِنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اَنْكَرُوْكَ قُلْ لَهُمْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمُبْتَدَأِ قُلِ اللّٰهُ اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهٗ هُوَ شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ عَلٰى صِدْقِيْ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ط عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ اُنْذِرَكُمْ اَيْ بَلَغَهُ الْقُرْاٰنُ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ ـ

১৯. যখন কাফেরগণ রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, আপনার নবুয়তের সমর্থনে সাক্ষ্য দানের জন্য কাউকেও নিয়ে আসুন। কারণ কিতাবীরা আপনার অস্বীকার করে, তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– এদেরকে বল, সাক্ষ্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কী? شَهَادَةً এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্যের রূপ হতে পরবর্তী হয়ে এখানে تَمْيِيْز হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা যদি উত্তর না দেয় তবে তুমিই বল, আল্লাহ। কারণ এটা ব্যতীত এর আর কোনো উত্তর নেই। তিনিই আমার তোমাদের মধ্যে আমার সত্যতার সাক্ষী। আর হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছবে وَمَنْ بَلَغَ- এর اُنْذِرَكُمْ -এর كُمْ সর্বনামের সাথে عَطْف সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ জিন ও মানব জাতিসমূহের যার নিকট কুরআন পৌঁছবে।

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ قُلْ لَّهُمْ لَآ أَشْهَدُ ج بِذٰلِكَ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مَعَهٗ مِنَ الْاَصْنَامِ .

এত দ্বারা সতর্ক করার জন্য আমার নিকট এ কুরআন প্রেরিত হয়েছে। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও রয়েছে? أَئِنَّكُمْ-এখানে اِنْكَارْ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার করা হয়েছে। এদেরকে বল, আমি সে সাক্ষ্য দেই না। বল, তিনি একক ইলাহ আর তোমরা তাঁর সাথে প্রতিমাসমূহের যে শরিক কর তা হতে আমি মুক্ত।

২০. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ اَىْ مُحَمَّدًا بِنَعْتِهٖ فِىْ كِتَابِهِمْ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ مِنْهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ .

২০. যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -কে তাদের কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিবরণ থাকায় সেরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে; তাদের মধ্যে যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ হলো মুবতাদা। فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ হলো খবর।

প্রশ্ন. খবরের শুরুতে কিভাবে فَاءْ আনা হলো? **উত্তর.** এ কারণে যে, مَوْصُوْلْ-এর মধ্যে شَرْطْ -এর অর্থ পাওয়া যায়। যার কারণে তার খবরের মধ্যে جَزَاءْ -এর অর্থ রয়েছে। এ কারণে فَاءْ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَلَّ : سَكَنَ -এর ব্যাখ্যায় حَلَّ بِمَعْنَى اِسْتَقَرَّ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও سُكُوْنْ [স্থিরতা] حَرْكَتْ [নড়াচাড়া]-এর বিপরীতকে বলা হয় কিন্তু এখানে সাধারণ اِسْتِقْرَارْ উদ্দেশ্যে। এটি আরবদের উক্তি تَقِيْكُمُ الْحَرَّ -এর মতো اَىْ تَقِيْكَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ

قَوْلُهُ الْعَائِدُ مَحْذُوْفٌ : এটি يُصْرَفْ-কে مَعْرُوْفْ পড়ার সুরতে হবে। বাহ্যিকভাবে এখানে اَلْعَذَابُ মাহযূফ থাকার কথা। কেননা, নাহবী কায়দা হলো غَيْرِ مَوْصُوْلْ-এর দিকে عَائِدْ -এর হযফ জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ النَّجَاةُ الظَّاهِرَةُ : এ কারণে যে, এ কামিয়াবিটি হবে সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং স্থায়ী। পক্ষান্তরে পার্থিব কামিয়াবি অস্থায়ী।

قَوْلُهُ مُسْتَعْلِيًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَوْقَ عِبَادِهٖ জুমলাটি اَلْقَاهِرُ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। আর اِسْتِعْلَاءْ থেকে عُلُوٌّ فِى الْقُدْرَةِ وَالشَّاْنِ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ : اَىْ قُلِ اللّٰهُ اَكْبَرُ এখানে اَكْبَرُ শব্দটি মাহযূফ আছে। কেননা, مَقُوْلَهٗ মুফরাদ হয় না। পূর্ণ জুমলা হতে হয়।

قَوْلُهُ هُوَ شَهِيْدٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, شَهِيْدٌ হলো هُوَ মুবতাদা মাহযূফের খবর।

প্রশ্ন. اَللّٰهُ শব্দকে মুবতাদা এবং সরাসরি شَهِيْدٌ -কে খবর ধরা হলে কোনো সমস্যা রয়েছে? তাহলে তো هُوَ মুবতাদা মাহযূফ উহ্য ধরতে হবে না।

উত্তর. اَللّٰهُ শব্দকে মুবতাদা এবং شَهِيْدٌ -কে খবর ধরা এজন্য শুধু নয় যে, اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً -এর জবাব হিসেবে اَللّٰهُ شَهِيْدٌ হওয়া শুদ্ধ নয়। কেননা তখন মূল বা তাকদীরী ইবারত হবে- اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً اَللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ আর এতে উত্তরটি প্রশ্ন অনুযায়ী হয়নি।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ اُنْذِرَكُمْ : অর্থাৎ مَنْ بَلَغَ -এর 'আতফ' اُنْذِرَكُمْ -এর মাফউলের যমীর كُمْ -এর সাথে, তার ضَمِيْرِ مُسْتَتَرْ ফায়েলের উপর নয়।

قَوْلُهُ اَىْ بَلَغَهُ الْقُرْاٰنُ : এখানে بَلَغَ -এর ফায়েলের যমীর নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ لِمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ : এ আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন, সবার মালিক আল্লাহ। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলাকেই মানত।

قَوْلُهُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : এ বাক্যে اِلٰى শব্দটি فِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে- اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ عَلٰى غَضَبِىْ অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। -[কুরতুবী]

لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ : এখানে سُكُوْنٌ অর্থ اِسْتِقْرَارٌ [অবস্থান করা], অর্থাৎ পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত, তা সবই আল্লাহর। অথবা এর অর্থ سُكُوْنٌ وَحَرَكَتٌ -এর সমষ্টি। অর্থাৎ مَا سَكَنَ وَمَا تَحَرَّكَ [স্থাবর ও অবস্থার]। আয়াতে শুধু سُكُوْنٌ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত حَرَكَتٌ আপনা-আপনিই বোঝা যায়। -[মাআরিফুল কুরআন ৩/২৬৭-৬৮]

قَوْلُهُ قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীদের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন ছার!

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ الخ : এ আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোনো ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যত একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশি এর কোনো গুরুত্ব নেই।

এ বিশ্বাসটিও ইসলামের অন্যতম বৈপ্লবিক বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মুসলমানদের সমগ্র সৃষ্টি জগৎ থেকে বিমুখ করে একমাত্র স্রষ্টার মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। ফলে মুসলমানরা এমন একটি নজিরবিহীন সদাপ্রফুল্ল সম্প্রদায়ের পরিণত হয়ে গেছে, যারা দারিদ্র্যে এবং উপবাসেও সারা বিশ্বের উপর ভারী কারো সামনে মস্তক অবনত করতে জানে না।

কুরআন মাজীদে এ বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে– مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে রহমত মানুষের জন্য খুলে দিয়েছেন তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই এবং যাকে তিনি আটকে দেন, তাকে খুলে দেওয়ারই কেউ নেই। সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই দোয়ায় একথা বলতেন, اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন, তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই, আপনি যা আটকে দেন, তার কোনো দাতা নেই এবং আপনার বিপক্ষে কোনো চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকার সাধন করতে পারে না। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি আরজ করলাম আদেশ করুন, আমি হাজির আছি। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোনেকিছু যাচনা করতে হলে তুমি আল্লাহর কাছেই যাচনা কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই– তোমার এমন কোনো উপকার করতে সমগ্র সৃষ্ট জীবন সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনও তো করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাসে ধৈর্যধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা কর। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা স্বভাববিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত কষ্টের সাথে এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত। –[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

পরিতাপের বিষয়, কুরআন পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে না; বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গাম্বর ও ওলীদের অসিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা জায়েজ। স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। সরাসরি কোনো সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সরল পথে কায়েম রাখুন।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ : অর্থাৎ আল্লাহই তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তম ব্যক্তিরাও সবকাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ। তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে, তাঁর সব কাজেই প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। তিনি সর্বজ্ঞ। আয়াতে قَاهِرٌ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য এবং حَكِيْمٌ শব্দ দ্বারা সবকিছু বেষ্টনকারী জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, পরাকাষ্ঠামূলক যাবতীয় গুণ-প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামার্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা একক।

قَوْلُهُ قُلْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً : অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ আয়াতের একটি বিশেষ শানে নুযূল উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, মক্কাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, আপনি রাসূল হওয়ার দাবি করেন। এ দাবির পক্ষে আপনার সাক্ষী কে? কেননা, আপনার সত্যায়ন করার মতো কোনো লোক আমরা পাইনি। আমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের পুরোপুরি চেষ্টা করেছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়– قُلْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً অর্থাৎ আপনি বলে দিন আল্লাহর চাইতে অধিক প্রবল কোন সাক্ষ্য হবে? সারা জাহান এবং সবার লাভ-লোকসান তাঁরই আয়ত্তাধীন। অতঃপর আপনি বলে দিন আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সাক্ষী। আল্লাহর সাক্ষ্যের অর্থ ঐসব মু'জিযা ও নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -এর সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। তাই পরের আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এ সাক্ষ্যের পরও কি তোমরা এর বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যও শরিক আছে। এরূপ করলে স্বীয় পরিণাম ভেবে নাও, আমি এরূপ সাক্ষ্য দিতে পারি না।

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ : অর্থাৎ আপনি বলে দিন আল্লাহ একক উপাস্য; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও বলা হয়েছে- وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি ওহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, যাদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত এ কুরআন পৌঁছবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ সর্বশেষ নবী এবং কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত এর শিক্ষা ও তেলাওয়াত বাকি থাকবে এবং এর অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, যার কাছে কুরআন পৌঁছে গেল, সে যেন মুহাম্মদ ﷺ -এর সাক্ষ্য লাভ করল। অন্য এক হাদীসে আছে, যার কাছে কুরআন পৌঁছে আমি তার ভীতি প্রদর্শক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জোর দিয়ে বলেন- بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলি ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌঁছাও যদি তা একটি আয়াতও হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সতেজ ও সুস্থ রাখুন, যে আমার কোনো উক্তি শুনে তা স্মরণ রাখে; অতঃপর তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক সময় প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে পরোক্ষ শ্রোতা কালামের মর্ম অধিক অনুধাবন করে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ : এখানে কাফেদের এ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে জেনে নিয়েছি, তাদের কেউ আপনাদের সত্যতা ও নবুয়তের সাক্ষ্য দেয় না। এ সম্পর্কে **বলা হয়েছে**- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ অর্থাৎ ইহুদি ও **খ্রিস্টানরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে এমনভাবে চিনে, যেমন করে চিনে নিজের সন্তানদেরকে।**

কারণ এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৈহিক আকৃতি, জন্মভূমি, হিজরত-ভূমি, অভ্যাস, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ **বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে।** এ বর্ণনার পর কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু মহানবী ﷺ -এর আলোচনাই নয় **তাঁর সাহাবায়ে কেরামের** বিস্তারিত অবস্থাও তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে এবং তা পাঠ করে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনবে না এরূপ সম্ভাবনা নেই।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তুলনামূলকভাবে বলেছেন, 'যেমন, মানুষ নিজ সন্তানদের চেনে।' একথা বলেননি যে, 'যেমন সন্তানরা পিতামাতাকে চেনে।' এর কারণ এই যে, পিতামাতার পরিচয় সন্তানের জন্য অত্যধিক হয়ে থাকে। সন্তানের দেহের প্রত্যেকটি অংশ পিতামাতার দৃষ্টিতে থাকে। তারা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের হাতে ও ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতটুকু চিনতে পারে ততটুকু সন্তান পিতামাতাকে চিনতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) পূর্বে ইহুদি ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে যান। হযরত ফারূকে আজম (রা.) একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন যে, তোমরা আমাদের পয়গাম্বরকে এমন চেন, যেমন নিজ সন্তানদেকে চেন- এরূপ বলার কারণ কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত গুণাবলির দ্বারাই চিনি, যা তাওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই আমাদের এ জ্ঞান অকাট্য ও সুনিশ্চিত। নিজ সন্তানরা এরূপ নয় তাদের পরিচয় সন্দেহ হতে পারে যে, আমাদের সন্তান কিনা?

হযরত যায়েদ ইবনে সা'না (রা.) আহলে কিতাবদের একজন ছিলেন। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলের বর্ণনার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনেছিলেন। শুধু একটি মাত্র গুণের সত্যতা তিনি পূর্বে জানতে পারেননি। পরীক্ষার পর তাও জানতে পারেন। তা হলো এই যে, তাঁর সহনশীলতা ক্রোধের উপর প্রবল হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌঁছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ গুণটিও তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান দেখতে পান। অতঃপর কালবিলম্ব না করে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْاۤ اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, আহলে কিতাবরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ণরূপে চেনা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না। এভাবে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/২৭১-৭৫]

অনুবাদ :

٢١. وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِنِسْبَتِهِ الشَّرِيْكَ اِلَيْهِ اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط الْقُرْاٰنَ اِنَّهٗ اَىِ الشَّانَ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ بِذٰلِكَ .

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ-এর প্রতি শরিক আরোপ করে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে অর্থাৎ আল কুরআনকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? না, কেউ নেই। এরূপ জালিমগণ নিশ্চয় সফলকাম হয় না। اِنَّهٗ-এর সর্বনামটি شَانْ বাচক।

٢٢. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا تَوْبِيْخًا اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ شُرَكَاۤءُ اللّٰهِ .

২২. আর স্মরণ কর যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর ভৎসনা স্বরে অংশীবাদীদেরকে বলব, যাদেরকে তোমরা মনে করতে যে, এরা আল্লাহর শরিক তোমাদের সে শরিকগণ আজ কোথায়?

٢٣. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِتْنَتُهُمْ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ اَىْ مَعْذِرَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَىْ قَوْلُهُمْ وَاللّٰهِ رَبِّنَا بِالْجَرِّ نَعْتٌ وَالنَّصْبِ نِدَاۤءٌ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ .

২৩. অতঃপর তাদের এটা ভিন্ন এ কথা বলার অন্য কোনো কৈফিয়ত অন্য কোনো অজুহাত থাকবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না। لَمْ تَكُنْ এটা ت [নামবাচক স্ত্রীলিঙ্গ] ও ى [নামবাচক পুংলিঙ্গ] উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। فِتْنَتُهُمْ এটা نَصْب [ফাতাহসহ] ও رَفْع ও [পেশসহ] উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। رَبِّنَا -এটা جَرّ [কাসরা] সহ পঠিত হলে اللّٰه-এর نَعْتٌ বা বিশেষণ আর نَصْب [ফাতাহ]-সহ পঠিত হলে نِدَاۤءٌ অর্থাৎ সম্বোধিত পদ বলে বিবেচ্য হবে।

٢٤. قَالَ تَعَالٰى اُنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِنَفْيِ الشِّرْكِ عَنْهُمْ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الشُّرَكَاءِ .

২৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! দেখ, তারা নিজেদের হতে শিরকের অপনোদন করে নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তারা আল্লাহর শরিকানা সম্পর্কিত যে মিথ্যা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হলো, অদৃশ্য হয়ে গেল।

٢٥. وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج اِذَا قَرَأْتَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَغْطِيَةً لِ اَنْ لَا يَفْقَهُوْهُ اَنْ يَّفْهَمُوا الْقُرْاٰنَ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط صَمَمًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهٗ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ مَا هٰذَاۤ الْقُرْاٰنُ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ اَكَاذِيْبُ الْاَوَّلِيْنَ كَالْاَضَاحِيْكِ وَالْاَعَاجِيْبِ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ .

২৫. তাদের মধ্যে কতক যখন তুমি তেলাওয়াত কর তখন তোমার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ আচ্ছাদন দিয়ে দিয়েছি যেন তারা তা অর্থাৎ আল কুরআন উপলব্ধি করতে না পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে। তাদেরকে বধির করে দিয়েছি। তাদের কর্ণে ছিপি এটে দিয়েছি। ফলে গ্রহণ করার মতো তারা শুনতে পায় না এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না; এমনকি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, এটা অর্থাৎ আল কুরআন তো সেকালের উপকথা বৈ কিছুই নয়। অর্থাৎ রোমাঞ্চকর ও রম্যরচনার মতো মিথ্যা কাহিনী বৈ কিছুই নয়। اَسَاطِيْر এটা اُسْطُوْرَةٌ [প্রথমাক্ষর পেশযুক্ত]-এর বহুবচন।

٢٦. وَهُمْ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ اَىْ عَنْ اِتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُوْنَ عَنْهُ ج فَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقِيْلَ نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ طَالِبٍ كَانَ يَنْهٰى عَنْ اَذَاهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِهٖ وَاِنْ مَا يُهْلِكُوْنَ بِالنَّأْيِ عَنْهُ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ لِاَنَّ ضَرَرَهٗ عَلَيْهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ بِذٰلِكَ ـ

২৬. তারা লোকদেরকে তা হতে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ হতে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা হতে দূরে থাকে ফলে, তারা ঈমান আনে না। আর তা হতে দূরে থেকে তারা নিজেদেরকেই কেবল ধ্বংস করছে। কারণ এর ক্ষতি তাদের নিজেদের উপরই বর্তায়। অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না।

٢٧. وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذْ وُقِفُوْا عُرِضُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنَا نُرَدُّ اِلَى الدُّنْيَا وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا **وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرَفْعِ الْفِعْلَيْنِ اِسْتِئْنَافًا وَنَصْبِهِمَا فِىْ جَوَابِ التَّمَنِّىْ** وَرَفْعِ الْاَوَّلِ وَنَصْبِ الثَّانِىْ وَ جَوَابُ لَوْ لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا ـ

২৭. হে মুহাম্মদ! **তুমি যদি দেখতে পেতে যখন** তাদেরকে **অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে,** হাজির করা হবে অনন্তর **তারা বলবে, হায়! যদি পৃথিবীতে** আমাদের প্রত্যাবর্তন **ঘটত তবে আমরা** আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে **মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা মু'মিনদের** অন্তর্ভুক্ত হতাম। **[হে মুহাম্মদ, তুমি এটা দেখলে]** তখন মারাত্মক একটি **বিষয় দেখতে পেতে।** يَا-এটা تَنْبِيْه বা সতর্ক বাচক **শব্দ।** نُكَذِّبَ وَنَكُوْنَ এ দুটি ক্রিয়া مُسْتَاْنِفَةٌ অর্থাৎ নতুন বাক্য হিসেবে رَفْع [পেশ] সহকারে কিংবা جَوَابُ تَمَنِّىْ অর্থাৎ কামনাবোধক মর্মের জবাব হিসেবে نَصْب [যবর] সহকারে, কিংবা প্রথমটি رَفْع ও দ্বিতীয়টি نَصْب সহকারে পাঠ করা যায়। لَوْ -এর জবাব এখানে উহ্য। তা হলো, لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا তখন নিশ্চয় তুমি মারাত্মক একটি বিষয় দেখতে পেতে।

٢٨. قَالَ تَعَالٰى بَلْ لِلْاِضْرَابِ عَنْ اِرَادَةِ الْاِيْمَانِ الْمَفْهُوْمِ مِنَ التَّمَنِّىْ بَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مَا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ط يَكْتُمُوْنَ بِقَوْلِهِمْ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ بِشَهَادَةِ جَوَارِحِهِمْ فَتَمَنَّوْا ذٰلِكَ وَلَوْ رُدُّوْا اِلَى الدُّنْيَا فَرْضًا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ مِنَ الشِّرْكِ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِىْ وَعْدِهِمْ بِالْاِيْمَانِ ـ

২৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত অর্থাৎ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের প্রভু আমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। এ কথা বলে তারা যে জিনিস [অর্থাৎ তাদের কুফরি] গোপন করে রেখেছিল [তা এখন] এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে গেছে, উন্মোচিত হয়ে গেছে। আর তাই আজ তারা অনুরূপ কামনা করছে। পৃথিবীতে তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে অর্থাৎ যে শিরক করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করত। নিশ্চয় ঈমান আনয়ন সম্পর্কিত অঙ্গীকারে তারা মিথ্যাবাদী। بَلْ এটা এখানে اِضْرَاب অর্থাৎ ঈমান না আনয়নের উপর এদের দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে বাহ্যত ঈমান গ্রহণ করার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হচ্ছে তাকে মিথ্যা ও বাতিল প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٩. وَقَالُوْا اَىْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ اِنْ مَا هِىَ اَىِ الْحَيٰوةُ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ـ

২৯. তারা অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীগণ বলে, আমাদের এটাই হলো অর্থাৎ পার্থিব জীবনই হলো একমাত্র জীবন। আমরা পুনরুত্থিত হবো না। اِنْ এটা এখানে না মর্মবোধক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٠. وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَالَ لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ تَوْبِيْخًا اَلَيْسَ هٰذَا الْبَعْثُ وَالْحِسَابُ بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط اِنَّهُ لَحَقٌّ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا .

৩০. তুমি যদি দেখতে পেতে যখন এদেরকে প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে উপস্থিত করা হবে, তবে সাংঘাতিক একটি বিষয় দেখতে। তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা স্বরে ফেরেশতাগণের জবানিতে বলবেন, এটা এ পুনরুত্থান ও হিসাব-কিতাব কি সত্য নয়? তারা বলবে, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের শপথ এটা সত্য। তিনি বলবেন, সুতরাং পৃথিবীতে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে তজ্জন্য এখন শাস্তির স্বাদ ভোগ কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنْ قَالُوْا : اَنْ قَالُوْا-এর اَنْ টি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার মূল অর্থবোধক। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে قَوْلُهُمْ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنْ لَا يَفْعَلُوْا : اَنْ এটা হেতুবোধক। এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তাফসীরে এর পূর্বে لِ-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ لَّا يَفْهَمُوْا : يَفْقَهُوْا -এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ هٰذَا : এর اِنْ-টি এখানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَسَاطِيْرُ : এটা اُسْطُوْرَةٌ [প্রথমাক্ষর পেশযুক্ত]-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ يَنْاَوْنَ : অর্থ তারা দূরে থাকে।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللّٰهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَزْعُمُوْنَ -এর উভয় মাফঊল পূর্বের বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যাওয়ার কারণে মাহযূফ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ : فِتْنَتُهُمْ-এর نَصْبٌ হয়েছে এটি كَانَ -এর خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হওয়ার কারণে এবং اِلَّا اَنْ قَالُوْا অংশটি اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ হওয়ার কারণে। অন্যথায় সেটি مَحَلٌّ হিসেবে مَرْفُوْعٌ এবং رَفْعٌ তার বিপরীত হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ مَعْذِرَتُهُمْ : এটি فِتْنَةٌ-এর তাফসীর।

قَوْلُهُ اَىْ قَوْلُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ قَالُوْا- -এর মধ্যে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ যাতে اِسْتِثْنَاءٌ শুদ্ধ হয়।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ نَعْتٌ وَالنَّصْبِ نِدَاءً : অর্থাৎ رَبِّنَا-এর মাঝে দুটি কেরাত রয়েছে। যদি رَبِّنَا শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের সিফত হয় তাহলে جَرٌّ হবে আর যদি উহ্য يَا হরফে নেদার مُنَادٰى হয় তাহলে نَصْبٌ হবে। اَىْ رَبَّنَا

قَوْلُهُ الْاَسْطُوْرَةُ : অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ যেসব মিথ্যা ও মনগড়া গল্প কাহিনী রচনা করেছে।

قَوْلُهُ يَنْاَوْنَ : نَاٰى (ف) نَاْيًا [দূরে থাকা] থেকে مُضَارِعٌ جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ– তারা দূরে থাকে।

قَوْلُهُ اِسْتِيْنَافًا يَعْنِىْ لَا نُكَذِّبُ : এটি একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব। اَىْ مَاذَا تَفْعَلُوْنَ لَوْ رُدِدْتُّمْ؟ اَىْ لَا نُكَذِّبُ وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর وَاوْ -এর পর اَنْ উহ্য থাকার সাথে সাথে تَمَنِّىْ -এর জবাব হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। একটি কেরাত রয়েছে نُكَذِّبُ -এর رَفْعٌ সহকারে এবং نَكُوْنَ-এর نَصْبٌ সহকারে। প্রথমটিতে رَفْعٌ হয়েছে تَمَنِّىْ এবং তার জবাবের মধ্যখানে খবর হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ نَكُوْنَ -এর নসব হয়েছে تَمَنِّىْ -এর জবাব হওয়ার কারণে। আর لَوْ تَرٰى -এর জবাব মাহযূফ রয়েছে। যেমন মুফাসসির (র.) لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ بَلْ لِلْاِضْرَابِ : اَىْ لِاِبْطَالِ مَا يُفْهَمُ مِنَ التَّمَنِّىْ অর্থাৎ ঈমানের আকাঙ্ক্ষাকে বাতিল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের এ কামনা দৃঢ় সংকল্প ও সত্য স্বীকার করার কারণে হবে না; বরং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদানের কারণে লজ্জার কারণে হবে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا : এর আতফ হয়েছে لَعَادُوْا-এর সাথে اَىْ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে– وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরি করা উপাস্যসমূহকে একত্র করব। ثُمَّ نَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمْ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঝে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসা শুরু হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন যেমন তীরসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। –[মুস্তাদরাক, বায়হাকী]

উপরিউক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কুরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে– كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ একদিন তোমার পালনকর্তার কাছে এক হাজার বছরের মতো হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্নরূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্র প্রথমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনোরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চিয়তার কষ্ট তো দূর হবে! এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُوْلُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এ উত্তর দেবে– وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ : এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারো প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থসম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালোবাসা ও আসক্তি নিশেষ হয়ে গেছে এবং এছাড়া তাদের মুখে কোনো উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবি করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলি এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলি দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল। তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন, তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলি ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন তারা পৃথিবীর মতো অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা-ভাষণে অদ্বিতীয় পটু; এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআন পাকের অপর এক আয়াতে وَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শিরকি ও কুফরি অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু কর্ণ এরা সবাই ছিল আল্লাহ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে– اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোনো তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ এদিন তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথমে তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহা-বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দেবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, মুনকার-নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে এবং তোমার দীন কি? কাফের বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মু'মিন বলবে, رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ আমার পালনকর্তা আল্লাহ এবং আমার দীন ইসলাম। এতে বোঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নুতবা কাফের মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছে ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত। ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। যেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকর হবে না।

তাফসীরে 'বাহরে মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোনো কোনো তাফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোনো সৃষ্ট জীবকে খোলাখুলি আল্লাহ কিংবা আল্লাহর প্রতিনিধি না বললেও আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বণ্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্ট জীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুজি-রোজগার, সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে. যে, তারা মুশরিক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন। আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কাফের ও গুনাহগারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসাবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যেও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; আল্লাহর বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরিক তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরি করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি [শরিক] ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরির অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, মনগড়া তৈরি করা বলে মুশরিকদের এসব অপব্যাখ্যা বোঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত।

উদাহরণত তারা বলত- مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

একানে প্রশ্ন হয়, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন এ প্রশ্ন ও উত্তর হবে, তখন মিথ্যা উপাস্যরা উধাও হয়ে থাকবে, কেউ সামনে থাকবে না। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে- اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতে আল্লাহ নির্দেশ দেবেন, অত্যাচারীদের, তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের এবং তারা যাদের উপাসনা করত সবাইকে একত্র কর। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা উপাস্যরাও হাশরে উপস্থিত থাকবে।

উত্তর এই যে, আয়াতে তাদের উধাও হওয়ার অর্থ অংশীদার কিংবা সুপারিশকারী হিসাবে তারা অনুপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ অংশীবাদীদের কোনো উপকারই তারা করতে পারবে না, বরং এমনিতেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। এভাবে উভয় আয়াতে কোনোরূপ গরমিল থাকে না। একথা বলাও সম্ভব যে, এক সময়ে তাদেরকে একত্র করা হবে এবং পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপরিউক্ত প্রশ্ন করা হবে।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদের যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। -[ইবনে হাব্বান]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে কাজের দরুন মানুষ দোজখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন, সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। -[মুসনাদে আহমদ]

মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কে? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এ হলো মিথ্যাবাদী।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না। এমনকি হাসি-ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কুঅভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিজিক কমিয়ে দেয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ : যাহহাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী ﷺ -এর চাচা আবূ তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে নবী করীম ﷺ হবেন। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/২৭৭-৮২]

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ الخ : ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে- ১. একত্ববাদ, ২. রিসালত ও ৩. আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যত এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কুরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অবশেষ ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, পরকালে যখন তাদেরকে দোজখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলি ও নির্দেশাবলিতে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহ্বল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন, এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপারে এই যে, পয়গাম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গাম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে তা সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোজখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোনো ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে- অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

قَوْلُهُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا-এর عَطْف হয়েছে عَادُوا-এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে এ কথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোনো জীবন মানি না, এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবত হওয়াকে এবং হিসাব-কিতাব, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তব ঘটনাবলির বিশ্বাস না থাকা জরুরি নয়; বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামি সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতাবশত ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কুরআন পাক বর্তমান জীবনে কোনো কোনো কাফের সম্পর্কে বলে- وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী ﷺ -কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লেগে আছে।

মোটকথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে 'দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব' সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তাফসীরে মাযহারীতে তাবারানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বিচারদণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন, সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশি হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ তা'আলা আরও বলবেন, আমি জাহান্নামের আজাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও সে পূর্বের মতোই কাজ করবে।

-[মা'আরিফুল কুরআন: ৩/২৮৫-৮৬]

অনুবাদ :

৩১. قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۤءِ اللّٰهِ ط بِالْبَعْثِ حَتّٰى غَايَةٌ لِلتَّكْذِيْبِ اِذَا جَاۤءَتْهُمُ السَّاعَةُ الْقِيٰمَةُ بَغْتَةً فُجَاءَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا هِىَ شِدَّةُ التَّاَلُّمِ وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ اَىْ هٰذَا اَوَانُكِ فَاحْضُرِىْ عَلٰى مَا فَرَّطْنَا قَصَّرْنَا فِيْهَا اَىِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط بِاَنْ تَاْتِيَهُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ فِىْ اَقْبَحِ شَيْءٍ صُوْرَةً وَاَنْتَنِهٖ رِيْحًا فَتَرْكَبُهُمْ اَلَا سَاۤءَ بِئْسَ مَا يَزِرُوْنَ يَحْمِلُوْنَهٗ حَمْلُهُمْ ذٰلِكَ ـ

৩১. যারা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। حَتّٰى এটা তাদের কর্তৃক পুনরুত্থান অস্বীকার করার সীমা বর্ণনা করছে। এমনকি যখন আকস্মাৎ তাদেরকে নিকট নির্দিষ্ট ক্ষণ অর্থাৎ কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! আমাদের আক্ষেপ! يَا حَسْرَتَنَا অর্থ হে আমাদের দুঃসহ যন্ত্রণা ও ক্লেশ! এখানে مَجَازٌ অর্থাৎ রূপকার্থে এর আহ্বান জানানো হচ্ছে। অর্থাৎ এটাই তোমার সমুপস্থিতির প্রকৃষ্ট সময় সুতরাং তুমি উপস্থিত হও। এতে দুনিয়াতে আমরা যে অবহেলা করেছি ত্রুটি করেছি এ শাস্তি তজ্জন্য। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। অত্যন্ত কুশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় কিয়ামতের দিন তাদের এ কৃতকর্ম উপস্থিত হবে এবং তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। দেখ, তারা যা বহন করত তা অর্থাৎ তাদের এ বোঝা কত মন্দ! কত নিকৃষ্ট!

৩২. وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اَىِ الْاِشْتِغَالُ بِهَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَاَمَّا الطَّاعَاتُ وَمَا يُعِيْنُ عَلَيْهَا فَمِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط الشِّرْكَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ ذٰلِكَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

৩২. পার্থিব জীবন অর্থাৎ তার লিপ্ততা তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নয়। তবে ইবাদত-বন্দেগি ও তার সহায়ক বিষয়সমূহ পরকালের বিষয় বলে গণ্য। بَغْتَةً অর্থ অকস্মাৎ। আর যারা শিরক হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্য পরকালের আবাসই অর্থাৎ জান্নাতই শ্রেয় তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? করলে ঈমান গ্রহণ করতে পারতে। يَعْقِلُوْنَ এটা ى [নাম পুরুষ] ও ت [দ্বিতীয় পুরুষ] রূপে পঠিত রয়েছে।

৩৩. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَعْلَمُ اِنَّهٗ اَىِ الشَّاْنُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ لَكَ مِنَ التَّكْذِيْبِ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ فِى السِّرِّ لِعِلْمِهِمْ اَنَّكَ صَادِقٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّخْفِيْفِ اَىْ لَا يَنْسِبُوْنَكَ اِلَى الْكِذْبِ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ وَضَعَهٗ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اَىِ الْقُرْاٰنِ يَجْحَدُوْنَ يُكَذِّبُوْنَ ـ

৩৩. অবশ্য জানি যে, قَدْ এটা تَحْقِيْق বা সুনিশ্চিতার্থ বোধক শব্দ। اِنَّهٗ -এর সর্বনাম ه -টি এখানে شَاْن -রূপে ব্যবহৃত। তারা তোমাকে অস্বীকার করে যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; তবে তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, গোপনে, এ কারণে যে, তারা তোমাকে সত্যবাদী বলে নিশ্চিত জানে। لَا يُكَذِّبُوْنَكَ এটা অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদহীনরূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারা তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে না। বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর আয়াতকে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করে, মিথ্যা বলে মনে করে। لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ এখানে ضَمِيْر [هُمْ] বা [তারা] সর্বনাম স্থানে এর [الظّٰلِمِيْنَ] ব্যবহার হয়েছে।

٣٤. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ج بِاِهْلَاكِ قَوْمِهِمْ فَاصْبِرْ حَتّٰى يَاْتِيَكَ النَّصْرُ بِاِهْلَاكِ قَوْمِكَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط مَوَاعِيْدِهٖ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ مَا يَسْكُنُ بِهٖ قَلْبُكَ ـ

৩৪. তোমার পূর্বে বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে অস্বীকার করা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্প্রদায়ের ধ্বংস কল্পে তাদের পক্ষে আমাদের সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। সুতরাং তুমিও তোমার সম্প্রদায়ের ধ্বংস কল্পে তোমার পক্ষে আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর আদেশ তাঁর অঙ্গীকার কেউ পরিবর্তন করার নেই। প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে; যা দ্বারা তোমার হৃদয়ে প্রশান্তি আসবে। এ আয়াতটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ।

٣٥. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ عَنِ الْاِسْلَامِ لِحِرْصِكَ عَلَيْهِمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا سِرْبًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا مَصْعَدًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط مِمَّا اقْتَرَحُوْا فَافْعَلِ الْمَعْنٰى اِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ هِدَايَتَهُمْ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى وَلٰكِنْ لَّمْ يَشَأْ ذٰلِكَ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ بِذٰلِكَ ـ

৩৫. যদি ইসলাম সম্পর্কে তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় অর্থাৎ এতদ্বিষয়ে তোমার সুতীব্র আগ্রহের কারণে এটা যদি তোমার জন্য ক্লেশ করা হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাদের আবদারানুসারে কোনো নিদর্শন নিয়ে আস। মোটকথা, তা পারলে, যাও, কর। আর তোমার পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং এদের বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ যদি এদের হেদায়েত চাইতেন তবে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি ফলে এরাও ঈমান আনেনি। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٣٦. اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَكَ اِلَى الْاِيْمَانِ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط سِمَاعَ تَفَهُّمٍ وَاعْتِبَارٍ وَالْمَوْتٰى اَىِ الْكُفَّارُ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِىْ عَدَمِ السِّمَاعِ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ يُرَدُّوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ ـ

৩৬. ঈমানের প্রতি তোমার আহ্বানে সাড়া কেবল তারাই দেবে যারা শুনে। অর্থাৎ উপলব্ধি করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুনে। মৃতগণ অর্থাৎ কাফেরগণ, না শোনার বিষয়ে কাফেদেরকে এখানে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে পরকালে পুনর্জীবন দান করবেন; অতঃপর তাঁর দিকেই এরা প্রত্যানীত হবে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অনন্তর তিনি তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন।

٣٧. وَقَالُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْمَائِدَةِ قُلْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اٰيَةً مِّمَّا اقْتَرَحُوْا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ نُزُوْلَهَا بَلَاءٌ عَلَيْهِمْ لِوُجُوْبِ هَلَاكِهِمْ اِنْ جَحَدُوْهَا .

৩৭. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ বলে, তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোনো নিদর্শন যেমন– উষ্ট্রী, লাঠি, খাঞ্চা ভরা খাদ্য ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়নি কেন? لَوْلَا এটা এখানে সতর্কী ব্যঞ্জক শব্দ هَلَّا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদেরকে বল, আল্লাহ তাদের দাবি অনুসারে নিদর্শন অবতরণ করতে সক্ষম; يُنَزِّلَ এটা তাশদীদসহ [بَابُ تَفْعِيْل] এবং তাশদীদ ব্যতিরেকে [بَابُ ضَرَبَ]-ও পঠিত রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না যে, এর অবতারণ তাদের জন্য মহা এক পরীক্ষা। কারণ, তখন যদি তারা তার অস্বীকার করে তবে এদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

٣٨. وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ دَآبَّةٍ تَمْشِىْ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ فِى الْهَوَاءِ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ فِىْ تَقْدِيْرِ خَلْقِهَا وَرِزْقِهَا وَاَحْوَالِهَا مَا فَرَّطْنَا تَرَكْنَا فِى الْكِتٰبِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مِنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ فَلَمْ نَكْتُبْهُ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ فَيَقْضِىْ بَيْنَهُمْ وَيَقْتَصُّ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُمْ كُوْنُوْا تُرَابًا .

৩৮. ভূপৃষ্ঠে বিচরণ রত এমন জীব নেই এবং স্বীয় ডানার সাহায্যে বাতাসে এমন কোনো পাখি উড়ে না যা সৃষ্টি, জীবনোপকরণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের মতো এক একটি উম্মত নয়। مِنْ دَآبَّةٍ এতে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত। কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুজে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করেনি, না লিখে ছেড়ে দেইনি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সকলে একত্র হবে। مِنْ شَىْءٍ-এর مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত। অনন্তর তিনি সকলের মধ্যে মীমাংসা করবেন। এমনকি শিংহীন প্রাণী শিংওয়ালা প্রাণী হতে বদলা হবে। শেষে এদের সকল কিছুকে মাটি হয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ صُمٌّ عَنْ سِمَاعِهَا سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَّبُكْمٌ عَنِ النُّطْقِ بِالْحَقِّ فِى الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ اِضْلَالَهٗ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ هِدَايَتَهٗ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ .

৩৯. যারা আমার আয়াতে অর্থাৎ আল কুরআনকে মিথ্যা বলে, তারা তা গ্রহণ করার কর্ণে শ্রবণ করা হতে বধির, সত্য কথা বলা সম্পর্কে মূক, তারা অন্ধকারে অর্থাৎ কুফরিতে নিমজ্জিত। যাকে আল্লাহ বিপথগামী করতে চান বিপথগামী করেন, আর যাকে হেদায়েতের ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি সরল পথে দীনে ইসলামের পথে স্থাপন করেন।

٤٠. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةَ اَرَاَيْتَكُمْ اَخْبِرُوْنِىْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ فِى الدُّنْيَا اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ الْقِيٰمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ بَغْتَةً اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ج لَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ اَنَّ الْاَصْنَامَ تَنْفَعُكُمْ فَادْعُوْهَا .

৪০. হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীদেরকে বল, তোমরা ভেবে দেখ আমাকে সংবাদ দাও যে, দুনিয়াতে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা এটা শাস্তি সংবলিত নির্দিষ্ট ক্ষণ কিয়ামত দিবস অকস্মাৎ তোমাদের নিকট উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? না, ডাকবে না। তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও যে, এ সকল প্রতিমা তোমাদের উপকার করে তবে তাদেরকেই ডাক।

٤١. بَلْ إِيَّاهُ لَا غَيْرَهُ تَدْعُوْنَ فِي الشَّدَائِدِ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ أَيْ يَكْشِفُهُ عَنْكُمْ مِنَ الضُّرِّ وَنَحْوِهِ إِنْ شَاءَ كَشْفَهُ وَتَنْسَوْنَ تَتْرُكُوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ مَعَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْعُوْنَهُ.

৪১. বরং তোমরা বিপদে কেবল তাঁকেই ডাক, অপর কাউকেও নয়। যার দিকে তোমরা ডাক তা তিনি দূর করবেন অর্থাৎ যে ক্লেশ, দুঃখ ইত্যাদি বিদূরণের জন্য তোমরা তাঁকে ডাক তিনি তো মোচন করবেন যদি তিনি দূর করার ইচ্ছা করেন। তাঁর সাথে যে সমস্ত প্রতিমা তোমার শরিক করতে তা তোমরা বিস্মৃত হবে, পরিত্যাগ করবে। এদেরকে আর ডাকবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَغْتَةً : অর্থ অকস্মাৎ। এটি بَاغِتَةً-এর অর্থে হয়ে حَالٌ হয়েছে। نَفَقًا অর্থ সুড়ঙ্গ। سُلَّمًا অর্থ সোপান।

قَوْلُهُ حَتّٰى غَايَةً لِلتَّكْذِيْبِ : অর্থাৎ حَتّٰى হরফটি تَكْذِيْب বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শেষ সীমা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। خُسْرَانٌ-এর সীমা বর্ণনা করার জন্য নয়। কেননা তাদের خُسْرَانٌ বা ক্ষতিগ্রস্ততার কোনো সীমা নেই। পক্ষান্তরে تَكْذِيْب -এর সীমা রয়েছে। তাহলো তা দুনিয়াতেই হবে কেয়ামতের পর তা বন্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ نِدَائُهَا مَجَازٌ : এখানে نِدَا বা আহ্বানটা মাজাযী ও রূপক অর্থে হওয়ার কারণ হলো, আহ্বান তো তাকে করা হয় যার মাঝে ফিরে তাকানোর যোগ্যতা রয়েছে। حَسْرَتْ-এর মাঝে সে যোগ্যতা নেই। সুতরাং حَسْرَتْ-কে عُقَلَاء ও বিবেকবানদের স্তরে রেখে আহ্বান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلدُّنْيَا : এটি فِيْهَا-এর যমীরকে যাহের করা হয়েছে। অথচ পূর্বে কাছাকাছি কোথাও দুনিয়ার আলোচনা নেই। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু যেহনীভাবে مَعْلُوْم বা জানা জিনিস তাই তার দিকে যমীর ফিরানো হয়েছে। তাই إِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ-এর ইশকাল বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ حَمْلُهُمْ ذٰلِكَ : এটি مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ

قَوْلُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ : এতে মাউসূফকে সিফতের দিকে إِضَافَتْ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটি يَعْقِلُوْنَ-এর মাফউল। **প্রশ্ন.** এখানে فِي السِّرِّ অংশটি বৃদ্ধি করার ফায়দা কী? **উত্তর.** এর দ্বারা تَعَارُضْ দূর করা হয়েছে। تَعَارُضْ হলো এই যে, لَا يُكَذِّبُوْنَكَ এবং يَجْحَدُوْنَ-এর মাঝে تَعَارُضْ রয়েছে। কেননা, لَا يُكَذِّبُوْنَ-এর মর্ম হলো মিথ্যা প্রতিপন্ন না করা। আর يَجْحَدُوْنَ-এর মর্ম হলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

নিরসন : উক্ত تَعَارُضْ এভাবে নিরসন করা হয়েছে যে, تَكْذِيْب না করা অন্তরের দ্বারা আর تَكْذِيْب করাটা মুখে মুখে।

قَوْلُهُ وَضَعَهُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : এর মর্ম হলো لٰكِنَّهُمْ -এর স্থলে لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ যমীরই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেহেতু কাফেরদের জুলুমের চরিত্রটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল তাই যমীরের স্থলে إِسْمِ ظَاهِرْ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُكَذِّبُوْنَ : يَجْحَدُوْنَ -এর তাফসীর يُكَذِّبُوْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَجْحَدُوْنَ-কে بَاء-এর মাধ্যমে مُتَعَدِّيْ করার কারণ হলো তাতে يُكَذِّبُوْنَ-এর অর্থ নিহিত রয়েছে। আর يُكَذِّبُوْنَ -এর মধ্যে بَاء -এর দ্বারা مُتَعَدِّيْ করা হয় বিধায় এখানেও তেমনটি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَادْعُوْهَا : এটি إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-এর উহ্য জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الخ কাফেরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দান : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতেও বলা হয়েছে فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে তাফসীরে মাজহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দুজন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবূ জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবূ জাহলকে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল হিকাম! [আরবে আবূ জাহল 'আবুল হিকাম' অর্থাৎ জ্ঞানধর নামে খ্যাত ছিল। ইসলামি যুগে কুফরি ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবূ জাহল' অর্থাৎ মূর্খতাধর উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি, আমাকে সত্য সত্য বল। তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

আবূ জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই' -এ সব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কুরাইশরা রিক্তহস্ত থেকে যাবে আমরা তা কিরূপে সত্য করতে পারি? পতাকা বনী কুসাই -এর হাতে রয়েছে। হেরেম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের মধ্যেই ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কুরাইশদের হাতে কি থাকবে? নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবূ জাহল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আপনি মিথ্যাবাদী– এরূপ কোনো ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে পারে, কোনো রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে নয় আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যত যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়।

قَوْلُهُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ : এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকে জীবিত করা হবে। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোনো শিংবিশিষ্ট জন্তু কোনো শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে– 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে– يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ আফসোস, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম। ইমাম বগভী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব : সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোনো শরিয়ত ও বিধিবিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমরা বলেন, হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কোনো কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্ট জীবের পাম্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়– এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। –[মাআরিফুল কুরআন, ৩/২৯২-৯৪]

অনুবাদ :

٤٢. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِنْ زَائِدَةٌ قَبْلِكَ رُسُلًا فَكَذَّبُوْهُمْ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاۤءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّرَّاۤءِ الْمَرَضِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ يَتَذَلَّلُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ.

৪২. তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ-এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। কিন্তু তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে ফলে তাদেরকে অর্থ-সংকট, চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা অসুস্থতা দ্বারা পীড়িত করেছি যাতে তারা বিনীত হয়, অবনত হয় এবং ঈমান আনয়ন করে।

٤٣. فَلَوْلَا فَهَلَّا اِذْ جَاۤءَهُمْ بَاْسُنَا عَذَابُنَا تَضَرَّعُوْا اَىْ لَمْ يَفْعَلُوْا ذٰلِكَ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِى لَهُ وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ فَلَنْ تَلِنَ لِلْاِيْمَانِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ فَاَصَرُّوْا عَلَيْهَا.

৪৩. আমার শাস্তি অর্থাৎ আজাব যখন তাদের উপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? বিনীত হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও তারা এটা করল না। আসলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে তাই এটা ঈমান আনয়নের জন্য কোমল হচ্ছে না এবং তারা যা অর্থাৎ যে পাপ ও অবাধ্যাচরণ করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে ধরেছিল। ফলে তারা এর উপর জিদ ধরে বসে থাকে। لَوْلَا-এটা এখানে تَنْبِيْه বা সতর্কীসূচক শব্দ هَلَّا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٤. فَلَمَّا نَسُوْا تَرَكُوْا مَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا وَ خُوِّفُوْا بِهٖ مِنَ الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ فَلَمْ يَتَّعِظُوْا فَتَحْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ مِنَ النِّعَمِ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْا فَرَحَ بَطَرٍ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ بَغْتَةً فَجْاَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ اٰيِسُوْنَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ.

৪৪. এর মাধ্যমে অর্থাৎ দারিদ্র্য ও রোগ-শোক দ্বারা তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল শিক্ষাদান এবং ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো তা পরিত্যাগ করল এবং কোনো উপদেশ গ্রহণ করল না তখন উন্মুক্ত করে দিলাম; فَتَحْنَا এটা তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও তাশদীদ ব্যতিরেকেই উভয়রূপে পাঠ করা যায়। তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার অর্থাৎ তাদের প্রতি অবকাশ প্রদান স্বরূপ সকল স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার অবশেষে তাদেরকে প্রদত্ত স্বাচ্ছন্দ্যে তারা যখন মত্ত হলো অহংকারে আত্মহারা হয়ে উঠল তখন অকস্মাৎ হঠাৎ তাদেরকে শাস্তিতে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনই তারা নিরাশ হলো। অর্থাৎ সকল কল্যাণ সম্পর্কে তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

٤٥. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط اَىْ اٰخِرُهُمْ بِاَنْ اُسْتُؤْصِلُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى نَصْرِ الرُّسُلِ وَهَلَاكِ الْكٰفِرِيْنَ.

৪৫. অতঃপর সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো। অর্থাৎ এদের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত উৎপাটিত করা হলো রাসূলগণকে সাহায্য এবং কাফেরদের ধ্বংস করায় প্রশংসা আল্লাহরই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

٤٦. قُلْ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَرَأَيْتُمْ أَخْبِرُوْنِى إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ أَصَمَّكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ عَمَاكُمْ وَخَتَمَ طَبَعَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ فَلَا تَعْرِفُوْنَ شَيْئًا مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ ط بِمَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بِزَعْمِكُمْ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ الدَّلَالَاتِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ عَنْهَا فَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

৪৬. মক্কাবাসীদেরকে বল, ভেবে দেখ, আমাকে সংবাদ দাও, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন অর্থাৎ তোমাদেরকে বধির ও অন্ধ করে দেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন, সিল করে দেন। কিছুই তোমরা চিনতে ও বুঝতে না পার তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ তোমাদের ধারণায় আছে যে তোমাদেরকে এগুলো অর্থাৎ যেগুলো তোমাদের হতে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখ কিরূপভাবে আমি নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ আমার একত্বের নিদর্শনসমূহের বর্ণনা করি। প্রতদসত্ত্বেও তারা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং ঈমান আনয়ন করে না।

٤٧. قُلْ لَهُمْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ أَىْ مَا يُهْلَكُ إِلَّا هُمْ.

৪৭. তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে বল, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে অর্থাৎ রাত্রে বা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত কাফেরগণ ব্যতীত আর কে ধ্বংস হবে? অর্থাৎ এরা ব্যতীত আর কেউ ধ্বংস হবে না।

٤٨. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ وَمُنْذِرِيْنَ ج مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ فَمَنْ اٰمَنَ بِهِمْ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ.

৪৮. রাসূলগণকে শুধু যারা ঈমান আনয়ন করবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদবাহী এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি। কেউ তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেও স্বীয় কার্য সংশোধন করলে পরকালে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।

٤٩. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ يَخْرُجُوْنَ عَنِ الطَّاعَةِ.

৪৯. যারা আমার নির্দেশকে অস্বীকার করে সত্য ত্যাগের কারণে আনুগত্যের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে।

٥٠. قُلْ لَهُمْ لَّآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ الَّتِىْ مِنْهَا يُرْزَقُ وَلَآ أَنِّىْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِّىْ وَلَمْ يُوْحَ إِلَىَّ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّىْ مَلَكٌ ج مِنَ الْمَلٰئِكَةِ إِنْ مَا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَىَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمٰى الْكَافِرُ وَالْبَصِيْرُ الْمُؤْمِنُ لَا أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ.

৫০. তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার বর্তমান যা হতে তিনি জীবনোপকরণ দান করেন, অদৃশ্য সম্পর্কেও অর্থাৎ যা আমার দৃষ্টির বাইরে এবং যার সম্পর্কে আমাকে ওহী প্রেরণ করা হয়নি সে সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদের এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতাগণের অন্যতম একজন ফেরেশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি; إن এটা এখানে না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বল, অন্ধ অর্থাৎ কাফের ও চক্ষুষ্মান অর্থাৎ মু'মিন কি সমান? তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? তা করলে তোমরা ঈমান নিয়ে আসতে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نُصَرِّفُ : এখানে অর্থ বর্ণনা করি।

قَوْلُهُ مِنْ زَائِدَةٌ : مِنْ قَبْلِكَ -এর মাঝে مِنْ হরফটি হলো অতিরিক্ত। কেননা ظَرْف হরফে জর দাবি করে না।

قَوْلُهُ رُسُلًا : এটি اَرْسَلْنَا-এর উহ্য মাফউল।

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوْهُمْ : প্রশ্ন. এখানে فَكَذَّبُوْهُمْ মাহযূফ ধরার কি প্রয়োজন হলো? উত্তর : যাতে فَاَخَذْنَاهُمْ -এর تَفْرِيْع সঠিক হয়। তাকদীরী ইবারত হবে- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فَكَذَّبُوْهُمْ فَاَخَذْنٰهُمْ অন্যথায় শুধু রাসূল প্রেরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রশ্নই নেই, বরং অস্বীকার করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।

قَوْلُهُ اَخَذَهُ مِنْكُمْ : প্রশ্ন. اَخَذَهُ-এর মধ্যে যমীর একবচন কেন আনা হলো? অথচ তার مَرْجِعْ হলো বহুবচন।
উত্তর : উল্লিখিত مَاخُوْذٌ-এর তাবীলে যমীর একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِزَعْمِكُمْ : এর সম্পর্ক হলো مِنْ اِلٰهٍ-এর সাথে। অর্থাৎ ঐ ইলাহ যাকে তোমরা ইলাহ মনে কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ .... لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ : অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কিনা। তারা যখন এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বারে খুলে দেওয়া হলো এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হলো। আশা ছিল যে, তারা এ সব নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হলো। নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওজর-আপত্তির আর কোনো ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবার ও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতের উপর এ আজাব জলেস্থলে ও অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে সিমার করে দিয়েছে। হযরত নূহ (আ.) -এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত লূত (আ.)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে বেঙ, মাছ ইত্যাদি জীবজন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহরে মাইয়্যেত' তথা মৃত সাগর নামে এবং 'বাহরে লুত' নামেও অভিহিত করা হয়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আজাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোনো সময় তারা বাহ্যত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তী তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো জাতির প্রতি আকস্মাৎ আজাব নাজিল করেন না, বরং প্রথমে হুঁশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আজাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসে।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ ভালো-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিদান দিবস। কিন্তু আজাবের নমুনা হিসেবে কিছু কষ্ট এবং ছওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোনো কোনো সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোনো কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

মোটকথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের নমুনামাত্র। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শো-রুম। ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখাবার জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শো-রুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব, বোঝা গেল যে, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি কৌশলমাত্র।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্যে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে আজাব হিসেবে যে কষ্ট বিপদ কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমত কার্যরত থাকে।

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষায় সম্মুখীন করা হয়, অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে রয়েছে এবং সফল জীবনযাপন করছে। অনেক সময় আজাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহের এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোনো ব্যক্তির উপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আজাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন– ১. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, ২, সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাসভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে– আল্লাহর ব্যাপক আজাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে– وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী অত্যাচারীদের উপর আজাব নাজিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এজন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ৩/২৯৬-৯৯]

قَوْلُهُ قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ الخ : কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তিনটি দাবি করেছিল। ১. যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে মু'জিযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমাদের জন্য একত্র করে দিন। ২. যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলি ব্যক্ত করুন, যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্বে থেকেই করে নিতে পারি। ৩. আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতোই পিতামাতার

মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘোরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সমঅংশীদার, তিনি কিভাবে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলিতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোনো ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহর রাসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরিউক্ত তিনটি দাবির উত্তরে বলা হয়েছে- قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দাবি করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আল্লাহ তা'আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবি করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদের বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবি করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়- অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রিসালত দাবি করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ তা'আলারই মতো প্রত্যেক ছোট বড় অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোনো ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরি নয়। রাসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত ঐশীবাণী অনুসরণ করবেন, নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহ্বান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা একদিকে রিসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রাসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রিস্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহ না মনে করে বসে। রাসূলের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার দাবিও তাই; এ ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদিরা রাসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রিস্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদরা অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বোঝা যায় ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে, এতে কোনো বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তাফসীরবিদরা যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোনো মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ভাণ্ডার পয়গাম্বর কুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোনো ওলী অথবা বুজুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন। সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে- وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রিসালতে অস্বীকার করবে। মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ। বলার পরিবর্তে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে "আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না" বলা হয়েছে।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোনো ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ তা'আলার সব ভাণ্ডার রাসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশত এসব দাবি করত। কাজেই কাফেরদের

এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবি কখনও করিনি।

কিন্তু অদৃশ্য বিষয় জানার প্রশ্নটি এমন নয়। কেননা তারা জ্যোতিষী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের সম্পর্কেও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অতএব, আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখাও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে, তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে অনেক অদৃশ্য সংবাদও শুনেছিল এবং তদনুযায়ী ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তাই এখানে শুধু 'বলি না' বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং 'অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে যেসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কোনো রাসূল, ফেরেশতা কিংবা ওলীকে দান করা হয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান' বলা যায় না। এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। বরং সব ফেরেশতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে যেটুকু জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাদের সবার জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান একা মহানবী ﷺ -কে দান করা হয়েছিল।

সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তাই। কিন্তু এর সাথে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব পণ্ডিতের এটাও বিশ্বাস যে, সমগ্র সৃষ্টজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কোনো ফেরেশতা কিংবা রাসূল তাঁর সমতুল্য নয়, এ কারণেই কোনো ফেরেশতা কিংবা পয়গাম্বরকে লাখো অদৃশ্য বিষয় জানা সত্ত্বেও 'আলিমুল গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। এ গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

মোটামুটিভাবে সাইয়্যেদুর রাসূল, সরওয়ারে কায়েনাত, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে সর্বাধিক অর্থবহ বাক্য হচ্ছে এই- بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر [সংক্ষেপে আল্লাহর পরে তুমিই সবার বড়]। জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রাসূলের চাইতে তাঁর জ্ঞান অধিক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সমান নয়। সমান হওয়ার দাবি করা খ্রিস্টবাদ প্রবর্তিত বাড়াবাড়ির পথ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। উদ্দেশ্যে এই যে, মানসিক আবেগপ্রবণতা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তব সত্য উপলব্ধি কর, যাতে তোমরা অন্ধদের মধ্যে গণ্য না হও এবং চক্ষুষ্মান হয়ে যাও। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা তোমরা এ দৃষ্টি অর্জন করতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্কবিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রিসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে- ১. কিয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, ২. অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং ৩. সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। কিন্তু প্রথমোক্ত দু-প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশি আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে- وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন। [৩/৩০৩-৬]

অনুবাদ :

٥١. وَاَنْذِرْ خَوِّف بِهِ بِالْقُرْانِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ اَىْ غَيْرِهِ وَلِيٌّ يَّنْصُرُهُمْ وَّلَا شَفِيْعٌ يَّشْفَعُ لَهُمْ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ مِّنْ ضَمِيْرِ يُحْشَرُوْا وَهِىَ مَحَلُّ الْخَوْفِ وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْعَاصُوْنَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ بِاِقْلَاعِهِمْ عَمَّا هُمْ فِيْهِ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ ـ

৫১. তুমি তাদেরকে এটা অর্থাৎ আল কুরআন দ্বারা সতর্ক কর ভয় প্রদর্শন কর, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক যে তাদেরকে সাহায্য করবে বা সুপারিশকারী যে তাদের জন্য সুপারিশ করবে এমন কেউ থাকবে না। لَيْسَ لَهُمْ না অর্থবোধক এ বাক্যটি يُحْشَرُوْا ক্রিয়ার ضَمِيْر [সর্বনাম] هُمْ -এর حَالٌ আর এটাই হচ্ছে مَحَلٌّ الْخَوْف অর্থাৎ ভয়ের স্থান। এখানে পাপী মুমিনদের কথা বুঝানো হয়েছে। হয়তো তারা বর্তমানে যে মন্দ কাজে লিপ্ত তার মূলোৎপাটন করত এবং সৎ আমল করত আল্লাহকে ভয় করবে।

٥٢. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَجْهَهٗ ط تَعَالٰى لَا شَيْئًا مِّنْ اَعْرَاضِ الدُّنْيَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ طَعَنُوْا فِيْهِمْ وَطَلَبُوْا اَنْ يَّطْرُدَهُمْ لِيُجَالِسُوْهُ وَاَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ طَمَعًا فِىْ اِسْلَامِهِمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ اِنْ كَانَ بَاطِنُهُمْ غَيْرَ مَرْضِيٍّ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ جَوَابُ النَّفْيِ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ـ

৫২. যারা তাদের প্রতিপালককে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কেবল তাঁরই আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে নয় তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। এরা হলেন দরিদ্র মুসলিমগণ। মুশরিকরা তাদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখত এবং কটাক্ষ করত। রাসূল ﷺ -এর দরবারে বসার পূর্বশর্ত হিসেবে মুশরিকরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার দাবি করেছিল। এদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি রাসূল ﷺ -এর আগ্রহাতিশয্যের কারণে তিনি তার ইচ্ছাও করে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উক্ত নির্দেশ নাজিল করেছিলেন। তাদের অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তর যদি সন্তোষজনক না হয় তবে এর জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, مِنْ شَىْءٍ এখানে مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। এবং তোমার কোনো বিষয়ের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। فَتَطْرُدَهُمْ এটা উক্ত نَفِى অর্থাৎ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ এ না-বোধক বক্তব্যটির জবাব। তবে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি এরূপ কর।

٥٣. وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا اِبْتَلَيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اَىِ الشَّرِيْفَ بِالْوَضِيْعِ وَالْغَنِيَّ بِالْفَقِيْرِ بِاَنْ قَدَّمْنَاهُ بِالسَّبْقِ اِلَى الْاِيْمَانِ لِيَقُوْلُوْا اَىِ الشُّرَفَاءُ وَالْاَغْنِيَاءُ مُنْكِرِيْنَ ـ

৫৩. এভাবে তাদের একদলকে অন্য দল যারা অর্থাৎ কুলিন এবং হীন, ধনী এবং নির্ধন, একদলকে অপর দল দ্বারা পরীক্ষা করি যেমন একদলকে অগ্রে ঈমান আনার তাওফীক দিয়ে দেই যেন তারা অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ও মর্যাদার অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীগণ–

أَهٰؤُلَاءِ الْفُقَرَاءُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط بِالْهِدَايَةِ اَىْ لَوْ كَانَ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُدًى مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ لَهٗ فَيَهْدِيْهِمْ بَلٰى .

বলে, আমাদে মধ্যে কি এদের এ দরিদ্রদের প্রতিই আল্লাহ হেদায়েত করত অনুগ্রহ করলেন? অর্থাৎ এরা যে পথ গ্রহণ করেছে তা যদি হেদায়েত এবং সৎপথ হতো তবে কখনও এরা আমাদের অগ্রে তা গ্রহণ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? নিশ্চয় তিনি অবহিত। তাই তাদেরকে তিনি হেদায়েত করেন।

٥٤. وَاِذَا جَاۤءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ لَهُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ قَضٰى رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ اَيِ الشَّاْنُ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِالْفَتْحِ بَدَلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۤءًا بِجَهَالَةٍ مِنْهُ حَيْثُ اِرْتَكَبَهٗ ثُمَّ تَابَ رَجَعَ مِنْۢ بَعْدِهٖ بَعْدَ عَمَلِهٖ عَنْهُ وَاَصْلَحَ عَمَلَهٗ فَاَنَّهٗ اَيِ اللّٰهُ غَفُوْرٌ لَهٗ رَّحِيْمٌ بِهٖ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِالْفَتْحِ اَىْ فَالْمَغْفِرَةُ لَهٗ .

৫৪. যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল 'তোমাদের প্রতি সালাম' তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। ফয়সালা করে নিয়েছেন। اَنَّهٗ-এর ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনাম ه-টি شَاْن বাচক। অপর এক কিরাতে এটা اَلرَّحْمَةَ -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ হিসেবে হামযাটি ফাতাহসহ اَنَّهٗ রূপে পঠিত রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অর্থাৎ তাতে জড়িত হয়ে পড়ে অতঃপর তওবা করে অর্থাৎ তাতে লিপ্ত হওয়ার পর তা হতে ফিরে যায় এবং স্বীয় আমল সংশোধন করে তবে তো তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল, তার বিষয়ে পরম দয়ালু। অর্থাৎ তবে তার জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মাগফিরাত। فَاَنَّهٗ-অপর এক কেরাতে এর হামযা অক্ষরটি ফাতাহ সহকারে পঠিত রয়েছে।

٥٥. وَكَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ الْقُرْاٰنَ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ فَيُعْمَلُ بِهٖ وَلِتَسْتَبِيْنَ تَظْهَرَ سَبِيْلُ طَرِيْقُ الْمُجْرِمِيْنَ فَتُجْتَنَبُ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِىْ اُخْرٰى بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَنَصْبِ سَبِيْلَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ .

৫৫. এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন বর্ণনা করে দিয়েছি সেভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই, বিবৃত করে দেই যাতে মানুষ আমল করতে পারে এবং যাতে অপরাধীদের পথ, তাদের পন্থা প্রকাশিত হয়, সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে, তা হতে মানুষ দূরে সরে থাকতে পারে। لِتَسْتَبِيْنَ অপর এক কেরাতে تَحْتَانِيَّه [ى] অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে এবং অন্য এক কেরাতে فَوْقَانِيَّة [ت] দ্বিতীয় পুরুষরূপে ও سَبِيْل শব্দটি مَنْصُوْب [ফাতাহসহ]-রূপে পঠিত রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় এখানে রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন হচ্ছে বলে বিবেচ্য হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَتَنَّا : এখানে এর অর্থ আমরা পরীক্ষা করি।

قَوْلُهٗ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُحْشَرُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جُمْلَه مَنْفِيَّة [না-বাচক বাক্যটি] اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ -এর সিফত নয়। কেননা, اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ হলো مَعْرِفَه এবং جُمْلَه হলো نَكِرَه আর نَكِرَه শব্দ -এর مَعْرِفَه

সিফত হতে পারে না। এমনিভাবে يُحْشَرُوْا-এর যমীর থেকেও সিফত হতে পারে না। কেননা, প্রসিদ্ধ কায়দা হলো اَلضَّمِيْرُ لَا يُوْصَفُ وَلَا يُوْصَفُ بِهِ বরং يُحْشَرُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হতে পারে।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَحَلُّ الْخَوْفِ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُؤَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. হাশর সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের কী উদ্দেশ্য? হাশর তো অবশ্যম্ভাবী হবে। সে সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। ভয় প্রদর্শন দ্বারা কোনো উপকার হবে না।

উত্তর : مَحَلِّ اِنْذَارْ তথা مُخَوَّفٌ بِهِ এমন অবস্থায় হাশর যে, তার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। আর اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ দ্বারা গুনাহগার মু'মিন উদ্দেশ্য। কেননা, যে ব্যক্তি হাশরের বিশ্বাস রাখে না তাকে ভয় দেখানো অনর্থক কাজ। আর যে পূর্ব থেকেই মুত্তাকী তাকে ভয় দেখানো تَحْصِيْلِ حَاصِلْ লাজেম আসে। সুতরাং এটা নির্ধারিত হলো যে, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তারা গুনাহগার মু'মিন।

قَوْلُهُ جَوَابُ النَّفْيِ : অর্থাৎ فَتَطْرُدَهُمْ বাক্যটি مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ-এর জবাব। এটি تَطْرُدَ ফে'লের নসব হওয়ার কারণ বর্ণনা।

قَوْلُهُ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَتَكُوْنَ شَرْط مَحْذُوْف -এর جَزَاء مُقَدَّمْ সুতরাং جَوَاب نَفِيْ তাকরার হওয়ার সংশয় দূর হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِالسَّبْقِ : اَيْ بِسَبَبِ السَّبْقِ

قَوْلُهُ لِيَقُوْلُوْا : এখানে لَامْ-টি عَاقِبَتْ -এর জন্য। সুতরাং এ আপত্তি খতম হয়ে গেল যে, اِبْتِلَاء-এর ইল্লত পূর্বোক্ত উক্তিকে সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ : ফাতহার সুরতে رَحْمَةٌ থেকে বদল হবে। **আর কাসরার সুরতে** جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে, যা سُؤَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব হবে। অর্থাৎ **রহমতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে** مَا هِيَ **-আর** مَنْ عَمِلَ الخ **থেকে পূর্ণ জুমলা** সে سُؤَال مُقَدَّرٌ -এর জবাব।

قَوْلُهُ فَالْمَغْفِرَةُ لَهُ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنَّهُ-এর মাঝে اَنَّ তার ইসমসহ মুবতাদা। আর لَهُ তার খবর।

قَوْلُهُ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِتَسْتَبِيْنَ-এর আতফ হলো عِلَّتْ مُقَدَّرَه -এর সাথে। সুতরাং **পূর্বের সাথে** عَطْف হওয়া অশুদ্ধ হওয়ার সংশয় শেষ হয়ে গেল। আর আয়াতে مُضَارِعٌ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে اِسْتِمْرَارْ **বুঝানোর** জন্য। সুতরাং تَخْصِيْصْ بِالْمُسْتَقْبِلِ -এর আপত্তিও শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ : অর্থাৎ একটি কেরাতে لِيَسْتَبِيْنَ শব্দটি يَاء-সহ পঠিত হয়েছে এবং اَلسَّبِيْلُ তার **ফায়েল। আর** سَبِيْلُ যেহেতু مُذَكَّرْ এবং مُؤَنَّثْ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয় তাই عَدَم مُطَابَقَتْ-এর আপত্তিও **করা যাবে** না। **আর** اَلسَّبِيْلَ **নসব** হওয়ার সুরতে تَسْتَبِيْنَ-এর মাফউল হবে। حَاضِرْ -এর সীগার **সুরতে সম্বোধন রাসূল** ﷺ -কে **করা হবে।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا جَاۤءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ الخ : এ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরবিদদের উক্তি দ্বিবিধ। অধিকাংশের মতে এ আয়াতগুলোও পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সমর্থনে তাঁরা এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ সর্দাররা আবূ তালিবের মাধ্যমে দাবি জানাল যে, আপনার মজলিসে দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোক থাকে। তাদের কাতারে বসে আপনার কথাবার্তা শুনতে পারি না। আমাদের আগমনের সময় যদি তাদের মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার কথাবার্তা শুনব ও চিন্তাভাবনা করব।

এতে হযরত ফারুকে আযম (রা.) পরামর্শ দিলেন যে, এ দাবি মেনে নিতে অসুবিধা কি? মুসলমানরা তো অকৃত্রিম বন্ধু আছেই। তাদেরকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে বলে দেওয়া হবে। সম্ভবত এভাবে কুরাইশ সর্দাররা আল্লাহর কালাম শুনবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে।

কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে এ পরামর্শের বিপক্ষে নির্দেশ আসে যে, কখনও এমনটি করা যাবে না। এমন করা অন্যায় ও অবিচার। এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ফারুকে আযম (রা.) নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে হয়তো তিনি মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতের সারমর্ম এই যে, আপনাকে অতীত ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না বলে তাদেরকে শান্ত করে দিন। শুধু তাই নয়, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতের ওয়াদাও শুনিয়ে দিন। তাঁর দরবারের এ আইন সম্পর্কেও বলে দিন যে, যখন কোনো মুসলমান অজ্ঞতাবশত কোনো মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে নেয় এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং ভবিষ্যতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামত থেকেও তাকে বঞ্চিত করবেন না।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতগুলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ এসব আয়াতের বিষয়বস্তুকে একটি স্বতন্ত্র নির্দেশনামা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়বস্তু তাদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহ করে ফেলে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উপরিউক্ত উভয়বিধ উক্তিতে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। কেননা, সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন মাজীদের কোনো নির্দেশ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও যদি তার ভাষা ও বিষয়বস্তু ব্যাপক হয়, তবে সে নির্দেশটি শুধু সে বিশেষ ঘটনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না, বরং এটি ব্যাপক নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে তবুও এ নির্দেশ একটি ব্যাপক বিধির মর্যাদা রাখে, যা প্রত্যেক গুনাহগারের বেলায় প্রযোজ্য, যে গুনাহ করার পর স্বীয় ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন করে নেয়।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৩১৩-১৪]

٥٦. قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ فِى عِبَادَتِهَا قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا إِنِ اتَّبَعْتُهَا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

٥٧. قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّنْ رَّبِّى وَ قَدْ كَذَّبْتُمْ بِهِ ط بِرَبِّى حَيْثُ أَشْرَكْتُمْ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ ط مِنَ الْعَذَابِ إِنِ مَا الْحُكْمُ فِى ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ إِلَّا لِلّٰهِ ط وَحْدَهُ يَقْضِ الْقَضَاءَ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ الْحَاكِمِيْنَ وَفِى قِرَاءَةٍ يَقُصُّ أَىْ يَقُوْلُ.

٥٨. قُلْ لَّهُمْ لَوْ أَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِىَ الْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ط بِأَنْ أَعْجَلَهُ لَكُمْ وَأَسْتَرِيْحَ وَلٰكِنَّهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ مَتٰى يُعَاقِبُهُمْ.

٥٩. وَعِنْدَهُ تَعَالٰى مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَزَائِنُهُ أَوِ الطُّرُقُ الْمُوْصِلَةُ إِلٰى عِلْمِهِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَهِىَ الْخَمْسَةُ الَّتِىْ فِى قَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَيَعْلَمُ مَا يَحْدُثُ فِى الْبَرِّ الْقِفَارِ وَالْبَحْرِ ط الْقُرَى الَّتِىْ عَلَى الْأَنْهَارِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَائِدَةٌ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ عَطْفٌ عَلٰى وَرَقَةٍ إِلَّا فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ وَالْإِسْتِثْنَاءُ بَدَلُ إِشْتِمَالٍ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ قَبْلَهُ.

অনুবাদ :

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর অর্থাৎ যাদের উপাসনা কর তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, তাদের উপাসনা করে আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না। যদি এর অনুসরণ করি তবে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

৫৭. বল, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণের উপর, দ্ব্যর্থহীন বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তোমরা তাকে অর্থাৎ আমার প্রভুকে তাঁর সাথে শিরক করত অস্বীকার করেছ। وَكَذَّبْتُمْ বাক্যটি حَالْ এ কথা বুঝানোর জন্য তাফসীরে وَاوْ-এর পর قَدْ উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা যা অর্থাৎ যে শাস্তি সত্বর চাইছ তা আমার নিকট নেই। এ বিষয়েই হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে সকল কর্তৃত্ব এক আল্লাহরই। তিনি সত্য ফয়সালা দেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে বিচারকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। يَقْضِىْ অপর এক কেরাতে এর স্থলে يَقُصُّ পঠিত রয়েছে। অর্থ হলো, বিবৃত করেন।

৫৮. বল, তোমরা যা সত্বর চাইছ তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেত। অতি শীঘ্র তা তোমাদের উপর চাপিয়ে তোমাদের হতে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু তা মূলত আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে অর্থাৎ কবে তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন এতদসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

৫৯. অদৃশ্যের কুঞ্জি অর্থাৎ তার ভাণ্ডার বা তার ইলমে পৌঁছানোর পন্থাসমূহ তাঁর নিকটই, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো, إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [৩১ : ৩৪] এ আয়াতটিতে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়। বারর অর্থাৎ মাঠে, বনজঙ্গলে এবং বাহরে অর্থাৎ নদীর তীরবর্তী জনপদসমূহে যা কিছু আছে এবং ঘটে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; مِنْ وَرَقَةٍ-এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা কাঁচা ও শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফূজে নেই। وَلَا حَبَّةٍ পূর্বোল্লিখিত وَرَقَةٍ-এর সাথে عَطْف হয়েছে। إِلَّا فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ পূর্বোল্লিখিত إِسْتِثْنَاء অর্থাৎ ব্যত্যয়ী বাক্য إِلَّا يَعْلَمُهَا-এর بَدَلُ إِشْتِمَالٍ অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট স্থলাভিষিক্ত পদরূপে এ إِسْتِثْنَاء অর্থাৎ ব্যত্যয়ী বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٠. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ عِنْدَ النَّوْمِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ كَسَبْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ أَيْ النَّهَارِ بِرَدِّ أَرْوَاحِكُمْ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ج هُوَ أَجَلُ الْحَيٰوةِ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ ـ

৬০. তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন, নিদ্রাকালে তোমাদের রূহসমূহ নিয়ে যান এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন; অতঃপর এতে অর্থাৎ দিবসে তোমাদের রূহসমূহ ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিত কাল অর্থাৎ জীবনের মেয়াদ পূর্ণ হয়। অতঃপর পুরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنِ الْحُكْمُ : এর إِنْ শব্দটি না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই إِنْ -এর পরে مَا শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْقَضَاءَ : اَلْحَقَّ শব্দটি এখানে مَوْصُوْف অর্থাৎ বিশেষ্যতব্য পদ اَلْقَضَاءَ-এর صِفَتْ অর্থাৎ বিশেষণ। একথা বুঝানোর জন্য তাফসীরে এর পূর্বে اَلْقَضَاءَ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا جَرَحْتُمْ : অর্থ তোমরা যা অর্জন কর।

قَوْلُهُ قَدْ كَذَّبْتُمْ : প্রশ্ন. এখানে قَدْ শব্দটি মাহযূফ ধরার কী প্রয়োজন হলো? উত্তর : فِعْل مَاضِىْ যেহেতু قَدْ ছাড়া حَالْ হতে পারে না এজন্য এখানে قَدْ উহ্য ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْقَضَاءَ الْحَقَّ : প্রশ্ন. এখানে اَلْقَضَاءَ মাহযূফ ধরার কী প্রয়োজন দেখা দিল? উত্তর. এটা মাহযূফ ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, الحق মাহযূফ মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। সুতরাং এখন এ সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল যে, اَلْحَقّ শব্দের সিফত হওয়ার কারণে মাজরূর হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَقُصُّ : يَقُوْلُ الْحَقَّ অর্থাৎ أَىْ يَقُصُّ الْحَقَّ

قَوْلُهُ اَلْمَفَاتِحُ : এটি مِفْتَحٌ [بِكَسْرِ الْمِيْمِ]-এর বহুবচন। অর্থ– চাবি। কেউ কেউ বলেন, مَفْتَحٌ [بِفَتْحِ الْمِيْمِ] -এর বহুবচন। অর্থ– খাজানা, ভাণ্ডার।

قَوْلُهُ اَلْقَفْرُ : খালি ভূমি।

قَوْلُهُ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ : অর্থাৎ إِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ হলো প্রথম إِسْتِثْنَاء তথা إِلَّا يَعْلَمُهَا থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। মূলত এটি তাফসীরে কাশশাফ রচয়িতার প্রতি খণ্ডন। কেননা তিনি দ্বিতীয় إِسْتِثْنَاء টিকে প্রথমটির تَاكِيْد আখ্যা দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে– وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর একবচন مِفْتَحٌ ও مَفْتَحٌ উভয়টিই হতে পারে। مَفْتَحٌ -এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مِفْتَحٌ-এর অর্থ চাবি; আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ ও অনুবাদক مِفْتَحٌ -এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বুঝানো যায়।

কুরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর : غَيْب শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি। -[মাযহারী]

প্রথম প্রকার দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণত কে কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিজিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন কোথায় কি পরিমাণ হবে। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ : এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা, অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে, তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عِنْدَهٗ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছে– لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবহিত নয়। তাই এ বাক্য দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে– ১. আল্লাহ তা'আলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া; এবং ২. তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কুরআনের পরিভাষায় غَيْب শব্দের অর্থ পূর্বে তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব প্রাপ্ত করলেও কোনো সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্য দৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু غَيْب শব্দটি মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غَيْب বলে অভিহিত করে, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিদ প্রশ্ন মাথ-চাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণত জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, গণনা বিদ্যা কিংবা হস্তরেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও ইলহাম' [সত্য স্বর্গীয় প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান] দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি জেনে ফেলে অথবা মৌসুমি বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয় এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন পাক 'ইলমে গায়েব'কে আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা 'কাশ্‌ফ ও ইলহামে'র মাধ্যমে যদি কোনো বান্দাকে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে গায়েব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান-অর্জন করা হয়, তাও কুরআনি পরিভাষা অনুযায়ী 'ইলমে গায়েব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে

দেওয়া। কারণ আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোনো হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় ; কিন্তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের নিকট সেগুলো অজানা থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস, দু-মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা এখন পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোনো হাকীম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বছর দু-বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ঔষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ স্বভাবত এর কোনো ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না।

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরিউক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনোটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইলম বটে, কিন্তু 'গায়েব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একত্রিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই, যেমন আমরা কোনো রেল গাড়ির কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবি করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয় এবং একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়। গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চারটি ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বভাবিক ব্যাপার। কোনো জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্স-রে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা, কুরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়েব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবত যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃতপক্ষে 'গায়েব' নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না হওয়ার দরুন তাকে 'গায়েব' বলেই অভিহিত করা হয়।

এমনিভাবে কোনো রাসূল ও নবীকে ওহীর মাধ্যমে এবং ওলীকে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে যে কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের ইলম দেওয়া হয়, দেওয়ার পর তা আর গায়েব থাকে না। কুরআনে একে গায়েব না বলে أَنْبَاءُ الْغَيْبِ [গায়েবের খবর] বলা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত রয়েছে- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ তাই আলোচ্য আয়াত لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্যের ভাণ্ডার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এতে কোনোরূপ প্রশ্ন ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই।

এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার 'আলিমুল গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ গুণটি বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যসমূহে এর বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ উপস্থিত ও বিদ্যমান বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী; কোনো অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে- স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। কোন বৃক্ষের কোন পাতা ঝরে না, সেটা তিনিই জানেন। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও তিনি জানেন এবং সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি আর্দ্র ও শুষ্ক কণা তাঁর জ্ঞানে ও লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মোটকথা, জ্ঞান সম্পর্কিত দুটি বিষয় একান্তই আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। কোনো ফেরেশতা, কোনো রাসূল কিংবা কোনো সৃষ্ট জীব এতে তাঁর অংশীদার নয়। একটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও অপরটি সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোনো অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের অগোচরে নয়। প্রথম আয়াতে এ দুটি বিশেষ গুণই বর্ণিত হয়েছে।

এর প্রথম বাক্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহে সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান বর্ণনা করে প্রথমে বলা হয়েছে- وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ স্থলে ও জলে যা রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। 'স্থলে ও জলে' বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও দৃশ্যজগৎ বোঝানো হয়েছে। যেমন সকাল ও বিকাল বলে সম্পূর্ণ সময় এবং পূর্ব ও পশ্চিম বলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বোঝানো হয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত।

অতঃপর বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানগতভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিবেষ্টন করা শুধু এই নয় যে, বড় বড় বস্তুগুলোর খবরই তিনি জানেন; বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا অর্থাৎ সারা জাহানে কোনো বৃক্ষের এমন কোনো পাতা ঝরে না, যা তাঁর জানা নেই। উদ্দেশ্যে এই যে, প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক পাতা ঝরার পূর্বে ঝরার সময় এবং ঝরার পর তিনি জানেন। তাঁর জানা আছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা কতবার নড়াচড়া করবে, কখন এবং কোথায় ঝরবে। অতঃপর কোন কোন অবস্থা অতিক্রম করবে। ঝরার কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা, বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া হচ্ছে পাতার ক্রমবিকাশ ও বনজ জীবনের সর্বশেষ স্তর। তাই শেষ অবস্থা উল্লেখ করে আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ : অর্থাৎ ভূপ্রষ্ঠের গভীরতায় ও অন্ধকারে যে শষ্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তাঁর জানা আছে। প্রথমে বৃক্ষপত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টির সামনে ঝরে, এরপর শস্যকণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষক ক্ষেত্রে বপন করে কিংবা আপনা-আপনি মাটির গভীরতায় ও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে, অতঃপর আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আর্দ্র ও শুষ্কা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসব বিষয় আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত আছে। কারও কারও মতে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলে 'লওহে মাহফূজ' বুঝানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহর জ্ঞান। একে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলার কারণ এই যে, লিখিত বিষয়বস্তু যেমন ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানও সমগ্র সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে শুধু আনুমানিক নয় সুনিশ্চিত।

সৃষ্টজগতের কোনো কণাও তাঁর অবগতির বাইরে নয়- এ ধরনের সর্বব্যাপী জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য কুরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। সূরা লোকমানে বলা হয়েছে-

إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمَاوَاتِ أَوْ فِى الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ، إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ অর্থাৎ সরিষা পরিমাণ কোনো শষ্যকণা যদি পাথরের বুকে বিজড়িত থাকে অথবা আকাশে কিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আয়াতুল কুরসীতে আছে-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সব মানুষের সামনের ও পশ্চাতের সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। সব মানুষ একত্র হয়ে তাঁর জ্ঞানের মধ্য থেকে একটি বিষয়কেও বেষ্টন করতে পারে না। তবে যতটুকু জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দিতে চান।' সূরা ইউনুসে আছে- لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আসমান ও জমিনে এক কণা পরিমাণ বস্তুও আপনার পালনকর্তার জ্ঞান থেকে পৃথক নয়। সূরা তালাকে আছে- وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্ববিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছে। এমনিভাবে অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান [যাকে কুরআনের অদৃশ্য বিষয় বলা হয়েছে এবং যার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে] কিংবা সমগ্র সৃষ্টজগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। কোনো ফেরেশতা কিংবা রাসূলের জ্ঞানকে এরূপ সর্বব্যাপী মনে করা খ্রিস্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহর স্তরে উন্নীত করা ও আল্লাহর সমতুল্য মনে করার শামিল, যা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শিরক। সূরা শু'আরায় শিরকের স্বরূপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে- تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ـ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বলবে, আল্লাহর কসম আমরা ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে [অর্থাৎ **মূর্তিদেরকে**] বিশ্বপালকর্তার সমতুল্য করে নিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের এবং বিশেষভাবে শেষ নবী ﷺ-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সব ফেরেশতা ও পয়গাম্বরের চাইতে বেশি দান করেছিলেন। **কিন্তু** এটা জানা যে, আল্লাহ তা'আলার সমান কারও জ্ঞান নয় এবং হতেও পারে না। নতুবা খ্রিস্টানদের মতো রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি হবে। তারা রাসূলকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে, যার নাম শিরক [নাউযুবিল্লাহ]।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত বর্ণিত হলো। এতে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কিত গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রত্যেক অদৃশ্য, দৃশ্য ও প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনভিাবে আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কিত গুণ ও তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এগুণটিও তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য। বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে তোমাদের আত্মা একপ্রকার করায়ত্ত করে নেন এবং পুনরায় প্রত্যুষে জাগ্রত করে দেন, যাতে তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করে দেওয়া হয়। সারাদিন তোমরা যা কিছু কর, তা সবই তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের ফলেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুরুত্থানের একটা নমুনা প্রত্যহ সামনে আসতে থাকে। হাদীসে নিদ্রাকে 'মৃত্যুর ভাই' বলা হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, নিদ্রা মানুষের সব শক্তিকে মৃত্যুর মতোই নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা, অতঃপর জাগরণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে মানুষকে হুঁশিয়ার করেছেন যে, যেভাবে প্রতি রাতে ও প্রতি সকালে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যুবরণ করে জীবিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করে, এমনিভাবে ঘটবে সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যু। অতঃপর সামগ্রিক জীবন লাভকেও বুঝে নাও, যাকে হাশর বলা হবে। যে সত্তা প্রথমোক্তটি করতে পারেন, শেষোক্তটি করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভবন নয়। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কতৃকর্ম বলে দেবেন অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করা হবে। –[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩২১-২৭]

অনুবাদ :

٦١. وَهُوَ الْقَاهِرُ مُسْتَعْلِيًا فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط مَلٰئِكَةً تُحْصِيْ اَعْمَالَكُمْ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُوَكَّلُوْنَ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ يُقَصِّرُوْنَ فِيْمَا يُؤْمَرُوْنَ .

৬১. তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী কর্তৃত্বশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক অর্থাৎ আমলের হিসেবে রক্ষাকারী ফেরেশতা প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন আমার প্রেরিতরা অর্থাৎ প্রাণ সংহারের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ তার মৃত্যু ঘটায়। تَوَفَّتْهُ এটা অপর এক কেরাতে تَوَفَّاهُ রূপে পঠিত রয়েছে। আর তারা কোনো ত্রুটি করে না। অর্থাৎ তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাতে তারা কোনোরূপ ত্রুটি করে না।

٦٢. ثُمَّ رُدُّوْٓا اَيِ الْخَلْقُ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ مَالِكُهُمُ الْحَقِّ ط الثَّابِتُ الْعَادِلُ لِيُجَازِيَهُمْ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِيْهِمْ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِيْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ .

৬২. অতঃপর তাদের প্রকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রতিপালকের নিকট মালিকের নিকট প্রতিদান প্রদানের উদ্দেশ্যে তারা অর্থাৎ সকল সৃষ্টি প্রত্যানীত হবে। দেখ, তাঁরই সকল বিধান। অর্থাৎ এদের উপর কার্যকারী ফয়সালা কেবল তাঁরই। হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। হাদীসে আছে যে, দুনিার দিন হিসেবে অর্ধ দিনের ভিতর তিনি সকল সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ করে ফেলবেন।

٦٣. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اَهْوَالِهِمَا فِيْ اَسْفَارِكُمْ حِيْنَ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا عَلَانِيَةً وَّخُفْيَةً ج سِرًّا تَقُوْلُوْنَ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَنْجَيْتَنَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ اَنْجٰنَا اَيِ اللّٰهُ مِنْ هٰذِهِ الظُّلُمٰتِ وَالشَّدَائِدِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৬৩. হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীদেরকে বল, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে অর্থাৎ তোমাদের পরিভ্রমণকালে এতদুভয়ের বিভীষিকাময় বিপদে কাতরভাবে প্রকাশ্যে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর। বল, আমাদেরকে এটা হতে অর্থাৎ এ অন্ধকার ও বিপদ হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অর্থাৎ মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হব। لَئِنْ-এর لَامْ টি قَسَمِيَّة অর্থাৎ শপথবাচক। اَنْجَيْتَنَا এটা অপর এক কেরাতে اَنْجَانَا [নামপুরুষ, বহুবচন] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর কর্তা হবেন আল্লাহ । অর্থাৎ আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তি দেন।

٦٤. قُلِ لَهُمُ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ غَمٍّ سِوَاهَا ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ بِهِ .

৬৪. তাদেরকে বল, আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে এবং এ ছাড়াও সমস্ত দুঃখকষ্ট হতে চিন্তাভাবনা হতে ত্রাণ করেন। يُنَجِّيْكُمْ এটা তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] এবং তাশদীদ ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে। এরপরও তোমরা তাঁর সাথে শরিক কর।

٦٥. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ كَالْحِجَارَةِ وَالصَّيْحَةِ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ كَالْخَسْفِ أَوْ يَلْبِسَكُمْ يَخْلِطَكُمْ شِيَعًا فِرَقًا مُخْتَلِفَةَ الْأَهْوَاءِ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط بِالْقِتَالِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذَا أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ وَلَمَّا نَزَلَ مَا قَبْلَهُ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمُ حَدِيثَ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَ أُمَّتِي بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا وَفِي حَدِيثٍ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَمَا أَنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيٰتِ الدَّالَّاتِ عَلَى قُدْرَتِنَا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ .

৬৫. বল, তোমাদের **উর্ধ্বদেশ** অর্থাৎ আকাশ হতে যেমন পাথর বা প্রচণ্ড গর্জনের মাধ্যমে অথবা তলদেশ হতে যেমন ভূগর্ভে প্রোথিত করত **শাস্তি প্রেরণ করতে** বা তোমাদেরকে দলে দলে অর্থাৎ বিভিন্ন মতাবলম্বী দলে বিভক্ত করে দিতে এলোমেলো করে দিতে এবং এক দলকে অপর দলের সাথে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে নিশ্চয় **তিনি সক্ষম**। এ আয়াত নাজিল হলে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, এটিই তুলনামূলকভাবে সহজ। আর পূর্ববর্ণিত আজাবসমূহ সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন, হে আল্লাহ! তোমার অসিলায় আমরা ঐগুলো হতে পানাহ চাই। [বুখারী] মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে পরস্পর যেন বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি না হয় এ মর্মে আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো; এ দোয়া কবুল করা হলো না। অন্য একটি হাদীসে আছে, এ আয়াতটি নাজিল হলে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে তবে এখনও তা বাস্তবে ঘটেনি। দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ অর্থাৎ আমার কুদরতের প্রমাণবহ নিদর্শনসমূহ এদের জন্য বিবৃত করি, বর্ণনা করি যাতে তারা অনুধাবন করে। অর্থাৎ জানতে পারে যে, তারা যে পথে বিদ্যমান তা বাতিল ও ভ্রান্ত।

٦٦. وَكَذَّبَ بِهِ بِالْقُرْاٰنِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ط الصِّدْقُ قُلْ لَهُمْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ فَأُجَازِيكُمْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَأَمْرُكُمْ إِلَى اللّٰهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ .

৬৬. তোমার কওম তো তাকে অর্থাৎ আল কুরআনকে অস্বীকার করেছে অথচ তা সঠিক সত্য। তাদেরকে বল, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই যে, তোমাদেরকে আমি প্রতিদান দেব। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। তোমাদের বিষয় আল্লাহর উপরই ন্যস্ত। এ কথা যুদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল।

٦٧. لِكُلِّ نَبَإٍ خَبَرٍ مُسْتَقَرٌّ وَقْتٌ يَقَعُ فِيهِ وَيَسْتَقِرُّ وَمِنْهُ عَذَابُكُمْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَهْدِيدٌ لَهُمْ .

৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য খবরের জন্য নির্ধারণ রয়েছে। অর্থাৎ তা সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত কাল রয়েছে। তোমাদের শাস্তিও এরই অন্তর্ভুক্ত এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে। এ বাক্যটি এদের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

٦٨. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِالْاِسْتِهْزَاءِ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تُجَالِسْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط وَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الزَّائِدَةِ يُنْسِيَنَّكَ بِسُكُوْنِ النُّوْنِ وَالتَّخْفِيْفِ وَفَتْحِهَا وَالتَّشْدِيْدِ الشَّيْطٰنُ فَقَعَدْتَ مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى اَيْ تَذْكِرَةٍ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِنْ قُمْنَا كُلَّمَا خَاضُوْا لَمْ نَسْتَطِعْ اَنْ نَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ وَاَنْ نَطُوْفَ.

৬৮. তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে অর্থাৎ আল কুরআন সম্বন্ধে কৌতুকে মত্ত, তখন এদের থেকে দূরে সরে যাবে, এদের সাথে বসবে না যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং যদি إِمَّا এতে শর্তবাচক শব্দ إِنْ -এর نُوْن টি অতিরিক্ত مَا -এর مِيْم -এ اِدْغَام অর্থাৎ সন্ধিভূত হয়েছে। তোমাকে ভ্রমে ফেলে يُنْسِيَنَّكَ -এর نُوْن -এ সাকিন এবং তাশদীদহীনভাবে অথবা نُوْن -এ ফাতাহ ও তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। শয়তান আর তাদের সাথে বসে পড়ে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ এখানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনাম [هُمْ] -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য [اَلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ]-এর ব্যবহার হয়েছে। উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণ বললেন, যতবার তারা এ ধরনের আলোচনায় লিপ্ত হয় ততবারই যদি আমাদেরকে উঠে যেতে হয় তবে তো আর আমাদের পক্ষে বায়তুল্লাহ কা'বা মসজিদে বসা বা তার তাওয়াফ করা সম্ভবপর হবে না।

٦٩. فَنَزَلَ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ مِنْ حِسَابِهِمْ اَيِ الْخَائِضِيْنَ مِّنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ اِذَا جَالَسُوْهُمْ وَّلٰكِنْ عَلَيْهِمْ ذِكْرٰى تَذْكِرَةٌ لَهُمْ وَمَوْعِظَةٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الْخَوْضَ.

৬৯. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের অর্থাৎ কৌতুকে লিপ্ত মুশরিকদের কর্মের দায়িত্ব তাদের নয় যারা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়সহ যদি তারা বসে তবে তাদেরকে তাদের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে না। তবে উপদেশ দেওয়া তাদেরকে শিক্ষাদান ও নসিহত করা তাদের কর্তব্য। যাতে তারা তাতে লিপ্ত হতে ভয় করে। مِنْ شَيْءٍ -এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٧٠. وَذَرِ اُتْرُكِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمُ الَّذِيْ كُلِّفُوْهُ لَعِبًا وَّلَهْوًا بِاسْتِهْزَائِهِمْ بِهٖ وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَلَا تَتَعَرَّضْ لَهُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ وَذَكِّرْ عِظْ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ النَّاسَ اَنْ لَا تُبْسَلَ نَفْسٌ تُسْلَمَ اِلَى الْهَلَاكِ بِمَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ وَلِيٌّ نَاصِرٌ وَّلَا شَفِيْعٌ ج يَمْنَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ.

৭০. যারা তাদের উপর বর্ণিত [দীনকে] হাসিঠাট্টা করত ক্রীড়া-কৌতুকরূপে বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের পরিত্যাগ কর, বর্জন কর। আর তাদের পিছনে পড়ো না। এ বিধান ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিল হওয়ার পূর্বের। এর অর্থাৎ আল কুরআনের মাধ্যমে লোকদেরকে উপদেশ দাও; নসিহত কর যাতে কোনো প্রাণ নিজ উপার্জনের জন্য কৃতকর্মের জন্য লাঞ্ছিত না হয় اَنْ تُبْسَلَ -এর اَنْ টি হেতুবোধক। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে এর পূর্বে ل উল্লেখ করা হয়েছে। تُبْسَلَ -এর পূর্বে না অর্থবোধক শব্দ لَا উহ্য রয়েছে। ধ্বংসের জন্য সমর্পিত না হয় যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী এবং সুপারিশকারী থাকবে না যে তার হতে শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে।

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ تَفْدِ كُلَّ فِدَاءٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط مَا تَفْدِيْ بِهٖ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ مَاءٍ بَالِغٍ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِكُفْرِهِمْ ـ

এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুক্তিপণ দিলেও যা দেওয়া হবে তা গৃহীত হবে না। এরাই তারা যারা কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। সত্য প্রত্যাখ্যান হেতু এদের কুফরির কারণে এদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الذِّكْرٰى : অর্থ تَذْكِرَةٍ স্মরণ হওয়া। قَوْلُهُ حَمِيْمٍ : অর্থ, চরম পর্যায়ের উষ্ণ পানি।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ : এটি كَلَامٌ مُسْتَانِفٌ স্বীয় মাখলুকের উপর তার **ক্ষমতার বিবরণ দিতে গিয়ে আনা** হয়েছে। هُوَ মুবতাদা এবং اَلْقَاهِرُ তার খবর। فَوْقَ হলো ظَرْف আর مُسْتَعْلِيًا হলো **উহ্য** حَالٌ -**এর সাথে** مُتَعَلِّقٌ -

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ الخ : এটি **আমলসমূহ হেফাজত করার সীমা। অর্থাৎ জীবদ্দশায় মৃত্যু পর্যন্ত। আমলের হেফাজত করা হবে।**

قَوْلُهُ الْمَلٰئِكَةُ : অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা ও তাঁর সহকারিগণ।

قَوْلُهُ حِيْنَ : এখানে حِيْنَ শব্দটি উল্লেখ করে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, تَدْعُوْنَهٗ হাল হয়েছে يُنَجِّيْكُمْ-এর মাফউলের যমীর থেকে।

قَوْلُهُ الظُّلُمَاتِ وَا لشَّدَائِدِ : এতটুকু ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো هٰذِهٖ ইসমে ইশারার مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ধারণ করা।

قَوْلُهُ هٰذَا : هٰذَا হলো মুবতাদা আর اَهْوَنُ وَاَيْسَرُ তার খবর।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ ذِكْرٰى : এটি মুবতাদা হওয়ার কারণে মহল হিসেবে মারফূ' হয়েছে। তার খবর মাহযূফ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ : এ আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়বস্তুরই আরও বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সকল বান্দার উপর প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি বান্দাকে যতদিন জীবিত রাখতে চান, ততদিন তার জন্য দেহরক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ফলে তার ক্ষতি করার সাধ্য কারও থাকে না। অতঃপর যখন জীবনের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এ দেহরক্ষী ফেরেশতাদলই তার মৃত্যুর অসিলা হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর উপকরণ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না; বরং رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির সামনে উপস্থিত এবং সারা জীবনের হিসাবের কথা কল্পনা করলে কার সাধ্য আছে যে, সফলকাম হবে এবং শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে– اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতিই শুধু নন, বান্দাদের মাওলা এবং প্রভুও। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে বান্দাকে সাহায্য করবেন । এরপর বলা হয়েছে, নিশ্চয় ফয়সালা এবং নির্দেশ তাঁরই। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একটিমাত্র সত্তা অগণিত মানুষের হিসাব সমাধা করবেন কিভাবে? তাই অতঃপর বলা হয়েছে– وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ অর্থাৎ নিজের কাজের সাথে তুলনা করে আল্লাহর কাজকে বোঝা মূর্খতা বৈ নয়। তিনি অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩২৭-২৮]

قَوْلُهُ قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহর জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে−

প্রথম আয়াতে ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ− অন্ধকার। ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে− রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধুলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্য ظُلُمٰتٌ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকার মানুষের প্রতি একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ-বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظُلْمَةٌ শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তাফসীরবিদরা এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্যে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেবদেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহ্বান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতিভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, দেবদেবীরা বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদের বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো দেবদেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং দেবদেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে− ১. আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্যবান। ২. সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই করায়ত্ত এবং ৩. একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেবদেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলকেই আহ্বান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় : মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুকবিশেষ। আমরা মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না, বরং আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেবদেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না; কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেবদেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার : আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ঔষুধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কুরআন পাক বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণত মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যই কুরআন পাক বলে وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ

আমি তাদের পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন। [সূরা শুরা] এ আয়াতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ- কারও গায়ে কোনো কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোনো না কোনো গুনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অনেক গুনাহ ক্ষমাও করে দেন।

আল্লামা কাযী বাইযাভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গুনাহগাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গুনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপুমক্তদের রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চ স্তর দান করা হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, পাপ থেকে মুক্ত নয় এরূপ সাধারণ লোকেরা যে কোনো অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ কষ্ট ও অস্থিরতায় পতিত হয়, তা সবই পাপের ফলশ্রুতি। এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সংকটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম, ঔষধপত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলাকৌশল অনর্থক। বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজসরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা সব সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়ামত! এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে। অগ্নি, বাতাস, পানি, মৃত্তিকা এবং পৃথিবীর সব শক্তি তাঁর নির্দেশের অনুগামী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অগ্নি দাহন করতে পারে না, পানি নির্বাপণ করতে পারে না, কোনো ঔষধ ক্রিয়া করতে পারে না এবং কোনো পথ্য রোগীর ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জামের পিছনে পড়েছে, তখন সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ঔষধ কিংবা ইঞ্জেকশনের উপকার প্রমাণিত হওয়া কিংবা কোনো বস্তুগত কলাকৌশলের সাফল্য অর্জন করা অমনোযোগিতা ও পাপের সাথেও সম্ভবপর। কিন্তু যখন সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন এসব বস্তু ব্যর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান যুগে মানুষকে আরাম দেওয়া ও কষ্ট দূর করার জন্য কত রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম যে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ এসব বস্তুর কল্পনাও করতে পারত না। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধপত্র, নানা রকমের ইঞ্জেকশন এবং বড় বড় সুদক্ষ ডাক্তার ও স্থানে স্থানে হাসপাতালের প্রাচুর্য কার না জানা আছে। পঞ্চাশ-ষাট বছরের আগের মানুষ এগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত মানুষ আজকের মতো এত বেশি রুগ্‌ণ ও দুর্বল ছিল না। এমনিভাবে আজ ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির জন্য নানা রকমের টীকা রয়েছে। দুর্ঘটনার কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিন, বিপদ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রেরণ ও তাৎক্ষণিক সাহায্যের উপায়াদি ও আসবাবপত্রের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এসব বস্তুগত সাজসরঞ্জাম যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের শিকার পূর্বের তুলনায় বেশি হচ্ছে। এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, বিগত যুগে স্রষ্টার প্রতি অমনোযোগিতা ও প্রকাশ্য অবাধ্যতা এত অধিক ছিল না, যতটুকু বর্তমানকালে রয়েছে। বিগত যুগে আরাম-আয়েশের সাজসরঞ্জামকে আল্লাহ তা'আলার দান মনে করে কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আজকের মানুষ বিদ্রোহের মানোভাব নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে সচেষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রাচুর্য তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহকেই স্মরণ করে এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম ও কলাকৌশলের চেয়ে অধিক আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে অর্থাৎ সব কলাকৌশল সামগ্রিক হিসাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বারবার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন পন্দি-ফিকির করা হচ্ছে কিন্তু ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ কারার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যত তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলেছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যত লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলাকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এরপর কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলাকৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসাবে ব্যবহার করা। এ ছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। −[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩২৯-৩২]

قَوْلُهُ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ الخ বাতিলপন্থিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গুনাহ সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গুনাহ। এ থেকে বেঁচে থাক উচিত। এর বিবরণ এরূপ−

প্রথম আয়াতে يَخُوْضُوْنَ শব্দটি خَوْضٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خَوْض বলা হয়। কুরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ এবং فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই خَوْضٌ فِي الْاٰيَاتِ -এর অনুবাদ এ স্থলে 'ছিদ্রান্বেষণ' [অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি করা] কিংবা 'কলহ করা' করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ ও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদের শোনানোর জন্য। নতুবা তিনি এর আগে কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থিদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে− ১. মজিলস ত্যাগ করা, ২. সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া− তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলার হয়েছে তাতে প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে− যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজিলসে যোগদান করে ফেল, নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ− উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গুনাহ। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন, এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জানমাল কিংবা ইজ্জতের আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েজ। উদাহরণত অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয় তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

قَوْلُهُ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ : অর্থাৎ 'যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে দেয়।' এখানে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোনো আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর রাসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর. এই যে, বিশেষ কোনো তাৎপর্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীরাও ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষে থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেওয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্যে থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোনো ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গুনাহ এবং যে কাজ অপরে জোর-জবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গুনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস (রা.) আহকামুল কুরআনে বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল কিংবা শরিয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হ্যাঁ সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস (রা.) মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুনাহ; তারা তখন কোনো অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরি লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোনো শর্ত আয়াতে নেই। কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَلَا تَرْكَنُوْاۤ اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে তবে আমরা মসজিদে হারামে নামাজ ও তওয়াফ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে [এটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা] এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে হারাম গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোনো দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া। সম্ভবত দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

قَوْلُهُ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا : এখানে ذَرْ শব্দটি وَذَرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই : আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে- ১. তাদের জন্য সত্যধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ২. তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

قَوْلُهُ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- ১. উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরি।

আয়াতের শেষে আজাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে أَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া। কোনো ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। প্রথমত স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্যে সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোনো আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থসম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ অর্থাৎ 'এরা ঐ লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে।' অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীও পরিণামে তাদের অনুরূপ আজাবে পতিত হবে।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোনো মানুষের জন্যই বিষতুল্য। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভালো এবং ভালোকে মন্দ করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ করে, তখন তার মানসপটে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কালো দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সেও গুনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুনাহ করে চলে এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কালো দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ফলশ্রুতিতে ভালোমন্দের পার্থক্য থাকে না। কুরআন পাকে رَانَ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

-[তাফসীরে মাআরিফ-৩/৩৪৫-৪৯]

৭১. قُلْ أَنَدْعُوا نَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا بِعِبَادَتِهِ وَلَا يَضُرُّنَا بِتَرْكِهَا وَهُوَ الْأَصْنَامُ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا نَرْجِعُ مُشْرِكِيْنَ بَعْدَ إِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ إِلَى الْإِسْلَامِ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ أَضَلَّتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ص مُتَحَيِّرًا لَا يَدْرِيْ أَيْنَ يَذْهَبُ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ لَهُ أَصْحٰبٌ رُفْقَةٌ يَّدْعُوْنَهُ إِلَى الْهُدَى أَيْ لِيَهْدُوْهُ الطَّرِيْقَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ ائْتِنَا ط فَلَا يُجِيْبُهُمْ فَيَهْلِكُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ وَجُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ نُرَدُّ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ هُوَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْهُدٰى ط وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ أَيْ بِأَنْ نُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অনুবাদ :

৭১. বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব এমন কিছুর অর্থাৎ প্রতিমার উপাসনা করব যার উপাসনা আমাদের কোনো উপকার কিংবা তার বর্জন কোনো অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে অর্থাৎ ইসলামের দিকে পরিচালিত করার পর আমরা কি সে ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান পৃথিবীতে প্ররোচিত করত পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে? পেরেশান করে ফেলেছে। কোথায় যাবে তা সে জানে না। অর্থাৎ আমরা কি মুশরিক হয়ে যাব? حَيْرَانَ এটা اِسْتَهْوَتْهُ -এর সর্বনাম ه -এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তারা সঙ্গীগণ সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে অর্থাৎ পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা তাকে আহ্বান করে, বলে আমাদের নিকট এসো কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। أَنَدْعُوْا এ বাক্যটিতে اِنْكَارٌ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে এবং كَالَّذِيْ এ উপমাবোধক বাক্যটি نُرَدُّ -এর ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনামের حَالٌ বল, আল্লাহর পথই অর্থাৎ ইসলামের পথই পথ, এটা ব্যতীত আর সকল কিছুই গোমরাহি। আর আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। لِنُسْلِمَ -এর لَامٌ টি أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ারমূল অর্থবোধক أَنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে بِأَنْ نُسْلِمَ উল্লেখ করা হয়েছে।

৭২. وَأَنْ أَيْ بِأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط تَعَالٰى وَهُوَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ تُجْمَعُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِلْحِسَابِ ـ

৭২. এবং সালাত কায়েম করতে ও তাঁকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেও আদিষ্ট হয়েছি। এবং তাঁরই নিকট হিসাব-নিকাশের জন্য কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, একত্র করা হবে। وَأَنْ পূর্বোল্লিখিত لِنُسْلِمَ-এর সাথে عَطْف হয়েছে।

৭৩. وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط أَيْ مُحِقًّا وَ اذْكُرْ يَوْمَ يَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ ط هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ يَقُوْلُ لِلْخَلْقِ قُوْمُوْا فَيَقُوْمُوْا قَوْلُهُ الْحَقُّ ط الصِّدْقُ الْوَاقِعُ لَا مُحَالَةَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ط

৭৩. তিনিই সত্যিকারভাবে যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর স্মরণ কর যেদিন তিনি কোনো জিনিসকে বলবেন হও, তখনই তা হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি সকল সৃষ্টিকে বলবেন দাঁড়াও, অনন্তর সকলেই দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। সঠিক ও নিঃসন্দেহে তা অবশ্যম্ভাবী। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।

الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ إِسْرَافِيْلَ لَا مِلْكَ فِيْهِ لِغَيْرِهِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِيْ خَلْقِهِ الْخَبِيْرُ بِبَاطِنِ الْأَشْيَاءِ كَظَاهِرِهَا .

অর্থাৎ যেদিন হযরত ইসরাফীলের তরফ হতে দ্বিতীয় দফা ফুৎকার হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই। এদিন তিনি ব্যতীত আর কারও কোনোরূপ আধিপত্য হবে না। বলা হবে, কর্তৃত্ব আজ কার? তা একমাত্র আল্লাহরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য অর্থাৎ যা দৃশ্যমান নয় ও যা দৃশ্যমান আছে সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় এবং বাহ্যিক অবস্থার মতো প্রতিটি জিনিসির অভ্যন্তর সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত।

٧٤. وَ اذْكُرْ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ هُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ تَارَحُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ج تَعْبُدُهَا اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ إِنِّيْ أَرٰكَ وَقَوْمَكَ بِاتِّخَاذِهَا فِيْ ضَلٰلٍ عَنِ الْحَقِّ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

৭৪. আর স্মরণ কর ইবরাহীম তার পিতা আযরকে এটা তার উপাধি। তার প্রকৃত নাম হলো তারাহ। বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করবেন? এর উপাসনা করবেন? **أَتَتَّخِذُ এখানে تَوْبِيْخ বা তিরস্কার অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।** [আমি তো] এটা করায় আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে পরিষ্কার সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

٧٥. وَكَذٰلِكَ كَمَا أَرَيْنَاهُ إِضْلَالَ أَبِيْهِ وَقَوْمِهِ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ مُلْكَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ بِهَا وَجُمْلَةُ وَكَذٰلِكَ وَمَا بَعْدَهَا اِعْتِرَاضٌ وَعَطْفٌ عَلٰى قَالَ .

৭৫. এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তাকে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট হওয়া প্রদর্শন করেছি সেভাবে ইবরাহীমকে আমার একত্ব সম্পর্কে যুক্তিদানের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও কুদরত দেখাই যাতে সে এতদ্বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। كَذٰلِكَ এটা ও তৎপরবর্তী বাক্য جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বাক্যরূপে বিবেচ্য এবং قَالَ -এর সাথে এর عَطْف হয়েছে।

٧٦. فَلَمَّا جَنَّ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قِيْلَ هُوَ الزُّهَرَةُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَكَانُوْا نَجَّامِيْنَ هٰذَا رَبِّيْ ج فِيْ زَعْمِكُمْ فَلَمَّا أَفَلَ غَابَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأٰفِلِيْنَ أَنْ أَتَّخِذَهُمْ أَرْبَابًا لِأَنَّ الرَّبَّ لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ وَالْإِنْتِقَالُ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَأْنِ الْحَوَادِثِ فَلَمْ يَنْجَعْ فِيْهِمْ ذٰلِكَ .

৭৬. অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল অর্থাৎ সব কিছু অন্ধকার করে ফেলল, তখন সে নক্ষত্র কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল যুহরা নক্ষত্র দেখে তার সম্প্রদায়কে বলল, আর এরা ছিল জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এটা তোমাদের ধারণায় আমার প্রভু; অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো অদৃশ্য হলো তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা -কে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা আমি পছন্দ করি না। কারণ, যিনি প্রভু হবেন তার মধ্যে কোনোরূপ বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কেননা, এটা حَادِثٌ অর্থাৎ সৃষ্ট জিনিসের চিহ্ন। কিন্তু তাদের উপর এ যুক্তি কোনো প্রভাব বিস্তার করল না।

٧٧. فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا طَالِعًا قَالَ لَهُمْ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ يُثَبِّتْنِىْ عَلَى الْهُدٰى لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ تَعْرِيْضٌ لِقَوْمِهٖ بِاَنَّهُمْ عَلٰى ضَلَالٍ فَلَمْ يَنْجَعْ فِيْهِمْ ذٰلِكَ.

৭৭. অতঃপর যখন সে চন্দ্র উদিত হতে দেখল তাদেরকে বলল, এটা আমার প্রভু এটাও যখন অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রভু সৎপথ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ সৎপথে প্রতিষ্ঠিত না রাখলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো। বাক্যটি এদিকে ইঙ্গিতবহ যে, তারা অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের কওম পথভ্রষ্টতায় বিদ্যমান। কিন্তু এ কথাও তাদের মধ্যে কোনো প্রভাব আনয়ন করল না।

٧٨. فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا ذُكِّرَهٗ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهٖ رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج مِنَ الْكَوْكَبِ وَالْقَمَرِ فَلَمَّا اَفَلَتْ وَقَوِيَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ وَلَمْ يَرْجِعُوْا قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَجْرَامِ الْمُحْدَثَةِ الْمُحْتَاجَةِ اِلٰى مُحْدِثٍ.

৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল; তখন সে বলল, এটা আমার প্রভু, هٰذَا رَبِّىْ এখানে خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয়টি [رَبِّىْ] যেহেতু مُذَكَّرٌ বা পুংলিঙ্গবাচক সেহেতু هٰذَا-কেও مُذَكَّرٌ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ বাচকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা চন্দ্র ও নক্ষত্রের তুলনায় বৃহৎ। যখন এটাও অস্তমিত হলো আর তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও যখন তারা ফিরল না তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এ প্রতিমা ও এ সৃষ্ট কতগুলো **জড়পদার্থ যেগুলো স্বীয় অস্তিত্বের ব্যাপারে একজন সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী,** সেসব যা আল্লাহর সাথে শরিক কর তা হতে আমি মুক্ত।

٧٩. فَقَالُوْا لَهٗ مَا تَعْبُدُ قَالَ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ قَصَدْتُّ بِعِبَادَتِىْ لِلَّذِىْ فَطَرَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَىِ اللّٰهُ حَنِيْفًا مَائِلًا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهٖ.

৭৯. তারা বলল, তবে তুমি কার উপাসনা কর? তিনি বললেন, আমি একনিষ্ঠভাবে অর্থাৎ সব ধর্ম হতে নির্লিপ্ত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি তাঁকেই আমার ইবাদত উপাসনার উদ্দেশ্য রাখি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা। আর আমি তাঁর সাথে শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٨٠. وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ط جَادَلُوْهُ فِىْ دِيْنِهٖ وَهَدَّدُوْهُ بِالْاَصْنَامِ اَنْ تُصِيْبَهٗ بِسُوْءٍ اِنْ تَرَكَهَا قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ بِتَشْدِيْدِ النُّوْنِ وَتَخْفِيْفِهَا بِحَذْفِ اِحْدَى النُّوْنَيْنِ وَهِىَ نُوْنُ الرَّفْعِ عِنْدَ النُّحَاةِ وَنُوْنُ الْوِقَايَةِ عِنْدَ الْقُرَّاءِ اَىْ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ط تَعَالٰى اِلَيْهَا وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ مِنَ الْاَصْنَامِ.

৮০. তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো অর্থাৎ তার ধর্ম মত নিয়ে তারা তার সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হলো। তারা হুমকি দিল, প্রতিমাসমূহকে যদি ত্যাগ কর তবে তোমার অকল্যাণ হবে। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে তাঁর একত্ব সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্ক কর? বিবাদ কর? অথচ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর হেদায়েত করেছেন। تُحَاجُّوْنِّىْ-এর نُوْن অক্ষরটি তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। একটি نُوْن বিলুপ্ত করত তাশদীদহীনভাবেও পাঠ করা যায়। নাহবী অর্থাৎ আরবি ব্যাকরণবিদদের অভিমত অনুসারে বিলুপ্ত نُوْن-টি হলো نُوْن رَفْع ক্বারী অর্থাৎ **কুরআন** পাঠবিদগণের অভিমত অনুসারে তা হলো, **نُوْن وِقَايَة** তোমরা যাকে তাঁর শরিক কর অর্থাৎ **প্রতিমাসমূহ তাকে** আমি ভয় করি না।

اَنْ تُصِيْبَنِىْ بِسُوْءٍ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلٰى شَيْءٍ اِلَّآ لٰكِنْ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْئًا ط مِنَ الْمَكْرُوْهِ يُصِيْبُنِىْ فَيَكُوْنُ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط اَىْ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَيْءٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ بِهٰذَا فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ এসব প্রতিমা আমার কোনো অকল্যাণ করতে পারবে বলে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ কোনো কিছুর উপর এদের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। তবে আমার প্রতিপালক কোনোরূপ অকল্যাণ করতে চাইলে তা হবে। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তাঁর জ্ঞান সব কিছুতেই বিস্তৃত। তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? করলে ঈমান গ্রহণ করতে পারতে। اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ - اِسْتِثْنَاء অর্থাৎ ব্যত্যয়সূচক শব্দ اِلَّآ এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হয়েছে। এটা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তাফসীরে لٰكِنْ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

٨١. وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ وَهِىَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ فِى الْعِبَادَةِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ بِعِبَادَتِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ط حُجَّةً وَبُرْهَانًا وَهُوَ الْقَادِرُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ج اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ مَنِ الْاَحَقُّ بِهٖ اَىْ وَهُوَ نَحْنُ فَاتَّبِعُوْهُ ـ

৮১. তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ এগুলি কোনোরূপ ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। যে বিষয়ে অর্থাৎ যেসব জিনিসের উপাসনা করার কোনো সনদ যুক্তি-প্রমাণ অবতীর্ণ করেনি তাকে উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক করতে তোমরা আল্লাহর ভয় কর না। অথচ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। সুতরাং এ দু-দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিক হকদার তোমরা না আমরা? কে অধিক হকদার এতদ্বিষয়ে যদি তোমরা জান তবে বল। এরা হলাম আমরাই। অতএব এদেরই অর্থাৎ আমাদেরই তোমরা অনুসরণ কর।

٨٢. قَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْآ يَخْلِطُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اَىْ شِرْكٍ كَمَا فُسِّرَ بِذٰلِكَ فِى حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

৮২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে জুলুমের অর্থাৎ শিরকের, সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় শিরক দ্বারা জুলুম শব্দের তাফসীর করা হয়েছে সংমিশ্রণ করেনি তাদের জন্যই রয়েছে আজাব ও শাস্তি হতে নিরাপত্তা। আর তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بَازِغًا : অর্থ উদিত। **قَوْلُهٗ فَطَرَ** : অর্থ সৃষ্টি করেছেন। **قَوْلُهٗ لَمْ يَلْبِسُوْا** : অর্থ তারা সংমিশ্রণ করেনি।

قَوْلُهٗ اَنَدْعُوْا : هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ টি اِنْكَارْ এবং تَوْبِيْخْ-এর অর্থে। আর نَدْعُوْا-এর শেষে اَلِفْ টি বহুবচনের সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মাসহাফে উসমানীর রাসমুল খত অনুযায়ী হয়েছে।

قَوْلُهٗ نُرَدُّ : এটি مُضَارِعْ مَجْهُوْل مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। اَنَدْعُوْا -এর সাথে তার আতফ হয়েছে। نَحْنُ -এর فَاعِلْ উহ্য রয়েছে। نُرْجَعُ ফে'লটি نُرَدُّ -এর তাফসীর। আর مُشْرِكِيْنَ শব্দটি نُرَدُّ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِسْتَهْوَتْهُ : এটি اِسْتِهْوَاءٌ থেকে مَاضِىْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। ه হলো মাফঊলের যমীর। অর্থ সে গোমরাহ করেছে।

قَوْلُهُ حَيْرَانَ : অর্থ পেরেশান। সিফতে মুশাব্বাহার সীগাহ। তার مُؤَنَّث হলো حَيْرٰى

قَوْلُهُ كَالَّذِيْ اِسْتَهْوَتْهُ : এটি نُرَدُّ জুমলার نَائِب فَاعِل -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। তাকদীরী ইবারত হবে- نُرَدُّ مُشْبِهِيْنَ الَّذِيْ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ এবং حَيْرَانَ শব্দটি اِسْتَهْوَتْهُ-এর মাফঊলের যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَكَّرَ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهِ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন.** هٰذَا -এর مَرْجِعْ হলো اَلشَّمْسُ যা مُؤَنَّثْ سَمَاعِيْ সুতরাং ইসমে ইশারাও هٰذِهٖ হওয়া উচিত ছিল, যাতে اِسْمِ اِشَارَه এবং مُشَارٌ اِلَيْهِ -এর মাঝে مُطَابَقَتْ বা সামঞ্জস্য বাকি থাকে। **উত্তর.** যখন اِسْمِ اِشَارَه এবং مُشَارٌ اِلَيْهِ -এর মাঝে مُطَابَقَتْ না হয় তখন খবরের رِعَايَتْ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً : পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের সম্বোধন এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে আল্লাহর আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গিতে স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমা ও তারকা পূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা আযরকে বললেন, তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'আযর' একথাই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী (র.) এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে যান। চাচাকে পিতা বলে আরবি বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী (র.) 'মাওয়াহিব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান : আযর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা হোন কিংবা চাচা সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল- وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করেন।

তাফসীরে বাহরে মুহীত -এ বলা হয়েছে, এতে বোঝা যায় যে, পরিবারের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে, তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থি নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবি তাই। আরও জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকটাত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গাম্বরদের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব : এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন, তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থি হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীত সব জাতীয়তাই বর্জনীয়। কুরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উত্তম আদর্শ অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদের পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদতে সমবেত না হও।

বলা বাহুল্য, এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করে। উম্মতে মুহাম্মাদী ও অন্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কোন জাতীয় লোক? উত্তর হলো نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি। [বুখারী] এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন- يَا قَوْمِ إِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এখানে এই ইঙ্গিতই করা হয়েছে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বজনরা ও তাঁর পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও করত। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দুটি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজাও পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন- وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সে সব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিতেই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا - قَالَ هٰذَا رَبِّىْ : অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন, এ নক্ষত্র আমার পালনকর্তা। উদ্দেশ্যে এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, لَآ أُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ এবং اٰفِلِيْنَ শব্দটি أُفُوْلٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- অস্ত যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালোবাসি না যে বস্তু আল্লাহ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোনো রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় স্বজনদেরকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, [তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী] এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকতেন তবে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোনো সত্তা, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়। এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন, [তোমাদের ধারণা অনুযায়ী] এটি আমার পালনকর্তা এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতিসত্বর দৃষ্টিগোচন হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন- يَا قَوْمِ إِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনোটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত; বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'লা-শরীক আল্লাহর' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) পয়গাম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেননি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র-পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র-পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয় অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) এসব অবস্থার মধ্যে থেকে শুধু নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলোর একপ্রকার পতনরূপে গণ্য হয়ে। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গাম্বরগণ সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ তাত্ত্বিক আলোচনার পেছনে বেশি পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

দীন প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকগণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম নির্দেশ এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে ইবরাহীম (আ.) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র-পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষতাহীনতার মতো সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোনো ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলেম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালকর্তা । উদ্দেশ্যে তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা, সত্যকথা বলে দেওয়াই সংস্কার ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকারী ভঙ্গিতে বলা জরুরি। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৫৩-৫৭]

٨٣. وَتِلْكَ مُبْتَدَأٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ حُجَّتُنَا الَّتِي احْتَجَّ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ أُفُوْلِ الْكَوْكَبِ وَمَا بَعْدَهُ وَالْخَبَرُ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ أَرْشَدْنَاهُ لَهَا حُجَّةً عَلَى قَوْمِهِ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِيْنِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ فِي صُنْعِهِ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ -

٨٤. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط اِبْنَهُ كُلًّا مِنْهُمَا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ إِبْرَاهِيْمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَيْ نُوْحٍ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِبْنَهُ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ اِبْنَ يَعْقُوْبَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُمْ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ -

٨٥. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى اِبْنَهُ وَعِيْسٰى اِبْنَ مَرْيَمَ يُفِيْدُ أَنَّ الذُّرِّيَّةَ يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الْبِنْتِ وَإِلْيَاسَ ط اِبْنَ أَخِي هَارُوْنَ أَخِي مُوْسٰى كُلٌّ مِنْهُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

٨٦. وَإِسْمٰعِيْلَ اِبْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَالْيَسَعَ اللَّامُ زَائِدَةٌ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط اِبْنَ هَارَانَ أَخِي إِبْرَاهِيْمَ وَكُلًّا مِنْهُمْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ بِالنُّبُوَّةِ -

অনুবাদ :

৮৩. এ আমার যুক্তি تِلْكَ এটা مُبْتَدَأٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্য। حُجَّتُنَا এটা تِلْكَ-এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। آتَيْنَاهَا এটা خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয়। আমি নক্ষত্র অস্তমিত হওয়া ও তৎপরবর্তীতে উল্লিখিত যেসব বিষয় দ্বারা ইবরাহীম আল্লাহর একত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন সেগুলো যা আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তাকে যেসব যুক্তির সন্ধান আমি করে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা আমি জ্ঞানে ও হিকমতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নত করি। دَرَجَاتٍ مَّنْ এটা إِضَافَةٌ অর্থাৎ সম্বন্ধ বাচক অথবা তানবীনসহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তোমার প্রতিপালক তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

৮৪. এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও তার [ইসহাকের] পুত্র ইয়াকুব; এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে অর্থাৎ ইবরাহীমের পূর্বে নূহকে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার নূহের বংশধর দাউদ তৎপুত্র সুলায়মান, আইয়ুব, ইয়াকুব পুত্র ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই অর্থাৎ তাদেরকে যেভাবে পুরস্কৃত করেছি সেভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি পুরস্কৃত করি।

৮৫. এবং যাকারিয়া তৎপুত্র ইয়াহইয়া মরিয়াম তনয় ঈসা এবং মূসার ভ্রাতা হারূনের ভ্রাতুষ্পুত্র ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এদের প্রত্যেকেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। মরিয়ম তনয় ঈসার উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় ذُرِّيَّةٌ [সন্তানসন্ততি] শব্দটি কন্যার সন্তানসন্ততিকেও শামিল করে।

৮৬. এবং ইবরাহীম তনয় ইসমাঈল, আল ইয়াসআ, ইউনুস এবং ইবরাহীমের ভ্রাতা হারূনের পুত্র লূতকে, এদের প্রত্যেককে নবুয়ত দান করত বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। اَلْيَسَعَ-এর اَلِفْ وَلَامْ টি زائدة বা অতিরিক্ত।

٨٧. وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج عَطْفٌ عَلٰى كُلًّا اَوْ نُوْحًا وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ لِاَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَبَعْضُهُمْ كَانَ فِىْ وَلَدِهِ كَافِرٌ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ اخْتَرْنَاهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম, গ্রহণ করে নিয়েছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। وَمِنْ اٰبَائِهِمْ পূর্বোল্লিখিত كُلًّا বা نُوْحًا-এর সাথে এ আয়াতটির عَطْف হয়েছে। এ আয়াতে مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّة অর্থাৎ ঐকদেশিক বলে বিবেচ্য হবে। কারণ এদের কতকজন নিঃসন্তান ছিলেন, আবার সন্তানদের মধ্যেও কতকজন ছিল কাফের।

٨٨. ذٰلِكَ الدِّيْنُ الَّذِىْ هُدُوْا اِلَيْهِ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا فَرْضًا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৮৮. এটা অর্থাৎ যে ধর্মপথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল তা আল্লাহর পরিচালিত পথ; স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। যদি তারা শিরক করত অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া হলো তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।

٨٩. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَالْحُكْمَ الْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا اَىْ بِهٰذِهِ الثَّلٰثَةِ هٰۤؤُلَاۤءِ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا اَرْصَدْنَا لَهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ.

৮৯. এদেরকেই কিতাব, অর্থাৎ কিতাবসমূহ বিধান হিকমত ও নবুয়ত প্রদান করেছি। এগুলোকে অর্থাৎ এ তিনটিকে যদি এরা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা প্রত্যাখ্যান করে তবে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি, এমন এক সম্প্রদায় প্রস্তুত করেছি যারা এগুলোর কাফের ও প্রত্যাখ্যানকারী নয়। এরা হলো মুহাজির ও আনসারগণ।

٩٠. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمْ طَرِيْقِهِمْ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالصَّبْرِ اقْتَدِهْ ط بِهَاءِ السَّكْتِ وَقْفًا وَّوَصْلًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِهَا وَصْلًا قُلْ لِاَهْلِ مَكَّةَ لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىِ الْقُرْاٰنِ اَجْرًا ط تُعْطُوْنِيْهِ اِنْ هُوَ مَا الْقُرْاٰنُ اِلَّا ذِكْرٰى عِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ.

৯০. এরা তারাই যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের হেদায়েতের অর্থাৎ একত্ববাদ, ধৈর্যধারণ ইত্যাদি তাদের অনুসৃত পথের অনুসরণ কর। اِقْتَدِهْ ওয়াকফ হোক বা মিলিতভাবে পাঠ হোক উভয় অবস্থায়ই এর শেষে ه-টি সাকতা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে وَصْل অর্থাৎ মিলিতভাবে পাঠের ক্ষেত্রে এটা বিলুপ্ত করে পঠিত রয়েছে। মক্কাবাসীদেরকে বল, এর জন্য অর্থাৎ আল কুরআনের জন্য আমি তোমাদের নিকট পরিশ্রমিক যা তোমরা দেবে তা চাই না। এটা অর্থাৎ আল কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য জিন ও মানবের জন্য নসিহত উপদেশ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْهُ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تِلْكَ ইসমে ইশারা। حُجَّتُنَا হলো مُشَارٌ اِلَيْهِ উভয়টি মিলে **মুবতাদা। আর** اٰتَيْنَا হলো তার খবর। [অপর একটি তারকীব] تِلْكَ মুবতাদা। حُجَّتُنَا প্রথম খবর। اٰتَيْنَاهُ জুমলা হয়ে **দ্বিতীয় খবর।**

قَوْلُهُ الَّتِيْ اِحْتَجَّ : এটি تِلْكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ-এর বিবরণ।

قَوْلُهُ اَرْشَدْنَاهُ لَهَا : **প্রশ্ন.** اٰتَيْنَا-এর তাফসীর اَرْشَدْنَاهُ দ্বারা করার ফায়দা কী? **উত্তর.** যেহেতু حُجَّتْ কোনো দেওয়ার বস্তু নয়, তাই اتينا-এর তাফসীর اَرْشَدْنَا দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حُجَّةً عَلٰى قَوْمِهٖ : **প্রশ্ন.** এখানে حُجَّةً-কে কেন উহ্য ধরা হলো? **উত্তর.** এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, عَلٰى قَوْمِهٖ টা حُجَّةً-এর مُتَعَلِّقْ হবে اٰتَيْنَا-এর নয়। কেননা, اِيْتَاءٌ-এর সেলা عَلٰى আসে না।

قَوْلُهُ نُوْحٍ : এ শব্দটি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো ذُرِّيَّتِهٖ-এর যমীরের مَرْجِعْ নির্ণয় করা। আর তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.) ; হযরত ইবরাহীম (আ.) নন। কেননা, হযরত ইউনুস (আ.) ও হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর নন। অথচ উভয়ের عَطْف হয়েছে পূর্বের সাথে।

قَوْلُهُ اِبْنَ اَخِيْ هَارُوْنَ اَخِيْ مُوْسٰى : **প্রশ্ন.** اِلْيَاسُ ابْنُ اَخِيْ مُوْسٰى এ সংক্ষিপ্ত বাক্য বাদ দিয়ে উক্ত দীর্ঘ বাক্য কেন ব্যবহার করা হলো? **উত্তর.** এভাবে প্রকাশ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আপন ভাই নয়, বরং মা শরিক ভাই। কিন্তু এটি দুর্বল মত।

قَوْلُهُ اَلْيَسَعَ اللَّامُ زَائِدَةٌ : اَلْيَسَعَ-এর اَلِفْ لَامْ অতিরিক্ত। কেননা, عَلَمْ বা মানুষের নামে اَلِفْ لَامْ আসে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَبَعْضَهُمْ كَانَ فِيْ وَالِدِهٖ كَافِرٌ : لِاَنَّ দ্বারা وَمِنْ اٰبَائِهِمْ-এর مِنْ হরফটি تبعيضية হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, مِنْ-কে تَبْعِيْضِيَّةٌ ধরা না হলে আয়াতে সকল মানুষের সন্তানকে হেদায়েত প্রাপ্ত বলতে হবে। অথচ তাদের মধ্যে কারো তো সন্তানই ছিল না। যেমন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)। কারো সন্তান কাফেরও ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান কেনান।

قَوْلُهُ اِقْتَدِهْ : **প্রশ্ন.** এ থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারী ছিলেন। তাঁকে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। **উত্তর.** مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالصَّبْرِ বৃদ্ধি করে এ আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। অনুসরণ কেবল কষ্টে ধৈর্যধারণ এবং তাওহীদের ক্ষেত্রে; শাখা-প্রশাখার মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ هَاءِ السَّكْتِ : ঐ هَا-কে বলা হয় যাকে কালিমার ওয়াকফের সময় বৃদ্ধি করা হয়। যখন শেষ হরফটি হরকতবিশিষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেছেন, اِقْتَدِهْ-এর মধ্যে هَاءٌ হলো মাসদারের যমীর। اَيْ اِقْتَدِ الْاِقْتِدَاءَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, স্বজাতির বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন, এটা ছিল আমারই অবদান। আমিই তাঁকে বিশুদ্ধ মতবাদ দান করেছি এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বলে দিয়েছি। কেউ যেন স্বীকার, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জন্য গর্বিত না হয়। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কারও নৌকা তীরে ভিড়ে না। নিছক মানববুদ্ধিই সত্যোপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। যুগে যুগেই দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সুনিপুন দার্শনিক পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক অশিক্ষিত মূর্খ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের অনুসারী হয়।

قَوْلُهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ : অর্থাৎ আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা সমুন্নত করে দেই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সারা বিশ্বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সম্মানের আসন লাভ করেছেন, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাও আমারই দান। এতে কারও স্বকীয়তার প্রভাব নেই। এরপর ছয়টি আয়াতে সতেরো জন পয়গাম্বরের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বপুরুষ, অধিকাংশই তাঁর সন্তানসন্ততি এবং কেউ কেউ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। এসব আয়াতে একদিকে তাঁদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্যবান হওয়া এবং সরল পথে থাকার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই ধর্মের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। অপরদিকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে স্বীয় পিতা, স্বদেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা পরকালের উচ্চ মর্তবা ও চিরস্থায়ী শান্তির পূর্বে দুনিয়াতে তাঁকে উত্তম স্বজন এবং উত্তম দেশ দান করেছেন। কেননা তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, সবাই তাঁরই সন্তানসন্ততি ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ.) থেকে যে শাখা বের হয়, তাতে বনী ইসরাঈলের সব পয়গাম্বর রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে শাখা হযরত ইসমাঈল (আ.) থেকে বের হয়, তাতে সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, নবিয়্যুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এতে আরও জানা গেল যে, সম্মান, অপমান এবং মুক্তি ও শাস্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই ক্রিয়াকর্মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো নবী বা ওলী থাকা সন্তানসন্ততির মধ্যে কোনো আলেম এবং পুণ্যবান থাকাও একটি বড় নিয়ামত। এর দ্বারাও মানুষের উপকার হয়।

আয়াতে উল্লিখিত সতেরো জন পয়গাম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তানসন্ততি। বলা হয়েছে- وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র নন, দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলেম ও ফিকহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذُرِّيَّتٌ শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হুসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধরভুক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপর দিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহর সত্তা। সাথে অন্যকে আরাধনায় শরিক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, তোমরা যদি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

قَوْلُهُ فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ : পরিশেষে মহানবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, আপনার কিছুসংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাঁদের উল্লেখ করেছেন। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِمْ

-[মাআরিফুল কুরআন, ৩/৩৬২-৬৩]

অনুবাদ :

৯১. وَمَا قَدَرُوا اَيِ الْيَهُوْدُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اَيْ مَا عَظَّمُوْهُ حَقَّ عَظْمَتِهٖ اَوْ مَا عَرَفُوْهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖ اِذْ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ خَاصَمُوْهُ فِي الْقُرْاٰنِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ط قُلْ لَهُمْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ قَرَاطِيْسَ اَيْ يَكْتُبُوْنَهٗ فِيْ دَفَاتِرَ مُقَطَّعَةٍ تُبْدُوْنَهَا اَيْ مَا يُحِبُّوْنَ اِبْدَاءَهٗ مِنْهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ج مِمَّا فِيْهَا كَنَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعُلِّمْتُمْ اَيُّهَا الْيَهُوْدُ فِي الْقُرْاٰنِ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْآ اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ط مِنَ التَّوْرٰةِ بِبَيَانِ مَا الْتَبَسَ عَلَيْكُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ قُلِ اللّٰهُ اَنْزَلَهٗ اِنْ لَّمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهٗ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ باطلهم يَلْعَبُوْنَ .

৯১. তারা অর্থাৎ ইহুদিরা আল্লাহর যথাযোগ্য কদর করেনি। অর্থাৎ যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি; তাঁর যথাযথ মা'রিফাত ও পরিচয় লাভ করতে পারেনি। তাই তারা রাসূল ﷺ -এর সাথে কুরআন নিয়ে বিতর্ক কালে তাঁকে বলেছিল, 'আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেননি।' এদেরকে **বল, তবে মূসার আনীত কিতাব কে অবতারণ করেছিল? যে কিতাব ছিল মানুষের জন্য আলো ও পথ নির্দেশ যা তোমরা পৃষ্ঠাসমূহে রাখ।** অর্থাৎ বিভিন্ন **খণ্ডে যা তোমরা লিপিবদ্ধ করে রাখ। তার কিছু প্রকাশ কর, অর্থাৎ তার যতটুকু প্রকাশ করতে তোমরা ভালোবাস ততটুকু প্রকাশ কর** এবং অনেকাংশ অর্থাৎ যে অংশে **রাসূল ﷺ -এর বিবরণ বিদ্যমান** সে অংশসমূহ তোমরা গোপন কর। এবং **হে ইহুদি সম্প্রদায়!** যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণও তাওরাতে জানতে পারেনি অর্থাৎ যেসব বিষয় তোমাদের নিকট অস্পষ্ট ছিল এবং যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে কুরআনে সেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে **তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তারা যদি উত্তর না দেয় তবে তুমিই বল, আল্লাহই তা অবতারণ করেছিলেন। কারণ, এটা ছাড়া এর আর কোনো উত্তর নেই।** অতঃপর তাদেরকে তাদের মগ্নতায় এ সম্পর্কে তাদের নিরর্থক আ-লোচনায় খেলতে ছেড়ে দাও। تَجْعَلُوْنَهٗ এটাসহ তিন স্থানে [تَجْعَلُوْنَهٗ ، تُبْدُوْنَهَا ، تُخْفُوْنَ] ت [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] ও ى [নাম পুরুষরূপে]-সহ পঠিত রয়েছে।

৯২. وَهٰذَا الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ مِنَ الْكُتُبِ وَلِتُنْذِرَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عَطْفٌ عَلٰى مَعْنٰى مَا قَبْلَهٗ اَيْ اَنْزَلْنَاهُ لِلْبَرَكَةِ وَالتَّصْدِيْقِ وَلِتُنْذِرَ بِهٖ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ وَسَائِرَ النَّاسِ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهَا .

৯২. এ কিতব অর্থাৎ আল কুরআন কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি যা তার সামনের অর্থাৎ পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক এবং এটা দ্বারা তুমি জনপদমাতা অর্থাৎ মক্কা নগরীর অধিবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তীকে অর্থাৎ সব মানুষকে যেন সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা তাতে বিশ্বাস করে এবং তারা পরকালের শাস্তির ভয়ে তাদের সালাতের হেফাজত করে। لِتُنْذِرَ এটা ت [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] ও ى [প্রথম পুরুষরূপে]-সহ পঠিত রয়েছে। পূর্ববর্তী বাক্যের মর্মার্থের সাথে এর عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ এটা [আল কুরআন] কল্যাণ, সমর্থন ও সতর্কীকরণার্থে আমি অবতারণ করেছি।

٩٣. وَمَنْ أَيْ لَا أَحَدٌ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِادِّعَاءِ النُّبُوَّةِ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ نَزَلَتْ فِي مُسَيْلِمَةِ الْكَذَّابِ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ط وَهُمُ الْمُسْتَهْزِءُونَ قَالُوا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ إِذِ الظّٰلِمُونَ الْمَذْكُورُونَ فِي غَمَرَاتِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ج إِلَيْهِمْ بِالضَّرْبِ وَالتَّعْذِيبِ يَقُولُونَ لَهُمْ تَعْنِيفًا أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمْ ط إِلَيْنَا لِنَقْبِضَهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ الْهَوَانِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ وَالْإِيْحَاءِ كِذْبًا وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ تَتَكَبَّرُونَ عَنِ الْإِيْمَانِ بِهَا وَجَوَابُ لَوْ لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيعًا .

৯৩. যে ব্যক্তি নবী না হয়েও নবুয়তের দাবি করতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়, যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না। আয়াতাংশ ভণ্ড নবী মুসায়লাম আলকাযযাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতারণ করেছেন আমি শীঘ্র তা অবতারণ করব। এটা হলো বিদ্রূপকারীদের উক্তি। তারা বলত, আমরাও ইচ্ছা করলে অনুরূপ বলতে পারি। তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? না, অন্য কেউ নেই। হে মুহাম্মদ! তুমি যদি দেখতে উল্লিখিত জালিমগণ যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় রইবে মুমূর্ষু অবস্থায় রইবে এবং ফেরেশতাগণ মারপিঠ ও শাস্তিদানের জন্য এদের প্রতি হাত বাড়িয়ে রইবে এবং রুক্ষভাবে বলবে, আমাদের নিকট তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। যাতে আমরা তা সংহার করে নিয়ে যেতে পারি। তোমরা নবুয়ত ও ওহী লাভের মিথ্যা দাবি করত আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে অর্থাৎ তার উপর ঈমান আনয়ন সম্বন্ধে অহংকার প্রদর্শন করতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে সে জন্য তোমাদের আজ অবমাননাকর লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেওয়া হবে। لَوْ تَرٰى -এ لَوْ -এর জবাব উহ্য। এটা হলো, لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيعًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ভীষণ ভয়াবহ একটি বিষয় দেখতে পেতে।

٩٤. وَيُقَالُ لَهُمْ إِذَا بُعِثُوا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى مُنْفَرِدِينَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَيْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ج فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِكُمْ .

৯৪. এবং তাদেরকে পুনরুত্থিত করার সময় বলা হবে তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞাতি-পরিবার, ধন-দৌলত ও সন্তানসন্ততিহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন প্রথমে তোমাদেরকে খালি পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম; তোমাদেরকে যা অর্থাৎ যেসব ধন-দৌলত প্রদান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের অনিচ্ছায় পশ্চাতে অর্থাৎ দুনিয়াতে ফেলে এসেছ।

وَ يُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الْاَصْنَامَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ اَىْ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ عِبَادَتِكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط اللّٰهِ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصْلُكُمْ اَىْ تَشَتَّتَ جَمْعُكُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ اَىْ وَصْلُكُمْ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ ذَهَبَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ فِى الدُّنْيَا مِنْ شَفَاعَتِهَا ـ

এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা স্বরে বলা হবে তোমরা যাদেরকে তোমাদের উপাসনার অধিকারী বলে আল্লাহর শরিক করতে সেই সুপারিশকারীগণকেও অর্থাৎ প্রতিমাসমূহকেও তো তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়ে গেছে তোমাদের সমাবেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা তাদের সুপারিশ সম্পর্কে দুনিয়াতে যা ধারণা করতে, তাও নিষ্ফল হয়েছে, তাও হারিয়ে গেছে। بَيْنَكُمْ এটা অপর এক কেরাতে ظَرْف অর্থাৎ স্থান ও কাল বাচক পদরূপে نَصْب [ফাতাহ] সহকারে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَوَّلْنَاكُمْ : অর্থ– যা তোমাদেরকে দান করেছিলাম।

قَوْلُهُ اَلْيَهُوْدُ : مَا قَدَرُوْا -এর فَاعِلْ ইহুদিদেরকে সাব্যস্ত করে মুশরিকদের সম্ভাবনাকে দূর করা হয়েছে। কেননা تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ মুশরিকদের অবস্থার সাথে বেমানান। কারণ মুশরিকরা তো আহলে কিতাব নয় যে, কিতাবকে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ : সে তিনটি স্থান হলো– تَجْعَلُوْنَهٗ ـ تُبْدُوْنَهَا ـ تُخْفُوْنَهَا

قَوْلُهُ قَرَاطِيْسَ : قِرْطَاسٌ -এর বহুবচন। ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠা।

قَوْلُهُ يَكْتُبُوْنَهٗ فِىْ دَفَاتِرَ : **প্রশ্ন.** قَرَاطِيْسٌ শব্দটি কিতাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ -এর কোনো মর্ম নেই। **উত্তর.** বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত মাহযূফ ধরে এ আপত্তিরই জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাওরাতকে বিভিন্ন দফতরে বা খাতায় লিখত।

قَوْلُهُ اَنْزَلَهٗ : এতে ইশারা করা হয়েছে যে, اَللّٰهُ মুবতাদা এবং اَنْزَلَهٗ উহ্য খবর। এর প্রতি করীনা হলো مَنْ اَنْزَلَ আর اَنْزَلَهٗ-কে উহ্য ধরে একটি প্রশ্নের জবাব প্রদানও উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. اَللّٰهُ হলো قُلْ উহ্য اَمْر-এর مَقُوْلَه আর مَقُوْلَه -এর জন্য জুমলা হওয়া জরুরি। অথচ اَللّٰهُ শব্দটি একক; জুমলা নয়।

উত্তর. اَللّٰهُ শব্দের পর اَنْزَلَ মাহযূফ রয়েছে। আর اَللّٰهُ اَنْزَلَ জুমলা হয়ে قُلْ -এর مَقُوْلَه হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى مَعْنٰى مَا قَبْلَهٗ : এটি পূর্বের বাক্যের মর্মের উপর আতফ হয়েছে। মাহযূফের ইল্লত নয়। তাকদীরী ইবারত এভাবে– وَاَنْزَلْنٰهُ لِتُنْذِرَ الخ কেননা হযফ তো প্রয়োজনের সময়ই করা হয়। আর এখানে হযফের প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ : تَرٰى -এর মাফঊল اَلظّٰلِمُوْنَ-এর দালালতের কারণে মাহযূফ রয়েছে। اَىْ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ يَا مُحَمَّدُ

قَوْلُهُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا : حُفَاةً শব্দটি حَافٍ وَحَافِىْ -এর বহুবচন। অর্থ– খালি পা। عُرَاةً-এর একবচন হলো عَارٍ উলঙ্গ শরীর। غُرْلًا -এর একবচন হলো اَغْرَلُ অর্থ– খতনাবিহীন।

قَوْلُهُ بَيْنَكُمْ : যদি بَيْنَكُمْ-কে مَرْفُوْعٌ পড়া হয় তাহলে تَقَطَّعَ -এর فَاعِلْ হবে। আর যদি مَنْصُوْب পড়া হয় তাহলে ظَرْف হিসেবে হবে। আর تَقَطَّعَ-এর ফায়েল যমীর হবে, যা اِتِّصَالْ -এর দিকে ফিরেছে। اَىْ وَصْلُكُمْ بَيْنَكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ : দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি কখনও কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ করেননি, গ্রন্থ ও রাসূল প্রেরণ ব্যাপারটি মূলত ভিত্তিহীন।

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তি পূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা তারা কোনো গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোনো কালেই ছিল না। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে এটি ইহুদিদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যত এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থি ছিল। ইমাম বগভী (র.) -এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছেন, যারা এমন বাজে কথা বলেছে তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চেনেনি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হতো না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির একজন হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছ, সে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন– তোমরা এমন বক্রগামী যে, যে তাওরাতকে তোমরা ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করে গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোনো পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদিরা সেগুলো তাওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قَرَاطِيْسُ শব্দটি قِرْطَاسٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

قَوْلُهُ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ : অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর কি দেবে; আপনিই বলে দিন! আল্লাহ তা'আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

قَوْلُهُ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ الخ : তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا .

অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কুরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কুরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী ইসরাঈলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোনো বিশেষ পয়গাম্বর ও গ্রন্থ এ যাবৎ অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কুরআন

বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মুয়াযযমাকে কুরআন পাক 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কিবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু। -[তাফসীরে মাযহারী]

উম্মুল কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ : অর্থাৎ যারা পরকালের বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদি ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা, মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে তৈরি করা- এটি পরকালের বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, আল্লাহভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তাভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরোয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায় পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালের বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোনো সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি এবং পরকাল ভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআন পাকের কোনো সূরা বরং কোনো রুকু এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৬৯-৭২]

অনুবাদ :

٩٥. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ شَاقُّ الْحَبِّ عَنِ النَّبَاتِ وَالنَّوٰى ط عَنِ النَّخْلِ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالْاِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَىِّ ط ذٰلِكُمُ الْفَالِقُ الْمُخْرِجُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ فَكَيْفَ تُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ.

৯৫. আল্লাহই বৃক্ষের দানা ও খর্জুরের আঁটি অঙ্কুরিত করেন। বিদীর্ণ করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে **জীবন্তকে** যেমন, মানুষকে শুক্র হতে ও পাখিকে ডিম হতে **নির্গত করেন** এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে **যেমন, শুক্র ও ডিম** নির্গত করেন। এ তো অর্থাৎ **অঙ্কুরোদগমকারী ও নির্গতকারীই** তো আল্লাহ, সুতরাং **তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ প্রমাণ** প্রতিষ্ঠার পরও ঈমান আনয়ন না করে তোমরা কিরূপে ফিরে যাবে?

٩٦. فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ج مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الصُّبْحِ اَىْ شَاقُّ عُمُوْدِ الصُّبْحِ وَهُوَ اَوَّلُ مَا يَبْدُوْ مِنْ نُوْرِ النَّهَارِ عَنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا يَسْكُنُ فِيْهِ الْخَلْقُ مِنَ التَّعَبِ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ اللَّيْلِ حُسْبَانًا ط حِسَابًا لِلْاَوْقَاتِ اَوِ الْبَاءُ مَحْذُوْفَةٌ وَهُوَ حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ اَىْ يَجْرِيَانِ بِحُسْبَانٍ كَمَا فِىْ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْعَلِيْمِ بِخَلْقِهِ.

৯৬. তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান ভোরের আলোকস্তম্ভ বিদীরণ করেন। রাত্রের আঁধার চিরে দিনের প্রথম যে আলো পরিস্ফুট হয় তাকে ভোরের আলোস্তম্ভ বলা হয়। اَلْاِصْبَاحُ এটা মূলত مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল। এখানে বিশেষ্য اَلصُّبْحُ [ভোর] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এতে সব সৃষ্টজীব শ্রান্তি হতে বিশ্রাম নেয় এবং সময় গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এসব অর্থাৎ উল্লিখিত সব এমন এক সত্তা কর্তৃক **সুনির্ধারিত যিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।** اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ **পূর্বোল্লিখিত** اَللَّيْلِ **-এর** مَحَلَّ [স্থান]-এর **সাথে** عَطْف **বা অন্বয় সাধিতরূপে এ দুটি** مَنْصُوْب **[ফাতাহযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।** حُسْبَانًا এখানে এর পূর্বে بِ উহ্য রয়েছে। এটা এখানে উহ্য শব্দ يَجْرِيَانِ -এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ يَجْرِيَانِ بِحُسْبَانٍ উভয়ই হিসাব অনুসারে সঞ্চরণশীল। সূরা আর রাহমানেও এরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

٩٧. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط فِى الْاَسْفَارِ قَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى قُدْرَتِنَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন পরিভ্রমণের সময় তোমরা তা দ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমি আমার কুদরতের উপর প্রমাণবহ নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই, বিবৃত করে দেই।

٩٨. وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ هِيَ اٰدَمُ فَمُسْتَقَرٌّ مِّنْكُمْ فِي الرَّحِمِ وَّمُسْتَوْدَعٌ ط مِنْكُمْ فِي الصُّلْبِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ اَيْ مَكَانُ قَرَارٍ لَكُمْ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ مَا يُقَالُ لَهُمْ .

৯৮. তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি আদম হতে পয়দা করেছেন সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তোমাদের জন্য রয়েছে মাতার গর্ভাশয়ে স্থিত স্থান এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পিতার শিরদাঁড়ায় গচ্ছিত থাকার স্থান। যা বলা হয় তা অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই। مُسْتَقَرٌّ এটা অপর এক কেরাতে ق অক্ষরে ফাতাহসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ অবস্থাস্থল।

٩٩. وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ج فَاَخْرَجْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهِ بِالْمَاءِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ اَيِ النَّبَاتِ شَيْئًا خَضِرًا بِمَعْنٰى اَخْضَرَ نُّخْرِجُ مِنْهُ مِنَ الْخَضِرِ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ج يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَسَنَابِلَ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا وَمِنَ النَّخْلِ خَبَرٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ مِنْ طَلْعِهَا اَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِيْ اَكْمَامِهَا وَالْمُبْتَدَأُ قِنْوَانٌ عَرَاجِيْنُ دَانِيَةٌ قَرِيْبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَّ اَخْرَجْنَا بِهِ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مِنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَرَقُهُمَا حَالٌ وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط ثَمَرُهُمَا اُنْظُرُوْٓا يَا مُخَاطَبِيْنَ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ اِلٰى ثَمَرِهٖ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِضَمِّهِمَا وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ كَشَجَرَةٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ اِذَآ اَثْمَرَ اَوَّلُ مَا يَبْدُوْ كَيْفَ هُوَ وَ اِلٰى يَنْعِهٖ ط نَضْجِهٖ اِذَا اَدْرَكَ كَيْفَ يَعُوْدُ .

৯৯. তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা অর্থাৎ পানি দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন। অনন্তর তা হতে চারা হতে সবুজ জিনিস উদ্‌গত করেন। পরে তা হতে অর্থাৎ সবুজ গাছ হতে ঘন সন্নিবিষ্ট একটির পর আরেকটি স্তরে স্তরে সাজান শস্যদানা উৎপাদন করেন। যেমন গম ইত্যাদির শীষ। এবং খর্জুর বৃক্ষের মাথি হতে অর্থাৎ তার থোড়ে প্রথম যে ফুল জাতীয় বস্তু উদ্‌গত হয় তা হতে [ঝুলন্ত কাঁদি] একটির নিকট আরেকটি সাজানো কচি ফলগুচ্ছ [নির্গত করেন। এবং] তা দ্বারা আরো উদ্‌গত করেন [আঙ্গুর কুঞ্জ] তার উদ্যান যাইতুন ও দাড়িম্ব এ দুটির পাতা একটি আরেকটির সদৃশ এবং ফল বিসদৃশ। হে সম্বোধিত জন! শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর এর ফলের দিকে যখন ফল উদগম হয় অর্থাৎ প্রথম অংকুরিত হওয়ার সময় কিরূপ থাকে এবং এর পক্বতার প্রতি। অর্থাৎ যখন তা পরিপক্ব তখন কিরূপে এটা রূপান্তরিত হয় দেখ। اَخْرَجْنَا এতে غَيْب অর্থাৎ নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَات অর্থাৎ রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। خَضِرَ এরা এখানে اَخْضَر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنَ النَّخْلِ এটা خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয়। مِنْ طَلْعِهَا -এটা مِنَ النَّخْلِ এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। قِنْوَانٌ এটা مُبْتَدَأٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্য। مُشْتَبِهًا এটা حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ثَمَرٌ-এর ث ও م-এ ফাতাহ বা উভয়টিতেই পেশ সহকারে পাঠ করা যায়। এটা ثَمَرَةٌ-এর বহুবচন। যেমন شَجَرَةٌ [বৃক্ষ] -এর বহুবচন شَجَرٌ এবং خَشَبَةٌ [কাষ্ঠ] এর বহুবচন خَشَبٌ -

إِنَّ فِي ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ دَالَّاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى عَلَى الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا فِي الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ۔

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্য পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রমাণবহ নিদর্শন রয়েছে। কেবল বিশ্বাসীগণই যেহেতু ঈমানের বিষয়ে এটা দ্বারা উপকৃত হতে পারে সেহেতু এখানে এদেরকেই বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেরদের অবস্থা এর বিপরীত!

١٠٠. وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ شُرَكَاءَ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ الْجِنَّ حَيْثُ اَطَاعُوْهُمْ فِيْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَ قَدْ خَلَقَهُمْ فَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ شُرَكَاءَهٗ وَخَرَقُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَيْ اِخْتَلَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط حَيْثُ قَالُوْا عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَنٰتُ اللّٰهِ سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ بِاَنَّ لَهٗ وَلَدًا۔

১০০. তারা জিনকে আল্লাহর শরিক করে। অর্থাৎ প্রতিমা পূজার ব্যাপারে তারা এদেরই অনুসরণ করে। অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেমন করে এরা তাঁর শরিক হতে পারে? এবং তারা অজ্ঞানতা বশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে। এ বিষয়ে মিথ্যা রচনা করে। যেমন তারা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। তিনিই মহিমান্বিত পবিত্রতা তাঁরই। তারা যা বলে যে, তার সন্তানসন্ততি রয়েছে তিনি তার ঊর্ধ্বে। لِلّٰهِ এটা جَعَلُوْا ক্রিয়ার - مَفْعُوْل ثَانِيْ। شُرَكَاءَ এটা উক্ত ক্রিয়ার مَفْعُوْل اَوَّل - اَلْجِنَّ এটা شُرَكَاءَ-এর بَدَل। وَخَلَقَهُمْ এ বাক্যটি حَال অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে এর পূর্বে قَدْ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। خَرَقُوْا এটা তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَنْعِ : অর্থাৎ পক্ব হওয়া।

قَوْلُهٗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ : এ জুমলাটি كَلَام مُسْتَانِفْ হয়ে পূর্বের ইল্লত হয়েছে এবং দ্বিতীয় খবর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর حَيّ দ্বারা প্রত্যেক ঐ বস্তু উদ্দেশ্য যার মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। চাই তার মধ্যে রূহ থাকুক বা না থাকুক। আর مَيِّت দ্বারা প্রত্যেক ঐ বস্তু উদ্দেশ্য যার মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা নেই।

قَوْلُهٗ مُخْرِجُ : এর আতফ হয়েছে فَالِقُ-এর সাথে। এজন্য يُخْرِجُ-এর স্থলে مُخْرِجُ ইসমে ফায়েলের সীগাহ আনা হয়েছে, যাতে আতফ শুদ্ধ হয়ে যায়। আর يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ এটি فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى-এর বয়ান। এজন্য وَاوْ বাদ দিয়ে يُخْرِجُ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন. اِخْرَاجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ কেন বয়ান হতে পারে না? উত্তর. এজন্য যে, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى টি -এর জিনস। তার বিপরীত জিনিস নয়। অথচ بَيَان তার مُبَيَّن-এর মর্মের মাঝে مُطَابَقَت জরুরি।

قَوْلُهٗ فَكَيْفَ تَعْرِفُوْنَ الخ : اَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ-এর তাফসীর كَيْفَ تَعْرِفُوْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ

قَوْلُهٗ مَصْدَرٌ : অর্থাৎ اَلْاِصْبَاحِ বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। যার অর্থ হলো دُخُوْلٌ فِي الصُّبْحِ কিন্তু এখানে এ অর্থ নয়। বরং এখানে অর্থ হলো শুধু সকাল। মাসদার বলে মাসদারের اَثَرْ অর্থাৎ সকাল বোঝানো হয়েছে। আর কুফাবাসীদের মতে, جَاعِلُ-এর স্থলে جَعَلَ রয়েছে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে اِسْم-এর সাথে فِعْل-এর আতফ জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَحَلِّ اللَّيْلِ : অর্থাৎ لَيْل -এর মহল جَاعِلُ -এর মাফউল হওয়ার কারণে নসব হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ حَالٌ مِنَ الْمُقَدَّرِ : অর্থাৎ حُسْبَان উহ্য يَجْرِيَانِ থেকে حَالٌ হয়েছে। যদি মুফাসসির (র.) مُقَدَّرٌ থেকে حَالٌ না বলে مُتَعَلِّقٌ বলতেন তাহলে বেশি ভালো হতো।

قَوْلُهُ قِنْوَانٌ : এটি قِنْوٌ-এর বহুবচন। অর্থ– থোকা, কাঁদি, খেজুরের গুচ্ছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা বর্ণিত হয়েছিল। এসব দোষের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাই আলে-াচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী। এতে আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক জীব ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগৎ স্রষ্টারই কাজ এতে কোনো মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোনো প্রভাব নেই। আল্লাহর শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অংকুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম হওয়া, অতঃপর তাতে রঙ্গবেঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফলফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি করতে অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানবীয় কর্মের কোনো প্রভাব নেই। তাই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ অর্থাৎ তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, না আমি করি? দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে– يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত্যু বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম– এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন– ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ অর্থাৎ এগুলো সবই এক আল্লাহর কাজ। অতঃপর একথা জেনেশুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

قَوْلُهُ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ : فَالِقٌ শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং إِصْبَاحٌ শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ এর অর্থ প্রভাতকে ফাঁককারী। অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তি ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো সৃষ্ট জীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

রাত্রিকে সৃষ্ট জীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক নির্ধারণ একটি বিরাট নিয়ামত : এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا-سَكَنٌ শব্দটি سُكُوْنٌ থেকে উদ্ভূত। যেখানে পৌঁছে মানুষ শান্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করে তাকেই سَكَنٌ বলা হয়। এ কারণেই মানুষের বাসগৃহকে কুরআনে سَكَنٌ বলা হয়েছে। جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا কেননা, কুঁড়ে ঘর হলেও মানুষ সেখানে পৌঁছে স্বভাবতই স্বস্তি ও আরাম বোধ করে। কাজেই আলোচ্য বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আরামদায়ক করেছেন। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ বাক্যে ঐসব নিয়ামতের বর্ণনা ছিল, যা মানুষ দিবালোকে অর্জন করে, রাত্রির অন্ধকারে নয়। এরপর جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ দিনের বেলা সব কাজকারবার করে বিধায় দিবালোক যেমন একটি বিরাট নিয়ামত, তেমনি রাত্রির অন্ধকারকেও মন্দ মনে করো না। এটিও একটি বড় নিয়ামত। সারাদিনের শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ রাত্রে আরাম করে পরদিন আবার নবোদ্যমে কাজ করার যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা মানবপ্রকৃতি অব্যাহত পরিশ্রম সহ্য করতে পারত না।

রাত্রির অন্ধকারকে আরামের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং আল্লাহ তা'আলার অজেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এ নিয়ামতটি প্রত্যহ অযাচিতভাবে পাওয়া যায়। তাই এটি যে কত বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ, সেদিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপও করে না। চিন্তা করুন, যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করত, তবে কেউ হয়তো সকাল আটটায়, কেউ দুপুর বারোটায়, কেউ বিকাল চারটায় এবং কেউ রাতের বিভিন্ন অংশে ঘুমাবার ইচ্ছা করত। ফলে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অহরহ মানুষ কাজকারবার ও শ্রমে লিপ্ত থাকত এবং মিল-ফ্যাক্টরী সর্বক্ষণ চালু থাকত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে নিদ্রিতদের নিদ্রায় এবং কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটত। কেননা, কর্মীদের হট্টগোলে নিদ্রিতদের নিদ্রা ভেঙে যেত এবং নিদ্রিতদের অনুপস্থিতি কর্মীদের কাজ বিঘ্নিত করত। এ ছাড়া নিদ্রিতদের এমন সব অনেক কাজ বাদ পড়ে যেত, যা নিদ্রার সময়ই হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি শুধু মানুষের উপরই নয় প্রত্যেক প্রাণীর উপর রাত্রিবেলায় নিদ্রাকে এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে যে, সবাই কাজকর্ম ছেড়ে ঘুমাতে বাধ্য। সন্ধ্যার সাথে সাথেই যাবতীয় পশু-পাখি ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু নিজ নিজ বাসস্থান ও গৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে কাজ ছেড়ে বিশ্রামের চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্বে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও বিশ্রামে সাহায্য করে। কেননা অধিক আলোতে স্বভাবতই সুনিদ্রা আসে না। চিন্তা করুন, যদি সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও জনগণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে নিদ্রার কোনো সময় নির্দিষ্ট করতে চাইত, তবে প্রথমত তাতে কত যে অসুবিধা দেখা দিত তার ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয়ত সব মানুষ যদি কোনো চুক্তি অনুসরণ করে নিদ্রা যেত, তবে জন্তু-জানোয়ারকে কে চুক্তি অনুকরণে বাধ্য করতে পারত। তারা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করত এবং নিদ্রিত মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলত। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের উপর নির্দিষ্ট এক সময়ে নিদ্রা চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

সৌর ও চান্দ্র হিসাব : বলা হয়েছে- وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا - حُسْبَانٌ একটি ধাতু। এর অর্থ- হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্য কোনো ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকাও দেখা দেয় না। উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে।

قَوْلُهُ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ : হাজারো বছরে এদের গতিতে এক সেকেন্ড পার্থক্য হয় না। পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনাআপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা রয়েছে। কিন্তু এসব গোলকের পরিবর্তনীয় ও অটল ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে হতচকিত ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। ফলে মানুষ একথা ভুলে গেছে যে, ঐশীগ্রন্থ, পয়গাম্বর ও রাসূলরা এ সত্য উদঘাটন করার জন্য অবতীর্ণ হন।

কুরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং এ দুটিই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। এটি ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামি বিধিবিধানে চান্দ্রমাস ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামি তারিখ এবং ইসলামি বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজন বশত সৌর ও অন্যান্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোনো পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ। এতে রমজান কিংবা জিলহজ্জ ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ : অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেন্ড এদিকে-ওদিক হয় না একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ

এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কল-কব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্র পুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোনো একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্ম-প্রবঞ্চিত।

قَوْلُهُ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহকে চেনে না, তারা বেখবর ও অসচেতন।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ : مُسْتَقَرٌّ শব্দটি قَرَارٌ থেকে উদ্ভূত। কোনো বস্তুর অবস্থানস্থলকে مُسْتَقَرٌّ বলা হয়। مُسْتَوْدَعٌ শব্দটি وَدِيْعَتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারো কাছে কোনো বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেওয়া। অতএব, مُسْتَوْدَعٌ ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোনো বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এ ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন, مُسْتَوْدَعٌ ও مُسْتَقَرٌّ যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন, কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কুরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীর মাযহারীতে বলেছেন, مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোজখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক, কিংবা কবর ও বরযখই হোক সবগুলোই হচ্ছে مُسْتَوْدَعٌ অর্থাৎ সাময়িক অবস্থানস্থল। কুরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে– لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফির সদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়েও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করতে থাকে। বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৃষ্ট জগতের তামাশায় মত্ত হয়ে যারা আসল বাসস্থান এবং আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে যায়, শেষ এ আয়াতে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন করে এবং দুনিয়ার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৭৩-৭৮]

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً : আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. উর্ধ্বজগৎ, ২. অধঃজগৎ এবং ৩. শূন্যজগৎ। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ ও বাগানের বর্ণনা এবং ২. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলেফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পুনঃ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে রাখা হয়েছে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই مُنْعَمٌ عَلَيْهِ যাদেরকে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণিবিন্যাস বহাল রয়েছে; অর্থাৎ শস্যের অবস্থা বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৮১]

অনুবাদ :

١٠١. هُوَ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مُبْدِعُهُمَا مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ أَنّٰى كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ط زَوْجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْلُقَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

১০১. তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে এতদুভয়ের উদ্ভাবক। তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোনো সঙ্গিনী নেই অর্থাৎ ভার্যা নেই। তিনিই তো সব কিছু অর্থাৎ যেসব জিনিস সৃষ্টি হতে পারে তা সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। أَنّٰى এটা এখানে كَيْفَ [কিরূপে।] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٢. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَحِّدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ حَفِيظٌ.

১০২. তিনিই আল্লাহ; তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, তিনি এক বলে স্বীকার কর, তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক রক্ষক।

١٠٣. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ أَيْ لَا تَرَاهُ وَهٰذَا مَخْصُوصٌ لِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقِيلَ الْمُرَادُ لَا تُحِيطُ بِهِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ج أَيْ يَرَاهَا وَلَا تَرَاهُ وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ أَنْ يُدْرِكَ الْبَصَرَ وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ أَوْ يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا وَهُوَ اللَّطِيفُ بِأَوْلِيَائِهِ الْخَبِيرُ بِهِمْ.

১০৩. তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। তাঁকে দৃষ্টি অবলোকন করতে পারে না। পরকালে মু'মিনদের কর্তৃক তাঁকে দর্শন করার বিষয়টি এ আয়াতটির মর্ম হতে ব্যতিক্রম। কেননা একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ বহু চেহারা এ দিন সজীব-সুন্দর হবে তার প্রতিপালকের প্রতি দেখতে থাকবে। শাইখাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ -ইরশাদ করেন, পূর্ণিমার চাঁদ যেমন তোমরা অবলোকন কর তদ্রূপ অতি সত্বরই তোমরা আল্লাহকে দর্শন করতে পারবে। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটির মর্ম হলো, সেটা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত। অর্থাৎ তিনি তাকে দেখেন কিন্তু সে তাঁকে অবলোকন করতে সক্ষম নয়। অপর কারও ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় যে, সে তা দেখবে কিন্তু তা তাকে দেখবে না। কিংবা বাক্যটির মর্ম হলো, তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা তা বেষ্টন করতে পারঙ্গম। তিনি তাঁর ওলীগণের সম্পর্কে অতি কোমল, তাদের বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

١٠٤. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ حُجَجٌ مِنْ رَبِّكُمْ ج فَمَنْ أَبْصَرَهَا فَآمَنَ فَلِنَفْسِهِ ج أَبْصَرَ لِأَنَّ ثَوَابَ إِبْصَارِهِ لَهُ وَمَنْ عَمِيَ عَنْهَا فَضَلَّ فَعَلَيْهَا ط وَبَالُ ضَلَالِهِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ رَقِيبٍ لِأَعْمَالِكُمْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ.

১০৪. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় এসেছে। সুতরাং কেউ এটা লক্ষ্য করলে অনন্তর ঈমান আনয়ন করলে সে নিজের জন্যই তা লক্ষ্য করল। কারণ তা লক্ষ্য করার পুণ্যফল তারই হবে। আর যে সেটা হতে অন্ধ হবে অনন্তর পথভ্রষ্ট হবে তার নিজের উপরই তা বর্তাবে অর্থাৎ তার পথভ্রষ্টতার মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আমি তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের কার্যসমূহের রক্ষক নই, তত্ত্বাবধায়ক নই। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

١٠٥. وَكَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِيَعْتَبِرُوْا وَلِيَقُوْلُوْا اَيِ الْكُفَّارُ فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ دَارَسْتَ ذَاكَرْتَ اَهْلَ الْكِتَابِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ دَرَسْتَ اَىْ كُتُبَ الْمَاضِيْنَ وَجِئْتَ بِهٰذَا مِنْهَا وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

১০৫. এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন বর্ণনা করে দিয়েছি তেমনি নিদর্শনাবলি বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি বর্ণনা করি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং যেন তারা অর্থাৎ কাফেরগণ অবশেষে বলে, তুমি এটা অধ্যয়ন করেছ। অর্থাৎ কিতাবীদের সাথে আলোচনা করে এসে বলছ। আমি তো এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। دَارَسْتَ এটা অপর এক কেরাতে دَرَسْتَ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হলো, তুমি অতীত যুগের কিতাবসমূহ পাঠ করত তা নিয়ে এসেছ।

١٠٦. اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ اَىِ الْقُرْاٰنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

১০৬. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় অর্থাৎ আল কুরআন তুমি তারই অনুসরণ কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর।

١٠٧. وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۚ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ رَقِيْبًا فَنُجَازِيْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ فَتُجْبِرُهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ.

১০৭. আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করত না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করেনি, তত্ত্বাবধায়ক করেনি। আমিই তাদের কৃতকার্যের প্রতিফল দান করব। আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও। যে তাদেরকে তুমি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য করতে পার। এ বিধান ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশের পূর্বের।

١٠٨. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ هُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا اِعْتِدَاءً وَظُلْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ اَىْ جَهْلٍ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ كَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لِهٰؤُلَاءِ مَا هُمْ عَلَيْهِ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَاَتَوْهُ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فِى الاخرة فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ.

১০৮. আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে অর্থাৎ যে প্রতিমাসমূহকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারাও অজ্ঞানতা বশত অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞানতার কারণে সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে ও সীমাতিক্রম করে আল্লাহকেও গালি দেবে! এভাবে অর্থাৎ যেভাবে এদের বর্তমান অবস্থা এদের জন্য আমি সুশোভন করে দিয়েছি সেভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের ভালো ও মন্দ কার্যকলাপ সুশোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা তা করে। অতঃপর পরকালে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন এবং তাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করবেন।

١٠٩. وَاَقْسَمُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَىْ غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا لَئِنْ جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ مِّمَّا اقْتَرَحُوْا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ط قُلْ لَّهُمْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ يُنَزِّلُهَا كَمَا يَشَاۤءُ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ وَمَا يُشْعِرُكُمْ يُدْرِيْكُمْ بِاِيْمَانِهِمْ اِذَا جَاۤءَتْ اَىْ اَنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ ذٰلِكَ اَنَّهَاۤ اِذَا جَاۤءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ لِمَا سَبَقَ فِىْ عِلْمِىْ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِالتَّاۤءِ خِطَابًا لِلْكُفَّارِ وَفِىْ اُخْرٰى بِفَتْحِ اَنَّ بِمَعْنٰى لَعَلَّ اَوْ مَعْمُوْلَةٌ لِمَا قَبْلَهَا .

১০৯. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ চূড়ান্ত পর্যায়ের শপথ করে বলে, তাদের আবদার অনুসারে তাদের নিকট যদি নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত। এদেরকে বল, নিদর্শন তো আল্লাহর নিকট। যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন তা অবতারণ করেন। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এটা এলেও তাদের ঈমান সম্পর্কে তোমরা কি করে বুঝবে? তোমাদের কিভাবে এটা বোধগম্য হবে? তোমাদের তা বোধগম্য হবে না। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কারণ, পূর্ব হতেই আমি তা জানি। يُشْعِرُكُمْ এটা অপর এক কেরাতে কাফেরদের প্রতি সম্বোধন হিসেবে ت সহ [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] পঠিত রয়েছে। اَنَّهَا অপর এক কেরাতে এর হামযাটি ফাতাহযুক্তরূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা لَعَلَّ [হয়তোবা] অর্থে ব্যবহৃত বলে বিবেচ্য হবে কিংবা পূর্ববর্তী ক্রিয়ার مَعْمُوْل রূপে গণ্য হবে।

١١٠. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ نُحَوِّلُ قُلُوْبَهُمْ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ وَاَبْصَارَهُمْ عَنْهُ فَلَا يُبْصِرُوْنَهُ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَىْ بِمَا اُنْزِلَ مِنَ الْاٰيَاتِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ نَتْرُكُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ ضَلَالِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ مُتَحَيِّرِيْنَ .

১১০. তারা যেমন প্রথমবারে তাতে অর্থাৎ প্রেরিত নিদর্শসমূহে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তর তাদের হৃদয় সত্য হতে ফিরিয়ে দেব, ফলে তারা তা বুঝবে না এবং চক্ষু তা হতে ঘুরিয়ে দেব। ফলে তারা তা দেখতে পারবে না। সুতরাং ঈমানও আনয়ন করবে না। আর তাদের অবাধ্যতায় গোমরাহিতে তাদেরকে উদভ্রান্ত হয়ে অস্থির ও পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াতে ইতস্তত বিচরণ করে ফিরতে দেব ছেড়ে দেব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَصَائِرُ : অর্থ যুক্তি-প্রমাণাদি।

قَوْلُهُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ মুবতাদা মাহযূফের খবর। بَدِيْعُ اَىْ هُوَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ অথবা بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ হলো মুবতাদা আর তার খবর হলো اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ -

بَدِيْعُ শব্দটি مُبْدِعٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। سَمِيْعٌ যেমন مُسْمِعٌ-এর অর্থে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ-এর মধ্যে صِفَت مُشَبَّه-এর اِضَافَتْ হয়েছে فَاعِل -এর দিকে। তার মূলরূপ হলো– بَدِيْعٌ سَمٰوٰتُهٗ وَاَرْضُهٗ

قَوْلُهُ مِنْ شَاْنِهٖ اَنْ يَخْلُقَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُؤَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ -এর মাঝে আল্লাহর যাতও দাখেল আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে আল্লাহর যাত এবং সিফত لَا شَىْءَ হওয়া লাযেম আসে, যা অসম্ভব। আর যদি দাখেল থাকে তাহলে আল্লাহর যাত ও সিফত মাখলুক হওয়া লাযেম আসে।

উত্তর. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ -এর মাঝে شَيْءٍ টি عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ হয়েছে أَيْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَخْصُوصٌ لِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো মু'তাযিলাদের إِمْتِنَاعُ رُؤْيَتْ বা আল্লাহর দীদার অসম্ভব হওয়ার দাবি খণ্ডন করা। মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হলো, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দীদার হবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হলো, আখেরাতে মু'মিনগণ আল্লাহর দীদার হাসিল করবেন।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْمُرَادُ لَا تُحِيْطُ بِهٖ : যদি لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় عَدَمِ إِحَاطَه বেষ্টন না করা, তাহলে সে সুরতে مَخْصُوْص হবে না; বরং عُمُوْمِيَّتْ বা ব্যাপকতা বাকি থাকবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার হাকীকত অনুভব করা দুনিয়া এবং আখেরাতের কোথাও সম্ভব হবে না।

قَوْلُهُ وَيُحِيْطُ بِهَا عِلْمًا : এটি إِدْرَاكْ-এর দ্বিতীয় অর্থ।

قَوْلُهُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ : **প্রশ্ন.** এখানে قُلْ يَا مُحَمَّدُ উহ্য মানার কী কারণ?

উত্তর : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত কথাটি রাসূল ﷺ -এর জবান মুবারক থেকে বের হয়েছে। অন্যথায় এ আপত্তি হবে যে, وَمَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ -এর কী অর্থ? কারণ আল্লাহ থেকে حِفْظ -এর নফী করাটা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ لِيَعْتَبِرُوْا : **প্রশ্ন.** মুফাসসির (র.) এখানে يَعْتَبِرُوْا উহ্য মানলেন কেন?

উত্তর. যাতে وَلِيَقُوْلُوْا-এর আতফ সহীহ হতে পারে।

قَوْلُهُ نُبَيِّنُهٗ : لِنُبَيِّنَهٗ تَبْيِيْنٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ جَمْع مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। আমরা খুলে খুলে বর্ণনা করব। -এর মধ্যে لَامْ টি تَعْلِيْل-এর জন্য।

قَوْلُهُ فَاَتَوْهُ : এখানে فَاَتَوْهُ উহ্য ধরার কারণ হলো, যাতে এর উপর ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ الخ -এর আতফ সহীহ হয়। কেননা, مَعْطُوْف হলো ওয়াদা এবং وَعِيْد সতর্কবাণী। আর এটা ভালো ও মন্দ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। সাধারণ تَتْرِيْن -এর ক্ষেত্রে হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَيْ اَنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ ذٰلِكَ : এখানে মু'মিনদেরকে খেতাব করা হচ্ছে। এতে মু'মিনদেরকে মুশরিকদের ফরমায়েশী মু'জিযার আশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মু'মিনরা এ কামনা করত যে, যদি মুশরিকদের দাবি অনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর হাতে মু'জিযা প্রকাশ পেত, তাহলে ভালো হতো। যাতে মুশরিকরা ঈমান নিয়ে আসে। তাদের এ কামনার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা মুশরিকদের ফরমায়েশী মু'জিযার কামনা করবে না। তোমাদের কি জানা আছে যে, তারা এসব মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? আমার ইলমে আযালীতে রয়েছে যে, তারা এসব দেখেও ঈমান আনবে না।

মুফাসসির (র.)-এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন। একটি হলো, مَا يُشْعِرُكُمْ -এর মধ্যে مَا হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ বা অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন।

اَيْ لَا تَدْرُوْنَ بِاَنَّهَا إِذَا جَاءَتِ الْاٰيَاتُ لَا يُؤْمِنُوْنَ فَلِذٰلِكَ تَمَنَّوْنَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ ذٰلِكَ فَلَا تَتَمَنَّى بِهَا অর্থাৎ তোমরা জান না যে, যদি তাদের দাবি অনুযায়ী মু'জিযা প্রকাশও পেত তবু তারা ঈমান আনবে না। সুতরাং তোমরা তা কামনা করো না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, اَنَّ হরফটি لَعَلَّ -এর অর্থে। এর সারকথা হলো, يُشْعِرُكُمْ -এর দ্বিতীয় মাফঊল উহ্য আছে।

اَيْ مَا يُشْعِرُكُمْ بِاِيْمَانِهِمْ وَاَيْ لَعَلَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর لَعَلَّ সে সময় নিশ্চিত অর্থে আসবে। অর্থাৎ তাদের দাবি মোতাবেক মু'জিযা এলেও নিঃসন্দেহে তারা ঈমান আনবে না। তাদের উদ্দেশ্য হলো আয়াতকে জাহের মোতাবেক বানানো। আর (بِالْكَسْرِ) اِنَّ-এর সুরতে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে। যা সর্বদা سُؤَال مُقَدَّرْ -এর জবাবে আসে। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে مَا يُشْعِرُكُمْ مَا يَكُوْنُ مِنْهُمْ তার জবাবে বলা হয়েছে- إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

قَوْلُهُ وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ : এর আতফ হলো لَا يُؤْمِنُوْنَ -এর সাথে।

اَيْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّا حِيْنَئِذٍ نُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَفْهَمُوْنَهٗ وَاَبْصَارَهُمْ فَلَا يُبْصِرُوْنَهٗ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا .

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে أَبْصَارٌ শব্দটি بَصَرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ- দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি। إِدْرَاكٌ শব্দের অর্থ- পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ স্থলে إِدْرَاكٌ শব্দের অর্থ- 'বেষ্টন করা' বর্ণনা করেছেন। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

এতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে।

১. সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ যাবৎ পৃথিবীতে যম মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ জীবজন্তুর দৃষ্টিকেও এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জন্তুর ক্ষুদ্রতম চক্ষুও পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ? এদের বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েসমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহর পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি অসীম। মানবিক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা সসীম। এটা সবাই জানে যে, কোনো অসীমকে কোনো সসীম নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না। তাই বিশ্বের যত বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের নিরিখে স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলির অনুসন্ধান ও গবেষণায় জীবনপাত করেছেন এবং যত সূফী মনীষী 'কাশফ' [অন্তর্দৃষ্টি] ও 'ইলহাম' [ঐশীজ্ঞান] -এর আলো নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি এবং পেতে পারে না।

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা : মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) যখন رَبِّ أَرِنِيْ [হে পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখা দাও] বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল- لَنْ تَرَانِيْ [তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।] হযরত মূসা (আ.)-ই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোনো জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনের এক আয়াতে আছে- كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ কাফেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে আড়ালে ও বঞ্চিত থাকবে। পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে- হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌঁছার পরও। জান্নাতিদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোনো নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতিরা নিবেদন করবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত সোহায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারীর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, [পরকালে] তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে। তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দান করবেন তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতি এ নিয়ামত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগৎ বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আয়াতের অর্থ এটা নয়, বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় দেখা হতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহর সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

২. আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় গুণ যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অনুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তাঁর অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারে না। কেনেনা এটা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

قَوْلُهُ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ : আরবি অভিধানে لَطِيْف শব্দটি দু-অর্থে ব্যবহৃত হয়, ১. দয়ালু, ২. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না কিংবা জানা যায় না। خَبِيْر শব্দের অর্থ- যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ সূক্ষ্ম। তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لَطِيْف শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও তাই সব গুনাহের কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- বুদ্ধি ও জ্ঞান । অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بَصَائِرُ বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ কুরআন, রাসূল ﷺ ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে এবং তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকারবার ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজের উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব নয়, যেমনটি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রাসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলি পৌঁছিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা, না করা মানুষের দায়িত্ব।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ ও রিসালতের যেসব প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণাদি বর্ণনা করে থাকি।

قَوْلُهُ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ হেদায়েতের সব সাজসরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি- যেমন, কুরআন একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত

আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে– সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোনো হঠকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে دَرَسْتَ অর্থাৎ এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যায়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে– وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এ দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

চতুর্থ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে– কে মানে, আর কে মানে না– আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে, এ বিশ্বাস যে আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না।

পঞ্চম আয়াতে এর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন : ৩/৩৮৩-৮৮]

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিতৃব্য আবূ তালিব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পারস্পরিক বলাবলি করতে থাকে– আবূ তালিবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন সামস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থি হবে। লোকে বলবে, আবূ তালিব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবূ তালিবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবূ তালিব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুদের মোকাবিলায় সবসময় তাঁর ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কুরায়েশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালিবের কাছে যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, আমর ইবনে আস প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সে আবূ তালিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধিদলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবূ তালিবকে বলল, আপনি আমাদের মান্যবর সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন; আমরা কিছুই বলব না।

আবূ তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাছে ডেকে বললেন, এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কি চান? তারা বলল, আমাদের বাসনা, আপনি আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবূ জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালিবও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এ কালেমা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাচাজান, আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কালেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদের নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল– হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়– لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ আপনি ঐ প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদের তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। এখানে لَا تَسُبُّوْا শব্দটি سَبٌّ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে বরং কোনো জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবত কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কুরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহকে গালি-গালাজ করব।

এতে কুরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোনো কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল; যেমন বলা হয়েছে–

مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ এবং مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا-أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ- اِتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
এসব বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছিল, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوْا বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তা তাঁর মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে, তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সকল সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

এখন প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এসব আয়াত রহিত নয়; অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর. কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসাবে কোনো সত্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্যে নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদের মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষায় বিশেষ বাকপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোনো বিষয়ের তথ্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতাও ফুটে উঠে। বলা হয়েছে– ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয় দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে– اِنَّكُمْ

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়; পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহবিদরা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজায়েজ হবে। যেমন, মকরূহ স্থানসমূহে কুরআন তেলাওয়াত যে নাজায়েজ তা সবাই জানে। -[রূহুল মাআনী]

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে এবং কুরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোনো বাক্য উচ্চারিত হয়নি, যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা এবং এ সম্পর্কিত কুরআনি নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়েছে।

কোনো পাপের কারণ হওয়াও পাপ : উদাহরণত একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ এবং কোনো না কোনো স্তরে প্রশংসনীয় হয় কিন্তু সে কাজ করলে যদি কোনো ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদের মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবত মূলত তা ছওয়াব এবং প্রশংসনীয়ও বটে কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমা পূজারীরা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদের মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহীমী ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমত কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত কা'বাগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটিমাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠে থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কা'বাগৃহে প্রবেশ তাদের ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে; প্রত্যেকেই যেন বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দিই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বাগৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতি জানা গেল যে, কোনো বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোনো অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মাআনী গ্রন্থে আবূ মনসূর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফের নিধন ফরজ করেছে। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তেলাওয়াত, আজান ও নামাজের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজেদের ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবূ মনসূর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরি শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরি কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়। যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়।

এমনিভাবে কা'বাগৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোনো ধর্মীয় অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো ইসলামি উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোনো অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না; বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যথাসাধ্য অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী (র.) ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) উভয়েই এক জানাজার নামাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার কারণে আমরা জরুরি কাজ কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? জানাজার নামাজ ফরজ। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং ইবাদত, কিন্তু শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিকহবিদরা হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোনো কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে যদ্দরুন তার কঠোর গুনাহগার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন, অমুক কাজটি করলে খুবই ভালো হতো। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গুনাহ পুত্রের উপর বর্তাবে না। -[খুলাসাতুল ফাতওয়া]

এমনিভাবে কাউকে ওয়াজ-উপদেশ দানের ক্ষেত্রে যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোনো অপকর্ম করে বসবে যদ্দরুন আরও অধিকতর গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন-

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ مَخَافَةً اَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوْا فِىْ اَشَدِّ مِنْهُ অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোনো ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়।

কিন্তু যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোনো প্রকার ইসলামি বৈশিষ্ট্য হবে তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না; বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলি সাক্ষ্য দেয় যে; নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামি বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত আবূ জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কুরাইশ সর্দাররা তাওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয় তবেও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা ত্যাগ করলে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা যাবে। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৯১-৯৭]

اَلْجُزْءُ الثَّامِنُ : অষ্টম পারা

অনুবাদ :

١١١. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى كَمَا اقْتَرَحُوْا وَحَشَرْنَا جَمَعْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ قَبِيْلٍ اَىْ فَوْجًا فَوْجًا وَبِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ اَىْ مُعَايَنَةً فَشَهِدُوْا بِصِدْقِكَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا لِمَا سَبَقَ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا لٰكِنْ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ اِيْمَانَهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ذٰلِكَ .

১১১. তাদের অভিলাস অনুসারে আমি তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তু দলে দলে তাদের মাঝে হাজির করলেও সমবেত করলেও ; قُبُلًا -এর ق ও ب এ পেশসহ পড়া হলে قَبِيْل -এর বহুবচন বলে গণ্য হবে। অর্থ দলে দলে। আর ق কাসরা ও ب ফাতাহসহ পঠিত হলে তার অর্থ হবে সমক্ষে, সামনে। আর এগুলি তোমার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেও তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ আল্লাহর জ্ঞানে এ সম্পর্কে পূর্ব হতে এ কথা আছে। তবে আল্লাহ যদি তাদের ঈমান আনয়নের অভিপ্রায় করেন তাহলে তারা ঈমান আনয়ন করতে পারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এতদসম্পর্কে অজ্ঞ। اِلَّا এই حَرْفُ اِسْتِثْنَاءٍ অর্থাৎ প্রত্যয়সূচক শব্দ এ স্থানে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বা ছিন্ন ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে لٰكِنَّ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

١١٢. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا كَمَا جَعَلْنَا هٰؤُلَاۤءِ اَعْدَاءَكَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ شَيٰطِيْنَ مَرَدَةَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ يُوَسْوِسُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ مُمَوَّهَهُ مِنَ الْبَاطِلِ غُرُوْرًا اَىْ لِيَغُرُّوْهُمْ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ اَىِ الْاِيْحَاءَ الْمَذْكُوْرَ فَذَرْهُمْ دَعِ الْكُفَّارَ وَمَا يَفْتَرُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا زُيِّنَ لَهُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

১১২. এরূপ অর্থাৎ এদেরকে যেমন আপনার শত্রু বানিয়েছি তেমনি শয়তান অর্থাৎ অবাধ্যচারী ; شيطين এটা عدوا -এর بدل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। মানব ও জিনকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। প্রবঞ্চনার জন্য অর্থাৎ এদেরকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা অসত্য কথা দ্বারা সুশোভিত করত প্ররোচিত করে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দান করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটা উক্ত প্ররোচনার কাজ করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কাফেরদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে অর্থাৎ কুফরি ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় তাদের চোখে শোভন করে রাখা হয়েছে সেগুলো বর্জন কর, ছেড়ে রাখ। এ বিধান যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিলের পূর্বের।

١١٣. وَلِتَصْغٰٓى عَطْفٌ عَلٰى غُرُوْرًا اَىْ تَمِيْلَ اِلَيْهِ اَىِ الزُّخْرُفِ اَفْئِدَةُ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا يَكْتَسِبُوْا مَاهُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ مِنَ الذُّنُوْبِ فَيُعَاقَبُوْا عَلَيْهِ .

১১৩. এবং তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন হৃদয় যেন এর প্রতি মিথ্যা মিশ্রিত সুশোভিত বাক্যের প্রতি; وَلِتَصْغٰى পূর্বোল্লিখিত غُرُوْرًا -এর সাথে এটার عَطْف অর্থাৎ অন্বয় হয়েছে। অনুরাগী হয় আকর্ষিত হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যা অর্থাৎ যে সমস্ত পাপ কাজ করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে। অনন্তর এর কারণে তারা শাস্তিগ্রস্ত হবে। لِيَقْتَرِفُوْا অর্থ তারা যেন অর্জন করে।

١١٤. وَنَزَلَ لَمَّا طَلَبُوْا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَكَمًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ اَطْلُبُ حَكَمًا قَاضِيًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ مُفَصَّلًا مُبَيَّنًا فِيْهِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ وَالْمُرَادُ بِذٰلِكَ التَّقْرِيْرُ لِلْكُفَّارِ اَنَّهٗ حَقٌّ .

১১৪. তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট তাঁর ও তাদের মধ্যে একজন সালিস নিযুক্তির দাবি জানালে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– বল, তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য একজন সালিস আমার ও তোমাদের মধ্যে অপর একজন বিচারক তালাশ করব? অনুসন্ধান করব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি বাতিল হতে হকের পরিষ্কার পার্থক্যকরণ সংবলিত সুস্পষ্ট কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাদেরকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত প্রদান করেছি তারা যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীগণ জানে যে তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। مُنَزَّلٌ শব্দটি [ز -এ] তাশদীদ সহ ও তাশদীদ ব্যতীত উভয় রূপেই পাঠ করা যায়। সুতরাং তুমি দ্বিধাকারীদের সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এ আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের সম্মুখে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলা যে তা সত্য।

١١٥. وَتَمَّتْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ بِالْاَحْكَامِ وَالْمَوَاعِيْدِ صِدْقًا وَّعَدْلًا تَمْيِيْزٌ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ بِنَقْصٍ اَوْ خُلْفٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا يُقَالُ الْعَلِيْمُ بِمَا يُفْعَلُ .

১১৫. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী বিধিবিধান ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে হ্রাস বা উলটপালট করত তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি যা বলা হয় অতি শোনেন এবং যা করা হয় তা খুবই জানেন। صِدْقًا وَعَدْلًا শব্দদ্বয় এ স্থানে تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٦. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اَيِ الْكُفَّارِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهٖ اِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ فِيْ مُجَادَلَتِهِمْ لَكَ فِيْ اَمْرِ الْمَيْتَةِ اِذْ قَالُوْا مَا قَتَلَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَاْكُلُوْهُ مِمَّا قَتَلْتُمْ وَاِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ يَكْذِبُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ .

১১৬. যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ কাফেরদের কথামতো চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর ধর্ম হতে বিচ্যুত করবে। তারা তো মৃত বস্তু নিয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদে কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ -এর اِنْ শব্দটি এ স্থানে না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলে, 'তোমাদের কর্তৃক নিহত বস্তু আহার করা অপেক্ষা আল্লাহ কর্তৃক নিহত বস্তু আহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত।' আর তারা তো শুধু ধারণাই করে। এ বিষয়ে কেবল মিথ্যাই বলে। اِنْ هُمْ এ স্থানেও اِنْ শব্দটি না-বাচক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٧. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ اَيْ عَالِمٌ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ فَيُجَازِيْ كُلًّا مِنْهُمْ .

১১৭. তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে অধিক অবহিত অর্থাৎ তিনি তা জানেন। এবং কে সৎ পথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি প্রত্যেককেই [illegible]র্মের প্রতিফল দান করবেন।

١١٨. فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَىْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ـ

১১৮. তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে তা আহার করা।

١١٩. وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَقَدْ فُصِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَلِلْفَاعِلِ فِى الْفِعْلَيْنِ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِىْ اٰيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط مِنْهُ فَهُوَ اَيْضًا حَلَالٌ لَّكُمْ اَلْمَعْنٰى لَا مَانِعَ لَكُمْ مِنْ اَكْلِ مَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ اَلْمُحَرَّمَ اَكْلُهُ وَهٰذَا لَيْسَ مِنْهُ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا بِاَهْوَآئِهِمْ بِمَا تَهْوَاهُ اَنْفُسُهُمْ مِنْ تَحْلِيْلِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط يَعْتَمِدُوْنَهُ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ اَلْمُتَجَاوِزِيْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ ـ

১১৯. তোমাদের হয়েছে কি যে, যাতে অর্থাৎ যে সমস্ত জবাইকৃত প্রাণীতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না? অথচ فُصِّلَ وَحُرِّمَ এ দুটি ক্রিয়া مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য ও مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ এ আয়াতটিতে তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তোমারা যদি নিরুপায় হও। তবে এগুলোও [নিষিদ্ধগুলোও] তোমাদের জন্য আহার করা হালাল। অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুসমূহ আহার করায় তোমাদের কোনো বাধা নেই। যেগুলো আহার করা নিষিদ্ধ তা পূর্বে বর্ণনা করে দিয়েছি। আর এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেক অজ্ঞানতা বশত অর্থাৎ তদ্বিষয়ে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ব্যতীত নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা অর্থাৎ মৃত বস্তু হালাল করা যা তাদের মন চায় তা দ্বারা নিশ্চয় অন্যকে বিপথগামী করে। لَيُضِلُّوْنَ তার ى টি ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে অর্থাৎ যারা হালালের সীমা অতিক্রম করত, হারাম গ্রহণ করে তাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

١٢٠. وَذَرُوْا اُتْرُكُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ط عَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ وَالْاِثْمَ قِيْلَ الزِّنَا وَقِيْلَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ يَكْتَسِبُوْنَ ـ

১২০. তোমরা প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্য পাপ ত্যাগ কর বর্জন কর। এ স্থানে পাপ বলতে কেউ কেউ বলেন ব্যভিচার; অপর কতকজন বলেন, সাধারণভাবে সকল পাপকেই বুঝানো হয়েছে। যারা পাপ করে তাদেরকে পরকালে তারা যা করেছে, যা অর্জন করেছে এর সমুচিত প্রতিফল দেওয়া হবে।

১২১. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِأَنْ مَاتَ أَوْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَمَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ وَلَمْ يُسَمِّ فِيْهِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَهُوَ حَلَالٌ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّهُ أَيِ الْأَكْلَ مِنْهُ لَفِسْقٌ ط خُرُوْجٌ عَمَّا يَحِلُّ وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ يُوَسْوِسُوْنَ إِلٰى أَوْلِيٰئِهِمْ الْكُفَّارِ لِيُجَادِلُوْكُمْ ط فِيْ تَحْلِيْلِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ فِيْهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ .

১২১. যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি অর্থাৎ যা মারা গেল বা অন্যের নামে জবাই করা হলো তা আহার করো না। কিন্তু কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি জবাই করে, আর ইচ্ছা করে হোক বা ভুল বশত সে যদি তাতে আল্লাহর নাম না-ও নেয় তবুও তা হালাল। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তা অর্থাৎ এর কিছু আহার করা অবশ্যই পাপ ও হালালের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য। শয়তান তার বন্ধুদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে মৃত প্রাণীকে হালাল করার বিষয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়, মন্ত্রণা দেয়। যদি তোমরা তাতে তাদের কথামতো চল তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী বলে সাব্যস্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَمْعُ قَبِيْلٍ : قُبُلٌ শব্দটি قَبِيْلٌ -এর বহুবচন। যেমন رُغُفٌ টি رَغِيْفٌ -এর বহুবচন। অর্থ– জামাত, দল। কারো কারো মতে এটা قُبُلٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো দৃষ্টির সম্মুখে, قُبُلًا টা كُلَّ থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَيٰطِيْنَ : এটা عَدُوًّا হতে بَدَلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَرَدَةً : এ শব্দটি বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে شَيَاطِيْنَ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মানুষ প্রকৃত শয়তান হতে পারে না, অবাধ্যতার কারণে মানুষকে শয়তান বলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ يُوَسْوِسُ : يُوَسْوِسُ -এর মাধ্যমে يُوْحِيْ-এর তাফসীরকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. শয়তানের দিকে ওহীর নিসবত করা বৈধ নয়; বরং অসম্ভব।

উত্তর. ওহী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা। কাজেই কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ جَعَلْنَا هٰؤُلَاءِ أَعْدَائَكَ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যে, جَعَلَ টা صَيَّرَ অর্থে যা দুটি মাফঊল কামনা করে। প্রথম মাফঊল হলো عَدُوًّا যা مُؤَخَّرٌ হয়েছে। আর لِكُلِّ نَبِيٍّ হলো দ্বিতীয় মাফঊল যা مُقَدَّمٌ হয়েছে। আর شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ এটা عَدُوًّا হতে بَدَلٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ عَدُوًّا -কে দ্বিতীয় মাফঊল বলেছেন, আর شَيَاطِيْنَ -কে প্রথম মাফঊল বলেছেন। আর لِكُلِّ টা উভয়ের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে عَدُوًّا থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَرَدَةً : এটা مَارِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অবাধ্য।

قَوْلُهُ لِيَغُرُّوْهُمْ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, غُرُوْرًا টা مَفْعُوْلٌ لَهُ হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى غُرُوْرًا : لِتَصْغٰى -এর عَطْفٌ হয়েছে غُرُوْرًا -এর উপর। لِتَصْغٰى টাও যেহেতু يُوْحِيْ -এর ইল্লত হয়েছে, কাজেই مَعْطُوْفٌ এবং مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর উপর عَدَمُ مُنَاسَبَتْ -এর প্রশ্নও হতে পারে না।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِذٰلِكَ التَّقْرِيْرُ أَنَّهُ حَقٌّ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি সংশয়ের অপনোদন উদ্দেশ্য।

সংশয় : فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ -এর মধ্যে পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ -কে **কোনোরূপ** সংশয় পোষণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ সংশয় পোষণ করার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। কেননা কুরআন তো স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর উপরই অবতীর্ণ হচ্ছিল, তাহলে পুনরায় সংশয় পোষণের অর্থ কি?

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, اَمْرَاءُ-এর সম্পর্ক হলো কুরআনের সত্য হওয়ার ব্যাপারে আহলে কিতাবের জ্ঞানের সাথে, **অর্থাৎ** কাফেরদের থেকে কুরআন সত্য হওয়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করানো।

এর দ্বিতীয় উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, বাক্যের মধ্যে تَعْرِيْض বা ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ সম্বোধন যদিও রাসূল ﷺ -কে করা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাবী কাফেররা।

قَوْلُهُ تَمَّتْ : এর অর্থ হলো– بَلَغَتِ الْغَايَةَ اِخْبَارُهُ مَوَاعِيْدُهُ

قَوْلُهُ صِدْقًا وَعَدْلًا : এখানে صِدْقًا-এর সম্পর্ক হয়েছে مواعيد-এর সাথে। আর عَدْلًا-এর সম্পর্ক হয়েছে اَحْكَام -এর সাথে। এটা لَفٌّ نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ -এর ভিত্তিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ عَالِمٌ : মুসান্নেফ (র.) اَعْلَمُ -এর তাফসীর عَالِمٌ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন।

প্রশ্ন. اِسْمُ تَفْضِيْل টা اِسْمُ ظَاهِر -কে নসব দেয় না তবে শুধুমাত্র مَسْئَلَةُ الْكُحْلِ -এর ক্ষেত্রে, যা নাহুশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। অথচ এখানে اَعْلَمُ ইসমে তাফযীল مَنْ يَضِلُّ -কে নসব দিচ্ছে। কেননা مَنْ يَضِلُّ টা নসবের স্থানে রয়েছে।

উত্তর. مَنْ يَضِلُّ টা اَعْلَمُ-এর কারণে مَنْصُوْب হয়নি; বরং اَعْلَمُ টা عَالِمٌ অর্থে হওয়ার কারণেই مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইসলামের দুশমনদের দুশমনির কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের দুশমনির বিস্তারিত **বিবরণ সন্নিবেশিত** হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে পবিত্র কুরআনকে যারা বিদ্রূপ **করত তাদের** মধ্যে এ পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

১. ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা আল মাখজুমী ২. **আছি ইবনে** ওয়ায়েলুছ সাহমী ৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছজ জুহরী ৪. আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালিব ৫. আলহারাম ইবনে **হানজালা**। তারা একবার দলেবলে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, যদি ফেরেশতারা আমাদের **সম্মুখে এসে সাক্ষ্য** দেয় অথবা আমাদের মৃত ব্যক্তি এসে আপনার সত্যতার কথা বলে তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। **কাফেরদের এ কথারই** জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

"যদি আমি ফেরেশতাদেরকে **আসমান থেকে নাজিল করি** আর ফেরেশতাগণ আল্লাহর নবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে, এভাবে কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরা **উঠে আসে এবং আল্লাহর** নবীর সত্যতার কথা প্রকাশ করে এমনকি যদি পূর্বকালের সমস্ত উম্মতকে পুনর্জীবন দান **করা হয় এবং তারা এই দুরাত্মা কাফেরদের** সম্মুখে হাজির হয় তবুও তারা ঈমান আনবে না। কোনো অবস্থাতেই তারা সত্যকে গ্রহণ করতে **প্রস্তুত হবে** না। **এর কারণ**, তাদের হীন এবং নীচ প্রবৃত্তি, তাদের হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, তাদের জেদ হঠকারিতা এবং অহমিকা। **এসব চারিত্রিক** দুর্বলতাই তাদের ঈমানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এসব বাধা তারা অতিক্রম করবে না তাই ঈমানও আনবে না।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ : তবে হ্যাঁ, স্বয়ং আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল পৌত্তলিককেই তিনি বলপূর্বক মু'মিন বানাতে পারেন। এমন অবস্থায় তাদের একজনও মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক জবরদস্তি করা বা বলপ্রয়োগের নীতি পছন্দ করেন না। ঈমান আনতে হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ : কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। কেননা তারা **মূর্খ**। আর মূর্খতার কারণেই তারা এমন মু'জিযা দেখতে চায় যা তাদের জন্যে মহাবিপদের কারণ হতে পারে। কেননা যদি এমন **মু'জিযা** দেখানোর পরও তারা ঈমান না আনে তবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ এবং তাদের শাস্তি হবে অনিবার্য। মূর্খতাবশত **তারা** এ সত্য উপলব্ধি করে না বলেই এমন মু'জিযা দাবি করে।

–[তাফসীরে কবীর, খ. ১৩, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০ ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৩]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী তাদের মূর্খতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তাদের জাহালত বা মূর্খতা এই যে, তারা ঈমান আনয়নের ইচ্ছাই করে না। তাদের মধ্যে ঈমান লাভের অন্বেষণ নেই। অথচ তারা বিস্ময়কর, অলৌকিক বস্তু তথা মু'জিযা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আল্লাহর নবীর আসল শিক্ষা এবং ঈমানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তারা চিন্তাই করে না। আর আল্লাহর নবীকে তারা জাদুকর মনে করে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা এই সত্যই উপলব্ধি করে না যে, মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে, বান্দার হাতে নয়।

-[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৩০৭ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খ. ২, পৃ. ৫১৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) এ কথাও লিখেছেন যে, কোনো নবীর জন্যে একটি মু'জিযা জরুরি যেন মানুষ সত্যবাদী এবং মিথ্যবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু যখন কোনো সম্প্রদায় একাধিক মু'জিযা দাবি করে এবং একটি মু'জিযা দেখার পর আর একটির দাবি উত্থাপিত হয় তখন বুঝতে হবে যে, এ সম্প্রদায় সত্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, বরং একাধিক মু'জিযা প্রদর্শনের দাবির মধ্যেই রয়েছে তাদের হঠকারিতা এবং জেদ। আর যারা ঈমানের ব্যাপারে হঠকারিতা করে, জেদ ধরে তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। -[তাফসীরে কবীর, খ. ১৩, পৃ. ১৫০]

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শাওকানী (রা.) লিখেছেন যে, এতে সান্ত্বনা রয়েছে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যে। কেননা কাফেরদের আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না আনার কারণে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হতেন। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যেভাবে এই কাফেররা ঈমান আনে না এবং পবিত্র কুরআনের তথা ইসলামের প্রতি বিদ্রূপ করে ঠিক তেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গেও মানবতার দুশমনরা অনুরূপ ব্যবহার করেছে। অতএব, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা বা আপনার সাথে শত্রুতা করা, মু'মিনদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা নতুন কিছু নয়। -[তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১৫৩]

হক ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে : বস্তুত সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীতে ভালো-মন্দ এবং পাপ-পুণ্যের, সত্য-অসত্যের সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে। একদিকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আগমন করেছেন নবী-রাসূলগণ। অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট করার জন্যে সচেষ্ট রয়েছে শয়তানি শক্তি। তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে শয়তানি শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে যুগে যুগে। আলোচ্য আয়াতে এ সত্যেরই ঘোষণা রয়েছে যে, হে রাসূল! যেমন এ যুগের দুরাত্মা কাফেররা আপনার সাথে শত্রুতা করেছে, আপনার বিরোধিতা করছে প্রতি পদক্ষেপে, ঠিক এভাবেই মানুষ ও জিনের মধ্যে যারা শয়তান তারা প্রত্যেক নবীকে কষ্ট দিয়েছে। অতএব, এদের আচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা এ শয়তানদের আচরণ যেমন চির পরিচিত তেমনি চির নিন্দিতও।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছে যে হে রাসূল! আপনি চিন্তিত হবেন না, যেভাবে আপনার যুগের কাফেররা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেছে এবং আপনার বিরোধিতা করছে ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক নবীর সাথে তাদের যুগের কাফেররা এমন ব্যবহারই করেছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ [হে রাসূল!] আপনার পূর্বে আগমনকারী রাসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে যার উপর তারা ধৈর্যধারণ করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ওহী নাজিল হয় তখন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রা.) প্রিয়নবী ﷺ -কে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিলেন, আপনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন, এ বাণী যিনিই ইতঃপূর্বে এনেছেন তাঁর সাথে শত্রুতা করা হয়েছে।

শয়তান হলো মানুষের শত্রু : নবীগণের শত্রু দুষ্ট মানুষও হয় এবং দুষ্ট জিনও হয়, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ইরশাদ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে এবং জিনের মধ্যেও। বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আবূ যর (রা.) নামাজ আদায় করেছিলেন তখন প্রিয়নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জিন ও মানুষ শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছ? হযরত আবূ যর (রা.) আরজ করেন, মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, রয়েছে। আর মানুষ শয়তান জিন শয়তান থেকেও মারাত্মক।

قَوْلُهُ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا : অর্থাৎ এ শয়তানদের কাজ হলো মানুষকে তারা প্রতারণা করে, একে অন্যের কাছে তারা মানুষকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কথা সাজিয়ে বলে। এভাবে যেন মানুষ সহজে তাদের প্রতি আকৃষ্ট এবং প্রতারিত হয়। যেহেতু আখেরাতে তাদের বিশ্বাস নেই, তাই তারা এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু], খ. ৯, পৃ. ৫]

قَوْلُهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ : অর্থাৎ যদি আপনার পরওয়ারদেগার ইচ্ছা করতেন তবে এ দুরাত্মারা এমন কাজ করতে পারত না। কিন্তু যেহেতু কোনো লোককে ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ, তাই আল্লাহ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব, হে রাসূল! আপনিও তাদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ছানাউল্লা পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো মু'মিনকে প্রতারণা করা যখন ইবলিস শয়তানের পক্ষে সম্ভব না হয় তখন সে দুষ্ট লোকের নিকট যায় এবং মু'মিন বান্দাকে প্রতারিত করার জন্যেই দুষ্ট লোকটিকে প্ররোচনা দেয়। হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হাদীসেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উক্ত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ একথাও বলেছেন যে, মানুষ শয়তান জিন শয়তান থেকেও মারাত্মক হয়। মালেক ইবনে দীনারের কথা হলো জিন শয়তানের চেয়ে মানুষ শয়তান অধিকতর কঠোর হয়, তার প্রমাণ এই যে, আমি যখন জিন শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি তখন সে আমার নিকট থেকে চলে যায় কিন্তু মানুষ শয়তান আমাকে গুনাহর দিকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে।

তাফসীরকার ইকরামা, যাহহাক, সুদ্দী এবং কালবীর মতে মানুষ শয়তান বলতে বুঝানো হয়েছে সেই শয়তানগুলোকে যারা মানুষকে প্রতারণা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। কেননা মানুষ শয়তান হয় না। আর জিন শয়তান হলো সেগুলো যারা জিনদেরকে প্রতারণা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। ইবলিস তার সৈন্যদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। একভাগ জিনদেরকে প্রতারণা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, আর একভাগ মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। উভয় দলই প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদের দুশমন। প্রত্যেক দল সর্বদা অন্য দলের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং বলে যে আমি এভাবে অমুককে প্রতারিত করেছি তুমিও এভাবেই মানুষকে প্রতারিত কর। জিন শয়তান মানুষ শয়তানকে এভাবেই বলে। আর এ অর্থেই ইরশাদ হয়েছে– يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ তারা একে অন্যকে এভাবেই নিজেদের প্রতারণার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করত।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ৭, পৃ. ৫ ; তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ২০২]

আল্লামা আলূসী (র.) আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, জিন জিনই, তারা শয়তান নয়। আর শয়তান হলো ইবলিসের বংশধর। তাদের মৃত্যু হবে ইবলিসের মৃত্যুর সময়। আর জিনের মৃত্যু হয়ে থাকে সর্বদা। জিন মু'মিনও হয় এবং কাফেরও হয়। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৩, পৃ. ১৫৪]

ইমাম রাযী (রা.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে "শায়াতীন" যাদেরকে বলা হয়েছে তারা হলো দুষ্ট জিন বা মানুষ। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শয়তান যে সর্বদা জিনই হবে তা নয় বরং কোনো সময় মানুষ শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, এ মত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহেদ, হাসান, এবং কাতাদা (রা.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ পোষণ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, যারা গণক তারা হলো মানুষ শয়তান।

قَوْلُهُ وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ : অর্থাৎ যাতে করে শয়তানদের বানানো এবং সাজানো কথার দিকে সেসব লোকের মন আকৃষ্ট হয় যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না।

এর দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শয়তান ওয়াসওয়াসা কেন দেয় তার কারণ কি একথা প্রকাশ করা। অর্থাৎ এবং সাজানো কথার প্রতি মানব মনকে আকৃষ্ট করাই হলো শয়তানের প্ররোচনার উদ্দেশ্য।

আখেরাতের প্রতি ঈমান হলো রক্ষাকবচ : এ আয়াত দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করার মৌলিক পন্থা হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। আখেরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসই হলো এ পর্যায়ে মানুষের জন্যে রক্ষাকবচ। যে আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, যে একথা মনে করে যে অবশেষে আমার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব পেশ করতে হবে। ভালোকাজের জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং মন্দকাজের জন্যে রয়েছে শাস্তি সে শয়তানের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হবে না। এ জন্যে পবিত্র কুরআনে আখেরাতের কথা বহুবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আরো কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়। শয়তানের প্ররোচনার কারণে সর্বপ্রথম মানব মন মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ

আর দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যায় কাজকে মানুষ পছন্দ করে তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلِيَرْضَوْهُ

এবং তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয় তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلِيَقْتَرِفُوْا

কিন্তু এ অবস্থা তাদের হয় যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস রাখে তারা শয়তানের প্রতারণার প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ পাকের নিকটি শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

-[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৩০৭]

قَوْلُهُ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সত্য ও অভ্রান্ত হওয়ার পক্ষে খোলাখুলি মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখা ও জানা সত্ত্বেও হঠকারিতাবশত বিশেষ ধরনের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করে, কুরআন পাক তাদের বক্র দাবির উত্তরে বলেছে যে, তারা যেসব মু'জিযা এখন দেখতে চায়, সেগুলো প্রকাশ করাও আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু হঠকারীরা এগুলো দেখার পরও অবাধ্যতা পরিহার করবে না। আল্লাহর চিরাচরিত আইনানুসারে অতঃপর এর ফলশ্রুতি হবে এই যে, সবাইকে আজাব গ্রাস করে নেবে।

এ কারণেই দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশ করতে দয়াবশত অস্বীকার করেন এবং যেসব মু'জিযা এ যাবৎ তাদের সামনে এসে গিয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে বানিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাক সত্য এবং আল্লাহর কালাম।

প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালত ও নবুয়তে মতবিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিদ্যমান। আমি রিসালতের দাবিদার এবং তোমরা অবিশ্বাসী। শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে আমার পক্ষে এ বিষয়ের ফয়সালা এভাবে দেওয়া হয়ে গেছে যে, আমার দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং কুরআনের অলৌকিকতা। কুরআন বিশ্বের সকল জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে সে এ কালামের একটি ছোট সূরা কিংবা আয়াতের অনুরূপ সূরা কিংবা আয়াত উপস্থিত করে দেখাক। এ চ্যালেঞ্জের জওয়াবে সমগ্র আরব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, সন্তানসন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু কুরবান করেছিল, তাদের মধ্যে থেকে একটি লোকও এমন বের হলো না, যে কুরআনের মোকাবিলায় দুটি আয়াতও রচনা করে দেখিয়ে দিতে পারে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি যিনি কোথাও কারও কাছে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি তিনি এমন বিস্ময়কর কালাম জনসমক্ষে পেশ করলেন, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হয়ে পড়েছে। সত্য গ্রহণের জন্য এ খোলাখুলি মু'জিযাটি যথেষ্ট ছিল না কি? এটি প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ফয়সালা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সত্য রাসূল এবং কুরআন আল্লাহর সত্য কালাম।

প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোনো ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কুরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا এতে কুরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে- ১. কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ২. এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। ৩. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৪. পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কুরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে- فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। যেমন স্বয়ং তিনি বলেন, আমি কোনো সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি। -[ইবনে কাসীর] এতে বোঝা গেল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোককে শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াতে কুরআন পাকের আরও দুটি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কুরআন পাক যে আল্লাহর কালাম এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে- تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিকে দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কলামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই।

تَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। [বাহরে-মুহীত] কুরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু-প্রকার। ১. যাতে বিশ্ব-ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎকাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং ২. যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ দু-প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কুরআন পাকের صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে । صِدْق -এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে। অর্থাৎ কুরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনোরূপ ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। عَدْل -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার সব বিধান عَدْل তথা ন্যায়বিচারভিত্তিক। عَدْل শব্দের দুটি অর্থ এক. ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা না হয়। দুই. সমতা ও সুষমতা।

অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোনো কঠোরতাও নেই, যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোনো বাধ্যকতা আরোপ করেন না। আলোচ্য আয়াত تَمَّتْ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কুরআনে শুধু صِدْق وَعَدْل বিদ্যমানই নয়, বরং কুরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কুরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক একথাটি একমাত্র আল্লাহ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোনো আইন সভা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোনো রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থি দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কুরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি [অর্থাৎ কুরআনের বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলি, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কুরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।] কুরআন যে আল্লাহর কালাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ অর্থাৎ আল্লাহর কালামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোনো ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনের উর্ধ্বে। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য অছে যে, এ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কুরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশি ছিল, কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কুরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কাজের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কুরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে- وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অন্যত্র বলা হয়েছে- وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে-

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধিবিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহর পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরও পুরস্কৃত করবেন।

বিসমিল্লাহ বিনে জবাইকৃত জন্তুর বিধান : যেহেতু لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেই জন্তু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি তা ভক্ষণ করো না। এ জন্যই এ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা সন্নিবেশন করা যথোপযুক্ত মনে করছি।

ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আহমদ ও ইবনে সীরীন (র.) তা খাওয়া জায়েজ নয়। চাই স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করুক বা ভুলবশত করুক। উল্লিখিত আয়াতটি তাঁদের দলিল।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত : তাঁদের মতে ভুলবশত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে তা খাওয়া জায়েজ।

দলিল :

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে ভুলবশত বিসমিল্লাহ বিনে জবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল ﷺ বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের রসনায় আল্লাহর নাম বিদ্যমান রয়েছে। [দারাকুতনী] অপর বর্ণনায় রসনার পরিবর্তে অন্তঃকরণের উল্লেখ রয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান যদি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় তবুও তা আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে ফেলো।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করুক বা ভুলবশত পরিত্যাগ করুক! সেই জন্তু খাওয়া বৈধ। তাঁর দলিল হলো- প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয়ে আল্লাহর নাম রয়েছে।

আর তিনি বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য করো নামে জবাই করা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। কেননা আলোচিত আয়াতে না খাওয়ার কারণ فِسْقٌ বলা হয়েছে। তিনি فِسْقٌ -এর মেসদাক সেই জন্তুকে নিয়েছেন যা আল্লাহ বিনে অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে।

١٢٢. وَنَزَلَ فِى أَبِى جَهْلٍ وَغَيْرِهِ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا بِالْكُفْرِ فَأَحْيَيْنٰهُ بِالْهُدٰى وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهِ فِى النَّاسِ يَتَبَصَّرُ بِهِ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْاِيْمَانُ كَمَنْ مَّثَلُهُ مَثَلُ زَائِدَةٌ اَىْ كَمَنْ هُوَ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا وَهُوَ الْكَافِرُ لَا كَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْاِيْمَانُ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ .

১২২. আবূ জাহল প্রমুখ কাফেরদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে ব্যক্তি কুফরির কারণে মৃত ছিল, অতঃপর সৎপথ প্রদর্শন করত যাকে আমি জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি যা দ্বারা সে সত্যকে অন্য বিষয় হতে পৃথক করে দর্শন করতে পারে সেই ব্যক্তি কি তার كَمَنْ مَّثَلُهُ -এর مَثَلُ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তা হতে যে বাহির হওয়ার নয়? অর্থাৎ যে কাফের তার মতো? না, ঐ ব্যক্তি তার মতো নয়। এরূপ অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য যেমন ঈমান আনয়ন শোভন করে দেওয়া হয়েছে তেমনিভাবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ কুফরি, অবাধ্যাচরণ ইত্যাদি শোভন করে রাখা হয়েছে।

١٢٣. وَكَذٰلِكَ كَمَا جَعَلْنَا فُسَّاقَ مَكَّةَ اَكَابِرَهَا جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا بِالصَّدِّ عَنِ الْاِيْمَانِ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ لِاَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ بِذٰلِكَ .

১২৩. এমনিভাবে অর্থাৎ যেমনিভাবে মক্কাবাসীর প্রধানদেরকে অন্যায়াচারী বানিয়েছি তেমনিভাবে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদেরকে প্রধান করেছি যেন তারা সেখানে ঈমান গ্রহণ হতে লোকদের বাধা প্রদান করত চক্রান্ত করে; কিন্তু মূলত তারা শুধু নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কেননা তার মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপর বর্তাবে অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না।

١٢٤. وَاِذَا جَاۤءَتْهُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اٰيَةٌ عَلٰى صِدْقِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهِ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ مِنَ الرِّسَالَةِ وَالْوَحْىِ اِلَيْنَا لِاَنَّا اَكْثَرُ مَالًا وَاَكْبَرُ سِنًّا قَالَ تَعَالٰى اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالٰتِهِ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَحَيْثُ مَفْعُوْلٌ بِهِ لِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ اَعْلَمُ اَىْ يَعْلَمُ الْمَوْضِعَ الصَّالِحَ لِوَضْعِهَا فِيْهِ فَيَضَعُهَا وَهٰۤؤُلَاۤءِ لَيْسُوْا اَهْلًا لَهَا سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا بِقَوْلِهِمْ ذٰلِكَ صَغَارٌ ذُلٌّ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ اَىْ بِسَبَبِ مَكْرِهِمْ .

১২৪. যখন তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট রাসূল ﷺ -এর সত্যতার কোনো নির্দশন আসে তারা তখন বলে, আল্লাহর রাসূলগণকে যা অর্থাৎ যে রিসালত ও ওহী দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করব না। কেননা আমাদের বিত্ত-বৈভব অধিক, আমরা বয়সেও প্রবীণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ রিসালতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন। অর্থাৎ তার যোগ্য স্থান সম্পর্কে তিনিই অবহিত। সেস্থানেই তিনি ঐ ভার অর্পণ করেন। আর তারা [এ কাফেররা] এর যোগ্য নয়। সুতরাং তাদের এ দায়িত্বভার পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যারা এ কথা বলে অপরাধ করেছে তারা যে চক্রান্ত করে এর কারণে অর্থাৎ তাদের চক্রান্তের দরুন আল্লাহর নিকট হতে লাঞ্ছনা অবমাননা ও কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে। رِسَالٰتِهِ এটা একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। حَيْثُ -এটা اَعْلَمُ ক্রিয়া কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত উহ্য একটি ক্রিয়া [يَعْلَمُ] -এর مَفْعُوْلٌ بِهِ অর্থাৎ মুখ্য কর্ম।

١٢٥. فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ بِاَنْ يَّقْذِفَ فِيْ قَلْبِهٖ نُوْرًا فَيَنْفَسِحُ لَهُ وَيَقْبَلُهُ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَنْ قَبُوْلِهٖ حَرَجًا شَدِيْدَ الضِّيْقِ بِكَسْرِ الرَّاءِ صِفَةٌ وَفَتْحِهَا مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهٖ مُبَالَغَةً كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَصَّاعَدُ وَفِيْهِمَا اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الصَّادِ وَفِيْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا فِي السَّمَآءِ ط اِذَا كُلِّفَ الْاِيْمَانَ لِشِدَّتِهٖ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ الْجَعْلِ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ الْعَذَابَ اَوِ الشَّيْطَانَ اَيْ يُسَلِّطُهُ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

১২৫. আল্লাহ কাউকে সৎ পথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। হাদীসে আছে যে, তিনি হৃদয়ে জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন যা দ্বারা তা সম্প্রসারিত হয় ফলে সে তা কবুল করতে পারে। এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় তা [ইসলাম] কবুল করার বিষয়ে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; ضَيِّقًا-এর ى -টি তাশদীদসহ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। ঈমানের জন্য চাপ দিলে এটা তার কাছে এত কঠিন লাগে ; حَرَجًا -এর ر -তে কাসরাসহ হলে এটা বিশেষণ বলে বিবেচ্য হবে। আর তা ফাতাহসহ হলে হবে مَصْدَرٌ অর্থাৎ ক্রিয়ামূল। এমতাবস্থায় এটাকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হবে مُبَالَغَهْ বা অতিশয়োক্তি স্বরূপ। এর অর্থ, অতিশয় সংকীর্ণ। যে সে যেন আকাশে আরোহণ করছে। يَصَّعَّدُ এটা অপর এক কেরাতে يَصَّاعَدُ রূপে পঠিত রয়েছে। এ দুটিতেই [يَصَّعَّدُ এবং يَصَّاعَدُ] মূলত ص-এ ت-এর اِدْغَامْ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে বলে ধরা হবে। আর এক কেরাতে ص -এ সাকিনসহ পঠিত রয়েছে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এরূপে এ ধরনের লাঞ্ছিত করার মতো লাঞ্ছিত করেন অর্থাৎ তার উপর আজাব কিংবা শয়তানকে চাপিয়ে দেন।

١٢٦. وَهٰذَا الَّذِيْ اَنْتَ عَلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ صِرَاطُ طَرِيْقُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا لَا عِوَجَ فِيْهِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكِّدَةِ لِلْجُمْلَةِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ قَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الذَّالِ اَيْ يَتَّعِظُوْنَ وَخَصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

১২৬. এটাই অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ তুমি যে পথে প্রতিষ্ঠিত তাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ صِرَاطٌ অর্থ, পথ। এতে কোনো বক্রতা নেই। مُسْتَقِيْمًا এটা বাক্যটির তাকীদমূলক حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদরূপে مَنْصُوْبٌ ব্যবহৃত হয়েছে। هٰذَا এ ইঙ্গিতবাচক শব্দটির মর্মবোধক ক্রিয়া [يُشِيْرُ] এ স্থানে তার عَامِلٌ রূপে গণ্য। যে সম্প্রদায় শিক্ষা গ্রহণ করে يَذَّكَّرُوْنَ এতে মূলত ذ -এ ت -এর اِدْغَامْ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে। উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য বিশদভাবে নিদর্শন বর্ণনা করে দিয়েছি, বিবৃত করে দিয়েছি। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তারাই যেহেতু এটা দ্বারা উপকৃত হয় সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

١٢٧. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اَىِ السَّلَامَةِ وَهِىَ الْجَنَّةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

১২৭. তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির ঘর প্রশান্তির আলয় অর্থাৎ জান্নাত। এবং তারা যা করত তার জন্য তিনি তাদের বন্ধু।

١٢٨. وَ اذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اَىِ اللّٰهُ الْخَلْقَ جَمِيْعًا ج وَيُقَالُ لَهُمْ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ج بِاَغْوَائِكُمْ وَقَالَ اَوْلِيٰـؤُهُمُ الَّذِيْنَ اَطَاعُوْهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اِنْتَفَعَ الْاِنْسُ بِتَزْيِيْنِ الْجِنِّ لَهُمُ الشَّهَوَاتِ وَالْجِنُّ بِطَاعَةِ الْاِنْسِ لَهُمْ وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِىْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ط وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَهٰذَا تَحَسُّرٌ مِنْهُمْ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ مَاْوٰكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط مِنَ الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ يَخْرُجُوْنَ فِيْهَا لِشُرْبِ الْحَمِيْمِ فَاِنَّهَا خَارِجَهَا كَمَا قَالَ تَعَالٰى ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ فِىْ مَنْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهُمْ يُؤْمِنُوْنَ فَمَا بِمَعْنٰى مَنْ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهِ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ .

১২৮. এবং স্মরণ কর যেদিন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। يَحْشُرُ এটা نُوْنٌ [অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন] ও ى সহ [নাম পুরুষরূপে] পঠিত রয়েছে। আর তাদেরকে বলা হবে হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্ররোচনার মাধ্যমে অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা অর্থাৎ যারা তাদের অনুসরণ করেছিল, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের আস্বাদ লাভ করেছি। অর্থাৎ জিনদের কর্তৃক মানুষের কুপ্রবৃত্তির মনোহর করা দ্বারা মানুষ লাভবান হয়েছে, আর মানুষ কর্তৃক এদের অনুসরণ দ্বারা জিনরা লাভবান হয়েছে। আর তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করছিলে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এখন আমরা তাতে উপনীত। এটা মূলত তাদের আফসোসের উক্তি। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ফেরেশতাদের জবানিতে বলবেন, অগ্নিই তোমাদের ঠিকানা অবাসস্থল। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যে সময় তারা হামীম অর্থাৎ উষ্ণ পানি পানের উদ্দেশ্যে বের হবে সেই সময়টা এর ব্যতিক্রম। কেননা এটা জাহান্নামের বাইরে অবস্থিত। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ অতঃপর জাহান্নামের দিকেই এদের প্রত্যাবর্তন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ উক্তিটি ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তারা একদিন ঈমান আনত। এমতাবস্থায় مَا শব্দটি مَنْ রূপে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর কাজে অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٢٩. وَكَذٰلِكَ كَمَا مَتَّعْنَا عُصَاةَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ نُوَلِّىْ مِنَ الْوَلَايَةِ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا اَىْ عَلٰى بَعْضٍ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ .

১২৯. এরূপে অর্থাৎ যেভাবে অবাধ্যচারী জিন ও মানুষদের কতকজনকে কতকজন দ্বারা লাভবান করেছি সেভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের পাপাচারের **জন্য** জালিমদের একদলকে অপর দলের উপর আধিপত্য **দান** করি। نُوَلِّىْ এটা وَلَايَةٌ থেকে পঠিত ক্রিয়া। **অর্থ.** আধিপত্য দান করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَثَلُ زَائِدَةٌ : যাতে করে تَكْرَارْ -এর সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে। অতিরিক্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, مَثَلُ টা হচ্ছে সিফত। যদি مَثَلُ -কে অতিরিক্ত মানা না হয় তবে صِفَتْ -এর ظُلُمَاتْ -এর মধ্যে হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ ظُلُمَاتْ -এর মধ্যে ذَاتْ হয়ে থাকে; صِفَتْ নয়।

قَوْلُهُ ضَيِّقًا بِالتَّخْفِيفِ : এটা মাসদার। এ সুরতে حَمْلْ টা মুবালাগার ভিত্তিতে زَيْدٌ عَدْلٌ -এর অন্তর্গত মাজাযের ভিত্তিতে হবে। আর যদি তাশদীদ সহ হয় তবে صِفَتْ مُشَبَّهْ হবে।

قَوْلُهُ حَرَجًا : رَاءْ বর্ণে যের দিয়ে। صِفَتْ مُشَبَّهْ -এর সীগাহ শব্দের মতবিরোধের কারণে تَكْرَارْ -এর মধ্যে এক ধরনের حُسْن সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর বাকূন (র.) رَاءْ -কে যবর দিয়ে পড়েছেন। এ সুরতে এটা حَرَجَةٌ-এর বহুবচন হবে। অর্থ شِدَّةُ الضِّيْقِ আর যদি মাসদার হয় তবে حَمْلْ হবে মুবালাগার ভিত্তিতে।

قَوْلُهُ يَصَّعَّدُ : এটা বাবে تَفْعِيْل হতে আর يَصَّاعَدُ বাবে تَفَاعُلْ হতে।

قَوْلُهُ مِنَ الْوِلَايَةِ : اَلْوَلَايَةُ শব্দের وَاوْ বর্ণটি যবরযুক্ত অর্থ সাহায্য করা। আর وَاوْ বর্ণটি যেরযুক্ত হলে অর্থ হবে সুলতান, বাদশাহ। স্থানের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় অর্থ অধিক যথোপযুক্ত। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি عَلٰى بَعْضٍ এ অর্থকেই বুঝাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের কলহ-দ্বন্দ্বের উল্লেখ ছিল। এরপর মুসলমানগণকে তাদের অনুসরণ না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমান এবং কাফেরের সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যেন মুসলিম এবং কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় এবং একথা জানা যায় যে, কে নিন্দনীয় আর কে অনুসরণীয়।

শানে নুযূল : আবূ শায়খ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.) এবং আবূ জাহল সম্পর্কে আর ইবনে জারীর যাহহাকের এ বর্ণনারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত হযরত হামযা (রা.) এবং আবূ জাহল এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা হয়েছিল এই যে, আবূ জাহল হুজুর ﷺ -এর পৃষ্ঠ মোবারকে উষ্ট্রের নাড়িভুঁড়ি রেখে দিয়েছিল। হযরত হামযা (রা.) তখন শিকার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি এ সংবাদ পেয়ে সরাসরি আবূ জাহলের নিকট রাগান্বিত অবস্থায় পৌছলেন। তার অবস্থা দেখে আবূ জাহল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, দেখুন মুহাম্মদ ﷺ আমাদের সম্মুখে কি পেশ করেছে। আমাদের উপাস্যদের গালি দিচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরোধিতা করছে। তখন হযরত হামযা (রা.) বলেছিলেন তোমার চেয়ে বড় আহাম্মক আর কে হবে? তুমি আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে পাথরের পূজা কর। আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। ইকরিমা এবং কালবী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং আবূ জাহল সম্পর্কে।

–[তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ২০৯-১০]

এ তিনটি বর্ণনা একত্রে করলে দেখা যায় যে, مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ বাক্য দ্বারা আবূ জাহলকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে সকলেই একমত। তবে এর মোকাবিলায় মুসলমান কে? এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করা হয়েছে।

মু'মিন জীবিত আর কাফের মৃত : এ দৃষ্টান্তে মু'মিনকে জীবিত এবং কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বিষয়টি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে– اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى কুরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছার জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন

করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয় মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে উঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মতো হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্টজগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশি কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদ্‌গত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা , পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্য নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিকে দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশি পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভালো প্রাকৃতিক পোশাক পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারে প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনিভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যত মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোনো কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে 'সৃষ্টির সেরা' পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মঞ্জিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরিউক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ । এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারী দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোনো বৃহত্তম হুঁশিয়ার জন্তুর জ্ঞানচেতনাও কাজ করে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোনো বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অপরকে এসব উপকারী বস্তসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অপরকে এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌছাতে হবে তখন কুরআনে এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে আল্লাহর প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন। মাওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন- زیر کان موشگا فان دہی * کردہ ہر خرطوم خط ابلہی

আল্লাহর প্রত্যাদেশের অনুসারী ও মু'মিন ব্যক্তিই যখন জীবনের লক্ষ্যের দিক দিয়ে জীবিত, তখন একথাও বোঝা গেল. যে ব্যক্তি এরূপ নয়, সে মৃত বলেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য। মাওলানা রুমীর ভাষায় জীবনের লক্ষ্য হলো-

زندگی از بہر طاعت وبندگی است * بے عبادت زندگی شرمندگی ست

آدمیت لحم وشحم وپوست نیست * آدمیت جز رضائے دوست نیست

এটি ছিল মু'মিন ও কাফেরের কুরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। মু'মিন জীবিত আর কাফের মৃত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঈমান ও কুফরের আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার : ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয় বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে : যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে সক্ষম। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে সক্ষম নয়। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে, ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোনো খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোনো অনুভূতিও তার নেই। কুরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই বলেছে- يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বুঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফিল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কুরআন বলে- وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফিল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক ও প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোনো প্রভাব ছিল না।

এর বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন-

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

উদ্দেশ্য এই যে, ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ কুফরের অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চেনে না, অপরের কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় : এ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ বলে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকাহ, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশ চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায়। আলো কোনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধাকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূরে পৌঁছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়ও সর্বযুগে মানুষের সাথে আছে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবেই সবাই তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে

মু'মিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু-না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফেরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, هر كس بخيال خويش خبطى دارد [প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিকে পোষণ করে।] শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে– এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ : এ আয়াতে একদিকে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য, অন্য দিকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে দুরাত্মা কাফেরদের জন্য। ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! যেভাবে মক্কার দুর্বৃত্ত পৌত্তলিকরা আপনার বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্ত করে চলেছে, ঠিক তেমনিভাবে অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও সে যুগের দুষ্ট লোকেরা তাই করেছে। অতএব, মক্কার দুরাত্মা কাফেরদের অন্যায় আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই, কেননা যখনই এবং যেখানেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোনো নবী আগমন করেছেন, তখন সেখানকার বড় বড় দুষ্ট লোকেরা তাদেরকে মন্দ বলেছে, তাঁদের প্রতিরোধ করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন, এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিরুদ্ধে নমরুদ যা করেছে, মক্কার আবূ জাহলরা প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাই করেছে, অতএব এটি দুষ্ট লোকদের পুরাতন নীতি।

তবে সব যুগেই পাপিষ্ঠ লোকদের সকল চক্রান্ত বিফল হয়েছে, তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তারা সত্যকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফেরাউন লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, নমরুদের পরিণামও শোচনীয় হয়েছে, হযরত নূহ (আ.)-এর অবাধ্য সম্প্রদায় অবশেষে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় প্লাবিত হয়ে শেষ হয়েছে। সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায় চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আর সত্য সর্বকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে যুগে যুগে। অতএব, হে রাসূল! বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ইতিহাস সাক্ষী। অবশেষে তাই হয়েছিল। প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে নির্যাতিত অবস্থায় হিজরত করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মাত্র ৮ বছর পরই প্রিয়নবী ﷺ মক্কায় ফিরে এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এবং আল্লাহর ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠে এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল– وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন সত্য এসেছে মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেওয়ারই যোগ্য।

قَوْلُهُ مَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ : আর তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে। অথচ তা তারা বোঝে না। ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেররা যে ষড়যন্ত্র করে তার ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা বোঝে না। মক্কায় পৌত্তলিকরা শহরের সকল প্রবেশদ্বারে তাদের লোক নিয়োগ করেছিল যারা শহরে আগমনকারীদেরকে প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে সতর্ক করে দিত যেন তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর কথা শ্রবণ না করে, তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়।

وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ -এর শানে নুযূল : আল্লামা বগবী ইমাম কাতাদা (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবূ জাহল বলেছিল, আবদে মানাফের বংশধরেরা উচ্চ মর্যাদা অর্জনে আমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। অবশেষে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এ কথা বলেছে যে, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন যার নিকট ওহী আসে। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তাকে মানব না। আর কখনও তার অনুসারী হবো না। তবে যদি আমাদের নিকটও তেমনি ওহী আসে যেমন তার নিকট আসে তাহলে তাকে মানব।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ বলেছে, যদি নবুয়তে সত্যিই কোনো জরুরি বিষয় হয় তবে আমি তোমার চেয়েও নবুয়তের অধিকতর হকদার, কেননা আমার বয়স বেশি এবং ধনসম্পদও বেশি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ২১১ ; তাফসীরে কাবীর খ. ১৩, পৃ. ১৭৫]

নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদ : কুরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জবাবে বলেছে– اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, রিসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধেরা মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত আভিজাত্য কিংবা গোত্রীয় সরদারি ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রিসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহর দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলি অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহর বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না; বরং আল্লাহর এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরি যে, আল্লাহ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে– سَيُصِيبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ এখানে صَغَارٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ– অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্র সরদার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতি সত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহর কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহর কাছে' এর এক অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সরদার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন পয়গাম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানিত বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরায়েশ সরদারের শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙে দেয়।

দীন সম্পর্কে অন্তর খুলে দেওয়া এবং এর লক্ষণাদি : তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টতায় অটল ব্যক্তিদের কিছু চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে شَرْحِ صَدْر অর্থাৎ অন্তর খুলে দেওয়ার তাফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় [সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে]। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মতো কোনো লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে– وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তাফসীরবিদ কালবী বলেন, তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্য কোনো পথ থাকে না। হযরত ফারুকে আজম (রা.) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর জিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কেরাম দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত অন্তর ছিলেন : আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গে এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামি বিধিবিধানে তারা খুব কমই সন্দেহ-সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবন যেসব প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুনতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গের কল্যাণ আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شَرْحِ صَدْر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা : আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্কবিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں
ڈور کو سلجھا رہا ہے پرسرا ملتا نہیں

অর্থাৎ দার্শনিক তর্কবিতর্কের মধ্যে আল্লাহকে পায় না। সে সুতা ভাঁজ করে, কিন্তু সুতার মাথা খুঁজে পায় না।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : আর এভাবেই আমি পাপিষ্ঠদেরকে তাদের কার্যকলাপের কারণে একে অন্যের সাথী করে দেই। শয়তান জিন আর তাদের মানবরূপী বন্ধুদের ভয়াবহ পরিণতির ন্যায় অন্যান্য জালেম পাপিষ্ঠদের পরিণতিও হবে ভয়াবহ। তাদের পাপ যত বেশি হবে শাস্তিও হবে তত বেশি। আল্লাহর নাফরমানির ব্যাপারে দুনিয়াতে যেমন তারা একমত ছিল দোজখেও তাদেরকে এভাবে একত্রিত করা হবে।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন-

১. আর যেভাবে আমি কাফের জিন ও মানুষকে দুনিয়াতে একে অন্যের দ্বারা নিজ নিজ মতলব উদ্ধারের সুযোগ দিয়েছি ঠিক তেমনিভাবে তাদের কৃতকর্মের কারণে দোজখে তাদেরকে কাছাকাছি রাখব।

২. نُوَلِّيْ শব্দটির অর্থ একজনকে অন্যের বন্ধু বানানো অর্থাৎ মু'মিনকে মু'মিনের বন্ধু এবং কাফেরদেরকে কাফেরদের বন্ধু বানিয়ে দেই। এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে সত্যসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে, কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে এক কাফের অন্য কাফেরকে মন্দ ও ঘৃণ্য কাজে উৎসাহিত করে এবং একে অন্যকে সাহায্য করে।

৩. ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আমি দোজখে কাফেরদেরকে একের পর এককে কাতারবন্দী করে প্রেরণ করব। نُوَلِّيْ শব্দের আরেকটি অর্থ হলো একে অন্যের কাছাকাছি থাকা অর্থাৎ এই কাফেররা দোজখে একে অন্যের কাছাকাছি থাকবে।

৪. আর এ শব্দটির অর্থ কোনো কিছু সোপর্দ করাও হয়। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে আমি কোনো কোনো কাফের মানুষকে কাফের জিনের নিকট এবং কোনো কাফের জিনকে কাফের মানুষের সোপর্দ করি।

৫. কালবী (র.) আবূ সালেহের সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক যখন কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণের মর্জি করেন নেককার লোকদেরকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ পাক কোনো সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান তখন মন্দ লোকদেরকে তাদের শসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ কথার আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আমি কোনো কোনো জালেমকে অন্য জালেমদের উপর প্রবল করে দেই আর এক জালেমের মাধ্যমে অন্য জালেমকে পাকড়াও করি।

কালবীর এ ব্যাখ্যার আলোকে হযরত আলী (রা.)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। যখন ঘাতক ইবনে মুলজিমের আঘাতে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে আসে তখন লোকেরা তাঁর খেদমতে আরজ করল, আমীরুল মু'মিনীন আপনার স্থলে কোনো লোককে মনোনীত করুন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করেন তবে নেককার লোকদেরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করবেন। এরপর হযরত আলী (রা.) এ কথাও বলে দিলেন, আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করেই হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, জালেম হলো পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের জীবন্ত গজব, জালেমের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মানুষের শাস্তি বিধান করেন, অতঃপর জালেমকে শাস্তি দেন।

অনুবাদ :

١٣٠. يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ اَىْ مِنْ مَجْمُوْعِكُمْ اَىْ بَعْضِكُمْ اَلصَّادِقِ بِالْاِنْسِ اَوْ رُسُلُ الْجِنِّ نُذُرُهُمُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ الرُّسُلِ فَيُبَلِّغُوْنَ قَوْمَهُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا اَنْ قَدْ بَلَغَنَا قَالَ تَعَالٰى وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ـ

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি। অর্থাৎ তোমাদের সকলের মধ্যে হতে কি রাসূলগণ আসেনি। এমতাবস্থায় মানুষ রাসূলগণের বেলায় কেবল এটা প্রযোজ্য হবে। কিংবা জিন রাসূল বলত সেই সমস্ত জিনদেরকে বুঝাবে যারা নবীগণের বাচনিক ধর্ম-কথা শুনে স্বীয় জাতির নিকট তা পৌঁছাত। যারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন বিবৃত করত এবং তোমাদের এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে আমাদের নিকট তোমার কথা পৌঁছেছে এই সম্পর্কে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেই। আল্লাহ তা'আলা বলবেন বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল ফলে তারা ঈমান আনয়ন করেনি। আর নিজেদের বিপক্ষে তারা সাক্ষী দিল যে, তারা ছিল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী।

١٣١. ذٰلِكَ اَىْ اِرْسَالُ الرُّسُلِ اَنْ اللَّامُ مُقَدَّرَةٌ وَهِىَ مُخَفَّفَةٌ اَىْ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ مِنْهَا وَاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ لَمْ يُرْسَلْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلٌ يُبَيِّنُ لَهُمْ ـ

১৩১. এটা অর্থাৎ রাসুল প্রেরণ এই হেতু যে, اَنْ -এটা مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ তাশদীদ যুক্ত রূঢ় রূপ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে রূপান্তরিত। এটার পূর্বে একটি হেতুবোধক لَامْ উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল لِاَنَّهُ [এজন্য যে.....]। তোমার প্রভু কোনো জনপদকে তার সীমালঙ্ঘনের জন্য ততক্ষণ ধ্বংস করার নন যতক্ষণ তার অধিবাসীগণ অনবহিত। অর্থাৎ যতক্ষণ তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ না করা হয়েছে এবং তাদেরকে সব কিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে না দেওয়া হয়েছে ততক্ষণ তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেন না।

١٣٢. وَلِكُلٍّ مِنَ الْعٰمِلِيْنَ دَرَجٰتٌ جَزَاۤءٌ مِمَّا عَمِلُوْا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ ـ

১৩২. আমলকারীদের প্রত্যেকেই ভালো বা মন্দ যা করে তদনুসারে তার স্থান অর্থাৎ প্রতিদান রয়েছে। এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। يَعْمَلُوْنَ -এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ রূপে পঠিত রয়েছে।

١٣٣. وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ عَنْ خَلْقِهِ وَعِبَادَتِهِمْ ذُو الرَّحْمَةِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ يَاۤ اَهْلَ مَكَّةَ بِالْاِهْلَاكِ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاۤءُ مِنَ الْخَلْقِ كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ اَذْهَبَهُمْ وَلٰكِنَّهُ تَعَالٰى اَبْقَاكُمْ رَحْمَةً لَّكُمْ ـ

১৩৩. তোমার প্রতিপালক সকল সৃষ্টি ও তাদের বন্দেগি হতে অনপেক্ষ দয়াশীল। হে মক্কাবাসীগণ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করত অপসারিত করত এবং তোমাদের পর সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন যেমন তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে তাদেরকে অপসারিত করত তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি কৃপা বশত তোমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছেন।

١٣٤. اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ مِنَ السَّاعَةِ وَالْعَذَابِ لَاٰتٍ لَا مُحَالَةَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فَائِتِيْنَ عَذَابَنَا .

১৩৪. তোমাদের নিকট যা অর্থাৎ কিয়ামত ও আজাব সম্পর্কে যে, ঘোষণা করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বাস্তবায়িত হবেই। তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না; আমার শাস্তিকে হটাতে পারবে না।

١٣٥. قُلْ لَهُمْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ عَلٰى حَالَتِىْ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اَىِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ يَسْعَدُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ .

১৩৫. এদেরকে বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমারা তোমাদের স্থানে অর্থাৎ তোমাদের অবস্থায় কাজ কর। আমি আমার অবস্থায় কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময়? مَنْ এটা مَوْصُوْلَةٌ অর্থাৎ সংযোজক পদ এবং تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ অর্থাৎ কর্মকারক। অর্থাৎ পরকালে কার জন্য প্রশংসনীয় পরিণাম বিদ্যমান, আমাদের জন্য না তোমাদের জন্য? আর জালিমগণ কাফেরগণ কখনও সফলকাম হবে না, সৌভাগ্যশীল হতে পারবে না।

١٣٦. وَجَعَلُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ خَلَقَ مِنَ الْحَرْثِ الزَّرْعِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا يَصْرِفُوْنَهُ اِلَى الضِّيْفَانِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَلِشُرَكَائِهِمْ نَصِيْبًا يَصْرِفُوْنَهُ اِلٰى سَدَنَتِهَا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَكَانُوْا اِذَا سَقَطَ فِىْ نَصِيْبِ اللّٰهِ شَىْءٌ مِنْ نَصِيْبِهَا الْتَقَطُوْهُ اَوْ فِىْ نَصِيْبِهَا شَىْءٌ مِنْ نَصِيْبِهِ تَرَكُوْهُ وَقَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ هٰذَا كَمَا قَالَ تَعَالٰى فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ اَىْ لِجِهَتِهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَآءَ بِئْسَ مَا يَحْكُمُوْنَ حُكْمُهُمْ هٰذَا .

১৩৬. আল্লাহ যে কৃষি দ্রব্য অর্থাৎ শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন ذَرَاَ অর্থ, সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্য হতে তারা মক্কার কাফেররা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে। এই অংশ তারা মেহমান ও দরিদ্রদের খাতে ব্যয় করে। আর এক অংশ তারা দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। এটা তারা সেবায়েতদের পেছনে ব্যয় করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, زَعْمٌ এটার ز -এর ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত পাঠ করা যায়। এটা আল্লাহর জন্য এবং তা আমাদের দেবতাদের জন্য দেবদেবীদের জন্য নির্ধারিত হিস্যা হতে কিছু যদি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হিস্যায় মিশে যেতো তবে তা তারা কুড়িয়ে পূরণ করে দিত। আর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হিস্যা হতে যদি কিছু দেবদেবীদের নামে নির্ধারিত হিস্যার সাথে মিশে পড়ত তবে তারা এটা এমনিতেই ছেড়ে দিত। তা পূরণ করত না। বলত, আল্লাহ এটার মুখাপেক্ষী নন। এই আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর দিকে অর্থাৎ সেই অংশে পৌঁছায় না আর যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌঁছায় তারা যা মীমাংসা করে অর্থাৎ তাদের এই মীমাংসা কত নিকৃষ্ট! কত মন্দ!

١٣٧. وَكَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لَهُمْ مَا ذُكِرَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ بِالْوَأْدِ شُرَكَآؤُهُمْ مِنَ الْجِنِّ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَيَّنَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ وَرَفْعِ قَتْلِ وَنَصْبِ الْأَوْلَادِ بِهِ وَجَرِّ شُرَكَائِهِمْ بِإِضَافَتِهِ وَفِيهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالْمَفْعُولِ وَلَا يَضُرُّ وَ إِضَافَةُ الْقَتْلِ إِلَى الشُّرَكَاءِ لِأَمْرِهِمْ بِهِ لِيُرْدُوهُمْ يُهْلِكُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا يَخْلِطُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ـ

১৩৭. এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়টি যেভাবে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে সেভাবে তাদের জিন দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে জীবন্ত প্রোথিত করত সন্তান হত্যাকে শোভন করে ধরেছে। তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। شُرَكَآؤُهُمْ এটা زَيَّنَ ক্রিয়ার فَاعِلُ অর্থাৎ কর্তারূপে رَفْعٌ সহ পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে زُيِّنَ ক্রিয়াটি مَجْهُول; قَتْلُ শব্দটি رَفع সহযোগে, أَوْلَادَ শব্দটি قَتْلُ-এর مَفْعُول হিসেবে مَنْصُوْب রূপে এবং এটার [قَتْلُ-এর] إِضَافَةٌ হওয়ার মাধ্যমে شُرَكَاءُ শব্দটি جَرٌ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় مُضَافٌ সম্বন্ধিত পদ অর্থাৎ قَتْلُ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ [যার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ شُرَكَاءُ]-এর মাঝে একটি مَفْعُوْلٌ-এর মাধ্যমে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে পড়ে। شُرَكَاءُ অর্থাৎ দেবতাদের প্রতি قَتْلُ অর্থাৎ হত্যার إِضَافَةٌ করায় অর্থের মধ্যে কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা মূলত এরাই তাদেরকে হত্যার প্ররোচনা দেয়। لِيُرْدُوْهُمْ অর্থ, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও।

١٣٨. وَقَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ لَا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَنْ نَشَآءُ مِنْ خَدَمَةِ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِهِمْ بِزَعْمِهِمْ أَيْ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا فَلَا تُرْكَبُ كَالسَّوَائِبِ وَالْحَوَامِي وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا بَلْ يَذْكُرُوْنَ اسْمَ أَصْنَامِهِمْ وَنَسَبُوْا ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَيْهِ ـ

১৩৮. তারা তাদের ধারণা অনুসারে অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের কোনো যুক্তি নেই কেবলমাত্র ধারণার উপর নির্ভর করে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্য নিষিদ্ধ অর্থাৎ হারাম। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত অর্থাৎ দেবতাদের সেবায়েত প্রমুখ ব্যক্তিরা ব্যতীত কেউ এসব আহার করতে পারবে না। এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে যাদের পৃষ্ঠে অর্থাৎ তাতে আরোহণ নিষিদ্ধ যেমন সায়েবা ও হামী জাতীয় পশু এবং কতক পশু এমন যাদের বেলায় অর্থাৎ জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না, তদস্থলে প্রতিমাসমূহের নাম নিয়ে তারা জবাই করে এবং এটা তাঁর প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে। তিনি শীঘ্র তাদেরকে তাঁর সম্বন্ধে এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল দেবেন।

١٣٩. وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ الْمُحَرَّمَةِ وَهِيَ السَّوَائِبُ أَوِ الْبَحَائِرُ خَالِصَةٌ حَلَالٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى أَزْوَاجِنَا ج أَيِ النِّسَاءِ ـ

১৩৯. তারা আরও বলে, এসব নিষিদ্ধ গবাদি পশুর গর্ভে অর্থাৎ সায়িবা বাহিরার গর্ভে যা আছে বিশেষ করে কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ এবং এটা আমাদের সঙ্গিনীদের অর্থাৎ স্ত্রীগণের জন্য অবৈধ।

وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ مَعَ تَانِيْثِ الْفِعْلِ وَتَذْكِيْرِهٖ فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيْهِمُ اللّٰهُ وَصْفَهُمْ ذٰلِكَ بِالتَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ اَىْ جَزَآءَهٗ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ ـ

আর তা যদি মৃত হয় مَيْتَةً এটার ক্রিয়া অর্থাৎ يَكُنْ শব্দটি পুংবাচক হোক বা স্ত্রীবাচক উভয় অবস্থায় مَيْتَةً শব্দটি رَفْع ও نَصْب সহ পঠিত রয়েছে। তবে নারী-পুরুষ সকলে এতে অংশীদার। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ শীঘ্র তাদের হারাম ও হালাল বলে এ বিশেষণের প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٤٠. قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَوْلَادَهُمْ بِالْوَادِ سَفَهًا جَهْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ مِمَّا ذُكِرَ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ـ

১৪০. যারা অজ্ঞতার কারণে নির্বুদ্ধিতা বশত মূর্খতা বশত স্বীয় সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করে হত্যা করে قَتَلُوْا এটা তাশদীদ সহ ও তাশদীদ হীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে আল্লাহর প্রদত্ত উল্লিখিত জীবিকা নিষিদ্ধ করে তারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يُقَالُ لَهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ-এর عَامِلْ উহ্য রয়েছে আর তা হলো يُقَالُ, পূর্বে উল্লিখিত نَحْشُرُهُمْ নয়। اَلْمَعْشَرُ অর্থ হলো জামাত। এর বহুবচন হলো مَعَاشِرُ-আর জিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তান।

قَوْلُهٗ اِسْتَكْثَرْتُمْ : এখানে سِيْن এবং تَاءْ আধিক্যের তাকিদের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاَغْوَائِكُمْ : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ بِاَغْوَاءِ الْاِنْسِ

قَوْلُهٗ مِنْ مَجْمُوْعِكُمُ الصَّادِقِ بِالْاِنْسِ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা।

প্রশ্ন. রাসূল মানুষ হয়ে থাকেন, জিন নয়। অথচ رُسُلٌ مِّنْكُمْ দ্বারা বুঝা যায় যে, জিনদের মধ্যে থেকেও রাসূল হয়ে থাকেন। কেননা এখানে মানব ও দানব উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে।

উত্তর. সম্বোধনের ক্ষেত্রে যখন জিন ও ইনসান একত্রিত হয় যেমনটি এখানে হয়েছে, তখন مِنْكُمْ বলা বৈধ হয়ে থাকে। যদিও উদ্দেশ্য একজনই হয়ে থাকুক না কেন। যেমন يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ-এর মধ্যে লবণাক্ত সমুদ্র উদ্দেশ্য, কেননা লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই মুক্তা বের হয়ে আসে, মিঠা পানির নদী থেকে নয়, তথাপিও এখানে مِنْهُمَا বলা বৈধ হয়েছে। مِنْكُمْ অর্থ হলো مِنْ مَجْمُوْعِكُمُ الصَّادِقِ بِالْاِنْسِ উদ্দেশ্য হচ্ছে– مِنْكُمْ দ্বারা সকল সম্বোধিত উদ্দেশ্য। আর সকলের মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই مِنْكُمْ সেই সময়ও প্রযোজ্য হবে যখন শুধুমাত্র একদলই উদ্দেশ্য হবে, আর এখানে মানব উদ্দেশ্য।

رُسُلٌ দ্বারা দ্বিতীয় আরেকটি উত্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে رُسُلٌ দ্বারা পারিভাষিক رُسُلٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং শাব্দিক رُسُلٌ তথা দূত উদ্দেশ্য। আর এরা হলো সে সকল জিন যারা রাসূল ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াত শুনেছিল। মনে হয় যেন তারা রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে সেই সম্প্রদায়ের প্রতি দূত এবং ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হলো اَلْاَمْرُ ذَالِكَ মুবতাদা উহ্য রাখার কারণ হলো একটি প্রশ্নের সমাধান দেওয়া।

প্রশ্ন. اِنْ لَّمْ يَكُنْ হতে ইল্লত বর্ণিত হচ্ছে اِنْ টা মূলত لِاَنَّ ছিল। আর ইল্লত তো হুকুমেরই হয়ে থাকে। আর ذَالِكَ টা হুকুম নয়।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, ذَالِكَ টা উহ্য মুবতাদার খবর আর তাতে حُكْم রয়েছে। কাজেই ইল্লত বর্ণনা করা বিশুদ্ধ হয়ে গেল। আর لَامْ উহ্য মানার কারণে عَدَمُ رَبْط-এর প্রশ্নও তিরোহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ قَوْمِ اٰخَرِيْنَ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার অধিবাসীগণ।

قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ : এ বাক্য বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– কাশশাফ গ্রন্থকার ও সে সকল লোকদের মতাদর্শকে খণ্ডন করা যারা যেই মাসদার فَاعِلْ-এর দিকে মুযাফ হওয়ার মাঝে مَفْعُوْل দ্বারা فَصْل বা পার্থক্য করা কবিতার প্রয়োজন ব্যতিরেকে নাজায়েজ মনে করে থাকেন।

বিস্তারিত বিবরণ : وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاۤؤُهُمْ : এ আয়াতে একাধিক কেরাত রয়েছে। লিখিত কেরাতটি জমহুরের কেরাত তা হলো زَيَّنَ ফে'লে মারূফ আর شُرَكَاۤؤُهُمْ তার ফায়েল। قَتْلَ হলো زَيَّنَ-এর মাফউল, এই কেরাতে কোনো প্রশ্ন নেই। এটা ছাড়াও ইবনে আমেরের বর্ণিত অপর আরেকটি কেরাত এরূপ যে, وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلُ اَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ এখানে زُيِّنَ হলো ফে'লে মাজহুল। আর قَتْلُ টা زُيِّنَ-এর نَائِبْ فَاعِلْ হওয়ার কারণে মারফূ হয়েছে। আর اَوْلَادَهُمْ মাফউল হওয়ার কারণে মানসূব এবং شُرَكَائِهِمْ টা قَتْلُ-এর মুযাফ ইলাইহি হওয়ার কারণে মাজরূর হয়েছে। এ সুরতে قَتْلُ মুযাফ এবং شُرَكَائِهِمْ মুযাফ ইলাইহি এর মাঝে اَوْلَادَهُمْ মাফউলের দ্বারা فَصْل আবশ্যক হয় যা কাব্যিক প্রয়োজন ব্যতীত গদ্য বাক্যে বৈধ নয়। আর এটাও পবিত্র কুরআনে রয়েছে যা স্বীয় শব্দ ও অর্থের দিক থেকে ফাসাহাত ও বলাগাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। এটা অবৈধ হওয়ার কারণ নাহবীদের দৃষ্টিতে এই যে, مُضَاف এবং مُضَافْ اِلَيْه -এর মাঝে কাব্যিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে فَصْل জায়েজ নয়। কেননা مُضَافْ اِلَيْه টা مُضَافْ-এর জন্য جُزْء-এর সমপর্যায়ে হয়ে থাকে। যেহেতু مُضَافْ اِلَيْه টা مُضَافْ-এর তানবীনের স্থানে পতিত হয়ে থাকে। কাজেই যেভাবে اِسْم-এর جُزْء সমূহের মধ্যে فَصْل জায়েজ নেই, তদ্রূপ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির মাঝেও فَصْل জায়েজ নেই। আর এটা বসরী নাহবীগণের অভিমত অনুসারে। অবশ্য কূফী নাহবীগণের মতে যদি মুযাফ মাসদার এবং মুযাফ ইলাইহি তার ফায়েল হয় এবং فَصْل টা মাফউলের মাধ্যমে হয় যেমনটি ইবনে আমেরের উল্লিখিত কেরাতে হয়েছে তবে তা বৈধ। لَا يَضُرُّهُ বলে গ্রন্থকার এই উত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। –[ই'রাবুল কুরআন]

ইবনে মালিক ও কাফিয়ার ব্যাখ্যায় এ فَصْل-কে কাব্যিক প্রয়োজন ব্যতীতই বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন–

اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ مَفْصُوْلًا بَيْنَهُمَا بِمَفْعُوْلِ الْمَصْدَرِ جَائِزَةٌ

قَوْلُهُ وَاِضَافَةُ الْقَتْلِ اِلَى شُرَكَائِهِمْ لِاَمْرِهِمْ بِهِ : এখানে اِضَافَةُ الْقَتْلِ হলো মুবতাদা, لِاَمْرِهِمْ بِهِ হলো তার খবর। উদ্দেশ্য হলো قَتْل -এর ইযাফত شُرَكَاءْ-এর দিকে করা مَجَازْ হিসেবে হয়েছে। মূল হত্যাকারী তো মুশরিকরাই। কিন্তু যেহেতু شُرَكَاءْ হলো হত্যার নির্দেশ প্রদানকারী এজন্য قَتْل-এর ইযাফত شُرَكَاءْ -এর দিকে তাদের নির্দেশদাতা/ اَمِرْ হওয়ার কারণে করে দেওয়া হয়েছে। এটাকে اِسْنَادْ مَجَازِىْ বলা হয়। যেমন– بَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ -এর মধ্যে بِنَاءْ-এর ইযাফত আমীরের দিকে مَجَازْ রূপে হয়েছে তার নির্মাণের নির্দেশ দেওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ : যদি كَانَ টি تَامَّةْ হয় তবে مَيْتَةٌ টা مَرْفُوْعْ হবে, আর نَاقِصَهْ হয় তবে نَصَبْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন : দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন– তোমাদের মধ্যে থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বর রূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছেন, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বর রূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেই কেউ বলেন, রাসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাসূল হয়নি; বরং মানব রাসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌছানোর জন্য জিনদের মধ্যে থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব রাসূলদের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রাসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তাফসীরবিদ এ কথা বলেন, তাঁদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কুরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌছিয়েছে। উদাহরণত وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ এবং সূরা জিনের আয়াত قَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী ﷺ -এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব রাসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রাসূলই আগমন করতেন। শেষনবী ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তাও কোনো এক বিশেষ কালের জন্য নয়; বরং কিয়ামত অবাধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রাসূল।

জিনদেরই হিন্দুদের কোনো রাসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা : কালবী মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ উক্তিই পছন্দ করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাজহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)-এর পূর্বে জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতো। যখন একথা প্রমাণিত যে পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানব জাতির মতো বিধিবিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরিয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাজী সানাউল্লাহ (র.) আরো বলেন, ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদের সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলি পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতির মতো শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণা করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলির সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলিও বিদ্যমান থাকত তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব ও রিসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোনো জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদের পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়তের আলো প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

قَوْلُهُ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ে রাসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এজন্যে ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিংবা তাঁর কোনো কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়াগুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা বেচারা মানুষ নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতিনীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কোনো মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি, যেমন হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোনো মানব চেয়েছিল কি? না তার চাওয়ার মতো অনুভূতি ছিল? কিছুই নয়, বরং

ما نبوديم وتقاضا ما نبود
لطف تونا گفته ما مى شنود

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। জগৎ সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল : মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে رَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্ব পানকর্তার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথে ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি যদিও কারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার সাথে সাথে তিনি ذُو الرَّحْمَةِ অর্থাৎ করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ যে কোনো মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য : অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করত না, বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হতো। কুরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায় তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যূষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যানবাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী, কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোনো ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোনো শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়। এ স্থলে ذُو الرَّحْمَةِ শব্দের পরিবর্তে رَحْمَانٌ কিংবা رَحِيمٌ শব্দ ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে যেত। কিন্তু غَنِيٌّ শব্দের সাথে রহমত গুণ সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য ذُو الرَّحْمَةِ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি غَنِيٌّ ও পুরোপুরি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি রহমতের অধিকারী। এ গুণটিই পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থ প্রেরণের আসল কারণ।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক কাজে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজির প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউ ছিল না।

অন্য এক জাতি ছিল যারা আজ ভূগর্বে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। 'নিয়ে যাওয়ার' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় আয়াতে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহর সে আজাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে–

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি মক্কাবাসীদের বলে দিন– হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, জালিম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে আয়াতে مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ বলা হয়েছে এবং عَاقِبَةُ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ বলা হয়নি। এতে বোঝা যায় যে, পরজগতের পূর্বে ইহজগতেও পরিণামে আল্লাহর সৎ বান্দারাই সফল হয়ে থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই শক্তিশালী প্রতাপান্বিত শত্রুরা তাঁদের পদানত হয়ে যায় এবং শত্রুদের দেশ তাঁদের হাতে বিজিত হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে গোটা আরব উপত্যকা তাঁর অধিকারে এসে যায়। ইয়েমেন ও বাহরাইন থেকে শুরু করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর তাঁর খলিফা ও সাহাবীদের হাতে প্রায় সমগ্র বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়। এভাবে আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায় যে, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ অর্থাৎ আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার পয়গম্বররাই জয়ী হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ অর্থাৎ আমি আমার রাসূলদের এবং মু'মিনদের অবশ্যই সাহায্য করব, এ জগতেও এবং ঐ দিনও যেদিন কাজকর্মের হিসেবে সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

চতুর্থ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানি হতো, তার এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেবদেবীদের নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরিব-মিসকিনকে দান করা হতো এবং দেবদেবীর অংশ প্রতিমাগৃহের পূজারী রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত।

প্রথমত এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদের অংশীদার করা হতো। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহর অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত আল্লাহ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোনো সময় এমনও হতো যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোনো বস্তু আল্লাহর অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কোনো বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে

যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কুরআন পক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে- سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ অর্থাৎ তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের হুঁশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা : এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুঁশিয়ারি। এতে ঐসব মুসলমানদের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াক্‌ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামাজ, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোনো অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহর আমাদের এবং সব মুসলমানকে এহেন কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الخ যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের কুফর-শিরক সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন কুপ্রথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত কুপ্রথাসমূহ হচ্ছে এই–

১. তারা খাদ্যশস্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহর এবং কিছু অংশ দেবদেবীর নামে পৃথক করত। অতঃপর যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহর অংশ থেকে কিছু পরিমাণ দেবদেবীদের অংশে মিশে যেত, তবে তা এমননিই থাকতে দিত। পক্ষান্তরে ব্যাপার উল্টো হলে তা তুলে নিয়ে প্রতিমাগুলোর অংশ পুরো করে দিত। এর বাহানা ছিল এই যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত ; তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অংশীদাররা অভাবগ্রস্ত। তাদের অংশ হ্রাস পাওয়া উচিত নয়। এ কুপ্রথাটি আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী আয়াতে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. বহীরা, সায়েবা ইত্যাদি জন্তু দেবদেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং বলা হতো যে, এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত। এতেও প্রতিমার অংশ ছিল এই যে, একে তাঁর সন্তুষ্টি মনে করা হতো।

৩. মুশরিকরা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত। ৪. কিছু শস্যক্ষেত্র প্রতিমাদের নামে ওয়াকফ করে দিত এবং বলত যে, এর উৎপন্ন ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করবে, মহিলাদেরকে কিছু দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। তাদের দাবি করার অধিকার নেই। ৫. চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও তারা এমনি ধরনের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করত এবং কোনো কোনো জন্তু শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত। ৬. তারা যেসব চতুষ্পদ জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত সেগুলোতে আরোহণ করা কিংবা বোঝা বহন করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করত। ৭. বিশেষ কতকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা কোনো সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতো না, উদাহরণত দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত না। ৮. বহিরা কিংবা সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোকে জবাই করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও জবাই করত কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত। পক্ষান্তরে মৃত বাচ্চা বের হলে তা সবার জন্য হালাল হতো। ৯. কোনো কোনো জন্তুর দুধও পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম ছিল। ১০. বহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হামী -এ চার প্রকার জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত। এসব রেওয়ায়েত দুররে-মনসূর ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।

–[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

অনুবাদ :

١٤١. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ خَلَقَ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مَعْرُوْشٰتٍ مَبْسُوْطَاتٍ عَلَى الْأَرْضِ كَالْبِطِّيْخِ وَغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ بِأَنْ ارْتَفَعَتْ عَلٰى سَاقٍ كَالنَّخْلِ وَ أَنْشَأَ النَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ ثَمَرُهُ وَحَبُّهُ فِي الْهَيْئَةِ وَالطَّعْمِ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَرَقُهُمَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط طَعْمُهُمَا كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ قَبْلَ النَّضْجِ وَأٰتُوْا حَقَّهُ زَكٰوتَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مِنَ الْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا ط بِإِعْطَاءِ كُلِّهِ فَلَا يَبْقٰى لِعِيَالِكُمْ شَيْءٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ.

১৪১. তিনি লতাগুল অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ মাটিতে বিছিয়ে থাকে যেমন– তরমুজ ইত্যাদির গাছ ও বৃক্ষের অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান যেমন– খেজুর বৃক্ষ উদ্যান বাগান রাজি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও বিভিন্ন স্বাদের শস্য যার ফল ও দানা আকৃতিতে ও স্বাদে বিভিন্ন। যয়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন, যে দুটির পাতা একে অন্যের সদৃশ ও স্বাদ বিসদৃশ। যখন ফলোদগম হয় তখন পরিপক্বতার পূর্বেও এটার ফল তোমরা আহার কর এবং ফসল কাটার দিনেও حَصَادٌ -এটার ح -এ কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকত দ্বারা পাঠ করা যায়। তার হক অর্থাৎ এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক জাকাত প্রদান কর। পরিবারের জন্য কিছুই না রেখে একেবারে সব কিছু দিয়ে অপচয় করো না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

١٤٢. وَ أَنْشَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُوْلَةً صَالِحَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا كَالْإِبِلِ الْكِبَارِ وَفَرْشًا لَا تَصْلُحُ لَهُ كَالْإِبِلِ الصِّغَارِ وَالْغَنَمِ سُمِّيَتْ فَرْشًا لِأَنَّهَا كَالْفَرْشِ لِلْأَرْضِ لِدُنُوِّهَا مِنْهَا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ طَرَائِقَهُ فِي التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

১৪২. এবং গবাদিপশুর মধ্যে কতক ভারবাহী বোঝা বহনের যোগ্য, যেমন বড় বড় উট এবং কতক ফারশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় পশু যেগুলো ভার বহনের যোগ্য নয় যেমন– ছোট উট ও ভেড়া-বকরি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। ছোট হওয়ার কারণে এগুলো যেহেতু মাটির সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে, এগুলোকে ভূমি-শয্যা বা ফারশ বলে মনে হয় সেহেতু এই ছোট প্রাণীকে আরবিতে 'ফারশ' [শয্যা] বলে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে যা জীবিকারূপে দিয়েছেন তা আহার কর এবং নিজেদের মনমতো হালাল বা হারাম করে শয়তানের পদাঙ্ক অর্থাৎ তার পথ অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

١٤٣. ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ج أَصْنَافٍ بَدَلٌ مِنْ حَمُولَةً وَفَرْشًا مِنَ الضَّأْنِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَمِنَ الْمَعْزِ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ اثْنَيْنِ ط قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ حَرَّمَ ذُكُورَ الْأَنْعَامِ تَارَةً وَإِنَاثَهَا أُخْرَى وَنَسَبَ ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ ءَالذَّكَرَيْنِ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ط ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ عَنْ كَيْفِيَةِ تَحْرِيمِ ذٰلِكَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ فِيهِ الْمَعْنَى مِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيمُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الذُّكُورَةِ فَجَمِيعُ الذُّكُورِ حَرَامٌ أَوِ الْأُنُوثَةِ فَجَمِيعُ الْإِنَاثِ أَوْ إِشْتِمَالِ الرَّحِمِ فَالزَّوْجَانِ فَمِنْ أَيْنَ التَّخْصِيصُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ .

১৪৩. আট জোড়া আট প্রকার পশু ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত حَمُولَةً وَفَرْشًا -এর بَدَل মেষ হতে দুপ্রকার নর ও স্ত্রী ও ছাগল হতে দুপ্রকার। اَلْمَعْز -এর ع-এ ফাতাহ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। হে মুহাম্মদ! যারা গবাদিপশুর কোনো সময় নর জাতিকে অবৈধ বলে নির্ণয় করে, অন্য আরেক সময় স্ত্রী জাতিকে অবৈধ বলে নির্ধারণ করে আর আল্লাহর দিকে তা আরোপ করে তাদেরকে বল, মেষ ও ভেড়ার নর দুটিই ءَالذَّكَرَيْنِ এস্থানে اِنْكَار অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, না এতদুভয়ের মাদি দুটি নিষিদ্ধ করেছেন, না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে নর হউক বা মাদি তা? এতে তোমরা সত্যবাদী হলে তা নিষিদ্ধ হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর। অর্থাৎ বল, কিসের কারণে এগুলো অবৈধ হলো? যদি নর হওয়ার কারণে হয় তবে সকল ধরনের নর প্রাণীই হারাম হওয়া উচিত; যদি মাদী হওয়ার কারণে তা হয় তবে সকল ধরনের মাদি প্রাণীই হারাম হওয়া দরকার। আর মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে যদি এটা হয়ে থাকে তবে নর ও মাদি উভয় জাতীয় পশুই হারাম হওয়া উচিত। কোনো সময় এই প্রকার কোনো সময় ঐ প্রকার হারাম করার বিশেষত্ব কোথা হতে আসল?

١٤٤. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ط أَمْ بَلْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ حُضُورًا إِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا التَّحْرِيمِ فَاعْتَمَدْتُّمْ ذٰلِكَ لَا بَلْ أَنْتُمْ كٰذِبُونَ فِيهِ فَمَنْ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِذٰلِكَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ .

১৪৪. এবং উট হতে দুইটি ও গরু হতে দুটি ; বল, নর দুটিই কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন? না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? না আল্লাহ যখন এসব হারাম হওয়ার নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা সমক্ষে ছিলে? উপস্থিত ছিলে? যে এটার উপর নির্ভর করে তোমরা এবম্বিধ কথা বলছ, না তোমরা এতে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে উক্তরূপ মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? না, কেউ নেই। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَعْرُوْشَاتٍ : এটা اِسْمُ مَفْعُوْل -এর جَمْعُ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ, একবচনে مَعْرُوْشَةٌ অর্থ– মাচায় ছড়ানো লতা গুল্ম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুতলাক গুল্মকে مَعْرُوْشَاتْ বলা হয় চাই তা মাচায় ছড়ানো হোক বা না হোক। এতে আঙ্গুর, তরমুজ, খরবুজা, লাউ ইত্যাদি ধরনের গুল্ম লতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اُكُلُهُ : মুযাফ ইলাইহির যমীর ذرع-এর দিকে ফিরেছে; نَخْل-এর দিকে নয়। কেননা نَخْل হলো مُؤَنَّثْ سِمَاعِىْ আর اُكُلُهُ-এর যমীর হলো مُذَكَّرٌ যার কারণে مُطَابَقَتْ হবে না, বাকিগুলোকে ذَرْع-এর উপর কিয়াস করা হবে।

قَوْلُهُ قَبْلَ النَّضْجِ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. اِذَا اَثْمَرَ -এর কার্যত কোনো উপকারিতা বুঝা যায় না। কেননা ফল খাওয়ার সম্পর্ক ফল আসার পরেই হয়ে থাকে। ফল আগমনের পূর্বে খাওয়া সম্ভব নয়।

উত্তর. قَبْلَ النَّضْجِ-এর বৃদ্ধিকরণ এ প্রশ্নের সমাধান কল্পেই হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সাধারণত এই ধারণা হতে পারে যে, ফল ভক্ষণের সম্পর্ক ফল পাকার পরেই হয়ে থাকে। অথচ কতিপয় ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই খাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَاَنْشَا مِنَ الْاَنْعَامِ : এখানে اَنْشَا শব্দটি উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, مِنَ الْاَنْعَامِ-এর আতফ جَنّٰتٍ-এর উপর হয়েছে, কেননা নিকটবর্তীর উপর আতফ করা দ্বারা অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ حَمُوْلَةً : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ -কে উহ্য ফে'লের মাফঊল স্বীকৃতি দানকারীদের মতাদর্শকে খণ্ডন করার জন্য আনা হয়েছে, তখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, كُلُوْا ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ কেননা প্রয়োজনহীন উহ্য মানা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الضَّانِ : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ হতে بَدَلْ হয়েছে। ضَانْ শব্দটি ضَائِنْ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : **প্রশ্ন.** زَوْجَيْنِ শব্দটি زَوْجٌ-এর দ্বিবচন; জোড়াকে زَوْجٌ বলা হয়। যা দু'-এর উপর সম্বলিত। কাজেই زَوْجَيْنِ অর্থ হবে দুই জোড়া তথা চার। আর এ সুরতে زَوْجَيْنِ -এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না।

উত্তর. زَوْجٌ -এর দুটি অর্থ রয়েছে–

১. زَوْجٌ বলা হয় যার সাথে তার সমজাতীয় অন্যটি হবে। তার জন্য দু' হওয়া জরুরি নয়, যেমন স্বামীকে زَوْجٌ বলা হয়।

২. অন্য অর্থ হলো জোড়া। সে সময় زَوْجَيْنِ অর্থ হবে চার আর এ অর্থের ভিত্তিতে زَوْجَيْنِ -এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ءَالذَّكَرَيْنِ : এটা حَرَّمَ -এর مَفْعُوْل بِه مُقَدَّمْ হয়েছে। আর اَمْ হলো حَرْف عَطْف আর الْاُنْثَيَيْنِ হলো ذَكَرَيْنِ -এর উপর আতফ। এরপর বাক্য হয়ে قُلْ -এর مَقُوْلَهْ হওয়ার কারণে نَصَب -এর স্থানে হয়েছে। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِىْ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পতভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালিমরা আল্লাহ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্রাণ, অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার

অনুবাদ :

١٤١. وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَا خَلَقَ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مَعْرُوْشٰتٍ مَبْسُوْطَاتٍ عَلَى الْاَرْضِ كَالْبِطِّيْخِ وَغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ بِاَنْ اِرْتَفَعَتْ عَلٰى سَاقٍ كَالنَّخْلِ وَ اَنْشَا النَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ ثَمَرُهٗ وَحَبُّهٗ فِى الْهَيْئَةِ وَالطَّعْمِ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَرَقُهُمَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط طُعْمُهُمَا كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ قَبْلَ النَّضْجِ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ زَكٰوتَهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مِنَ الْعُشْرِ اَوْ نِصْفِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا ط بِاِعْطَاءِ كُلِّهٖ فَلَا يَبْقٰى لِعِيَالِكُمْ شَئٌ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ.

১৪১. তিনি লতাগুল অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ মাটিতে বিছিয়ে থাকে যেমন– তরমুজ ইত্যাদির গাছ ও বৃক্ষের অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান যেমন– খেজুর বৃক্ষ উদ্যান বাগান রাজি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও বিভিন্ন স্বাদের শস্য যার ফল ও দানা আকৃতিতে ও স্বাদে বিভিন্ন। যয়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন, যে দুটির পাতা একে অন্যের সদৃশ ও স্বাদ বিসদৃশ। যখন ফলোদগম হয় তখন পরিপক্বতার পূর্বেও এটার ফল তোমরা আহার কর এবং ফসল কাটার দিনেও حَصَادٌ -এটার ح -এ কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকত দ্বারা পাঠ করা যায়। তার হক অর্থাৎ এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক জাকাত প্রদান কর। পরিবারের জন্য কিছুই না রেখে একেবারে সব কিছু দিয়ে অপচয় করো না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

١٤٢. وَ اَنْشَا مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً صَالِحَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا كَالْاِبِلِ الْكِبَارِ وَفَرْشًا لَا تَصْلُحُ لَهٗ كَالْاِبِلِ الصِّغَارِ وَالْغَنَمِ سُمِّيَتْ فَرْشًا لِاَنَّهَا كَالْفَرْشِ لِلْاَرْضِ لِدُنُوِّهَا مِنْهَا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ طَرَائِقَهٗ فِى التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

১৪২. এবং গবাদিপশুর মধ্যে কতক ভারবাহী বোঝা বহনের যোগ্য, যেমন বড় বড় উট এবং কতক ফারশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় পশু যেগুলো ভার বহনের যোগ্য নয় যেমন– ছোট উট ও ভেড়া-বকরি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। ছোট হওয়ার কারণে এগুলো যেহেতু মাটির সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে, এগুলোকে ভূমি-শয্যা বা ফারশ বলে মনে হয় সেহেতু এই ছোট প্রাণীকে আরবিতে 'ফারশ' [শয্যা] বলে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে যা জীবিকারূপে দিয়েছেন তা আহার কর এবং নিজেদের মনমতো হালাল বা হারাম করে শয়তানের পদাঙ্ক অর্থাৎ তার পথ অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

١٤٣. ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ أَصْنَافٍ بَدَلٌ مِنْ حَمُولَةً وَفَرْشًا مِنَ الضَّأْنِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَمِنَ الْمَعْزِ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ اثْنَيْنِ ط قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ حَرَّمَ ذُكُورَ الْأَنْعَامِ تَارَةً وَإِنَاثَهَا أُخْرٰى وَنَسَبَ ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ط ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ عَنْ كَيْفِيَةِ تَحْرِيمِ ذٰلِكَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ فِيهِ الْمَعْنٰى مِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيمُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الذُّكُورَةِ فَجَمِيعُ الذُّكُورِ حَرَامٌ أَوِ الْأُنُوثَةِ فَجَمِيعُ الْإِنَاثِ أَوِ اشْتِمَالِ الرَّحِمِ فَالزَّوْجَانِ فَمِنْ أَيْنَ التَّخْصِيصُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ.

১৪৩. আট জোড়া আট প্রকার পশু ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত حَمُولَةً وَفَرْشًا -এর بَدَل মেষ হতে দুপ্রকার নর ও স্ত্রী ও ছাগল হতে দুপ্রকার। اَلْمَعْز -এর ع-এ ফাতাহ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। হে মুহাম্মদ! যারা গবাদিপশুর কোনো সময় নর জাতিকে অবৈধ বলে নির্ণয় করে, অন্য আরেক সময় স্ত্রী জাতিকে অবৈধ বলে নির্ধারণ করে আর আল্লাহর দিকে তা আরোপ করে তাদেরকে বল, মেষ ও ভেড়ার নর দুটিই ءٰٓالذَّكَرَيْنِ এস্থানে إِنْكَار অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, না এতদুভয়ের মাদি দুটি নিষিদ্ধ করেছেন, না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে নর হউক বা মাদি তা? এতে তোমরা সত্যবাদী হলে তা নিষিদ্ধ হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর। অর্থাৎ বল, কিসের কারণে এগুলো অবৈধ হলো? যদি নর হওয়ার কারণে হয় তবে সকল ধরনের নর প্রাণীই হারাম হওয়া উচিত; যদি মাদী হওয়ার কারণে তা হয় তবে সকল ধরনের মাদি প্রাণীই হারাম হওয়া দরকার। আর মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে যদি এটা হয়ে থাকে তবে নর ও মাদি উভয় জাতীয় পশুই হারাম হওয়া উচিত। কোনো সময় এই প্রকার কোনো সময় ঐ প্রকার হারাম করার বিশেষত্ব কোথা হতে আসল?

١٤٤. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ط أَمْ بَلْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ حُضُورًا إِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا التَّحْرِيمِ فَاعْتَمَدْتُمْ ذٰلِكَ لَا بَلْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ فِيهِ فَمَنْ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِذٰلِكَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ.

১৪৪. এবং উট হতে দুইটি ও গরু হতে দুটি ; বল, নর দুটিই কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন? না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? না আল্লাহ যখন এসব হারাম হওয়ার নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা সমক্ষে ছিলে? উপস্থিত ছিল? যে এটার উপর নির্ভর করে তোমরা এবম্বিধ কথা বলছ, না তোমরা এতে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে উক্তরূপ মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? না, কেউ নেই। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَعْرُوشَاتٍ : এটা اِسْمُ مَفْعُوْل -এর جَمْعُ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ, একবচনে مَعْرُوشَةٌ অর্থ– মাচায় ছড়ানো লতা গুল্ম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুতলাক গুল্মকে مَعْرُوشَاتٌ বলা হয় চাই তা মাচায় ছড়ানো হোক বা না হোক। এতে আঙ্গুর, তরমুজ, খরবুজা, লাউ ইত্যাদি ধরনের গুল্ম লতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اُكُلُهُ : মুযাফ ইলাইহির যমীর ذرع-এর দিকে ফিরেছে; نَخْل-এর দিকে নয়। কেননা نَخْل হলো مُؤَنَّثْ سِمَاعِيّ আর اُكُلُ-এর যমীর হলো مُذَكَّرْ যার কারণে مُطَابَقَتْ হবে না, বাকিগুলোকে ذَرْع-এর উপর কিয়াস করা হবে।

قَوْلُهُ قَبْلَ النُّضْجُ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. اِذَا اَثْمَرَ -এর কার্যত কোনো উপকারিতা বুঝা যায় না। কেননা ফল খাওয়ার সম্পর্ক ফল আসার পরেই হয়ে থাকে। ফল আগমনের পূর্বে খাওয়া সম্ভব নয়।

উত্তর. قَبْلَ النُّضْجِ-এর বৃদ্ধিকরণ এ প্রশ্নের সমাধান কল্পেই হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সাধারণত এই ধারণা হতে পারে যে, ফল ভক্ষণের সম্পর্ক ফল পাকার পরেই হয়ে থাকে। অথচ কতিপয় ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই খাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَاَنْشَا مِنَ الْاَنْعَامِ : এখানে اَنْشَا শব্দটি উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, مِنَ الْاَنْعَامِ-এর আতফ جَنّٰتٍ-এর উপর হয়েছে, কেননা নিকটবর্তীর উপর আতফ করা দ্বারা অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ حَمُوْلَةً : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ -কে উহ্য ফে'লের মাফউল স্বীকৃতি দানকারীদের মতাদর্শকে খণ্ডন করার জন্য আনা হয়েছে, তখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, كُلُوْا ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ কেননা প্রয়োজনহীন উহ্য মানা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الضَّاْنِ : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ হতে بَدَلْ হয়েছে। ضَاْن শব্দটি ضَائِنٌ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : **প্রশ্ন.** زَوْجَيْنِ শব্দটি زَوْج-এর দ্বিবচন; জোড়াকে زَوْج বলা হয়। যা দু'-এর উপর সম্বলিত। কাজেই زَوْجَيْنِ অর্থ হবে দুই জোড়া তথা চার। আর এ সুরতে زَوْجَيْنِ -এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না।

উত্তর. زَوْج -এর দুটি অর্থ রয়েছে–

১. زَوْج বলা হয় যার সাথে তার সমজাতীয় অন্যটি হবে। তার জন্য দু' হওয়া জরুরি নয়, যেমন স্বামীকে زَوْج বলা হয়।

২. অন্য অর্থ হলো জোড়া। সে সময় زَوْجَيْنِ অর্থ হবে চার আর এ অর্থের ভিত্তিতে زَوْجَيْنِ -এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ءَالذَّكَرَيْنِ : এটা حَرَّمَ -এর مَفْعُوْل بِه مُقَدَّمْ হয়েছে। আর اَمْ হলো حَرْف عَطْف আর اَلْاُنْثَيَيْنِ হলো ذَكَرَيْنِ -এর উপর আতফ। এরপর বাক্য হয়ে قُلْ -এর مَقُوْلَه হওয়ার কারণে نَصْب -এর স্থানে হয়েছে। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِىْ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পতভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালিমরা আল্লাহ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্রাণ, অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার

সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরিক ও অংশীদার করে ফেলেছে। অতঃপর তাদের সরলপথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদের দান করার কাজে কোনো অংশীদার নেই তখন ইবাদতে তাদের অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদের দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ব্যবহার করতে পার, এরপরও যেসব বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য সেই সব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শয়তানি ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে اَنْشَاَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং مَعْرُوْشَاتٌ শব্দটি عَرْشٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা, مَعْرُوْشَاتٌ বলে উদ্ভিদের ঐসব লতিকা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচা বা কাঠামোর উপর চড়ানো হয় যেমন– আঙ্গুর ও কোনো শাকসবজি। এর বিপরীতে غَيْرُ مَعْرُوْشَاتٌ বলে ঐ সমস্ত বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না। কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক ; কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না, যেমন– তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نَخْل শব্দের অর্থ খেজুর বৃক্ষ, زَرْع সর্বপ্রকার শস্য, زَيْتُوْن জয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رُمَّانٌ ডালিমকে বলা হয়। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। ১. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় এবং ২. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহর চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারা গাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরি, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না, যদি ধরেও তবে তা বাড়ে না এবং বাকি থাকে না, যেমন– আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না, চড়লেও ফল দুর্বল হয়ে যায়, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোনো কোনো বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবত সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কোনো ফল মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ব হয় আর কোনো কোনো ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্য কিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরি। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এরপর বিশেষভাবে খেজুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খেজুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এর দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণত মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দুটি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اُكُلُهٗ-এর সর্বনাম زَرْع এবং نَخْل উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ রয়েছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি, বাতাস, একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যাঁর জ্ঞান ও তাৎপর্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে, জয়তুন ও ডালিম। জয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দু প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। জয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবির পরিপূরক। বলা হয়েছে- كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও শস্য ক্ষেত্রের ফসল আহার কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোনো প্রয়োজন মেটাতে চান না, বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। اِذَآ اَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তামাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার- পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর : দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে- وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ এখানে اٰتُوْا শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حَصَادٌ বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকির-মিসকিনকে দান করা বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ : অর্থাৎ সৎলোকদের ধনসম্পদে ফকির-মিসকিনদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে। এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বুঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের জাকাত-ওশর বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং জাকাত মদিনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরজ হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের জাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حَقٌّ -এর অর্থ জাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দলূসী 'আহকামুল কুরআনে' এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদিনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্য ক্ষেত্রের জাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কেননা তাঁদের মতে জাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুয্‌যাম্মিলের আয়াতে জাকাতের পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎ লোকের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হতো। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানের সময় যেসব গরিব মিসকিন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হতো। কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম-পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা কুরআন পাকের اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দুবছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন অন্যান্য ধনসম্পদের জাকাত ও নিসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের জাকাতও বর্ণনা করেন। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে- مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّاقِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ

অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব।

ইসলামি শরিয়ত জাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার জাকাতের পরিমাণ বেশি আর পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, জাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোনো লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনারূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশি। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর জাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর জাকাত ও তার অর্ধেক। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনারূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যাধিক। এজন্য এগুলোর জাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোনো নিসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশি সর্বাবস্থায় তার জাকাত বের করা জরুরি। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের ফসলের জাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোনো নিসাব বর্ণিত হয়নি।

বলা হয়েছে- اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্যসামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে জাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে জাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত হাদীসে কোনো নিসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই উৎপন্ন ফসল কমবেশি যাই হোক, তার উপর দশ ভাগের এক কিংবা বিশ ভাগের একভাগ জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর পথে যদি কেউ সমস্ত ধনসম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না, বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে? তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

অনুবাদ :

١٤٥. قُلْ لَآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ شَيْئًا مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مَيْتَةً بِالنَّصْبِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ مَعَ التَّحْتَانِيَّةِ اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا سَائِلًا بِخِلَافِ غَيْرِهٖ كَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ حَرَامٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج اَىْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ اِلٰى شَىْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاَكَلَهٗ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ لَّهٗ مَا اَكَلَ رَحِيْمٌ بِهٖ وَيَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

১৪৫. বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি নিষিদ্ধ কিছুই পাই না মড়া, বহমান রক্ত পক্ষান্তরে যা বহমান নয় যেমন, কলিজা, তিলি ইত্যাদির বিধান এটা হতে ভিন্ন ; يَكُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে ও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গরূপে পঠিত। مَيْتَةً এটা مَنْصُوْب রূপে পঠিত। অপর এক কেরাতে এটা অর্থাৎ مَيْتَةٌ শব্দটি رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। এ অবস্থায় يَكُوْنَ -এর ى অক্ষরটি পেশযুক্ত হবে। مَسْفُوْحًا অর্থ বহমান। ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা, এসব অপবিত্র হারাম। তবে যা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে অর্থাৎ অন্য কিছুর নামে জবাই করার কারণে অবৈধ। তাও হারাম। তবে কেউ অবাধ্যাচারী ও সীমলঙ্ঘনকারী না হওয়া উল্লিখিত বস্তুসমূহের কিছু গ্রহণে একান্ত বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক তার প্রতি যা আহার করে ফেলেছে তার জন্য ক্ষমাশীল, তার বিষয়ে পরম দয়ালু। হাদীস ও সুন্নার বিবরণ অনুসারে উল্লিখিত অবৈধ বস্তুসমূহের মধ্যে তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত হিংস্র পশু ও নখরবিশিষ্ট থাবার অধিকারী হিংস্র পাখিসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

١٤٦. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا اَىِ الْيَهُوْدِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ج وَهُوَ مَا لَمْ تُفَرَّقْ اَصَابِعُهٗ كَالْاِبِلِ وَالنَّعَامِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا الثُّرُوْبَ وَشَحْمَ الْكُلٰى اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَىْ مَا عَلِقَ بِهَا مِنْهُ اَوْ حَمَلَتْهُ الْحَوَايَا الْاَمْعَاءُ جَمْعُ حَاوِيَاءٍ اَوْ حَاوِيَةٍ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط مِنْهُ وَهُوَ شَحْمُ الْاَلْيَةِ فَاِنَّهٗ اُحِلَّ لَهُمْ ذٰلِكَ التَّحْرِيْمُ جَزَيْنٰهُمْ بِهٖ بِبَغْيِهِمْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ بِمَا سَبَقَ فِىْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ فِىْ اَخْبَارِنَا وَمَوَاعِيْدِنَا .

১৪৬. যারা ইহুদি হয়েছে তাদের জন্য অর্থাৎ ইহুদিগণের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু অর্থাৎ যে সমস্ত পশুর আঙ্গুল বিভক্ত নয় যেমন– উট, উটপাখি ইত্যাদি সেগুলো নিষিদ্ধ করেছিলাম। এবং গরু ও ছাগলের মধ্যে এতদুভয়ের চর্বি অর্থাৎ পাকস্থলী ও গুর্দার চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম তবে এগুলোর পৃষ্ঠ, অন্ত্র সংলগ্ন কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি অর্থাৎ নিতম্ব সংলগ্ন চর্বি ; তা তাদের জন্য হালাল ছিল নিষিদ্ধ ছিল না। اَلْحَوَايَا এটা حَاوِيَاء বা حَاوِيَة -এর বহুবচন। অর্থ– অন্ত্র। তাদের অবাধ্যতার দরুন بِبَغْيِهِمْ এটার ب টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। সূরা আননিসায় উল্লিখিত সীমালঙ্ঘনের দরুন তাদেরকে এ প্রতিফল অর্থাৎ তাদের জন্য ঐ সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ করত প্রতিফল প্রদান করেছিলাম। আমি তো আমার প্রতিশ্রুতি ও সংবাদ দানে সত্যবাদী।

١٤٧. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فِيمَا جِئْتَ بِهِ فَقُلْ لَهُمْ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ج حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ بِهِ وَفِيهِ تَلَطُّفٌ بِدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَذَابُهُ إِذَا جَاءَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

১৪৭. অতঃপর যদি তারা তোমাকে তুমি যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আগমন করেছ সেসব বিষয়ে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে বল, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক তাই তিনি তোমাদের অপরাধসমূহের শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেন না। এ বাক্যটি ঈমানের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করতে কোমলতা প্রদর্শনমূলক। এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি যখন আসে তখন আর তা রদ হয় না।

١٤٨. سَيَقُولُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط فَإِشْرَاكُنَا وَتَحْرِيمُنَا بِمَشِيئَتِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ قَالَ تَعَالَى كَذٰلِكَ كَمَا كَذَّبَ هٰؤُلَاءِ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ حَتّٰى ذَاقُوا بَأْسَنَا ط عَذَابَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ بِأَنَّ اللّٰهَ رَاضٍ بِذٰلِكَ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ط أَيْ لَا عِلْمَ عِنْدَكُمْ إِنْ مَا تَتَّبِعُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ تَكْذِبُوْنَ فِيهِ.

১৪৮. যারা শিরক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না। অতএব আমাদের এ শিরক করা ও নিষিদ্ধ করা তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তিনি এতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে অর্থাৎ এরা যেমন অস্বীকার করেছে তাদেরকে পূর্ববর্তীগণও তাদের নবীগণকে অস্বীকার করেছিল। অবশেষে তারা আমার যন্ত্রণা শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, আল্লাহ যে তোমাদের এ কাজে সন্তুষ্ট এমন কোনো জ্ঞান তোমাদের নিকট আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর। না, আসলে তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি ও জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং কেবল অনুমানই করে থাক। অর্থাৎ মিথ্যাই বলে থাক। إِنْ تَتَّبِعُوْنَ -এটার إِنْ টি না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। إِنْ أَنْتُمْ এটার إِنْ টিও 'না' বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٤٩. قُلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حُجَّةٌ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج التَّامَّةُ فَلَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدٰكُمْ أَجْمَعِيْنَ.

১৪৯. তোমাদের যখন কোনো যুক্তি নেই বল, পূর্ণাঙ্গ চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি তোমাদের হেদায়েতের ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।

١٥٠. قُلْ هَلُمَّ أَحْضِرُوْا شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج الَّذِيْ حَرَّمْتُمُوْهُ فَإِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ يُشْرِكُوْنَ.

১৫০. বল, তোমরা যে সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ করে রেখেছ আল্লাহ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে নিয়ে আস, হাজির কর। তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে এটা স্বীকার করো না। যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে; যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় অর্থাৎ শিরক করে তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ شَيْئًا : এখানে مَا টি হলো مَوْصُوْلَهْ আর اُوْحِىَ হলো তার সেলাহ, তার عَائِدْ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– اَلَّذِىْ اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَى

قَوْلُهُ شَيْئًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা مُحَرَّمًا উহ্য মাওসূফের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ شَيْئًا مُحْرِمًا

قَوْلُهُ مَيْتَةً بِالنَّصْبِ : كَانَ-কে যদি نَاقِصَهْ মানা হয় তবে তার যমীর উহ্য হবে এবং ঐ যমীরের مَرْجِعْ হবে شَيْئٌ আর مَيْتَةً টা كَانَ-এর খবর হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হবে আর يَكُوْنَ টা স্বীয় اِسْم-এর مَرْجِعْ যা مُحَرَّمْ-এর প্রতি لক্ষ্য রেখে مُذَكَّرْ-এর সীগাহ হবে। এ সুরতে খবর অর্থাৎ مَيْتَةً-এর প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর تَكُوْنَ যা مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ খবরের প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে হবে। এ উভয় সুরতেই مَيْتَةً নসবযুক্ত হবে। আর مَيْتَةٌ -এর রফা'র সুরতে تَكُوْنَ-এর মধ্যে শুধুমাত্র এক কেরাতই হবে। অর্থাৎ উপরে নুক্তাযুক্ত تَاء দ্বারা। আর এ সুরতে تَكُوْنَ টা تَامَّهْ হবে এবং مَيْتَةٌ তার فَاعِلْ হবে। যখন উল্লিখিত আলোচনা বুঝে আসল গ্রন্থকারের বক্তব্য وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ مَعَ التَّحْتَانِيَّةِ এটা লিখনির ভ্রান্তি বলে বিবেচিত হবে। বিশুদ্ধ হলো اَلْفَوْقَانِيَّةُ তথা تَاء দ্বারা হওয়া।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ : যদি عُمُوْمِ اَحْوَالْ থেকে مُسْتَثْنٰى মানা হয় তবে তা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে। আর যদি বলা হয় যে, مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো مُحَرَّمًا যা ذَاتْ আর مُسْتَثْنٰى হলো مَيْتَةً যা সিফত। কাজেই مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর জিনস থেকে না হওয়ার কারণে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে। আর প্রথমটি হলো অধিক নিকটবর্তী। –[সাবী]

قَوْلُهُ حَرَامٌ : গ্রন্থকার যদি رِجْس-এর তাফসীর حَرَامٌ-এর পরিবর্তে نَجَسْ দ্বারা করতেন তবে উত্তম হতো। কেননা হুরমত তো اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً الخ ইস্তেছনা থেকে বুঝে আসে।

قَوْلُهُ اَوْ فِسْقًا : এর عَطْف হলো مَيْتَةً -এর উপর এর মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ذَا فِسْقٍ মুবালাগার ভিত্তিতে حَمْل হবে। এ সুরতে زَيْدٌ عَدْلٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার নিকটবর্তিতার কারণে لَحْمَ خِنْزِيْرٍ-এর উপরও عَطْف হওয়া বৈধ রয়েছে। আর فَاِنَّهُ رِجْس এটা جُمْلَهْ مُعْتَرِضَهْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ : এটা فِسْقًا-এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশ্ন. আয়াত দ্বারা উল্লিখিত চারটি বিষয়ের মধ্যেই হুরমতটা সীমাবদ্ধ হওয়া বুঝে আসে। অথচ এগুলো ব্যতীত ও আরো অনেক কিছু হারাম রয়েছে।

উত্তর. حَصْرحَقِيْقِىْ বা প্রকৃত সীমাবদ্ধকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং হাদীস দ্বারা আরো অনেক কিছু হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلثُّرُوْبُ : এটা ثَرْب-এর বহুবচন। অর্থ চর্বির ঐ পাতলা আবরণকে বলে যা পাকস্থলী এবং নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদির উপর রয়েছে।

قَوْلُهُ كُلَى : এটা كُلْيَةٌ-এর বহুবচন। গ্রুপ, দলকে বলে।

قَوْلُهُ شَحْمُ الْاَلْيَةِ : অর্থ মেরুদণ্ডের চর্বি যা লেজের হাড়ের সাথে লেগে থাকে।

قَوْلُهُ نَحْنُ : এটা اَشْرَكْنَا-এর উহ্য যমীরের তাকিদ হয়েছে। যাতে করে مَرْفُوْعْ مُتَّصِلْ-এর উপর আতফ ঠিক থাকে। কেননা ضَمِيْر مَرْفُوْعْ مُتَّصِلْ-এর উপর আতফ করার জন্য فَصْل বা تَاكِيْد-এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ حُجَّةٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ উহ্য شَرْط-এর جَزَاءْ যাকে মুসান্নেফ (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ-এর প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اَحْضِرُوْا : প্রশ্ন : هَلُمَّ-এর তাফসীর اَحْضِرُوْا যা جَمْعْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ এর দ্বারা করার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে?

উত্তর. هَلُمَّ এটা اَسْمَاءُ اَفْعَالْ -এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে হেজাযবাসীদের ভাষা অনুপাতে ব্যবহার হয়েছে। কেননা হেজাযবাসীদের নিকট এটা غَيْرُ مُنْصَرِفْ ; বনূ তামীমের বিপরীত। কাজেই এ প্রশ্ন এখানে শেষ হয়ে গেল যে, এখানে هَلُمُّوْا বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা উচিত ছিল। কেননা এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ অনেক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেই সব হালাল বস্তুর উল্লেখ রয়েছে যেগুলো জাহিলি যুগে পৌত্তলিকরা হারাম মনে করত। আর এ আয়াতে সেই হারাম বস্তুসমূহের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোকে পৌত্তলিকরা হালাল মনে করতো। –[তাফসীরে মারেআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খ. ২, পৃ. ৫৫৩]

ইমাম রাযী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন যেহেতু ইতঃপূর্বে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হালাল হারামের সিদ্ধান্ত শুধু ওহীর মাধ্যমেই হয় আল্লাহ পাকই ঘোষণা করেন কোনো বস্তু হালাল আর কোনো বস্তু হারাম। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলুন আমার প্রতি যে ওহী নাজিল হয়েছে, মানুষের আহার্যের মধ্যে আমি চারটি বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নিষিদ্ধ পাই না।

আর এ চারটি বস্তু হলো : ১. যে জন্তু নিজে মরে গেছে ২. প্রবাহিত রক্ত ৩. শূকরের গোশ্‌ত ৪. অবৈধভাবে জবাই করা জন্তু যার উপর আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর নাম উচ্চারিত হয়েছে।

অতএব, এ চারটি বস্তু ব্যতীত আর কিছু ওহীর মাধ্যমে হারাম ঘোষিত হয়নি আর ওহী আসে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট। –[তাফসীরে কবীর, খ. ১৩, পৃ. ২১৯]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, হে রাসুল! আপনি এ কাফেরদের জানিয়ে দিন যে ওহী আমার নিকট এসেছে তাতে চারটি জিনিসকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। [যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে] আমর ইবনে দীনার হযরত জাবের (রা.)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, লোকে বলে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিনে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌তকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে হাকাম ইবনে ওমর এ বর্ণনাই করেছেন। কিন্তু এই সমুদ্র তথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা অস্বীকার করেন। আর আলোচ্য আয়াত قُلْ لَّآ اَجِدُ পাঠ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বর্বরতার যুগে লোকেরা কোনো বস্তু আহার করতো আর কোনো বস্তু পরিহার করতো। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন আসমানি গ্রন্থ নাজিল করেছেন এবং হালাল হারামের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। যা আল্লাহর তরফ থেকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে তা হালাল, আর যা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম আর যে ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে তা মাফ, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত قُلْ لَّآ اَجِدُ তেলাওয়াত করেন।

এক সাহাবীর বকরি মরে গেল। বিষয়টি প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে আলোচিত হলো, তিনি ইরশাদ করলেন তুমি তার চামড়াটা বের করলে না কেন? ঐ সাহাবী আরজ করলেন, মৃত বকরির চামড়া নেওয়া কি বৈধ? তখন প্রিয়নবী ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, মৃত বকরির গোশ্‌ত খাওয়া হারাম কিন্তু তার চামড়া দ্বারা তুমি উপকৃত হতে পার। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে ঐ মৃত বকরির চামড়া বের করলেন এবং তা দ্বারা পানির মশক তৈরি করলেন যা অনেকদিন তাঁর কাজে লাগে।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ৯, পৃ. ২৩]

قَوْلُهٗ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ : আমি ইহুদিদের জন্য হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী, আর গরু ছাগল থেকে তাদের চর্বি। পূর্ববর্তী আয়াতে হারাম বস্তুসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে কখনও কখনও সাময়িকভাবে কোনো বস্তু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে যেমন অভিশপ্ত ইহুদি জাতির অন্যায়-অনাচারের শাস্তিস্বরূপ

নখরযুক্ত প্রাণী মাত্রকে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। যার আঙ্গুলে ফাঁক নেই এমন বিশিষ্ট জন্তু যেমন– উটপাখি, হাঁস প্রভৃতি এবং গরু-ছাগলের পৃষ্ঠ দেশে একটি অন্ত্রে এবং হাড়ে চর্বি জড়ানো থাকে তা এবং অস্থি মজ্জার ভিতরে যে চর্বি থাকে তাও তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

ইহুদিরা একথা বলে বেড়াত যে এসব বস্তু হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জমানা থেকে হারাম বলে আসছে। কিন্তু তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আমি ইহুদিদেরকে তাদের বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছি, এ বস্তুসমূহ হালাল ঘোষণা করা মাধ্যমে। কেননা, ইহুদিরা নবীগণকে হত্যা করেছে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে, সুদ গ্রহণ করেছে, মানুষের অর্থসম্পদ হজম করেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাব সম্পর্কে তাদের কিতাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, চির অভিশপ্ত ইহুদি জাতি এত বড় অপরাধী ছিল, তাদের ব্যাপারে কোনো বস্তুকে হারাম করলে তাদের কি কিছু যায় আসে? তারা যে জন্ম অপরাধী। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এর জবাবে লিখেছেন, হয়তো আখেরাতের শাস্তি বৃদ্ধি করার নিমিত্তে এসব বস্তু হারাম ঘোষিত হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছরে যখন প্রিয়নবী ﷺ মক্কা মোয়াজ্জমায় ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ইহুদিদের উপর আল্লাহর লানত, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি মৃত্যু জন্তুর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন, কিন্তু তারা এ চর্বিকে রান্না করে বিক্রয় করেছে, আর তার মূল্য ভোগ করেছে। –[বুখারী]

قَوْلُهُ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ : নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। এর তাৎপর্য হলো পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, আর নেক কারদের জন্য যে ছওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে অবশেষে সবই সত্য প্রমাণিত হবে, আর পবিত্র কুরআনে অতীতের যে ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কতিপয় বিরোধপূর্ণ মাসায়েল : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে পালিত গাধা ভক্ষণ করা হারাম। অন্যান্য কতিপয় ফকীহ বলেন যে, তা হারাম নয়; বরং কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কারণে তা নিষিদ্ধ করেছিলেন। হিংস্র প্রাণী, শিকারি পাখি এবং মৃতভোজী প্রাণীকে হানাফীগণ সাধারণত হারাম বলে থাকেন। কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম আওযায়ী (র.)-এর মতে শিকারি পাখি হালাল। ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর নিকট শুধুমাত্র ঐ হিংস্র প্রাণীই হারাম যা মানুষের উপর আক্রমণ করে থাকে, যেমন– বাঘ, চিতা, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি। ইকরিমা (র.)-এর নিকট কাক, বিজ্জু [গোশ্‌তভোজী একজাতীয় প্রাণী] উভয়টি খাওয়া হলাল অনুরূপভাবে হানাফীগণের মতে সকল প্রকার কীটপতঙ্গ হারাম। কিন্তু ইবনে আবী লায়লা এবং ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট সর্প হালাল।

অনুবাদ :

١٥١. قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ اَقْرَأُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَنْ مُفَسِّرَةٌ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَ اَحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالْوَادِ مِنْ اَجْلِ اِمْلَاقٍ ط فَقْرٍ تَخَافُوْنَهٗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ الْكَبَائِرَ كَالزِّنَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج اَىْ عَلَانِيَتَهَا وَسِرَّهَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ كَالْقَوَدِ وَحَدِّ الرِّدَّةِ وَرَجْمِ الْمُحْصَنِ ذٰلِكُمُ الْمَذْكُوْرُ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تَتَدَبَّرُوْنَ .

১৫১. বল, আসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা আবৃত্তি করে বিস্তারিত পাঠ করে শুনাই; তোমরা তার কোনো শরিক করবে না, পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত হত্যা করবে না। مِنْ اِمْلَاقٍ এটার مِنْ টি হেতুবোধক। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। গোপন ও বাহ্যিক অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ অর্থাৎ কবীরা গুনাহ, যেমন ব্যভিচার ইত্যাদির নিকটও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে যেমন কিসাস, মুরতাদ বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ, বিবাহিত ব্যভিচারীর রাজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা ইত্যাদি ব্যতিরেকে [তাকে হত্যা করবে না। এই] অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশ তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর চিন্তা কর।

١٥٢. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ اَىْ بِالْخَصْلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ وَهِىَ مَا فِيْهِ صَلَاحُهٗ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج بِاَنْ يَّحْتَلِمَ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ج بِالْعَدْلِ وَتَرْكِ الْبَخْسِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ج طَاقَتَهَا فِىْ ذٰلِكَ فَاِنْ اَخْطَاَ فِى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ صِحَّةَ نِيَّتِهٖ فَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ وَاِذَا قُلْتُمْ فِىْ حُكْمٍ اَوْ غَيْرِهٖ فَاعْدِلُوْا بِالصِّدْقِ وَلَوْ كَانَ الْمَقُوْلُ لَهٗ اَوْ عَلَيْهِ ذَا قُرْبٰى ج قَرَابَةٍ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ تَتَّعِظُوْنَ وَالسُّكُوْنِ .

১৫২. পিতৃহীন বুদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎভাবে ছাড়া অর্থাৎ এমন বিষয় যাতে তার কল্যাণ নিহিত সেই বিষয় ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে। ন্যায়নুসারে দেবে ও মাপে কম প্রদান বর্জন করবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ও শক্তির বাহিরে ভার অর্পণ করি না। সুতরাং যদি পরিমাণ ও ওজনের বেলায় ভুল করে বসে আর আল্লাহ তার সৎ নিয়ত দেখেন তবে এটার কারণে সে অভিযুক্ত হবে না বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যখন তোমরা কোনো ফয়সালা প্রদান বা অন্য বিষয়ে কথা বলবে তখন যার পক্ষে বা বিরুদ্ধে কথা হবে সে স্বজন হলেও ন্যায্য কথা বলবে। আত্মীয়তার অধিকারী হলেও সত্য কথা বলবে। আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করবে। এ ধরনের নির্দেশ তোমাদেরকে আল্লাহ দেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, নসিহত গ্রহণ কর। تذكرون এটা তাশদীদ ও সাকিন উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে।

١٥٣. وَاَنَّ بِالْفَتْحِ عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ وَالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا هٰذَا الَّذِىْ وَصِيَّتُكُمْ بِهٖ صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا حَالٌ فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الطُّرُقَ الْمُخَالِفَةَ لَهٗ فَتَفَرَّقَ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ تَمِيْلَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط دِيْنِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

১৫৩. আর নিশ্চয়ই এই পথ اَنَّ-এর পূর্বে একটি لَامٌ উহ্য ধরা হলে এটা ফাতাহ সহকারে পঠিত হবে। আর কাসরা সহ পাঠ করা হলে এটাকে مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নববাক্য বলে গণ্য করা হবে। যে পথের নির্দেশ দিয়েছি সেই পথ আমার সরল পথ। مُسْتَقِيْمًا এটা حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। সুতরাং তোমরা এটারই অনুসরণ করবে এবং ভিন্নপথসমূহ অর্থাৎ এটার বিপরীত কোনো পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে তাঁর দীন হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, বিমুখ করে ফেলবে। تَفَرَّقَ এতে একটি ت উহ্য রয়েছে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।

١٥٤. ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَثُمَّ لِتَرْتِيْبِ الْاَخْبَارِ تَمَامًا لِلنِّعْمَةِ عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ بِالْقِيَامِ وَتَفْصِيْلًا بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ اَىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ يُؤْمِنُوْنَ.

১৫৪. এবং মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ; ثُمَّ এটাকে এ স্থানে تَرْتِيْبُ الْاَخْبَارِ অর্থাৎ বিবরণ ক্রম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দিয়েছিলাম যা ছিল সৎকর্মপরায়ণের জন্য অর্থাৎ যারা এতদনুসারে আমল প্রতিষ্ঠা করে তাদের জন্য সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহের পূর্ণতা স্বরূপ এবং ধর্ম বিষয়ে যা কিছুর প্রয়োজন ছিল সেই সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ রহমত স্বরূপ যেন তারা অর্থাৎ বনী ইসরাঈল তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُفَسِّرَةٌ : اِلَّا-এর মধ্যে اَنْ টা اَنْ تِلَاوَتْ فِعْلُ-এর জন্য مُفَسِّرْ উর্দূতে يَعْنِىْ শব্দটি এর সমার্থবোধক। এটা اَنْ نَاصِبَةٌ নয়। কেননা نَاصِبَةٌ হওয়ার সুরতে عَطْفُ طَلَبٍ عَلَى الْخَبَرِ আবশ্যক হওয়ার কারণে عَطْفُ বৈধ হবে না, উল্লিখিত اَنْ-এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পছন্দনীয়–

১. اَنْ-টা مُفَسِّرَةٌ হবে। কেননা তার পূর্বে اَتْلُ রয়েছে যা قَوْلٌ-এর অর্থে হয়েছে। কেননা اَنْ مُفَسِّرَةٌ-এর জন্য قَوْلٌ বা قَوْلٌ-এর সমার্থবোধক হওয়া জরুরি। لَا হলো نَاهِيَةٌ আর تُشْرِكُوْا ফে'লটি হলো مُضَارِعْ مَجْزُوْمٌ

২. اَنْ টা মাসদারিয়া হবে। এ সুরতে اَنْ এবং তার অধীনস্থ বাক্যটি مَا حَرَّمَ থেকে بَدَلْ হবে।

قَوْلُهُ اِمْلَاقٌ : এর অর্থ হলো– দরিদ্রতা, ক্ষুধার্ত, অভাব, হতদরিদ্র।

قَوْلُهُ بِالْخَصْلَةِ : এর দ্বারা الَّتِىْ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ لِتَرْتِيْبِ الْاَخْبَارِ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. ثُمَّ اٰتَيْنَا-এর আতফ হয়েছে وَصّٰكُمْ-এর উপর যা اِعْطَاءُ كِتَابٍ لِمُوْسٰى-এর مُؤَخَّرٌ হওয়াকে বুঝায়। অথচ اِيْتَاءُ كِتَابٍ এটা অসিয়ত এর উপর مُقَدَّمٌ

উত্তর. এখানে ثُمَّ টা تَرْتِيْبُ اَخْبَارِىْ-এর জন্য, تَرْتِيْبُ وُجُوْدِىْ-এর জন্য নয়।

قَوْلُهُ لِلنِّعْمَةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَمَامًا টা مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। تَمَامًا টা اِتْمَام -এর অর্থে হওয়ার কারণে لَامْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ : এটা يُؤْمِنُوْنَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে। فَوَاصِل -এর প্রতি লক্ষ্য রেখে مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দুতিন রুকূ'ত অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফিল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোনো কোনো বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোনো কোনো বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, মকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে; নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কুরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম। [কাশ্‌শাফ] এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই-

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা; ২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা; ৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা; ৪. নির্লজ্জতার কাজ করা; ৫. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; ৬. এতিমের ধনসম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা; ৭. ওজন ও মাপে কম দেওয়া; ৮. সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা; ৯. আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং ১০ আল্লাহ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিকে-ওদিকে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : তাওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদি ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব তাওরাত বিসমিল্লাহর পর কুরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আলে ইমরানে মুহকাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরিয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোনো ধর্ম ও শরিয়তে এগুলোর কোনোটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি। -[তাফসীরে বাহরে-মুহীত]

এসব আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসিয়তনামা : তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোহরাঙ্কিত অসিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ অসিয়ত বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কে আছে, আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তাফসীর লক্ষ্য করুন।

আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ এতে تَعَالَوْا শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদের নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন, এস, যাতে আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোনো প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন; মু'মিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।
-[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে : এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে- اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا। অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরিকদের মতো দেবদেবীদের বা মূর্তিকে আল্লাহ মনে করো না। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো পয়গম্বরদের আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলো না। অন্যদের মতো ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খজনগণের মতো পয়গাম্বর ও ওলীদের জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এখানে شَيْئًا-এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক; এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে থেকে কোনোটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত, আনুগত্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজকর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করা ও কার্যত অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এ ছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ ইত্যাদি ঠিকমতো পড়া, নামযশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শেখ সাদী (র.) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন-

درین نوعے از شرک پوشیدہ است

کہ زیدم بخشید وعموم بخست

অর্থাৎ যায়েদ আমাকে দান করেছে এবং ওমর আমার ক্ষতি করেছে এমন বলার মধ্যেও একপ্রকার প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান। সত্য এই যে, দান ও ক্ষতি সব সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। যায়েদ কিংবা ওমর হচ্ছে পর্দা, যার ভেতর থেকে দান ও ক্ষতি প্রকাশ পায়। উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যদি সারা বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত হয়ে তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ তোমার জন্য অবধারিত করেননি, তবে তাদের তা করার সাধ্য নেই। পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের জিন ও মানব একজোট হয়ে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, তবে তা কারও পক্ষ সম্ভবপর নয়।

মোটকথা, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গাম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয় তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কুরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নেই। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহর ক্ষমা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এ কারণেই হাদীসে ওবাদা ইবনে সামেত ও আবুদ্দারদা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, যদিও তোমাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলা হয় অথবা শূলিতে চড়ানো হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় গুনাহ পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার : এরপর দ্বিতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে- وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতামাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতামাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরজ। কুরআন পাকের অন্যত্র একথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ এ আয়াতে পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়াকে শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে- اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতামাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, নামাজ মোস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এরপর কোনটি? উত্তর হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হলো, এরপর কোনটি? উত্তর হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, رَغِمَ اَنْفُهُ، رَغِمَ اَنْفُهُ ، رَغِمَ اَنْفُهُ অর্থাৎ সে লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

উদ্দেশ্য এই যে, বার্ধক্যাবস্থায় পিতামাতার সেবা-যত্ন দ্বারা জান্নাত লাভ নিশ্চিত। ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত, যে জান্নাত লাভের এমন সহজ সুযোগ হাত ছাড়া করে : সহজ সুযোগ এজন্য যে, পিতামাতা সন্তানের প্রতি স্বভাবতই মেহেরবান হয়ে থাকেন, সামান্য সেবা-যত্নেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিরাট কিছু করার দরকার হয় না। বার্ধক্যের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পিতামাতা যখন শক্ত-সমর্থ ও সুস্থ থাকেন, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন বরং সন্তানদেরও আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করেন, তখন তাঁরা সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী নন এবং এ সেবা-যত্নের বিশেষ কোনো মূল্যও নেই। তাঁরা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তখনকার সেবা-যত্নই মূল্যবান হতে পারে।

তৃতীয় হারাম সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতঃপূর্বে পিতামাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতামাতার দায়িত্ব। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে রাখা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের এবং তাদের উভয়কে জীবিকা দান করব।

জাহিলি যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষাণ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কুরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হতো। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়। এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতামাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। এ কাজে মানুষের কোনো হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব পিতামাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিজিক দান করে। বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতামাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতামাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরও রিজিক দেব

এবং তাদেরও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদের রিজিক এজন্য দেওয়া হয় যাতে তোমরা সন্তানদের পৌঁছে দাও; এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিজিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিজিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তানদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে- نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরও রিজিক দেব এবং তোমাদেরও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিজিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরও দেওয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও একপ্রকার সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গুনাহ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা যদ্দরুন সে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কুরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চেনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে, যারা সন্তানদের কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামি চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ : আয়াতে বর্ণিত হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনে যে কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فَوَاحِشْ শব্দটি فَاحِشَةٌ -এর বহুবচন। فُحْشٌ، فَحْشَاءُ ও فَاحِشَةٌ সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণত অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ যার অনিষ্টতা ও খারাবি সুদূরপ্রসারী। ইমাম রাগেব (র.) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজেরও নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অন্যত্র বলা হয়েছে- حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

যাবতীয় বড় গুনাহ فُحْشٌ ও فَحْشَاءُ -এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কুরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলো যাবতীয় বদভ্যাস, মুখ, হাত-পা ও অন্তরের যাবতীয় গুনাহই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেওয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই فَوَاحِشْ -এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে- مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فَوَاحِشْ -এর অর্থ হবে হাত-পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গুনাহ এবং অভ্যন্তরীণ فَوَاحِشْ -এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গুনাহ। যেমন- হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فَوَاحِشْ -এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর অভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পরনারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন অভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং অভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজকর্ম, যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণত স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেওয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ বিবাহ করা।

মোটকথা এই যে, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত গুনাহকে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাক, যেখানে গেলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দারা এসব গুনাহের পথ খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ حَامَ حَوْلَ حِمًى اَوْشَكَ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়। অতএব নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করাই হলো সতর্কতা।

পঞ্চম হারাম অন্যায় হত্যা : পঞ্চম হরাম বিষয় হচ্ছে অন্যায় হত্যা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। এ 'ন্যয়ভাবের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের খুন হালাল নয়। ১. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং ৩. সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলিফা হযরত উসমান গনী (রা.) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন আল্লাহর রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা জাহেলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোনো খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করব এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনো জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও?

বিনা কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোনো অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম যে, কোনো ইসলামি দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মি অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে। এ একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জোড় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতিমদের ধনসম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা : দ্বিতীয় আয়াতে এতিমদের ধনসম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতিমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতিমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে। তবে এতিমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশঙ্কা নেই- এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরি পন্থা। এতিমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতিমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

اَشُدٌّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমদের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরিয়ত মতে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধনসম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধনসম্পদ হেফাজত করার দায়িত্ব অভিভাবকের। ইতোমধ্যে যখনই ধনসম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে তখনই তার ধনসম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে ঐ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোনো কোনো ইমামের

মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া যাবে না, বরং শরিয়তের কাজী [বিচারক] তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন। এ বিষয়টি কুরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ অর্থাৎ এতিমদের মধ্যে বয়স্কপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমরা যদি এরূপ সুমতি দেখ যে, তারা স্বয়ং মালের হেফাজত করতে পারবে এবং কোনো কারবারে নিয়োগ করতে পারবে, তবে তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করে দাও। এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াই মাল সমর্পণের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং মালের হেফাজত ও কাজ কারবারের যোগ্যতাও শর্ত।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা : এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেবে না। -[রূহুল মা'আনী]

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপ কমবেশি করাকে কুরআন কঠোরভাবে হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহর আজাবে পতিত হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। -[ইবনে কাসীর]

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম : বলা হয়েছে- وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى অর্থাৎ **'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়।'** এখানে বিশেষ কোনো কথার উল্লেখ নেই। **তাই সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত।** কোনো ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি না করে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া- অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও লোকসানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। মকদ্দমার ফয়সালায় সাক্ষীদের শরিয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে "মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকীয় সমতুল্য।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাক্য তিনবার বলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ অর্থাৎ মূর্তিপূজার কুৎসিত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে দূরে সরে থাকে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা অবস্থায়।

এমনিভাবে অসত্য ফয়সালা সম্পর্কে আবূ দাউদ হযরত বরীদা (রা.)-এর রেওয়ায়েত ক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি বর্ণনা করেন। কাজি **[অর্থাৎ মকদ্দমার** বিচারক] তিন প্রকার। তন্মধ্যে একপ্রকার জান্নাতে ও দু প্রকার জাহান্নামে যাবে। যে কাজি শরিয়তের **নীতি অনুযায়ী মামলার** তদন্ত করে সত্য ঘটনার জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর তদনুযায়ী ফয়সালা করে সে জান্নাতি। পক্ষান্তরে যে **তদন্ত করে সত্য অবগত** হওয়ার পর জেনেশুনে অসত্য ফয়সালা করে, সে জাহান্নামি। এমনিভাবে যার কোনো জ্ঞান নেই কিংবা তদন্ত ও **চিন্তাভাবনায় ত্রুটি করে** এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকেই ফয়সালা করে, সেও জাহান্নামে যাবে।

সাক্ষ্য কিংবা **ফয়সালায় কারও** বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতার কোনো প্রভাব থাকা উচিত নয়; এ বিষয়টি কুরআনের অন্যান্য আয়াতে আরও পরিষ্কার ও তাকিদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ যদিও তোমার নিজের অথবা পিতামাতার ও আত্মীয়স্বজনের বিপক্ষে যায়, তবুও সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের অসত্য সাক্ষ্য দিতে কিংবা অন্যায় ফয়সালা করতে উদ্বুদ্ধ না করে। পারস্পরিক কথাবার্তায় ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ মিথ্যা না বলা, অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা এবং কষ্টদায়ক কিংবা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতিকারক কথাবার্তা না বলা।

নবম নির্দেশ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা : এ আয়াতে নবম নির্দেশ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং তা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কিত। বলা হয়েছে- وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে । তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল- بَلٰى অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক। এ অঙ্গীকারের দাবি হলো এই যে, প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর তাফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকিদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন, নযর, মানত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দারা মানত পূর্ণ করে। মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে- ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

তৃতীয় আয়াতে দশম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ এ শরিয়তে মুহাম্মাদী আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোনো পথে চল না। কেননা সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে هٰذَا শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আন'আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা এতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি তওহীদ, রিসালত এবং মূল বিধিবিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيْمٌ শব্দটি صِرَاطٌ-এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে حَالٌ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে- فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ তখন মনযিলে মকসুদের সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

এরপর বলা হয়েছে- وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ - سُبُلٌ শব্দটি سَبِيْلٌ-এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা এসব পথে চলো না। কেননা এসব পথ বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে, সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়বে।

তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে, কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যানধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে নিক এবং জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যানধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীত দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুসনাদে দারেমীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সরল রেখা টেনে বললেন, এটা আল্লাহর পথ। অতঃপর এর ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন, এগুলো سُبُلٌ [অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথসমূহ]। তিনি আরও বললেন, এর প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। এরা মানুষকে সরল পথ থেকে সরিয়ে এদিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ বিষয়ে জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযমী হও। আয়াতদ্বয়ের তাফসীর এবং এগুলোতে বর্ণিত দশটি নির্দেশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলো। উপসংহারে কুরআন পাকের এ বর্ণনা পদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত দশটি নির্দেশকে বর্তমান কালে প্রচলিত আইন গ্রন্থের মতো দশ দফায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি; বরং প্রথমে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণনা করার পর বলেছেন– ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অতঃপর চারটি নির্দেশ ব্যক্ত করার পর এ تَعْقِلُوْنَ এর স্থলে تَذَكَّرُوْنَ -এর পরিবর্তন সহ উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ নির্দেশটি একটি স্বতন্ত্র আয়াত উল্লেখ করে এ বাক্যটিকেই আবার تَذَكَّرُوْنَ -এর স্থলে تَتَّقُوْنَ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনা ভঙ্গিতে বহু তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, কুরআন পাক জগতের সাধারণ আইনসমূহের মতো একটি শাসকসুলভ আইন নয়, বরং সহৃদয় আইন। তাই প্রত্যেক আইনের সাথে তাকে সহজসাধ্য করার কৌশলও ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পরিচয়জ্ঞান ও পরকাল চিন্তাই মানুষকে নির্জনে ও জনসমক্ষে আইনের অনুগামী হতে বাধ্য করে। এ কারণেই তিনটি আয়াতের শেষভাগেই এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের চিন্তাধারণাকে বস্তুজগৎ থেকে আল্লাহ ও পরকালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

প্রথম আয়াতে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে– ১. শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা, ২. পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা, ৩. সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা, ৪. নির্লজ্জ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং ৫. অন্যায় হত্যা থেকে বিরত হওয়া। এগুলোর শেষে تَعْقِلُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা জাহিলি যুগে এগুলোকে কেউ দোষ বলে মনে করত না। তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৈতৃক কুপ্রথা ও ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

দ্বিতীয় আয়াতে চারটি নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে– ১. এতিমের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, ২. ওজন ও মাপে ত্রুটি না করা, ৩. কথাবার্তায় ন্যায় ও সততার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ৪. আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করা [যাঁর সাথে তোমরা অঙ্গীকৃত।]

এসব বিষয় পূরণ করা যে জরুরি, তা যে কোনো অজ্ঞ লোকও জানে এবং জাহিলি যুগের কিছু লোক তা পালন করত কিন্তু অধিকাংশই ছিল গাফিল। এ গাফলতির প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালকে স্মরণ রাখা। তাই এ আয়াতের শেষে تَذَكَّرُوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সরল পথ অবলম্বন করা এবং এর বিপরীত অন্য সব পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহভীতিই মানুষকে রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হতে পারে। তাই এর শেষে تَتَّقُوْنَ বলা হয়েছে।

তিন জায়গাতেই وَصّٰكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ জোর নির্দেশ। এ কারণেই কোনো কোনো সাহাবী বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোহরাঙ্কিত অসিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ তিনটি আয়াত পাঠ করে।

অনুবাদ :

١٥٥. وَهٰذَا الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ يَاۤ اَهْلَ مَكَّةَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ وَاتَّقُوا الْكُفْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

১৫৫. এ কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন আমি অবতারণ করেছি। এটা কল্যাণময়। সুতরাং হে মক্কাবাসী! এতে যা আছে তা অনুসারে আমল করত তারই অনুসরণ কর এবং কুফরি হতে বেঁচে থাক। হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।

١٥٦. اَنْزَلْنٰهُ لِ اَنْ لَّا تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَاۤئِفَتَيْنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ قِرَاءَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِنَا لَهَا اِذْ لَيْسَتْ بِلُغَتِنَا .

১৫৬. আমি এটা অবতারণ করেছি এজন্য যে, তোমরা যেন বলতে না পার যে, اَنْ এটা এ স্থানে হেতুবোধক। تَقُوْلُوْا -এর পূর্বে একটি 'না' বাচক لَا উহ্য রয়েছে। কিতাব তো আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা তো তাদের অধ্যয়ন সম্বন্ধে পঠন-পাঠন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম। اَنْ এটা مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ তাশদীদসহ রূঢ়রূপ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে রূপান্তরিত। এটার اِسْم অর্থাৎ উদ্দেশ্য এ স্থানে উহ্য। মূলত ছিল اِنَّا অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা। কেননা তা আমাদের ভাষায় না হওয়ায় আমরা এ সম্পর্কে জানতাম না।

١٥٧. اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّاۤ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج لِجَوْدَةِ اَذْهَانِنَا فَقَدْ جَاۤءَكُمْ بَيِّنَةٌ بَيَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ اَعْرَضَ عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْۤءَ الْعَذَابِ اَىْ اَشَدَّهُ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ .

১৫৭. কিংবা যেন তোমরা না বলতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা মেধার উৎকৃষ্টতার কারণে তাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম। এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ, বিবরণ পথ নির্দেশ, এবং যে ব্যক্তি এটার অনুসরণ করে তার জন্য রহমত এসেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমুখ হয় তা অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? না কেউ নেই। যারা আমার নিদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এই সত্য বিমুখতার জন্য আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কঠিন শাস্তি দেব।

١٥٨. هَلْ يَنْظُرُوْنَ مَا يَنْتَظِرُ الْمُكَذِّبُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بِالتَّاۤءِ وَالْيَاۤءِ الْمَلٰۤئِكَةُ لِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَىْ اَمْرُهُ بِمَعْنٰى عَذَابِهٖ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ط اَىْ عَلَامَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى السَّاعَةِ .

১৫৮. তারা কেবল এটারই লক্ষ্য করছে যে অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারীরা কেবল এটারই অপেক্ষা করে যে তাদের প্রাণ সংহারের জন্য তাদের নিকট ফেরেশতাগণ আসবে تَاْتِيَهُمْ শব্দটি تَاء এবং يَاء উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অথবা তোমার প্রতিপালক তাঁর নির্দেশ ও কুদরতের নিশানী নিয়ে আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন অর্থাৎ কিয়ামতের ইঙ্গিতবহ চিহ্নাদি আসবে।

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ وَهُوَ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا كَمَا فِي حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ الْجُمْلَةُ صِفَةُ نَفْسٍ اَوْ نَفْسًا لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط طَاعَةً اَيْ لَا تَنْفَعُهَا تَوْبَتُهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اَحَدَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ذٰلِكَ ـ

যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, এই নিদর্শন হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি তার বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ এ বাক্যটি نَفْس -এর صِفَتْ অর্থাৎ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমানে কোনো কল্যাণকর কাজ অর্থাৎ আনুগত্যের কাজ করেনি। সেদিন তার তওবা কবুল করা হবে না বলে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। বল এগুলোর যে কোনো একটির তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তার প্রতীক্ষা করছি।

١٥٩. اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِيْهِ فَاَخَذُوْا بَعْضَهُ وَتَرَكُوْا بَعْضَهُ وَكَانُوْا شِيَعًا فِرَقًا فِيْ ذٰلِكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَارَقُوْا اَيْ تَرَكُوْا دِيْنَهُمُ الَّذِيْ اُمِرُوْا بِهِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط فَلَا تَتَعَرَّضْ لَهُمْ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهِ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ ـ

১৫৯. যারা দীন সম্পর্কে মতবিরোধ করে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তারা তো তার কিছু অংশ গ্রহণ করেছে। আর তার কতক অংশ বর্জন করে বসেছে ফলে এ বিষয়ে নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে فَرَّقُوْا এটা অপর এক কেরাতে فَارَقُوْا রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে, যারা নির্দেশিত ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। এরা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের কোনো কাজের জবাবদিহি তোমার উপর নেই সুতরাং তুমি এদের পিছনে পড়িও না, তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তিনিই এদের তত্ত্বাবধায়ক অতঃপর তাদেরকে তিনি পরকালে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। অনন্তর তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতোক্ত বিধান مَنْسُوْخٌ অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে।

١٦٠. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ اَيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ج اَيْ جَزَاءُ عَشْرِ حَسَنَاتٍ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا اَيْ جَزَاؤُهٗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ يَنْقُصُوْنَ مِنْ جَزَائِهِمْ شَيْئًا ـ

১৬০. কেউ কোনো সৎকর্ম করলে অর্থাৎ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করলে সে তার দশগুণ পাবে অর্থাৎ দশটি সৎকাজের পরিমাণ প্রতিদান পাবে। এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে অনুরূপ অর্থাৎ কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে আর তারা অত্যাচারিতও হবে না। অর্থাৎ তাদের প্রতিদান হতে কিছুই হ্রাস করা হবে না।

١٦١. قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج وَيُبْدَلُ مِنْ مَحَلِّهِ دِيْنًا قِيَمًا مُسْتَقِيْمًا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১৬১. বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরলপথে পরিচালিত করেছেন, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত دِيْنًا এটা صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-এর مَحَلّ হতে بَدَل রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সরল ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٦٢. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ عِبَادَتِىْ مِنْ حَجٍّ وَغَيْرِهِ وَمَحْيَاىَ حَيَاتِىْ وَمَمَاتِىْ مَوْتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

১৬২. বল, আমার সালাত, আমার নুসুক অর্থাৎ হজ ও অন্যান্য সকল ইবাদত আমার জীবন হায়াত আমার মরণ মওত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

١٦٣. لَا شَرِيْكَ لَهُ ج فِىْ ذٰلِكَ وَبِذٰلِكَ اَىِ التَّوْحِيْدِ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ.

১৬৩. এতে তাঁর কেউ শরিক নেই। আমি তারই অর্থাৎ তাওহীদেরই আদিষ্ট হয়েছি এবং এই উম্মতের আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।

١٦٤. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا اِلٰهًا اَىْ لَا اَطْلُبُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَبُّ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ ط وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ذَنْبًا اِلَّا عَلَيْهَا ج وَلَا تَزِرُ تَحْمِلُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ اٰثِمَةٌ وِّزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ج ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে প্রতিপালক অর্থাৎ ইলাহ অন্বেষণ করব? না, আর কাউকেও আমি ইলাহ হিসাবে অন্বেষণ করব না। তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক, মালিক। প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ পাপাচারের জন্য দায়ী এবং কেউ কোনো প্রাণী অন্য কোনো প্রাণীর পাপের ভার নেবে না, وَازِرَةٌ অর্থ– পাপী। পাপের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

١٦٥. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ جَمْعُ خَلِيْفَةٍ اَىْ يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِيْهَا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ ط اَعْطَاكُمْ لِيَظْهَرَ الْمُطِيْعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِىْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন خَلَائِفَ এটা خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ এখানে তোমরা একজন অপর জনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাক এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন প্রদান করেছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে অনুগত আর কে অবাধ্য তা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে বিত্ত-বৈভব, মান-সম্মান ইত্যাদিতে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপালক পাপীদের ক্ষেত্রে শাস্তি দানে সত্বর। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে দয়াময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِ اَنْ لَا تَقُوْلُوْا : لَامْ এবং لَا উহ্য মানার দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সামাধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. اَنْ تَقُوْلُوْا টা اَنْزَلْنَاهُ-এর مَفْعُوْل لَهُ হওয়া অর্থগতভাবে বৈধ নয়, বরং عَدَمَ قَوْل হলো مَفْعُوْل لَهُ

উত্তর. এ প্রশ্নের সমাধান কল্পেই মুসান্নেফ (র.) হরফে জার لَامْ উহ্য মেনে اَنْزَلْنَاهُ-এর বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন এবং এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ টা হলো মাসদারিয়া, এ কারণেই تَقُوْلُوْا থেকে نُوْن পড়ে গেছে। কিসায়ী এবং ফাররা বলেন যে, اَنْ تَقُوْلُوْا মূলত ছিল لِاَنْ لَا تَقُوْلُوْا হরফে জর এবং حَرْف نَفْى -কে ফেলে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- لِئَلَّا رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ মূলত لِئَلَّا تَضِلُّوْا ; এমনি ভাবে আল্লাহর বাণী- يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا -এর মূল হলো لِئَلَّا تَمِيْدَ بِكُمْ ছিল ব্যাখ্যাকার (র.) এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন। আর বসরীগণ মুযাফ উহ্য হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। উহ্য ইবারত হলো- اَنْزَلْنَاهُ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَقُوْلُوْا বসরীগণ বলেন যে, لَا -কে ফেলে দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা جِئْتُ اَنْ اُكْرِمَكَ বলা জায়েজ নেই অর্থ اَنْ لَا اُكْرِمَكَ

قَوْلُهُ اَوْ تَقُوْلُوْا : এর عَطْف হলো পূর্বের اَنْ تَقُوْلُوْا -এর উপর, কাজেই এখানেও لَامْ এবং لَا উহ্য হবে।

قَوْلُهُ اَلْجُمْلَةُ صِفَةُ نَفْسًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ বাক্যটি نَفْسًا-এর সিফত اِيْمَانُهَا -এর নয়, যেমন নাকি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে প্রকাশ্যত সন্দেহ হয়। কেননা ঈমানের জন্য ঈমান আবশ্যক হবে, যা অসম্ভব।

قَوْلُهُ اَوْ نَفْسًا لَمْ تَكُنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَوْكَسَبَتْ-এর আতফ اٰمَنَتْ -এর উপর হয়েছে اِيْمَانُهَا -এর উপর নয়।

قَوْلُهُ اَىْ لَا تَنْفَعُهَا تَوْبَتُهَا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. এ আয়াত মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের মাযহাবের সত্যায়ন করে। কেননা তাদের মতে اِيْمَانٌ مُجَرَّدٌ عَنِ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ উপকারী হবে না।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, আয়াতটা لَفٌّ تَقْدِيْرِىْ -এর অন্তর্গত অর্থাৎ

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانٌ وَلَا كَسْبُهَا فِى الْاِيْمَانِ لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْهِ خَيْرًا

قَوْلُهُ جَزَاءُ عَشْرِ حَسَنَاتٍ : এ ইবারতে মুফাসসির (র.) فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا -এর মধ্যস্থ عَشْر শব্দের মধ্যে تَاء বিলুপ্ত করার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা প্রকাশ্য দিক থেকে عَشْرَةُ اَمْثَالِهَا হওয়া সমীচীন মনে হয়। কেননা مِثْل হলো مُذَكَّر বা পুংলিঙ্গ।

উত্তরের সার হলো, اَمْثَال টা অর্থগত দিক থেকে مُؤَنَّث বা স্ত্রীলিঙ্গ।

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْ مَحَلِّهِ : اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর প্রথম মাফঊল হলো هَدَانِىْ-এর শেষের ىَاء টি আর هَدَانِىْ হলো দ্বিতীয় মাফঊল। আর دِيْنًا قِيَمًا টা صِرَاط -এর مَحَل থেকে بَدَل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে مَفْعُوْل ثَانِىْ হওয়ার কারণে নয় যেমনটি কেউ কেউ এ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছেন।

قَوْلُهُ اَعْطَاكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَتَاكُمْ এটা اِيْتَاء হতে اِتْيَان থেকে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আন'আমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, [illegible] -এর যুক্তি ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছে, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে

নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মু'জিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়ের আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে। নাকি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় এ বিষয় সম্পর্কিত একটি আয়াত এরূপ- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ অর্থাৎ তারা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় তাদের কাছে এসে যাবেন, ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে এবং মানুষের জন্য জান্নাত ও দোজখের যা ফয়সালা হওয়ার, তা হয়ে যাবে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণত এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, এখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তিই পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু কোনো সৎকর্ম করেনি, সে এখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবা কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহর শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন পাকের অনেক আয়াতে বর্ণিত আছে যে, দোজখীরা দোজখে পৌঁছে ফরিয়াদ করবে এবং মুখ ভরে ওয়াদা করবে যে, আমাদেরকে পুনর্বার দুনিয়ার ফেরত পাঠানো হলে আমরা ঈমান আনব এবং সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই করব না। কিন্তু সবার উত্তরে বলা হবে যে, ঈমান ও সৎকর্মের সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন যা বলছ অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বলছ! কাজেই তা ধর্তব্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। -[বগভী]

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোনো কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোনটি কুরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এ নিদর্শন দেখার পর জগতের সব মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ সময় সম্পর্কেই কুরআন পাকে বলা হয়েছে তখনকার বিশ্বাস স্থাপন কারও জন্য ফলপ্রসূ হবে না।

সহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হযরত হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ২. বিশেষ একপ্রকার ধোঁয়া, ৩. দাব্বাতুল-আরদ, ৪.

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জালের অভ্যুদয়, ৭. ৮. ও ৯. প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং ১০. আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুসনাদে-আহমাদে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-আরদের আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী (র.) তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ ঘটনার অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ' বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পর সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় নাকি?

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

আল্লামা বিলকিনী প্রমুখ বলেন, এটাও অসম্ভব নয় যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় না হওয়ার এ নির্দেশটি শেষ জমানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে না, বরং কিছুদিন পর এ নির্দেশ বদলে যাবে এবং ঈমান ও তওবা আবার কবুল হতে থাকবে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

সারকথা, আলোচ্য আয়াতে যদিও নিদর্শন ব্যক্ত করা হয়নি, যা প্রকাশিত হওয়ার পর তওবা কবুল হবে না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা দ্বারা ফুটে উঠেছে যে, এ নিদর্শন হচ্ছে সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয়। কুরআন স্বয়ং একথা ব্যক্ত করল না কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে কুরআনের অস্পষ্টতাই গাফেল মানুষকে হুঁশিয়ার করার ব্যাপারে অধিক সহায়ক। ফলে তারা যে কোনো নতুন ঘটনা দেখেই হুঁশিয়ার হবে এবং দ্রুত তওবা করবে।

এছাড়া এ অস্পষ্টতার আরও একটি উপকারিতা এই যে, মানুষ আরও একটি ব্যাপারে সাবধান হতে পারবে। তা এই যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ফলে যেমন সমগ্র বিশ্বের জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তেমনি এর একটি নমুনা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগতভাবে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা তার মৃত্যুর সময় ঘটে।

কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে– وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْآنَ অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল হয় না, যারা গুনাহ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন বলে আমি এখন তওবা করছি। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ অর্থাৎ বন্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয়, যতক্ষণ না তার আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে [illegible] শুরু করে।

এতে বোঝা গেল যে, অন্তিম নিশ্বাসের সময় যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে যায়, তখন তওবা কবুল হয় না। এ পরিস্থিতিও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তাই আলোচ্য আয়াতে بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ বাক্যে মৃত্যুর সময়কেও [illegible] হয়েছে। তাফসীর বাহরে মুহীতে কোনো কোনো আলেমের এ উক্তি বর্ণিতও হয়েছে যে, مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার কিয়ামত তখনই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা কর্মজগৎ সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মের প্রতিফলের কিছু নমুনা কবর থেকেই শুরু হয়!

এখানে আরবি ভাষার দিক দিয়ে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে– اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ এরপর এ বাক্যটিকেই পুনরুক্তি করে বলা হয়েছে– يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا এখানে সর্বনাম [illegible] করে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। এতে বোঝা গেল যে, প্রথম বাক্যের কোনো কোনো নিদর্শন ভিন্ন এবং দ্বিতীয় বাক্যের [illegible] নিদর্শন ভিন্ন। এ দ্বারা পূর্ববর্ণিত হযরত হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত বিবরণের দিকে ইঙ্গিত [illegible] কিয়ামতের প্রধান নিদর্শন দশটি। তন্মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় সর্বশেষ নিদর্শন যা তওবার দরজা বন্ধ

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে– قُلِ انْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহর প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যদি তোমরা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকতে চাও তবে থাক, আমরাও এজন্য অপেক্ষা করব যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ الخ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাদের আল্লাহর সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের পথিকদের সাথে আপনার কোনোরূপ সম্পর্কে থাকা উচিত নয়। এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে; যেমন, মুশরিক, আহলে কিতাবদের অনুসৃত পথ আর কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদ'আতের পথ। এগুলো মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়। বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তাদের থেকে মুক্ত। তাঁর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অতঃপর তাদেরকে এই কঠোর শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে যে, তাদের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পিত রয়েছে। তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন।

আয়াতে উল্লিখিত 'ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং 'বিভন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যানধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেওয়া।

ধর্মে বিদ'আত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নেজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বিদ'আতিরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, বনী ইসরাঈলরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোজখে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হলো যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

তাবারানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারূকে আযম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, এ আয়াতে বিদ'আতি, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত রয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ إِلَى صِرَاطٍ الخ : আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কমবেশি করে এক ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্য ধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু-আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ অর্থাৎ আপনি বলে দিন আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মতো নিজ ধ্যানধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। [পালনকর্তা] শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবি। তোমরাও ইচ্ছা করলে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যও বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ এখানে قِيَمْ শব্দটি قِيَامٌ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ়। অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে এমন কোনো নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্ব সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে- إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا [আমি তোমাকে মানবজাতির নেতারূপে বরণ করব।]

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ.) আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং আরবের মুশরিকরা হাজারো ধরনের পাথরকে আল্লাহর অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এখানে نُسُكْ শব্দের অর্থ কুরবানি। হজের ক্রিয়া-কর্মকেও نُسُكْ বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই نَاسِكْ শব্দটি عابد [ইবাদতকারী] অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এ সবকটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সব ধরনের ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই- আমার নামাজ, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

এখানে দীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও দীনের স্তম্ভ। এরপর অন্য সব কাজ ও ইবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত যাঁর কোনো শরিক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পূত-পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে।

তাফসীরে দুররে-মানসূরে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, প্রত্যেক মুসলমান এ আয়াতটি বারবার পাঠ করুক এবং একে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুক।

এ আয়াতে বর্ণিত 'নামাজ এবং সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য নিবেদিত' কথাটির অর্থ এই যে, এগুলোতে শিরক, রিয়া অথবা কোনো পার্থিব স্বার্থের প্রভাব না থাকা চাই। জীবন ও মরণ আল্লাহর জন্য হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আমার জীবন ও

মরণ তাঁরই করায়ত্ত। কাজেই জীবনের কাজকর্ম ও ইবাদত তাঁরই জন্য হওয়া অপরিহার্য। এ অর্থও হতে পারে যে, যেসব কাজকর্ম জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য যেমন– নামাজ, রোজা, অপরের সাথে লেনদেনের অধিকার ইত্যাদি এবং যেসব কাজকর্ম মৃত্যুর সাথে জড়িত অর্থাৎ অসিয়ত ও মৃত্যু-পরবর্তী ব্যবস্থা, তা সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই বিধিবিধানের অনুগামী।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গাম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতারণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্টজগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে– اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না : চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরিক ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে– قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মতো আমিও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্টজগতের পালনকর্তা। আমার কাছে থেকে এরূপ পথভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে– لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইনকানুন দুনিয়ার মতো নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে, যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে এর কোনো অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে কিছুতেই দায়ী বা ধৃত করা হবে না। আয়াত দৃষ্টেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার উপর পিতামাতার অপরাধের কোনো দায়দায়িত্ব পতিত হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এক মৃত ব্যক্তির জানাজায় একজনকে কাঁদতে দেখে বললেন, জীবিতদের কাঁদার কারণে মৃতরা শাস্তি ভোগ করে। ইবনে আবী মুলায়কা (রা.) বলেন, আমি এ উক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি এমন ব্যক্তির এ উক্তি বর্ণনা করছ যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না এবং তাঁর নির্ভরযোগ্যতায়ও কোনোরূপ সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু মাঝে শুনতেও ভুল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের সুস্পষ্ট ফয়সালাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাহলো لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ একের পাপ অপরের ঘাড়ে চাপতে পারে না। অতএব জীবিত ব্যক্তির কাঁদার কারণে নিরপরাধ মৃত ব্যক্তি কেমন করে আজাবে থাকতে পারে? –[দুররে-মানসূর]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে অবশেষে তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে তোমাদের সব মতবিরোধেরই ফয়সালা শোনানো হবে। উদ্দেশ্য এই যে, বাকপটুতা ও জটিল আলোচনা পরিহার করা এবং পরিণাম চিন্তা করা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিয়ে সূরা আন'আম সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অতীত ইতিহাস ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিবৃত্তান্ত উপস্থিত করে ভবিষ্যতের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে– وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ خَلَائِفُ : وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কারও স্থলাভিষিক্ত ও গদিনশীন। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থলে অভিষিক্ত করেছেন। তোমরা আজ যে গৃহ ও সম্পত্তিকে নিজ মালিকানাধীন বল ও মনে কর, এরূপ নয় যে, কাল তাই তোমাদের মতো অন্য মানুষের মালিকানাধীন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সরিয়ে তোমাদেরকে তাদের স্থলে বসিয়েছেন। এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, তোমাদের মধ্যে সবাই সমান নয়; কেউ নিঃস্ব, কেউ সম্পদশীল, কেউ লাঞ্ছিত এবং কেউ সম্মানিত। এটাও জানা কথা যে, ধনাঢ্যতা ও মান-সম্মান মানুষের ক্ষমতাধীন ব্যাপার হলে কেউ নিঃস্ব ও লাঞ্ছিত হতে সম্মত হতো না। পদমর্যাদার এ পার্থক্যও তোমাদেরকে এ কথাই অবহিত করছে যে, ক্ষমতা অন্য কোনো সত্তার হাতে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব করেন, যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– لِيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্যের স্থলে অভিষিক্ত করা তাদের ধন-সম্পত্তির মালিক করা এবং সম্মান ও লাঞ্ছনার বিভিন্ন স্তরে রাখার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের চক্ষু খুলুক এবং এ বিষয়ের পরীক্ষা হোক যে, অন্যদেরকে হটিয়ে যেসব নিয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তোমরা সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ ও অনুগত হও, না অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হও।

ষষ্ঠ আয়াতে উভয় অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে– اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অবাধ্যকে দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং অনুগতদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সূরা আন'আমের শুরু হামদ দ্বারা হয়েছে এবং সমাপ্তি মাগফেরাতের দ্বারা হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হামদের তওফীক এবং মাগফেরাতের গৌরবে ভূষিত করুন।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূরা আন'আম সবটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এমন জাঁকজমকের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে করতে আগমন করেছেন। এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম (রা.) বলেন, সূরা আন'আম কুরআন পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সূরাসমূহের অন্যতম।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে রোগীর উপর সূরা আন'আম পাঠ করা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাময় করেন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. الٓمٓصٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ .

১. আলিফ, লাম, মী, সাদ। এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত।

٢. هٰذَا كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ ضَيِّقٌ مِّنْهُ اَنْ تُبَلِّغَهُ مَخَافَةَ اَنْ تُكَذَّبَ لِتُنْذِرَ مُتَعَلِّقٌ بِاُنْزِلَ اَيْ لِلْاِنْذَارِ بِهِ وَذِكْرٰى تَذْكِرَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ .

২. এ একটি কিতাব যা তোমার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে اِلَيْكَ [তোমার প্রতি] এ স্থানে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে তুমি এটা দ্বারা সতর্ক কর এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ। অর্থাৎ এটার সাহায্যে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং এটা একটি উপদেশ স্বরূপ এটাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অনন্তর তোমার মনে এটার সম্পর্কে অর্থাৎ এটার প্রচার সম্পর্কে তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে এ আশঙ্কায় কোনোরূপ দ্বিধা যেন না থাকে। لِتُنْذِرَ এটা اُنْزِلَ [অবতীর্ণ করা হয়েছে] ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٣. قُلْ لَّهُمْ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَيِ الْقُرْاٰنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَيِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ اَوْلِيَآءَ ط تُطِيْعُوْنَهُمْ فِيْ مَعْصِيَتِهٖ تَعَالٰى قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَتَّعِظُوْنَ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الذَّالِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِهَا وَمَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ .

৩. এদের বলে দাও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ তাকে ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না। অর্থাৎ অন্য কাউকে এমন অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পূর্বক তাদের অনুসরণ করতে শুরু করবে। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। تَذَكَّرُوْنَ এটা ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন ও ی অর্থাৎ নাম পুরুষ বহুবচন উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। এতে মূলত ذ অক্ষরে ت -এর اِدْغَامٌ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে। অপর এক কেরাতে ذ সাকিনসহও পঠিত রয়েছে। مَا -এটা زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। স্বল্পতার تَاكِيْد বা জোর বুঝাতে এ স্থানে এটার ব্যবহার হয়েছে।

٤. وَكَمْ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ مِّنْ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ اَهْلُهَا اَهْلَكْنٰهَا اَرَدْنَا اِهْلَاكَهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا عَذَابُنَا بَيَاتًا لَيْلًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ .

৪. আর কত জনপদকে অর্থাৎ তার অধিবাসীকে; كَمْ এটা خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। এ স্থানে মূলত مَفْعُوْل রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি ধ্বংস করছি। অর্থাৎ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেছি। অনন্তর তাদের উপর আমার পরাক্রম অর্থাৎ আমার শাস্তি আপতিত হলো রাত্রিতে অথবা তারা যখন বিশ্রামরত ছিল।

نَائِمُوْنَ بِالظَّهِيْرَةِ وَالْقَيْلُوْلَةُ اِسْتِرَاحَةُ نِصْفِ النَّهَارِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ اَىْ مَرَّةً جَاءَ هَا لَيْلًا وَمَرَّةً نَهَارًا .

অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে শয়নরত ছিল। অর্থাৎ আমার শাস্তি কখনো বা রাত্রিতে আপতিত হয়েছে আর কখনো বা দিনে আপতিত হয়েছে। قَائِلُوْنَ দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত। قَيْلُوْلَةٌ অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম গ্রহণ করা। এটার সাথে নিদ্রা বিজড়িত হওয়া জরুরি নয়।

৫. فَمَا كَانَ دَعْوٰهُمْ قَوْلُهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ .

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছে তখন তাদের ডাক অর্থাৎ কথা শুধু এটাই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।

৬. فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ اَىِ الْاُمَمَ عَنْ اِجَابَتِهِمُ الرُّسُلَ وَعَمَلِهِمْ فِيْمَا بَلَّغَهُمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ عَنِ الْاِبْلَاغِ .

৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে অর্থাৎ উম্মতগণকে আমি জিজ্ঞাসা করবই অর্থাৎ তারা রাসূলগণের আহ্বানের কি জওয়াব প্রদান করেছে, কতটুকু তা কবুল করেছে এবং তাদের নিকট যা পৌঁছেছে তদনুসারে কতটুকু তারা আমল করেছে এতদসম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও তাদের প্রচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব।

৭. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ لَنُخْبِرَنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ بِمَا فَعَلُوْهُ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ عَنْ اِبْلَاغِ الرُّسُلِ وَالْاُمَمِ الْخَالِيَةِ فِيْمَا عَمِلُوْا .

৭. অনন্তর তাদের নিকট সজ্ঞানে বিবৃত করবই। অর্থাৎ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবই। আর আমি তো রাসূলগণের প্রচার ও অতীত উম্মতগণের কার্যকলাপ হতে অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮. وَالْوَزْنُ لِلْاَعْمَالِ وَلِصَحَائِفِهَا بِمِيْزَانٍ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ كَائِنٌ يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ السُّؤَالِ الْمَذْكُوْرِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ن الْحَقُّ اَلْعَدْلُ صِفَةُ الْوَزْنِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ بِالْحَسَنَاتِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ .

৮. সেদিন অর্থাৎ উল্লিখিত জিজ্ঞাসাবাদের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমলসমূহের অথবা আমলনামাসমূহের ওজন ঠিকভাবেই অর্থাৎ ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে করা হবে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, তা মীযান ও দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করা হবে। তার একটি জিহ্বা [অগ্রভাগ, নোক] ও দুটি পাল্লা হবে। যাদের পাল্লা সৎকর্মাবলির কারণে ভারী হবে তারাই কল্যাণের অধিকারী হবে। সফলকাম হবে। يَوْمَئِذٍ -এর পূর্বে كَائِنٌ শব্দটি উল্লেখ করে মাননীয় তাফসীরকার এদিকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে তা এ স্থানে خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْحَقُّ এটা اَلْوَزْنُ -এর صِفَتٌ অর্থাৎ বিশেষণ।

৯. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ بِالسَّيِّاٰتِ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْآ اَنْفُسَهُمْ بِتَصْيِيْرِهَا اِلَى النَّارِ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ يَجْحَدُوْنَ .

৯. আর যাদের পাল্লা অসৎকর্মের দরুন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করত। অর্থাৎ ঐসমস্ত প্রত্যাখ্যান করত।

১০. وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ اَسْبَابًا تَعِيْشُوْنَ بِهَا جَمْعُ مَعِيْشَةٍ قَلِيْلًا مَا لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ تَشْكُرُوْنَ .

১০. হে আদম সন্তান! আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি مَعَايِشَ এটা ش -এর পূর্বে ى সহ পঠিত রয়েছে। এটা مَعِيْشَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ জীবনোপকরণসমূহ। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। مَا تَشْكُرُوْنَ -এর مَا টি স্বল্পতার تَاكِيْد অর্থাৎ জোর বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِلْإِنْذَارِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِتُنْذِرَ-এর মধ্যে لَامْ-এর পরে أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ উহ্য রয়েছে। কাজেই এ সংশয়েরও নিরসন হয়ে গেল যে, لِتُنْذِرَ-এর মধ্যে فِعْل-এর উপর حَرْفُ جَارٍ এসেছে। فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ এ বাক্যটি عِلَّتْ-এর مَعْلُوْل-এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَذِكْرٰى : এটা كِتَابٌ-এর উপর مَعْطُوْف হওয়ার কারণে উহ্যভাবে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। এটা اِسْمُ مَصْدَرْ উহ্য ইবারত হলো- هٰذَا كِتَابٌ وَتَذْكِرَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

قَوْلُهُ قُلْ لَهُمْ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করেছে যে, ইতঃপূর্বে সম্বোধন রাসূল ﷺ-এর দিকে ছিল এরপর হঠাৎ অন্যদের দিকে সম্বোধনকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো, যার জন্য প্রকাশ্যত কোনো কারণ বা করীনা ও বিদ্যমান নেই। এর উত্তরের জন্যই قُلْ لَّهُمْ-কে উহ্য মেনে اِلْتِفَاتْ-কে বিশুদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ : অর্থাৎ كَمْ خَبَرِيَّةٌ টা উহ্য ফে'লের মাফউল হয়েছে এবং এটা عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর অন্তর্গত। উহ্য ইবারত হলো- أَهْلَكْنَا كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

قَوْلُهُ أَرَدْنَا : প্রশ্ন. أَهْلَكْنَا-এর পূর্বে أَرَدْنَا উহ্য মানার মধ্যে কি উপকারিতা রয়েছে?

উত্তর. মুফাসসির (র.) أَرَدْنَا উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রশ্নের সারকথা হলো আল্লাহর বাণী- كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَنَا দ্বারা বুঝা যায় যে, إِهْلَاكْ বা ধ্বংস করা مُقَدَّمْ হবে আর فَجَاءَ بَأْسُنَا মুয়াখখার হবে। অর্থাৎ اهلاك যা হলো مُسَبَّبْ তা مُقَدَّمْ এবং مَجِيْئَتْ যা سَبَبْ তা مُؤَخَّرْ হয়েছে। অথচ سَبَبْ টা مُسَبَّبْ-এর مُقَدَّمْ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শাস্তির আগমন مُقَدَّمْ হয় আর ধ্বংস পরে হয়ে থাকে। আয়াত দ্বারা এর বিপরীত বুঝা যায়। মুফাসসির আলিমগণ এর বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। তন্মধ্য হতে একটি উত্তর মুফাসসির (র.) أَرَدْنَا উহ্য মেনে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আমি তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছি তখন তাদের উপর আমার শাস্তি নিপতিত হলো। উহ্য ইবারত হলো- أَرَدْنَا إِهْلَاكَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا

প্রশ্ন. কিন্তু এখানে এখনও একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়। তা এই যে, فَجَاءَنَا-এর মধ্যে فَاءْ টি হলো تَعْقِيْبِيَّةٌ যা শাস্তি ধ্বংসের পরে আসাকে বুঝায়। কাজেই পূর্বোক্ত প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে।

উত্তর. এই যে, فَاءْ কখনো তাফসীরের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কেননা ধ্বংসের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন কখনো মৃত্যু طَبْعِىْ-এর কারণে হয়ে থাকে। কখনো আগুনে পুরে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। কখনো পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। فَجَاءَنَا بَأْسُنَا বলে মৃত্যুর কারণের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আমার শাস্তির কারণেই হয়েছে।

قَوْلُهُ مَرَّةً جَاءَ لَيْلًا وَمَرَّةً نَهَارًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, أَوْ টা تَنْوِيْع-এর জন্য, সংশয়ের জন্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সন্দেহ-সংশয় মুক্ত।

প্রশ্ন. একটি حَالْ-কে যখন অপর একটি حَالْ-এর উপর عَطْف করা হয় তখন وَاوْ عَاطِفَةٌ নেওয়া জরুরি হয়। আর এখানে أَوْ هُمْ قَائِلُوْنَ-এর আতফ بَيَاتًا-এর উপর হয়েছে। কাজেই এর মাঝে وَاوْ عَاطِفَةٌ নেওয়া জরুরি ছিল।

উত্তর. أَوْ-টা تَنْوِيْع-এর জন্য যা মূলত হরফে আতফের মতোই। যদি وَاوْ عَاطِفَةٌ নেওয়া হতো তবে উহ্য ইবারত এরূপ হতো যে, أَوْ وَهُمْ قَائِلُوْنَ দুটি হরফে আতফ-এর একত্রিত হওয়া কঠিন হওয়ার কারণে وَاوْ-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ لِصَحَائِفِهَا : أَعْمَالْ-এর পরে صَحَائِفُ أَعْمَالْ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ঐ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, أَعْمَالْ যেহেতু اعْرَاضْ কাজেই তার ওজন সম্ভব নয়। জবাবের সার হলো, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো, صَحَائِفُ أَعْمَالْ আর صَحَائِفُ أَعْمَالْ-এর ওজনের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ لِسَانُ الْمِيْزَانِ : لِسَانُ الْمِيْزَانِ দ্বারা সাধারণত সেই সুচ বা কাটা উদ্দেশ্য হয় যা উভয় পাল্লার সমতাকে জানিয়ে দেয়। যখন উভয় পাল্লা পরিপূর্ণ রূপে সমান সমান হয়ে যায় তখন ঐ لِسَانٌ বা কাটা একেবারে ঠিক মাঝখানে এসে যায়।

قَوْلُهُ كَائِنٌ : এটাকে উহ্য মানার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْوَزْنُ হলো মুবতাদা আর يَوْمَئِذٍ টা كَائِنٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ صِفَةُ الْوَزْنِ : এতে সে সকল লোকদের উপর খণ্ডন করা হয়েছে যারা اَلْحَقُّ -কে اَلْوَزْنُ মুবতাদার খবর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা সে সুরতে অর্থ এই হবে যে, ওজন সেদিন সত্য তা ব্যতীত নয়। আর এটা হলো ভুল বা অশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আরাফ প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ২০৬ আয়াত এবং ২৪ রুকূ' রয়েছে। এ সূরায় আটটি আয়াত وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ থেকে وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ পর্যন্ত মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সঙ্গে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার এবং তার অনুসরণের কথা ছিল, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের আলোচনা দ্বারা। তাই ইরশাদ হয়েছে– الٓمّٓصٓ . كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ

এতদ্ব্যতীত বিগত সূরায়ে তাওহীদের বিবরণ ছিল অধিকতর, আর এ সূরায় রিসালাত বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে অধিক পরিমাণে। এ সূরার শুরুতে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হযরত হুদ (আ.), হযরত সালেহ (আ.), হযরত লূত (আ.) এবং হযরত শুআইব (আ.)-এর ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাদের উম্মতদের অন্যায় আচরণের শাস্তিস্বরূপ তাদের প্রতি আল্লাহর যে আজাব আপতিত হয়েছিল, তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারে যে, নবী-রাসূলগণের বিরোধিতার পরিণতি কত ভয়াবহ হয়। এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ফেরাউনের সাথে তাঁর যে মোকাবিলা হয়েছে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক মানবজাতি থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে, যা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। এরপর এ সূরার শেষে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণের তাগিদ রয়েছে।

সম্পূর্ণ সূরার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার বিষয়বস্তুর অধিকাংশই পরকাল ও নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত। শুরু থেকে ষষ্ঠ রুকূ' পর্যন্ত বেশির ভাগেই পরকালের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ' থেকে একুশতম রুকূ' পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা এবং তাঁদের উম্মতদের ঘটনাবলি, প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

الٓمّٓصٓ : আলিফ লাম মীম সোয়াদ এ অক্ষরগুলো সম্পর্কে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি তাই এ সম্পর্কে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন খ. ১ পৃ. ১৯৩]

অবশ্য এস্থানে الٓمّٓصٓ -এর অর্থ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রায় সকল তাফসীরকারগণ। ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ অক্ষরগুলোর অর্থ বলেছেন– أَنَا اللّٰهُ أَفْضَلُ আমি আল্লাহ উত্তম। অপর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– أَنَا اللّٰهُ أَعْلَمُ وَأَفْصِلُ আমি আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। আল্লামা আলূসী (র.) পূর্বোল্লিখিত কথাগুলোর বিবরণ দেওয়ার পর আরো লিখেছেন– তাফসীরকার যাহহাক বলেছেন, এর অর্থ হলো– أَنَا اللّٰهُ الصَّادِقُ আমি আল্লাহই সত্যবাদী। আর মুহাম্মাদ ইবনে কাআবুল কারাজী বলেছেন, এ অক্ষরগুলোর মধ্যে আলিফ এবং লাম আল্লাহ শব্দ থেকে এবং মীম রহমান শব্দ থেকে এবং সোয়াদ সামাদ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার এ অক্ষরগুলোর আরো অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাকই এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। –[তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ৮ ; পৃ. ৭৪]

قَوْلُهُ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ : প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; এ কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোনো সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরে সংকোচ অর্থ হলো কুরআন পাক ও এর নির্দেশনাবলি প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। –[মাযহারী]

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাজিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাজতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারও কারও মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কুরআন ও ইসলামি বিধিবিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই অন্তরের মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে– আপনার কর্তব্য শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না– এ দায়িত্ব আপনার নয়। অতএব আপনি অহেতুক মর্মাহত হবেন কেন?

قَوْلُهُ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে– যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কিনা? –[মাযহারী]

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছিয়েছি কিনা? তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন আমরা বলব, আপনি আল্লাহর পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কিনা। আমি উত্তরে বলব, পৌঁছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়। –[তাফসীরে মাযহারী]

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পয়গাম পৌঁছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে যায়।

قَوْلُهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ الخ : প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে– وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ অর্থাৎ সেদিন যে ভালোমন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিকভাবেই হবে। এতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভালোমন্দ কাজকর্ম কোনো জড়বস্তু নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমত পরম প্রভু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুই করতে পারেন। অতএব আমরা যা ওজন করতে পারি না, আল্লাহ তা'আলা তাও ওজন করতে পারবেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়ত আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দাঁড়িপাল্লা স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এতদ্ব্যতীত স্রষ্টার এ শক্তিও রয়েছে যে, তিনি আমাদের কাজকর্মকে জড় আকার আকৃতি দান করতে পারেন। অনেক হাদীসে এর প্রমাণও রয়েছে যে, বরযখ ও হাশরের ময়দানে মানুষের কাজকর্ম বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করে উত্থিত হবে। কবরে মানুষের সৎকর্মসমূহ সুশ্রী আকারে তাদের সহচর হবে এবং অসৎ কর্মসমূহ সাপ-বিচ্ছু হয়ে গায়ে জড়িয়ে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জাকাত দেয়নি, তার ধনসম্পদ বিষাক্ত সাপের আকারে কবরে পৌঁছবে এবং তাকে দংশন করতে করতে বলবে– আমি তোমার ধনসম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।

এমনিভাবে কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মানুষের সৎ কর্মসমূহ তাদের যানবাহন হবে এবং অসৎ কর্মসমূহ বোঝা হয়ে মাথায় চেপে বসবে। এক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– কুরআন পাকের সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান হাশরের ময়দান দুটি ঘন মেঘের আকারে এসে সেসব লোককে ছায়া দেবে, যারা এ সূরাগুলো পাঠ করত।

এমনি ধরনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর আমাদের সব ভালোমন্দ কাজকর্ম বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করবে এবং এক একটি পদার্থ-সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে কুরআন পাকের অনেক বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে– وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, তাকে সেখানে উপস্থিত পাবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ অর্থাৎ যে এক কণা পরিমাণও সৎকাজ করবে, কিয়ামতে তা দেখতে পাবে এবং যে এক কণা পরিমাণও অসৎকাজ করবে কিয়ামতে তাও দেখতে পাবে। এসবের বাহ্যিক অর্থ এই যে, মানুষের কাজকর্ম পদার্থ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে সামনে আসবে। কাজকর্মের প্রতিদান উপস্থিত পাবে এবং দেখবে এতে কোনো রূপক অর্থ করার প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় কাজকর্মসমূহকে ওজন করা কোনো অসম্ভব অথবা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সব কিছুকে উপস্থিত ও বাহ্যিক অবস্থার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে অভ্যস্ত। কুরআন পাক মানুষের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলে–

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ : অর্থাৎ তারা শুধু পার্থিব জীবনের পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বাহ্যিক ও পার্থিব জীবনে তারা আকাশ-পাতালের খবর রাখে, কিন্তু যেসব বিষয়ের বাস্তব স্বরূপ বিশুদ্ধরূপে উদ্‌ঘাটিত হবে সেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ওজন সংক্রান্ত বিষয়টিকে অস্বীকার করে না বসে তাই وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ কথাটি একান্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, যাতে বাহ্যদর্শী মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালে আমাদের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিয়ামতে আমলের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কুরআনের বহু আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিশদ বর্ণনায় হাদীসের সংখ্যাও প্রচুর।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ওজন হবে সবচাইতে বেশি। এ কালেমা যে পাল্লায় থাকবে তা সর্বাধিক ভারী হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সব আমলনামাই অসৎ কাজ এবং গুনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে– এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোনো অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোনো কোথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে– হায় পরওয়ারদিগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কালেমা 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না-মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে– ইয়া রব, অত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সংবলিত পাতাটি রাখা হবে। এতে কালেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হাল্কা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর নামের তুলনায় কোনো বস্তুই ভারী হতে পারে না। –[তাফসীরে মাযহারী]

মুসনাদে বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন, আমি তোমাদেরকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র অসিয়ত করছি। কেননা যদি সাত আসমান ও জমিন এক পাল্লায় এবং কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রা.) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিনের পাল্লা সবসময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপ কর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণত কুরআন পাকের এক আয়াতে আছে– وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। যদি একটি রাইদানা পরিমাণও ভালোমন্দ কাজ কেউ করে তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট। সূরা কারিয়াতে বলা হয়েছে– فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে দোজখ।

এসব আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে মু'মিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। –[তাফসীরে মাযহারী]

আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো বান্দার ফরজ কাজসমূহে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন দেখ, তার নফল কাজও আছে কিনা। নফল কাজ থাকলে ফরজের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

এসব আয়াত ও হাদীসের মর্ম এই যে, মু'মিন মুসলমানদের পাল্লাও কোনো সময় ভারী এবং কোনো সময় হাল্কা হবে। তাই তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, এতে বোঝা যায় যে, হাশরে দু'বার ওজন হবে। প্রথমে কুফর ও ঈমানের ওজন হবে। এর ফলে মু'মিন ও কাফের পৃথক হয়ে যাবে। এ ওজনে যার আমলনামায় শুধু ঈমানের কালেমাও থাকবে, তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাকে কাফেরদের দল থেকে পৃথক করা হবে। দ্বিতীয়বার নেকী ও পাপের ওজন হবে। তাতে কোনো মুসলমানের নেকী এবং কোনো মুসলমানের পাপ ভারী হবে এবং তদনুযায়ী তাকে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে সব আয়াত ও হাদীসের বিষয়বস্তু স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। -[বয়ানুল কুরআন]

আমলের ওজন কিভাবে হবে : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কুরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন- فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো ওজন স্থির করব না। -[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাঁর পা দুটি বাহ্যত যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশি হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে- দুটি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দুটি এই- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন- 'সুবহাল্লাহ' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায়, আর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে বাকি অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যাবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

এসব হাদীস দৃষ্টে আমলের ওজনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ মনে হয়। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আমলকারী মানুষের ওজন হবে। তারা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী হাল্কা কিংবা ভারী হবে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আমলনামারই ওজন করা হবে। আবার কোনো কোনো হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, আমলসমূহ বস্তুসত্তা বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোর ওজন করা হবে। ইবনে কাসীর এসব হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, বিভিন্ন রূপে একাধিকবার ওজন হওয়াও বিচিত্র নয়। এসব বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমল করার জন্য এ স্বরূপ জানা আদৌ জরুরি নয়; বরং এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের আমলেরও ওজন হবে। নেক আমলের পাল্লা হালকা হলে আমরা আজাবের যোগ্য হবো। তবে আল্লাহ তা'আলা কাউকে স্বীয় কৃপায় কিংবা কোনো নবী অথবা ওলীর সুপারিশে ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা।

যেসব হাদীসে বলা হয়েছে যে কোনো কোনো ব্যক্তি শুধু কালেমার বদৌলতে মুক্তি পাবে এবং সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সেগুলো উপরিউক্ত ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা সাধারণ নিয়েমের বাইরে কৃপা ও অনুকম্পার কারণে মুক্তি পাবে।

আলোচ্য দুটি আয়াতে পাপীদেরকে হাশরে লাঞ্ছনা ও আজাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সত্য গ্রহণ করতে ও তদনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য এবং মালিকসুলভ ক্ষমতা দান করেছি। অতঃপর তোমাদের জন্য ভোগ সামগ্রী উপার্জন করার হাজারো পথ খুলে দিয়েছি। রাব্বুল আলামীন যেন পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে চিত্তবিনোদনের আসবাবপত্র পর্যন্ত সব কিছুর একটা বিরাট গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এর ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূপৃষ্ঠে গুদামে সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ পন্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য। যেসব বোকা ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ এ গুদাম থেকে মাল বের করার পদ্ধতি জানে না, কিংবা বের করার পর নিয়ম বুঝে না, তারা এর উপকার থেকে বঞ্চিত থাকে। বুদ্ধিমান মানুষ এসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝে এ গুদাম থেকে লাভবান হয়।

মোট কথা মানুষের যাবতীয় আসবাবপত্র আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে এবং পার্থিব দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

অনুবাদ :

١١. وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ اَىْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ اَىْ صَوَّرْنَاهُ وَاَنْتُمْ فِىْ ظَهْرِهٖ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبَا الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ .

১১. আমিই তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের অর্থাৎ তাঁকে ও তোমাদেরকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে রেখে রূপ দান করি, তৎপর ফেরেশতাগণকে আদমের সেজদা করতে বলি। এটা ছিল আনত হয়ে অভিবাদনমূলক সেজদা। ইবলিস জিন জাতির আদি পিতা, সে তখন ফেরেশতাগণের মাঝে ছিল ব্যতীত সকলেই সেজদা করে। সে ইবলিস সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

١٢. قَالَ تَعَالٰى مَا مَنَعَكَ اَلَّا زَائِدَةٌ تَسْجُدَ اِذْ حِيْنَ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ .

১২. আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল اَلَّا-এর لَا শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। যে তুমি সেজদা করলে না? اِذْ এটা এ স্থানে حِيْنَ অর্থাৎ যখন, যে সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে বলল, 'আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে তুমি অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম হতে সৃষ্টি করেছ।'

١٣. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَمَا يَكُوْنُ يَنْبَغِىْ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ الذَّلِيْلِيْنَ .

১৩. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে অর্থাৎ জান্নাত হতে কেউ কেউ বলেন, আকাশ হতে নেমে যাও, এ স্থানে থেকে তুমি অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। অর্থাৎ এ স্থানে তোমার অহংকার করা উচিত নয়। সুতরাং এ স্থান হতে বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি অধমদের লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

١٤. قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اَخِّرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ اَىِ النَّاسُ .

১৪. সে বলল, 'যেদিন। মানুষ পুনরুত্থিত হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে সময় দাও, অবকাশ দাও।

١٥. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ اَىْ وَقْتِ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى .

১৫. তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে। অপর একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তুমি নির্দিষ্ট একটা সময় অর্থাৎ নাফখা-এ-উলা বা ইসরাফীলের প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত অবকাশ প্রাপ্ত হলে।"

١٦. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ اَىْ بِاِغْوَائِكَ لِىْ وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهٗ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ اَىْ لِبَنِىْ اٰدَمَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ اَىْ عَلَى الطَّرِيْقِ الْمُوْصِلِ اِلَيْكَ .

১৬. সে বলল, তুমি আমার সর্বনাশ করলে অর্থাৎ তোমা কর্তৃক আমার সর্বনাশের শপথ করে বলছি যে ; فَبِمَا -এর ب অক্ষরটি قَسَمِيَّةٌ বা শপথ অর্থ ব্যঞ্জক। সেহেতু আমি তোমার সরল পথে অর্থাৎ যে পথ তোমার সমীপে নিয়ে যায় সেই পথ তাদের জন্য আদম-সন্তানদের জন্য নিশ্চয়ই ওত পেতে থাকবে। لَاَقْعُدَنَّ এটা কসমের জওয়াব।

١٧. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ط اَىْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَاَمْنَعُهُمْ عَنْ سُلُوْكِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّأْتِىَ مِنْ فَوْقِهِمْ لِئَلَّا يَحُوْلَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ.

১৭. অতঃপর আমি তাদের উপর চড়াও হবোই, তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম সকল দিক হতে। অনন্তর এ সরল পথে চলতে তাদেরকে বাধা প্রদান করব। এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ অর্থাৎ বিশ্বাসী পাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বান্দার মধ্যে যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় সেহেতু ইবলিস মানুষের মাথার উপর দিয়ে এসে কোনো প্রকার চক্রান্ত করতে পারবে না।

١٨. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا بِالْهَمْزَةِ مَعِيْبًا اَوْ مَمْقُوْتًا مَّدْحُوْرًا ط مُبْعَدًا عَنِ الرَّحْمَةِ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ مِنَ النَّاسِ وَاللَّامُ لِلْاِبْتِدَاءِ اَوْ مَوَطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ وَهُوَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ اَىْ مِنْكَ بِذُرِّيَّتِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ وَفِى الْجُمْلَةِ مَعْنٰى جَزَاءِ مَنِ الشَّرْطِيَّةِ اَىْ مَنِ اتَّبَعَكَ اُعَذِّبُهُ.

১৮. তিনি বললেন, এ স্থান হতে দোষী ও বিতাড়িত অবস্থায় অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হতে বিদূরিত অবস্থায় বের হয়ে যাও مَذْءُوْمًا এটার ذ অক্ষরটির পর হামযাসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ দোষী হওয়া, ক্রোধ নিপতিত অবস্থায়। এদের অর্থাৎ মানুষের; لَمَنْ -এর لَامْ অক্ষরটি اِبْتِدَاء অর্থাৎ مُبْتَدَا -এর অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কসমের উপর ইঙ্গিতবহ। আর উক্ত কসম হলো لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা অর্থাৎ তোমার সন্তানসন্ততিসহ তুমি ও তোমার অনুসারী মানুষ সকলের দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। مِنْكُمْ এ স্থানে [كُمْ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন অর্থবোধক সর্বনাম উল্লেখ করত] تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ। অর্থাৎ অনুপস্থিতের উপর উপস্থিতদের প্রাধান্য দেওয়ার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ এ বাক্যটিতে পূর্বোল্লিখিত শর্তবাচক مَنْ -এর جَزَاء বা জওয়াবের অর্থ বিদ্যমান। আয়াতটির সারমর্ম হলো, যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি প্রদান করব।

١٩. وَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ فِى اُسْكُنْ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ بِالْاَكْلِ مِنْهَا وَهِىَ الْحِنْطَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

১৯. এবং তিনি বলেছেন, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী হাওয়া; এটা مَدّ অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরে উচ্চারিত হয় জান্নাতে বসবাস কর. اَنْتَ এটা اُسْكُنْ [বসবাস কর] ক্রিয়াস্থিত উহ্য সর্বনাম [তুমি]-এর تَاكِيْد [অর্থাৎ জোর সৃষ্টি] রূপে এবং পরবর্তী শব্দ [زَوْجُكَ] টিকে তার সাথে عَطْف বা অন্বয়ের উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এ বৃক্ষের অর্থাৎ এটা এতে কিছু আহারের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমার সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই বৃক্ষ ছিল গমের।

٢٠. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ اِبْلِيْسُ لِيُبْدِىَ يُظْهِرَ لَهُمَا مَا وُرِىَ فُوْعِلَ مِنَ الْمُوَارَةِ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا.

২০. অনন্তর শয়তান ইবলিস তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যেন সে গোপন করে রাখা তাদের লজ্জাস্থান উদ্ঘটিত করে দিতে পারে। প্রকাশ করে দিতে পারে।

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا كَرَاهَةَ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ اللَّامِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ اَىْ وَذٰلِكَ لَازِمٌ عَنِ الْاَكْلِ مِنْهَا كَمَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰى .

সে বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা এ স্থানে স্থায়ী হও সেই বিষয় পছন্দ না করার দরুন তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। ঐ বৃক্ষ হতে কিছু আহার করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এটাই অর্থাৎ ফেরেশতা হওয়া বা স্থায়ী হওয়া। অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, শয়তান বলেছিল, هَلْ اَدُلُّكُمَا عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰى অর্থাৎ আমি তোমরা উভয়কে সন্ধান দেব কি স্থায়িত্ব লাভ হওয়ার বৃক্ষের এবং এমন এক সাম্রাজ্যের যা কখনো জীর্ণ হবে না? وُرِىَ এটা مُوَارَاةٌ হতে গঠিত مَجْهُوْل বা কর্মপদবাচ্য ক্রিয়া। অর্থ যা গোপন রাখা হয়েছে। مَلَكَيْنِ এ শব্দটি لام -এর কাসরাসহও পঠিত রয়েছে। অর্থ রাষ্ট্রপতি।

২১. وَقَاسَمَهُمَا اَىْ اَقْسَمَ لَهُمَا بِاللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ فِىْ ذٰلِكَ .

২১. সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করল অর্থাৎ তাদের উভয়ের নিকট সে আল্লাহর নামে শপথ করে বলল নিশ্চয় আমি এ বিষয়ে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই একজন।

২২. فَدَلّٰهُمَا حَطَّهُمَا عَنْ مَنْزِلَتِهِمَا بِغُرُوْرٍ مِنْهُ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ اَىْ اَكَلَا مِنْهَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا اَىْ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاٰخَرِ وَدُبُرُهُ وَسُمِّىَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَوْأَةً لِاَنَّ انْكِشَافَهُ يَسُوْءُ صَاحِبَهُ وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ اَخَذَا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ لِيَسْتَتِرَا بِهِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ .

২২. অনন্তর সে তৎপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে তাদের উভয়কে নামিয়ে দিল, মর্যাদাচ্যুত করল। তারা যখন সেই বৃক্ষের অস্বাদ গ্রহণ করল অর্থাৎ তা হতে আহার করল। তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকটিত হয়ে পড়ল। অর্থাৎ নিজের ও অপরজনের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ল। লজ্জাস্থানকে আরবিতে سَوْأَةٌ [খারাপ, কষ্টকর] বলার কারণ হলো, তা অনাবৃত হওয়া সকলের নিকটই খারাপ লাগে। এবং তারা নিজেদের আচ্ছাদিত করার মানসে জান্নাতপত্র দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল। অর্থাৎ নিজেদের অঙ্গে তা চাপিয়ে ধরতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ তার শত্রুতা যে সুস্পষ্ট একথা তোমাদেরকে বলিনি? اَلَمْ এ স্থানে تَقْرِيْر অর্থাৎ বক্তব্যটিকে সুসাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

২৩. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا بِمَعْصِيَتِنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

২৩. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অবাধ্যাচারের মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

٢٤. قَالَ اهْبِطُوا اَىْ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَكَانُ اِسْتِقْرَارٍ وَّمَتَاعٌ تَمَتُّعٌ اِلٰى حِيْنٍ تَنْقَضِىْ فِيْهِ اٰجَالُكُمْ ـ

২৪. তিনি বললেন, কতকজন অন্য কতকজনের উপর জুলুম করায় তোমরা হে আদম ও হাওয়া তোমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সন্তানসন্ততিসহ একে অন্যের অর্থাৎ কতক আদম সন্তান অন্য কতকজনের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য অর্থাৎ জীবনের সময়সীমার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তোমাদের বসবাস অবস্থানস্থল ও জীবিকা রইল। যা তোমরা ভোগ করবে।

٢٥. قَالَ فِيْهَا اَيِ الْاَرْضِ تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ بِالْبَعْثِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ ـ

২৫. তিনি বললেন, সেখানেই অর্থাৎ পৃথিবীতেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে তথা হতে তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। تُخْرَجُوْنَ এটা بِنَاءُ لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্য ও بِنَاءُ لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্য উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ : প্রশ্ন. خَلَقْنٰكُمْ-এর মধ্যে সম্বোধন ছিল বনী আদমের দিকে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, خَلْق এবং تَصْوِيْر-এর সম্পর্ক বনী আদমের সাথে। অথচ خَلَقْنٰكُمْ -এর তাফসীর اَىْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ করার দ্বারা জানা যায় যে, خَلْق এবং تَصْوِيْر -এর সম্পর্ক হযরত আদম (আ.)-এর সাথে।

উত্তর. যেহেতু পূর্বে ফেরেশতাগণকে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি خَلَقْنٰكُمْ-এর মধ্যস্থ كُمْ দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য না হন তবে تَخْلِيْق এবং اَمْرٌ بِالسَّجْدَةِ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ ذُرِّيَّة تَخْلِيْق দ্বারা -এর বর্ণনা করা হচ্ছে আর তার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-কে এই সংশয়কে দূরীভূতকরণের জন্যই مُضَافْ উহ্য মানার প্রয়োজন হয়েছে।

قَوْلُهُ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ : প্রশ্ন. এ ইবারত বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো اِلَّا اِبْلِيْسَ-এর ইস্তেছনাকে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া।

প্রশ্ন. اِلَّا اِبْلِيْسَ দ্বারাই তো ইবলিসের সেজদা না করার বিষয়টি বুঝে আসে এরপরও لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ বলার হেতু কি?

উত্তর. اِلَّا اِبْلِيْسَ দ্বারা মুতলাক সেজদার نَفِىْ বুঝে আসে না, বরং শুধুমাত্র সেজদার হুকুম করার সময়কার نَفِىْ বুঝাচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, সে সময় সেজদা করেনি পরবর্তী সেজদা করেছে। যেমন– لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ বৃদ্ধি করা হলো তখন তার দ্বারা মুতলাক সেজদার نَفِىْ হয়ে গেল, অর্থাৎ ইবলিস সেজদার হুকুম কালেও সেজদা করেনি এবং পরেও সেজদা করেনি।

قَوْلُهُ زَائِدَةٌ : অর্থাৎ اِلَّا-এর মধ্যে لَا হলো অতিরিক্ত। অন্যায় উদ্দেশ্য হবে সেজদা করা থেকে নিষেধ করেছে কেননা نَفِىْ -এর نَفِىْ দ্বারা اِثْبَاتْ সাব্যস্ত হয়। অথচ এটা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَخِّرْنِىْ : اَنْظِرْنِىْ-এর তাফসীর اَخِّرْنِىْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْظِرْنِىْ অর্থ হলো অপেক্ষা করা, দেখা নয়। অন্যথায় অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি সংশয়ের অপনোদন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : সংশয় হলো এই যে, اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ বলে দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকার আবেদন করেছে, এরপর মৃত্যু নেই। এ আবেদন মঞ্জুর করে আল্লাহ তা'আলা اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ বলে ইবলিসের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর অর্থ হলো ইবলীস মৃত্যু থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। তার উপর মৃত্যু আসবে না। কেননা প্রথম ফুৎকার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকুল বিনাস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকুল জীবিত হয়ে যাবে। যেহেতু ইবলিস দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল তা মঞ্জুরও হয়েছে। এজন্য যে আল্লাহর বাণী اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

উত্তর : উত্তরের সার হলো اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ দ্বারা যদিও ইবলিসের আবেদন গ্রহণীয় হওয়া বুঝা যায়; কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম ফুৎকার যে সব কিছু বিনাশ হয়ে যাওয়ার ফুৎকার। কাজেই বুঝা গেল যে, ইবলিসও ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مَذْءُوْمًا بِالْهَمْزَةِ : অর্থ হলো مَعِيْبًا এক কেরাতে مَذْمُوْمًا ও রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلْاِبْتِدَاءِ : لَمَنْ تَبِعَكَ -এর لَامْ টি لَامِ اِبْتِدَائِيَّة তাকিদের জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ وَفِى الْجُمْلَةِ مَعْنَى الْجَزَاءِ : এ বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের জবাবে হয়েছে যে, لَمَنْ تَبِعَكَ টা جَزَاء বিহীন শর্ত হয়েছে। উত্তরের সার হলো– لَاَمْلَئَنَّ বাক্যটি جَزَاء -এর স্থলাভিষিক্ত। কাজেই شَرْطٌ بِدُوْنِ الْجَزَاءِ -এর প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল।

প্রশ্ন : উল্লিখিত বাক্যটিকে جَزَاء-এর স্থাভিষিক্ত না বলে সরাসরি جَزَاء বলা হলো কেন?

উত্তর : جُمْلَهْ يَمِيْنِيَّهْ টা যখন جَزَاء হয় তখন তাতে لَامْ আসে না। অথচ এখানে لَامْ এসেছে। এ কারণেই এ বাক্যকে جَزَاء বলার পরিবর্তে جَزَاء -এর স্থলাভিষিক্ত বলা হয়েছে। (تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ)

قَوْلُهُ اَوْ مُوَطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ : অর্থাৎ لَامْ টি উহ্য قَسَمْ -কে বুঝানোর জন্য হয়েছে। আর তা হলো لَاَمْلَئَنَّ অর্থাৎ اُقْسِمُ لَاَمْلَئَنَّ الخ

قَوْلُهُ وُوْرِىَ : এটা فُوْعِلَ -এর ওযনে اَلْمُوَارَاةُ থেকে। এতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন : যখন শব্দের শুরুতে দুটি وَاوْ একত্রিত হয়ে যায় এবং তাতে প্রথমটি مَضْمُوْم হয় তবে তাকে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা জরুরি। যেমন وُوَيْصِلُ যা وَاصِلُ-এর তাসগীর। প্রথম وَاوْ -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করে اُوَيْصِلُ করা হয়েছে।

উত্তর : এ নিয়ম সেই দুই وَاوْ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাতে উভয়টি হরকতযুক্ত হয় আর এখানে দ্বিতীয় وَاوْ টি سَاكِنْ বিধায় এখানে সেই নীতি প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ حَطَّهُمَا : এ তাফসীর لَازِمْ অর্থকে বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। কেননা اِرْسَالُ الشَّيْءِ مِنْ اَعْلٰى اِلٰى اَسْفَلَ -কে تَدْلِيَة বলে।

قَوْلُهُ اَىْ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ بِمَا اشْتَمَلْتُمَا : এটা দ্বারা একটি সংশয়ের আপনোদন করা হয়েছে।

সংশয় : اِهْبِطُوْا হলো বহুবচনের সীগাহ, অথচ সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্র দুজন তথা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.), কাজেই اِهْبِطَا হওয়া উচিত ছিল।

নিরসন : এর আপনোদনে বলা হয় যে, এখানে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে তাদের সন্তানসন্ততিসহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাজেই কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ : خَلَقْنٰكُمْ -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর থাকলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হযরত আদম (আ.)। বহুবচন আনার কারণ এই যে, যেহেতু তিনি সকল সন্তানাদি সংবলিত এবং আবুল বাশার বা সকল মানুষের পিতা এ কারণেই তাঁকে বহুবচনের যমীর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম আখফাশ (র.) বলেন, ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ -এর মধ্যে ثُمَّ টা وَاوْ অর্থে হয়েছে। اَلَّا تَسْجُدَ -এর মধ্যে لَا হরফে অতিরিক্ত অর্থাৎ اَنْ تَسْجُدَ অর্থাৎ তোমাকে সেজদা করা হতে কে বারণ করল? অথবা ইবারত উহ্য রয়েছে অর্থাৎ কে তোমাকে বাধ্য করল যে, তুমি সেজদা করলে না। −[ইবনে কাছীর, ফাতহুল কাদীর]

আরো বলা হয়েছে যে, مَنَعَ অর্থ হলো قَالَ অর্থাৎ إِلَى مَنْ قَالَ لَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ এবং এটাও বলা হয়েছে যে, مَنَعَ টা دَعَا অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مَا دَعَاكَ إِلَى اَنْ لَا تَسْجُدَ

শয়তান ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং স্বয়ং কুরআনের ভাষ্য মতেই সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আকাশে ফেরেশতাদের সাথে অবস্থানের কারণে সে ফেরেশতাগণকে প্রদত্ত সেজদার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আর এ কারণেই সে সেজদা না করায় তার থেকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। আর যদি সে উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হতো তবে তার থেকে কৈফিয়ত ও তলব করা হতো না এবং তাকে তথা হতে বিতাড়িতও করা হতো না।

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারায় চতুর্থ রুকূতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলিসের দোয়া কবুল হয়েছে কিনা। কবুল হয়ে থাকলে দুটি পরস্পর বিরোধী আয়াতের সামঞ্জস্য বিধান : ইবলিস ঠিক ক্রোধ ও গজবের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে– إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ। অর্থাৎ তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিত এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলিসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, নাকি অন্য কোনো মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ শব্দাবলিও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইবলিসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলিসের দোয়া কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

তাফসীরে ইবনে জারীরে সুদ্দী থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে–

فَلَمْ يُنْظِرْهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلٰكِنْ اَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَهُوَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ النَّفْخَةُ الْاُوْلَى فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ فَمَاتَ.

আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে হাশর দিবস পর্যন্ত অবসর দেননি বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সময়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত, যখন সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবুল হলে সে সময় একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলিস তখনও জীবিত থাকত। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যে সময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলিসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

ইবলিসের এ দোয়া ও كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ [পৃথিবীস্থ সবকিছু ধ্বংশীল] আয়াতের মধ্যে বাহ্যত যে পরস্পর বিরোধি ছিল, উপরিউক্ত বিশ্লেষণের ফলে তাও বিদূরিত হয়ে গেল।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, يَوْمُ الْبَعْثِ [পুনরুত্থান দিবস] ও يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ [নির্দিষ্ট দিবস] দুটি পৃথক পৃথক দিন। ইবলিস يَوْمِ يُبْعَثُ পর্যন্ত অবসর চেয়েছিল। তা সম্পূর্ণ কবুল হয়নি; বরং একে পরিবর্তন করে يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ অবসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ দুটি পৃথক পৃথক দিন। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় থেকে জান্নাত ও দোজখে প্রবেশ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ দিন হবে। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হবে। এসব বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্ক রেখে এ দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে পারে। উদাহরণত একে يَوْمَ نَفْخِ صُوْرٍ [শিঙ্গা ফুঁকার দিন] ও يَوْم فَنَاء [ধ্বংসের দিন]ও বলা যায় এবং يَوْمُ الْبَعْثِ [পুনরুত্থান দিবস] ও يَوْم جَزَاء [প্রতিদান দিবস] নামেও অবিহিত করা যায়। এতে সব খটকা দূর হয়ে যায়।

২৬. يٰبَنِىٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا اَىْ خَلَقْنَاهُ لَكُمْ يُّوَارِىْ يَسْتُرُ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط هُوَ مَا يَتَجَمَّلُ بِهٖ مِنَ الثِّيَابِ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الْحَسَنُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى لِبَاسًا وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ جُمْلَةُ ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ دَلَائِلُ قُدْرَتِهٖ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ .

২৭. يٰبَنِىٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ يُضِلَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اَىْ لَا تَتَّبِعُوْهُ فَتَفْتَتِنُوْا كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ بِفِتْنَتِهٖ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ حَالٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ اَيِ الشَّيْطٰنَ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ جُنُوْدُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط لِلَطَافَةِ اَجْسَادِهِمْ اَوْ عَدَمِ اَلْوَانِهِمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ اَعْوَانًا وَقُرَنَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

২৮. وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً كَالشِّرْكِ وَطَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ عُرَاةً قَائِلِيْنَ لَا نَطُوْفُ فِىْ ثِيَابٍ عَصَيْنَا اللّٰهَ فِيْهَا فَنُهُوْا عَنْهَا قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط اَيْضًا قُلْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ قَالَهٗ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ .

অনুবাদ :

২৬. হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান গোপন করার অর্থাৎ আচ্ছাদিত করার ও বেশ-ভূষার জন্য তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। رِيْشًا অর্থ ঐ সমস্ত পোশাক যেগুলো সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়। অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তাকওয়ার পরিচ্ছদই অর্থাৎ সৎকর্ম ও সদাচারই– لِبَاسُ এটা পূর্বোল্লিখিত لِبَاسًا শব্দটির عَطْف অন্বয় রূপে نَصْب সহকারে পাঠ করা যায়। আর رَفْع সহকারে পাঠ করা হলে এটা এস্থানে مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্যে রূপে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ذٰلِكَ خَيْرٌ এ বাক্যটি এটার خَبَرٌ বলে গণ্য হবে। সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অর্থাৎ তাঁর কুদরতের নিশানী ও চিহ্নসমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অনন্তর বিশ্বাস স্থাপন করে। لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ এ স্থানে [هُمْ ও يَذَّكَّرُوْنَ স্থিত সর্বনাম هُمْ -এ] خِطَابٌ বা সম্বোধনবোধক দ্বিতীয় পুরুষ হতে সংঘটিত হয়েছে।

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলোভিত না করে। তোমাদেরকে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট না করে। অর্থাৎ তোমরা এটার অনুসরণ করো না, যদি কর তবে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে পড়বে। যেমন তোমাদের পিতামাতাকে সে তদীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল। يَنْزِعُ বাক্যটি এ স্থানে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান প্রদর্শনের জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে অর্থাৎ শয়তান নিজে এবং তার দল তার বাহিনী তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। কেননা এরা অতি সূক্ষ্ম শরীরের অধিকারী বা এটার কারণ হলো এরা বর্ণহীন আকৃতিবিশিষ্ট। যারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক সাথী ও সাহায্যকারী করেছি।

২৮. যখন তারা কোনো অশ্লীল আচারণ করে যেমন শিরক, উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তওয়াফ; তারা বলত 'যে কাপড় পরিধান করে আমরা পাপকার্য করেছি তা শরীরে জড়িয়ে তওয়াফ করতে পারি না।' অনন্তর এটা হতে তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এটা করতে দেখছি এ বিষয়ে তাদেরকেই আমরা অনুসরণ করি। আর আল্লাহও আমাদেরকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন। এদেরকে বল, আল্লাহ অশ্লীল আচরণেরই নির্দেশ দেন না। যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে তেমন কিছুই বলছ? اَتَقُوْلُوْنَ [তোমরা কি বলছ?] এ স্থানে اِنْكَارٌ বা অস্বীকার ও নিষেধার্থে اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

٢٩. قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ اَلْعَدْلِ وَاَقِيْمُوْا مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَعْنٰى بِالْقِسْطِ اَىْ قَالَ اَقْسِطُوْا اَوْ اَقِيْمُوْا اَوْ قَبْلَهُ فَاَقْبِلُوْا مُقَدَّرًا وُجُوْهَكُمْ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اَىْ اَخْلِصُوْا لَهُ سُجُوْدَكُمْ وَّ ادْعُوْهُ اَعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط مِنَ الشِّرْكِ كَمَا بَدَاَكُمْ خَلَقَكُمْ وَلَمْ تَكُوْنُوْا شَيْئًا تَعُوْدُوْنَ اَىْ يُعِيْدُكُمْ اَحْيَاءً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

২৯. বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন সুবিচার অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠার। প্রত্যেক সালাত তোমাদের দিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঠিক রাখবে। وَاَقِيْمُوْا পূর্বোল্লিখিত শব্দ اَلْقِسْطِ -এর মর্মবোধক একটি শব্দের সাথে এটার عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। এটা ছিল اَقْسِطُوْا وَاَقِيْمُوْا অর্থাৎ তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর এবং সালাতে লক্ষ্য স্থির রাখ। কিংবা এটার পূর্বে اَقْبِلُوْا [সামনে লক্ষ্য কর, অগ্রসর হও] শব্দটি উহ্য রয়েছে। তার সাথে এটার عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যেই কেবল তোমাদের সেজদা ও সালাত নির্ধারিত করে নাও এবং তাঁরই আনুগত্যে শিরক হতে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাকবে, তাঁর ইবাদত করবে। তিনি যেভাবে তোমাদের সম্পর্কে প্রথমে শুরু করেছিলেন অর্থাৎ প্রথমে যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করছিলেন। অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না তেমনি তোমরা সেভাবে প্রত্যর্পণ করবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সেভাবে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করত ফিরিয়ে আনবেন।

٣٠. فَرِيْقًا مِنْكُمْ هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ط اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

৩০. তোমাদের একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্তি সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত শয়তানদের অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, অথচ নিজেদেরকে তারা সৎপথপ্রাপ্ত বলে মনে করে।

٣١. يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ عِنْدَ الصَّلٰوةِ وَالطَّوَافِ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا مَا شِئْتُمْ وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

৩১. হে আদম-সন্তান! প্রত্যেক মসজিদের অর্থাৎ সালাত ও তওয়াফের সময় তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর যা দ্বারা তোমাদের সতর আচ্ছাদিত করবে এবং যা তোমাদের ইচ্ছা হয় পানাহার কর কিন্তু অমিতাচার করবে না, তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَبَرُهُ جُمْلَةٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, একাকী خَيْرٌ শব্দটি খবর নয়; বরং বাক্য হয়ে خَبَرٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, لِبَاسُ التَّقْوٰى এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوٰى তথা سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِبَاسُ التَّقْوٰى এরপর বলেছেন- ذٰلِكَ خَيْرٌ

قَوْلُهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ : অর্থাৎ প্রকাশ্যের চাহিদা لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ছিল। কিন্তু বাক্যে ভারত্বকে দূর করার জন্য حَاضِرٌ থেকে غَيْبٌ -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ করেছেন।

قَوْلُهُ يَنْزِعُ حَالٌ : এটা حَال حِكَائِىٌّ যা তোমাদের পিতামাতার পূর্বের অবস্থাকে বর্ণনা করছে। কেননা نَزْعِ لِبَاسْ বা পোশাক খুলে ফেলা বের করার পূর্বে ছিল। উদ্দেশ্য হলো يَنْزِعُ টা اَبَوَيْكُمْ থেকে حَالٌ হয়েছে, সিফত নয়। কেননা يَنْزِعُ হচ্ছে نَكِرَة হওয়ার কারণে اَبَوَيْكُمْ -এর সিফত হতে পারে না। এজন্যই اَبَوَيْكُمْ থেকে حَالٌ বলা হয়েছে।

عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى قَوْلُهُ عَلَى مَعْنَى الْقِسْطِ : এই قِسْط -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হয়েছে কাজেই الْمُفْرَد -এর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

قَوْلُهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَكُمْ : অর্থাৎ حَالّ বলে مَحَلّ উদ্দেশ্য। কাজেই এখন এ সংশয় হবে না যে, أَخْذ زِيْنَتْ বা সৌন্দর্য গ্রহণ সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ عِنْدَ الصَّلٰوةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসজিদ বলে مَا يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ حَالّ বলে مَحَلّ উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইতঃপূর্বে পূর্ণ এক রুকু'তে হযরত আদম (আ.) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শয়তানি প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাতি পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমাদের পোশাক আল্লাহ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি– সমগ্র বনী আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ এখানে يُوَارِىْ শব্দটি مُوَارَاةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা। سَوْاٰتٌ শব্দটি سَوْءَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবগতভাবেই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে, وَرِيْشًا সাজসজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে رِيْش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয় কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজসজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার।

কুরআন পাক এ স্থলে اَنْزَلْنَا অর্থাৎ 'অবতারণ করা' শব্দ ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য, দান করা। এটা জরুরি নয় যে, আকাশ থেকে তৈরি পোশাক অবতীর্ণ হবে। যেমন অন্যত্র اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোহা অবতারণ করেছি। অথচ লোহা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে বের হয়। উভয়স্থলে اَنْزَلْنَا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন মানুষের কোনো কলাকৌশল ও কারিগরির প্রভাব থাকে না, তেমনি পোশাকের আসল উপাদান তুলা বা পশমের মধ্যে কোনো মানবীয় কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও প্রভাব নেই। এটা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার দান। তবে এগুলো দ্বারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য পছন্দসই পোশাক তৈরি করার মধ্যে মানবীয় কারিগরি অবশ্যই কাজ করে। এ কারিগরিও আল্লাহ তা'আলারই এমন দান, যার মূল সূত্র আল্লাহর তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা : আয়াতে পোশাকের দুটি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। ১. গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং ২. শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গসজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষাই নয়, অঙ্গসজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম-হওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানি প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকাবিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা : মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজ শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা : শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরিয়তে গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামাজ, রোজা ইত্যাদি সবই এর পরবর্তী করণীয়।

হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্তাঙ্গ আবৃত করি এবং সাজসজ্জা করি।

নতুন পোশাক তৈরির সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার ছওয়াব : তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকিনকে দান করে দেয়, সে জীবন ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে। -[ইবনে কাসীর]

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দুটি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষের স্বভাবগত কর্ম ক্রমোন্নতির নতুন দর্শন ভ্রান্ত : হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা এবং কুরআন পাকের এ বক্তব্য থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন এবং পোশাক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং জন্মগত প্রয়োজন। প্রথম দিন থেকেই এটি মানুষের সাথে রয়েছে। আজকালকার কোনো কোনো দার্শনিকের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন যে, মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা করত অতঃপর ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোশাকের একটি তৃতীয় প্রকার : গুপ্তাঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজসজ্জার জন্য দু-প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কুরআন পাক তৃতীয় একপ্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে- وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোনো কোনো কেরাতে যবর দিয়ে لِبَاسُ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْزَلْنَا-এর مَفْعُوْل হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু-প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহভীরুতাকে বোঝানো হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্তাঙ্গের জন্য আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজসজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎ কর্ম ও আল্লাহভীরুতারও একটি অভ্যন্তরীণ পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। একারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীতি ও সৎ কর্মবিহীন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যত পর্দার ভিতরেই আত্মগোপন করুক না কেন, পরিণামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। ইবনে জারীর হযরত উসমান (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যে ব্যক্তি কোনো কাজ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সে কাজের চাদর পরিধান করিয়ে তা প্রমাণ করে দেন। সৎকাজ হলে সৎকাজের কথা এবং অসৎকাজ হলে অসৎকাজের কথা প্রকাশ করেন। 'চাদর পরিধান করানোর' অর্থে এই যে, দেহে পরিহিত চাদর যেমন সবার দৃষ্টির সামনে থাকে, তেমনি মানুষের কাজ যতই গোপন হোক না কোন, তার ফলাফল ও চিহ্ন তার মুখমণ্ডল ও দেহে আল্লাহ তা'আলা ফুটিয়ে দেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন- وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

বাহ্যিক পোশাকেরও আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা : لِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ও সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এ আল্লাহভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাঁটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুসরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসত্ত্বেও পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ। অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে না দেয়, যেমন তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করেছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

আয়াতের শেষে বলেছেন– اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ এখানে قَبِيْلٌ শব্দের অর্থ– দলবল। এক পরিবারভুক্ত দলকে قَبِيْلَةٌ বলা হয় এবং সাধারণ দলকে قِسْطٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান তোমাদের এমন শত্রু যে, সে এবং তার দলবল তো তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না। কাজেই তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা তোমাদের উপর কার্যকরী হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

কিন্তু অন্যান্য আয়াতে একাথাও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে এবং শয়তানি চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকে, তাদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

এ আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে– আমি শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করি, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই কঠিন নয়।

কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, যে শত্রু আমাদেরকে দেখে এবং আমরা তাকে দেখি না, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করাই তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ পাক শয়তান ও তার দলবলের গতিবিধি দেখেন কিন্তু শয়তানরা তাঁকে দেখে না।

মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না একথাটি সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অলৌকিকভাবে কোনো মানুষ শয়তানকে দেখলে তা এর পরিপন্থি নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জিনদের আগমন করা, প্রশ্ন করা, ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً الخ : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশদের ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোনো কুরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানি কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি সেগুলো পরিধানর করে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবি। [এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশি বেআদবির কাজ। হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল]।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে–তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করত তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত, আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। فُحْش, فَحْشَاءُ ও فَاحِشَة এমন প্রত্যেক মন্দকাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট। –[তাফসীরে মাযহারী]

এ স্তরে ভালো ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। –[রূহুল মা'আনী]

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য দুটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। এক. বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ বাপ-দাদার তরিকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোনো তরিকার বৈধতার পক্ষে এটা কোনো প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদারা এরূপ করত। কেননা বাপ-দাদার তরিকা হওয়া যদি কোনো তরিকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট

হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়।

মোট কথা মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কুরআন পাক এখানে এর উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোনো মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটি সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে- قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ 'আপনি বলে দিন আল্লাহ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।' কেননা এরূপ নির্দেশ দেওয়া আল্লাহর প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থি। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে- أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহর প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কুরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা সর্বদা قِسْط -এর নির্দেশ দেন। قِسْط -এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমায় লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত শরিয়তের সব বিধিবিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قِسْط শব্দের অর্থ যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরিয়তরে সকল বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: ১. أَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং ২. وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে প্রথম বিধান مَسْجِدٌ শব্দটি সিজদা ও ইবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইবাদত ও নামাজের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাজের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে পালনকর্তার নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাজের জন্য হবে না, বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়, এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে, এমনকি গোপন শিরক অর্থাৎ লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়, এমনিভাবে শুধু অন্তরিকতা বাহ্যিক শরিয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না; বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরিয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরি। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরিয়ত ও তরিকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরিকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোনো দোষ নেই। বলাবাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

[illegible] বলা হয়েছে- كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, [illegible] তিনি পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোনো কঠিন [illegible] সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يُعِيْدُكُمْ -এর পরিবর্তে تَعُوْدُوْنَ বলেছেন। অর্থাৎ [illegible] কোনো কষ্টঃপরত ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। –[রূহুল মা'আনী]

[illegible] একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরিয়তের বিধানাবলিতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের [illegible] হয়ে যাবে। কেননা পরকাল ও কিয়ামত এবং তথায় ভালোমন্দ কর্মের প্রতিফল ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য

প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোনো আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– একদল লোককে তো আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে; অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর হেদায়েত যদিও সবার জন্য ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে– হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর– সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহিলি যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করত, তেমনি তারা হজের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। –[তাফসীরে ইবনে জারীর]

তাদের এ অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বেআদবি বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোনো ধর্ম কর্ম নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালজ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর। তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাজের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্য জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহ তা'আলার গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তাফসীরবিদ ও ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো বিশেষ ঘটনায় কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাজে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ : তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ [বায়তুল্লাহর তওয়াফও একপ্রকার নামাজ] এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তাফসীরবিদগণের মতে যখন مَسْجِدٌ বলে সিজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সিজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সিজদায় যখন নিষিদ্ধ হলো, তখন নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, চাদর পরিধান ব্যতীত কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামাজ জায়েজ নয়। –[তিরমিযী]

নামাজের জন্য উত্তম পোশাক : আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা, পোশাককে زِيْنَةٌ [সাজসজ্জা] শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এতদসঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করা কর্তব্য।

হযরত হাসান (রা.) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাই আমি পালনকর্তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন– خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থাৎ তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ কর। বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাজে সতর আবৃত করা ফরজ বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফজিলতও প্রমাণিত হয়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতা দৃষ্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাসআলাও জানা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্যটিও আরবদের হজের

দুনিয়াতে উৎকৃষ্ট পানাহারের জন্য [illegible] মনে করে বরং [illegible] দ্বীনের জন্য অবতীর্ণ হলেও [illegible] এখানেও অনেক [illegible] ও [illegible] প্রবর্তিত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরজ : প্রথমত শরিয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরজ ও জরুরি। [illegible] যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ [illegible] সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু অবৈধ হয় না : আহকামুল কুরআন জাসসাসের বর্ণনা মতে [illegible] থেকে একটি মাসআলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিশেষ বস্তু অবৈধ ও নিষিদ্ধতা শরিয়তরে কোনো প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ [illegible] হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। كُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে مَفْعُوْل অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় [illegible] প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এরূপ স্থলে مَفْعُوْل উল্লেখ না করে مَفْعُوْل -এর [illegible] প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার ঐসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালঙ্ঘন বৈধ নয় : আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوْا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারে অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত اِسْرَافٌ শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। সীমালঙ্ঘন দুরকম প্রকারের হতে পারে।

১. হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

২. [illegible] হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গুনাহ, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহর আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গুনাহ।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

[illegible] ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফিকহবিদগণ উদরপূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নাজায়েজ লিখেছেন। [আহকামুল কুরআন] এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরজ কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা এটাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে– اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ অর্থাৎ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে প্রয়োজনের চাইতে বেশি ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্যপন্থাই দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী : হযরত ওমর (রা.) বলেন, বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। এটি দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে মুক্ত। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না [অর্থাৎ যে বেশি পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী হয়]। আরও বলেন, মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দান করে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এক আয়াত দ্বারা ৭টি মাসআলা : আলোচ্য আয়াত দ্বারা শরিয়তের ৭টি মাসআলা প্রমাণিত হচ্ছে–

১. [illegible] প্রয়োজনে পানাহার ফরজ।

২. [illegible] কোনো দলিল দ্বারা কোনো জিনিসের হারাম হওয়া প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল।

৩. [illegible] আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোর ব্যবহার ইসরাফের অন্তর্ভুক্ত এবং অবৈধ।

৪. [illegible] আল্লাহ হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করা ইসরাফ এবং অত্যন্ত বড় গুনাহ।

৫. [illegible] পরিতৃপ্ত হওয়ার পরও খাদ্য গ্রহণ অনুচিত।

৬. [illegible] পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের ফলে দুর্বল হওয়া এবং ফরজ ওয়াজিব আদায়ে অক্ষম হওয়া।

৭. [illegible] ইসরাফ।

অনুবাদ :

٣٢. قُلْ اِنْكَارًا عَلَيْهِمْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطَّيِّبٰتِ الْمُسْتَلِذَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِالْاِسْتِحْقَاقِ وَاِنْ شَارَكَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ خَالِصَةً خَاصَّةً بِهِمْ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ حَالٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ ذٰلِكَ التَّفْصِيْلِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ فَاِنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا .

৩২. এদের দাবি অস্বীকার করে বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিশুদ্ধ সুস্বাদু জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, জাগতিক জীবনে অন্যরা শরিক থাকলেও অধিকার হিসাবে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। আর কিয়ামতের দিন তো বিশেষ করে এই সমস্ত কেবল মাত্র তাদেরই। خَالِصَةٌ এটা رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। حَالٌ রূপে نَصْب সহও এটার পাঠ রয়েছে। এরূপে অর্থাৎ যেমনি এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি সেভাবে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীলদের জন্য, আর এরাই মূলত এটা দ্বারা উপকৃত হয় নির্দেশসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই।

٣٣. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ الْكَبَائِرَ كَالزِّنَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَىْ جَهْرُهَا وَسِرُّهَا وَالْاِثْمَ الْمَعْصِيَةَ وَالْبَغْىَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ هُوَ الظُّلْمُ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ بِاِشْرَاكِهٖ سُلْطٰنًا حُجَّةً وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ مِنْ تَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَغَيْرِهٖ .

৩৩. বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন ভিতর ও বাহির সকল প্রকার অশ্লীলতা কবীরা গুনাহসমূহ যেমন ব্যভিচার আর পাপ অবাধ্যচার এবং মানুষের উপর অন্যায় সীমালঙ্ঘন, অর্থাৎ জুলুম করা, আল্লাহর সাথে শরিক করা যার সম্পর্কে অর্থাৎ যে শিরক সম্পর্কে কোনো সনদ কোনো প্রমাণ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জানা নাই। যেমন, যা তিনি নিষিদ্ধ করেননি তা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি।

٣٤. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ج مُدَّةٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ عَلَيْهِ .

৩৪. প্রত্যেক জাতির এক মেয়াদ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা তা হতে মুহূর্তকালও বিলম্ব এবং তার অগ্রে করতে পারবে না।

٣٥. يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الْمَزِيْدَةِ يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى الشِّرْكَ وَاَصْلَحَ عَمَلَهٗ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোনো রাসূল তোমাদের নিকট এসে নিদর্শন বিবৃত করে তখন যারা اِمَّا এটা মূলত ছিল اِنْ مَا শর্তবাচক اِنْ-এর نُوْن অক্ষরটিকে অতিরিক্ত مِيْم-এ اِدْغَام করে দেওয়া হয়েছে। শিরক হতে সাবধান হবে এবং স্বীয় আমল ও ক্রিয়াকলাপ সংশোধন করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তার পরকালে কোনোরূপ দুঃখিত হবে না।

٣٦. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا عَنْهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

৩৬. যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তা হতে নিজকে বড় মন করেছে অর্থাৎ অহংকার প্রদর্শন করেছে ফলে বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٣٧. فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ حَظُّهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ط مِمَّا كُتِبَ لَهُمْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْاَجَلِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا الْمَلٰئِكَةُ يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْا لَهُمْ تَبْكِيْتًا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا غَابُوْا عَنَّا فَلَمْ نَرَهُمْ وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ عِنْدَ الْمَوْتِ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ .

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অংশীদারিত্ব ও সন্তান আরোপ করতে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর নিদর্শন আল-কুরআন অস্বীকার করে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? না, আর কেউ নেই। তাদের নিকট তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ লওহে মাহফূজে তাদের রিজিক, জীবিকা, জীবনের মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার অংশ হিস্যা পৌছবেই, শেষে আমার প্রেরিতরা অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আসবেও লা-জওয়াবকরণার্থে বলবে, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে অর্থাৎ যাদের তোমরা উপাসনা করতে তারা কোথায়? তারা তখন বলবে, তারা হারিয়ে গেছে অন্তর্হিত হয়েছে, এদেরকে আমরা দেখি না এবং মৃত্যুর সময় তারা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী

٣٨. قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ادْخُلُوْا فِىْ جُمْلَةِ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ط مُتَعَلِّقٌ بِادْخُلُوْا كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ النَّارَ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط الَّتِىْ قَبْلَهَا لِضَلَالِهَا بِهَا حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا تَلَاحَقُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ وَهُمُ الْاَتْبَاعُ لِاُوْلٰهُمْ اَىْ لِاَجْلِهِمْ وَهُمُ الْمَتْبُوْعُوْنَ رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مُضَعَّفًا مِّنَ النَّارِ ط

৩৮. কিয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ দল গত হয়েছে তাদের মাঝে শামিল হয়ে তোমরাও অগ্নিতে প্রবেশ কর।' فِى النَّارِ এটা اُدْخُلُوْا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। যখনই কোনো দল অগ্নিতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দল যারা এদের পূর্বে ছিল তাদেরকে অভিসম্পাত করবে। কেননা এদের দ্বারা এরা পথ-ভ্রান্ত হয়েছিল। শেষে সকলে যখন তাতে একত্রিত হবে সমবেত হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ অনুসারীগণ পূর্ববর্তীগণের জন্য অর্থাৎ এদের অনুসৃতদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং এদেরকে দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুগুণ জাহান্নামের শাস্তি দাও।

قَالَ تَعَالٰى لِكُلٍّ مِّنْكُمْ وَمِنْهُمْ ضِعْفٌ عذاب مضعف وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مَا لِكُلٍّ فَرِيْقٍ ـ

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ও তারা প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুগুণ শাস্তি রয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকের জন্য কি রয়েছে সেই সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও। لَا يَعْلَمُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٣٩. وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لِاُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ لِاَنَّكُمْ لَمْ تَكْفُرُوْا بِسَبَبِنَا فَنَحْنُ وَاَنْتُمْ سَوَاءٌ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ـ

৩৯. তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেননা আমাদের কারণে তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করনি। সুতরাং আমরা ও তোমরা তো সমান। আল্লাহ তা'আলা এদের সকলকেই বলবেন, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন শাস্তির স্বাদ ভোগ করে নাও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنْكَارًا عَلَيْهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ حَرَّمَ-এর মধ্যে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ اللِّبَاسِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছে যে, زِيْنَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذَرِيْعَه زِيْنَتْ বা সৌন্দর্য গ্রহণের মাধ্যম।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ : خَالِصَةً-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে- ১. رَفْع এবং ২. نَصْب রফার সুরতে هِىَ মুবতাদার দ্বিতীয় খবর হবে, উহ্য ইবারত হবে- هِىَ ثَابِتَةٌ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আর حَالْ হওয়ার কারণে نَصْب হবে। উহ্য ইবারত হবে اِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا حَالَ كَوْنِهَا خَالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - ثَابِتَةً যরফের উহ্য যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ : এটা اَلْبَغْى-এর তাকিদ। অন্যথায় জুলুম তো অন্যায়ভাবেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ جُمْلَةً : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ اُمَمٍ টা جَارْ এবং مَجْرُوْر মিলে اُدْخُلُوْا-এর مُتَعَلِّقْ নয়; বরং উহ্য كَائِنِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اُدْخُلُوْا-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِضَلَالِهَا بِهَا : ضَلَالِهَا-এর যমীর اُمَّةٌ-এর দিকে এবং بِهَا-এর যমীর اُخْتْ-এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ تَلَاحَقُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِدَّارَكُوْا এটা বাবে تَفَاعُلْ হতে, تَاء-কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ-কে دَالْ-এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে এবং শুরুতে একটি هَمْزَه وَصْل যুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَجْلِهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِاُوْلٰهُمْ-এর لَامْ টা اَجَلْ-এর জন্য, قَالَتْ-এর صِلَه নয়। কেননা সম্বোধন আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সাথে নয়। কাজেই এ প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল যে, لَامْ যখন قَوْل-এর সেলাহ হয় তখন তার مَدْخُوْل টা قَوْل-এর مُخَاطَبْ হয়। অথচ هٰؤُلَاءِ এবং اَضَلُّوْنَا উভয়টি غَائِبْ-এর সীগাহ তার نَفِى করে।

قَوْلُهُ مَا لِكُلٍّ فَرِيْقٍ : এটা يَعْلَمُوْنَ-এর মাফঊল।

قَوْلُهُ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ : হয়তো এটা সর্দারগণের বাক্য অথবা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার বাক্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা হজের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহর زِينَت অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় : উদ্দেশ্য এই যে, কোনো বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয় যারা আল্লাহর হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয় যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) চারশ' গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (র.) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিলেন। যে বস্ত্র জোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না, মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোনো দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি : ১. রিয়া ও নামযশ এবং ২. গর্ব ও অহংকার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এবং আরও কয়েকজন সাহাবীর মামুলি পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকির-মিসকিনদের দান ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যা দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকিরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সুফি-বুজুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে আত্মার চিকিৎসা ও অহংবোধের প্রতিকারার্থে এ ধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সুফি-বুজুর্গই

পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য অধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত : খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য। তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোনো উপায়ে এমনকি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনেশুনে খারাপ করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে লেগে থাকা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মু'মিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালোমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে; বরং এখানে আল্লাহর রীতি এই যে, মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করালগ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নিয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে- قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আপনি বলে দিন সব পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনও মু'মিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না, এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মু'মিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচার অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নিয়ামত তারাও পায়, বরং আরও বেশি পায়; কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আজাবের কারণ হবে, কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানা রকম দুঃখকষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নিয়ামত লাভ করবেন, তাঁরা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবেন। এগুলোর সাথে কোনোরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোনো চিন্তাভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলি জ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়। ভালো পোশাক ও ভালো খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং

অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহর গজব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দুকুলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে–

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হরাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপ কাজ, অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোনো সনদ তোমাদের কাছে নেই।

এখানে إِثْم [পাপ কাজ] শব্দের আওতায় সেসব গুনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بَغْي [উৎপীড়ন] শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গুনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

এ বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করার কারণ দ্বিবিধ :

১. এতে প্রায় সব রকম হারাম কাজ ও গুনাহ পুরোপুরি এসে গেছে, তা বিশ্বাসগত হোক কিংবা কর্মগত, ব্যক্তিগত কর্মের গুনাহ হোক কিংবা অপরের অধিকার হরণ সম্পর্কিত হোক।

২. জাহিলি যুগের আরবরা এসব অপরাধ ও হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে তাদের মূর্খতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তারা হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকে এবং হারাম বস্তু ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধর্মে বাড়াবাড়ি এবং স্বকল্পিত বিদ'আতের এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে, যে ব্যক্তি এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে ধর্মের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে স্বাভাবতই গাফিল হয়ে যায়। তাই বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের ক্ষতি দ্বিমুখী হয়ে থাকে। ১. স্বয়ং বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ এবং ২. এর বিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম ও সুন্নত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় আয়াতে মুশরিকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। ১. হালালকে হারাম করা এবং ২. হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আজাব বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্বপ্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোনো আজাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে কোনো রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এ অবকাশেরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, তখন এক মুহূর্তও আগপাছ হয় না এবং তাদেরকে আজাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আজাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথে আজাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে মূল্য কিছু কমবেশি হতে পারবে কিনা? এখানে জানা কথা যে, বেশি মূল্য তার কাম্য নয়– কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশিও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٤٠. اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا عَنْهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ اِذَا عُرِجَ بِاَرْوَاحِهِمْ اِلَيْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُهْبَطُ بِهَا اِلٰى سِجِّيْنٍ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ فَتُفْتَحُ لَهُ وَيُصْعَدُ بِرُوْحِهِ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ يَدْخُلَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط ثَقْبِ الْاِبْرَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَكَذَا دُخُوْلُهُمْ وَكَذٰلِكَ الْجَزَاءُ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ بِالْكُفْرِ.

৪০. যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেকে বড় মনে করে এতদসম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করে, অনন্তর এটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না। মৃত্যুর পর যখন তাদের রূহ নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করা হবে তখন এ অবস্থা হবে। অনন্তর এগুলো সিজ্জীনে রক্ষিত করা হবে। পক্ষান্তরে হাদীসে যে মু'মিন বান্দাদের রূহের উদ্দেশ্যে আকাশের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং তা নিয়ে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উঠা হবে। এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র-পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। يَلِجَ অর্থ– প্রবেশ করবে। سَمِّ الْخِيَاطِ অর্থ– সুচের ছিদ্র পথ। অর্থাৎ এটা [সুচের ছিদ্র-পথে উষ্ট্রের প্রবেশ] যেমন অসম্ভব তেমনি এদের জান্নাত প্রবেশও অসম্ভব। এরূপ প্রতিফল আমি অপরাধীদেরকে তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে বিনিময় দেব।

٤١. لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ فِرَاشٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط اَغْطِيَةٌ مِنَ النَّارِ جَمْعُ غَاشِيَةٍ وَتَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ.

৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপর আচ্ছাদনও জাহান্নামের। مِهَادٌ অর্থ– শয্যা। غَوَاشٍ এটা মূলত ছিল غَوَاشِيٌ এটা غَاشِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– আচ্ছাদান। এটার শেষে উহ্য ى -এর পরিবর্তে তানবীন ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দেব।

٤٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ز طَاقَتَهَا مِنَ الْعَمَلِ اِعْتِرَاضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَرِهِ وَهُوَ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

৪২. আমি কাউকে তার সাধ্যায়ত ব্যতীত অর্থাৎ তার কাজের সামর্থ্যাতীত কিছুর ভার অর্পণ করি না; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। اَلَّذِيْنَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اُولٰئِكَ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। لَا نُكَلِّفُ এটা উক্ত مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ -এর মাঝে مُعْتَرِضَةٌ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٣. وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ حِقْدٍ كَانَ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ تَحْتَ قُصُوْرِهِمُ الْاَنْهٰرُ ج

৪৩. তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের পরস্পরে যে সাধারণ বিদ্বেষ ছিল তা দূর করে দেব। তাদের প্রাসাদসমূহের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী।

وَقَالُوا عِنْدَ الْاِسْتِقْرَارِ فِيْ مَنَازِلِهِمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا الْعَمَلِ هٰذَا جَزَاؤُهُ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ط حُذِفَ جَوَابُ لَوْلَا لِدَلَالَةِ مَا قَبْلِهِ عَلَيْهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ط وَنُوْدُوْآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اَنَّهُ اَوْ مُفَسِّرَةٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

এবং তারা তাদের আবাস-কুটিরে অবস্থান গ্রহণ করার পর বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এটার এই কাজের পথ দেখিয়েছিলেন। এটা তারই প্রতিদান ফল। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। لَوْلَا -এর জওয়াব এ স্থানে উহ্য। পূর্ববর্তী বাক্য مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ -এর প্রতি ইঙ্গিতবহ। আমাদের প্রভুর রাসূলগণ তো সত্যসহ আগমন করেছিলেন। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। اَنْ একে এ স্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন রূপে লঘুকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মূলত ছিল اَنَّهُ কিংবা এটা مُفَسِّرَةٌ অর্থাৎ ভাষ্যমূলক। পরবর্তী পাঁচটি স্থানেও [৫০ নং আয়াতে اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا পর্যন্ত।] এটার ব্যবহার তদ্রূপ।

٤٤. وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ تَقْرِيْرًا وَتَبْكِيْتًا اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا مِنَ الثَّوَابِ حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ كُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ نَادٰى مُنَادٍ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ اَسْمَعَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ .

৪৪. জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে নিজেদের দাবির প্রতিষ্ঠা ও তাদের লা-জওয়াব করার উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ছওয়াব ও পুণ্যফল দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক আজাব ও শাস্তি দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি? তারা বলবে, হ্যাঁ অতঃপর তাদের অর্থাৎ উভয় দলের মধ্যে জনৈক আজান দানকারী আজান দেবে অর্থাৎ তাদেরকে শুনিয়ে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দেবে নিশ্চয় জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

٤٥. اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهٖ وَيَبْغُوْنَهَا اَيْ يَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ عِوَجًا ج مُعْوَجَّةً وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ .

৪৫. যারা লোককে আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর ধর্মমত হতে বাধা দিত এবং তাতে উক্ত পথে দোষ-ত্রুটি অর্থাৎ বক্রতা অনুসন্ধান করতে তারাই ছিল পরকাল সম্পর্কে অস্বীকারকারী। يَبْغُوْنَ অর্থ– তালাশ করে, অনুসন্ধান করে।

٤٦. وَبَيْنَهُمَا اَيْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حِجَابٌ ج حَاجِزٌ قِيْلَ هُوَ سُوْرُ الْاَعْرَافِ وَعَلَى الْاَعْرَافِ وَهُوَ سُوْرُ الْجَنَّةِ رِجَالٌ اِسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ يَعْرِفُوْنَ كُلًّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .

৪৬. আর উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যে রয়েছে পর্দা প্রাচীর, কেউ কেউ বলেন, এটা হচ্ছে আ'রাফের দেয়াল। এবং আ'রাফে এটা হলো জান্নাতের প্রকার অবস্থানরত কিছু লোক থাকবে। হাদীস উল্লেখ আছে যে, এরা হলো তারা যাদের সৎ ও অসৎ কর্ম এক সমান হবে। তারা প্রত্যেককে অর্থাৎ জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে।

بِسِيْمٰهُمْ ج بِعَلَامَتِهِمْ وَهِيَ بَيَاضُ الْوُجُوْهِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوَادُهَا لِلْكٰفِرِيْنَ لِرُؤْيَتِهِمْ لَهُمْ اِذْ مَوْضِعُهُمْ عَالٍ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قَالَ تَعَالٰى لَمْ يَدْخُلُوْهَا اَيْ اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ فِيْ دُخُوْلِهَا قَالَ الْحَسَنُ لَمْ يَطْمَعْهُمْ اِلَّا لِكَرَامَةٍ يُرِيْدُهَا بِهِمْ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ بَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ فَقَالَ قُوْمُوْا اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .

তাদের চিহ্ন দ্বারা লক্ষণ দ্বারা চিনবে। লক্ষণ হলো, মু'মিনদের চেহারা হবে ফর্সা ধবধবে। আর কাফেরদের চেহারা হবে কালো মিসমিসে। এরা যেহেতু উঁচুতে অবস্থান করবে সেহেতু প্রত্যেককে দেখে চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা অর্থাৎ এই আ'রাফবাসীরা তখনও তাতে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষারত। হযরত হাসান বলেন, আল্লাহ এদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করার অভিপ্রায় করবেন বলেই তারা তখন জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করবে। হাকেম হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, এরূপই চলতে থাকবে। এর মধ্যে হঠাৎ আল্লাহ তাদের সামনে উদয় হবেন। বলবেন, চল, সকলেই তোমরা জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

٤٧. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ اَيْ اَصْحٰبِ الْاَعْرَافِ تِلْقَاۤءَ جِهَةَ اَصْحٰبِ النَّارِ ج قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي النَّارِ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

৪৭. যখন তাদের অর্থাৎ আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের সমক্ষে অর্থাৎ দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জাহান্নাম জালেমদের সঙ্গী করো না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْيَاءِ : প্রশ্ন. غَوَاشٍ এটা غَيْرُ مُنْصَرِفٌ এতে তানবীন হয় না।

উত্তর. এটা ইমাম সীবাওয়াইহ -এর নিকট কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না। প্রতিহত করার দলিল এই যে, غَيْرُ مُنْصَرِفٌ -এর উপর تَنْوِيْن تَمَكُّنْ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ تَنْوِيْن عِوَض নয়।

প্রশ্ন. غَوَاشٍ এটা جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ -এর সীগাহ নয়। কাজেই এটা غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হতে পারে না।

উত্তর. غَوَاشٍ যদিও فِي الْحَالِ চূড়ান্ত বহুবচন বা جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ -এর সীগাহ নয়; কিন্তু মূলত تَعْلِيْل-এর পূর্বে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ-এর সীগাহ ছিল। আর غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হওয়া تَعْلِيْل-এর উপর مُقَدَّمٌ বা অগ্রগামী। কাজেই تَعْلِيْل -এর পূর্বের অবস্থাই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ حَرْفُ جَوَابُ لَوْلَا : উহ্য ইবারত হবে এরূপ– لَوْلَا هِدَايَةُ تَعَالٰى لَنَا مَوْجُوْدَةٌ لَشَقِيْنَا وَمَا كُنَّا مُهْتَدِيْنَ

قَوْلُهُ اَوْ مُفَسِّرَةٌ : প্রশ্ন. اَنْ مُفَسِّرَةٌ-এর জন্য পূর্বে قَوْل হওয়া জরুরি যা এখানে বিদ্যমান নেই।

উত্তর. قَوْل বা قَوْل -এর সম অর্থ হওয়া জরুরি, আর এখানে نُوْدُوْا হলো قَوْل -এর সমার্থক। কাজেই কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ فِى الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ : এর মধ্যে প্রথম হলো ان تلكم الجنة আর শেষ হলো اَنْ اَفِيْضُوْا

قَوْلُهُ لَمْ يَدْخُلُوْهَا : এটা نَادَوْا-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই– যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলি নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদানুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলি অমান্য করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমাণ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আজাব ও ছওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মু'মিনদের কথা আলোচিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলির প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। তাফসীরে বাহরে-মুহীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের এক তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দাগণের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম 'ইল্লিয়্যীন' বলা হয়েছে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে– اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ অর্থাৎ মানুষের পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে। অর্থাৎ মানুষের সৎকর্মসমূহ পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহর বিশেষ দরবারে পৌঁছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই :

'রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাজায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন, মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করেন। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যান। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল (আ.) আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন, হে নিশ্চিন্ত আত্মা! পালনকর্তার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হতো এবং বলে ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে এবং দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়. এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রাখ এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা এবং ধর্ম ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয়– এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, ইনি আল্লাহর রাসূল! তখন একটি গায়েবি আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও,

জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কালো রঙ্গের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোনো কাঁটাবিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মু'মিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর কেবল هَاه هَاه لَا أَدْرِيْ [হায়, হায়, আমি জানি না] বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

মোটকথা, কাফেরদের আত্মা আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। ফলে সেখান থেকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, মৃত্যুর সময় তাদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

يَلِجَ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جَمَلٌ-এর অর্থ উট এবং سَمٌّ -এর অর্থ সুচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মতো বিরাট বপু জন্তু সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সুচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আজাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে– لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ - مِهَادٌ শব্দের অর্থ– বিছানা এবং غَوَاشٍ শব্দটি غَاشِيَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাদের শেষে كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ বলা হয়েছে। কেননা এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর নির্দেশাবলি যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরিয়তের নির্দেশাবলি সহজ করা হয়েছে কিন্তু তাদের জন্য সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কৃপাবশত এ কথাও বলা হয়েছে– لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরিয়তের নির্দেশাবলি নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে, সৎকর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা হয়েছে– আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলি প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

IslamiBoi.tk

জান্নাতিদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে : চতুর্থ আয়াতে জান্নাতিদের দুটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

১. نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ অর্থাৎ জান্নাতিদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোনো মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোনো কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কে পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবি করা হবে, সেগুলো টাকা-পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকি থাকে, তবে প্রাপকের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে।

এক হাদীসে পাওনা পরিশোধ ও প্রতিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরি নয়। ইবনে কাসীর ও তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব। যেমন, কোনো কোনো হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝরনার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পরস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধুয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (র.) কুরআন পাকের وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا আয়াতের তাফসীরেও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানির দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা.) একবার এ আয়াত পাঠ করে বললেন, আমি আশা করি, ওসমান, তালহা ও যুবায়র ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। [ইবনে কাসীর] বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পরস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

২. আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতিদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে– যদি আল্লাহ তা'আলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিল না। এতে বোঝা যায় যে, কোনো মানুষ কেবল নিজ প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কৃপা হয়। স্বয়ং প্রচেষ্টটুকুও তো তার [illegible] নয়। এটাও শুধু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর : ইমাম রাগিব ইস্পাহানী 'হেদায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হেদায়াত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ অসীম অনন্ত। তাই আল্লাহর নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হেদায়েতের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি এবং ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহমুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তর হেদায়েত। তাই হেদায়েত [illegible] থেকে কখনও কোনো মানব এমনকি নবী-রাসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের

শেষ পর্যন্ত إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্ন সহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা আল্লাহর নৈকট্যের স্তরের কোনো শেষ নেই। এমনকি আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়েত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা এটি হচ্ছে হেদায়েতের সর্বশেষ স্তর।

আ'রাফবাসী কারা? জান্নাতি ও দোজখিদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোজখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে।

১. সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসিরাত চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগে জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

২. মু'মিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে।

৩. মুনাফিকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে তাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মু'মিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে অগ্রসর হবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা বলবে পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঐ সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আজাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মু'মিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতে মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই–

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاۤءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .

এ আয়াতে জান্নাতি ও দোজখিদের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীকে سُوْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি আসলে শহর-প্রাচীরের অর্থে বলা হয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড় বড় শহরের চারদিকে খুব মজবুত ও অজেয় করে এ প্রাচীর তৈরি করা হয়। এসব প্রাচীরে রক্ষী সেনাদলের গোপন অবস্থানও তৈরি করা হয়। তারা আক্রমণকারীদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে।

قَوْلُهٗ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ : ইবনে জারীর ও অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতে حِجَاب বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে, যা সূরা হাদীদে سُوْر শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নাম আ'রাফ। কেননা আ'রাফ 'ওরফে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ দূর থেকে এ ভাগই 'মারূফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে তারা জান্নাত ও দোজখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরা কারা এবং এ মধ্যবর্তী স্থানে এদেরকে কেন আটক করা হবে? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি এবং একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য উক্তি এই যে, এরা ঐসব লোক, যাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান সমান হবে। তারা পুণ্যের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, কিন্তু পাপের কারণে তখনও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারাও জান্নাত প্রবেশ করবে।

অনুবাদ :

৪৮. وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا مِّنَ اَصْحٰبِ النَّارِ يَعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ مِنَ النَّارِ جَمْعُكُمْ اَلْمَالُ اَوْ كَثْرَتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ اَىْ وَاسْتِكْبَارُكُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ .

৪৮. আ'রাফবাসীগণ জাহান্নামবাসী যাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে সেই লোকদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের সমাবেশ অর্থাৎ বিত্ত-বৈভব বা লোক সংখ্যাধিক্য এবং তোমাদের অহংকার অর্থাৎ ঈমান সম্পর্কে তোমাদের ঔদ্ধত্য জাহান্নাম হতে বাঁচার ব্যাপারে তোমাদের কোনো কাজ আসল না।

৪৯. وَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مُشِيْرِيْنَ اِلٰى ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ اَهٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ط قَدْ قِيْلَ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ وَقُرِئَ اُدْخِلُوْا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَدَخَلُوْا فَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ اَىْ مَقُوْلًا لَهُمْ ذٰلِكَ .

৪৯. দুর্বল শ্রেণির মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করে এদেরকে তারা বলবে দেখ, এদের সম্বন্ধেই কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না? অথচ এদেরই বলা হয়েছে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। اُدْخُلُوْا এটা بِنَاءٌ لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে এবং دَخَلُوْا রূপেও পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় نَفْى অর্থাৎ না-বোধক বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এই বলে তাদেরকে জান্নাত প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে।

৫০. وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط مِنَ الطَّعَامِ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا مَنَعَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ .

৫০. আর জাহান্নামবাসীগণ জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা যেসব আহার্য বস্তু দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও। তারা বলবে আল্লাহ তা'আলা এ দুটি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য হারাম নিষেধ করে দিয়েছেন।

৫১. اَلَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ نَتْرُكُهُمْ فِى النَّارِ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا بِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ لَهُ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ اَىْ وَكَمَا جَحَدُوْا .

৫১. যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব জাহান্নামেই এদের পরিত্যাগ করে রাখব যেভাবে তারা সৎ আমল পরিত্যাগ করত এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করছিল। অর্থাৎ তারা যেমন অস্বীকার করেছিল [তেমন আমিও তাদেরকে ভুলে গেছি।]

৫২. وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ بِكِتٰبٍ قُرْاٰنٍ فَصَّلْنٰهُ بَيَّنَّاهُ بِالْاَخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ عَلٰى عِلْمٍ حَالٌ اَىْ عَالِمِيْنَ بِمَا فُصِّلَ فِيْهِ هُدًى حَالٌ مِنَ الْهَاءِ وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بِهٖ .

৫২. অবশ্য তাদেরকে অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে পৌঁছিয়েছি এক কিতাব আল-কুরআন বিশদভাবে অবহিতিসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুতি ও কাফেরদের প্রতি হুমকি ও বিভিন্ন কাহিনী এতে বিবৃত করে দিয়েছিলাম এবং যা ছিল এতদসম্পর্কে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুকম্পা। عَلٰى عِلْمٍ এটা এ স্থানে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। هُدًى এটা فَصَّلْنٰهُ -এর কর্মবাচক সর্বনাম ه হতে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٣. هَلْ يَنْظُرُونَ مَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ط عَاقِبَةَ مَا فِيهِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ تَرَكُوا الْإِيمَانَ بِهِ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ج فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ هَلْ نُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ نُوَحِّدُ اللّٰهَ وَنَتْرُكُ الشِّرْكَ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا قَالَ تَعَالَى قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ إِذْ صَارُوا إِلَى الْهَلَاكِ وَضَلَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مِنْ دَعْوَى الشَّرِيكِ.

৫৩. তারা কেবল তার তাবীল অর্থাৎ তার শেষ পরিণাম লক্ষ্য করছে প্রতীক্ষা করছে। যেদিন তার পরিণাম বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সেদিন যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিল অর্থাৎ সম্পর্কে ঈমান আনয়ন পরিহার করেছিল তারা বলবে, আমাদের প্রভুর রাসূলগণ তো সত্য সত্যই আগমন করেছিলেন। আমাদের কি এমন কোনো সুফারিশকারী আছে যে, আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে? যেন পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্ন কিছু করতে পারি, আল্লাহর একত্ব স্বীকার এবং শিরক পরিত্যাগ করতে পারি। এ কথার উত্তরে তাদেরকে বলা হবে, না, কিছুই করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে কারণ তারা ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হয়েছে এবং শিরকের দাবি করে তারা যে মিথ্যা রচনা করত তাও উধাও হয়ে গেছে, অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ : অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ كَانُوْا عُظَمَاءَ فِى الدُّنْيَا فَيُنَادُوْنَهُمْ يَا اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَيَا وَلِيْدَ بْنَ مُغِيْرَةَ وَيَا فُلَانُ وَيَا فُلَانُ وَهُمْ فِى النَّارِ আসহাফে আ'রাফ সে সকল লোকদের নাম ডেকে ডেকে বলবেন যে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে নেতা বলা হতো, তোমাদের একতা, ধনসম্পদ, মান-মর্যাদার কি হলো? যা নিয়ে তোমরা গর্ব-অহংকারে লিপ্ত ছিলে, আজকে সেগুলো তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قَوْلُهُ مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ : এখানে مَا টি হলো اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخِيْ অর্থাৎ اَيُّ شَيْءٍ اَغْنٰى আবার مَا টা نَافِيَه ও হতে পারে। অর্থাৎ সেগুলো তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قَوْلُهُ اِسْتِكْبَارًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا كُنْتُمْ -এর مَا টি মাসদারিয়া, কাজেই عَدَم عَائِدْ -এর সংশয় শেষ হয়ে গেল। আবার কেউ কেউ اِسْتِكْبَارًا-এর অর্থ নিয়েছেন খারাপ মনে করা। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আল্লামা সুয়ূতী (র.) দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ الخ এটাও আ'রাফবাসীদের উক্তি।

قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ বাবে اِفْعَالٌ হতে مَاضِى مَجْهُوْل এবং دَخَلُوْا বাবে نَصَرَ হতে مَاضِى مَعْرُوْف এ উভয় কেরাতই شَاذٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। যার প্রতি قُرِئَ বলে ইঙ্গিত করেছেন। এ উভয় কেরাতের বিশুদ্ধতার জন্য قَوْل উহ্য মানার প্রয়োজন নেই। কেননা তখন কোনো تَاوِيْل ব্যতীতই খবর হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ : উদ্দেশ্য হলো لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ বাক্য এবং اُدْخُلُوْا -এর ফায়েলের ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنَعَهُمَا : حَرَّمَهُمَا -এর তাফসীর مَنَعَهُمَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, حَرَّمَ টা مَنَعَ -এর অর্থে হয়েছে। কেননা হালাল ও হরামের স্থান হলো পৃথিবী পরকাল নয়।

قَوْلُهُ نَتْرُكُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نِسْيَانٌ দ্বারা তার لَازِمِيْ অর্থ তথা পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য نِسْيَانٌ অসম্ভব।

قَوْلُهُ اَىْ وَكَمَا جَحَدُوْا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ -এর আতফ كَمَا نَسُوْا لِقَاۤءَ -এর উপর করা ঠিক নয়। কেননা مَعْطُوْف عَلَيْه হলো مَاضِىْ আর مَعْطُوْف হলো মুযারে'।

উত্তর. مُضَارِعْ -এর উপর যখন كَانَ প্রবিষ্ট হয় তখন তা মাযীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজেই عَطْف সঠিক হবে।

قَوْلُهُ عَاقِبَةُ مَا فِيْهِ : এখানে فِيْه -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো কুরআন। অর্থাৎ এখন তাদেরকে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত অঙ্গীকার এবং ভীতির পরিণামের সত্যতারই অপেক্ষা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاۤءَ اَصْحٰبِ النَّارِ "যখন আ'রাফবাসীর চোখ দোজখীদের দিকে ফেরানো হবে" তাই আলোচ্য আয়াতে আ'রাফবাসীগণ দোজখীদের সঙ্গে যে কথা বলবেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ অর্থাৎ আ'রাফবাসীগণ দোজখীদের মধ্যে যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবল, তোমাদের অর্থসম্পদ এবং তোমাদের অহংকার আজ তোমাদের কোনো কাজে লাগল না। এই মহাবিপদের মুহূর্তে তোমাদের কোনো উপকারেই আসল না।

يَعْرِفُوْنَهُمْ মূলত দোজখীদের চোখে-মুখে দোজখের জ্বালা-যন্ত্রণা এবং পরিচয় প্রকাশ পাবে এবং তাদেরকে চিনতে আদৌ কোনো কষ্ট হবে না। তাই ইরশাদ হয়েছে- আ'রাফবাসীগণ তাদেরকে দেখেই চিনবে। কেননা, যারা কোপগ্রস্ত তাদের চেহারায় তার চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে।

সাধারণত মানুষ অর্থসম্পদ তথা ধনবল বা জনবল অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কারণে অহংকার করে, কিন্তু ধনবল বা জনবল এবং ক্ষমতা মানব জীবনে নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। জীবন যখন ক্ষণস্থায়ী, জীবনের সামগ্রী ও ক্ষণস্থায়ী। অতএব, এসবের উপর ভিত্তি করে অহংকার করা বোকামি ব্যতীত আর কিছু নয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম যখন দীন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতেন তখন যাদের কাছে ধনবল বা জনবল থাকত তারা অহংকারী হয়ে দীন ইসলামের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করত। প্রিয়নবী ﷺ যখন মক্কা মুয়াযযমায় মক্কাবাসীকে দীন ইসলামের আহ্বান জানালেন তখনও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, যারা ছিল ধনসম্পদের অধিকারী অথবা নেতৃত্বের দাবিদার, তারা সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করল। দীন ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, তাদের দলবল এবং অর্থসম্পদের কারণে তারা অহংকারী হলো, যারা সমাজে দুর্বল শ্রেণি ছিল তাঁরাই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করলেন। যেমন হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত সোহায়েব রুমী (রা.), হযরত বেলাল (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম, মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে দেখে বিদ্রূপ করত এবং বলত এ দুর্বল লোকেরাই কি আল্লাহর রহমত পাবে?

আরাফবাসীগণ তাই দোজখীদেরকে স্মরণ করিয়ে বলবেন যে, দরিদ্র লোকেরা সেদিন দীন ইসলাম কবুল করেছিল তোমরা তাদের সম্পর্কে শপথ করে বলতে যে, তারা কোনোদিন আল্লাহর রহমত পাবে না। তদানীন্তন সমাজ জীবনে তারাই ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত। তাদের কাছে ধনবল, জনবল বলতে কিছুই ছিল না, কিন্তু আজ তারা ভাগ্যবান। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতে তাঁরা ধন্য, তাঁদেরকে বলা হয়েছে- اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে, তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই। অথচ হে দোজখবাসী! তোমাদের ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কারণে, তোমাদের জনবলের গরিমায় তোমরা অহংকারী ছিলে, সত্য গ্রহণে অস্বীকার করেছিলে, তাই আজ তোমরা দোজখে নিক্ষিপ্ত এবং কোপগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতে جَمْعُكُمْ শব্দটি সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তোমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সাহায্যকারী ও সমর্থকদের দল, অথবা তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ। কালবী (র) লিখেছেন যে, আ'রাফবাসীগণ মক্কার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং আবূ জাহল ইবনে হেশাম সহ অন্যান্য কাফেরদের নাম ধরে ডাকবেন এবং এ সকল কথা বলবেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ কথাটি ফেরেশতাগণ আ'রাফবাসীদেরকে বলবে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পৌঁছে গেছে, দোজখীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অতএব, হে আ'রাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন তা হলো এই যে, আ'রাফবাসীগণ যখন দোজখীদের সঙ্গে কথা বলবেন তখন দোজখীরা জবাব দেবে ঐ দুর্বল লোকেরা যদি জান্নাতে গমন করে থাকে তবে তোমাদের কি? তোমরা তো জান্নাতে যেতে পারবে না। দোজখীরা শপথ করে বলবে, তোমরা অবশ্যই দোজখে আসবে। একথা শ্রবণ করে পুলসিরাতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ দোজখীদেরকে বলবেন, তোমরাই আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলেছ তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে না।

এরপর আ'রাফবাসীর দিকে ইঙ্গিত করে তারা বলবেন, তোমরা নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত মনে বেহেশতে চলে যাও। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আতা (র.)-এর সূত্রে আরো লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন আ'রাফবাসী চলে যাবে তখন দোজখীদের অন্তরেও একটু লোভ হবে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করবে– হে আমাদের পরওয়াদেরগার! আমাদের বন্ধু আত্মীয়স্বজন জান্নাতে রয়েছে আমাদেরকে তাদের সাথে কথা বলার এবং দেখা করার অনুমতি দান করুন! আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে অনুমতি দান করবেন। তখন তারা তাদের জান্নাতি আপনজনদের অবস্থা দেখতে পারবে এবং আল্লাহ পাকের যে অনন্ত-অসীম নিয়ামত তারা ভোগ করছে তাও প্রত্যক্ষ করবে।

দোজখীরা তাদের জান্নাতি আপনজনদের চিনতে পারবে কিন্তু দোজখের শাস্তি ও পরিণামে তাদের চেহারা বিকৃত হওয়ার কারণে বেহেশতবাসীগণ তাদেরকে চিনতে পারবে না। দুনিয়াতে যারা তাদের আপনজন ছিল; ঈমান ও নেক আমলের বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তারা আজ জান্নাতের অধিবাসী, আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে দোজখীরা জান্নাতিদের সঙ্গে কথা বলবে এবং পানাহারের ছিটেফোঁটা দান করার জন্য আবেদন করবে। সেই আবেদনের কথাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে।

দোজখীদের আবেদন– وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ.

অর্থাৎ দোজখীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে [নিজেদের আত্মীয়দের কথা মনে করিয়ে দিয়ে] আবেদন করবে আমাদের দিকে সামান্য পানি ফেলে দাও, [আমরা বড় তৃষ্ণার্ত] আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে রিজিক দান করেছেন তা থেকে ছিটেফোঁটা হলেও আমাদের দিকে নিক্ষেপ কর। [আমরা বড় ক্ষুধার্ত]

দোজখীদের এ আবেদনের জবাবে জান্নাতবাসীগণ বলবেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্যে দানাপানি হারাম করে দিয়েছেন। এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন– জান্নাতিদের আপন আত্মীয়স্বজন যেমন– পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী যদি দোজখে যায় এমন আপনজনেরাই তাদের বেহেশতবাসী আত্মীয়স্বজনের নিকট দানাপানির আবেদন করবে। আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে জান্নাতবাসীগণ জবাব দেবেন, দানাপানি কাফেরদের জন্যে হারাম, তাই আমরা কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারব না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আরো লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন জিনিসের সদকা উত্তম? তিনি বলেন, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সবচেয়ে উত্তম দান হলো পানি। দেখ, দোজখীরা জান্নাতবাসীদের নিকট পানির জন্য আবেদন করবে।

বর্ণিত আছে, আবূ তালেব যখন তার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয় তখন কুরাইশ গোত্রের কিছু লোক তাঁকে বলে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কারো মাধ্যমে অনুরোধ কর যেন তিনি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য বেহেশতের আঙ্গুর পাঠিয়ে দেন। আবূ তালেবের প্রেরিত লোক যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয় তখন তাঁর খেদমতে হযরত আবূ বকর (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আবূ তালেবের জন্যে বেহেশতের আঙ্গুরের আবেদন পেশ করা হলে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক জান্নাতের পানাহারের বস্তু কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ৯ পৃ. ৬২]

ইবনে আবিদ্দুনিয়া যায়েদ ইবনে রাফীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোজখীরা দোজখে প্রবেশ করে বহুদিন ক্রন্দন করবে, তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে, এরপর অশ্রুর বদলে রক্ত বের হতে থাকবে, দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবে, হে হতভাগার দল! তোমরা দুনিয়াতে ক্রন্দন করনি আজ কার নিকট ফরিয়াদ করছ? তখন তারা চিৎকার করে জান্নাতবাসী আত্মীয়স্বজনকে ডাকবে, কেউ পিতাকে, কেউ মাতাকে, কেউ সন্তানসন্ততিকে ডাকবে এবং বলবে, আমরা কবর থেকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বের হয়েছি। হাশরের ময়দানেও আমরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পিপাসাগ্রস্ত রয়েছি, অতএব, আমাদের প্রতি সদয় হও, তোমাদেরকে প্রদত্ত পানি এবং আহার্য থেকে সামান্য পরিমাণ আমাদেরকেও দাও। [চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর] যন্ত্রণাকতর দোজখীরা এভাবে মিনতি জানাতে থাকবে কিন্তু তাদেরকে কোনো জবাব দেওয়া হবে না। অবশেষে তাদেরকে উপরিউক্ত জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমরা তোমাদেরকে কোনো কিছু দান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কেননা আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্য বেহেশতের দানাপানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا : অর্থাৎ এ কাফেররাইতো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধান নিয়ে খেলতামাশা করেছে, যারা দীন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি বিদ্রূপ করেছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে গেছে, দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে বেহেশতবাসীর চিরস্থায়ী জিন্দেগির সুখ-শান্তির কথা বিস্মৃত হয়েছে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশসমূহকে উপেক্ষা করেছে, তাই তাদের এ পরিণাম, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا অর্থাৎ আজ আমি তাদেরকে ভুলে থাকব যেমন তারা এদিন হাজির হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। আর যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাই আজ তাদের জন্যে হবে কঠিন কঠোর শাস্তি। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন– "আজ আমি তাদেরকে ভুলে থাকব" এর অর্থ হলো তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আর দুনিয়াতে তারা একথা ভুলে গিয়েছিল যে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে– এর তাৎপর্য হলো এমন নেক আমল পরিত্যাগ করা, যা কেয়ামতের দিন উপকারী হবে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ الخ **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতবাসী এবং দোজখীদের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর আ'রাফে অবস্থানকারীদের কথাও উল্লিখিত হয়েছে, এ তিনটি দলের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে তারও আলোচনা রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের কথা রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– আমি তোমাদেরকে এমন কিতাব প্রদান করেছি যার মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে মু'মিনদের জন্য হেদায়েত এবং রহমত। যারা বুদ্ধিমান ও যারা ঈমানদার, তারা মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তারা নিজেদের বর্তমানকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করেছে, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও করেছে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যহত, যারা অপরিণামদর্শী, তারা আল্লাহর কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তার প্রিয়নবী ﷺ -এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং নিজেরা নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন– بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে হালাল-হারামকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আকীদা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ করেছেন। عَلَىٰ عِلْمٍ অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের পথ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। তাই মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা অকল্যাণকর তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। –[তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ৩১৩]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করেছেন এবং এ মহান গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে মানব জাতির কল্যাণের পথ নির্দেশ করা হয়েছে, এর দ্বারা কাফেরদের এই ওজর আপত্তি যে, আমরা বুঝতে পারিনি, জানতে পারিনি বা সত্যের সন্ধান পাইনি, এ ধরনের কথার পথ বন্ধ হয়ে গেল, আখেরাতে তাদের যে কঠোর কঠিন শাস্তি হবে এ ব্যাপারে তাদের আর কোনো বক্তব্য থাকবে না। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا "আমি যে পর্যন্ত রাসূল প্রেরণ না করি সে পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়কে কোপগ্রস্ত করি না" অথচ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আগমন করেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে পরিপূর্ণ হেদায়েত এবং রহমত। কিন্তু যারা হতভাগা, তারা এ হেদায়েত কবুল করে না এবং রাহমাতুললিল আলামীন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনুসারী হয় না। আলোচ্য আয়াতে هُدًى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেছেন, হেদায়েত হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা। যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক স্তর রয়েছে তাই হেদায়েতেরও অনেক স্তর রয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম স্তর হলো কুফর এবং শিরক থেকে নাজাত লাভ করা এবং তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং রেসালত ও আখেরাতে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা হেদায়েতের এই স্তর পার হতে পারে তাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ইতঃপূর্বে দিশেহারা ছিল, সে যদি দিশারীর মাধ্যমে পথের সন্ধান পায় তবে বলা হবে যে সে হেদায়েতও পেয়েছে। এজন্যে হেদায়েতের অন্বেষণ করতে হয় সর্বক্ষণ এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এ কারণেই সূরা ফাতেহায় আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত কর। সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাজে অবশ্য পাঠ্য। এর অর্থ হলো, প্রত্যেককে প্রতি দিন বারে বারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হেদায়েতের জন্যে মিনতি জানাতে হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের অগণিত স্তর রয়েছে তাই বান্দাকে প্রত্যেক স্তরে পৌছার পর পরবর্তী স্তরের উন্নতি লাভের জন্যে আরজি পেশ করতে হয়। আর যে মকাম বা স্তরে সে থাকে তার উপরের স্তর সে লাভ করে। এ পর্যায়ের সর্বশেষ স্তর হলো জান্নাতে পৌছা। অতএব, আল্লাহ পাকের নৈকট্য অন্বেষণকারীকে দরবারে ইলাহীতে হেদায়েতের জন্যে মুনাজাত করতে হয়।

قَوْلُهُ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهُ يَقُوْلُ : অর্থাৎ যেদিন তাদের পরিণাম দেখা যাবে– সেদিন মৃত্যুর দিন, অথবা কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষ সারা জীবনের সাধনার শুভ পরিণতি অথবা শাস্তি দেখতে পাবে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও নাফরমান হয়ে জীবনযাপন করে তারা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের সর্বনাশের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী হবে, তারা সেই কঠিন বিপদের মুহূর্তে কোনো সুপারিশকারী বা সাহায্যকারী পাবে না এবং পুনরায় পৃথিবীতে এসে সৎ কাজের অঙ্গীকার করলে তার অনুমতি পাবে না, বরং চিরদিন তাদেরকে কঠোর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : তাদের মিথ্যা রচনা তখন হারিয়ে যাবে। ইমাম রাযী (রা.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দুনিয়াতে কাফের মুশরিকরা হাতের বানানো মূর্তিপূজা করতো এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সামনেই মাথা নিচু করতো, কিন্তু এই সব মূর্তি তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। অথবা এর অর্থ হলো তারা যে বাতিল ধর্মে বিশ্বাস করত সেই ধর্ম তাদের জন্য উপকারী হবে না। ইমাম রাযী (র.) আরও বলেছেন যে, এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তারা দুনিয়াতে এ অবস্থায় ছিল যে, ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারত। এজন্যই তারা এ আবেদন করবে যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে আসার সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে। যদি দুনিয়াতে ঈমান আনয়নের শক্তি তাদের না থাকত তবে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আশার আকাঙ্ক্ষা করত না। –[তাফসীরে কবীর খ. ১৪ পৃ. ৯৫, ৯৬]

অনুবাদ :

٥٤. إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيْ فِيْ قَدْرِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَمْسٌ وَلَوْ شَاءَ خَلَقَهُنَّ فِيْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ هُوَ فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا أَيْ يُغَطِّيْ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْأٰخَرِ يَطْلُبُهٗ يَطْلُبُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْأٰخَرَ طَلَبًا حَثِيْثًا سَرِيْعًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ مُسَخَّرَاتٍ مُذَلَّلَاتٍ بِأَمْرِهٖ ط بِقُدْرَتِهٖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ جَمِيْعًا وَالْأَمْرُ ط كُلُّهٗ تَبٰرَكَ تَعَاظَمَ اللّٰهُ رَبُّ مَالِكُ الْعٰلَمِيْنَ.

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী দুনিয়ার দিনের পরিমাণানুসারে ছয়দিনে সেই সময় সূর্য ছিল না, সুতরাং দিন নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে না। [সৃষ্টি করেছেন।] আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করে ফেলতে পারতেন। তা সত্ত্বেও মানুষ জাতিকে ধীরতা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য তিনি তা হতে বিরত রইলেন এবং সময় নিয়ে তা করলেন। অতঃপর তিনি আরশে اَلْعَرْشِ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– রাজসিংহাসন সমাসীন হন। যেমনিভাবে সমাসীন হওয়া তাঁর উপযোগী সেভাবে। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অর্থাৎ একটি অপরটি দ্বারা আবৃত করে দেন। يُغْشِ এটা ش অক্ষর তাশদীদ সহ بَاب تَفْعِيْل ও তাখফীক অর্থাৎ তাশদীদহীন بَاب إِفْعَال -এও পঠিত রয়েছে। ফলে একটি অপরটিকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। حَثِيْثًا অর্থ দ্রুতগতিতে। এটা এ স্থানে উহ্য طَلَبًا -এর صِفَت বা বিশেষণ এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে মাননীয় তাফসীরকার এর পূর্বে طَلَبًا শব্দটির উল্লেখ করেছেন। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই নির্দেশের وَالشَّمْسَ ...النُّجُوْمَ এটা পূর্বোল্লিখিত اَلسَّمٰوٰتِ -এর সাথে عَطْف হিসেবে نَصْب সহ পঠিত রয়েছে। مُبْتَدَأ অর্থাৎ উদ্দেশ্যরূপে এটাকে رَفْع সহও পাঠ করা যায়। এমতাবস্থায় এর خَبَر হলো مُسَخَّرَاتٍ কুদরত ও শাস্তির অধীন অজ্ঞাবহ। জেনে রাখ সকল সৃজন কাজ ও সর্বপ্রকার আজ্ঞা ও নির্দেশ তাঁরই। বিশ্ব জগতের প্রভু মালিক আল্লাহ মহিমাময় অতি মহান।

٥٥. اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا حَالٌ تَذَلُّلًا وَّخُفْيَةً ط سِرًّا إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَاءِ بِالتَّشَدُّقِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ.

৫৫. তোমরা মিনতি সহকারে বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি দোয়ার মধ্যে অসতর্ক শব্দযোজনা ও স্বর মাত্রা চড়িয়ে সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। تَضَرُّعًا এটা এ স্থানে حَال রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। خُفْيَةً অর্থ সঙ্গোপনে।

٥٦. وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بِالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِيْ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ وَادْعُوْهُ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهٖ وَطَمَعًا ط فِيْ رَحْمَتِهٖ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُطِيْعِيْنَ وَتَذْكِيْرُ قَرِيْبٍ الْمُخْبَرِ بِهٖ عَنْ رَحْمَةٍ لِإِضَافَتِهَا إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

৫৬. রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে দুনিয়ার সংশোধনের পর শিরক ও অবাধ্যাচারের মাধ্যমে তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না। তাঁকে তাঁর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশার সাথে ডাকবে। আল্লাহর রহমত সৎকর্মপরায়ণদের অর্থাৎ তাঁর বাধ্যগতদের নিকটবর্তী قَرِيْب-শব্দটি এ স্থানে যদিও رَحْمَة -এর خَبَر আর এ হিসাবে এটাকে مُؤَنَّث অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করা সঙ্গত ছিল বটে তবুও رَحْمَة শব্দটিকে اَللّٰه -এর প্রতি إِضَافَت বা সম্বন্ধ করায় তাকে [قَرِيْب শব্দটিকে] مُذَكَّر রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৭. وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط اَىْ مُتَفَرِّقَةً قُدَّامَ الْمَطَرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ تَخْفِيْفًا وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا وَفَتْحِ النُّوْنِ مَصْدَرًا وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ النُّوْنِ اَىْ مُبَشِّرًا وَمُفْرَدُ الْاُوْلٰى نُشُوْرٌ كَرَسُوْلٍ وَالْاَخِيْرَةُ بَشِيْرٌ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ حَمَلَتِ الرِّيْحُ سَحَابًا ثِقَالًا بِالْمَطَرِ سُقْنٰهُ اَىِ السَّحَابَ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ لَانَبَاتَ بِهٖ اَىْ لِاِحْيَائِهٖ فَاَنْزَلْنَا بِهِ بِالْبَلَدِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ الْاِخْرَاجُ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى مِنْ قُبُوْرِهِمْ بِالْاِحْيَاءِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَتُؤْمِنُوْنَ -

৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে অর্থাৎ বৃষ্টির প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বিক্ষিপ্তভাবে বায়ু প্রেরণ করেন। بُشْرًا এটা অপর এক পাঠ অনুসারে تَخْفِيْف বা লঘুকরণার্থে [প্রথমাক্ষর نُوْن ও] ش-এ সাকিন সহ পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে مَصْدَرٌ অর্থাৎ ক্রিয়ার মূলরূপে نُوْن-এ যবর ও ش -এ সাকিন সহ পঠিত রয়েছে। অর্থ হবে বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে। অপর এক কেরাতে ش-এ সাকিন এবং نون-এর পরিবর্তে ب -এর পেশসহ [بُشْرًا] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে مُبَشِّرًا সুসংবাদবাহীরূপে। প্রথম কেরাত অনুসারে তার مُفْرَدٌ বা একবচন হলো نُشُوْرٌ যেমন- رَسُوْلٌ। আর দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে এটার مُفْرَدٌ বা একবচন হবে بَشِيْرٌ। যখন তা অর্থাৎ বায়ু বৃষ্টির ফোঁটায় পরিপূর্ণ ভারী মেঘ বহন করে তখন তা অর্থাৎ ঐ মেঘকে মৃত ভূমিতে অর্থাৎ যে স্থানে কোনো গাছপালা নেই সেই ভূখণ্ডকে সজীব করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি অনন্তর اَقَلَّتْ অর্থ এটা বহন করে। سُقْنٰهُ এ স্থানে غَيْبَ অর্থাৎ নাম পুরুষবাচক রূপ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর হয়েছে। সেই ভূখণ্ডে বারি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এই উদগম করার মতো পুনর্জীবনদানের মাধ্যমে কবর হতে মৃতদেরকে জীবিত করব, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর।

৫৮. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ الْعَذْبُ التُّرَابُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ حَسَنًا بِاِذْنِ رَبِّهٖ هٰذَا مَثَلٌ لِلْمُؤْمِنِ يَسْمَعُ الْمَوْعِظَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا وَالَّذِىْ خَبُثَ تُرَابُهٗ لَا يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ اِلَّا نَكِدًا عُسْرًا بِمَشَقَّةٍ وَهٰذَا مَثَلٌ لِلْكَافِرِ كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ اللّٰهَ فَيُؤْمِنُوْنَ -

৫৮. এবং উৎকৃষ্ট ভূমি উর্বর ও মিঠা পানির মাটি তার প্রতিপালকের অনুমোদনে ভালো ফসল উৎপন্ন করে। এটা হলো মু'মিনের উদাহরণ, সে উপদেশ শুনে এবং এটা দ্বারা উপকৃত হয়। এবং যে মাটি নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। نَكِدًا অর্থ, অতি কঠিন পরিশ্রম। এটা হলো কাফেরের উদাহরণ। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি। ফলে তারা ঈমান আনয়ন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এটা مُتَشَابِهَاتٌ-এর অন্তর্গত। এর প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। يُغْشِىْ অর্থাৎ يُغَطِّىْ অর্থ হলো– ছেয়ে যাওয়া, ঢেকে ফেলা, এখান থেকেই غَشِيَتْهُ الْحُمّٰى অর্থ– তার জ্বর এসে গেছে।

قَوْلُهُ حَثِيْثًا : এটা حَثٌّ হতে নির্গত। আর এটা طَلَبًا উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالتَّشَدُّقِ : অর্থাৎ اِظْهَارُ الْفَصَاحَةِ بِالتَّكَلُّفِ ফাসাহাত প্রকাশ করার জন্য কৃত্রিমভাবে টেনে টেনে কথা বলা। تَشَدُّقٌ بِالْكَلَامِ وَفِيْهِ অর্থ হলো– কোনো সতর্কতা ব্যতিরেকে সব ধরনের কথা বলা।

قَوْلُهُ مُتَفَرِّقَةً : এ শব্দের সম্পর্ক نَشْرًا কেরাতের সাথে। এটা সেই সুরতে হবে যখন نَشْرًا-কে اَلرِّيْحِ থেকে حَالٌ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। حَالٌ এর ذُوالْحَالِ-এর উপর حَمْل ঠিক রাখার জন্য এই تَاوِيْل-এর প্রয়োজন হয়েছে। তবে অন্যান্য মুফাসসিরগণ এতে একমত নন। কতিপয় মুফাসসির نَشْرًا-কে نَاشِرَةً لِلْحِسَابِ অর্থে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ مَنْشُوْرَةً অর্থে নিয়েছেন। نَشْرًا টা نُشُوْرٌ-এর এবং بُشْرًا টা بَشِيْرٌ-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ وَتَذْكِيْرُ قَرِيْبٍ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ رَحْمَتِهِ لِاِضَافَتِهَا اِلَى اللّٰهِ : উল্লিখিত ইবারতের বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে

প্রশ্ন. رَحْمَتَ اللّٰهِ হলো اِنَّ-এর ইসিম। আর قَرِيْبٌ হলো তার খবর। اِسْم হলো مُؤَنَّثٌ আর খবর হলো مُذَكَّرٌ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। কাজেই قَرِيْبَةٌ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর. رَحْمَتَ اللّٰهِ-এর মধ্যে مُضَافٌ اِلَيْهِ তথা اَللّٰهِ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে مُذَكَّرٌ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ مُضَافٌ-কে مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর হুকুম দিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য ভাষা ও اِعْرَابٌ-এর ইমামগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ইমাম যুজায (র.) বলেছেন, رَحْمَتَهُ টা عَفْو এবং غُفْرَانٌ অর্থে হওয়ার কারণে رَحْم অর্থে হয়েছে। ইমাম নুহাস এই ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন।
২. নযর ইবনে শুমায়ল বলেন, رَحْمَةٌ মাসদার যা تَرَحُّمٌ অর্থে হয়েছে।
৩. আখফাশ সাঈদ বলেন, رَحْمَةٌ দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।
৪. কেউ কেউ বলেন, رَحْمَةٌ যেহেতু مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِىْ এ কারণে مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ উভয়ই ব্যবহার হতে পারে।

–[ফতহুল কাদীর শওকানী]

قَوْلُهُ اَقَلَّتْ : অর্থাৎ حَمَلَتْ এবং رَفَعَتْ-এর مَاخَذ اِشْتِقَاقٌ হলো اِقْلَالٌ

قَوْلُهُ نَكِرًا : অর্থাৎ اَلَّذِىْ لَا خَيْرَ فِيْهِ অথবা اَلَّذِىْ اِشْتَدَّ وَعَسُرَ

قَوْلُهُ ثِقَالًا : প্রশ্ন. ثِقَالًا-কে বহুবচন নেওয়ার কারণ কি?

উত্তর. যেহেতু سَحَابًا টা سَحَابَةٌ-এর বহুবচনের অর্থে। কেননা এটা অর্থগত দিক থেকে سَحَائِبُ অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য প্রথম আয়াতে নভোমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা, তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে- وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়। কোথাও বলা হয়েছে- إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন 'হয়ে যা'। আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয়দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চিন্তাভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা সহকারে কাজ করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় আর তড়িঘড়ি কাজ করা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। -[তাফসীরে মাযহারী]

উদ্দেশ্য এই যে, তড়িঘড়ি কাজ করলে মানুষ কাজের সব দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারে না। ফলে প্রায়ই সে কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনুতাপ করতে হয়। পক্ষান্তরে যে কাজ চিন্তাভাবনা ও ধীরে-সুস্থে করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবারাত্রির পরিচয় কি ছিল? : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হলো?

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বুঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয়দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে দিবারাত্রির পরিচয়ের অন্য কোনো লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, যেমন জান্নাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, যে ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমাদের ছয়দিনের সমান হওয়া জরুরি নয়; বরং এর চাইতে বড়ও হতে পারে যেমন, পরকালের দিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে।

আবূ আব্দুল্লাহ রাযী (র.) বলেন, সপ্তম আকাশের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় এত বেশি দ্রুত যে, দ্রুত ধাবমান একটি লোকের একটি পা তুলে তা পুনরায় মাটিতে রাখার পূর্বেই সপ্তম আকাশ তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে।

-[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

সে জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ (র.) বলেন যে, এ ছয় দিনের অর্থ পরকালের ছয় দিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতেও তাই বর্ণিত রয়েছে।

সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেন, سَبْتٌ -এর অর্থ কর্তন করা। এ দিন কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে يَوْمُ السَّبْتِ। [শনিবার] বলা হয়। -[ইবনে কাসীর]

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয়দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা-মীম-সিজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুদিনে ভূমণ্ডল, দুদিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হলো। বলা হয়েছে- خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ আবার বলা হয়েছে- قَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ যে দুদিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দুদিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজসরঞ্জাম, পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যত এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হলো।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। إِسْتَوٰى -এর শাব্দিক অর্থ- অধিষ্ঠিত হওয়া। আরশ রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহর আরশ কিরূপ এবং কি? এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সুফি-বুজুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির

স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোনো অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালিক (রা.)-কে কেউ اِسْتِوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, اِسْتِوَاء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানববুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান ছওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) প্রমুখ বলেছেন, যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। –[তাফসীরে মাযহারী]

এরপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে– يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবারাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়– মোটেই দেরি হয় না। এরপর বলা হয়েছে– وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছে যে, সবাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞের তৈরি মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু দোষক্রটি থাকে। যদি দোষক্রটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কলকব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এ জন্য কয়েকদিন শুধু নয়, অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোনো কলকজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও কোথাও মেরামতের জন্য পাঠাতে হয় না। কারণ এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, না কোনো ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়; বরং শুধু আল্লাহর আদেশের শক্তি বলেই চলছে। চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও সম্ভব নয়। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হলো কিয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে– أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ - خَلْق শব্দের অর্থ– সৃষ্টি করা এবং أَمْر শব্দের অর্থ– আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে আর না কউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে কোনো বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তা'আলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

সুফি-বুজুর্গরা বলেন, خَلْق ও أَمْر দুটি জগৎ। خَلْق -এর সম্পর্ক বস্তুজগতের সাথে এবং أَمْر-এর সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও অজড় বিষয়াদির সাথে। قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي আয়াতে 'আত্মা'কে পালনকর্তার আদেশ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। خَلْق ও أَمْر দুই-ই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ তখন এই হবে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই বস্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকেই خَلْق বলা হয়েছে এবং নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে যা কিছু আছে, সব অবস্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকে أَمْر শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এখানে تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ [বরকত] থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, কায়েম থাকা ইত্যাদি। তবে এখানে تَبَارَكَ শব্দের অর্থ উচ্চ ও মহান হওয়া। এটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং কায়েম থাকা উভয় অর্থেই হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেমন কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মহান ও উচ্চও বটে। হাদীসে এক বাক্যেও উচ্চ হওয়া অর্থের দিকেই করা হয়েছে। বলা হয়েছে– تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এখানে تَبَارَكْتَ শব্দের তাফসীর تَعَالَيْتَ শব্দ দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً الخ : আরবি ভাষায় دُعَاء [দোয়া শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। ১. বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং ২. যে কোনো অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটন একমাত্র আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত কর। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তাফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে- تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً - تَضَرُّع শব্দের অর্থ- অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خُفْيَةً শব্দের অর্থ- গোপন। এ দুটি শব্দে দোয়া ও স্মরণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, এটা কবুল হওয়ার জন্য জরুরি শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় ও নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বুঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না, বরং দোয়া পাঠ করা বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেগুলোর অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবি বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামাজ শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলির সাথে সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বুঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনার বিষয়, পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলির অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোনো বান্দারই নেই।

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতাহীনতা এবং এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপি চুপি ও সংগোপনে দোয়া করা। এটাই উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়ত এতে রিয়া ও সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকার আশঙ্কাও রয়েছে। তৃতীয়ত এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কোনো বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন সূক্ষ্ম শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন- اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। তা দোয়ার সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোনো কাজে, কোনোটিই আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলি পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরিয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ার সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকার হতে পারে।

১. দোয়ার শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়।

২. দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতে সাদা রঙের ডানদিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি।' তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন, দোয়ায় এ ধরনের শর্ত যুক্ত করা সীমা অতিক্রম, কুরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ। -[তাফসীরে মাযহারী]

৩. মুসলমান জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা কিংবা এমন কোনো বিষয় কামনা করা, যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও একপ্রকার সীমা অতিক্রম।

–[তাফসীরে মাযহারী, আহকামুল কুরআন]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا এখানে صَلَاحٌ ও فَسَادٌ দুটি পরস্পরবিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صَلَاحٌ শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فَسَادٌ শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগিব মুফারাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فَسَادٌ বলা হয়, তা সামান্য বের হোক কিংবা বেশি। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশি বের হলে বেশি ফাসাদ হবে। اِفْسَادٌ শব্দের অর্থ– অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اِصْلَاحٌ শব্দের অর্থ– সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগিব বলেন, আল্লাহ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকারে হতে পারে। ১. প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন বলা হয়েছে– وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ২. অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন– وَيُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ৩. সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দুটি অর্থ হতে পারে।

১. বাহ্যিক সংস্কার অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।
২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম : সংস্কার যেমন দু-রকম– বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু-রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মতো নরমও নয় যে, যাতে কোনো কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মতো শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না; বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরি করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারি, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুলে ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা দ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন– فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا [আল্লাহ মানুষকে পাপাচার ও আল্লাহ-ভীতি এতদুভয়েরই অনুপ্রেরণা দান করেছেন]। মানুষের চারপাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে– فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ [সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা]। এছাড়া রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাজিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে– আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ বা অনর্থ সৃষ্টির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির

ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরিয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক সকল আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপকাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

قَوْلُهُ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا : বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গুনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে- وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দুটি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোনো কোনো আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন; যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়। আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ।

-[তাফসীরে বাহ্‌রে-মুহীত]

কোনো কোনো সূক্ষ্মদর্শী আলেম বলেন, ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্ন রূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে সচেষ্ট হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দুটি আদব বর্ণিত হয়েছে। ১. বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং ২. মৃদু স্বরে ও সংগোপনে দোয়া করা। এ দুটি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা বিনয়ের অর্থ হলো দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারগ ও ফকিরের মতো করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মতো না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহ্বার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দুটি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হলো এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা পাপ ও গুনাহ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থি। অপর দিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব-পালনকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে কোনো ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গুনাহর অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে স্বীয় বেশভূষা ফকিরের মতো করে আল্লাহর সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে কিন্তু তাদের খাদ্য ও পোশাক সবই হারাম দ্বারা সংগৃহীত- এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?

-[মুসলিম, তিরমিযী]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা যতক্ষণ কোনো গুনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ হলো, এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবুল হলো না! অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। -[মুসীলিম, তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তখন কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে। অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত করা। এমন মনে করা গুনাহের কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করার পরিপন্থি নয়।

অনুবাদ :

٥٩. لَقَدْ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِإِلٰهٍ وَالرَّفْعُ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّهِ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِنْ عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ.

৫৯. আমি তো নূহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। لَقَدْ এটা এ স্থানে কসমের জওয়াব। غَيْرُهُ এটা جَرّ সহকারে পঠিত হলে إِلٰهٍ-এর صِفَتْ অর্থাৎ বিশেষণ রূপে গণ্য হবে। আর তার مَحَلّ বা অবস্থান হতে بَدَلْ বা স্থলাভিষিক্ত পদরূপে এটা رَفْع সহও পাঠ করা যায়। যদি তোমরা অন্য কারো ইবাদত কর, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

٦٠. قَالَ الْمَلَأُ الْأَشْرَافُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ.

৬০. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ গন্যমান্যগণ বলেছিল, আমরা তো তোমাকে নিঃসন্দেহে পরিষ্কার সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

٦١. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ هِيَ أَعَمُّ مِنَ الضَّلَالِ فَنَفْيُهَا أَبْلَغُ مِنْ نَفْيِهِ وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬১. তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোনো ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। ضَلَالَةٌ শব্দটি ضَلَالٌ হতে عَامٌ। সুতরাং তা হতে এটার نَفْي বা না থাকার কথা বলা অধিকতর অলংকার সমৃদ্ধ এবং এতে জোর বেশি।

٦٢. أُبَلِّغُكُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ أُرِيْدُ الْخَيْرَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেই ও তোমাদের হিত কামনা করি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট হতে অবহিত। أُبَلِّغُكُمْ এটা তাশদীদসহ [بَابُ تَفْعِيْلٍ] ও تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতিরেকে উভয়ভাবে পাঠ করা যায়। أَنْصَحُ অর্থ, আমি হিত কামনা করি।

٦٣. أَوَكَذَّبْتُمْ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى لِسَانِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ الْعَذَابَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلِتَتَّقُوا اللّٰهَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ بِهَا.

৬৩. তোমরা কি অস্বীকার কর এবং বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের বাচনিক তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে তোমাদের নিকট জিকির অর্থাৎ উপদেশ এসেছে যাতে তিনি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদেরকে আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেন আর তোমরা যাতে আল্লাহর ভীতির অধিকারী হতে পার এবং তোমরা যাতে এটার মাধ্যমে অনুগ্রহীত হতে পার।

٦٤. فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ مِنَ الْغَرَقِ فِي الْفُلْكِ السَّفِيْنَةِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط بِالطُّوْفَانِ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ عَنِ الْحَقِّ.

৬৪. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করে। অনন্তর তাকে ও তার সাথে যারা তরণিতে ছিল আমি তাদেরকে নিমজ্জন হতে রক্ষা করি এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে তুফান ও বন্যায় নিমজ্জিত করি। তারা ছিল সত্য সম্পর্কে অন্ধ এক সম্প্রদায়। اَلْفُلْكِ অর্থ তরণি, জলযান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوْفٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لَقَدْ -এর মধ্যকার لَامْ টি جَوَاب قَسَمْ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالرَّفْعُ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّهِ : উহ্য ইবারত হলো এই مَا لَكُمْ اِلٰهٌ এখানে مِنْ হলো অতিরিক্ত اِلٰهٌ হলো মুবতাদা, আর لَكُمْ হলো তার খবরে মুকাদ্দাম।

قَوْلُهُ هِيَ اَعَمُّ مِنَ الضَّلَالِ فَنَفْيُهَا اَبْلَغُ مِنْ نَفْيِهِ : হযরত নূহ (আ.) -এর দিকে সকল প্রকার ভ্রষ্টতার নিসবত করেছেন এর জবাবে হযরত নূহ (আ.) لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ বলে প্রত্যেক প্রকার ভ্রষ্টতার نَفْي করে দিয়েছেন। আর শুধুমাত্র প্রত্যেক প্রকার ভ্রষ্টতার نَفْي করেই ক্ষান্ত হননি; বরং وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে এ দাবিও করেছেন যে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা রিসালতও প্রাপ্ত হয়েছি।

اَلضَّلَالَةُ اَعَمُّ مِنَ الضَّلَالِ : কেননা ضَلَالَةٌ টা অনির্দিষ্ট একককে বুঝায়। আর অনির্দিষ্ট এককের نَفْي করা হলো عَامّ এটা ضَلَالٌ-এর বিপরীত। কেননা এটা মাসদার যা একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনকে অন্তর্ভুক্ত করে। মাসদারের نَفْي করা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, নিশ্চিতভাবে عَامّ -এর نَفْي করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ضَلَالَةٌ -এর نَفْي করা দ্বারা ضَلَالٌ -এর نَفْي -কে আবশ্যক করে, এর বিপরীত নয়। কেননা عَامّ -এর نَفْي দ্বারা خَاصّ -এর نَفْي -কে আবশ্যক করে। এর বিপরীত নয়। আর لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ -এর মধ্যে نَكِرَه টা نَفْي-এর অধীনে আসার কারণে عُمُوْم-এর ফায়দা দিচ্ছে।

قَوْلُهُ بِهَا : অর্থাৎ بِالتَّقْوٰى

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আ'রাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনাম ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত ও পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। মানুষকে তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি এবং এ প্রসঙ্গে শয়তানের চক্রান্ত ও প্রতারণা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এখন অষ্টম রুকূ' থেকে প্রায় সূরার শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সব পয়গম্বরের সর্বসম্মতভাবে উল্লিখিত মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত, পরকালের প্রতি নিজ নিজ উম্মতকে আহ্বান জানানো, মান্যকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কার এবং অমান্যকারীদের উপর নানা রকম আজাব ও তাদের অশুভ পরিণাম বিস্তারিতভাবে প্রায় চৌদ্দ রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শত শত মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে বর্তমান জাতিসমূহকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সান্ত্বনা লাভেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের সাথেও এমনি ধরনের ব্যবহার হয়ে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ। এতে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর উম্মতের অবস্থা ও সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ.) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহির মোকাবিলা ছিল না। তাঁর শরিয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালত ও শরিয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথি; তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এ কারণেই তাঁকে 'ছোট আদম' বলা হয়। বলা বাহুল্য, এ কারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এ কাহিনীতে সাড়ে নশ' বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ–

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ হযরত নূহ (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জন্ম হযরত আদম (আ.)-এর আটশত ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কুরআনের

বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নশ' পঞ্চাশ বছর। হযরত আদম (আ.)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আট শ' ছাপান্ন বছর হয়। -[মাযহারী]

হযরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরীস (আ.)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন। -[তাফসীরে বাহরে-মুহীত]

মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ (আ.) শুধু স্বজাতির জন্যই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন; তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় বর্তমান ইরাকের এলাকায় বসবাস করত এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। -[তাফসীরে কবীর]

قَوْلُهُ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ : مَلَأٌ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সরদার ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্যে ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদির ধারণা কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে হযরত নূহ (আ.) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সরল ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন- يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ তা'আলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোনো লাভ আছে এবং না আমার কোনো স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [বিশ্বপালক] শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোনো দেবদেবী কিংবা ইয়াযদা ও আহরিমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন, কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা সূরা মু'মিনূনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে-

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً.

অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শুনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমাদেরই মতো পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসরণীয় বলে মেনে নিতে পারি! আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কাছে কোনো পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো। এখন এছাড়া আর কোনো কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর উত্তরে তিনি বললেন- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদেরই মধ্যে থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও;

অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাজিল হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রাসূলরূপে মনোনীত করা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালত দান করবেন। এতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যাবে যে, মানুষের প্রতি রিসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ রিসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলির বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শান্তি কিছুই নেই, আমরা তাদের মতো হবো কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোনো অজুহাত থাকতে পারে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে– لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا অর্থাৎ মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে, অন্য কারও ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোনো মানুষের পক্ষে নবী ও রাসূল হওয়া উচিত নয়। কুরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনের এতসব সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোককে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ মোটেও মানুষ ছিলেন না' এরূপ একটি অর্থহীন তথ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট দেখা যায়। এরূপ ধারণা যে কুরআনে উল্লিখিত নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ও বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত– এ সরল সত্যটুকুও তারা বুঝে না। তারা কোনো সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলিমেদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণেই ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির দুঃখজনক কথাবার্তার জওয়াবে হযরত নূহ (আ.)-এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছে– فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর জালিম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়াও করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হূদে বর্ণিত হবে। এ স্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, যে সময় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আজাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য এলাকায়ও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদের অবকাশ দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশিজন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবি ভাষায় কথা বলত। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মুসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' [অর্থাৎ আশি] নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা, এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ১. পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। ২. আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে, পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত সুউচ্চ প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না। ৩. পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহর আজাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আজাবে নিপতিত হয়েছে এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

অনুবাদ :

٦٥. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى عَادٍ الْاُوْلٰى اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ تَخَافُوْنَهُ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

৬৫. এবং প্রেরণ করছিলাম প্রথম আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না? তাঁকে ভয় করবে না এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

٦٦. قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ سَفَاهَةٍ جَهَالَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ فِيْ رِسَالَتِكَ ـ

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা বলেছিল, আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ মূর্খ এবং তোমাকে আমরা তোমার রাসূল হওয়ার বিষয়ে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

٦٧. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৬৭. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে নির্বুদ্ধিতা নেই; বরং আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন রাসূল।

٦٨. اُبَلِّغُكُمْ بِالْوَجْهَيْنِ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ مَاْمُوْنٌ عَلَى الرِّسَالَةِ ـ

৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাই اُبَلِّغُكُمْ এটা এস্থানেও উক্ত দুভাবে অর্থাৎ ل -এ তাশদীদসহ ও তাশদীদ ব্যতিরেকে পাঠ করা যায়। এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত, রাসূল হওয়ার বিষয়ে আমি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, উপদেশ দানকারী।

٦٩. اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى لِسَانِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ج قُوَّةً وَطُوْلًا وَكَانَ طَوِيْلُهُمْ مِائَةَ ذِرَاعٍ وَقَصِيْرُهُمْ سِتِّيْنَ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ نِعَمَهٗ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ ـ

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের বাচনিক তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে নূহ সম্প্রদায়ের পর পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে শারীরিক কাঠামোতে অধিকতর শক্তিশালী করেছেন। শারীরিক শক্তি ও সুদীর্ঘ গঠনে তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। এদের সর্বাপেক্ষা লম্বাজন ছিল একশত হাত এবং সর্বাপেক্ষা ছোটজন ছিল ষাট হাত। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অনুগ্রসমূহ স্মরণ কর হয়তো তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে, সফলকাম হবে।

٧٠. قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ نَتْرُكَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْ قَوْلِكَ ـ

৭০. তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তা পরিত্যাগ করি। বর্জন করি। সুতরাং তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক তবে আমাদেরকে যে আজাবের ভয় প্রদর্শন করছ তা নিয়ে আস।

٧١. قَالَ قَدْ وَقَعَ وَجَبَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ عَذَابٌ وَّغَضَبٌ ط اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَيْ سَمَّيْتُمْ بِهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اَصْنَامًا تَعْبُدُوْنَهَا مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا اَيْ بِعِبَادَتِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ فَانْتَظِرُوا الْعَذَابَ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ذٰلِكَ بِتَكْذِيْبِكُمْ لِيْ فَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الرِّيْحُ الْعَقِيْمُ .

৭১. সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর আপতিত হয়ে আছে তা নির্ধারিত হয়েই আছে। তবে কি তোমরা আমার সাথে এমন কতগুলো নাম সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যেগুলোর নামকরণ করেছে? প্রতিমারূপে আর যেগুলোর তোমরা উপসনা কর? যেগুলোর উপাসনা সম্পর্কে আল্লাহ কোনো সনদ দলিল ও প্রমাণ পাঠাননি। সুতরাং আজাবের প্রতীক্ষা কর আর আমাকে অস্বীকার করার কারণে আমিও তোমাদের সাথে তার প্রতীক্ষা করছি। অনন্তর এদের উপর মারাত্মক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাত্যা প্রেরিত হয়। رِجْسٌ অর্থ এ স্থানে আজাব, শাস্তি। سَمَّيْتُمُوْهَا এটা মূলত سَمَّيْتُمْ بِهَا [এতদরূপে এর নামকরণ করেছে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٢. فَاَنْجَيْنٰهُ اَيْ هُوْدًا وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اَيْ اِسْتَاْصَلْنٰهُمْ وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ عَطْفٌ عَلٰى كَذَّبُوْا .

৭২. অনন্তর তাকে অর্থাৎ হুদকে ও তার বিশ্বাসী [সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করছিলাম আর আমার নিদর্শনসমূহকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যারা বিশ্বাসী ছিল না তাদের পশ্চাৎদেশ কেটে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে উৎপটিত করে দিয়েছিলাম। وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ পূর্ববর্তী كَذَّبُوْا ক্রিয়ার সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَرْسَلْنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَاِلٰى عَادٍ -এর আতফ نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ -এর উপর হয়েছে। আর এটা عَطْفُ قِصَّةٍ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ اَلْاُوْلٰى : عَادٌ -এর সিফত اَلْاُوْلٰى নিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَاد ثَانِيَه উদ্দেশ্য নয়। কেননা عَاد ثَانِيَة হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নাম।

قَوْلُهٗ اَخَاهُمْ هُوْدًا : هُوْدًا এটা اَخَاهُمْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। যারা عَادٌ -কে মহল্লার নাম বলেছেন তারা এটাকে مُنْصَرِفْ বলেছেন। আর যারা এটাকে কবীলা বা গোত্রের নাম বলেছেন তারা এটাকে تَانِيْث এবং عَلَمِيَّتْ-এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفْ বলেছেন, আর عَادٌ মূলত আদ সম্প্রদায়ের جَدّ اَكْبَرُ [পর-দাদা] -এর নাম। এর বংশধারা হলো এরূপ–

আদ ইবনে আউস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে হযরত নূহ (আ.)।

প্রশ্ন. হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনায় فَقَالَ يَا قَوْمِ তথা فَاء -এর সাথে বলেছেন, আর এখানে فَاء ব্যতীত বলেছেন এর হেতু কি?

উত্তর. হযরত নূহ (আ.) অলসতা বিনে বিরামহীন ভাবে স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে ব্যাপৃত ছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর বাণী– قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا দ্বারা বুঝা যায়। কাজেই এর জন্য فَاء تَعْقِيْبِيَّه নেওয়া যথাযথ হয়েছে। আর হযরত হূদ (আ.)-এর অবস্থা এরূপ ছিল না, তাই এখানে فَاء -কে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ : এটা উহ্য عَائِدٌ -এর বর্ণনা এবং تَعِدُنَا এটা বাক্য হয়ে সেলাহ হয়েছে। আর সেলাহ যখন বাক্য হয় তখন عَائِدٌ হওয়া আবশ্যক হয়। মুফাসসির (র.) بِهٖ বলে عَائِدٌ -কে প্রকাশ করে দিয়েছেন, আর مِنَ الْعَذَابِ ঐ যমীরেরই বর্ণনা।

قَوْلُهُ وَجَبَ : প্রশ্ন. وَقَعَ -এর তাফসীর وَجَبَ দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর. যাতে করে আল্লাহ তা'আলার খবরের মধ্যে মিথ্যা আবশ্যক না হয়। যেহেতু সে সময় শাস্তি পতিত হয়নি।

قَوْلُهُ سَمَّيْتُمُوْهَا : প্রশ্ন. سَمَّيْتُمُوْهَا -এর তাফসীর سَمَّيْتُمْ بِهَا দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর. سَمَّيْتُمُوْهَا -এর মধ্যে اَسْمَاء -এর জন্য اَسْمَاء হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। কেননা هَا যমীরটি اَسْمَاء -এর দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য এটা হবে যে, তোমরা নামসমূহের নাম রেখে দিয়েছে। অথচ এটা অহেতুক কথা। আর যখন هَا -এর সাথে بَاء -কে সংযুক্ত করে দিলে তখন এ প্রশ্ন আর উত্থাপিত হবে না। যেহেতু هَا যমীর اَسْمَاء -এর দিকে ফিরবে এবং سَمَّيْتُمْ-এর মাফঊল উহ্য হবে। অর্থাৎ سَمَّيْتُمْ مُسَمَّيَاتِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ بِهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : 'আদ' প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ (আ.)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তাঁর বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআন পাকে 'আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা' [প্রথম আদ] এবং কোথাও اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, 'আদ সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোনো দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই 'আদ। তাদেরকে প্রথম 'আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে 'সামূদ'। তার বংশধরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ' ও 'সামূদ' উভয়ই ইরামের দু-শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ' এবং অপর শাখাকে 'সামূদ' অথবা দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

'আদ সম্প্রদায়ের তেরোটি বংশ-শাখা ছিল। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাউত ও ইয়েমেন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুবিশিষ্ট। আয়াতে زَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের মর্ম তা-ই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামতই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً [আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?] এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। যে বিশ্ব-পালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, 'আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আজাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তাদেরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। –[তাফসীরে বায়ানুল কুরআন]

'হুদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনিও হযরত নূহ (আ.) -এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। 'আদ' সম্প্রদায় এবং 'হুদ' (আ.)-এর বংশ তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত এক হয়ে যায়। তাই হযরত হূদ (আ.) তাদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে اَخَاهُمْ هُوْدًا [তাদের ভাই হূদ] বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ.)-এর বংশ তালিকা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত : আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত হূদ (আ.)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ-বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন– হযরত হূদ (আ.)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান ইয়েমেনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়েমেনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবি ভাষার সূচনা তার থেকে হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবি এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব। –[বাহ্‌রে মুহীত]

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবি ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবি ভাষায় কথা বলতেন। [বাহ্‌রে মুহীত]। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়েমেনে আরবি ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্‌তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়তো তাই।

হযরত হুদ (আ.) 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আজাব নাজিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর ঘূর্ণিঝড়ের আজাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালানকোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে- وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোনো কোনো তাফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন 'আদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও 'আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হুদ (আ.)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আজাব নাজিল হয়, তখন হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আজাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোনো কষ্ট হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

'আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আজাব আসা কুরআন পাকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মু'মিনূনে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও বাক্যালাপ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে সঠিকভাবে আচ্ছন্ন করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আজাব আপতিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় দুটিই হয়েছিল।

৭৩. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ بِتَرْكِ الصَّرْفِ مُرَادًا بِهِ الْقَبِيْلَةَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مُعْجِزَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ عَلٰى صِدْقِىْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً حَالٌ عَامِلُهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ وَكَانُوْا سَاَلُوْهُ اَنْ يُّخْرِجَهَا لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ عَيَّنُوْهَا فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ بِعَقْرٍ اَوْ ضَرْبٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৭৪. وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ اَسْكَنَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا تَسْكُنُوْنَهَا فِى الصَّيْفِ وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ تَسْكُنُوْنَهَا فِى الشِّتَاءِ وَنَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

৭৫. قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ تَكَبَّرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَىْ مِنْ قَوْمِهٖ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهٗ بِاِعَادَةِ الْجَارِ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِلَيْكُمْ قَالُوْٓا نَعَمْ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

অনুবাদ :

৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে ثَمُوْد এটা একটি গোত্রের নাম বিধায় একে مَنْع صَرْف রূপে পাঠ করা হয়। প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আমার সত্য হওয়া সম্পর্কে বিশদ প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা এসেছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। اٰيَةً এটা এ স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ইঙ্গিতবাচক শব্দ ও هٰذِهٖ [এই]-এর মর্মবোধক ক্রিয়া اُشِيْرُ তার عَامِل রূপে গণ্য। একে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং একে হত্যা বা আঘাত করত কোনো ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। একটি পাথর নির্দিষ্ট করত তা হতে একটি উষ্ট্রী বের করতে হযরত সালেহ (আ.)-কে তারা বলেছিল। তখন তিনি মু'জিযারূপে তা করেছিলেন।

৭৪. স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দুনিয়ায় আশ্রয়স্থল দিয়েছেন। বসবাস করার ব্যবস্থা করেছেন। এর সমতল ভূমিতে তোমরা প্রাসাদ তৈরি কর এতে গ্রীষ্মকালে তোমরা বসবাস কর এবং পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ কর এতে তোমরা শীতকালে বসবাস কর। بُيُوْتًا এটা حَالٌ مُقَدَّرَة রূপে نَصْب সহ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা অর্থাৎ যারা ঈমান সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করেছিল তারা তাদের মধ্যে অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের দুর্বল শ্রেণির যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি জান যে সালেহ مِنْهُمْ এটা جَرّ বাচক শব্দ [مِنْ] -এর পুনরাবৃত্তিসহ পূর্বোল্লিখিত لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ, তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।

٧٦. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ.

৭৬. দাম্ভিকেরা বলল, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

٧٧. وَكَانَتِ النَّاقَةُ لَهَا يَوْمٌ فِى الْمَاءِ وَلَهُمْ يَوْمٌ فَمَلُّوْا ذٰلِكَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عَقَرَهَا قُدَارٌ بِاَمْرِهِمْ بِاَنْ قَتَلَهَا بِالسَّيْفِ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ عَلٰى قَتْلِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

৭৭. ঐ উষ্ট্রীটির জন্য একদিন পানি পান নির্ধারিত ছিল আর তাদের সকলের জন্য ছিল একদিন। শেষে এতে তারা বিরক্ত হয়ে উঠে। ফলে তারা সেই উষ্ট্রীটিকে বধ করে। এদের নির্দেশে কুদার নামক এক ব্যক্তি তলোওয়ার দিয়ে তা বধ করেছিল। এবং তাদের প্রভুর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালেহ! তুমি সত্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে এটা বধ করলে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস।

٧٨. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اَلزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ مِنَ الْاَرْضِ وَالصَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ.

৭৮. অতঃপর তারা রাজফা অর্থাৎ ভীষণ ভূকম্পন ও আকাশ হতে ভীষণ গর্জন দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। جَاثِمِيْنَ অর্থ নতজানু হয়ে মরে রইল।

٧٩. فَتَوَلّٰى اَعْرَضَ صَالِحٌ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ.

৭৯. অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত সালেহ এদের থেকে ফিরে গেলেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তো উপদেশদাতাগণকে পছন্দ কর না।

٨٠. وَ اذْكُرْ لُوْطًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اَىْ اَدْبَارَ الرِّجَالِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ.

৮০. আর স্মরণ কর লূত-এর কথা সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমরা এমন কুকর্মে সমকামে লিপ্ত যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে জিন ও মানুষ কেউ করেনি। إِذْ قَالَ -এটা لُوْطًا -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য।

٨١. ءَاِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ

৮১. তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর? বরঞ্চ তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের দিকে যাত্রী সম্প্রদায় أَإِنَّكُمْ -এ হামযাদ্বয়কে আলাদা স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে تَسْهِيْل করত বা উক্ত উভয়

٨٢. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْهُمْ أَيْ لُوْطًا وَأَتْبَاعَهٗ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ مِنْ أَدْبَارِ الرِّجَالِ .

৮২. তার সম্প্রদায়ের এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তর ছিল না যে, এদেরকে হযরত লূত ও তাঁর অনুসারীদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর। এরা সমকাম হতে পবিত্রতাকামী লোক।

٨٣. فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ .

৮৩. অনন্তর তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিজনবর্গ ও তাঁকে আমি রক্ষা করেছিলাম। তাঁর স্ত্রী ছিল অবশিষ্টদের অর্থাৎ আজাবের মধ্যে নিপতিত অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।

٨٤. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ط هُوَ حِجَارَةُ السِّجِّيْلِ فَأَهْلَكَتْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ .

৮৪. আর তাদের উপর মুষলধারে কঙ্কর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। এটা তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল দেখ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا : এর আতফও পূর্বের উপর হয়েছে এবং এটাও عَطْفُ قِصَّةٍ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত। ছামূদ একটি গোত্রের নাম যা তাদের جَدِّ أَكْبَرْ [পরদাদা] -এর নাম ছিল। এ কারণেই ثَمُوْد শব্দটি غَيْر مُنْصَرِفْ হয়েছে। তার বংশ পরম্পরা হলো এরূপ– ছামূদ ইবনে আদ ইবনে ইরাম ইবনে শালেখ ইবনে কাহশন্দ ইবনে সাম ইবনে হযরত হযরত নূহ (আ.)।

صَالِح শব্দটি أَخَاهُمْ -এর عَطْف بَيَانْ হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) -এর বংশ পরম্পরা এভাবে রয়েছে যে, সালেহ ইবনে উবায়দা ইবনে আসিফ ইবনে মাশিহ ইবনে ওবায়দ ইবনে হাযির ইবনে ছামূদ যারা ثَمُوْد -কে কবীলার নাম বলেন, তারা এটাকে غَيْر مُنْصَرِفْ পড়েন تَأْنِيْث -এর কারণে এবং عَلَمِيَّتْ আর যারা ثَمُوْد -কে ব্যক্তির নাম বলেছেন তারা এটাকে مُنْصَرِفْ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ : এটা جُمْلَه مُسْتَأْنِفَه উদ্দেশ্য হলো মু'জিযার كَيْفِيَّتْ বর্ণনা করা। কেমন যেন বলা হলো مَا هٰذِهِ الْبَيِّنَةُ তখন উত্তরে বলা হয়েছে যে, هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

قَوْلُهٗ حَالٌ عَامِلُهَا مَعْنَى الْإِشَارَةِ : এখানে اٰيَةً টা نَاقَةُ থেকে حَالْ হয়েছে। তার আমেল হলো هٰذِهٖ যা أُشِيْرَ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهٗ سُهُوْلِهَا : سُهُوْلٌ শব্দটি سَهْلٌ -এর বহুবচন, নরম ভূমিকে বলা হয়।

قَوْلُهٗ نَصْبُهٗ عَلَى الْمُقَدَّرَةِ : بُيُوْتًا টা تَنْحِتُوْنَ থেকে حَال مُقَدَّرَه হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এজন্য পাহাড়কে খোদাই কর যাতে তোমরা তথায় বসবাস করতে পার। কেননা খোদাই করা বাসস্থান গ্রহণের উপর মুকাদ্দাম। অথচ حَالْ এবং ذُوالْحَالِ -এর সময়কাল একই হয়।

قَوْلُهٗ لَا تَعْثَوْا : এ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর عَثِيَ বা عَثْى হতে جَمْع مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর।

قَوْلُهٗ اَلْمَلَأُ : এটা اسم جمع যা معرف باللام হয়েছে। বহুবচনে أَمْلَاءٌ অর্থ– নেতা, বড়লোক।

قَوْلُهٗ بِأَمْرِهِمْ : এ বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের উত্তর দান কল্পে হয়েছে যে, হত্যাকারী قَدَّارٌ নামীয় এক ব্যক্তি ছিল। আর عَقَرُوْا-এর মধ্যে হত্যার সম্পর্ক সমগ্র জাতির দিকেই করা হয়েছে।

এর উত্তর হলো এখানে إِسْنَاد مَجَازِيٌّ হয়েছে। যেহেতু قُدَارٌ -এর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সমগ্র জাতি ঐকমত্য ছিল এ কারণে সমগ্র সম্প্রদায়ের দিকেই হত্যার সম্বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ حِجَارَةُ السِّجِّيْلِ : এমন পাথর যাতে মাটির সংমিশ্রণ রয়েছে। যাকে কঙ্কর বলা হয়। বলা হয়েছে যে, এটা سنگ گل -এর আরবিকৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا ইতঃপূর্বে 'আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, 'আদ ও ছামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি 'আদ সম্প্রদায়, আর একটি ছামূদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণত 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়। 'আদ' জাতির মতো সামূদ জাতিও সম্পদ, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল এলাকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান লিখেছেন, তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলি আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি খোদিত রয়েছে।

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। ছামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলি তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো এবং 'আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেমন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যেসব জায়গায় নিজেদের বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই যে তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা 'আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়ে শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ (আ.)-কে পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে ছামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁকে اَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ ছামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করার ও মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় হযরত সালেহ (আ.)-ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ এতদসঙ্গে আরও বললেন- قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতেও এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রীর ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ (আ.) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁকে স্তব্ধ করে দিতে পারব। সেমতে তারা দাবি করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে 'কাতেবা' পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

হযরত সালেহ (আ.) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কিনা? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন হযরত সালেহ (আ.) প্রথমে দু-রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবি পূরণ করে দিন।" দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দনে দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবির অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

হযরত সালেহ (আ.)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সরদার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আজাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন, এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনোরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়তো তোমরা আজাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আজাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না নতুবা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহর উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন এবং হযরত সালেহ (আ.)-এর মু'জিযা হিসাবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রুহুল্লাহ [আল্লাহর আত্মা] বলা হয়েছে। تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। জমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর জমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

ছামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নেবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ অর্থাৎ হে সালেহ, তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বণ্টন হবে– একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বণ্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে, যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে– هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

দ্বিতীয় আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির প্রতি শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে–

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا

এতে خُلَفَاءَ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قُصُوْرٌ শব্দটি قَصْر-এর বহুবচন। এর অর্থ– উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تَنْحِتُوْنَ শব্দটি نَحْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– প্রস্তর খোদাই করা। جِبَالٌ শব্দটি جَبَلٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– পাহাড়। بُيُوْتًا শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ি ও সাহায্য-সম্পত্তি তোমাদের দান করেছেন এবং তাদের এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরি কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়–

১. ধর্মের মূলবিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরিয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

২. পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

৩. তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করা হয় যেমন 'আদ ও ছামূদ জাতির সামনে আল্লাহ তা'আলা ধনসম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

৪. তাফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো নবী-রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। কারণ এগুলো মানুষকে গাফিল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে ছামূদ জাতির দু-দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হতো অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেন, এখানে দু-দলের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি صِيْغَه مَعْرُوْف -এ اِسْتَكْبَرُوْا বলা হয়েছে এবং মু'মিনদের গুণটি صِيْغَه مَجْهُوْل -এ اُسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ, যা দণ্ডনীয় ও তিরস্কৃত, পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মু'মিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মু'মিনদের বলল, তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, হযরত সালেহ (আ.) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল?

উত্তরে মু'মিনরা বলল, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, ছামূদ জাতির মু'মিনরা কি চমৎকার অলঙ্কারপূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কিনা। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্জ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না। আল্লাহর ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও ছামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল, যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধনসম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন! এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্জ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

قَوْلُهٗ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে ছামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আজাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না। যে সর্ববৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়,

তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের পরমাসুন্দরী কতিপয় নারী বাজি রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের কন্যাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দুজন যুবক 'মিসদা' ও 'কুযার' এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসতেই 'মিসদা' তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং 'কুযার' তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল। কুরআন পাক তাকেই ছামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে- إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا। কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আজাবে পতিত হয়। উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে।

فَتَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ অর্থাৎ আরও তিন দিন আরাম করে নাও [এরপরই আজাব নেমে আসবে]। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোনো উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং হযরত সালেহ (আ.)-এর একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলল, এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

হযরত সালেহ (আ.) বললেন, তাহলে আজাবের লক্ষণও শুনে নাও- আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি এ কথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং হযরত সালেহ (আ.)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আজাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভাবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। ছামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা হযরত সালেহ (আ.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

فَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তার তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে হযরত সালেহ (আ.)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে এর প্রতি আরো চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গজবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কালো হয়ে গেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন দিক থেকে কিভাবে আজাব আসে। এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হলো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ এখানে رَجْفَةٌ শব্দের অর্থ ভূমিকম্প। অন্যান্য আয়াতে اَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ।ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আজাবই এসেছিল, নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তারা فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ -এ পরিণত হয়েছিল। جَاثِمٌ শব্দটি جُثُوْمٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। [কামূস] অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَهْرِهٖ وَعَذَابِهٖ)

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কুরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমন রয়েছে, যা তাফসীরবিদরা ইসরাঈলী [অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের] বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার উপর কোনো ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে ছামূদ জাতির উপর আজাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আজাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে। -[তাফসীরে মাযহারী]

কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ছামূদ জাতির উপর আপতিত আজাব থেকে আবূ রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থ আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন ছামূদ জাতির আজাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন, তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েত আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্র আবূ রেগালেরই বংশধর। -[তাফসীরে মাযহারী]

এসব আজাববিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন পাক আরবদেরকে বারবার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে- لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا

আজাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ .... وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব নাজিল হওয়ার পর হযরত সালেহ (আ.) ও ঈমানদাররা সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মু'মিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়েমেনের 'হাজরামাওতে' চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, হযরত সালেহ (আ.) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সরদারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া হযরত সালেহ (আ.)-এর এ সম্বোধন আজাব অবতরণের পূর্বে হতে পারে যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ الخ : পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী।

হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত পড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হন। فَاٰمَنَ لَهُ لُوْطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) দেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেনানে গিয়ে অবস্থায় করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দসের অদূরেই অবস্থিত। হযরত লূত (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হতো। হযরত লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। [এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাসীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।]

কুরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে- كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ

হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভালমন্দের স্বাভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গুনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে হুঁশিয়ার করে বলেন- أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি? জেনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কুরআন পাক إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةً শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ اَلْفَاحِشَةَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং জেনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে, এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন, এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি। -[মাযহারী] ছামূদবাসীদের পূর্বে কোনো ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বলেন, কুরআনে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লিখিত না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোনো মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দুদিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। ১. অনেক গুনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায় যদিও তা কোনো শরিয়তসম্মত ওজর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোনো না-কোনো স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গুনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোনো কারণও নেই, তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। ২. যে ব্যক্তি কোনো মন্দকাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গুনাহ ও শাস্তি তো চাপেই, সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে- তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদরা এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতে অধিক গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যারা এ কাজ করে, তাদের ঐ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোনো উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন- فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ অর্থাৎ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। -[ইবনে কাসীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

তৃতীয় আয়াতে হযরত লূত (আ.)-এর উপদেশের জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে- তাদের দ্বারা যখন কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া সম্ভবপর হলো না, তখন রাগের বশবর্তী হয়ে পরস্পরে বলতে লাগল- এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবি করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে ছামূদ সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানি শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহর আজাবে পতিত হলো শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আজাব থেকে বেঁচে রইলেন। কুরআনের ভাষায় أَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهٗ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি হযরত লূত ও তাঁর পরিবারকে আজাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহল' সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, তাঁর পরিবারের মধ্যে দুটি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী মুসলমান হয়নি। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোনো মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, হযরত লূত

(আ.)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আজাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আহলের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বুঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদের আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-কে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদের নিয়ে শেষরাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আজাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আ.) এ নির্দেশ মতো স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদের নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে দু-রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দুর সঙ্গে চলার পর আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে পেছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আজাব এসে তাকেও স্পর্শ করল। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী আজাবে লিপ্ত হয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছনে ফিরে না দেখার নির্দেশ কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আজাব সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হূদে এ আজাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۔ অর্থাৎ যখন আমার আজাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার পালনকর্তার নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশি দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা ভূখণ্ডকে উপর তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আজাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আজাব এসেছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কারণ কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয় তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আজাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়ার আজাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কুরআন পাক আরবদের হুঁশিয়ার করে একথাও বলেছে যে, وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ উল্টে দেওয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কুরআন অবতরণের সময় নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ

অনুবাদ :

٨٥. وَ أَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مُعْجِزَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى صِدْقِيْ فَأَوْفُوا أَتِمُّوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا تَنْقُصُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ط بِبَعْثِ الرُّسُلِ ذٰلِكُمُ الْمَذْكُوْرُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ مُرِيْدِي الْإِيْمَانَ فَبَادِرُوْا إِلَيْهِ .

৮৫. মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার সত্য হওয়ার বিশদ প্রমাণ মু'জিযা এসেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে পুরোপুরিভাবে দেবে। লোকদেরকে তাদের বস্তু হ্রাস করে দেবে না, কম দেবে না। রাসূল প্রেরণ করে সংশোধন করার পর কুফরি ও অবাধ্যাচার করত পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমরা বিশ্বাসী হলে অর্থাৎ ঈমান আনয়নের ইচ্ছা পোষণ করলে তোমাদের জন্য তা উল্লিখিত বিষয়টিই কল্যাণকর। সুতরাং এ দিকেই তোমরা অগ্রবর্তী হও।

٨٦. وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ طَرِيْقٍ تُوْعِدُوْنَ تُخَوِّفُوْنَ النَّاسَ بِأَخْذِ ثِيَابِهِمْ أَوِ الْمَكْسِ مِنْهُمْ وَتَصُدُّوْنَ تَصْرِفُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ مَنْ اٰمَنَ بِهِ بِتَوَعُّدِكُمْ إِيَّاهُ بِالْقَتْلِ وَتَبْغُوْنَهَا تَطْلُبُوْنَ الطَّرِيْقَ عِوَجًا ج مُعْوَجَّةً وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ قَبْلَكُمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ أَيْ اٰخِرُ أَمْرِهِمْ مِّنَ الْهَلَاكِ .

৮৬. পথে বসে থাকবে না হুমকি দিতে صِرَاطٍ অর্থ পথ অর্থাৎ লোকদের উপর নিপীড়নমূলক টোল আদায় করতে ও তাদের কাপড়-চোপড় ছিনতাই করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে, আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর ধর্ম হতে বিশ্বাসীকে হত্যার হুমকি দিয়ে বিরত রাখতে ফিরিয়ে রাখতে। আর এতে অর্থাৎ আল্লাহর পথে দোষত্রুটি বক্রতা অনুসন্ধান করবে না। تَبْغُوْنَ -এর মূল অর্থ, অনুসন্ধান করা। স্মরণ কর, তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে অনন্তর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। রাসূলগণকে অস্বীকার করে তোমাদের পূর্বে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখ। অর্থাৎ শেষে কি ধ্বংসকর পরিণাম এদের ঘটেছিল দেখ।

٨٧. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهِ فَاصْبِرُوْا انْتَظِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ج وَبَيْنَكُمْ بِإِنْجَاءِ الْمُحِقِّ وَإِهْلَاكِ الْمُبْطِلِ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ أَعْدَلُهُمْ .

৮৭. আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস করে আর কোনো দল এতে বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্যধারণ কর অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ সত্যপন্থিকে মুক্তি দান করে ও বাতিলপন্থিদের ধ্বংস করে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান মীমাংসাকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَدْيَنَ : مَدْيَانُ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সন্তান, সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা বনী ইসরাঈলের বংশ সূত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র ইয়াকুব ইবনে ইসহাক থেকে হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এক নাম ছিল ইসরাঈল, এজন্যই তাঁর বংশধরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়- مَدْيَنَ একটি গ্রামের বসতির নাম এবং مَدْيَانُ -এর বংশধরকেও বনী মাদইয়ান বলা হয় হযরত শোয়ায়েব (আ.)ও এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হযরত শোয়ায়েব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর শ্বশুর ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) মিশর থেকে হিজরত করে মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন এবং তথায় দশ বছর অতিবাহিত করেন, আর এ সময়ের ভিতর হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কন্যার সাথে হযরত মূসা (আ.) বিবাহ হয়।

قَوْلُهُ مُرِيْدِى الْإِيْمَانَ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. হযরত শুআয়ব (আ.)-এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ মু'মিন ছিল না তথাপিও إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ মাযীর সীগাহ দ্বারা কেন সম্বোধন করা হলো?

উত্তর. উত্তরের সার হলো, যেহেতু হরফে শর্ত ও মাযীর সীগাহকে মাযী থেকে বের করে না, এজন্যই مُرِيْدِى শব্দটি উহ্য মানতে হয়েছে, যাতে করে অর্থ সঠিক হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হলো যদি তোমাদের ঈমান আনয়নের ইচ্ছা থাকে তবে উল্লিখিত কর্ম হতে ফিরে এস।

قَوْلُهُ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ শর্তের جَزَاء উহ্য রয়েছে, পূর্বের বাক্য তার جَزَاء নয় (تَزْوِيْجُ الْأَزْوَاجِ)

قَوْلُهُ اَلْمَكْسِ : খেরাজ, ট্যাক্স, ওশর। ওশর আদায়কারীকে اَلْمَكَّاسُ اَلْعَشَّارُ বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا الخ : পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আ.)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদাইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে জনপদে তারা বসবাস করতে, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব, 'মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে- وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এতে এ জনপদটিকেই বুঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে 'খতীবুল আম্বিয়া' বলা হয়। -[ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত] হযরত শোয়ায়েব (আ.) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআন পাকে কোথাও তাদেরকে 'আহলে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোথাও 'আসহাবে আইকা' নামে। 'আইকা' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আ.) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আজাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। 'আসহাবে মাদইয়ানের' উপর কোথাও صَيْحَة এবং কোথাও رَجْفَة এবং 'আসহাবে আইকার' উপর কোথাও ظُلَّة -এর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। صَيْحَه শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رَجْفَه শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظُلَّة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে নাজিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের এলাকায় ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে আল্লাহর অপরাধীরা কোনোরূপ গ্রেফতারী

পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নিচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার আজাবই তাদের উপর নাজিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সর্বশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাসীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন থেকে হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু-নাম হোক, হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু প্রকার : ১. সরাসরি আল্লাহর হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোনো উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন– ইবাদত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। ২. বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়বিক্রয়ের মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ধনসম্পদ লুটে নিত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু-আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও হক সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে– قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' -এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মু'জিযার বিভিন্ন প্রকার তাফসীর বাহরে মুহীত উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ এতে كَيْل শব্দের অর্থ মাপ এবং مِيْزَانْ শব্দের অর্থ ওজন করা। بَخْس শব্দের অর্থ কারও প্রাপ্য হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করে এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথম একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হতো। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ বলে সর্বপ্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা ধন-সম্পদ ইজ্জত-আবরু অথবা অন্য যে কোনো বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরি তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ইজ্জত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কুরআন পাকে مُطَفِّفِيْنَ ও تَطْفِيْف -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরিউক্ত সব বিষয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকু-সিজদা করতে দেখে বললেন, قَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওজনে ত্রুটি করেছ। –[মুয়াত্তা ইমাম মালেক] অর্থাৎ তুমি নামাজের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাজের হক পূর্ণ করাকে تَطْفِيْف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বে ও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলি পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সবরকম অনর্থ বিরাজমান ছিল, তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে- ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এটি আল্লাহর আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাব জড়িত। ইহকালের, মঙ্গল এজন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে বাধা দান করার জন্য পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থেকো না। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কাছে আগমনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দুটি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাট করত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। 'বাহরে, মুহীত' প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরিয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, যারা পথে বসে শরিয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করে, তারাও হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে- وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

এখানে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধনসম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে: পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর- কওমে নূহ, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আজাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ কর।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যাক মুসলমান হয় এবং কিছুসংখ্যক কাফেরই থেকে যায়; কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে- فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তাড়াহুড় কিসের? আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আজাব নাজিল হয়ে যাবে।

اَلْجُزْءُ التَّاسِعُ : নবম পারা

অনুবাদ :

٨٨. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ عَنِ الْاِيْمَانِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ تَرْجِعُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط دِيْنِنَا وَغَلَّبُوْا فِي الْخِطَابِ الْجَمْعَ عَلَى الْوَاحِدِ لِاَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَكُنْ فِيْ مِلَّتِهِمْ قَطُّ وَعَلٰى نَحْوِهٖ اَجَابَ قَالَ اَنَعُوْدُ فِيْهَا وَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ لَهَا اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ ـ

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ অর্থাৎ যারা ঈমান আনয়ন সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করেছিল বলল, তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ধর্মাদর্শে প্রত্যাগমন করতে হবে ফিরে আসতে হবে অন্যথায় হে শুআইব! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান আনয়ন করেছে সকলকে আমাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করে ছাড়ব। لَتَعُوْدُنَّ [তোমরা ফিরে আসবে] এ ক্রিয়াটিতে সম্বোধনের বেলায় একবচন ব্যবহার না করে বহুবচনের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ হযরত শুআইব কোনো কালেই তাদের মিল্লাতভুক্ত ছিলেন না [যে আজ পুনরায় ফিরে আসার কথা হবে।] হযরত শুআইবও পরে اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ বলে এই হিসাবেই জওয়াব দিয়েছিলেন। সে বলল, কি আমরা তা ঘৃণা করলেও এতে ফিরে আসব? اَوَلَوْ كُنَّا এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ অর্থাৎ অস্বীকারসূচক প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।

٨٩. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط ذٰلِكَ فَيَخْذُلُنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط اَيْ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَيْءٍ وَمِنْهُ حَالِيْ وَحَالُكُمْ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ اَحْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ الْحَاكِمِيْنَ ـ

৮৯. তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আল্লাহর উপর আমাদের মিথ্যারোপ করা হবে; আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তার ইচ্ছা না করলে এবং এরূপে আমাদের লাঞ্ছনা না চাইলে আর তাতে ফিরে আসা আমাদের কাজ নয় আমাদের জন্য তা উচিত নয়; সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত অর্থাৎ সকল কিছুতেই তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। আমার ও তোমাদের অবস্থাও তাঁর জ্ঞানের ভিতরে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও। তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। اِفْتَحْ এ স্থানে এটার অর্থ ফয়সালা করে দাও। فَاتِحِيْنَ এ স্থানে অর্থ মীমাংসাকারী, ফয়সালাকারী।

٩٠. وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ـ

৯০. তার সম্প্রদায়ের প্রধান অবিশ্বাসীগণ একজন অপরজনকে বলল, তোমরা যদি শুআইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। لَئِنْ -এর لَامْ টি قَسَمِيَّةٌ বা শপথ ব্যঞ্জক।

٩١. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ .

৯১. অনন্তর তারা রাজফা অর্থাৎ প্রবল ভূ-কম্পন দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তারা নিজগৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, নতজানু হয়ে মরে পড়ে রইল।

٩٢. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيْمُوْا فِيْهَا ج فِىْ دِيَارِهِمْ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ اَلتَّاكِيْدُ بِاِعَادَةِ الْمَوْصُوْلِ وَغَيْرِهِ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ فِىْ قَوْلِهِمُ السَّابِقِ .

৯২. শোয়ায়েবকে যারা অস্বীকার করেছিল তারা যেন সেখানে তাদের আবাস অঞ্চলে কোনো সময় বসবাসই করেনি শুআইবকে যারা অস্বীকার করেছিল তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। كَاَنْ এটা مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুভাবে উচ্চারিত। এর اِسْم এ স্থানে উহ্য। এটা মূলত ছিল كَاَنَّهُ [যেন এটা]। لَمْ يَغْنَوْا এ স্থানে অর্থ বসবাস করেনি। اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا এ স্থানে اِسْم مَوْصُوْل অর্থাৎ সংযোজক বিশেষ্য الذين ইত্যাদির উল্লেখসহ তার সম্প্রদায়ের উপরোল্লিখিত কথার প্রত্যুত্তর স্বরূপ এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে تَاكِيْد বা অর্থে জোর সৃষ্টি করা হলো উদ্দেশ্য।

٩٣. فَتَوَلّٰى اَعْرَضَ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ج فَلَمْ تُؤْمِنُوْا فَكَيْفَ اٰسٰى اَحْزَنُ عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْىِ .

৯৩. সে এদের নিকট হতে ফিরে গেল মুখ ফিরিয়ে নিল বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশও করেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি। অনন্তর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি কি করে আক্ষেপ করি দুঃখিত হই। فَكَيْفَ এ স্থানে اِسْتِفْهَام অর্থাৎ প্রশ্নবোধক শব্দটি نَفِىْ অর্থাৎ না-বাচক অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَغَلَّبُوْا فِى الْخِطَابِ الْجَمْعَ عَلَى الْوَاحِدِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উক্তি اَوْ لَتَعُوْدُنَّ দ্বারা জানা যায় যে, হযরত শোয়ায়েব (আ.) নবুয়তের দাবি করার পূর্বে স্বীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শের উপর স্থির ছিলেন। কেননা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়াকেই তো عَوْد বলা হয় অথচ নবীর থেকে কুফরি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।

উত্তর. জবাবের সার হলো– যে সকল লোকেবা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তারা যেহেতু ঈমান গ্রহণের পূর্বে স্বীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শ তথা মূর্তিপূজার উপর ছিল এ কারণেই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে تَغْلِيْبًا তাদের সাথে শরিক করে لَتَعُوْدُنَّ বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করেছেন। অন্যথায় হযরত শোয়ায়েব (আ.) থেকে কখনোই কুফরি প্রকাশ পায়নি।

قَوْلُهُ وَعَلٰى نَحْوِهِ اَجَابَ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. হযরত শোয়ায়েব (আ.) اِنْ عُدْنَا বলে নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি নিজেও সম্প্রদায়ের মতাদর্শভুক্ত ছিলেন।

উত্তর. মুফাসসির (র.) وَعَلٰى نَحْوِهِ اَجَابَ বলে এর উত্তর দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যেভাবে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে تَغْلِيْبًا কওমের অন্তর্ভুক্ত করে لَتَعُوْدُنَّ বলেছিল, অনুরূপভাবে হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও تَغْلِيْبًا বলেছেন اِنْ عُدْنَا -

قَوْلُهُ فَيَخْذُلْنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يَشَاءُ -এর মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা خُذْلَانٌ হবে مُطْلَقُ شَيْءٍ হবে না।

قَوْلُهُ اَىْ وَسِعَ عِلْمُهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عِلْمًا টা ফায়েল হতে مَنْقُولٌ হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ التَّاكِيْدُ بِاِعَادَةِ الْمَوْصُوْلِ : এই ইবারতের মাধ্যমে সেই সন্দেহকে বিদূরিত করা হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا বলার পরিবের্তে اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرُوْنَ বললে অধিক ভালো হতো। مَوْصُوْلٌ কে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন ছিল না। যমীরই যথেষ্ট ছিল।

উত্তরের সার হলো তাদের صِفَتْ كُفْر -এর তাকিদের জন্য مَوْصُوْلٌ -এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যমীরের মধ্যে এটা হয় না।

قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ فِىْ قَوْلِهِمُ السَّابِقِ : অর্থাৎ مَوْصُوْلٌ কে পুনরায় আনার কারণে তাদের صِفَتْ -كُفْر-এর تَاكِيْد হয়েছে। এমনিভাবে পূর্ববর্তী বাক্যের মতো এ বাক্যকেও স্বতন্ত্র ও مُسْتَقِلْ নিয়ে পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয় বস্তুর تَاكِيْد বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا الخ : হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আপনি যদি সত্যপন্থি হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হতো এবং অমান্যকারীদের উপর আজাব আসত। কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থি বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে হযরত শোয়ায়েব (আ.) বললেন, তাড়াহুড়া কিসের? অতিসত্বর আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সরদাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল− হে শোয়ায়েব! হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মু'মিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদের বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্ম ফিরে আসা কথাটি মু'মিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে হযরত শু'আইব (আ.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু হযরত শু'আইব (আ.) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহর কোনো পয়গম্বর কখনও কোনো মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। হযরত শু'আইব (আ.) উত্তরে বললেন− اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হলো।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত শু'আইব (আ.) জাতিকে বললেন, তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা। কেননা প্রথমত কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শু'আইব (আ.)-এর এ উক্তিতে একপ্রকার দাবি ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবি করা বাহ্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থি এবং নৈকট্যশীল ও অধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন, তাই পরে বলেছেন− مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি [আল্লাহ না করুন] আমাদের পালনকর্তাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনো কাজ করা অথবা না করার কে? কোনো সৎ কাজ করা অথবা মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মেহেরবানিতেই হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا অর্থাৎ আল্লাহর কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা-খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামাজ পড়তেও সক্ষম হতাম না।

জাতির অহংকারী সরদারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন হযরত শোয়ায়েব (আ.) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَتْح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فَاتِح শব্দটি قَاضِىْ অর্থাৎ বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়। -[বাহরে মুহীত]

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে হযরত শু'আইব (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদের ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহংকারী সরদারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পরে অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল- যদি তোমরা শু'আইবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেকুব মূর্খ প্রতিপন্ন হবে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

চতুর্থ আয়াতে তাদের উপর আপতিত আজাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে اَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া-দিবসের আজাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া-দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কালো মেঘের ছায়া পতিত হয়। এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন, হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমনকি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশি গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হলো। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নিচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হলো এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হলো। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আজাব দুই-ই আসে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশ ছায়ার আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষার সবক দেওয়া হয়েছে, যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا - غَنِىْ শব্দের এক অর্থ কোনো স্থানে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করত, আজাবের পর এমন অবস্থা হলো, যেন এখানে কোনোদিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ যারা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদের বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব আসতে দেখে হযরত শোয়ায়েব (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাফসীরবিদরা বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে হযরত শোয়ায়েব (আ.) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যখন আজাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হলো। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোনো ত্রুটি করিনি কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

অনুবাদ :

٩٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ فَكَذَّبُوْهُ اِلَّآ اَخَذْنَا عَاقَبْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّرَّآءِ الْمَرَضِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ يَتَذَلَّلُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ .

৯৪. আমি কোনো জনপদে নবী প্রেরণ করলে আর তারা তাঁকে অস্বীকার করলে তার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ, চরম দারিদ্র্য ক্লেশ, পীড়া দ্বারা আক্রান্ত করি অর্থাৎ তাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি দেই যাতে তারা আনত হয়, নতি স্বীকার করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে।

٩٥. ثُمَّ بَدَّلْنَا اَعْطَيْنَاهُمْ مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْعَذَابِ الْحَسَنَةَ الْغِنٰى وَالصِّحَّةَ حَتّٰى عَفَوْا كَثُرُوْا وَقَالُوْا كُفْرًا لِلنِّعْمَةِ قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ كَمَا مَسَّنَا وَهٰذِهٖ عَادَةُ الدَّهْرِ وَلَيْسَتْ بِعُقُوْبَةٍ مِنَ اللّٰهِ فَكُوْنُوْا عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ بَغْتَةً فُجَاْةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ مَجِيْئِهٖ قَبْلَهٗ .

৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে অর্থাৎ আজাবের অবস্থাকে কল্যাণ সচ্ছলতা ও স্বাস্থ্যে পরিবর্তিত করি অর্থাৎ তার স্থলে এটা দান করি শেষ তারা অধিক্যের প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং এ সমস্ত নিয়ামত ও আল্লাহর অনুগ্রসমূহের নাশুকরি ও অকৃতজ্ঞতা করত বলে, আমাদের পূর্বপুরুষও তো দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করেছে যেমন আমরা করেছি। এটা কালের রীতি। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ নয়। সুতরাং তোমরা যেভাবে ছিলে সেভাবেই থাক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন অনন্তর, অকস্মাৎ আমি এমনভাবে তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করি যে তারা পূর্ব হতে এটার আগমনের সময় উপলব্ধিও করতে পারে না। بَغْتَةً অর্থ, অকস্মাৎ।

٩٦. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى الْمُكَذِّبِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِمْ وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِىَ لَفَتَحْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَاَخَذْنٰهُمْ عَاقَبْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

৯৬. যদি জনপদের অবিশ্বাসীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করত এবং কুফরি ও অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকত তবে তাদের জন্য বৃষ্টির মাধ্যমে আকাশমণ্ডলীর ও উদ্ভিদ জন্মিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম। কিন্তু তারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি, শাস্তিদান করেছি। لَفَتَحْنَا এটা তাশদীদসহ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٩٧. اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى الْمُكَذِّبُوْنَ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا عَذَابُنَا بَيَاتًا لَيْلًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ غَافِلُوْنَ عَنْهُ .

৯৭. তবে কি অবিশ্বাসী জনপদবাসীগণ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর রাত্রিতে চড়াও হবে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন অর্থাৎ এ সম্পর্কে তারা অসচেতন بَاْسُنَا অর্থ, আমার শাস্তি। بَيَاتًا অর্থ রাত্রি

৯৮. اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى نَهَارًا وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

৯৮. অথবা জনপদ অধিবাসীগণ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর নিপতিত হবে পূর্বাহ্নে দিনে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত।

৯৯. اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ج اِسْتِدْرَاجَهُ اِيَّاهُمْ بِالنِّعْمَةِ وَاَخْذَهُمْ بَغْتَةً فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

৯৯. তারা কি আল্লাহর কৌশলের অর্থাৎ নিয়ামত প্রদান করত প্রথমে সুযোগ দানের পরে অকস্মাৎ পাকাড়াও করার যে কৌশল সেই সম্পর্কে কি ভয় রাখে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহর কৌশল হতে আর কেউই নিশ্চিন্ত হয় না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ : এটা جُمْلَهٔ مُسْتَانِفَهْ হয়েছে, বিশেষ উম্মতদের ঘটনার বিবরণ দানের পর এখন থেকে আল্লাহর সাধারণ অভ্যাস ও ব্যাপক নীতিমালার বিবরণ প্রদান করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ يَضَّرَّعُوْنَ : এ সীগাহটি মূলত ছিল يَتَضَرَّعُوْنَ এরপর تَاءْ -কে ضَادْ দ্বারা পরিবর্তন করে ضَادْ -কে ضَادْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে ফলে يَضَّرَّعُوْنَ গঠিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِسْتِدْرَاجَهُ اِيَّاهُمْ : اِسْتِدْرَاجْ বলা হয় কোনো কাজকে ধীরে ধীরে করাকে। مَكْرٌ শব্দের অর্থ হলো– ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা। আল্লাহর দিকে এর সম্বন্ধ করা ঠিক নয়। এখানে مَكْرٌ দ্বারা اِسْتِدْرَاجْ بِالْاِسْتِعَارَةِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ধীরে ধীরে নিয়ামত ও সুস্থতার মাধ্যমে অবকাশ দিয়ে আটক করা গ্রেফতারকৃত তা অনুভবও করতে পারে না।

قَوْلُهُ عَفَوْا : এটা বাবে نَصَرَ -এর عَفْو মাসদার হতে جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, এর অর্থ স্বল্প হওয়াও আসে। এটা اَضْدَادْ -এর অন্তর্ভুক্ত। عَفَوْا ، كَثُرُوْا نَمَوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يُقَالُ عَفَا النَّبَاتُ وَعَفَا الشَّحْمُ وَالْوَبَرُ اِذَا كَثُرَتْ وَيُقَالُ عَفَا كَثُرَ وَعَفَا : دَرَسَ هُوَ مِنْ اَسْمَاءِ الْاَضْدَادِ (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ الْبَاْسَ : اَلْبَاْسُ এবং بُؤْسٌ অর্থ-দরিদ্রতা, ক্ষুধার্ত, ضُرٌّ এবং ضَرَّاءُ অর্থ হলো শারীরিক কষ্টদায়ক রোগ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ الخ : পূর্ববর্তী নবীরা (আ.) তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলি, যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকূ পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের। এ কাহিনীর আলোচনা পরবর্তী নয়টি আয়াতের পর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে যাচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআনে করীম বিশ্ব-ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তাঁর বর্ণনারীতি হলো এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মতো আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এ বিপদাপদের চাপে তারা নিজেদের গতিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয় বেশি। আর এ বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাহমানুর-রাহীমেরই দান।

উল্লিখিত আয়াতে أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ বাক্যটির মর্মও তাই। بَأْسَاءُ ও بُؤْسٌ শব্দ দুটির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضَرَّاءُ ও ضُرٌّ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো অভিধানবিদ অবশ্য بُؤْسٌ ও بَأْسَاءُ শব্দ দুটির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضُرٌّ ও ضَرَّاءُ অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেওয়া যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে একগুঁয়েমি- ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا এখানে سَيِّئَةٌ শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حَسَنَةٌ শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য-ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক; ধনসম্পদের বিস্তৃতি ও সচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। পরবর্তী عَفَوْا শব্দটি عَفْو থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা। বলা হয় عَفَا النَّبَاتُ ঘাস বা বৃক্ষের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। عَفَا الشَّحْمُ وَالْوَبَرُ অর্থাৎ পশুর মেদ ও লোম বেড়ে গেছে। এ অর্থেই এখানে عَفَوْا শব্দের অর্থ হবে বেড়ে গেছে বা উন্নতি করেছে।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছে তাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে আকৃতকার্য হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেওয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখকষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি, বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ অর্থাৎ এটা কোনো নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়, বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ; কখনও রোগ, কখনও স্বাস্থ্য কখনও দারিদ্র্য, কখনও সচ্ছলতা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্বপুরুষেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সারকথা, প্রথম পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছে বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টের মাধ্যমে। তাতে তারাও আকৃতকার্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেওয়া হলো, আরাম-আয়েশে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু তাতেও তারা তেমনি আকৃতকার্য রয়ে গেল। কোনোমতেই নিজেদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে এলো না। আর তখনই ধরা পড়ল আকস্মিক আজাবের মধ্যে। أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بَغْتَةً [বাগতাতান] হঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ- যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই আকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদের আকস্মিক আজাবের মাধ্যম ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনো খবরই ছিল না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা! যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানি থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকত খুলে দেওয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেওয়া অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো আর জমিন থেকে যে কোনো বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত হতো এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। তাতে তাদেরকে এমন কোনো চিন্তাভাবনা কিংবা টানাপড়েনের সম্মুখীন হতে হতো না, যার দরুন বড় বড় নিয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু-রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া কিংবা সামান্য খাদ্যদ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া, যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, আবার কোনো কোনো সময় মূল বস্তুতে বাহ্যত কোনো বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এত বেশি কাজ হয় যা এমন

দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণত সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোনো একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোনো আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরি করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোনো সুযোগ আসে না অথবা উপকার আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধনসম্পদেও হতে পারে, মন-মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজকর্মেও হতে পারে। কোনো কোনো সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোনো কোনো সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোনো কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোনো সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘণ্টায়ও করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহু গুণ বেশি।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তুরাজির বরকত ঈমান ও পরহেজগারির উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহেজগারির পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেজগারি পরিহার করলে সেগুলো কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়, বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশি যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচুর্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ণ ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এ ছাড়া আর কি বলা বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের মধ্যে যে বরকত ছিল তা শেষ হয়ে গেছে?

এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা আন'আমের এক আয়াতে কাফের ও দুরাচারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহর নির্দেশসমূহে বিস্মৃত হয়ে গেছে, তখন আমি তাদের উপর যাবতীয় বিষয়ের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছি এবং অতঃপর আকস্মিকভাবে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করেছি। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীতে কারো জন্য সব বিষয়ের দরজা খুলে যাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র অনুগ্রহই নয়; বরং তা আল্লাহর এক প্রকার গজবও হতে পারে। আর এখানে বলা হয়েছে যে, যদি তারা ঈমান ও পরহেজগারি অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও জমিনের বরকত লাভ করতে পারা আল্লাহর দান ও সন্তুষ্টির পরিচায়ক।

কথা হলো এই যে, পৃথিবীর বরকত ও নিয়ামাতসমূহ কখনও পাপাচার ও ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করার পর মানুষের পাপকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে এবং তা একান্তই সাময়িক হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তা গজব ও অভিশাপেরই লক্ষণ! আবার কখনও এ নিয়ামত ও বরকত আল্লাহর দান এবং রহমত হিসাবে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তখন তা হয় ঈমান ও পরহেজগারির ফল। বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পরিণতি ও ভবিতব্য সম্পর্কে কারোই কিছু জানা নেই। তবে যাঁরা আল্লাহর ওলী, তাঁরা লক্ষণ-নির্দেশনের আলোকে এরূপ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন যে, যখন ধনসম্পদ এবং আরাম-আয়েশের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর শুকরিয়া ও ইবাদতের অধিকতর তৌফিক লাভ হয়, তখনই বোঝা যায় যে, এটা রহমত। আর যদি ধনসম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অমনোযোগ এবং পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা আল্লাহর গজবের লক্ষণ। আমরা তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

চতুর্থ আয়াতে পুনরায় পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, সেই জনপদের অধিবাসীরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমার আজাব এমনি অবস্থায় এসে আঘাত করবে, যখন হয়তো তারা রাতের নিদ্রায় মগ্ন থাকবে? তাছাড়া এ জনপদবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, আজাব তাদেরকে এমন অবস্থায় এসে আঘাত করে বসবে, যখন তারা মধ্য-দিবসে খেলাধুলায় মত্ত থাকবে। এরা কি আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? তাহলে যথার্থই জেনে রাখ, আল্লাহর সে অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়মিতির ব্যাপারে সে জাতিই কেবল নিশ্চিন্ত হতে পারে, যারা অনিবার্যভাবেই সর্বনাশের সম্মুখীন।

সারমর্ম হলো এই যে, এসব লোক যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত নয় যে, তাদের প্রতি আল্লাহর আজাব রাতে কিংবা দিনের বেলায় যে কোনো অবস্থায় এসে যেতে পারে। যেমন বিগত জাতিসমূহের প্রতি অবতীর্ণ আজাবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে অন্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং যেসব কাজ অন্যের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে সেসব কাজের ধারে-কাছেও না যাওয়া।

অনুবাদ :

١٠٠. اَوَلَمْ يَهْدِ يَتَبَيَّنْ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ بِالسُّكْنٰى مِنْۢ بَعْدِ هَلَاكِ اَهْلِهَا اَنْ فَاعِلٌ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهُ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ بِذُنُوْبِهِمْ ج كَمَا اَصَبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَالْهَمْزَةُ فِى الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ لِلتَّوْبِيْخِ وَالْفَاءُ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْوَاوِ فِى الْمَوْضَعِ الْاَوَّلِ عَطْفًا بِاَوْ وَ نَحْنُ نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ الْمَوْعِظَةَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ ـ

১০০. কোনো অঞ্চলের জনগণের ধ্বংসের পর যারা তার বসবাসের উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি সুস্পষ্ট হয়নি। যে আমি ইচ্ছা করলে এদের পূর্ববর্তীদেরকে যেমন শাস্তিভোগ করিয়েছি এদের পাপের দরুন এদেরকে বিপদাপন্ন করতে পারি। শাস্তি দিতে পারি। اَنْ এটা مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত ও তাশদীদহীনরূপে পঠিত। এটার اِسْم এ স্থানে উহ্য। মূলত ছিল اَنَّهُ এটা এ স্থানে [لَمْ يَهْدِ ক্রিয়ার] فَاعِل অর্থাৎ কর্তারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরিউক্ত চারটি স্থানে অর্থাৎ ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০ নং আয়াতের শুরুতে হামযাটিকে تَوْبِيْخ [যথাক্রমে اَفَاَمِنَ ، اَوَ اَمِنَ ، اَفَاَمِنُوْا ، اَوَلَمْ يَهْدِ] অর্থাৎ হুমকি ও তিরস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর পরবর্তী ف এবং و অক্ষর দ্বয় عَطْف বা অন্বয়সূচক অক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে প্রথমোক্ত اَوْ সাকিনরূপে عَطْف বা অন্বয়সূচক অক্ষর اَوْ হিসাবে পঠিত রয়েছে। আর আমরা তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেব সিল মেরে দেব ফলে তারা চিন্তা করার মতো উপদেশ শুনবে না।

١٠١. تِلْكَ الْقُرٰى الَّتِىْ مَرَّ ذِكْرُهَا نَقُصُّ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ اَنْۢبَائِهَا ج اَخْبَارِ اَهْلِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا عِنْدَ مَجِيْئِهِمْ بِمَا كَذَّبُوْا كَفَرُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ ط قَبْلَ مَجِيْئِهِمْ بَلِ اسْتَمَرُّوْا عَلَى الْكُفْرِ كَذٰلِكَ الطَّبْعُ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

১০১. এ জনপদসমূহের অর্থাৎ পূর্বে যেগুলোর উল্লেখ করা হলো সেগুলোর অধিবাসীদের কিছু বৃত্তান্ত হে মুহাম্মদ! আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ এসেছিল কিন্তু এদের আগমনের পূর্বে যা তারা অস্বীকার করেছিল এদের আগমনের পরও তাতে তারা বিশ্বাস করার ছিল না বরং তারা কুফরির উপরই স্থায়ী হয়ে রইল। এরূপ মোহর করার মতো আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মোহর করে দেন।

١٠٢. وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ اَىِ النَّاسِ مِنْ عَهْدٍ ج اَىْ وَفَاءٍ بِعَهْدِ يَوْمَ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ـ

১০২. আমি তাদের অর্থাৎ লোকদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থাৎ তাদের নিকট হতে যে ওয়াদা নেওয়া হয়েছিল তা পালন করতে পাইনি। তাদের অধিকাংশকে অবশ্য সত্যত্যাগীই পেয়েছি। وَاِنْ এ اِنْ টি এ স্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত ও তাশদীদহীনভাবে রূপান্তরিত।

١٠٣. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ أَيِ الرُّسُلِ الْمَذْكُورِيْنَ مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا التِّسْعِ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ قَوْمِهٖ فَظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِهَا ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ بِالْكُفْرِ مِنْ إِهْلَاكِهِمْ.

১০৩. তাদের অর্থাৎ উল্লিখিত রাসূলগণের পর মূসাকে আমার নয়টি নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার দল সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করি কিন্তু তারা এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে তা অস্বীকার করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যান করত বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল। কিভাবে এদের ধ্বংস হয়েছিল।

١٠٤. وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ إِلَيْكَ فَكَذَّبَهٗ.

১০৪. হযরত মূসা (আ.) বলল, হে ফেরাউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছি।

١٠٥. فَقَالَ أَنَا حَقِيْقٌ جَدِيْرٌ عَلٰى أَنْ أَيْ بِأَنْ لَا أَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ط وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الْيَاءِ فَحَقِيْقٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ أَنْ وَمَا بَعْدَهٗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ إِلَى الشَّامِ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ وَكَانَ اسْتَعْبَدَهُمْ.

১০৫. কিন্তু সে তা অস্বীকার করল তখন তিনি বললেন, আমি এতে দৃঢ় যে, على ان -এর على শব্দটি এ স্থানে ب অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য মাননীয় তাফসীরকার এটার তাফসীরে بان উল্লেখ করেছেন। এর যোগ্য যে, আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলব না। على অপর এক কেরাতে এটার ى অক্ষরটি তাশদীদসহ [علىّ রূপে] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় حقيق শব্দটি مبتدأ এবং ان ও এর পরবর্তী শব্দসমূহ خبر রূপে গণ্য হবে। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমদের নিকট এসেছি। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে সিরিয়া যেতে দাও। সে [ফেরাউন] তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল।

١٠٦. قَالَ فِرْعَوْنُ لَهٗ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ عَلٰى دَعْوَاكَ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْهَا.

১০৬. সে ফেরাউন তাঁকে বলল যদি তুমি তোমার দাবির উপর কোনো নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি এতে সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।

١٠٧. فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ.

১০৭. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন এটা এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল, বিরাট এক সাপে পরিণত হলো।

١٠٨. وَنَزَعَ يَدَهٗ أَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهٖ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ ذَاتُ شُعَاعٍ لِلنّٰظِرِيْنَ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأُدْمَةِ.

১০৮. এবং তিনি তাঁর হাত জামার ফোকর হতে টানলেন বের করলো তৎক্ষণাৎ তা নিজের স্বাভাবিক গৌরবর্ণের বিপরীত দর্শকদের দৃষ্টিতে সুউজ্জ্বল শুভ্র প্রতিভাত হলো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَتَبَيَّنَ : প্রশ্ন. يَهْدِ-এর সেলাহ لَامْ আসে না। এখানে لِلَّذِيْنَ -এর মধ্যে يَهْدِ-এর সেলাহ لَامْ ব্যবহার হলো কেন?

উত্তর. মুফাসসির (র.) يَهْدِ -এর তাফসীর يَتَبَيَّنَ দ্বারা করে এ সংশয়েরই নিরসন করেছেন। অর্থাৎ يَهْدِ টা يَتَبَيَّنْ -এর অর্থে হয়েছে। আর يَتَبَيَّنَ -এর সেলাহ لَامْ আসে।

قَوْلُهُ بِالسُّكْنٰى : প্রশ্ন. কোন উদ্দেশ্যে اَلسُّكْنٰى শব্দটিকে বৃদ্ধি করা হয়েছে?

উত্তর. مِلْك বা মালিকানা বাস্তবায়ন শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের দ্বারাই হয় না। এর জন্য سُكُوْنَتْ -এর করায়ত্ত জরুরি। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই মুফাসসির (র.) اَلسُّكْنٰى শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ اِنْ فَاعِلٌ : اِن টা তার পরবর্তীর সাথে মিলে يَهْدِ -এর فَاعِلْ হয়েছে। نَهْدِ তথা يَاءْ-এর পরিবর্তে نُوْنْ দ্বারাও পঠিত রয়েছে। আর نُوْنْ যোগে পঠিত কেরাতে আল্লাহ فَاعِلْ হবে। আর نَهْدِ اِنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ বাক্যটিকে ফে'লের মাফঊল হবে। অর্থাৎ اِنَّ الشَّانَ هُوَ هٰذَا

আর يَهْدِ তথা يَاءْ যোগে পঠিত কেরাতে اِنْ لَوْ نَشَاءُ بِذُنُوْبِهِمْ فَاعِلْ হবে বাক্যটি (تَسْهِيْل) আর اِنْ টা হলো مُخَفَّفَةْ عَنِ الثَّقِيْلَةِ -এর اِسْم হলো ، যা ضَمِيْر شَان উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ انه আর لَوْ نَشَاءُ বাক্যটি তার খবর, আর তার পরবর্তী অংশ يَهْدِ -এর ফায়েল। আবার يَهْدِ -এর ফায়েল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীরও হতে পারে এবং ঐ যমীরের মারজি' তা হবে যা بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ سِيَاقِ كَلَامْ দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ اَوَ لَمْ يَهْدِ مَا جَرٰى لِلْاُمَمِ السَّابِقَةِ এ সুরতে اِنْ এবং তার পরবর্তী অংশ مَحَلًّا মাফঊল হবে। প্রথম সুরতে উহ্য ইবারত হলো- اَوَ لَمْ يَهْدِ اللّٰهُ وَيُبَيِّنْ لِلْوَارِثِيْنَ مَالَهُمْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِهِمْ
اَصَابَتْنَا اِيَّاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَيَكُوْنُ الْمَفْعُوْلُ بِهِ مَحْذُوْفًا كَمَا قَدَّرْنَا

আর দ্বিতীয় সুরতে উহ্য ইবারত এরূপ হবে- اَوَلَمْ يُبَيِّنْ فِىْ وَضْعِ اللّٰهِ مَا جَرٰى لِلْاُمَمِ اَصَابَتْنَا اِيَّاهُمْ لَوْ نَشَاءُ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ فِىْ مَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ : যার মধ্যে প্রথম তিনটি পূর্বের রুকূতে রয়েছে আর চতুর্থটি এ রুকূর শুরুতে রয়েছে। এ স্থানগুলোতে হামযা وَاوْ ও فَاءْ-এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হলো اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى আর শেষটি হলো اَوَ لَمْ يَهْدِ দুটি হলো فَاءْ-এর সাথে এবং দুটি وَاوْ -এর সাথে।

قَوْلُهُ الْوَاوُ دَاخِلَةٌ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ : প্রশ্ন. হরফে আতফের উপর প্রশ্নবোধক হামযা প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ।

উত্তর. নিষিদ্ধ তো রয়েছে عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ -এর ক্ষেত্রে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ -এর ক্ষেত্রে নয়। কেননা جُمْلَةٌ بَعْدَ الْجُمْلَةِ এটা كَلَامٌ مُسْتَانِفٌ হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ الخ : উল্লিখিত আয়াতসমূহেও বিগত জাতিসমূহের ঘটনাবলি এবং অবস্থার কথা শুনিয়ে বর্তমান আরব-আজমের সমস্ত জাতিকে এ বিষয় জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব ঘটনায় তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় সতর্কবাণী রয়ে গেছে। যেসব কর্মের ফলে বিগত দিনের লোকদের উপর আল্লাহ গজব ও আজাব নাজিল হয়েছে, সেগুলোর কাছেও যাবে না। আর যেসব কর্মের দরুন নবী-রাসূল (আ.) ও তাঁদের অনুসারীরা সাফল্য লাভ করেছেন সেগুলো অবলম্বন করবে। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ

هَدٰى يَهْدِىْ অর্থ- চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেওয়া। এখানে এর কর্তা হলো সে সমস্ত ঘটনাবলি যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় যেসব অতীত ঘটনাবলি একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরি ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা [অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ] ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ তা'আলার আজাব ও গজব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ শব্দের অর্থ- ছাপ এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলি থেকেও কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহর গজবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায় তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছে যে, কোনো লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে, আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি

লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে তওবা না করে, তাহলে এ কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভালো-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালোকে মন্দ: মন্দকে ভালো এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থাটিকেই কুরআনে رَانَ অর্থাৎ অন্তরের মরচে বলে অবহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকে আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طَبْع অর্থাৎ মোহর এঁটে দেওয়া বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোনো প্রতিক্রিয়া স্বাভাবত হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ 'তারা বোঝে না' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কুরআনে কারীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তারা শোনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোনো সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হলো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোনো রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোনো বিষয়ের ভালো কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآئِهَا এখানে اَنْبَاءُ শব্দটি نَبَأٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ- কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোনো কোনো ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে مِنْ বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলি আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয় বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূলরা তাদের কাছে মু'জিযা [অলৌকিক নিদর্শন]-সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত যে, এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জিযা এবং দলিল-প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় এই জানা গেল যে, সমস্ত নবী-রাসূলকেই মু'জিযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো নবী (আ.)-এর মু'জিযার আলোচনা কুরআনে এসেছে, অনেকের আসেওনি। এতে এমন কোনো ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জিযার বিষয় কুরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোনো মু'জিযাই ছিল না। আর সূরা হুদ-এ হযরত হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে- مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ আপনি কোনো মু'জিযা উপস্থিত করেননি। এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকরিতা ও একগুঁয়েমি, কিংবা তাঁর মু'জিযাগুলোকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করে এ কথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে কোনো ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ আসুক না কেন তারা নিজের ধ্যানধারণায় অটল থাকত। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলিম-ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থিত হলেও তাঁরা নিজের সে ধারণারই অনুসরণ করতে থাকেন। সুফিতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহর গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট না থাকে। তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমি প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী রূপে পাইনি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা বলতে عَهْدِ اَلَسْتُ [আহদে-আলাস্তু] বুঝানো হয়েছে যা সৃষ্টির আদিলগ্নে সমস্ত সৃষ্টির জন্মের পূর্বে যখন তাদের আত্মাগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন আল্লাহ সেগুলোর কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ। অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পরওয়ারদিগার নই? তখন সমস্ত রূহ বা মানবাত্মা প্রতিজ্ঞা ও স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তর দিয়েছিল بَلٰى অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পরওয়ারদিগার। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর অধিকাংশ লোকেই সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেছে। আল্লাহকে পরিত্যাগ করে সৃষ্টবস্তুর পূজার অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছে। সে জন্যই এ আয়াতে আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল পাইনি। অর্থাৎ ওয়াদা পূরণে তাদেরকে যথাযথ পাইনি। –[তাফসীরে কাবীর]

আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'ওয়াদা' বলতে ঈমানের ওয়াদা বুঝানো উদ্দেশ্য। কুরআনে বলা হয়েছে– اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا। এক্ষেত্রে 'আহদ' বা প্রতিজ্ঞা অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। কাজেই আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অধিকাংশই আমার সাথে ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া অর্থ হলো এই যে, সাধারণত মানুষ যখন কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, যত মন্দ লোকই হোক না কেন, তখন সে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে বা মুখে এমন প্রতিজ্ঞা করে নেয় যে, বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে আল্লাহর আনুগত্য এবং উপাসনায় আত্মনিয়োগ করব, নাফরমানি বা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকব। যেমন, কুরআন মাজীদেও এমনি বহু লোকের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা বিপদমুক্ত হয়ে যখন শান্তি ও স্থিতিশীলতায় ফিরে আসে, তখন আবার রিপুজনিত কামনা-বাসনায় জড়িয়ে পড়ে এবং কৃত ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়।

উল্লিখিত আয়াতের اَكْثَرُ। শব্দটি দ্বারা সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা বহু লোক এমন হতভাগাও রয়েছে যে, বিপদের সময়েও এরা আল্লাহকে স্মরণ করে না, তখনও এরা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগের কোনো মানেই হয় না। আর এমনও অনেক লোক রয়েছে, যারা প্রতিজ্ঞাও পূরণ করে এবং ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও সম্পাদন করে। কাজেই বলা হয়েছে– وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকে প্রতিজ্ঞা পূরণকারী পাইনি। তারপর বলা হয়েছে– وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি। এ পর্যন্ত অতীতের নবী-রাসূল (আ.) এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সে জন্যই কুরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى الخ : এ সূরায় নবী-রাসূল এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে, এ হলো সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ বিগত অন্য নবী-রাসূলদের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশি, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশি কঠিন। তদুপরি এ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের কথা এসেছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আ.)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা 'আয়াত' বলতে আসমানি কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফেরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَظَلَمُوا بِهَا : এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হলো নিদর্শন। অর্থাৎ তারা আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হলো এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোনো মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞান করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করেছে। কারণ জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা। অতঃপর বলা হয়েছে- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব-পালক আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুয়তি মর্যাদা তার দাবি হলো, যাতে আমি আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো বিষয় আরোপ না করি। কারণ নবীগণের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাঁদের কাছে আল্লাহর আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবির সপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহও প্রমাণ হিসাব রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শোন, আমার কথা মান। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোনো কথাই লক্ষ্য করল না; মু'জিযা দেখাবার দাবি করতে লাগল এবং বলল- اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ বাস্তবিক যদি তুমি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। হযরত মূসা (আ.) তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ 'ছু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُبِيْنٌ [মুবীন] শব্দ উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে লাঠিটি সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোনো ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না- সাধারণত যা জাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হলো প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফিরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হলো; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। -[তাফসীরে কবীর]

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না তা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেওয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোনো ঐশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মতো কোনো বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ - نَزْعٌ [নায্উন] অর্থ হচ্ছে কোনো একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভিতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দুটি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে- اُدْخُلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ যার অর্থ হলো, স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে থেকে অর্থাৎ কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখানে থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত- فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ সেই হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

بَيْضَاءُ [বাইদাউন]-এর শাব্দিক অর্থ– সাদা। আর হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোনো সময় শ্বেতি রোগের কারণও হতে পারে। তাই অন্য এক আয়াতে এক্ষেত্রে مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ শব্দটিও সংযোজিত করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোনো উপসর্গের কারণে ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, এ শুভ্রতাও সাধারণ শুভ্রতা ছিল না; বরং তার সঙ্গে এমন দীপ্তিও থাকত, যার ফলে সমগ্র পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত! –[কুরতুবী]

এখানে لِلنّٰظِرِيْنَ [দর্শকদের জন্য] কথাটা বাড়িয়ে উল্লিখিত প্রদীপ্তির বিস্ময়করতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে দীপ্তি এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ছিল যে, তা দেখার জন্য দর্শকরা এসে সমবেত হতো।

তখন ফেরাউনের দাবিতে হযরত মূসা (আ.) দুটি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া, আর অপরটি হলো হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। আর দ্বিতীয়টি তাদের আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন : মিশর সম্রাটগণের উপাধি ছিল ফেরাউন, এটি কোনো নির্দিষ্ট বাদশাহের নাম ছিল না। ফেরাউন শব্দের অর্থ হলো সূর্য দেবতার সন্তান। পূর্বযুগে মিশরবাসীরা সূর্যকে [যা তাদের মহাদেবতা বা رَبِّ اَعْلٰى ছিল] رَعْ বলত। আর فِرْعَوْنَ শব্দটি সেদিকেই مَنْسُوْبٌ ছিল। মিশর অধিপতিরা নিজেদেরকে তার শারীরিক বহিঃপ্রকাশ ও মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার ছিল। এজন্যই যারাই মিশরের শাসনকর্তা হতো তারাই নিজেদেরকে সূর্যসন্তান রূপে উপস্থাপন করত। যেমন হিন্দুস্তানেও অনেক বংশ নিজেদেরকে সূর্যসন্তান বলে দাবি করে থাকে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৯৪৮ বছর পূর্ব হতে নিয়ে সিকান্দারের যুগ পর্যন্ত ৩১টি বংশধর মিশরের শাসনকর্তা ছিল। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন কে ছিল? সাধারণ আরব ঐতিহাসিকগণ ও মুফাসসিরগণ তাকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কেউ তার নাম ওলীদ ইবনে রাইয়ান কেউ মুসআব ইবনে রাইয়ান বলে থাকেন। মুহাক্কিকগণের মতে তার নাম 'রাইয়ান' ছিল। ইবনে কাছীর বলেন যে, তার কুনিয়ত اَبُوْ مُرَّةَ ছিল। এ সকল উক্তি পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নব্য মিশরীয় গবেষণা ও শিলালিপির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মতামত হলো– হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন হলো দ্বিতীয় রামীসাসের পুত্র مِنْفَتَاحْ, যার রাজত্ব কাল খিস্টপূর্ব ১২৯২ হতে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১২২৫ সালে এসে শেষ হয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার সূত্রে দুজন ফেরাউনের আলোচনা এসে যায়। প্রথমজন হলো সেই ফেরাউন যার যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যার ঘরে থেকে লালিত-পালিত হয়েছেন। আর দ্বিতীয়জন হলো ঐ ফেরাউন যার নিকট হযরত মূসা (আ.) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন এবং বনী ইসরাঈলকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ফরমান জারি করেছেন। সর্বশেষ সে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে। আধুনিক গবেষকদের মতামত হলো, প্রথম ফেরাউন হলো দ্বিতীয় রামিসাস, আর দ্বিতীয় ফেরাউন হলো যার আলোচনা তাফসীরের কিতাবে এসেছে সে ছিল দ্বিতীয় রামিসাসের ছেলে مِنْفَتَاحْ; এই শাসকই বনী ইসরাঈলকে ভৃত্যে রূপান্তরিত করেছিল। তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাত। যার বিস্তারিত আলোচনা সূরায়ে বাকারাতে করা হয়েছে।

–[তাফসীরে জামালাইন খ. ২, পৃ. ৪০৯-৪১০]

অনুবাদ :

١٠٩. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ فَائِقٌ فِي عِلْمِ السِّحْرِ وَفِي الشُّعَرَاءِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ فِرْعَوْنَ نَفْسِهِ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوْا مَعَهُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشَاوُرِ .

১০৯. ফেরাউন প্রধানগণ বলল, এতো একজন সুদক্ষ জাদুকর, জাদুবিদ্যায় সে অতীব পারদর্শী। সূরা আশ-শুআরা [اَلشُّعَرَاءِ] -এ আছে যে ফেরাউন নিজেই এ উক্তি করেছিল। এমতাবস্থায় সম্ভবত তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণও পরামর্শ রূপে তার সাথে সাথে এ উক্তি করেছিল।

١١٠. يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ .

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে চায় এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?

١١١. قَالُوْٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ أَخِّرْ أَمْرَهُمَا وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ جَامِعِيْنَ .

১১১. তারা বলল, তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দিন অর্থাৎ তারা উভয়ের বিষয় সম্পর্কে বিলম্ব করুন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে একত্রকারীগণকে প্রেরণ করুন।

١١٢. يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ وَفِي قِرَاءَةٍ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ يَفْضُلُ مُوْسٰى فِي عِلْمِ السِّحْرِ فَجَمَعُوْا .

১১২. যেন তারা আপনার নিকট সুঅভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে যারা জাদুবিদ্যায় মূসা হতেও অধিক পারদর্শী হবে তাদেরকে এনে উপস্থিত করে। অনন্তর তারা এতদানুসারে সকলকে একত্রিত করল।

١١٣. وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا أَإِنَّ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ .

১১৩. জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? أَإِنَّ এ হামযাদ্বয় আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে تَسْهِيْل করে বা উভয় অবস্থায় এ দুটির মাঝে একটি অতিরিক্ত اَلِفْ সহও পঠিত রয়েছে।

١١٤. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ .

১১৪. সে বলল, হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

١١٥. قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ عَصَاكَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ مَا مَعَنَا .

১১৫. তারা বলল, হে মূসা! তুমিই কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, না আমরা আমাদের সাথে যা আছে তা নিক্ষেপ করব?

١١٦. قَالَ أَلْقُوْا ج أَمْرٌ لِلْإِذْنِ بِتَقْدِيْمِ إِلْقَائِهِمْ تَوَسُّلًا بِهِ إِلٰى إِظْهَارِ الْحَقِّ فَلَمَّآ أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ سَحَرُوْٓا أَعْيُنَ النَّاسِ صَرَفُوْهَا عَنْ حَقِيْقَةِ إِدْرَاكِهَا وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ خَوَّفُوْهُمْ حَيْثُ خَيَّلُوْهَا حَيَّاتٍ تَسْعٰى وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ .

১১৬. সে বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা তাদের দড়াদড়ি ও লাঠি-সোঠা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করে দিল, এগুলো মূলে যে কি তা অনুধাবন করা হতে চোখের দৃষ্টিতে বিভ্রম ঘটিয়ে দিল এবং তাদেরকে আতঙ্কিত করে ফেলল, ভীত করে ফেলল। কারণ তাদের ধারণা হচ্ছিল যে, এগুলো সঞ্চারমান সাপ। মোটকথা তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল। হযরত মূসা কর্তৃক জাদুকরদেরকে তাদের কৃতিত্ব অগ্রে প্রদর্শন করতে এবং তাদেরকে অগ্রে নিক্ষেপ করতে অনুমতি দেওয়ার কারণ হলো যে, এর মাধ্যমে তিনি সত্য প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।

١١٧. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ج فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ تَبْتَلِعُ مَا يَاْفِكُوْنَ يُقَلِّبُوْنَ بِتَمْوِيْهِهِمْ .

১১৭. মূসার প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে তাদের ভেলজিবাজীর দরুন যেগুলো ছুটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছিল সেগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। تَلْقَفُ এতে মূলত একটি ت উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– গ্রাস করতে লাগল।

١١٨. فَوَقَعَ الْحَقُّ ثَبَتَ وَظَهَرَ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ السِّحْرِ .

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হলো এবং তারা যা যে জাদু করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

١١٩. فَغُلِبُوْا اَىْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ صَارُوْا ذَلِيْلِيْنَ .

১১৯. সেখানে তারা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় পরাভূত হলো এবং অপমানিত হয়ে ফিরল, লাঞ্ছিত হলো।

١٢٠. وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ .

১২০. এবং জাদুকরেরা সেজদাবনত হলো।

١٢١. قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১২১. তারা বলল, আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

١٢٢. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَا شَاهَدُوْهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَاَتّٰى بِالسِّحْرِ .

১২২. যিনি মূসা ও হরুনের প্রতিপালক। তারা এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছিল যে, মূসার লাঠিকে যা করতে দেখা গেল তা জাদু দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। ফলে তারা সিজদাবনত হয়ে পড়েছিল।

١٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا بِهِ بِمُوْسٰى قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ اَنَا لَكُمْ ج اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتُمُوْهُ لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَا يَنَالُكُمْ مِنِّىْ .

১২৩. ফেরাউন বলল, কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা তাতে أَأَمَنْتُمْ এ হামযাদ্বয়কে স্পষ্ট করে আলাদাভাবে বা দ্বিতীয়টিকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তিত করেও পাঠ করা যায়। মূসা সম্পর্কে বিশ্বাস করলে? নিশ্চয় এটা অর্থাৎ তোমরা যা করলে তা একটি চক্রান্ত। নগরবাসীদেরকে তা হতে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তোমরা এ চক্রান্ত করেছ। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, এজন্যে আমার পক্ষ হতে তোমাদের কি কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

١٢٤. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ اَىْ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ الْيُمْنٰى وَرِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ .

১২৪. আমি নিশ্চয় তোমাদের হস্তপদ বিপরীতভাবে অর্থাৎ প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা কর্তন করব। অতঃপর তোমাদের সকলকে শূল-বিদ্ধও করব।

١٢٥. قَالُوْآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا بَعْدَ مَوْتِنَا بِاَىِّ وَجْهٍ كَانَ مُنْقَلِبُوْنَ رَاجِعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ .

১২৫. তারা বলল যেভাবেই মরিনা কেন মৃত্যুর পর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই পরকালে প্রত্যাবর্তন করব, ফিরে যাব।

١٢٦. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ط رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا عِنْدَ فِعْلِ مَا تَوَعَّدَهُ بِنَا لِئَلَّا نَرْجِعَ كُفَّارًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ .

১২৬. তুমি তো আমাদের উপর এ কারণেই দোষারোপ করছ যে, প্রতিহিংসা ও ক্রোধ প্রকাশ করছ আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এরা যে হুমকি প্রদর্শন করেছে তা বাস্তবায়নকালে আমাদেরকে ধৈর্য দান কর। যেন আমরা নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে পুনরায় কাফের না হয়ে যাই। এবং মুসলিম আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু দাও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشَاوُرِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরায়ে শু'আরা এবং এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে সামস্য বিধান করে দ্বন্দ্বের নিরসন করা। اٰخِرُ اَمْرِهِمَا اَىْ لَا تَعْجَلْ فِىْ قَتْلِهِ

قَوْلُهُ مَا مَعَنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْمُلْقِيْنَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تَوَسُّلًا : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, জাদু যা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় বস্তু। হযরত মূসা (আ.) তার নির্দেশ কেন দিলেন? **উত্তর.** উত্তরের সার হলো এই যে, এই নির্দেশ আদরের দিক থেকেও নয় এবং নির্দেশের দিক থেকেও নয়; বরং এটা ছিল শুধুমাত্র অনুমতির জন্য। আর এই অনুমতির উদ্দেশ্য ছিল বাতিলের বাতুলতা ও সত্য প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ اَرْجِهْ : এটা اِرْجَاءٌ থেকে وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ-এর সীগাহ, অর্থ তাকে অবকাশ দাও। এতে ه হলো ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلِىْ যা হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ : مَلَاٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী জাদুকর! তার কারণ, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست [প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে]। সে হতভাগারা আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর জাদুকরদের নিজেদের পথ প্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে! কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাজাদু। কিন্তু তারাও এখানে سَاحِرٌ-এর সাথে عَلِيْمٌ শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজনই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি বড় পারদর্শী জাদুকর।

মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য : বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগেই নবী-রাসূলদের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণত অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যতবেশি হবে, তাদের জাদুও ততবেশি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো নবী-রাসূলদের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই নবুয়তের দাবির পর কারও কোনো জাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, জাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, এ

কাজটি বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জিযাত বাহ্যিক বা মানসিক কোনো বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কাজ। তাই কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى [বরং আল্লাহ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন]।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জিযা এবং জাদুর প্রকৃতি ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। তবে সাধারণত মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশ্য এমন সব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোঁকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

قَوْلُهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَامُرُوْنَ : অর্থাৎ এ বিজ্ঞ জাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

قَوْلُهُ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ الخ : এ আয়াতগুলোতে হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল, লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনামে লাগিয়ে থাকে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদের বের করে দেওয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ এ বাক্যটিতে اَرْجِهْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত– যার অর্থ ঢিলা দেওয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَائِنُ শব্দটি مَدِيْنَةٌ -এর বহুবচন, যা যে কোনো বড় শহরকে বলা হয়। حٰشِرِيْنَ শব্দটি حَاشِرٌ -এর বহুবচন যার অর্থ হলো– আহ্বানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হলো সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাদুকরদের তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ জাদুকর রয়েছে যারা তাঁকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদের ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন জাদু-মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবিলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রতিটি যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলঙ্কারশাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই হুজুরে আকরাম ﷺ -এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন যার মোকাবিলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ .... وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ : অর্থাৎ পরিষদবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা যদি মূসার উপর জয়লাভ করতে পারি তাহলে আমরা তার পারিশ্রমিক এবং পুরস্কার পাব তো? ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, পুরস্কার-পারিশ্রমিক তো পাবেই, তদুপরি তোমরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব জাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপেও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল। –[তাফসীরে কুরতুবী]

ফেরাউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই দর কষাকষি করতে শুরু করতে শুরু করল যে,আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্তবাদী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যে কোনো কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলরা এবং তাঁদের যাঁরা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান কামনা করি না! আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। ফেরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেওয়ার পর জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হলো। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে– قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় জাদুকরদের সরদারের সাথে হযরত মূসা (আ.) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয়লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে বলল, আমাদের কাছে এমন জাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর সত্যিই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব। –[তাফসীরে মাজহারী, কুরতুবী]

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ : এখানে اِلْقَاءٌ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। জাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্য যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ আমরা নিজেদের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথম আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আ.) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার দরুন প্রথমে তাদেরকে সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একে তো জাদু হলো একটা হারাম কাজ, তদুপরি তা যখন কোনো একজন নবীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে, তখন নিঃসন্দেহে তা ছিল কুফরি। এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.) কেমন করে তাদেরকে সে অনুমতি দিয়ে বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরা নিক্ষেপ কর। কিন্তু বাস্তব বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। কারণ এ ক্ষেত্রে এ বিষয় নিশ্চিতই ছিল যে, এরা নিজেদের জাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশ্যই উপস্থাপন করবে। কথাটি হচ্ছিল

শুধু প্রথমে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে, আর পরে কে নামবে, তাই নিয়ে। কাজেই এখানে হযরত মূসা (আ.) তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে প্রথম সুযোগ তাদেরকেই দিলেন। এতে আরও একটি উপকারিতা ছিল এই যে, প্রথমে জাদুকররা তাদের লাঠি ও দড়িগুলোকে সাপ বানিয়ে নিক; আর তারপর আসুক হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মু'জিযা। শুধু তাই নয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠিও সাপই হোক; বরং এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করুক যে, জাদু বলে বানানো সমস্ত সাপকে গিলে খাক যাতে জাদুর প্রকাশ্য পরাজয় প্রথম ধাপেই সবার সামনে এসে যেতে পারে। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

আরও বলা যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অনুমতি দান জাদুর জন্য ছিল না; বরং তাদের অপমানকে প্রকাশ করার জন্য ছিল। এর মানে তোমরাই নিজেদের দড়ি-লাঠি নিক্ষেপ করে দেখে নাও তোমাদের জাদুর পরিণতিটা কি দাঁড়ায়।

قَوْلُهُ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْا .... بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ : অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এ লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমবদ্ধ এবং জাদুর মাধ্যমে বস্তুর বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ শরিয়তের বা যুক্তির কোনো প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি বরং বিভিন্ন প্রকার জাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরিয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى .... مَا يَاْفِكُوْنَ : অর্থাৎ আমি হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি [মাটিতে] ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার জাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়ি যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দশকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি যখন এক বিরাট অজদাহা বা অজগরের আকার ধরে এল, তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

قَوْلُهُ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল আর জাদুকররা যা কিছু বানিয়েছিল সে সবই মিথ্যায় পরিণত হলো।

قَوْلُهُ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ : অর্থাৎ তখনই সবাই হেরে গেল এবং অত্যন্ত অপদস্থ হলো।

قَوْلُهُ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ .... رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ : অর্থাৎ জাদুকরদের সিজদায় পতিত করে দেওয়া হলো এবং তারা বলতে লাগল যে, আমরা রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ মূসা ও হরুনের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। 'সিজদায় পতিত করে দেওয়া হলো' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে এরা এমনি হতভম্ভ ও বাধ্য হয়ে গেল যে, একান্ত অজান্তেই সিজদায় পড়ে গেল। এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান আনার তৌফিক করে সিজদায় নিপতিত করে দিলেন। আর 'রব্বুল আলামীন' -এর সাথে 'মূসা ও হারূনের রব' যোগ করে তারা নিজেদের বিষয়টি ফিরাউনের জন্য পরিষ্কার করে দিল। কারণ সে বোকা যে নিজেকেই 'রাব্বুল আলামীন' বলত। কাজেই 'রব্বি মূসা ও হারূন' বলে তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, আমরা আর তোমার আল্লাহতে বিশ্বাসী নই।

অনুবাদ :

١٢٧. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لَهُ اَتَذَرُ تَتْرُكُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بِالدُّعَاءِ اِلٰى مُخَالَفَتِكَ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط وَكَانَ صَنَعَ لَهُمْ اَصْنَامًا صِغَارًا يَعْبُدُوْنَهَا وَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ وَرَبُّهَا وَلِذَا قَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى قَالَ سَنُقَتِّلُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اَبْنَاءَهُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَنَسْتَحْيِىْ نَسْتَبْقِىْ نِسَاءَهُمْ كَفِعْلِنَا بِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ قَادِرُوْنَ .

১২৭. ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ তাকে বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে ছেড়ে দেবেন? ফেরাউন ছোট ছোট প্রতিমা নির্মাণ করেছিল। তার সম্প্রদায় এগুলির পূজা করতে। সে বলত, আমি তোমাদের এবং এই মূর্তিগুলোর প্রভু। তাই সে নিজেকে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি তোমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রভু!' বলে অভিহিত করত। এ স্থানে আপনার দেবতা বলতে ঐ ছোট ছোট প্রতিমাসমূহের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে বলল, পূর্বে যেমন করেছিলাম এবারও তাদের ভূমিষ্ঠ পুত্রগণকে হত্যা করব سَنُقَتِّلُ এটা তাশদীদ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তাদের নারীগণকে জীবিত ছেড়ে দেব, বাকি রেখে দিব। আমরা তো তাদের উপর প্রবল ক্ষমতাধিকারী।

١٢٨. فَفَعَلُوْا بِهِمْ ذٰلِكَ فَشَكَا بَنُوْٓ اِسْرَآئِيْلَ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج عَلٰى اَذَاهُمْ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا يُعْطِيْهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهَ .

১২৮. অনন্তর তারা তাই করল। ফলে বনী ইসরাঈলরা এ সম্পর্কে অভিযোগ করে তখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এদের অত্যাচারের মুখে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় ভূমি আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন তা দান করেন। এবং শুভ পরিণাম তো যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের।

١٢٩. قَالُوْا قَوْمُ مُوْسٰى اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فِيْهَا .

১২৯. তারা অর্থাৎ মূসার সম্প্রদায় বলল, তোমার আগমনের পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আগমনের পরও। সে বলল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি রাজ্যে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমরা এতে কি কর তিনি তা লক্ষ্য করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَذَرَكَ : এর আতফ হয়েছে يُفْسِدُوْا -এর উপর। اَتَذَرُ مُوْسٰى-এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো ফেরাউনকে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে উত্তেজিত করে দেওয়া। আর وَيَذَرَكَ-এর মধ্যে وَاوْ টা হলো مَعِيَّتْ -এর জন্য আর يَذَرَكَ এটা وَاوْ-এর পরে اَنْ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। اِسْتِفْهَامْ -এর জবাব হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ يَذَرَكَ : يَذَرُ টা وَذَرٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। মূলত يَوْذِرُ ছিল বাবে ضَرَبَ হতে। তবে সাধারণত এ শব্দটির ব্যবহার বাবে سَمِعَ থেকে হয়ে থাকে। অর্থ– ছেড়ে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ.)-এর এক বিরাট মু'জিযা : পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানরা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের জাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারাজীবন আল্লাহর পরিচয়বিমুখ নাস্তিক কাফেরদের মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আ.)-এর এ মু'জিযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর ভীতিজনক প্রতিক্রিয়া : ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খ জাতিকে তার সাথে পুরাতন পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মতো ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষনল জাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হলো– اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ অর্থাৎ তাহলে কি তুমি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদের পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করতে থাকবে?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরাউন বলল, سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ অর্থাৎ তাঁর বিষয়টিকে আমাদের পক্ষে তেমনি চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা সন্তানদের বাঁচতে দেব, যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

তাফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জোরার মুখেও ফেরাউন এ কথাই বলল যে, আমরা বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব, কিন্তু হযরত মূসা ও হারুন (আ.) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোনো কথাই এল না। তার কারণ, হযরত মূসা (আ.)-এর এই মু'জিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মনমস্তিষ্কে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখত, তখনই অবচেতন অবস্থায় তার পেশাব বেরিয়ে যেত। আর এটা একান্তই সত্য, সত্যভীতির এমনি অবস্থা হয়ে থাকে।

هیبت حق است این از خلق نیست

[আর এটা হলো আল্লাহর ভীতি, মানুষের পক্ষ থেকে নয়।]

আর মাওলানা রুমী (র.) বলেন– هر کے ترسید از حق وتقوی گزید

ترسد ازوے جن وانس وهرکه دید

অর্থাৎ আল্লাহকে যে ভয় করে, সমগ্র সৃষ্টি তাকে ভয় করতে থাকে।

এক্ষেত্রে ফেরাউনের সম্প্রদায় যে বলেছে, "হযরত মূসা (আ.) আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদের পরিহার করে দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ফেরাউন যদিও তার সম্প্রদায়ের সামনে স্বয়ং খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলে থাকত, কিন্তু নিজেও মূর্তির আরাধনা-উপাসনা করত।

আর বনী ইসরাঈলদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানদের হত্যা করার উৎপীড়নমূলক নৃশংস আইনের এ প্রবর্তন ছিল দ্বিতীয়বারের প্রবর্তন। এর প্রথম পর্যায় প্রবর্তিত হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে। যার অকৃতকার্যতার ব্যাপারে

তখনও সে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে অপদস্থ করতে চান, তার এমনি ব্যবস্থা হয়ে যায়, যার পরিণতি দাঁড়ায় একান্ত ধ্বংসাত্মক। অতঃপর পরবর্তীতে জানা যাবে, ফেরাউনের এ অত্যাচার-উৎপীড়ন কিভাবে তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছে।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ الخ : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী ইসাঈলদের প্রতি তার রাগ বাড়ল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে মেয়েদের জীবিত রাখার আইন তৈরি করে দিল। এতে বনী ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ফেরাউন তাদের উপর যে আজাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হযরত মূসা (আ.)-ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহিত লাভের জন্য তাদেরকে দুটি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। ১. শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ২. কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্যধারণ। সেই সঙ্গে এ কথাও বাতলে দিলেন যে, এ অবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছে– اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে– اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র ভূমি আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা এ ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী-পরহেজগাররাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেজগারি অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা : হযরত মূসা (আ.) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলদের যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার দীক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এ ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হলো এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবিলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কাজ লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এ সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু মুখে কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, 'সবর'-এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হলো ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোনো বিপদে ধৈর্যধাবণকেও সে জন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোনো অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোনো বৃহতোদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সত্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোনো নিয়ামত কেউ পায়নি। –[আবূ দাউদ]

হযরত মূসা (আ.)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল– اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেওয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, তাহলে আমরা কি করব।

সে জন্য আবারও হযরত মূসা (আ.) বাস্তব বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ বিষয়টি দূরে নয় যে, যদি তোমরা আমার উপদেশ মান্য কর, তাহলে শীঘ্রই তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর দেশের উপর স্থাপিত হবে তোমাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। কিন্তু সাথে সাথে তিনি একথাও বলে দিলেন– فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ তার মানে এ দুনিয়ার পার্থিব কোনো রাজ্য বা প্রভুত্ব মুখ্য বিষয় নয়, বরং পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত সততার বিস্তার এবং সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করার জন্য কাউকে কোনো রাজ্য বা প্রভুত্ব দান করা হয়। তাই তোমরা যখন মিসর দেশের আধিপত্য লাভ করবে, তখন সতর্ক থেকো, যাতে তোমরা রাজ্য ও শাসন ক্ষমতার নেশায় তোমাদের পূর্বর্তীদের পরিণতির কথা ভুলে না যাও।

রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রনায়ক শ্রেণির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ : এ আয়াতে যদিও বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা সমগ্র শাসক শ্রেণিকেই এতদ্বারা সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য হোক বা প্রভুত্ব, তাতে একচ্ছত্র অধিকার হলো আল্লাহর। তিনিই মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন এবং যখন ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নিয়ে যান। تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ আয়াতের মর্মও তাই। তদুপরি যাদেরকে পার্থিব রাজ্য দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা শাসক ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য একটা পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে যে, সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উদ্দেশ্য– ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নির্দেশিত কাজের প্রতি উৎসাহ দান ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব কতটা বাস্তবায়িত্ব করে।

'বাহরে মুহীত' নামক তাফসীরে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, বনী আব্বাসের দ্বিতীয় খলিফা মনসূরের খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বে একদিন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র.) এসে উপস্থিত হলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন– عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ যাতে তাঁর [মনসূরের] খেলাফত প্রাপ্তির সুসংবাদ ছিল। ঘটনাক্রমে এরপরে পরেই মনসূর খলিফা হয়ে যান; আর হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (রা.)-এর নিকট গিয়ে হাজির হন এবং আয়াতের মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (রা.) জবাব দেন যে, হ্যাঁ, খলিফা হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা বিষয় এখনও বাকি রয়েছে। অর্থাৎ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ এর মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, দেশের খলিফা অথবা আমির হয়ে যাওয়া কোনো গৌরবের বা আনন্দের বিষয় নয়। কেননা এরপরে আল্লাহ তা'আলা লক্ষ্য করেন যে, খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রীতিনীতি কি ও কেমনভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে। এখন হলো তার সে দেখার ও লক্ষ্য করার সময়।

অনুবাদ :

١٣٠. وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ بِالْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

১৩০. আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের [উৎপাদন] হ্রাস করত পাকড়াও করেছি যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে,] উপদেশ গ্রহণ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। اَلسِّنِيْنَ অর্থ, দুর্ভিক্ষ।

١٣١. فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ الْخِصْبُ وَالْغِنٰى قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ج اَىْ نَسْتَحِقُّهَا وَلَمْ يَشْكُرُوْا عَلَيْهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَاءٌ يَطَّيَّرُوْا يَتَشَاءَمُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ط مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ شُؤْمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَاْتِيْهِمْ بِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّ مَا يُصِيْبُهُمْ مِنْ عِنْدِهٖ ـ

১৩১. যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতে ফল-ফসলের বৃদ্ধি ও সচ্ছলতা দেখা দিত তারা বলত, এটাতো আমাদের প্রাপ্য অধিকার এবং এতদ্বিষয়ে তারা কোনোরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত না আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো খরা ও বিপদ-আপদ দেখা দিত তখন তা মূসা ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের উপর আরোপ করত তাদের অশুভতার ফল বলে ঘোষণা দিত। শোন, তাদের শুভাশুভ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ এদের অশুভতা আল্লাহর নিকট বিদ্যমান। তাই তাদের উপর আপতিত হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতেই যে তাদের উপর বিপদ আপতিত হয় তা জানে না।

١٣٢. وَقَالُوْا لِمُوْسٰى مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ ـ

১৩২. তারা হযরত মূসাকে বলল, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না।

١٣٣. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَهُوَ مَاءٌ دَخَلَ بُيُوْتَهُمْ وَوَصَلَ اِلٰى حُلُوْقِ الْجَالِسِيْنَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَالْجَرَادَ فَاَكَلَ زَرْعَهُمْ وَثِمَارَهُمْ كَذٰلِكَ وَالْقُمَّلَ السُّوْسَ اَوْ نَوْعٌ مِنَ الْقِرَادِ فَتَتَبَّعَ مَا تَرَكَهُ الْجَرَادُ وَالضَّفَادِعَ فَمَلَأَتْ بُيُوْتَهُمْ وَطَعَامَهُمْ وَالدَّمَ فِىْ مِيَاهِهِمْ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ مُبَيِّنَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ

১৩৩. অনন্তর হযরত মূসা (আ.) এদের সম্পর্কে বদদোয়া করলেন ফলে তাদের উপর প্লাবন পানি একেবারে তাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল এবং একজন উপবেশনরত ব্যক্তির কণ্ঠনালী পর্যন্ত গিয়ে প্রবেশ করেছিল। সাত দিন পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। পঙ্গপাল তা তাদের ফল ও ফসল খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। উকুন গম ইত্যাদি শস্যে সৃষ্ট পোকা বা পশুর শরীরে সৃষ্ট একপ্রকার উকুন জাতীয় কীটবিশেষ। পঙ্গপালের ধ্বংসের পর যা বেঁচেছিল এগুলো তাও শেষ করে দেয়। ভেক এটা তাদের ঘরবাড়ি ও আহার্য বস্তুতে ভরে থাকত। রক্ত এদের পানীয় জল রক্তে পরিণত হয়ে যেত। -এর আজাব প্রেরণ করি এগুলো বিশদ সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে অহংকার প্রদর্শন করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

١٣٤. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ الْعَذَابُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج مِنْ كَشْفِ الْعَذَابِ عَنَّا اَنْ اٰمَنَّا لَئِنْ لَامُ قَسْمٍ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ.

১৩৪. এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতো বলত, হে মূসা, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; اَلرِّجْزُ অর্থ আজাব, শাস্তি। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলে আমাদের হতে আজাব অপসৃত করে নেওয়া হবে এই সম্পর্কে তোমার সাথে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে সেই অনুসারে। যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস স্থাপন করব এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেব। لَئِنْ-এর لَامْ টি قَسَمِيَّةٌ অর্থাৎ কসম ব্যাঞ্জক।

١٣٥. فَلَمَّا كَشَفْنَا بِدُعَاءِ مُوْسٰى عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ وَيُصِرُّوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ.

১৩৫. অতঃপর মূসার দোয়ায় যখনই তাদের উপর হতে শাস্তি অপসৃত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তখনই তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত না বরং পূর্বের কুফরির উপরই জেদ ধরে থাকত।

١٣٦. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ الْبَحْرِ الْمِلْحِ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ لا يَتَدَبَّرُوْنَهَا.

১৩৬. সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সাগরে লবণাক্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি কারণ بِاَنَّهُمْ-এর بَاءٌ টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্পর্কে তারা ছিল অনাগ্রহী। এ সমস্তে তারা চিন্তা-গবেষণা করত না।

١٣٧. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ بِالْاِسْتِعْبَادِ وَهُوَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط بِالْمَاءِ وَالشَّجَرِ صِفَةٌ لِلْاَرْضِ وَهِىَ الشَّامُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى وَهِىَ قَوْلُهٗ وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الخ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا ط عَلٰى اَذٰى عَدُوِّهِمْ وَدَمَّرْنَا اَهْلَكْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ مِنَ الْعِمَارَةِ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا يَرْفَعُوْنَ مِنَ الْبُنْيَانِ.

১৩৭. দাসরূপে পরিগণিত করত যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হতো অর্থাৎ বনী ইসরাঈল তাদেরকে আমি পানি ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা– اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا এটা اَلْاَرْضِ-এর صِفَتْ বা বিশেষণ। আমার কল্যাণপ্রাপ্ত অঞ্চলের অর্থাৎ শামের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী। তা হলো نُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الخ অর্থাৎ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় তাদের উপর আমি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেছি। সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা শত্রুর নিগ্রহের মুখে ধৈর্যধারণ করেছিল আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করে দিয়েছি। دَمَّرْنَا অর্থ, ধ্বংস করে দিয়েছি। يَعْرِشُوْنَ এটা رِ অক্ষরটিতে কাসরা ও পেশ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অর্থ যে সমস্ত দালান-কোঠা তারা তুলত।

١٣٨. وَجَاوَزْنَا عَبَرْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا فَمَرُّوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكِفُوْنَ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ج يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عِبَادَتِهَا قَالُوْا يٰمُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا صَنَمًا نَعْبُدُهٗ كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ط قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ حَيْثُ قَابَلْتُمْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِمَا قُلْتُمُوْهُ .

১৩৮. এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই অতিক্রম করিয়ে দেই অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত– يَعْكِفُوْنَ -এর ك অক্ষরে পেশ ও কাসরা উভয়রূপে পাঠ করা যায়। তার উপাসনায় দণ্ডায়মান এক জাতির কাছে আসে। অর্থাৎ তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। তখন তারা বলল, হে মূসা এদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্য এক উপাস্য এক প্রতিমা গড়ে দাও। আমরা তার উপাসনা করব। তিনি বললেন, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। আর তাই তোমাদের উপর আল্লাহর যে অনুগ্রহ হয়েছে তার সাথে তোমাদের এ প্রস্তাবের বিনিময় করছ।

١٣٩. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ هَالِكٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

১৩৯. এসব লোক যাতে লিপ্ত তা তো বিধ্বস্ত হয়েছে এবং তারা যা করতেছে তাও অমূলক। مُتَبَّرٌ অর্থ, ধ্বংস হয়েছে।

١٤٠. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا مَعْبُوْدًا وَاَصْلُهٗ اَبْغِيْ لَكُمْ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ فِيْ زَمَانِكُمْ بِمَا ذَكَرَهٗ فِيْ قَوْلِهٖ .

১৪০. তিনি বললেন, আল্লাহকে ছেড়ে আমি তোমাদের জন্য অন্য ইলাহের উপাস্যের অনুসন্ধান করব? অথচ তোমাদেরকে তিনি তোমাদের যুগের জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। اَبْغِيْكُمْ এটা এ স্থানে মূলত اَبْغِيْ لَكُمْ [তোমাদের জন্য অনুসন্ধান করব?] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَكُمْ-এর ل টি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী উক্তিসমূহে শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে

١٤١. وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اَنْجَاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ يُكَلِّفُوْنَكُمْ وَيُذِيْقُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ج اَشَدَّهٗ وَهُوَ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ يَسْتَبْقُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ الْاِنْجَاءِ اَوِ الْعَذَابِ بَلَآءٌ اِنْعَامٌ اَوْ اِبْتِلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ اَفَلَا تَتَّعِظُوْنَ فَتَنْتَهُوْنَ عَمَّا قُلْتُمْ .

১৪১. এবং স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসরীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে মন্দ রকম শাস্তি দিত। اَنْجَيْنَاكُمْ এটা অপর এক কেরাতে اَنْجَاكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে। সুকঠিন শাস্তির বোঝা বহন করাত; তার আস্বাদ ভোগ করাত। তা হলো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, বাকি রেখে দিত। এতে অর্থাৎ মুক্তিদানে কিংবা শাস্তিতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা যথাক্রমে পুরস্কার বা যাচাই সুতরাং এটা হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না এবং তোমাদের এ প্রস্তাব ও কথা হতে বিরত হও না? بَلَاءٌ অর্থ পুরস্কার ও পরীক্ষা উভয়টাই। সুতরাং এ স্থানে ذٰلِكُمْ [এতে] -এর দ্বারা যদি মুক্তিদানের প্রতি ইঙ্গিত হয় তবে بلاء অর্থ হবে পুরস্কার। আর এটা যদি ঐ শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত বহ হয় তবে بَلَاءٌ অর্থ হবে পরীক্ষা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سِنِيْنَ : এটা سَنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি।

قَوْلُهٗ نَسْتَحِقُّهَا : অর্থ আমরা এর উপযুক্ত/ হকদার। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَنَا هٰذِهٖ -এর মধ্যস্থ لَامْ টি اِسْتِحْقَاقْ -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ مَهْمَا : মূলত ছিল مَامَا প্রথম مَا টি شَرْطِيَّةٌ আর দ্বিতীয়টি تَاكِيْد -এর জন্য। কঠিনতাকে দূরীভূত করার জন্য প্রথম مَا-এর اَلِف -কে هَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়ার ফলে مَهْمَا হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ يَتَشَاءَمُوْنَ : يَطَّيَّرُ-এর তাফসীর يَتَشَاءَمُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَتَطَيَّرُ এটা طَيَرَانٌ থেকে নিষ্পন্ন নয়; বরং تَطَيُّرٌ থেকে নিষ্পন্ন। এর দুটি অর্থ ব্যবহৃত হয়।

১. নসিব বা ভাগ্য। চাই ভালো হোক বা খারাপ হোক। অর্থাৎ খোশনসিব এবং বদনসিব উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

২. এর দ্বিতীয় অর্থ হলো অশুভ ব্যাপার, দুর্বিপাক, অমঙ্গলজনক, কুলক্ষণ। মুফাসসির (র.) يَطَّيَّرُ-এর তাফসীর تَشَاؤُمْ দ্বারা করে অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ هُمْ بَالِغُوْهُ : অর্থাৎ اِلٰى نِهَايَةٍ مِنَ الزَّمَانِ

قَوْلُهُ اِذَا هُمْ : এটা لَمَّا-এর জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ عَبَرْنَا : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন. হলো جَاوز-এর সেলাহ بَاءْ আসে না কেননা جَاوَزَ টা مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِه অথচ بِهَا-এর মধ্যে بَاءْ সেলাহ হয়েছে।

উত্তর. উত্তর হচ্ছে, এখানে جَاوَزَ টা عَبَرَ অর্থে হয়েছে। কাজেই এর সেলাহ بَاءْ নেওয়া বৈধ হয়ে গেল

قَوْلُهُ هُوَ : هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, يَقْتُلُوْنَ এটা جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة হয়েছে। পূর্বের উপর এর আতফ হয়নি

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ الخ : অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে কৃত ওয়াদার সম্পাদন এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নানা রকম আজাবের সম্মুখীন এবং শেষ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো কিছুটা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তার মধ্য সর্বপ্রথম আজাবটি হলো দুর্ভিক্ষ, পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্য, ফেরাউনের সম্প্রদায় যার সম্মুখীন হয়েছিল।

তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ দুর্ভিক্ষ তাদের উপর ক্রমাগত সাত বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গেই দুটি শব্দ سِنِيْنْ ও نَقْصُ ثَمَرَاتٌ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত কাতাদাহ (র.) প্রমুখ বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষ ও খরাসংক্রান্ত আজাব ছিল গ্রামবাসীদের জন্য আর ফলমূলের স্বল্পতা ছিল শহরবাসীদের জন্য। কেননা সাধারণত গ্রাম এলাকায়ই শস্যের উৎপাদন হয় বেশি এবং শহরে বেশি থাকে ফলমূলের বাগবাগিচা। তাতে এদিকেই ইঙ্গিত হয় যে, খরার কবল থেকে শস্যক্ষেত্র ও ফলের বাগান, কোনোটাই রক্ষা পায়নি।

কিন্তু কোনো জাতির উপর যখন আল্লাহর কহর বা প্রচণ্ড কোপদৃষ্টি পতিত হয়, তখন সঠিক বিষয় তাদের উপলব্ধিতে আসে না। ফেরাউনের সম্প্রদায়ও এ কহরেই পতিত হয়েছিল। আজাবের এ প্রাথমিক প্রচণ্ডতায় তাদের হুঁশ ফেরেনি। তারা এতটুকু সতর্ক হলো না, বরং এ দুর্ভিক্ষ এবং এ ধরনের অন্যান্য যে কোনো আগত বিপদ-আপদকে তারা বলতে লাগল যে, এগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর কওমের অমঙ্গল। فَاِذَا جَاۤءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ যখন তারা কোনো কল্যাণ ও আরাম-আয়েশ প্রাপ্ত হয়, তখন বলে যে, এগুলো আমাদের প্রাপ্য; আমাদের পাওয়াই উচিত। আর যখন কোনো বিপদ বা অকল্যাণের সম্মুখীন হয়, তখন বলে, এসবই হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়া. আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেন- اَلَاۤ اِنَّمَا طٰۤئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ এখানে طَائِرٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ- উড়ন্ত জীব বা পাখি। আরবরা পাখির ডান কিংবা বাঁ দিকে উড়াল দ্বারা ভবিষ্যৎ ভাগ্যলক্ষণ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করত। সেজন্যই শুধু মঙ্গলামঙ্গল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কথনকেও 'তায়ের' বলা হয়ে থাকে। এ আয়াতে طَائِرٌ অর্থও তাই। কাজেই আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, ভাগ্যলক্ষণ ভালো হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এ পৃথিবীতে যা কিছু প্রকাশ পায়, তা আল্লাহর কুদরতে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাতে না আছে কারও নহুছতের হাত, না আছে বকরতের। আর পাখিদের ডানে কিংবা বামে উড়িয়ে যে 'ফাল' বা ভবিষ্যৎ ভাগ্যপরীক্ষা করা হয় এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তি রচনা করা হয়, তা সবই তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও মূর্খতা।

আর শেষ পর্যন্ত ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর সমস্ত মু'জিযাকে জাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে ঘোষণা করল– مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আপনি যত রকম নিদর্শন উপস্থাপন করে আমাদের উপর স্বীয় জাদু চালাতে চেষ্টা করুন না কেন, আমরা কখনও আপনার উপর ঈমান আনব না।

قَوْلُهُ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ الخ : আলোচ্য আয়াতগুলোত ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত্য ও কুফরিতে আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদের আল্লাহর বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) -কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্যপথে আনা। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আয়াতে এ নয়টি মু'জিযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এ নয়টি মু'জিযার মধ্যে সর্বপ্রথম দুটি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং হাত কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জিযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন, যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আ)-এর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তাহলো আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে পরবর্তী ছয়টি মু'জিযার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, বেঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আজাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আজাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছুসময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আজাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আজাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হতো।

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আজাবেও প্রভাবিত হয়নি; বরং নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। এবার তাদের উপর এমন কোনো আজাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভর্ৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ প্রথমে তাদের উপর নাজিল করেন তুফানজনিত আজাব। প্রখ্যাত মুফাসসিরদের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান; অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ-বাসের কোনো ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী ইসরাঈলের জমিজমা ও ঘরবাড়ি। অথচ বনী ইসরাঈলদের ঘরবাড়ি, জমিজমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ জলের নিচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করল, আপনার পরওয়ারদিগারের দরবারে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের থেকে এ আজাব দূর করে দেন, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করে দেব। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এ তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোনো আজাব ছিল না; বরং আমাদের ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) -এর এতে কোনো দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিক কাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ তাদের চিন্তাভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হলো না। তখন দ্বিতীয় আজাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। এ পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য-ফসল ও বাগানের ফল-ফলারি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আজাবের ক্ষেত্রেও হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা পরিলক্ষিত হয় যে, এ সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চিৎকার করতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল, এবার আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করে আজাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদের মুক্তি দিয়ে দেব। তখন হযরত মূসা (আ.) আবার দোয়া করলেন এবং এ আজাবও সরে গেল। আজাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বৎসরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো। ঈমানও আনল না, বনী ইসরাঈলদেরও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ তা'আলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এ অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আজাব قُمَّلْ [কুম্মালা] قُمَّلْ সেই উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুল বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোনো কোনো সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কুম্মালের এ আজাবে সম্ভবত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশষ্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে, মাথায়ও উকুন পড়ে ছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্রু পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় এ আজাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য, এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে! তারা অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার এক মাসের সময় দেওয়া হলো, যাতে প্রচুর আরাম-আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এ অবকাশের কোনো সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আজাব হিসেবে এসে হাজির হলো বেঙ। এত অধিকসংখ্যায় বেঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনোখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত বেঙের স্তূপ। শুইতে গেলে বেঙের স্তূপের নিচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সবকিছুই বেঙে ভরে যেত। এ আজাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকা-পাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় এ আজাবও সরল।

কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহর গজব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোনো কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আজাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোনো সুযোগ নিল না। তখন এলো পঞ্চম আজাব রক্ত। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউজ থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আজাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আ.)-এর এ মু'জিযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোনো আজাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আজাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাঈলদের বাড়ি থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের

হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে বসে কিবতী ও বনী ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী ইসরাঈলেরা তুলত তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঘোট কোনো কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আজাবও পূর্বরীতি-নিয়ম অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চিৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আজাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহিতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কুরআন বলেছে–

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আজাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجْز -এর নাম বলা হয়েছে। এ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رِجْز বলা হয়। তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাদের ৭০.০০০ [সত্তর হাজার] লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আজাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আজাব। তাহলো এই যে, তারা নিজেদের ঘরবাড়ি, জমিজামা ও আসবাবপত্র ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে–

فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের ক্রমাগত ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন আজাবের মাধ্যমে তাদের সতর্কীকরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাদের অশুভ পরিণতি এবং বনী ইসরাঈলদের বিজয় ও কৃতকার্যতার আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا অর্থাৎ যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল," বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোনো সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে! কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে– تُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ

আর জমিনের মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে اَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্বপুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধনসম্পদের মালিক তাঁর সন্তানরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহর জানা মতে বনী ইসরাঈলরা পূর্ব থেকে কওমে ফেরাউনের ধনসম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقُ শব্দটি مَشْرِقٌ -এর বহুবচন। আর مَغَارِبُ হচ্ছে مَغْرِبٌ-এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' [উদয়াচলসমূহ] এবং 'মাগরিব' [অস্তাচলসমূহ] বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও জমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা কওমে-ফেরাউন ও কওমে-আমালেকাহকে ধ্বংস করার পর বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

আর اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا বলে একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছেন যে, এ ভূমিতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বরকত ও আশীর্বাদ নাজিল করেছেন। শাম-সিরিয়া সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনেরই বিভিন্ন আয়াতে তার বরকময় স্থান হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهَا তেও একথাই বলা হয়েছে। এমনিভাবে মিসরভূমির অসাধারণ উর্বরতা বরকতময়তাও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এবং প্রত্যক্ষতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেছেন, "মিসরের নীল দরিয়া হলো নদীসমূহের সর্দার"।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন যে, বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে মিসরে আর বাকি এক ভাগ রয়েছে সমগ্র ভূভাগে। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

সারকথা, যে জাতি অহংকার ও ঔদ্ধত্যে নেশাগ্রস্ত, সে জাতি নিজেদের সংকীর্ণতার দরুন অপর জাতিকে হীন ও দুর্বল মনে করে রেখেছিল, আমি তাদেরকেই সেই উদ্ধত অহংকারীদের ধনসম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানিয়ে প্রতীয়মান করেছি যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওয়াদা অবশ্যই সত্য হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে– وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ অর্থাৎ আপনার পরওয়ারদিগারের ভালো ও মঙ্গলজনক ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের অনুকূলে পূর্ণ হয়েছে।

এই ভালো বা মঙ্গলজনক ওয়াদা বলতে হয় عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে নিধন করে তোমাদেরকে তাদের ভূমির মালিক বানিয়ে দেবেন' বলে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা বোঝানো হয়েছে। অথবা কুরআনের অন্যত্র স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, সেটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ.

অর্থাৎ আমি চাই সে জাতির প্রতি সহায়তা দান করতে, যাকে এ দেশে হীন ও দুর্বল বলে মনে করা হয়েছে আর তাদেরই সর্দার ও শাসক বানিয়ে দিতে তাদেরকেই এ জমির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতে এবং জমিতে তাদেরকেই এ হস্তক্ষেপের অধিকার দান করতে চাই পক্ষান্তরে ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য সেনাকে সে বিষয়টি অনুষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিতে চাই, যার ভয়ে ওরা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা করে চলছে

প্রকৃতপক্ষে এতদুভয় ওয়াদাই এক। আল্লাহর ওয়াদার ভিত্তিতেই হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে ওয়াদা করেছিলেন। এ আয়াতে সে ওয়াদা পূরণের কথা تَمَّتْ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ওয়াদার সমাপ্তি বা পূর্ণতা তখনই হয়, যখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এরই সঙ্গে বনী ইসরাঈলের প্রতি এই দান এবং অনুগ্রহের কারণ ব্যক্ত করে দিয়েছেন بِمَا صَبَرُوْا বলে। অর্থাৎ যেহেতু তারা আল্লাহর পথে কষ্ট সয়েছে এবং তাতে অটল রয়েছে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার এই দান ও অনুগ্রহ শুধু বনী ইসরাঈলদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং তা ছিল তাদের সবর ও দৃঢ়তার ফলশ্রুতি যে ব্যক্তি কিংবা জাতিই এরূপ করবে, স্থান-কাল নির্বিশেষে তার জন্য আমার এ দান ও অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকবে

قضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ھیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

হযরত মূসা (আ.) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে এ কথাই বলেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবিলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোনো লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হলো তার মোকাবিলা না করে, বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবিলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক-সে ব্যাপারে তাঁর কোনো দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোনো লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবিলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় এবং জমিনের উপরে শাসন-ক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী ﷺ -এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন। وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ আর যেভাবে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী ﷺ -এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে –[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

এখানে এ প্রশ্ন করা যায় না যে, বনী ইসরাঈলরা তো ধৈর্যের সাথে কাজ করেনি; বরং হযরত মূসা (আ.) যখন ধৈর্যের উপদেশ দেন, তখন রুষ্ট হয়ে বলে উঠল– أُوْذِيْنَا সব সময়ই আমরা দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন রয়েছি। তার কারণ, প্রথমত ফেরাউনের উৎপীড়নের মোকাবিলায় তাদের ধৈর্য এবং ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা সর্বক্ষণই প্রতীয়মান। যদি কখনও হঠাৎ একআধটা অনুযোগ বেরিয়েও যায়, তবে তা ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলদের এ কথটিতে অভিযোগ অনুযোগ ছিলই না, বরং দুঃখ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য বলে থাকতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে– وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি সে সমস্ত বস্তু, যা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তৈরি করে থাকত এবং সেই প্রাসাদ ও বৃক্ষরাজি যেগুলোকে তারা উঁচিয়ে তুলত। ফেরাউন ও ফেরাউনের সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, ব্যবহার্য আসবাবপত্র এবং মূসার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। আর وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ যা কিছু তারা উঁচিয়ে তুলত। এতে উচ্চ প্রাসাদ এবং দালান-কোঠাও যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে বড় বড় বৃক্ষরাজি এবং আঙ্গুরের লতা যা মাচা দিয়ে ছাদের উপর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো এসবও অন্তর্ভুক্ত।

এ পর্যন্ত ছিল কওমে ফেরাউনের ধ্বংসের আলোচনা। তারপর থেকে শুরু হচ্ছে বনী ইসরাঈলের বিজয় ও কৃতকার্যতা লাভের পর তাদের ঔদ্ধত্য, মূর্খতা ও দুষ্কর্মের বিবরণ, যা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত প্রত্যক্ষ করার পরেও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দান যে, পূর্ববর্তী রাসূলরাও স্বীয় উম্মতের দ্বারা ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বর্তমান ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়ন কিছুটা লাঘব হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ : অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করে দিয়েছি।

ঘটনাটি হলো এই যে, এ জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি-নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদত-উপাসনা করতে পারি। আল্লাহর সত্তা তো আর সামনে আসে না। হযরত মূসা (আ.) বললেন– إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বড় মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে! এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদের দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বাবাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ তখন হযরত মূসা (আ.)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতঃপর বনী ইসরাঈলদের তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে নারীদের অব্যাহতি দেওয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

১٤٢. وَوَاعَدْنَا بِاَلِفٍ وَدُوْنِهَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً نُكَلِّمُهُ عِنْدَ اِنْتِهَائِهَا بِاَنْ يَّصُوْمُهَا وَهِيَ ذُو الْقَعْدَةِ فَصَامَهَا فَلَمَّا تَمَّتْ اَنْكَرَ خُلُوْفَ فَمِهِ فَاسْتَاكَ فَاَمَرَ اللّٰهُ بِعَشَرَةٍ اُخْرٰى لِيُكَلِّمَهُ بِخُلُوْفِ فَمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى وَاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ وَقْتَ وَعْدِهِ بِكَلَامِهِ اِيَّاهُ اَرْبَعِيْنَ حَالٌ لَيْلَةً ۚ تَمْيِيْزٌ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ عِنْدَ ذِهَابِهِ اِلَى الْجَبَلِ لِلْمُنَاجَاةِ اخْلُفْنِيْ كُنْ خَلِيْفَتِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ اَمْرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ بِمُوَافَقَتِهِمْ عَلَى الْمَعَاصِيْ.

১٤٣. وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا اَيْ لِلْوَقْتِ الَّذِيْ وَعَدْنَاهُ بِالْكَلَامِ فِيْهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ بِلَا وَاسِطَةٍ كَلَامًا يَسْمَعُهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ نَفْسَكَ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۖ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ اَيْ لَا تَقْدِرُ عَلٰى رُؤْيَتِيْ وَالتَّعْبِيْرُ بِهِ دُوْنَ لَنْ اُرٰى يُفِيْدُ اِمْكَانَ رُؤْيَتِهِ تَعَالٰى وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ الَّذِيْ هُوَ اَقْوٰى مِنْكَ فَاِنِ اسْتَقَرَّ ثَبَتَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ اَيْ تَثْبُتُ لِرُؤْيَتِيْ وَاِلَّا فَلَا طَاقَةَ لَكَ.

অনুবাদ :

১৪২. মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি وَاعَدْنَا এটা وَاوْ-এর পর اَلِفْ সহ ও اَلِفْ ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে। যে তার সমাপ্তির পর আমি তার সাথে কালাম করব। এ দিনগুলোতে তাকে রোজা রাখতে বলা হয়। ঐ মাসটি ছিল চান্দ্রমাস জিলকদ। তিনি তখন এ মাসের রোজা রাখেন। ঐ মেয়াদ শেষ হয়ে আসলে মুখের গন্ধ তাঁর নিকট অতিশয় খারাপ বলে বোধ হলো। ফলে তিনি মিসওয়াক করে ফেলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো দশ দিন বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। যাতে রোজাজনিত গন্ধ বিদ্যমান থাকাবস্থায় তার সাথে কথা বলতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এবং আর দশ দ্বারা অর্থাৎ জিলহজ মাসের আর দশ রাত্রিসহ উহা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের তার সাথে কথা বলার প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। اَرْبَعِيْنَ এটা এ স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ لَيْلَةً এটা تَمْيِيْز। এবং মূসা আল্লাহর সাথে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে যাওয়ার কালে তার ভ্রাতা হারূনকে বলেছিলেন আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ে প্রতিনিধিত্ব করবে অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে তুমি প্রতিনিধিত্ব কর, এবং তাদের বিষয়সমূহের সংশোধন ও দেখা-শুনা করবে আর অবাধ্যচারের কাজেহ সহযোগিতা সমর্থন দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময় অর্থাৎ তার সাথে কথোপকথনের জন্য যে সময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই সময় উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি তার সাথে কথা বললেন। এটা নির্দিষ্ট কোনো এক দিক নয় বরং সকল দিক হতেই শুনা যাচ্ছিল। তখন সে মূসা আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিজ সত্তার দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, আমাকে কখনই দেখবে না অর্থাৎ আমাকে দেখার ক্ষমতা তোমার নেই। لَنْ تَرٰىنِيْ এ স্থানে لَنْ اُرٰى অর্থাৎ আমাকে দর্শন করা যায় না, এইভাবে না বলে বক্তব্যটি لَنْ تَرٰىنِيْ অর্থাৎ তুমি আমাকে দেখবে না, রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে মূলত আল্লাহর দর্শন লাভ অসম্ভব নয়। তুমি বরং তোমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী পাহাড়টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে দৃঢ় থাকে তবে শীঘ্র তুমি আমাকে দেখবে, তবে আমার দর্শনে তুমি স্থির থাকতে পারবে। আর তা না হলে [বুঝবে] আমাকে দর্শন করার কোনো শক্তি তোমার নেই।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ اَىْ ظَهَرَ مِنْ نُوْرِهٖ قَدْرَ نِصْفِ اَنْمُلَةِ الْخِنْصَرِ كَمَا فِىْ حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ اَىْ مَدْكُوْكًا مُسْتَوِيًا بِالْاَرْضِ وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ج مَغْشِيًّا عَلَيْهِ لِهَوْلِ مَا رَاٰى فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْ سُؤَالِ مَا لَمْ اُوْمَرْ بِهٖ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ زَمَانِىْ ـ

অনন্তর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন একটি হাদীসে আছে যে, কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অগ্রভাগের অর্ধেক পরিমাণ নূর তিনি প্রকাশ করেছিলেন। হাকিম এই হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন। তা পাহাড়টিকে চূর্ণবিচূর্ণ করল, চূর্ণবিচূর্ণ করে একেবারে ভূপৃষ্ঠের সমান করে দিল। আর মূসা দৃশ্যপটের এই ভীষণতা প্রত্যক্ষ করত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। হুঁশ হারিয়ে ফেলল। دَكًّا এটা قَصْر অর্থাৎ হ্রস্বস্বরে [মদ ব্যতিরেকে] ও مَدّ অর্থাৎ দীর্ঘস্বরে পঠিত রয়েছে। অর্থ চূর্ণবিচূর্ণ করত ভূমির সমান করে দিল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, বলল, মহিমাময় তুমি সকল পবিত্রতা তোমার। যে বিষয়ে নির্দেশিত হইনি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হতে তোমার দরবারেই আমি তওবা করলাম এবং আমার যুগে বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।

١٤٤. قَالَ تَعَالٰى لَهٗ يٰمُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ اخْتَرْتُكَ عَلَى النَّاسِ اَهْلِ زَمَانِكَ بِرِسٰلٰتِىْ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَبِكَلَامِىْ اَىْ تَكْلِيْمِىْ اِيَّاكَ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ مِنَ الْفَضْلِ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ لِاَنْعُمِىْ ـ

১৪৪. তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার পয়গাম ও কথা দ্বারা رِسٰلٰتِىْ এটা একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে অর্থাৎ তোমার সাথে আমার বাক্যালাপ করা দ্বারা তোমার যুগের লোকের মধ্যে নির্বাচিত করে নিয়েছি, গ্রহণ করে নিয়েছি আমি তোমাকে যে মর্যাদা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং আমার অনুগ্রসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হও।

١٤٥. وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ اَىْ اَلْوَاحِ التَّوْرٰةِ وَكَانَتْ مِنْ سِدْرِ الْجَنَّةِ اَوْ زَبَرْجَدٍ اَوْ زُمُرُّدٍ سَبْعَةً اَوْ عَشَرَةً مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ مَوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا تَبْيِيْنًا لِكُلِّ شَىْءٍ ج بَدَلٌ مِنَ الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ قَبْلَهٗ فَخُذْهَا قَبْلَهٗ قُلْنَا مُقَدَّرًا بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَ اْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ط سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ فِرْعَوْنَ وَاَتْبَاعِهٖ وَهِىَ مِصْرُ لِتَعْتَبِرُوْا بِهِمْ ـ

১৪৫. আমি তার জন্য ফলকে اَلْوَاح তাওরাতের ফলকসমূহ। তা ছিল জান্নাতের বদরী কাঠের তৈরি। মতান্তরে যবরজাদ কিংবা যমরুদ পাথরের তৈরি। তা সখ্যায় ছিল সাত বা দশটি। অর্থাৎ তাওরাতের ফলকসমূহে ধর্ম বিষয়ে যা কিছু প্রয়োজন সেই সব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের বিশদ ও সুস্পষ্ট বিবরণ লিখে দিয়েছি; مَوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا এটা পূর্বোল্লিখিত جَارْ مَجْرُوْر অর্থাৎ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ হতে بَدَل বা তার স্থলাভিষিক্ত শব্দ সমষ্টি। সুতরাং এগুলো শক্তভাবে অর্থাৎ চেষ্টা ও শ্রম সহকারে ধারণ কর خُذْهَا -এর পূর্বে قُلْنَا ক্রিয়া ঊহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বললাম তা ধারণ কর। এবং তোমার সম্প্রদায়কে তার মধ্যে সুন্দরতম বিষয়সমূহ গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র তোমাদেরকে সত্য-ত্যাগীদের অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের বাসস্থান অর্থাৎ মিশর দর্শন করাব। যাতে তোমরা এদের অবস্থা দর্শন করে শিক্ষা লাভ করতে পার।

١٤٦. سَاصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىْ دَلَائِلِ قُدْرَتِىْ مِنَ الْمَصْنُوْعَاتِ وَغَيْرِهَا الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط بِاَنْ اَخْذُلَهُمْ فَلَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ طَرِيْقَ الرُّشْدِ الْهُدٰى الَّذِىْ جَاۤءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا يَسْلُكُوْهُ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ الضَّلَالِ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ج ذٰلِكَ الصَّرْفُ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ .

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে অর্থাৎ সৃষ্ট জিনিসসমূহে ও অন্যান্য বিষয়ে আমার কুদরতের যে প্রমাণ বিদ্যমান তা হতে ফিরিয়ে নেব। অর্থাৎ এদের আমি লাঞ্ছিত করব। সেহেতু এরা আর তাতে চিন্তাভাবনা করবে না। তারা আমার নিদর্শনের প্রত্যেকটি দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, যদি তারা সৎপথ অর্থাৎ যে হেদায়েত আল্লাহর তরফ হতে এসেছে সেই পথ দেখে তবে তাকে পথ বলে চলার জন্য গ্রহণ করবে না; কিন্তু তারা ভ্রান্ত-পথ গোমরাহির পথ দেখলে তাকে পথ বলে গ্রহণ করে। তা অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া এ হেতু যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা অনবধান। এ ধরনের আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

١٤٧. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ الْبَعْثِ وَغَيْرِهِ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ ط مَا عَمِلُوْهُ فِى الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ كَصِلَةِ رَحِمٍ وَصَدَقَةٍ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ لِعَدَمِ شَرْطِهِ هَلْ مَا يُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَالْمَعَاصِىْ .

১৪৭. যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে পুনরুত্থান ইত্যাদিকে অস্বীকার করে তাদের কার্যাবলি অর্থাৎ দুনিয়াতে যে সমস্ত ভালো কাজ করেছে যেমন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, দান করা ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে যাবে নিষ্ফল হবে। এগুলোর কোনো ছওয়াব বা পুণ্যফল তারা পাবে না। যেহেতু তা কবুল হওয়ার শর্ত ঈমান তাদের নেই। তারা সত্য-প্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যাচার ইত্যাদি যা করে তাদেরকে কেবল এদেরই প্রতিদান দেওয়া হবে। هَلْ এ প্রশ্নবোধক শব্দটি এ স্থানে نَفِىْ অর্থাৎ না বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এটার তাফসীরে না অর্থবোধক مَا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالِفٍ وَدُوْنَهَا : যখন اَلِفْ সহ হবে তখন এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে হবে। وَوَاعَدْنَا -এর وَاوْ -টি اِسْتِيْنَافِيَّةْ অর্থ বাক্যটি হলো مُسْتَانِفْ বাক্য, সূরা বাকারাতে যেই وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً বলেছিলেন, এটা তার বিস্তারিত বিবরণ وَاعَدْنَا مُوْسٰى হলো ফে'ল, ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী। আর ثَلٰثِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফঊলে বিহী। আর ثَلٰثِيْنَ -এর মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো تَمَامَ ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً আর لَيْلَةً হলো تَمْيِيْزْ ; আর اَتْمَمْنٰهَا -এর আতফ হয়েছে وَعَدْنَ -এর উপর।

قَوْلُهُ وَقْتَ وَعْدِهِ : مِيْقَاتُ -এর তাফসীর وَقْتُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِيْقَاتُ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ : وَاوْ টা تَرْتِيْبْ এবং تَعْقِيْبْ -এর জন্য নয়। কেননা উল্লিখিত উক্তি পাহাড়ে গমনের পূর্বের।

قَوْلُهُ بِكَلَامِهِ اِيَّاهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. مِيْقَاتُ رَبِّهِ দ্বারা জানা যায় যে, رَبٌّ-এর وَقْتٌ রয়েছে অথচ رَبٌّ-এর কোনো وَقْتٌ নেই।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَقْتُ كَلَامِ رَبِّهِ اِيَّاهُ

قَوْلُهُ حَالٌ : উহ্য ইবারত হবে– فَتَمَّ بَالِغًا هٰذَا الْعَدَدَ কাজেই حَمْل বৈধ না হওয়ার আপত্তি চুকে গেল।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَلَامٌ قَدِيْمٌ এবং كَلَامٌ حَادِثٌ-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা যে, كَلَامٌ حَادِثٌ-এর জন্য جِهَتٌ বা দিক থাকে, আর كَلَامٌ قَدِيْمٌ-এর জন্য নয়। কেননা قَدِيْمٌ-এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, তা সর্বদিকেই বিরাজমান।

قَوْلُهُ نَفْسَكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَرِنِيْ-এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। কাজেই فِعْل قَلْب-এর মাফউলের উপর সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيْرُ بِهِ دُوْنَ لَنْ اَرٰى يُفِيْدُ اِمْكَانَ رُؤْيَتِهِ تَعَالٰى : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, لَنْ تَرَانِيْ এবং لَنْ اَرٰى-এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? পার্থক্য হচ্ছে– لَنْ تَرَانِيْ এটা رُؤْيَةُ بَارِىْ تَعَالٰى-এর সম্ভাব্যতাকে বুঝায়। কেননা لَنْ تَرَانِيْ দ্বারা জানা যায় যে, না দেখার ইল্লত رَائِيْ-এর মধ্যে রয়েছে مَرْئِيْ-এর মধ্যে নয়। আর সেই ইল্লত হলো শক্তি এবং যোগ্যতা না থাকা। আর যদি لَنْ تَرَانِيْ-এর পরিবর্তে لَنْ اَرٰى হয়, তখন উদ্দেশ্য এই হবে যে, না দেখার ইল্লত مَرْئِيْ-এর মধ্যে রয়েছে رَائِيْ-এর যোগ্যতাহীনতাকে যোগ্যতার মধ্যে এবং শক্তিহীনতাকে শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। কেননা رَائِيْ টা مُمْكِنْ এবং حَادِثٌ আর مُمْكِنْ এবং حَادِثٌ টা تَصَرُّفٌ-কে গ্রহণ করে, এটা مَرْئِيْ-এর বিপরীত যে তা قَدِيْمٌ হওয়ার কারণে تَصَرُّفٌ-কে কবুল করে না।

قَوْلُهُ مَدْكُوْكًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, دَكًّا মাসদারটা مَدْكُوْكًا অর্থে হয়েছে। কাজেই جَبَل-এর উপর دَكًّا-এর حَمْل বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَكْلِيْمِىْ اِيَّاكَ : এর উদ্দেশ্য হলো تَخْصِيْص-কে বর্ণনা করা। কেননা مُطْلَقْ كَلَامٌ হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে خَاصْ নয়।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنَ الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ قَبْلَهُ : অর্থাৎ مَوْعِظَةً এটা مِنْ كُلِّ شَيْئٍ تَفْصِيْلًا-এর مَحَل থেকে بَدَل হয়েছে। কেননা مِنْ كُلِّ شَيْئٍ হলো كَتَبْنَا-এর মাফউল, যার কারণে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَحْسَنِهَا : অর্থাৎ আযীমতের উপর আমলকে আবশ্যক রূপে গ্রহণ কর। রুখসতের উপর নয়। উদ্দেশ্যে হলো تَوَارُثٌ-এর মধ্যে আযীমত, রুখসত, মুবাহ, ফরজ, ওয়াজিব সবই রয়েছে, তবে তোমাদের উচিত হলো রুখসত-এর উপর আমল না করে عَزِيْمَتٌ-এর উপর আমল করা। যেমন– ধৈর্য, সৈহ্য, ক্ষমা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা মুবতাদা, আর بِاَنَّهُمْ তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً الخ : এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসারাঈলের সেই ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে, যা ফেরাউনের জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বনী ইসরাঈলদের নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, তখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করেছিল যে, এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এবার যদি আমাদের কোনো কিতাব এবং শরিয়ত দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সে মতে আমল করতে পারি। তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। এতে وَاعَدْنَا শব্দটি وَعْدَةٌ থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হলো এই যে, কাউকে লাভজনক কোনো কিছু দেওয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাজিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) ত্রিশ রাত তূর পর্বতে ই'তিকাফ ও আল্লাহর ইবাদত-আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাতের উপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وَاعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো– দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি; আর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত যাবৎ ই'তিকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْنَا না বলে وَاعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয় : প্রথমত চল্লিশ রাত ই'তিকাফ করানোই যখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের ই'তিকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহর হিকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে? তবুও আলেম সমাজ এর কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হলো ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোনো কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তাফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে হয়েছে– ত্রিশ রাতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্যে ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এ দশ রাত বৃদ্ধির ব্যাপারে তাফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাতের ই'তিকাফের সময় হযরত মূসা (আ.) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোজাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোনো ইফতার করেননি। ত্রিশ রোজা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাজির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোজাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মিসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরও দশটি রোজা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোজার পর হযরত মূসা (আ.) মিসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোজাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোজাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ প্রথমত এই রেওয়ায়েতের কোনো সনদ নেই। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোজার সময় মিসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মাদীয়া বা মহানবী ﷺ -এর শরিয়তে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুরে আকরাম ﷺ বলেছেন– خَيْرُ خَصَائِلِ الصِّيَامِ السِّوَاكُ অর্থাৎ রোজাদারের সর্বোত্তম কাজ হলো মিসওয়াক করা। এ রেওয়ায়েতটি জামিউস সাগীরে উদ্ধৃত করে একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করেছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ আমাদের নাশতা বের কর। কারণ এ ভ্রমণ আমাদের পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোজা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোনো ইফতার করা যাবে না। বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তাফসীরে রূহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এ পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এ সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদিগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোজা পর্যন্ত কোনো কষ্টই তিনি অনুভব করেননি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ : আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলদের শরিয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী-রাসূলদের শরিয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সেজন্যই মাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানি যত ধর্ম রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে-আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حِسَابُ الشَّمْسِ لِلْمَنَافِعِ وَحِسَابُ الْقَمَرِ لِلْمَنَاسِكِ অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত-উপাসনার জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুসারে এ ত্রিশ রাত্রি ছিল জিলকদ মাসের রাত্রি আর এরই উপর জিলহজ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ.) তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কুরবানির দিনে। −[তাফসীরে কুরতুবী]

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য : এ আয়াতের ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেন। −[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর-স্থিরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষা : এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তা ধীরস্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ তা'আলার রীতি। কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহর পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর পক্ষে আসমান-জমিন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করার জন্যও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হলো সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনী ইসরাঈলদের গোমরাহির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়ির দেওয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, মূসা তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোনো নেতা নির্ধারণ করে নেওয়াই উচিত। তার ফলে তারা সহসাই 'সামেরী'-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তাভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীরস্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হতো না। −[তাফসীরে কুতরতুবী]

আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হয়েছে− وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ। এ বাক্য থেকেও কয়েকটি বিষয় ও আহকাম উদ্ভাবিত হয়।

প্রয়োজনবশত স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ : প্রথমত হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারূন (আ.)-কে বললেন, اُخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ অর্থাৎ আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোনো লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদিনার বাইরে যেতে হতো, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মূর্তজা (রা.)-কে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করে। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রা.)-কে মদিনায় খলিফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) হারূন (আ.)-কে খলিফা নিযুক্ত করা সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এ হেদায়েত বা নির্দেশাবলির মধ্যে প্রথম নির্দেশ হলো اَصْلِحْ ; এখানে اَصْلِحْ -এর কোনো কর্ম উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলা বাহুল্য, হযরত হারূন (আ.) হলেন আল্লাহর নবী, তাঁর নিজের পক্ষে ফ্যাসাদে পতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই এ হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোনো সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারূন (আ.) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী'-এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথামতো 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামি থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আ.) যখন ধারণা করলেন যে, হারূন (আ.) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুজুর্গি বলে মনে করে থাকেন।

قَوْلُهُ لَنْ تَرَانِيْ : [অর্থাৎ আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে [অর্থাৎ মূসা (আ.)] বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে لَنْ تَرَانِيْ না বলে বলা হতো, لَنْ أُرٰى 'আমার দর্শন হতে পারে না।' -[মাযহারী]

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহর দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হলো অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর অভিমত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে- لَنْ يَرٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتّٰى يَمُوْتَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদিগারকে দেখতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ : এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহর দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটাবিকিরণ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়। মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

قَوْلُهُ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ : আরবি অভিধানে تَجَلّٰى অর্থ প্রকাশিত হওয়া ও বিকশিত হওয়া। সুফি সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোনো বিষয়কে কোনো কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোনো বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ তা'আলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ও হাকেম-এর সনদকে যথার্থ বলেও উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহর তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কালাম বা বাক্য বিনিময় : এ বিষয়টি তো কুরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সরাসরিই বাক্যবিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমত সেসব কালাম যা নবুয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময় প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য কি ছিল এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারে না। তবে এতে শরিয়তের পরিপন্থি নয় এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোনো একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েজ হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতামতই সবচেয়ে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের সাম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ানোর পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ ক্ষেত্রে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ কি? এতে দুটি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল-ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসিকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হলো এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কিনা? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে, যেমন আয়াত اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ-এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ : এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ.)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তাওরাত'।

অনুবাদ :

١٤٨. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ ذَهَابِهٖ اِلَى الْمُنَاجَاةِ مِنْ حُلِيِّهِمْ الَّذِىْ اسْتَعَارُوْهَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لِعِلَّةِ عُرْسٍ فَبَقِىَ عِنْدَهُمْ عِجْلًا صَاغَهُ لَهُمْ مِنْهُ السَّامِرِىُّ جَسَدًا بَدَلٌ لَحْمًا وَدَمًا لَهٗ خُوَارٌ ط اَىْ صَوْتٌ يُسْمَعُ اِنْقَلَبَ كَذٰلِكَ بِوَضْعِ التُّرَابِ الَّذِىْ اَخَذَهٗ مِنْ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ فَمِهٖ فَاِنَّ اَثَرَهُ الْحَيَاةُ فِيْمَا يُوْضَعُ فِيْهِ وَمَفْعُوْلُ اتَّخَذَ الثَّانِىْ مَحْذُوْفٌ اَىْ اِلٰهًا اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا فَكَيْفَ يَتَّخِذُ اِلٰهًا اِتَّخَذُوْهُ اِلٰهًا وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ بِاتِّخَاذِهٖ .

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে তার গমনের পর নিজেদের অলঙ্কার দ্বারা কোনো এক আনন্দ উৎসব উপলক্ষে এ অলঙ্কারগুলো তারা ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট হতে ব্যবহার করার জন্য নিয়েছিল। পরে এগুলো তাদের নিকটই থেকে যায়। ঐ অলঙ্কার দ্বারা গড়ল একটি গো-বৎস, جَسَدًا এটা এ স্থানে بَدَلْ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে রক্ত ও মাংসের একটি অবয়ব যা হাম্বা রব করত এমন শব্দ করত যা শ্রুত হতো। সামিরী নামক জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে তা বানিয়ে দিয়েছিল। সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের মাটি সংরক্ষণ করে রেখেছিল। তা উক্ত গো-বৎসের মুখে রাখায় উক্তরূপ ধারণ করেছিল। কারণ, ঐ মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল তা যে বস্তুতেই লাগানো হতো তা জীবন্ত রূপ ধারণ করত। اِتَّخَذَ -এর مَفْعُوْلٌ ثَانِىْ অর্থাৎ দ্বিতীয় কর্ম পদ এ স্থানে উহ্য। তা হলো اِلٰهًا অর্থাৎ গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল। তারা কি লক্ষ্য করল না যে তা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না। এটার পরও কেমন করে তারা এটাকে ইলাহ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করল! তারা তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তা করায় তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

١٤٩. وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ اَىْ نَدِمُوْا عَلٰى عِبَادَتِهٖ وَرَاَوْا عَلِمُوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا بِهَا وَذٰلِكَ بَعْدَ رُجُوْعِ مُوْسٰى قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيْهِمَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

১৪৯. তারা যখন তাদের হস্তের মাঝে লুটিয়ে পড়ল অর্থাৎ তার উপাসনা করার বিষয়ে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলো এবং দেখল অর্থাৎ বুঝল যে, তারা তার কারণে বিপথগামী হয়ে গিয়েছে তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রত্যাবর্তনের পর তাদের এ অবস্থা হয়েছিল। يَرْحَمْنَا يَغْفِرْلَنَا এ ক্রিয়া দুটির ت [দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [নাম পুরুষ] উভয়রূপ পাঠই রয়েছে।

١٥٠. وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ مِنْ جِهَتِهِمْ اَسِفًا شَدِيْدَ الْحُزْنِ قَالَ لَهُمْ بِئْسَمَا اَىْ بِئْسَ خِلَافَةً خَلَفْتُمُوْنِىْ هَا مِنْ بَعْدِىْ ج خِلَافَتُكُمْ هٰذِهٖ حَيْثُ اَشْرَكْتُمْ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ج وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ اَلْوَاحَ التَّوْرٰةِ غَضَبًا لِرَبِّهٖ فَتَكَسَّرَتْ .

১৫০. মূসা যখন এদের আচরণের কারণে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল তখন তাদেরকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। اَسِفًا অর্থ অতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত। তোমাদের এ প্রতিনিধিত্ব কতই না মন্দ হয়েছে যে তোমরা শিরক ও অংশীদারিত্বের আকীদায় লিপ্ত হলে। তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ তোমরা ত্বরান্বিত করে নিলে? সে ফলকসমূহ অর্থাৎ তাওরাতের ফলকসমূহ তার প্রভুর খাতিরে ক্রোধ বশতঃ ফেলে দিল ফলে সেগুলো টুকরা হয়ে গেল।

وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ اَىْ بِشَعْرِهِ بِيَمِيْنِهِ وَلِحْيَتِهِ بِشِمَالِهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ ط غَضَبًا قَالَ يَابْنَ اُمَّ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَرَادَ اُمِّىْ وَذِكْرُهَا اَعْطَفُ لِقَلْبِهِ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا قَارَبُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ فَلَا تُشْمِتْ تَفْرَحْ بِىَ الْاَعْدَاءَ بِاِهَانَتِكَ اِيَّاىَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ فِى الْمُؤَاخَذَةِ .

আর ক্রোধে স্বীয় ভ্রাতার মাথায় ধরে ডান হাতে তার চুলে ও বাম হাতে তার শ্মশ্রুতে ধরে নিজের দিকে টানিয়া আনল। [ভ্রাতা হারূন] বলল, হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল, আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলল। সুতরাং اُمَّ এটার مِيْم অক্ষরটি কাসরা ও ফাতাহ উভয় রূপই পঠিত রয়েছে। এটা দ্বারা اِبْنَ اُمِّىْ [আমার মাতার পুত্র] অর্থ বুঝানো হয়েছে। এ স্থানে হযরত মূসার অন্তরে তার প্রতি করুণা উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে বক্তব্যটিকে এভাবে [যার সাথে সম্বন্ধ করে] উল্লেখ করা হয়েছে। كَادُوْا অর্থ প্রায় তারা। আমাকে তুমি অপমান করে আমার সম্পর্কে শত্রুকে হাসাইও না, আনন্দিত করো না। এবং যে সম্প্রদায় গো-বৎসের উপাসনা করে সীমালঙ্ঘন করেছে শাস্তির ক্ষেত্রে তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না

١٥١. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ مَا صَنَعْتُ بِاَخِىْ وَلِاَخِىْ اَشْرِكْهُ فِى الدُّعَاءِ اِرْضَاءً لَهُ وَدَفْعًا لِلشَّمَاتَةِ بِهِ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

১৫১. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার ভ্রাতার সাথে যে আচরণ করেছি সেই অপরাধ ক্ষমা করে দাও এবং আমার ভ্রাতাকেও ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। আর তুমিই সকল দয়ালুর দয়ালু। ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করার এবং তার সম্পর্কে শত্রুদের আনন্দকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) এ দোয়ার মধ্যে তাকেও শামিল করে নিয়েছিলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حُلِيِّهِمْ : حُلِىٌّ শব্দটি حَلْىٌ-এর বহুবচন, যেমন ثَدْى শব্দটি ثُدِىٌّ-এর বহুবচন। حُلِىٌّ মূলে ছিল حُلُوْىٌ এখানে وَاو এবং يَاء একত্রিত হওয়ায় وَاو-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে يَاء-কে يَاء-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর يَاء-এর মুনাসাবাতের কারণে لَام-এর পেশকে كَسْرَة দ্বারা পরিবর্তন করায় حُلِىٌّ হয়েছে।

قَوْلُهُ صَاغَهُ لَهُمْ مِنْهُ السَّامِرِىُّ : এখানে سَامِرِىٌّ হলো صَاغ -এর ফায়েল আর ه যমীর عِجْلًا-এর দিকে ফিরেছে। আর لَهُمْ -এর যমীর قَوْم-এর দিকে ফিরেছে আর مِنْهُ-এর যমীর স্বর্ণালঙ্কারের দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, সামেরী স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা সম্প্রদায়ের জন্য একটি গো-বৎস / বাছুর বানিয়ে দিল।

সতর্কীকরণ : জালালাইনের কপিতে صَاغَهُ-এর পরিবর্তে صَاغَهُمْ রয়েছে যা কলমের পদস্খলন বলে মনে হয়। তবে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-এর পক্ষ থেকে মুদ্রিত জালালাইনের কপিতে সেই ভুলটি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ جَسَدًا بَدَلٌ : প্রশ্ন. عِجْلًا-এর بَدَل টা جَسَدًا নেওয়ার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. এর দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে। আর তা হলো হতে পারে عِجَلَ نَقْش عَلَى الْحَائِط তথা দেয়ালে বাছুরের ছবি এঁকে দিয়েছিল। আর যখন তার بَدَل হিসেবে جَسَدًا চলে আসল তখন বুঝা গেল যে, সে গো-বৎসের পুতুল বানিয়েছিল, দেয়ালে অঙ্কন করেনি।

قَوْلُهُ لَحْمًا وَدَمًا : এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই গো-বৎস প্রকৃত গো-বৎসের মতোই রক্ত মাংস ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তবে এই তাফসীর টা ...

قَوْلُهُ مَفْعُوْلُ اتَّخَذَ الثَّانِىْ اَىْ اِلٰهًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِتَّخَذَ টা صَنَعَ অর্থে হয়নি যে, এক মাফঊলের উপর সীমাবদ্ধকরণ বৈধ হবে। কেননা مُطْلَقُ صَنَعَ উহাকে উপাস্য বানানো ব্যতিরেকে উল্লিখিত শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে না। কাজেই اَخَذَ -এর দ্বিতীয় মাফঊল যা اِلٰهًا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ نَدِمُوْا : وَلَمَّا سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ বাক পদ্ধতির পরিভাষায় এর অর্থ আসে লজ্জিত হওয়া سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ نَدِمُوْا [তারা লজ্জিত হলো] تَقُوْلُ الْعَرَبُ لِكُلِّ نَادِمٍ عَلٰى اَمْرٍ ، قَدْ سُقِطَ فِىْ يَدِهٖ

قَوْلُهُ بِئْسَ خِلَافَةً : এ بِئْسَمَا-এর মধ্যে مَا টা نَكِرَةٌ-এর تَمْيِيْزٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ خَلَفْتُمُوْنِىْ هَا : প্রশ্ন. هَا উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. এটা ঐ সংশয়ের নিরসন যে, مَا টা হয়তো مَوْصُوْلَةٌ বা مَوْصُوْفَةٌ আর خَلَفْتُمُوْنِىْ তার صِلَةٌ বা صِفَتْ অথচ صِلَةٌ এবং صِفَتْ যখন বাক্য হয় তখন عَائِدٌ হওয়া জরুরি হয়। هَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَائِدٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَافَتُكُمْ هٰذِهٖ : এটা مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ غَضَبًا لِرَبِّهٖ : এটা غَضَبْ নিষিদ্ধ থেকে ওজর পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ مُطْلَقُ غَضَبْ নিষিদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য عَدَاوَتْ বা শত্রুতা প্রিয়। বলা হয়েছে- اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা।

قَوْلُهُ ذِكْرُهَا اَعْطَفُ لِقَلْبِهٖ : এটা ঐ প্রশ্নের উত্তর যে, يَا ابْنَ اُمَّ দ্বারা বুঝা যায় হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃত ভাই নয়, অথচ তাঁরা উভয়েই আপন ভাই।

এর জবাব হচ্ছে যে, মায়ের ছেলে বলাটা হৃদয়কে অধিক নরমকারী, এর বিপরীতটির চেয়ে। অর্থাৎ يَا ابْنَ اَبِىْ বলার চেয়ে يَا ابْنَ اُمَّ বলার মধ্যে অধিক নৈকট্যতা ও স্নেহপরায়ণতা বুঝা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে, বনী ইসরাঈল যখন ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত লাভের পর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন একদল লোককে মূর্তি পূজা করতে দেখে তারা বলেছিল- اِجْعَلْ لَنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ "আমাদের জন্যও একটি দেবতা তৈরি করুন যেমন তাদের জন্য রয়েছে দেবতা।" এটি ছিল তাদের মূর্খতাপূর্ণ অন্যায় আবদার। আলোচ্য আয়াতেও বনী ইসরাঈলের এমনি একটি অন্যায় আচরণের উল্লেখ রয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ১২, পৃ. ২৪]

হযরত মূসা (আ.) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতঃপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল, সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব; সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলঙ্কারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলঙ্কারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে; কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। কারণ তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী ইসরাঈলরা তার কথামতো সমস্ত অলঙ্কার তার কাছে [সামেরীর কাছে] এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনারূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে মাটি তাতে মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মতো হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এক্ষেত্রে عِجْلًا শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনী ইসরাঈলদের কুফরির প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। হযরত মূসা (আ.) তো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তুর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ [নাউযুবিল্লাহ] সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং গাভীকে আল্লাহ মনে করে তারই উপাসনা-ইবাদতে প্রবৃত্ত হলো।

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সতর্কীকরণের পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলদের তওবার কথা বলা হয়েছে। এতে আরবি প্রবাদ অনুযায়ী سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ অর্থ হচ্ছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

পঞ্চম আয়াতে এ ঘটনারই বিস্তারিত বর্ণনা যে, হযরত মূসা (আ.) যখন কূহে-তূর থেকে তাওরাত নিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে বাছুরের পূজায় লিপ্ত দেখতে পেলেন, তখন তাঁর রাগের সীমা রইল না। আল্লাহ তা'আলা যদিও ইসরাঈলীদের এ গোমরাহির কথা কূহে-তূরেই ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শোনা এবং দেখার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কাজেই তাদের এহেন গোমরাহি এবং বাছুরের পূজাপাঠ সচক্ষে দেখার পর অধিকতর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তিনি প্রথমে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন– بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ অর্থাৎ তোমরা আমার অবর্তমানে এটা একান্তই মূর্খজনোচিত কাজ করেছ। اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নির্দেশ আনার চেয়েও তাড়াহুড়া করলে? অর্থাৎ অন্তত আল্লাহর কিতাব তাওরাতের আসা পর্যন্তই না হয় অপেক্ষা করতে তোমরা তার চেয়েও তাড়াহুড়া করে এহেন গোমরাহি অবলম্বন করে নিলে? এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো মুফাসসির এ বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তোমরা তাড়াহুড়া করে কি এটাই সাব্যস্ত করে নিলে যে, আমার মৃত্যু ঘটে গেছে?

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি এগিয়ে গেলেন যে, তাঁকে যখন নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই গোমরাহির সময় কেন বাধা দিলেন না? তাঁকে ধরার জন্য হাত খালি করার প্রয়োজন হলে তাওরাতের তখতীগুলো যা হাতে করে নিয়েই এসেছিলেন, তড়াতড়ি রেখে দিলেন। কুরআন মাজীদ এ কথাটিই এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ - اِلْقَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– ফেলে দেওয়া। আর اَلْوَاحٌ হলো لَوْحٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো তখতী। এখানে اِلْقَاءٌ শব্দে সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.) হয়তো রাগের বশে তওরাতের তখতীসমূহের অমর্যাদা করে ফেলে দিয়ে থাকবেন।

কিন্তু একথা সবারই জানা যে, তাওরাতের তখতীসমূহকে অমর্যাদা করে ফেলে দেওয়া মহাপাপ। পক্ষান্তরে সমস্ত নবী রাসূল (আ.) যাবতীয় পাপ থেকে পবিত্র ও মা'সূম। কাজেই এক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম হলো এই যে, আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত হারূন (আ.)-কে ধরার জন্য হাত খালি করা। আর রাগান্বিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি সেগুলোকে যেভাবে রাখলেন, তা দেখে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হলো যেমন সেগুলোকে বুঝি ফেলেই দিয়েছেন। কুরআন মাজীদ একেই সতর্কতার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া শব্দে উল্লেখ করেছে। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

তারপর এ ধারণাবশত হযরত হারূন (আ.)-কে মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন যে, হয়তো তিনি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকবেন। তখন হযরত হারূন (আ.) বললেন, ভাই এক্ষেত্রে আমার কোনো দোষ নেই। সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথার কোনোই গুরুত্ব দেয়নি। আমার কথা তারা শোনেনি। বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই আমার সাথে এমন ব্যবহার করবেন না, যাতে আমার শত্রুরা খুশি হতে পারে। আর আমাকে এ পথভ্রষ্টদের সাথে রয়েছি বলেও ভাববেন না। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর রাগ পড়ে গেল এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন– رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভাইকেও ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের আপনার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যে সমস্ত করুণাকারীর মধ্যে সবচেয়ে মহান করুণাময়।

এখানে স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ.)-এর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা হয়তো এ জন্য করলেন যে, হয়তো বা সম্প্রদায়কে তাদের গোমরাহি থেকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। আর নিজের জন্য হয়তো এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে তাওরাতের তখতীগুলোকে এমনভাবে রেখে দেওয়া, যাকে কুরআন মাজীদ 'ফেলে দেওয়া' শব্দে উল্লেখ করে তা ভুল হয়েছে বলে সতর্ক করেছে– তারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। অথবা এটা প্রার্থনারই একটা রীতি যে, অন্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করার সময় নিজেকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় যাতে এমন বোঝা না যায় যে, নিজকে দোয়ার মুখাপেক্ষী মনে করা হয়নি।

অনুবাদ :

١٥٢. قَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ اِلٰهًا سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ عَذَابٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعُذِّبُوْا بِالْاَمْرِ بِقَتْلِهِمْ اَنْفُسَهُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُمْ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ بِالْاِشْرَاكِ وَغَيْرِهٖ.

১৫২. বলেন, যারা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ শাস্তি ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে অনন্তর নিজেদেরকে [অপরাধীর নিকটতম আত্মীয়দের] নিজেরাই হত্যা করার নির্দেশের মাধ্যমে এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননার মোহর করার মাধ্যমে দুনিয়াতেই তারা সাজা লাভ করে। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে এদেরকে আমি প্রতিফল দিয়েছি সেভাবে শিরক ইত্যাদি আরোপ করত যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

١٥٣. وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا رَجَعُوْا عَنْهَا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا اَىْ التَّوْبَةِ لَغَفُوْرٌ لَّهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

১৫৩. যারা অসৎ কাজ করে পরে তওবা করে অর্থাৎ তা হতে ফিরে যায় ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে অতঃপর অর্থাৎ এ তওবার পর তোমার প্রতিপালক তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

١٥٤. وَلَمَّا سَكَتَ سَكَنَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ج الَّتِىْ اَلْقَاهَا وَفِىْ نُسْخَتِهَا اَىْ مَا نُسِخَ فِيْهَا اَىْ كُتِبَ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ يَخَافُوْنَ وَاَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لِتَقَدُّمِهٖ.

১৫৪. যখন মূসা হতে তা নীরব হলো তখন সে ফলগুলো অর্থাৎ তার ক্রোধ প্রশমিত হলে যে ফলকগুলো ফেলে দিয়েছিল তা তুলে নিল। তার লিপিতে ছিল অর্থাৎ তাতে লিখিত ছিল যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রহমত ও গোমরাহি থেকে হেদায়েতের কথা يَرْهَبُوْنَ অর্থ, ভয় করে। لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ এ স্থানে يَرْهَبُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل অর্থাৎ কার্যপদ যে পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় এটার [رَبِّهِمْ] পূর্বে رَبِّهِمْ ব্যবহার করা হয়েছে।

١٥٥. وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ ىْ مِنْ قَوْمِهٖ سَبْعِيْنَ رَجُلًا مِّمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ بِاَمْرِهٖ تَعَالٰى لِمِيْقَاتِنَا ج اَىْ الْوَقْتِ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُ بِاِتْيَانِهِمْ فِيْهِ لِيَعْتَذِرُوْا مِنْ عِبَادَةِ اَصْحَابِهِمُ الْعِجْلَ فَخَرَجَ بِهِمْ.

১৫৫. মূসা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তার সম্প্রদায়কে অর্থাৎ তার সম্প্রদায় হতে- قَوْمَهٗ -এর পূর্বে একটি مِنْ উহ্য রয়েছে। তাফসীরে مِنْ قَوْمِهٖ উল্লেখ করে ঐদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা গো-বৎস পূজায় শরিক হয়নি এমন সত্তরজন লোককে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের কর্তৃক গো-বৎস পূজা সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমার নির্ধারিত সময়ে যে সময়ে উপস্থিত হতে আমি তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম সেই সময়ে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। অনন্তর তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হলেন

فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ قَالَ ابْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رض لِاَنَّهُمْ لَمْ يُزَايِلُوْا قَوْمَهُمْ حِيْنَ عَبَدُوْا الْعِجْلَ قَالَ وَهُمْ غَيْرُ الَّذِيْنَ سَأَلُوْا الرُّؤْيَةَ وَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ قَالَ مُوْسٰى رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ خُرُوْجِىْ بِهِمْ لِيُعَايِنَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ ذٰلِكَ وَلَا يَتَّهِمُوْنِىْ وَاِيَّاىَ ط اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا ج اِسْتِفْهَامُ اِسْتِعْطَافٍ اَىْ لَا تُعَذِّبْنَا بِذَنْبِ غَيْرِنَا اِنْ مَا هِىَ اَىِ الْفِتْنَةُ الَّتِىْ وَقَعَتْ فِيْهَا السُّفَهَاۤءُ اِلَّا فِتْنَتُكَ ط اِبْتِلَاؤُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاۤءُ اِضْلَالَهُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَاۤءُ ط هِدَايَتَهُ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ـ

তারা যখন ভূ-কম্পন দ্বারা আক্রান্ত হলো। اَلرَّجْفَةُ তথা ভীষণ ভূমিকম্প। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণ হলো, তাদের স্বসম্প্রদায় যখন গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তখন তারা তাদেরকে বাধা প্রধান করেনি ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকর্ম হতে নিষেধের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়নি। আরো বলেন, যারা আল্লাহকে চাক্ষুষ দর্শনের দাবি করেছিল এবং পরিণামে যাদেরকে বজ্র হুংকারের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল এরা তারা ছিল না। এরা ছিল অন্য এক দল। তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই অর্থাৎ এদের নিয়ে আমার বের হওয়ার পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে আর তখন ইসরাঈলী গোত্রের বাকিরাও তা প্রত্যক্ষ করত, ফলে তারা আমাকে আর কোনোরূপ দোষারোপ করতে পারত না। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তাদের কর্মের জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? اَتُهْلِكُنَا এ স্থানে اِسْتِعْطَافٌ বা করুণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশ্নোবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মেহেরবানি পূর্বক তুমি আমাদের পাপের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিও না। এটা অর্থাৎ নির্বোধগণ যে ফিতনায় লিপ্ত হয়েছে তা তো তোমার একটি পরীক্ষা। اِلَّا فِتْنَتُكَ এ স্থানে فِتْنَةٌ শব্দটির অর্থ পরীক্ষা। এটা দ্বারা যাকে বিপথগামী করার ইচ্ছা তাকে বিপথগামী কর এবং যাকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। আর ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

١٥٦. وَاكْتُبْ اَوْجِبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً اِنَّا هُدْنَا تُبْنَا اِلَيْكَ ط قَالَ تَعَالٰى عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُ ج تَعْذِيْبَهُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ عَمَّتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فِى الدُّنْيَا فَسَاَكْتُبُهَا فِى الْاٰخِرَةِ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

১৫৬. আমাদের জন্য লিখিয়ে দাও নির্ধারণ করে দাও ইহকালের কল্যাণ ও পরকালেরও কল্যাণ আমরা তোমার দিকেই প্রদর্শিত হয়েছি। তওবা করতে প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার শাস্তি যাকে আমি শাস্তি দানের ইচ্ছা করি, দিয়ে থাকি; আর আমার দয়া-সে তো ইহজগতে প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত ব্যাপ্ত। আমি শীঘ্রই অর্থাৎ পরকালে তা নির্ধারিত করব তাদের জন্য যারা তাকওয়া গ্রহণ করে, জাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

١٥٧. اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ مُحَمَّدًا ﷺ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ زِ بِاسْمِهٖ وَصِفَتِهٖ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ مِمَّا حُرِّمَ فِيْ شَرْعِهِمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ثِقْلَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الشَّدَائِدَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط كَقَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَقَطْعِ أَثَرِ النَّجَسَةِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ مِنْهُمْ وَعَزَّرُوْهُ وَقَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗ أَيِ الْقُرْاٰنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১৫৭. যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ -এর যার নাম ও গুণাবলিসহ উল্লেখ তাদের নিকটস্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে তারা লিপিবদ্ধ পায়। যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন। যে সমস্ত পবিত্র বস্তু তাদের শরিয়তে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি বৈধ করেন এবং অপবিত্র ও ঘৃণ্য বস্তু যেমন মৃত শব ইত্যাদি অবৈধ করেন এবং যিনি তাদের ভার ও যে সমস্ত বন্ধন অর্থাৎ কঠোর বিধান তাদের উপর ছিল তা যেমন তওবার ক্ষেত্রে নিজেকে হত্যা করা, অপবিত্র জিনিস লাগলে সেই স্থানটিকে কেটে ফেলা ইত্যাদির বিধান লাঘব করেন। সুতরাং এদের মধ্য হতে যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তার শক্তি যোগায় অর্থাৎ তার সম্মান করে ও তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে তার অর্থাৎ আল-কুরআনের অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। إِصْرَهُمْ অর্থ তাদের ভার, বোঝা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مَا نُسِخَ فِيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মাসদারটা মাফউলের অর্থে হয়েছে। যেমন خُطْبَةٌ-এর অর্থ হলো مَخْطُوْبٌ কাজেই অর্থ ঠিক রয়েছে।

قَوْلُهٗ كُتِبَ : অর্থ সুনির্দিষ্টকরণার্থে এ শব্দের প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। কেননা نُسِخَ-এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন– উঠানো, মিটানো, পরিবর্তন করা, স্থানান্তর করা। এখানে লেখার অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاُدْخِلَ اللَّامُ عَلَى الْمَفْعُوْلِ : এ বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দান কল্পে এসেছে। প্রশ্ন হলো, رَهِبَ ফে'লটি নিজে নিজেই مُتَعَدِّىْ হয়। কাজেই তার মাফউলের উপর لَامْ প্রবিষ্ট করার কোনোই প্রয়োজন নেই। অথচ এখানে তার মাফউল তথা لِرَبِّهِمْ-এর উপর لَامْ প্রবিষ্ট হয়েছে।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, ফে'লের মাফউল যখন ফে'লের উপর مُقَدَّمْ হয় তখন ফে'লটি আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে যায়। আর এ কারণেই তার মাফউলের উপর لَامْ প্রবিষ্ট করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنْ قَوْمِهٖ : এটা একটি আপত্তির জবাব। আপত্তি হলো, اِخْتَارَ হলো لَازِمْ মুতা'আদ্দী বিনাফসিহী নয়, আর اِخْتَارَ -এর মধ্যে مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ ব্যবহৃত হয়েছে مِنْ قَوْمِهٖ বলে তার জবাব দিয়েছেন যে, এটা حَذْف এবং اِيْصَال -এর অন্তর্গত হরফে জরকে উহ্য করে ফে'লকে قَوْم -এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে এবং এ পদ্ধতি যা শুধুমাত্র কয়েকটি ফে'লের মধ্যে পাওয়া গেছে। সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত হলো– اِخْتَارَ، أَمَرَ، زَوَّجَ، اِسْتَغْفَرَ، صَدَقَ، عَادَ، اَنْبَأَ

قَوْلُهٗ وَاِيَّاىَ : এর আতফ হয়েছে اَهْلَكْتَهُمْ-এর هُمْ যমীরের উপর।

قَوْلُهُ تُبْنَا : মুফাসসির (র.) هُدْنَا -এর তাফসীর تُبْنَا দ্বারা করে বলে দিয়েছেন যে, هُدْنَا এটা هَادَ يَهُوْدُ থেকে নির্গত, যার অর্থ ফিরে আসা, তওবা করা। هَدٰى يَهْدِىْ هِدَايَةً নয়। যার অর্থ বুঝানো, দেখানো, পথ প্রদর্শন করা।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ : এতে তিনটি তারকীব রয়েছে–

প্রথম : اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ হলো মুবতাদা, يَأْمُرُهُمْ হলো তার খবর

দ্বিতীয় : اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হবে– هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

তৃতীয় : اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ এটা اَلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ থেকে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এটা সূরা আ'রাফের ১৯তম রুকূ'। এ রুকূ'র প্রথম আয়াতে গোবৎসের উপাসনাকারী এবং তারই উপর যারা স্থির ছিল সেসব বনী ইসরাঈলের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গজবের সম্মুখীন হতে হবে, যার পরে আর পরিত্রাণের কোনো জায়গা নেই। তদুপরি পার্থিব জীবনে তাদের ভাগ্যে জুটবে অপমান ও লাঞ্ছনা।

কোনো কোনো পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে। সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোনো মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না।

তাফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন আজব শাস্তি দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। –[তাফসীরে কুরতুবী]

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে– وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফাইয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে [অর্থাৎ ধর্মে কোনো রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,] তারাও আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। –[তাফসীরে মাযহারী]

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেছেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছেন এবং তওবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কঠোরতার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে। তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এ হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, সেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরিও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবি অনুসারী নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তাওরাতের তখতীগুলো আবার উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলন' -এ হেদায়েত ও রহমত ছিল। نُسْخَةٌ বা 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোনো গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাগের মাথায় যখন তাওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো কিছুতে লেখা তাওরাত দান করেছিলেন, তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তরজন বনী ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা : চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহরই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। হযরত মূসা (আ.) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদের তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টিই তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ.) তাদের মধ্যে থেকে সত্তরজনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহর কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তখন তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহরই না অন্য কারও! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহকে যখন প্রকাশ্যে আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাএদর উপর ঐশী রোষাণল বর্ষিত হলো। ফলে, তাদের নিচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হলো বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যত মৃতে পরিণত হলো। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় এক্ষেত্রে صَاعِقَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رَجْفَة। 'সায়েকা' অর্থ বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ' অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃত্যুর মতো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যত মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কারণ একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা [বুদ্ধিজীবী] লোক, দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছেন। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাৎ হত্যা করবে। সেজন্যই তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাই যদি হতো, তবে ইতঃপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত, ফেরাউনের সাথে তাদের সলিল সমাধি হতে পারত, কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেওয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া উদ্দেশ্যে নয়; বরং উদ্দেশ্যে হলো শাস্তি দেওয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ই-বা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এ ক্ষেত্রে 'নিজেকে নিজে ধ্বংস করা' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এ সত্তরজনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে হযরত মূসা (আ.)-এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন এই যে, আমি জানি, এটা একান্তই আপনার পরীক্ষা, যাতে আপনি কোনো কোনো লোককে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার না-শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহকে উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট! তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক– আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুত [এ প্রার্থনার পর] তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, এই সত্তরজন লোক, যাদের অলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে এরা أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً [আল্লাহকে আমরা প্রকাশ্যে দেখতে চাই]-এর নিবেদনকারী ছিল না, যারা বজ্র গর্জনের দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরা ছিল সেইসব লোক, যারা গো-বৎসের উপাসনায় নিজেরা অংশগ্রহণ না করলেও জাতি বা সম্প্রদায়কে তা থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করেনি। এরই শাস্তি হিসাবে তাদের উপর নেমে এসেছে বজ্র গর্জন যার দরুন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। যাহোক, এরা সবাই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনায় পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে।

পঞ্চম আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সে দোয়ার উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে– وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এই পার্থিব জীবনেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। কারণ আমরা আপনার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্য সহকারে ফিরে আসছি

এরই প্রতিউত্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন- عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ হে মূসা (আ.)! একে তো আমার করুণা ও রহমত সাধারণভাবেই আমার গজব বা রোষানলের অগ্রবর্তী, কাজেই আমি আমার আজাব ও গজব শুধুমাত্র তাদের উপরই আরোপিত করে থাকি, যার উপর ইচ্ছা করি, যদিও সব কাফের বা কৃতঘ্নই এর যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি সবাইকে এ আজাবে পতিত করি না, বরং তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোকদের উপরই আজাব আরোপ করি, যারা একান্তভাবেই চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে আমার রহমত এমনই ব্যাপক যে, তা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই পরিবেষ্টিত, অথচ তাদের মধ্যেও বহু লোক রয়েছে, যারা এর যোগ্য নয়; যেমন, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ট-না-ফরমান। কিন্তু তাদের প্রতিও আমার একরকম রহমত রয়েছে, তা যদিও দুনিয়ার জন্য। কাজেই আমার রহমত অযোগ্যদের জন্যও ব্যাপক। তবে এ রহমত পরিপূর্ণভাবে তাদেরই জন্য নিশ্চিতভাবে লিখে দেব, যারা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যেমন এর যোগ্য তেমনিভাবে আনুগত্যও পোষণ করে; তারা আল্লাহকে ভয় করে, জাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। এরা তো প্রথমাবস্থাতেই রহমতের অধিকারী। কাজেই আপনাকে আপনার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলার এ প্রতিউত্তরের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরীন মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার কারণ, এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাষায় দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়নি, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে- قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা (আ.) আপনার প্রার্থনা পূরণ করে দেওয়া হলো। আর অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে- اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ হে মূসা (আ.) তোমাদের উভয়ের দোয়াই গৃহীত হয়েছে। এভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রেও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়নি। সে জন্য কোনো কোনো মনীষী এ আয়াতের এ মর্মই সাব্যস্ত করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা যদিও তার উম্মতের বেলায় গৃহীত হয়নি, কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের জন্য গৃহীত হয়েছে যার আলোচনা পরবর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আসবে। কিন্তু তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে বর্ণিত প্রতিউত্তরের সঠিক বিশ্লেষণ এই যে, হযরত মূসা (আ.) যে প্রার্থনা করেছিলেন, তার দুটি অংশ ছিল। একটি হলো এই যে, যাদের প্রতি আজাব ও অভিসম্পাত হয়েছিল তাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হোক। আর দ্বিতীয় দিকটি ছিল এই যে, আমার ও আমার সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে লিখে দেওয়া হোক। প্রথম অংশের প্রতিউত্তর এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশের প্রতিউত্তর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক পাপের জন্য শাস্তি না দেওয়াই আমার রীতি। অবশ্য [চরম ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার দরুন] শুধু তাদেরকেই শাস্তি দেই, যাদেরকে একান্তভাবেই শাস্তি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে রইল রহমতের ব্যাপার। আমার রহমত তো সব কিছুতেই ব্যাপক তা সে মানুষ হোক বা অমানুষ, মু'মিন হোক বা কাফের, অনুগত হোক বা কৃতঘ্ন এমনকি পৃথিবীতে যাদেরকে কোনো শাস্তি ও কষ্টের সম্মুখীন করা হয়, তারাও সম্পূর্ণভাবে আমার রহমত বর্জিত হয় না। অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই যে, যেটুকু বিপদে তাকে ফেলা হলো, তার চেয়েও বড় বিপদে ফেলা হয়নি, অথচ আল্লাহ তা'আলার সে ক্ষমতাও ছিল।

মহামান্য ওস্তাদ আন্‌ওয়ার শাহ (র) বলেছেন যে, রহমতের ব্যাপকতর অর্থ হলো যে, রহমতের পরিধি কারো জন্যই সংকুচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতিই রহমত হবে- যেমন ইবলীসে-মালউন বলছে যে, আমিও তো একটা বস্তু, আর প্রত্যেকটি বস্তুই যখন রহমতযোগ্য, কাজেই আমিও রহমতের যোগ্য। বস্তুত কুরআন মাজীদের শব্দেই ইঙ্গিত রয়েছে তা বলা হয়নি যে প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিই রহমত করা হবে। বরং বলা হয়েছে, রহমত বা করুণা সংক্রান্ত আল্লাহর গুণ সংকুচিত নয়; অতি প্রশস্ত ও ব্যাপক। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করতে পারেন। কুরআন মাজীদের অন্যত্র এর সাক্ষ্য এভাবে দেওয়া হয়েছে- فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক রহমতের অধিকারী, কিন্তু যারা অপরাধী তাদের উপর থেকে তার আজাবকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। এখানে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, রহমতের ব্যাপকতা অপরাধীদের আজাব বা শাস্তির পরিপন্থি নয়।

সারকথা, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা সেসব লোকের পক্ষে কোনো রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই কবুল করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমাও করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি রহমতও করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় যে প্রার্থনায় দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ লিখে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল, তা কবুল করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হলো। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো মু'মিন-কাফের নির্বিশেষে সবার প্রতিই ব্যাপকভাবে রহমত হতে পারে, কিন্তু আখেরাত হলো ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের স্থান। সেখানে রহমত লাভের অধিকারী শুধুমাত্র তারাই হতে পারবে, যারা কয়েকটি শর্ত পূরণ করবে। আর তা হলো **প্রথমত** তাদেরকে তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ শরিয়ত কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করবে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকবে। **দ্বিতীয়ত** তাদেরকে নিজেদের ধনসম্পদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য জাকাত বের করতে হবে। **তৃতীয়ত** আমার সমস্ত আয়াত ও নির্দেশসমূহের প্রতি কোনো রকম ব্যতিক্রম বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বর্তমান আলোচ্য লোকগুলোও যদি এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে নেয়, তাহলে তাদের জন্যও দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ লিখে দেওয়া হবে। কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণভাবে এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তারাই, যারা এদের পরবর্তী যুগে আসবে ও উম্মীনবীর অনুসরণ করবে এবং তার ফলে তারা পরিপূর্ণ কল্যাণের অধিকারী হবে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, যখন رَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন ইবলীস বলল, আমিও এ রহমতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তী বাক্যেই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পরকালীন রহমত ঈমান প্রভৃতি শর্তসাপেক্ষ। এ কথা শুনে ইবলীস নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু ইহুদি ও নাসারারা দাবি করল যে, আমাদের মধ্যে তো এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। অর্থাৎ পরহেজগারি, জাকাত দান এবং ঈমান। কিন্তু এর পরেই যখন নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হলো, তখন তাতে সে সমস্ত ইহুদি-খ্রিষ্টান পৃথক হয়ে গেল, যারা মহানবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি। যাহোক, অনন্য এ বর্ণনাভঙ্গির ভেতর দিয়েই হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া মঞ্জুরির বিষয়টিও আলোচিত হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে মহানবী ﷺ -এর উম্মতদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হলো।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الخ : খাতিমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণত আল্লাহর রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক। আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহেজগারি ও জাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনেই নয় বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়ত ও সুন্নাহর আনুগত্য-অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ اَلرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ : এখানে মহানবী ﷺ -এর পদবি 'রাসূল' ও 'নবী'-এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। اُمِّىٌّ [উম্মী] শব্দের অর্থ হলো নিরক্ষর। যে লেখাপড়া কোনোটাই জানে না। সাধারণ আরবদের সে কারণেই কুরআন اُمِّيِّيْنَ [উম্মীয়্যীন] বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল; তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোনো মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়, বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ -এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কেননা, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোনো লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোনো একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে। যা কোনো প্রথম শ্রেণির বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ -এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝরনাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মতো একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত রাসূল হওয়ার এবং কুরআন মাজীদের আল্লাহর কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোনো প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হুজুরে আকরাম ﷺ -এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ এবং পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোনো প্রশংসাবাচক গুণ নয়; বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী ﷺ -এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা [অর্থাৎ ইহুদি নাসারারা] আপনার সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআন মাজীদ এ কথা বলেনি যে, 'আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহে তাতে লেখা পাবে'। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী ﷺ -এর অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হুজুর আকরাম ﷺ -কে দেখারই শামিল। আর এখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বনী ইসরাঈলরা এ দুটি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী ﷺ -এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যাবূর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী নবী ও খাতিমুল আম্বিয়া আলায়হিসসালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন : বর্তমানকালের তাওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বসযোগ্য রয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখান পর্যন্তও তাতে এমন সব বাক্য বর্ণনা রয়েছে যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন এ কথাটি যদি বাস্তবতা বিরোধী হতো, তবে সে যুগের ইহুদি ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে [সহজেই] কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে উম্মী ﷺ সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদি বা নাসারারা কুরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতিমুন্নাবিয়্যীন [সমস্ত নবীর শেষ নবী] ﷺ -এর যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআন মাজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন সচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (র.) 'দালায়েলুন্ নবুয়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন যে, কোনো এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুজুর ﷺ তার অবস্থা জানার জন্য তশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তিলাওয়াত করছে। হুজুর ﷺ বললেন, হে ইহুদি, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সেই মহান সত্তার, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাজিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি [ছেলেটির পিতা] ভুল বলেছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর হুজুরে আকরাম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেওয়া হবে না। -[তাফসীরে মাজহারী]

আর হযরত আলী (রা.) বলেন যে, হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নিকট জনৈক ইহুদির কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হুজুর ﷺ বললেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদি কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুজুর ﷺ বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে- আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুজুর ﷺ -সেখানেই বসে পড়লেন এবং জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাজও সেখানেই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন আর ইহুদিকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন, যাতে সে হুজুর ﷺ -কে ছেড়ে

দেয়। হুজুর ﷺ বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীদের বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদি আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুজুর ﷺ বললেন, "আমার পরওয়ারদিগার কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।" ইহুদি এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদি বলল- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।] এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তাওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কিনা। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি-

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়। তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। আর এই হলো আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদি বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ। [বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'তাফসীরে মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

পূর্ববর্তী আয়াতে মহানবী ﷺ-এর সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের সবিস্তার আলোচনা ছিল যা তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূরে লেখা ছিল। আয়াতে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর কিছু অতিরিক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য আলোচিত হচ্ছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম গুণটি হলো, সৎ কাজের উপদেশ দান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা مَعْرُوْف [মা'রূফ]-এর শব্দার্থ হলো জানাশোনা, প্রচলিত। আর مُنْكَرٌ [মুনকার] অর্থ- অজানা, বহিরাগত, যা চেনা যায় না। এক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বলতে সেসব সৎকাজকে বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামি শরিয়তে জানাশোনা ও প্রচলিত আর 'মুনকার' বলতে যেসব মন্দ ও অসৎকাজ, যা শরিয়তবহির্ভূত।

এখানে সৎকাজসমূহকে مَعْرُوْف [মা'রূফ] এবং মন্দ ও অন্যায় কাজসমূহকে مُنْكَرٌ [মুনকার] শব্দের মাধ্যমে বুঝাতে গিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দীনে ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকাজ শুধু সেই সমস্ত কাজকেই বলা যাবে, যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং যা এরূপ হবে না, সেটাকে 'মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ বলা হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীন (র.) যেসব কাজকে সৎকাজ বলে মনে করেননি, সে সমস্ত কাজ যতই ভালো মনে হোক না কেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে সেগুলো ভালো কাজ নয়। এজন্যই সহী হাদীসসমূহে সে সমস্ত কাজকেই কুসংস্কার ও বিদ'আত সাব্যস্ত করে গোমরাহি বলা হয়েছে। যার শিক্ষা মহানবী ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম কিংবা তাবেয়ীগণের কাছ থেকে আসেনি। আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটির অর্থ হলো এই যে, হুজুর ﷺ মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেবেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবেন।

এ গুণটি যদিও সমস্ত নবী (আ.)-এর মধ্যেই ব্যাপক এবং হওয়া উচিতও বটে। কারণ প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে এ কাজের জন্যই পাঠানো হয়েছে যে, তাঁরা মানুষকে সৎকাজের প্রতি পথনির্দেশ করবেন এবং অন্যায় ও মন্দকাজ থেকে বারণ করবেন, কিন্তু এখানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এর বর্ণনা করাতে সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -কে এ গুণটিতে অন্যান্য নবী-রাসূল অপেক্ষা কিছুটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। আর এ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত এ কাজের সেই বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে প্রতিটি শ্রেণির লোককে তাদের অবস্থার উপযোগী পদ্ধতিতে বুঝানো, যাতে করে প্রতিটি বিষয় তাদের মনে বসে যায়; কোনো বোঝা বলে মনে না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এ বিষয়ে অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার অধিকারী করেছিলেন। আরবের যে মরুবাসীরা উট, আর ছাগল চরানো ছাড়া কিছুই জানত না, তাদের সাথে তিনি তাদের বোধগম্য আলোচনা করতেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানগত বিষয়কেও এমন সরল-সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, যাতে অশিক্ষিত মূর্খজনেরও তা হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো অসুবিধা না হয়। আবার অপরদিকে কায়সার ও কিসরা হেন অনারব সম্রাট এবং তাদের পাঠানো বিজ্ঞ ও পণ্ডিত দূতদের সাথে তাদেরই যোগ্য আলোচনা চলত। অথচ সবাই সমানভাবে তার সে আলোচনায় প্রভাবিত

হতো। দ্বিতীয়ত হুজুর ﷺ ও তাঁর বাণীর মাঝে আল্লাহ-প্রদত্ত জনপ্রিয়তা এবং মানব মনের গভীরতম প্রদেশে প্রভাব বিস্তারের একটা মু'জিযাসুলভ ধারা ছিল। বড়র চেয়ে বড় শত্রুও যখন তাঁর বাণী শুনত, তখন প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারত না।

উপরে তাওরাতের উদ্ধৃতিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন আর বন্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ [সৎ কাজের নির্দেশ দান] এবং نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ [অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা] -এর জন্য যে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এসব গুণও হয়তো তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, রাসূলে কারীম ﷺ সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন! উদাহরণত পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, মহানবী ﷺ সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ্য ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা– সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। [আস্‌সিরাজুল-মুনীর] কোনো কোনো মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ মহানবী ﷺ মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন. যা তাদের উপর চেপে ছিল।

"إِصْر" শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা, যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর أَغْلَالٌ টা غُلٌّ -এর বহুবচন। 'গুল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

إِصْر ও أَغْلَالٌ অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধিবিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয় গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনিমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোনো অঙ্গ দ্বারা কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য ওয়াজিব : কারো হত্যা, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, খুনের ক্ষতিপূরণের কোনো বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধান যা বনী ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে "إِصْر" ও "أَغْلَالٌ" বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এসব কঠিন বিধিবিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধিবিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী ﷺ এ বিষয়টিই বলেছেন, আমি তোমাদের একটি সহজ ও সাবলীল শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোনো পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোনো ভয়ভীতি।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ ধর্ম সহজ। কুরআনে কারীম বলেছে– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। উম্মী নবী ﷺ -এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যর আলোচনার পর বলা হয়েছে– فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ। অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী ﷺ -এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেওয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হলো কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। **প্রথমত** মহানবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, **দ্বিতীয়ত** তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, **তৃতীয়ত** তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং **চুতর্থত** কুরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য عَزَّرُوْهُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تَعْزِيْر থেকে উদ্ভূত। تَعْزِيْر অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) عَزَّرُوْهُ -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تَعْزِيْر।

তার অর্থ, যারা মহানবী ﷺ -এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ-সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম ﷺ -এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু হুজুর ﷺ -এর তিরোধানের পর তাঁর শরিয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবীর সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কুরআন করীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কুরআন করীমও নিজেই আল্লাহর কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোনো উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কুরআন করীমের আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কুরআন করীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরজ : এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে- يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ - এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবী'র অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কুরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কুরআন ও সুন্নাহ দুটিরই অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। কারণ উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যেমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রাসূলের অনুসরণেই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং মহব্বত থাকাও ফরজ : উল্লিখিত বাক্য দুটির মাঝে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ শীর্ষক দুটি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিবিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদের বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়; বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অন্তরে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহত্ত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধিবিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রাসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একেতো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী ﷺ -এর মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবি পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মানব ও হাকেম হিসেবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসেবে তাঁর সাথে গভীরতর প্রেম ও ভালোবাসা রাখতে হবে এবং নবুয়তের ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরজ হওয়াই উচিত। কেননা এছাড়া নবী রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের রাসূলে-মকবুল ﷺ সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি-নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যে সেদিকে হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তাঁর স্বর হতে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না, অর্থাৎ যদি মজলিসে হুজুর আকরাম ﷺ উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোনো কথা বলো না।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হুজুর ﷺ -এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোনো কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কুরআনের একে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ; এমনভাবে ডাকবে না, নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে– لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের পরিপন্থি কোনো অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্মও বরবাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী ﷺ -এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে, তবুও তাঁদের অবস্থায় এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যখন মহানবী ﷺ -এর খেদমতে কোনো বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন যেন কোনো গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলেছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এরও। –[শেফা]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা আমার কোনো প্রিয়জন সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, সাহাবীদের মজলিসে যখন হুজুর আকরাম ﷺ তাশরিফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আ'যম (রা.) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদিনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে হুজুর ﷺ -এর প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল– "আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজাশীর সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবিলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম ﷺ যখন ঘরের ভিতরে অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম বেআদবি মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী ﷺ -এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে-নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোনো ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রা.)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুজুরে আকরাম ﷺ -এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন। এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুয়তি ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও এ কারণেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আ.)-এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

অনুবাদ :

١٥٨. قُلْ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَآيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ن الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ الْقُرْاٰنِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ تَرْشُدُوْنَ .

১৫৮. বল এ স্থানে সম্বোধন হলো রাসূল ﷺ -এর প্রতি হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর নিরক্ষর বার্তাবাহক রাসূলের প্রতি যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ ও তাঁর বাণী আল-কুরআনের উপর আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও, সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার।

١٥٩. وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ جَمَاعَةٌ يَّهْدُوْنَ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ فِي الْحُكْمِ .

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন গোষ্ঠী, এমন দল রয়েছে যারা মানুষকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ফয়সালা দানের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রদর্শন করে।

١٦٠. وَقَطَّعْنٰهُمْ فَرَّقْنَا بَنِيْ اِسْرَاۤءِيْلَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ حَالٌ اَسْبَاطًا بَدَلٌ مِنْهُ اَيْ قَبَائِلَ اُمَمًا ط بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ فِي التِّيْهِ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَضَرَبَهٗ فَانْبَجَسَتْ اِنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ سِبْطٍ مِنْهُمْ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ فِي التِّيْهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط هُمَا التُّرَنْجِبِيْنُ وَالطَّيْرُ السَّمَانِيْ بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ .

১৬০. তাদেরকে অর্থাৎ ইসরাঈল বংশীয়দেরকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিচ্ছিন্ন করেছি, বিভক্ত করেছি। اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ এটা এ স্থানে حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। اَسْبَاطًا এটা بَدَلٌ এ স্থানে অর্থ গোত্রসমূহ। اُمَمًا এটা পূর্ববর্তী শব্দ [اَسْبَاطًا] -এর بَدَلٌ মূসার সম্প্রদায় যখন তীহ প্রান্তরে তার নিকট পানি প্রার্থনা করল তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম তোমরা লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর অনন্তর তিনি তাতে আঘাত করলেন ফলে তা হতে তাদের গোত্রসমূহের সংখ্যানুসারে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো ফেটে বের হলো। প্রত্যেক মানুষ অর্থাৎ তাদের প্রত্যেক গোত্র স্ব-স্ব পান-স্থান চিনে নিল। এবং তীহ প্রান্তরে মার্তণ্ড তাপ হতে রক্ষার জন্য মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম; তাদের নিকট মান্ন ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। এ দুটি হলো যথাক্রমে তরানজীন [একপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য] ও সমানী [اَلسَّمَانِيْ মীম অক্ষর তাশদীদবিহীন এবং قَصْر অর্থ,হ্রস্বস্বরে পঠিত] পক্ষীবিশেষ। এবং তাদেরকে বলেছিলাম তোমাদেরকে যে সমস্ত পবিত্র জিনিস দিয়েছি তা আহার কর। তারা আমার প্রতি কোনোরূপ জুলুম করেনি কিন্তু তারা নিজেদের উপরই জুলুম করতেছিল।

١٦١. وَ اذْكُرْ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا اَمْرُنَا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ اَىْ بَابَ الْقَرْيَةِ سُجَّدًا سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ تَغْفِرْ بِالنُّوْنِ وَبِالتَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ لَكُمْ خَطِيْئٰتِكُمْ ط سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا .

১৬১. আর স্মরণ কর তাদেরকে বলা হয়েছিল এ জনপদে অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে তোমরা বাস কর এবং এর যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল আমাদের বিষয় হলো ক্ষমা এবং উক্ত জনপদের দ্বারে নতশিরে নত মস্তকে ঝুঁকে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব। আনুগত্য পরায়ণতার মাধ্যমে যারা সৎকর্ম করে তাদের ছওয়াব ও পুণ্যফল আরো বৃদ্ধি করে দেব। نَغْفِرْ এটা نُوْن [প্রথম পুরুষ, বহুবচন] এবং কর্মবাচ্য [مَجْهُوْل] রূপে ت [নাম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] সহ পঠিত রয়েছে।

١٦٢. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَقَالُوْا حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ وَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اِسْتَاهِهِمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا عَذَابًا مِّنَ السَّمَاۤءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ .

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। তারা বলেছিল, 'গমের দানা' আর নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হিঁচড়িয়ে উক্ত নগরীতে তারা প্রবেশ করেছিল। ফলে আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘন করতেছিল। رِجْز অর্থ আজাব, শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا : এখানে جَمِيْعًا এটা اِلَيْكُمْ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ : এটা لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে بَدَلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَسْبَاطًا بَدَلْ : এখানে اَسْبَاطًا টা بَدَلْ হয়েছে পূর্ববর্তী اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ থেকে, تَمْيِيْز নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। কেননা দশের উপরের تَمْيِيْز টা مُفْرَدْ হয়ে থাকে

قَوْلُهُ فَضَرَبَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যে সঙ্কোচন বা সংক্ষিপ্তকরণ রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ যখনই পাথরের গায়ে লাঠি মারার নির্দেশ দিলেন তখন তাৎক্ষণিকভাবেই হযরত মূসা (আ.) স্বীয় লাঠি পাথরে মারলেন।

قَوْلُهُ سِبْطٍ مِنْهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা যে, قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই ঝরনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই স্বীয় ঝরনা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়

এর উত্তর হলো, اُنَاسٍ দ্বারা বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র উদ্দেশ্য, প্রত্যেক গোত্রই স্বীয় ঝরনা নির্দিষ্ট করে নিল।

قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَهُمْ : যদি এ বাক্যকে উহ্য মানা না হয় তবে অকারণেই مُتَكَلِّمْ থেকে غَيْبَتْ-এর দিকে اِلْتِفَاتْ করা আবশ্যক হবে। অথচ এর কোনোই প্রয়োজন নেই। এ اِلْتِفَاتْ থেকে বেঁচে থাকার জন্য قُلْنَا لَهُمْ -কে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ اَمْرُنَا : এখানে اَمْرُنَا-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. قَالَ-এর مَقُوْلْ বাক্য হয়ে থাকে। অথচ এখানে حِطَّةٌ মুফরাদ হয়েছে। এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে।

উত্তর. حِطَّةٌ টি উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে مَقُوْلٌ হয়েছে। কাজেই কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, أَمْرُنَا উহ্য মানার পরিবর্তে مَسْئَلَتُنَا উহ্য মানা উচিত ছিল। কেননা أَمْرُنَا উহ্য মানার সুরতে উহ্য ইবারত হবে- أَمْرُنَا أَنْ نَحُطَّ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ এর অনুবাদ হবে- আমাদের কাজ এ গ্রামে প্রবেশ করা। আগে ক্ষমার উল্লেখ রয়েছে। অথচ গ্রামে প্রবেশ করা এবং ক্ষমার কোনো বন্ধন বুঝা যায় না, কাজেই أَمْرُنَا উহ্য মানার পরিবর্তে مَسْئَلَتُنَا উহ্য মানলে উত্তম হতো। তখন উহ্য ইবারত হতো- مَسْئَلَتُنَا حِطَّةٌ এর অর্থ হবে- আমাদের আবেদন হলো ক্ষমার।

قُوْلُوْا -এর قَائِلٌ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা। কাজেই حِطَّةٌ তার مَقُوْلَه হবে। এখন অর্থ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করে বিনয় ও মাথানত করে শাম দেশে প্রবেশ কর তবে আমি তোমাদের পদস্খলনকে ক্ষমা করে দেব। কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ ঐ দিকনির্দেশনাকে আমলে নেয়নি এবং আল্লাহর শেখানো বুলিকে পরিবর্তন করে ফেলল, حِطَّةٌ -এর পরিবর্তে حَبَّةٌ فِيْ شَعِيْرَةٍ এবং মাথানত করে প্রবেশের পরিবর্তে নিতম্ব ঘষতে ঘষতে প্রবেশ করল।

قَوْلُهُ بِالتَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ تَغْفِرْ -এর মধ্যে এক কেরাত تُغْفَرْ মজহুলের সীগাহ দ্বারাও রয়েছে। তবে এ সুরতে خَطِيْئَتِكُمْ নায়েব ফায়েল হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ يَزْحَفُوْنَ : এটা বাবে فَتَحَ হতে অর্থ হলো- ধীরে ধীরে নিতম্বের কুঞ্চন সরানো।

قَوْلُهُ اِسْتَاهِهِمْ : اِسْتَاهٌ শব্দটি سَتَهٌ -এর বহুবচন, নিতম্বকে বলা হয়।

قَوْلُهُ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : تَبْدِيْلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটির স্থানে অন্যটি রেখে দেওয়া। تَبْدِيْلٌ -এর জন্য দুটি হওয়া জরুরি। তন্মধ্য হতে একটি পরিত্যক্ত হবে। আর দ্বিতীয়টি গৃহীত, যা পরিত্যক্তটির উপরে প্রবিষ্ট হয়। আর مَأْخُوْذٌ -এর উপর بَاءٌ প্রবেশ করে না, অথবা এভাবে বলতে পার যে, بَدَّلَ শব্দটি দুটির দিকে مُتَعَدِّيْ হয়। একটির দিকে بَاءٌ -এর মাধ্যমে আর অন্যটির প্রতি بَاءٌ বিহীনভাবে। যার উপর بَاءٌ প্রবিষ্ট হয় তা পরিত্যক্ত হয়, আর অন্যটি গৃহীত হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বাক্যে কিছু উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الخ : এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি মানুষকে বলে দিন আমি তোমাদের সবার প্রতি নবী রূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও রিসালত প্রাপ্তি বিগত নবীদের মতো কোনো বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই নবুয়তের ধারাও সমাপ্ত: নবুয়ত সমাপ্তির এটাই হলো প্রকৃত রহস্য। কারণ মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাবের না কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোনো অবকাশ আছে। আর এই হলো মহানবীর উম্মতের সে বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম ﷺ -এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফিতনা-ফ্যাসাদের মোকাবিলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তা প্রাপ্ত হবে, যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী ﷺ -এর রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত [নায়েব]।

ইমাম রাযী (র.) كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা না হলে বিশ্বাবাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (র.) সর্বযুগে ইজমায়ে উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরিয়তের দলিল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোনো ভুল বিষয় কিংবা কোনো পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতে মাহানবী ﷺ -এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ হুজুর ﷺ -এর আবির্ভাব ও রিসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোনো নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুয়ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়তের উপরই আমল করবেন। [হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরিয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।] বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাব এবং তাঁর রিসালত যে কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক, এ আয়াতটি তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছেই; তাছাড়া কুরআন মাজীদে আরও কতিপয় আয়াত তার প্রমাণ বহন করে। যেমন বলা হয়েছে- وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি এ কুরআন ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদের আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও ভীতিপ্রদর্শন করি যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছবে আমার পরে। [অর্থাৎ হুজুর ﷺ -এর তিরোধানের পরে।]

মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবুকের [তাবুক যুদ্ধের] সময় রাসূলে কারীম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হুজুর ﷺ -এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুজুর ﷺ নামাজ শেষ করে ইরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোনো নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি। তার **একটি হলো এই যে,** আমার রিসালত ও নবুয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। **দ্বিতীয়ত** আমাকে আমার শত্রুর মোকাবিলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। **তৃতীয়ত** কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না; বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হতো। তাদের গনিমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। **চতুর্থত** আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামাজ যে কোনো জমি, যে কোনো জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোনো বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদত শুধু তাদের উপাসনালয়ে হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের নামাজ বা ইবাদত হতো না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোনো রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়াই পবিত্রতা ও অজুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন, **আর পঞ্চমটির** কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো আপনি কোনো একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لا اله الا الله কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদি খ্রিস্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কোনো এক বিষয়ে মতবিরোধ হওয়াতে হযরত ওমর (রা.) নারাজ হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.)-ও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কিছুতেই রাজি হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী ﷺ -এর দরবারে গিয়ে হাজির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রা.) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে যান এবং তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে মহানবী ﷺ -এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দোষ আমারই বেশি। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম- يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে, শুধু এই আবূ বকর (রা.)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, প্রতিটি দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী ﷺ -এর ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একাথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না সে লোক কোনো সাবেক শরিয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোনো ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

আয়াতের শেষাংশে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, সমস্ত আসমান-জমিন যার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ অর্থাৎ একথা যখন জানা হয়ে গেছে যে, মহানবী ﷺ সমস্ত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত রাসূল, তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোনো উপায় নেই, তখন আল্লাহ ও তাঁর সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনাও অপরিহার্য হয়ে গেছে, যিনি নিজেও আল্লাহর উপর এবং তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন। আর তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সঠিক পথে থাকতে পার।

আল্লাহর 'কালেমাত' বা বাণীসমূহ বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কিতাব তওরাত, ইঞ্জীল, কুরআন প্রভৃতি আসমানি গ্রন্থ। ঈমানের নির্দেশ দেওয়ার পর আবার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মহানবী ﷺ -এর শরিয়তের আনুগত্য ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান আনা কিংবা মৌখিক সত্যায়ন করাই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক বাতলানো পথ ছাড়া অন্য সমস্ত পথই বন্ধ।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল : দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٞ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচার, কূট তর্ক এবং গোমরাহির বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয় তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালোও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী ইসরাঈলদের এ সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআন মাজীদে বরংবারই করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে- مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্যনিষ্ঠ, সারারাত ধরে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সেজদা করে। অন্যত্র রয়েছে- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ যাদেরকে মহানবী ﷺ -এর পূর্বে কিতাব [তওরাত ও ইঞ্জীল] দান করা হয়েছিল, তারা মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনে।

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী ইসরাঈলদের গোমরাহি, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারোটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদিগারে আলম! আমাদের এদের থেকে সরিয়ে কোনো দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দেড়শ বছরের দূরত্বে দূর-প্রাচ্যের কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এ ব্যবস্থা হয় যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) হুজুর ﷺ -কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনে। রাসূলে করীম ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি মাপ-জোখের কোনো ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল, আমরা জমিতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দিই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমতো নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ-জোখের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ কেউ যদি তা করে তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘরবাড়িগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, তা এজন্য যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর হুজুর ﷺ যখন মি'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে এলেন তখন এ আয়াতটি নাজিল হলো- وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ তাফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাসীরে একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হুজুর ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন, যেখানে যাওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। [আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।]

অনুবাদ :

١٦٣. وَاسْئَلْهُمْ يَا مُحَمَّدُ تَوْبِيْخًا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مُجَاوِرَةً بَحْرَ الْقُلْزُمِ وَهِيَ اَيْلَةُ مَا وَقَعَ بِاَهْلِهَا اِذْ يَعْدُوْنَ يَعْتَدُوْنَ فِي السَّبْتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ الْمَامُوْرِيْنَ بِتَرْكِهٖ فِيْهِ اِذْ ظَرْفٌ لِيَعْدُوْنَ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ظَاهِرَةً عَلَى الْمَاءِ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا يُعَظِّمُوْنَ السَّبْتَ اَيْ سَائِرَ الْاَيَّامِ لَا تَاْتِيْهِمْ ابْتِلَاءً مِنَ اللّٰهِ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ وَلَمَّا صَادُوا السَّمَكَ افْتَرَقَتِ الْقَرْيَةُ اَثْلَاثًا ثُلُثٌ صَادُوْا مَعَهُمْ وَثُلُثٌ نَهَوْهُمْ وَثُلُثٌ اَمْسَكُوْا عَنِ الصَّيْدِ وَالنَّهْيِ.

১৬৩. হে মুহাম্মদ! ভর্ৎসনা স্বরূপ তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী বাহরে কুলযুম-ভূমধ্য সাগরের কুলে অবস্থিত জনপদ আয়লা সম্বন্ধে অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীদের কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তারা শনিবার সম্বন্ধে অর্থাৎ সেদিন মৎস শিকার বর্জনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা অমান্য করত মৎস্য শিকার পূর্বক সীমালঙ্ঘন করত يَعْدُوْنَ অর্থ সীমালঙ্ঘন করে। اِذْ এটা يَعْدُوْنَ ক্রিয়ার ظَرْف রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ প্রকাশ্যে অর্থাৎ পানির উপরে ভেসে তাদের নিকট আসত কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করত না সেদিন যেদিন শনিবারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ছিল না অর্থাৎ সপ্তাহের অন্যান্য দিন আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা হিসেবে তারা তাদের নিকট আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যেহেতু তারা অবাধ্যাচরণ করত। নিষেধ অমান্য করে মৎস শিকারে লিপ্ত হলে এরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল তো উক্ত অপরাধে শামিল হলো। আরেক দল তাদেরকে এ কাজ হতে নিষেধ করল। আরেক দল মৎস্য শিকারের অপরাধে লিপ্ত হয়নি বটে তবে অপরাধীদেরকে নিষেধ করার দায়িত্বও পালন করেনি।

١٦٤. وَاِذْ عَطْفٌ عَلٰى اِذْ قَبْلَهٗ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَصِدْ وَلَمْ تَنْهَ لِمَنْ نَهٰى لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط قَالُوْا مَوْعِظَتُنَا مَعْذِرَةً نَعْتَذِرُ بِهَا اِلٰى رَبِّكُمْ لِئَلَّا نُنْسَبَ اِلٰى تَقْصِيْرٍ فِيْ تَرْكِ النَّهْيِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الصَّيْدَ.

১৬৪. স্মরণ কর, وَاِذْ এটি পূর্ববর্তী اِذْ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। তাদের একদল যারা নিজেরা মৎস শিকার করেনি বটে তবে অন্যদেরকে এ কাজ হতে নিষেধও করেনি তারা বলেছিল, আল্লাহ যেই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল আমাদের এই সদুপদেশদান তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ খণ্ডনের জন্য অর্থাৎ এটা তাঁর দরবারে আমাদের পক্ষে কৈফিয়ত স্বরূপ হবে। ফলে নিষেধ করা বর্জনের অপরাধ আমাদের উপর আরোপিত হবে না। আর যাতে তারা মৎস শিকার হতে বেঁচে থাক সেজন্য এই উপদেশ দেই।

١٦٥. فَلَمَّا نَسُوْا تَرَكُوْا مَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِهٖ فَلَمْ يَرْجِعُوْا اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْاِعْتِدَاءِ بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ شَدِيْدٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

১৬৫. যে শিক্ষা উপদেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো পরিত্যাগ করল এবং সত্যের দিকে আর ফিরিয়ে আসল না তখন অসৎ কাজ হতে যারা নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি আর যারা সীমালঙ্ঘন করত নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তারা অবাধ্যাচরণ করত বিধায় তাদেরকে আমি মারাত্মক কঠোর শাস্তিতে পাকড়াও করি।

١٦٦. فَلَمَّا عَتَوْا تَكَبَّرُوْا عَنْ تَرْكِ مَا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ صَاغِرِيْنَ فَكَانُوْهَا وَهٰذَا تَفْصِيْلٌ لِمَا قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض مَا أَدْرِيْ مَا فُعِلَ بِالْفِرْقَةِ السَّاكِتَةِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَمْ تَهْلِكْ لِأَنَّهَا كَرِهَتْ مَا فَعَلُوْهُ وَقَالَتْ لِمَ تَعِظُوْنَ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَأَعْجَبَهُ.

১৬৬. তারা যখন নিষিদ্ধ কাজে বাড়াবাড়ি করতে লাগল অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন করল তখন তাদেরকে বললাম, লাঞ্ছিত ঘৃণিত বানরে পরিণত হও। ফলে তারা তাই হয়ে গেল। فَلَمَّا عَتَوْا এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত [... أَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا]-এর বিবরণ স্বরূপ। সুতরাং ف টি বিবরণমূলক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এদের যে দলটি নীরব ছিল তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কি করেছিলেন এই সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইকরিমা বলেন, এদের আজাব দেওয়া হয়নি। কারণ, তারা এ অপরাধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল এবং বলেছিল لِمَ تَعِظُوْنَ ..... হাকিম বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরে ইকরিমার এ অভিমত গ্রহণ করেন এবং এতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

١٦٧. وَإِذْ تَأَذَّنَ أَعْلَمَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ أَيِ الْيَهُوْدِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ ط بِالذُّلِّ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَهُ بُخْتَنَصَّرَ فَقَتَلَهُمْ وَسَبَاهُمْ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ فَكَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى الْمَجُوْسِ إِلٰى أَنْ بُعِثَ نَبِيُّنَا ﷺ وَضَرَبَهَا عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ج لِمَنْ عَصَاهُ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন تاذن অর্থ ঘোষণা দিলেন। যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের উপর ইহুদিদের উপর আধিপত্য দেবেন যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত পদদলিত এবং তাদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করে কঠিন শাস্তি দেবে। প্রথমত হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। এরপর সম্রাট বুখতনাস্‌সার এসে তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করে এবং তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করে। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব পর্যন্ত তারা অগ্নিপূজকদেরও তা প্রদান করে। রাসূল ﷺ ও তাদের উপর জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবাধ্যাচারীদেরকে শাস্তিদানে সত্বর এবং আনুগত্যপরায়ণদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

١٦٨. وَقَطَّعْنٰهُمْ فَرَّقْنٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ج فِرَقًا مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ نَاسٌ دُوْنَ ذٰلِكَ ز الْكُفَّارِ وَالْفَاسِقُوْنَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ بِالنِّعَمِ وَالسَّيِّاٰتِ النِّقَمِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ عَنْ فِسْقِهِمْ.

১৬৮. দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে ফেরকায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি, বিভিক্ত করে দিয়েছি। তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের কতক লোক অন্যরূপ অর্থাৎ কাফের ও অবাধ্যাচারী। মঙ্গল অর্থাৎ নিয়ামত প্রদান করত অমঙ্গল অর্থাৎ আমার শাস্তি ও ক্রোধে নিপতিত করে তাদেরকে আমি পরীক্ষা করি যেন তারা তাদের অবাধ্যাচরণ হতে ফিরে আসে।

١٦٩. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ عَنْ اٰبَائِهِمْ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى اَىْ حُطَامَ هٰذَا الشَّيْءِ الدَّنِيِّ اَىِ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ وَّحَرَامٍ وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ج مَا فَعَلْنَاهُ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ط اَلْجُمْلَةُ حَالٌ اَىْ يَرْجُوْنَ الْمَغْفِرَةَ وَهُمْ عَائِدُوْنَ اِلٰى مَا فَعَلُوْهُ مُصِرُّوْنَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِى التَّوْرٰةِ وَعْدُ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْاِصْرَارِ اَلَمْ يُؤْخَذْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ الْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى فِىْ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا عَطْفٌ عَلٰى يُؤْخَذْ قَرَءُوْا مَا فِيْهِ ط فَلِمَ كَذَبُوْا عَلَيْهِ بِنِسْبَةِ الْمَغْفِرَةِ اِلَيْهِ مَعَ الْاِصْرَارِ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط الْحَرَامَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَنَّهَا خَيْرٌ فَيُؤْثِرُوْهَا عَلَى الدُّنْيَا .

১৬৯. অতঃপর এমন উত্তর পুরুষ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট হতে কিতাবেরও তাওরাতেরও উত্তরাধিকারী হয়; তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী অর্থাৎ এ ঘৃণিত দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রী হালাল ও হারামের কোনো প্রভেদ না করে গ্রহণ করে। তারা বলে, আমরা যা করি সে বিষয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে তাও তারা গ্রহণ করে। وَاِنْ يَّاْتِهِمْ এ বাক্যটি এ স্থানে حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমার আশা করে অথচ তারা তাদের ঐ ঘৃণিত কর্মেরই পুনরাবৃত্তি করে তাতে জেদ ধরে থাকে। পাপের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা ক্ষমা করা হবে বলে কোনো প্রতিশ্রুতি তাওরাতে নেই। কিতাবের অর্থাৎ কিতাবের মধ্যে উল্লেখিত অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে নেওয়া হয়নি যে তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? আর তারা তো তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে। اَلَمْ يُؤْخَذْ [গ্রহণ করা হয়নি?] এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ অর্থাৎ বক্তব্যটিকে সুসাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। مِيْثَاقُ -এর প্রতি الْكِتَابِ এ স্থানে اَلْكِتَابِ-এর প্রতি مِيْثَاقُ -এর اِضَافَةٌ অর্থাৎ সম্বন্ধ فِىْ অর্থবোধক। وَدَرَسُوْا এটা يُؤْخَذْ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। অর্থাৎ অধ্যয়ন করে। يَعْقِلُوْنَ -এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষরূপেও পঠিত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা কেমন করে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে যে তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি ও জেদ প্রদর্শনের পরও তা ক্ষমা করে দেবেন! যারা হারাম হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়। তারা কি এটা অর্থাৎ এটা যে শ্রেয় তা অনুধাবন করে না? এবং এটাকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না?

١٧٠. وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِالْكِتٰبِ مِنْهُمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ اَلْجُمْلَةُ خَبَرُ الَّذِيْنَ وَفِيْهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اَىْ اَجْرَهُمْ .

১৭০. এদের মধ্যে যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে يُمَسِّكُوْنَ এটা س অক্ষরে তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপেও পঠিত রয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ আমি তো তাদের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। اِنَّا لَا نُضِيْعُ এ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ-এর خَبَر বা বিধেয়। এ স্থানে সর্বনাম [هُمْ] -এর স্থলে اَلظَّاهِر অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বিশেষ্য [اَلْمُصْلِحِيْنَ] -এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মূলত ছিল اَجْرَهُمْ অর্থাৎ তাদের শ্রমফল।

١٧١. وَ اذْكُرْ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَاهُ مِنْ اَصْلِهِ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَيْقَنُوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ج سَاقِطٌ عَلَيْهِمْ بِوَعْدِ اللّٰهِ اِيَّاهُمْ بِوُقُوْعِهِ اِنْ لَمْ يَقْبَلُوْا اَحْكَامَ التَّوْرٰةِ وَكَانُوْا اَبَوْهَا لِثِقْلِهَا فَقَبِلُوْا وَقُلْنَا لَهُمْ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَّاجْتِهَادٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ بِالْعَمَلِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

১৭১. আর স্মরণ কর আমি পর্বতকে যেমন একটি চন্দ্রাতপ সেইভাবে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি। সমূল উৎপাটিত করে তাদের উপর তাকে তুলে ধরি তারা তখন মনে করল তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে তা তাদের উপর পতিত হবে। তাওরাতের বিধানসমূহ কঠোর ও কঠিন ছিল বলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত বিধানসমূহ গ্রহণ না করলে উক্ত পাহাড় তাদের উপর পতিত করবেন বলে হুমকি দেন। এতদনুসারে তা সংঘটিত হয়। অনন্তর তারা তা গ্রহণ করে। আমি তাদেরকে বললাম, আমি তোমাদেরকে যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা ও শ্রম সহকারে ধারণ কর এবং এতদনুসারে কাজ করত তাতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। وَاقِعٌ بِهِمْ অর্থ, তাদের উপর নিপতিত হবে। بِهِمْ -এর ب টি এ স্থানে عَلٰى [উপর] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ : যেহেতু রাসূল ﷺ গ্রামবাসী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই عِلْم-এর জন্য প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য ছিল না, এ কারণেই এ প্রশ্নকে سُؤَال تَوْبِيْخ এবং تَقْرِيْع বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ : অর্থাৎ بِجَوَارِ الْبَحْرِ এ গ্রামের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ আইলা বলেছেন; কেউ কেউ طَبَرِيَة বলেছেন; কেউ কেউ مَدْيَنْ বলেছেন; কেউ কেউ اِيْلِيَا বলেছেন এবং বলা হয়েছে যে, শাম দেশের সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকা উদ্দেশ্য, বলা হয়– كُنْتُ بِحَضْرَةِ الدَّارِ অর্থাৎ بِقُرْبِهَا

قَوْلُهُ شُرَّعًا : এটা شَارِعٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রকাশ হওয়া।

قَوْلُهُ مَوْعِظَتُنَا : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো مَعْذِرَةً এটা قَالُوْا -এর مَقُوْلَه আর مَقُوْلَه টা বাক্য হওয়া জরুরি। অথচ مَعْذِرَةً টি মুফরাদ হয়েছে।

এর উত্তরে হচ্ছে, এটা قَالُوْا -এর مَقُوْلَه নয়; বরং উহ্য মুবতাদার খবর, আর তা হলো مَوْعِظَتُنَا আর এটা হলো مَعْذِرَةً -এর رَفْع-এর কেরাতের সুরতে। আর نَصْب -এর কেরাতের সুরতে উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل لَهُ হবে। উহ্য ইবারত হবে– وَعَظْنَاهُمْ مَعْذِرَةً অর্থাৎ لِمَعْذِرَةٍ

قَوْلُهُ وَهٰذَا تَفْصِيْلٌ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন হলো, فَلَمَّا عَتَوْا -এর উপর فَاء প্রবিষ্ট হওয়ার দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তারা এরপরও অবাধ্যাচরণ করেছে এবং তার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে শুধুমাত্র আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তিই প্রদান করা হয়েছিল, এটা ছাড়া অন্য কোনো শাস্তিই তাদেরকে প্রদান করা হয়নি।

এর জবাবে বলা হয় যে, فَلَمَّا -এর মধ্যকার فَاء টি تَفْصِيْلِيَّة হয়েছে تَعْقِيْبِيَّه নয়।

قَوْلُهُ اُمَمًا : এটা হয়তো قَطَّعْنَا -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে অথবা قَطَّعْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاسٌ مِنْهُمْ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে আর دُوْنَ ذٰلِكَ উহ্য মাওসূফের সিফত হয়েছে। আর তা হলো মুবতাদা উহ্য ইবারত হলো– وَمِنْهُمْ نَاسٌ قَوْمٌ دُوْنَ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ الْجُمْلَةُ حَالٌ : এখানে وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ এ বাক্যটি يَقُوْلُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে আর يَقُوْلُوْنَ টা يَعْتَقِدُوْنَ -এর অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : বিগত আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈল জাতির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির পূর্বপুরুষদের অবাধ্যতা ও নাফরমানির একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানি এবং অবাধ্যতা বনী ইসরাঈল তথা ইহুদিদের মজ্জাগত। তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং অবাধ্যতা তারা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছে। সেজন্য যুগে যুগে তারা তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তিও ভোগ করেছে। তাদেরকে বানর এবং শূকরে পরিণত হতে হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাকের নাফরমানি এবং অবাধ্যতার শাস্তি চির অপরিহার্য। আল্লাহ পাককে ফাঁকি দেওয়া যায় না। মানুষের কোনো কাজই ছোট হোক বা বড় তাঁর নিকট গোপন নেই। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনে শুধু অবহেলাই করেনি; বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশকে অমান্য করেছে। আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা হলো এই যে, লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত "আইলা" নগরীতে এক দল বনী ইসরাঈল বাস করত। মাদায়ান এবং তূর পর্বতের মধ্যস্থলে এ স্থানটি অবস্থিত। তাদের পেশা ছিল মৎস্য শিকার। তাদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়; কিন্তু তারা সে নিষেধ অমান্য করে। তাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে শনিবার দিনই মাছ ভেসে উঠত এবং তাদের নাগালে চলে আসত। অথচ অন্যদিন মাছ কাছেও আসতো না। তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল। আর এজন্যে একটি কৌশল অবলম্বন করল এভাবে যে, যেখানে মাছের সমাগম হতো তার কাছাকাছি একটি জলাধার তৈরি করল এবং সাগরের সঙ্গে তার যোগাযোগ করে দিল। শনিবারে যখন মাছ ভেসে উঠত এবং জলাধারে মাছ প্রবেশ করলে তারা তার মুখ বন্ধ করে দিত। পরের দিন ঐ মাছ ধরে আনত। এভাবে আল্লাহর বিধান অমান্য করার কৌশল আবিষ্কার করল। এ আইলাবাসীর শাস্তি হয়েছে বড় কঠোর। তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়েছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, বনী ইসরাঈলের যেসব লোক শনিবারের নির্দেশ সম্পর্কে নাফরমানি করেছিল তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে, শয়তান হয়তো তাদের অন্তরে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, আল্লাহ পাক শনিবার দিন মৎস শিকার করা নিষেধ করেননি; বরং মৎস্য খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্যে তারা শনিবারে মৎস্য শিকার করে। অথবা শয়তান তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করেছে, শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে, শনিবারে মৎস্য শিকার করব না তবে তাদের তৈরি জলাধারগুলোতে মাছ যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে এবং রবিবারে ধরে নিয়ে আসে। এ কৌশলের মাধ্যমে তাদের অপরাধ শুরু হয়। কিছুদিন পর তাদের আস্পর্ধা বেড়ে যায় এবং তারা শনিবারেও মাছ ধরা শুরু করে। শুধু তাই নয়; বরং ক্রয়বিক্রয়ও শুরু করে এবং শনিবার দিন তাদের খাবারে মৎস রাখতে তারা আর ইতস্তত করতো না। আইলাবাসীর এক তৃতীয়াংশ এ অপরাধে শরিক হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৪০৮]

আল্লামা শওকানী (র.) লিখেছেন- তাফসীরকারদের মতে, আইলাবাসী বনী ইসরাঈল তিনভাগে বিভক্ত হয়-

১. যারা এ অপরাধে লিপ্ত ছিল।

২. যারা এ অপরাধ করেনি কিন্তু অপরাধীদেরকে বাধাও দেয়নি এবং তাদের থেকে দূরেও সরে যায়নি।

৩. যারা এ অপরাধ করেনি; বরং অপরাধীদেরকে বাধা দিয়েছে এমনকি অবশেষে তাদের থেকে আল্লাহর গজবের ভয়ে দূরে সরে পড়েছে। অপরাধীদের মাঝে এবং তাদের বাড়িঘরের মাঝে দেয়াল দিয়েছে এবং তাদের সাথে উঠাবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। -[তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ২৫৭]

قَوْلُهُ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ : তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।

আল্লাহ পাক সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নীতি ঘোষণা করেছেন- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হলো এই, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতাংশেও আইলাবাসী অপরাধীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- "তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।" তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা বানরে পরিণত হয়। তাদের পুরুষগুলো নর বানর এবং স্ত্রীরা মাদি বানরে পরিণত হয়। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৫, পৃ. ৩৯-৪০]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন- আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা শৈলী দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের নাফরমানির কারণে কোনো কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা এবং মন্দ আচারণ থেকে বিরত হয়নি তাই তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করা হয়।

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, নেককার লোকদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বলেছিলেন, তোমরা কেন এ হতভাগাদেরকে উপদেশ দান কর? কেননা, তারা মনে করত এই দুর্বৃত্তদেরকে উপদেশ দান করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তখন তাদের কথার জবাবে উপদেশ দানকারীগণ বলেন, আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের ওজর হিসেবে পেশ করার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকি যেন উপদেশ না দেওয়ার অপরাধ আমাদের উপর না বর্তায়।

অথবা এর ব্যাখ্যা হলো এই, যারা শনিবারে মৎস শিকার করার ব্যাপারে অপরাধীদেরকে নসিহত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নসিহত করা থেকে বিরত হয়েছিলেন, তারা একে অন্যকে বললেন, আর এদেরকে নসিহত করে কি হবে? কেন এদেরকে নসিহত করছ? তখন তারা বলল, আল্লাহ পাকের দরবারে কর্তব্য পালনের আরজি পেশ করার জন্যে এ মর্মে যে, আমরা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং অন্যায় থেকে তাদেরকে বিরত রাখার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

বর্ণিত আছে যে, উপদেশ প্রদানকারীগণ যখন শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীদের হেদায়েত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তারা অপরাধীদের সাথে বাস করা অনুচিত মনে করলেন। বস্তিকে তারা ভাগ করে নিলেন। মুসলমানদের এলাকার প্রবেশদ্বার ভিন্ন করা হলো এবং পাপিষ্ঠদের প্রবেশদ্বার ভিন্ন হলো। দু-দলের মধ্যখানে একটি দেয়াল দিয়ে দেওয়া হলো।

হযরত দাউদ (আ.) পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে বদদোয়া করলেন। একদিনের সকালে নেককারগণ লক্ষ্য করলেন, পাপিষ্ঠদের এলাকা থেকে কেউ বের হচ্ছেনা, তখন তারা প্রমাদ গুণলেন। তারা বললেন, হয়তো আজ রাতে তাঁদের উপর কোনো বিপদ নিপতিত হয়েছে। তাই তাদের এলাকায় গিয়ে দেখলেন, সকলেই বানরে পরিণত হয়েছে। এরা তাদের আত্মীয়স্বজনকে চিনতে পারে না। কিন্তু বানররা তাদেরকে চিনতে পেরেছে এবং আত্মীয়স্বজনের নিকটে এসে তারা ক্রন্দন করতে থাকে, তখন নেককার আত্মীয়স্বজন তাদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদের নসিহত করিনি, তোমাদেরকে বারবার মৎস শিকারে আমরা কি বাধা দেইনি? তখন তারা মাথা ঝুকিয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়। তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকে। লোকেরা এসে তাদেরকে দেখত, এরপর তাদের মৃত্যু হয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৪১০]

قَوْلُهُ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ الخ : আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত [ইহুদি]-এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দুটি শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হলো প্রথমত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন কোনো ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদিরা সব সময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অসহায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এর চেয়ে বেশি কোনো গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদিরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলদের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদিদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এ পৃথিবীতেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কোথাও কোনো এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا-এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تَقْطِيْعٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ– খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়া। আর اُمَمٌ হলো اُمَّةٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণি। মর্ম হলো এই যে, আমি ইহুদি জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বোঝা গেল যে, কোনো জাতিবিশেষের কোনো এক স্থানে সমবেত জীবনযাপন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিছিন্ন হয়ে পড়া এক রকম ঐশী আজাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর এ নিয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদিনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদিরা সব সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

য়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ সদাসত্য রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদিদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহর অপরাধীকে সমন জারি করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাজির করা হবে না; বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করেন যাতে অপরাধী পায়ে হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাজির হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদিদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করে দেওয়া সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করেছেন। অতঃপর শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এ সমবেত হওয়া বর্ণিত আজাবের পরিপন্থি নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুত এটা এমন একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোনো ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অবিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোনো গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলা বাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেওয়ায় এ জাতির কোনো ক্ষমতালাভ ঘটে না। কুরআনে কারীম তাদের সম্পর্কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে আর বাদবাকি হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদিদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হলো এই- مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম" -এর মর্ম হলো এই যে, কাফের দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়। কিছু সৎও আছে। এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আর না কোনো রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এ ছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারে, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সেই সমস্ত লোক, যারা তাওরাতকে আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহকাম ও বিধিবিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে- وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ আমি ভালো-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভালো অবস্থার দ্বারা'- এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সেই অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোনো কোনো সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাহোক, সারমর্ম হলো এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দুটি প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো দান ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, তারা দাতা ও অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার ও সম্পাদন করে কিনা? দ্বিতীয়ত তাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন [করে পরীক্ষা] করা হয় যে, তারা নিজেদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মন্দ ও অসদাচরণ থেকে তওবা করে কিনা।

কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের জন্য নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, ধনসম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে– إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ অর্থাৎ [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ হলেন ফকির আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে– يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোনো জাতির একত্র বাস আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হলো একটা শাস্তি। দ্বিতীয়ত পার্থিব আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখানকার যে দুঃখকষ্ট, তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা কান্নাকাটির বিষয় নয়; তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহংকারী হয়ে উঠার মতো কোনো উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ -এর প্রথম শব্দ خَلَفَ [খলাফা] خِلَافٌ ধাতু থেকে নির্গত অতীতকালবাচক বচন। এর অর্থ– 'স্থলাভিষিক্ত কিংবা প্রতিনিধি হয়ে গেল'। আর দ্বিতীয় শব্দ خَلْفٌ হলো ধাতু যা স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একবচন ও বহুবচনে একইভাবে বলা যায়। خَلْفٌ [খলফুন] লামের সাকিন যোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অসৎ খলিফা বা প্রতিনিধি অর্থে! যারা কিনা নিজেদের বড়দের রীতিবিরুদ্ধভাবে অপকর্মে লিপ্ত হয়! আর خَلَفٌ [খালাফুন] লামের ফাতাহ যোগে হলে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধির ক্ষেত্রে। যারা নিজেদের বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন করে! এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার তাই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়।

قَوْلُهٗ وَرِثُوا الْكِتٰبَ : وَرِثُوْا শব্দটি وَرَاثَةٌ ধাতু থেকে গঠিত। যে বস্তু বা সামগ্রী মৃতের পরে জীবিত ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'মীরাস' বা 'ওয়ারাসাত'। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাওরাত গ্রন্থখানি নিজেদের বড়দের পক্ষ থেকে তারা প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের হাতে এসেছে।

عَرَضٌ [আরাদ] শব্দটি ব্যবহৃ হয় বস্তু-সামগ্রী অর্থে, যা নগদ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। আবার কখনও এ শব্দটি সাধারণভাবে বস্তুসামগ্রী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তা নগদ অর্থ হোক বা অন্যান্য সামগ্রী। তাফসীরে-মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, এখানে শব্দটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এখানে সাধারণ বস্তু-সামগ্রীকে عَرَضٌ শব্দে উল্লেখ করে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদ তা যতই হোক না কেন, একান্তই অস্থায়ী। কারণ عَرَضٌ [আরাদ] শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মৌল উপাদানের তুলনায় অল্প স্থায়ী বিষয়কে বুঝাবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, যার নিজস্ব কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব থাকে না, বরং সে তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সে কারণেই عَارِضٌ [আরিদ] শব্দটি 'মেঘ' অর্থে বলা হয়। কারণ তার অস্তিত্বও স্থিতিশীল নয়। শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কুরআনে কারীমে এ অর্থেই বলা হয়েছে– هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

هٰذَا الْاَدْنٰى -তে اَدْنٰى শব্দটি 'নৈকট্য' دُنُوٌّ ধাতু থেকে গঠিত বলেও বলা যায়। তখন اَدْنٰى [আদনা] অর্থ হবে 'নিকটতর'। এরই স্ত্রীলিঙ্গ হলো دُنْيَا [দুনইয়া] যার অর্থ নিকটবর্তী। আখেরাতের তুলনায় এ পৃথিবী মানুষের অধিক নিকটে বলেই একে اَدْنٰى বা دُنْيَا বলা হয়। এছাড়া 'তুচ্ছ' ও 'হীন' অর্থে ব্যবহৃত دَنَاءَةٌ থেকেও গঠিত হতে পারে। তখন অর্থ হবে– হীন ও তুচ্ছ। দুনিয়া এবং তার যাবতীয় বিষয় সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় হীন ও তুচ্ছ বলেই তাকে اَدْنٰى ও دُنْيَا বলা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ এই যে, প্রথম যুগের ইহুদিদের মধ্যে দু-রকমের লোক ছিল– কিছু ছিল সৎ এবং তাওরাতে বর্ণিত শরিয়তের অনুসারী, আর কিছু ছিল কৃতঘ্ন-পাপী। কিন্তু তারপরে এদের বংশধরদের মধ্যে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসাবে তাওরাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এমনি আচরণ অবলম্বন করেছে যে, আল্লাহর কিতাবকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে দিয়েছে, স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে আল্লাহর কালামকে তাদের মতলব অনুযায়ী বিকৃত করতে শুরু করেছে।

قَوْلُهٗ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا : তদুপরি এ ধৃষ্টতা যে, তারা বলতে থাকে, যদিও আমরা পাপ করে থাকি, কিন্তু আমাদের সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন বিভ্রান্তি সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে এভাবে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন– وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ তাদের অবস্থা হলো এই যে, এখনও যদি আল্লাহর কালামের বিকৃতি সাধনের

বিনিময়ে এরা কিছু অর্থ লাভ করতে পারে, তাহলে এরা এখনও তা নিয়ে কালামের বিকৃতি সাধনে বিরত থাকবে না। সারার্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও মার্জনা যথাস্থানে সত্য ও নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা শুধুমাত্র সেই সব লোকের জন্যই নির্ধারিত, যারা নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে তা পরিহার করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবে যার পারিভাষিক নাম হলো 'তওবা'।

এরা নিজেদের অপরাধে অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করে, অথচ এখনও পয়সা পেলে কালামুল্লার বিকৃতি সাধনে এতটুকু দ্বিধা করবে না। পাপের পুনরাবৃত্তি করেও ক্ষমার আশা করতে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া তার আর কোনোই তাৎপর্য থাকতে পারে না।

তারা কি তাওরাতে এ প্রতিজ্ঞা করেছিল না যে, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরোপ করে এমন কোনো কথাই বলবে না, যা সত্য নয়। আর তারা এ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে তাওরাতে পড়েও ছিল। এসবই হলো তাদের অদূরদর্শিতা। কথা হলো, শেষ বিচারের দিনেই যে পরহেজগারদের জন্য অতি উত্তম ও অন্তহীন সম্পদ রয়েছে তারা কি একথাটিও বুঝে না?

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষত বনী ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাওরাত সম্পর্কে নেওয়া হয়েছিল যে, এতে কোনো রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদিগারের প্রতি অন্য কোনো বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধিবিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এ আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসেবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের সব আলেমই এমন নয়; কোনো কোনো আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধিবিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সৎকাজের ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাজ ও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরজ আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্যে যার আলোচনা ইতঃপূর্বে এসে গেছে অর্থাৎ তাওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানি কিতাবই উদ্দেশ্যে। যেমন তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন।

দ্বিতীয়ত এ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেছে যে, আল্লাহর কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্নসহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধিবিধান ও নির্দেশাবলির অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই হয়তো এ আয়াতে কিতাবকে গ্রহণ করা কিংবা পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অন্যথায় يَأْخُذُوْنَ কিংবা يَقْرَءُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, يُمَسِّكُوْنَ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

তৃতীয় লক্ষণীয় হলো এই যে, এখানে তাওরতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তাওরাতের বিধি-নিষেধ একটি দুটি নয় শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবের বিধিবিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো নামাজ। তদুপরি নামাজের অনুবর্তিতা সকল বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন।

তবে এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাজে নিয়ামনুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাজের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইরশাদ রয়েছে– "নামাজ হলো দীনের স্তম্ভ, যার উপর দীন ইসলাম কায়েম হয়েছে, যে ব্যক্তি এ স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে যেন দীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।"

এ কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ-এর পরে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ আদায় করে। আর যে নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাসবীহ-অজিফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহাদা-সাধনাই

করুক না কেন আল্লাহর নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কারামত-কাশফও হয় তবুও তার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি লজ্ঘন এবং তাওরাতের বিধি-নিষেধে তাদের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে তাদের সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। এরপর দ্বিতীয় আয়াতে বনী ইসরাঈলেরই একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, যা তাওরাতের হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতার জন্য তাদেরকে নানা রকম ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় এসে গেছে।

এ আয়াতে نَتَقْنَا শব্দটি نَتْقٌ থেকে গঠিত, যার অর্থ হলো– টেনে নেওয়া এবং উত্তোলন করা। সূরা বাকারায় এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে رَفَعْنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) نَتَقْنَا [নাতাকনা]-এর ব্যাখ্যা رَفَعْنَا শব্দের দ্বারাই করেছেন।

رَفَعْنَا আর ظُلَّةٌ শব্দটি ছায়া অর্থে ظِلٌّ [যিল্লুন] থেকে গৃহীত। এর অর্থ সামিয়ানা। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এমন বস্তুকেই সামিয়ানা বলা হয়, যার ছায়া মাথার উপর পড়ে, কিন্তু তা কোনো খুঁটিতে টাঙ্গানো হয়। আর এ ঘটনায় তাদের মাথার উপর পাহাড়কে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সামিয়ানার মতোই ছিল না। সে জন্যই বিষয়টি উদাহরণবাচক শব্দ সহযোগে বলা হয়েছে

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সে সময়টিও স্মরণ করার মতো, যখন আমি বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড়কে তুলে এনে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে তারা মনে করতে লাগল, এই বুঝি আমাদের উপর পাহাড়টি ছুটে পড়ল! এমনি অবস্থায় তাদেরকে বলা হলো– خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি যেসব বিধিবিধান তোমাদের দান করছি সেগুলোকে সুদৃঢ় হাতে ধর। আর তাওরাতের হেদায়েতগুলো মনে রেখো, যাতে তোমরা মন্দ কাজ ও আচরণ হতে বিরত থাকতে পার।

ঘটনাটি হলো এই যে, বনী ইসরাঈলদের ইচ্ছা ও অনুরোধের ভিত্তিতে হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে কিতাব ও শরিয়তপ্রাপ্তির আবেদন করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ ব্যাপারে তূর পাহাড়ে চল্লিশ রাত ই'তিকাফ করার পর আল্লাহর এ গ্রন্থ পেলেন এবং তা নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের শোনালেন, তখন তাতে এমন বহু বিধিবিধান ছিল, যা ছিল তাদের মন-মানসিকতা ও সহজতার পরিপন্থি। সেগুলো শুনে তারা অস্বীকার করতে লাগল যে, আমাদের দ্বারা এসবের উপর আমল করা চলবে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈলকে হুকুম করলেন এবং তিনি গোটা তূর পাহাড়কে তুলে এনে সেই জনপদের উপর টাঙিয়ে দিলেন যেখানে বনী ইসরাঈলরা বাস করত। এভাবে তারা যখন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে মাথার উপর দাঁড়ানো দেখতে পেল, তখন সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাওরাতের যাবতীয় বিধিবিধানে যথাযথ আমল করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারবার তার বিরুদ্ধাচরণই করতে থাকল।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর : এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মাজীদে পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই, যার ভিত্তিতে কাউকে বাধতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এ ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দীন কবুল করার জন্য বনী ইসরাঈলদের বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে, ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে ইসলামি শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবধি শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটির সম্পর্ক হলো অমুসলিমদের সাথে। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বা জবরদস্তি মুসলমান বানানো যাবে না। আর বনী ইসরাঈলদের এ ঘটনায় কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়নি, বরং তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল বলেই তাদের উপর জবরদস্তি আরোপ করে অনুবর্তী করায় لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -এর পরিপন্থি কিছুই হয়নি।

١٧٢. وَ اذْكُرْ اِذْ حِيْنَ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِمَّا قَبْلَهُ بِاِعَادَةِ الْجَارِّ ذُرِّيَّتَهُمْ بِاَنْ اَخْرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ كَنَحْوِ مَا يَتَوَالَدُوْنَ كَالذَّرِّ بِنَعْمَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَنَصَبَ لَهُمْ دَلَائِلَ عَلٰى رُبُوْبِيَّتِهٖ وَرَكَّبَ فِيْهِمْ عَقْلًا وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج قَالَ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج اَنْتَ رَبُّنَا شَهِدْنَا ج بِذٰلِكَ وَالْاِشْهَادُ لِ اَنْ لَّا تَقُوْلُوْا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ اَيِ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا التَّوْحِيْدِ غٰفِلِيْنَ لَا نَعْرِفُهٗ.

অনুবাদ :

১৭২. আর স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক আদম-সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করেন। مِنْ ظُهُوْرِهِمْ এটা পূর্ববর্তী শব্দ [مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ]-এর جَرّ বাচক শব্দ [مِنْ]-এর পুনরুল্লেখসহ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করার পর পৃথিবীতে যে অনুসারে তাদের জন্ম হবে সেই ক্রমঅনুসারে আল্লাহ তা'আলা এক একজনের পৃষ্ঠদেশ হতে তার উত্তরাধিকারীগণকে আরাফার দিন না'মান নামক স্থানে [আরাফার নিকটস্থ একটি উপত্যকা] পিপীলিকার ন্যায় সমবেত করেন। তাদেরকে 'আকল' দান করেন এবং তাঁর রব হওয়ার প্রমাণসমূহ প্রদর্শন করেন। এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন। বললেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব-প্রতিপালক। আমরা এটার সাক্ষী করলাম; এ সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে তারা অর্থাৎ কাফেরগণ যেন কিয়ামতের দিন না বলে, تَقُوْلُوْا এটা উভয় স্থানে [পরবর্তী اَوْ تَقُوْلُوْا তেও] ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষরূপে পঠিত রয়েছে। আমরা তো এ বিষয়ে অর্থাৎ তাওহীদের সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম, এ সম্পর্কে আমরা জানতাম না কিছুই।

١٧٣. اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ج فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا تُعَذِّبُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ مِنْ اٰبَائِنَا بِتَاسِيْسِ الشِّرْكِ اَلْمَعْنٰى لَا يُمْكِنُهُمُ الْاِحْتِجَاجُ بِذٰلِكَ مَعَ اِشْهَادِهِمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ وَالتَّذْكِيْرِ بِهٖ عَلٰى لِسَانِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَةِ قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهٖ فِى النُّفُوْسِ.

১৭৩. কিংবা যেন না বলে, আমাদের পিতৃপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর আমরা এতে তাদেরই অনুসরণ করেছি। তবে কি শিরকের ভিত্তি স্থাপন করত আমাদের পিতৃপুরুষদের যারা মিথ্যাশ্রয়ী হয়েছে তাদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? শাস্তি দেবে? অর্থাৎ নিজ সম্পর্কে তাওহীদের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতিদানের পর তাদের পক্ষে এ ধরনের যুক্তির অবতারণা সম্ভব হবে না। মু'জিযার অধিকারী নবী কর্তৃক উক্ত অঙ্গীকার সম্পর্কে এভাবে স্মরণ করে দেওয়া খোদ নিজেরেই স্মরণ হওয়ার মর্যাদা রাখে।

١٧٤. وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ مَا بَيَّنَّا الْمِيْثَاقَ لِيَتَدَبَّرُوْهَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ عَنْ كُفْرِهِمْ.

১৭৪. এভাবে অর্থাৎ উক্ত অঙ্গীকারের কথা যেভাবে স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছি সেভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যেন তাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে এবং যাতে তারা কুফরি হতে ফিরে যায়।

١٧٥. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ أَيِ الْيَهُوْدِ نَبَأَ خَبَرَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا خَرَجَ بِكُفْرِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا وَهُوَ بَلْعَمُ بْنُ بَاعُوْرَا مِنْ عُلَمَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ سُئِلَ أَنْ يَدْعُوَ عَلٰى مُوْسٰى وَمَنْ مَعَهُ وَأُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فَدَعَا فَانْقَلَبَ عَلَيْهِ وَانْدَلَعَ لِسَانُهُ عَلٰى صَدْرِهِ فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَأَدْرَكَهُ فَصَارَ قَرِيْنَهُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ .

১৭৫. হে মুহাম্মদ! তাদেরকে অর্থাৎ ইহুদিদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত সংবাদ পাঠ করে শুনাও যাকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম অতঃপর সে তাকে বর্জন করে অর্থাৎ সাপ যেমন তার খোলস হতে বের হয়ে আসে তেমন ঐ ব্যক্তি তার কুফরিসহ আমার নিদর্শনসমূহ পরিত্যাগ করে বের হয়ে আসে, শয়তান তার পিছনে লাগে। তাকে শয়তান পেয়ে বসে এবং তার একান্ত সহচর হয়ে দাঁড়ায়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ব্যক্তিটি ছিল বালআম ইবনে বাউরা নামক জনৈক ইসরাঈলী আলেম পণ্ডিত। তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করত হযরত মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে বলা হলে সে অনুরূপ বদদোয়া করে। কিন্তু তা বুমেরাং হয়ে তার দিকেই ফিরিয়ে আসে, ফলে আজাব স্বরূপ তার জিহ্বা বের হয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়ে।

١٧٦. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ إِلٰى مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ بِهَا بِأَنْ نُوَفِّقَهُ لِلْعَمَلِ وَلٰكِنَّهُ أَخْلَدَ سَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ أَيِ الدُّنْيَا وَمَالَ إِلَيْهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فِيْ دُعَائِهِ إِلَيْهَا فَوَضَعْنَاهُ فَمَثَلُهُ صِفَتُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالزَّجْرِ يَلْهَثْ يَدْلَعُ لِسَانَهُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط وَلَيْسَ غَيْرُهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كَذٰلِكَ وَجُمْلَتَا الشَّرْطِ حَالٌ أَيْ لَاهِثًا ذَلِيْلًا بِكُلِّ حَالٍ وَالْقَصْدُ التَّشْبِيْهُ فِي الْوَضْعِ وَالْخِسَّةِ بِقَرِيْنَةِ الْفَاءِ الْمُشْعِرَةِ بِتَرْتِيْبِ مَا بَعْدَهَا عَلٰى مَا قَبْلَهَا مِنَ الْمَيْلِ إِلَى الدُّنْيَا وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ ذٰلِكَ الْمَثَلُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ عَلَى الْيَهُوْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ فِيْهَا فَيُؤْمِنُوْنَ .

১৭৬. আমি ইচ্ছা করলে এটা দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম আমল করার তাওফীক প্রদান করত এ সমস্ত নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে আলেমগণের মর্যাদায় বিভূষিত করতাম কিন্তু সে মাটির দিকে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে এটা নিয়ে সে শান্ত হয়ে পড়ে এবং এদিকেই সে অনুরক্ত হয়ে পড়ে ও তার খাতিরে দোয়া করে তার কামনারই সে অনুসরণ করে। ফলে তাকে আমি অধঃগতি করে দিলাম। তার উদাহরণ অবস্থা কুকুরের ন্যায়; এটাকে তুমি তাড়িয়ে ও ধমক দিয়ে ক্লেশ দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এ অবস্থা আর কোনো প্রাণীর নেই। إِنْ تَحْمِلْ শর্তযুক্ত এ দুটি বাক্য [إِنْ تَحْمِلْ.. ও تَتْرُكْهُ] এ স্থানে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্লেশ দেওয়া হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে হাঁপায় এবং সে ঘৃণিত। নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার মধ্যে তুলনা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কারণ ف অক্ষরের সাহায্যে এ উপমাটি আরম্ভ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতের মর্ম দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়াও কামনার অনুসরণ করার সাথে এর ক্রম সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী বাক্যটিও এর ইঙ্গিতবহ। এটা এ উদাহরণ হলো যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের উপমা। ইহুদিদের নিকট তুমি কাহিনী বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। তাতে গবেষণা করে এবং ঈমান আনয়ন করে।

١٧٧. سَاۤءَ بِئْسَ مَثَلًا نِ الْقَوْمُ اَيْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ بِالتَّكْذِيْبِ .

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করে কতই না মন্দ উপমা সেই সম্প্রদায়। অর্থাৎ সেই সম্প্রদায়ের উপমা কতই না মন্দ। سَاۤءَ অর্থ, কতই না মন্দ।

١٧٨. مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

১৭৮. আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٧٩. وَلَقَدْ ذَرَاْنَا خَلَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز اَلْحَقَّ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز دَلَائِلَ قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَصَرِ اِعْتِبَارٍ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط الْاٰيَاتِ وَالْمَوَاعِظَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَاتِّعَاظٍ اُولٰۤئِكَ كَالْاَنْعَامِ فِيْ عَدَمِ الْفِقْهِ وَالْبَصَرِ وَالْاِسْتِمَاعِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ مِنَ الْاَنْعَامِ لِاَنَّهَا تَطْلُبُ مَنَافِعَهَا وَتَهْرُبُ مِنْ مَضَارِهَا وَهٰؤُلَاۤءِ يُقْدِمُوْنَ عَلَى النَّارِ مُعَانِدَةً اُولٰۤئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ .

১৭৯. আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা ذَرَاْنَا অর্থ, সৃষ্টি করেছি। সত্য উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের প্রমাণসমূহ দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দ্বারা চিন্ত-গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করার মতো নিদর্শসমূহ ও উপদেশাবলি শ্রবণ করে না। এরা উপলব্ধি না করা, দর্শন ও শ্রবণ না করার ক্ষেত্রে পশুর ন্যায়, না, তা অপেক্ষাও অর্থাৎ পশু অপেক্ষাও অধিক মূঢ়। কারণ পশুও তার জন্য উপকারী বস্তুর প্রতি আগ্রহী হয় এবং অনিষ্ট হতে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে এরা শুধুমাত্র জিদের বশবর্তী হয়ে জাহান্নামের দিকে [যা তাদের জন্য ক্ষতিকর সেই দিকে] এগিয়ে চলছে। এরাই উদাসীন।

١٨٠. وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى اَلتِّسْعَةُ وَالتِّسْعُوْنَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسْنٰى مُؤَنَّثُ الْاَحْسَنِ فَادْعُوْهُ سَمُّوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا اُتْرُكُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ مِنْ اَلْحَدَ وَلَحَدَ يَمِيْلُوْنَ عَنِ الْحَقِّ فِيْۤ اَسْمَاۤئِهٖ ط حَيْثُ اِشْتَقُّوْا مِنْهَا اَسْمَاۤءً لِاٰلِهَتِهِمْ كَاللَّاتِ مِنَ اللّٰهِ وَالْعُزّٰى مِنَ الْعَزِيْزِ وَمَنَاتِ مِنَ الْمَنَّانِ سَيُجْزَوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ جَزَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

১৮০. উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। হাদীসে আছে তা হলো নিরান্নব্বইটি নাম। তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। নামকরণ করবে যারা তার নাম বিকৃত করে, يُلْحِدُوْنَ এটা اَلْحَدَ ও لَحَدَ উভয় ক্রিয়া হতে গঠিত। অর্থ, সত্য হতে ফিরে থাকে। সত্য হতে বিচ্যুত হয়; ঐ সমস্ত নাম বিকৃত করে তারা তাদের দেবতাদের নাম গঠন করে যেমন আল্লাহ হতে লাত, আযীয হতে উয্যা, মান্নান হতে মানাত নাম বানিয়ে নিয়েছে তাদেরকে পরিত্যাগ কর বর্জন কর। শীঘ্রই আখেরাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। এ নির্দেশ ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বের।

١٨١. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ هُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا فِيْ حَدِيْثٍ.

১৮১. যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল এমনও আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, এরা হলো রাসূল ﷺ -এর উম্মত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِمَّا قَبْلَهُ : অর্থাৎ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ টা بَنِىْ اٰدَمَ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন যে, এটা بَدَلُ الْبَعْضِ عَنِ الْكُلِّ হয়েছে। আর এটাই সুস্পষ্ট। যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا ظَهْرَهٗ একে কেউ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ বলেনি। উহ্য ইবারত হবে- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُوْرِ بَنِىْ اٰدَمَ

قَوْلُهُ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ : এখানে مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ হলো মওসূফ আর مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ হলো সিফত।

قَوْلُهُ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ : অর্থাৎ এ ধারাবাহিকতায়ই পৃথিবীতে প্রকাশ পাচ্ছিল, অর্থাৎ প্রথমে হযরত আদম (আ.)-এর পিঠ থেকে কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে আদম সন্তানদেরকে বের করেছেন। এরপর আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : যেন বিনা প্রয়োজনে اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ আবশ্যক না হয় এজন্য قَالَ শব্দকে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ اَنْتَ رَبُّنَا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো بَلٰى টা قَالُوْا-এর مَقُوْلَه হয়েছে। আর مَقُوْلَه-এর জন্য জুমলা হওয়া আবশ্যক। অথচ بَلٰى হলো হরফ।

উত্তর : এর জবাব হলো এই যে, এখানে ইবারত উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- بَلٰى اَنْتَ رَبُّنَا কাজেই আর কোনো আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْاِشْهَادُ لِ : এখানে اِشْهَادٌ এবং لَامٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ تَقُوْلُوْا এটা شَهِدْنَا -এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَهِدْنَا : এতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে-

১. এটা ফেরেশতাদের বাক্য যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী বানিয়েছেন। এ সুরতে بَلٰى -এর উপর وَقْف হবে।

২. এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা আদম সন্তানের বাক্য, হবে। এ সুরতে অর্থ হবে আমরা তাঁর স্বীকারোক্তি করে সাক্ষ্য দিয়েছি, এ সুরতে بَلٰى-এর উপর وَقْف ঠিক হবে না; বরং شَهِدْنَا -এর উপর হবে।

৩. এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম, অর্থাৎ شَهِدْنَا عَلٰى اِقْرَارِكُمْ كَرَاهَةَ اَنْ تَقُوْلُوْا اَوْ لِئَلَّا تَقُوْلُوْا অর্থাৎ আমি তোমাদের থেকে এজন্য স্বীকারোক্তি নিয়েছি যাতে তোমরা অজ্ঞানতার ওজর পেশ করতে না পার। অথবা এ কথাকে অপছন্দ করে যে, তোমরা অজ্ঞানতার ওজর পেশ কর।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى لَا يُمْكِنُهُمُ الْاِحْتِجَاجُ بِذٰلِكَ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আদম সন্তানদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর তাদের নিকট অজ্ঞানতা ও গাফলতের অজুহাত অবশিষ্ট থাকবে না। সে এটা বলতে পারবে না যে, হে আল্লাহ এ অঙ্গীকারের ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। যার কারণে আমরা গাফলতের মধ্যে রয়েছি।

قَوْلُهُ وَالتَّذْكِيْرُ بِهِ عَلٰى لِسَانِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَةِ قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهٖ فِى النُّفُوْسِ : এ ইবারত দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, রোজে আযলে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি পৃথিবীতে আগমনের পর একেবারেই ভুলে গেছে। এখন কারো اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ নেই। তাহলে এ জাতীয় অঙ্গীকারের উপকারিতা কি? যা মনেই থাকে না এবং এর কারণে ধরপাকড় হওয়া অনুচিত?

উত্তর. এই ভুলে যাওয়া অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই তো আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছেন। যারা বিরামহীনভাবে এ বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ধরপাকড় না হওয়ার তো কোনো কারণই থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ اَلتَّذْكِيْرُ : اَلتَّذْكِيْرُ হলো মুবতাদা এবং قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهٖ فِى النُّفُوْسِ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ سَكَنَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَخْلَدَ টা خُلُوْدٌ হতে নিষ্পন্ন যার অর্থ হলো دَوَامٌ [সর্বদা]। বরং اَخْلَدَ টা مَالَ অর্থে اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ অর্থ হলো مَالَ اِلَيْهَا

قَوْلُهُ فِىْ دُعَائِهٖ اِلَيْهَا : অর্থাৎ دُعَاءِ الْهَوٰى اِيَّاهُ তথা মনের কুপ্রবৃত্তি বালআমকে দুনিয়ার প্রতি আহ্বান করেছে। এতে مَصْدَرٌ مُضَافٌ টা فَاعِلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَوَضَعْنَاهُ : অর্থাৎ ذَلَّلْنَاهُ

قَوْلُهُ اَوْ اِنْ تَتْرُكْهُ : কোনো কোনো নুসখায় اِنْ-এর উল্লেখ নেই। এটা লেখকের ভ্রান্তি হয়েছে। মুফাসসির (র.) اَنْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, তার আতফ تَحْمِلْ -এর উপর ; اِنْ تَحْمِلْ-এর উপর নয়। কাজেই تَتْرُكْهُ -এর জযম সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهُ جُمْلَتَا الشَّرْطِ حَالٌ : অর্থাৎ মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি উভয় বাক্যই حَالٌ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, কুকুর সর্বাবস্থায় জিহ্বা বের করে হাপাতে থাকে, চাই সে আরামের অবস্থায় হোক বা কষ্টের মধ্যেই হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَسْتُ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ : আয়াতগুলোতে মহাপ্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মানবের মাঝে সে সময় হয়েছিল, যখন এ দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টি আসেওনি যাকে বলা হয় عَهْدِ اَزَلْ বা عَهْدِ اَلَسْتُ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছুই রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো বিধান চলতে পারে, আর নাইবা থাকতে পারে তাঁর কোনো কাজের উপর কারো কোনে প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্য রয়েছে সব রকমের আজাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজকর্ম; এমনকি মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোনো পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরি করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেওয়া এবং সেজন্য সাক্ষীসাবুদ দাঁড় করানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোনো লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষীসাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায় যেন সে নিজেও নিজকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নেয় এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ এমন কোনো বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে– كُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে। অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেওয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আজাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহাবিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজকর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোনো কোনো অপরাধী সাক্ষীদের মিথ্যা বলে দাবি করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোনো সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে– فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মতো নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্যসাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থা' সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরি করেন যে, যে-ই এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার [পিতার] স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়ে বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহু গুণ বেশি। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসেবেই তৈরি করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানি নির্দেশনামা। এক বিরাটসংখ্যক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এ ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান প্রতিপালককে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে দেওয়া, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো এমন সব নির্দেশ স্থাপন করে দেওয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোনো সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে– وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও [নিদর্শন রয়েছে]। তারপরও কি তোমরা দেখছ না? তাছাড়া যারা গাফেল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোনো আশঙ্কাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহর এ পবিত্র দল নিজেদের এ প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজ নিজ নবী-রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ পূরণ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি, যা আমাদের রাসূল ﷺ সম্পর্কে সমস্ত নবী-রাসূলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর 'নবীয়ে-উম্মী' খাতামুল আম্বিয়া ﷺ-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্য কর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বারবার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়'আত গ্রহণের তাৎপর্য : নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখদের মাঝে বায়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এ ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়'আতের মধ্যে 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এর কথা কুরআন কারীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশেষ গাছের নিচে আপনার হাতে 'বায়'আত' নিয়েছেন। হিজরতের পূর্বে মদিনার আনসারদের বায়'আতে 'আকাবা-'ও এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর কাছ থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়'আত নেওয়া হয়েছে। মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ে যে বায়'আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সৎকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ ও নবী-রাসূলদের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরিয়তের নির্দেশাবলি যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়'আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়'আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোনো বুজুর্গের হাতে হাত রেখে দেওয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয় তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়'আত হলো একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। না হলে এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে তাওরাতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে এ দুনিয়ার আসারও পূর্বে সৃষ্টি লগ্নে নেওয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عَهْد اَلَسْتُ [আহদে-আলাস্তু] বলে প্রসিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ .... عَلَى أَنْفُسِهِمْ : এ আয়াতগুলোতে আদম সন্তানদের বুঝাবার জন্য ذُرِّيَّتُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী (র.) বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذَرْءٌ [যারউন] থেকে গঠিত। যার অর্থ– সৃষ্টি করা। কুরআনে কারীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাত'-এর শাব্দিক তরজমা হলো সৃষ্টি। এ শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এ আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা– ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (র.) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারুক আ'যম (রা.) -এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হলো এই–

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোজখে যাবার মতোই কাজ করবে। সাহাবীদের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমেই যখন জান্নাতি ও দোজখি সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে? হুজুর ﷺ বললেন, "যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জান্নাতবাসীর কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ যখন কাউকে দোজখের জন্য তৈরি করেন, তখন সে দোজখের কাজেই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোনো কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।"

অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন্ শ্রেণিভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টিই হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা হযরত আদম (আ.)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মতো যত আদম সন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল!

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত'-এর আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেওয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কুরআনের শব্দে 'বনী-আদম' অর্থাৎ আদম সন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, হযরত আদম (আ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যদের। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদম সন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, হযরত আদম (আ.) থেকে তাঁর সন্তানদের, অতঃপর এ সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের অনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কুরআন মাজীদে সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদম-সন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সূক্ষ্মতার অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। কারণ প্রতিপালক, বিদ্যমানতা এবং

লালনপালনের প্রয়োজন বেশির ভাগ সেই ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কালো বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে, তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরী আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোনো রং বা বর্ণ নেই, শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মতো। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোনো সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকারে-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমণ্ডলীর ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি এ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদম সন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত এ প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেওয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোনো মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কেমন করে হলো, যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে এবং তাঁর প্রতিপালক হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ প্রতিপালকের কথা সেই স্বীকার করতে পারে, যে প্রতিপালক সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এ প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল– এ সম্পর্কে মুফাস্সিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (র.) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, এ প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয়, যখন হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হলো, 'ওয়াদিয়ে নু'মান' যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধ ও খ্যাতি লাভ করেছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এ নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোনো স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে! এর উত্তর হলো এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেওয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল! আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও কুদরতের এমন সব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কুরআনে রয়েছে– وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও [নিদর্শন রয়েছে], তবুও কি তোমরা দেখছ না?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি [আহদে আলাস্তু] যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্তত সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোরই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হলো?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদম সন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন যারা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এ প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (র.) বলেছেন, এ প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেমন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এ স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার

আশেপাশে কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হলো এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্টগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এ প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে আল্লাহ-পরিচিতির একটা বীজ রোপণ করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এ বীজেরই ফুল-ফসল এই যে, প্রত্যকটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে; তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্টি-পূজার কোনো ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনোভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহর ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোনো গোমরাহ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে– عَلٰى هٰذِهِ الْمِلَّةِ [বুখারী মুসলিম] অর্থাৎ প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতামাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে যা এ পৃথিবীতে নবী-রাসূল ﷺ -এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক, সেগুলো কিন্তু যে-কোনো অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আজান আর বাম কানে ইকামত ও তাকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং [আলহামদুলিল্লাহ] সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে; যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, এতে করে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে করে। এমনিভাবে যারা কুরআনের ভাষা জানে তাদের প্রতিও কুরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয়তো এই যে, এতে করে অন্তত এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সে জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোনো অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاۤؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ। অর্থাৎ এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন এমন কোনো ওজর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি, ভুল-শুদ্ধ কোনোটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই গ্রহণ করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদের দেওয়া হবে কেন? আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদের দেওয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয়ে বুঝতে পারা কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোনো মানুষ প্রভৃতির কোনো একটিও এমন নয়, যাকে কোনো মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি এভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ اٰتَيْنٰهُ الخ : উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত করা হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা আদি লগ্নে সমস্ত আদম-সন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদি-খ্রিস্টান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদিরা খাতিমুন্নাবিয়্যীন ﷺ -এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকারে-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনী ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার নিদর্শনমূলক ঘটনা : এ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা পড়ে শুনিয়ে দিন, যাতে বনী ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফ এবং প্রখ্যাত নেতার এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহির কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মা'রেফাত হাসিল করার পর, যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হলো।

কুরআন মাজীদে সে লোকের নাম বা কোনো পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিশারদ, সাহাবী ও তাবেঈনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হযরত ইবনে মারদুইয়াহ (র.) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল'আম ইবনে বা'উরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্‌আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহর কোনো কোনো কিতাবের ইলম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনে কারীমে اَلَّذِيْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে ইলমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরাউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর তখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলদের 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম হলো এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, হযরত মূসা (আ.) সমগ্র বনী ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন পক্ষান্তরে তাদের মোকাবিলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হলো। তারা সবাই মিলে বাল'আম ইবনে বা'উরার কাছে সমবেত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আ.) অতি কঠিন লোক, তদুপরি তাঁর সাথে সৈন্যও বিপুল- তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবিলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল'আম ইবনে বা'উরা ইস্‌মে আ'যম জানত এবং সেই ইসমের মাধ্যমে যে দোয়া করতো তাই কবুল হতো।

বাল'আম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ? তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি! আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জাব্বারীনরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল'আম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট জেনে সেই এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা। সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য ইস্তেখারা কিংবা অন্য কোনো আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেওয়া হলো, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে

বারণ করা হয়েছে। তখন 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় তাকে একটা বিরাট উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচবিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল, ফলে সে হযরত মূসা (আ.) এবং বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহর মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিস্ময় দেখা দেয়– হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চিৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বাল'আম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচারণে সমর্থ নয়। ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস অবতীর্ণ হলো। আর বাল'আমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদের একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদের সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভালো করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলদের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোনো রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয়তো বা এরা এ ব্যবস্থায় হারামকারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর আল্লাহর নিকট হারামকারী অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, অবশ্য তাতে গজব ও অভিসম্পাত নাজিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না। বাল'আমের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সেমতেই কাজ করা হলো। বনী ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত হতে বললেন। কিন্তু সে বিরত হলো না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনকি যে লোক অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল যাতে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হলো।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। اِنْسِلَاخٌ [ইনসেলাখুন] শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়েছে।

فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ [শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।] অর্থাৎ যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহর স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ [অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত।] অর্থাৎ শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اِخْلَادٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ হলো কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোনো স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর اَرْض-এর প্রকৃত অর্থ হলো– ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বস্তু-সামগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েশ নির্ভরশীল। সুতরাং "اَرْض" [আরদ] শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বুঝানো হয়েছে। আয়াতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এ জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

لهث - এ বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে- فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেওয়া। প্রতিটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভিতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভিতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ তা'আলাও প্রতিটি জীবের জন্য এ কাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোনো ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভিতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভিতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোনো শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীবজন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহবা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয় যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়।

কুরআনে কারীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল! তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর না-ই করুক, সে যে কোনো অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ এই হলো সে সমস্ত জাতির উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এর মর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এরাই হলো সেই সমস্ত মক্কাবাসী, যারা কোনো একজন পথপ্রদর্শকের আগমন কামনা করত, যিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং আনুগত্যের সঠিক পন্থা বাতলে দেবেন। কিন্তু যখন সেই পথপ্রদর্শক আগমন করলেন এবং এমন সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এলেন যাতে তাঁর সত্যতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না, তখন তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অমান্য করতে থাকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এতে উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাঈল, যারা মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁর নিদর্শন ও লক্ষণাদি এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাওরাতে পাঠ করে মানুষকে বলত এবং তারা নিজেরাও তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তাঁর আগমনের পর তারাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা ও শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাওরাতের বিধিবিধান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাল'আম ইবনে বা'উরা।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আপনি সে সমস্ত লোকদের কাহিনী তাদেরকে শুনিয়ে দিন। হয়তো তাতে তারা কিছুটা চিন্তা করবে এবং এ ঘটনার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের অবস্থা একান্তই নিকৃষ্ট। আর এসব লোক নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করছে অন্য কারোই কিছু অনিষ্ট করছে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তাতে বিবৃত ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

প্রথমত কারো পক্ষে নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে বিলম্ব হয় না। যেমন হয়েছিল বাল'আম ইবনে বা'উরার পরিণতি। ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বা'উরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থত অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হলো নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যাথায় আল্লাহ তা'আলার আজাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমত আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করলে মানুষ আজাবে পতিত হয় এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমতো সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا : 'আসমায়ে-হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ : উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলা বাহুল্য, কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর, যার ঊর্ধ্বে আর কোনো স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ -এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহর সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর 'দোয়া' শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো আল্লাহর জিকির, প্রশংসা ও তাসবীহ-তাহলীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হলো নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হলো এই যে, হামদ, ছানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তাসবীহ-তাহলীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে। আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা আল্লাহর নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা : এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্তাই প্রকৃত হামদ-ছানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোনো শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আমাদের যেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদের বাধ্য করে দিয়েছেন, যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র.) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর নিরানব্বই নাম পাঠ করে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন- اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধ কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোনো পন্থা এমন নেই, যাতে কোনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হলো এই যে, দোয়া যে একটি ইবাদত তার ছওয়াব দোয়াকারীর আমল-নামায় তখনই লেখা হয়ে যায়।

অনুবাদ :

١٨٢. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَاْخُذُهُمْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ .

১৮২. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা আমার নিদর্শন আল-কুরআন কে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে অবকাশ দিয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব ক্রমে ক্রমে পাকড়াও করব যে তারা জানতেও পারবে না।

١٨٣. وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اَمْهِلْهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ شَدِيْدٌ لَا يُطَاقُ .

১৮৩. আমি তাদেরকে সময় দেই, ঢিল দেই। আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, মজবুত, তা বিনষ্ট করার শক্তি কারো নাই।

١٨٤. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فَيَعْلَمُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِّنْ جِنَّةٍ ط جُنُوْنٍ اِنْ مَا هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ .

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না? তাহলে জানতে পারত তাদের সাথি মুহাম্মদ ﷺ -এর মধ্যে উন্মাদ হওয়ার কিছু নেই। তিনি উন্মাদ নন। তিনি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। যার সতর্কীকরণ অতি স্পষ্ট। اِنْ এটা এ স্থানে مَا বা না-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٨٥. اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ مُلْكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ فِيْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ بَيَانٌ لِمَا فَيَسْتَدِلُّوْا بِهِ عَلٰى قُدْرَةِ صَانِعِهِ وَ وَحْدَانِيَّتِهِ وَ فِيْ اَنْ اَيْ اَنَّهُ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ قَرُبَ اَجَلُهُمْ ط فَيَمُوْتُوْا كُفَّارًا فَيَصِيْرُوْا اِلَى النَّارِ فَيُبَادِرُوْا اِلَى الْاِيْمَانِ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ اَيِ الْقُرْاٰنِ يُؤْمِنُوْنَ .

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি সুবিশাল রাজ্যের প্রতি এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি। مِنْ شَيْءٍ এটা مَا خَلَقَ -এ উক্ত مَا -এর بَيَانٌ অর্থাৎ বিবরণ। যদি লক্ষ্য করত তবে তার মাধ্যমে এ সকলের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর একত্বের প্রমাণ পেত। আর হয়তো তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী আর কাফের হিসাবে ইহলীলা সংবরণ করে তারা জাহান্নামের দিকে যাবে সুতরাং ঈমান আনয়নের প্রতি যেন এরা এগিয়ে আসে এটার পর অর্থাৎ আল-কুরআনের পর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে! اَنْ এটা এ স্থানে مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ তাশদীদসহ রূঢ় রূপ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য এটার তাফসীরে اَنَّهٗ উল্লেখ করা হয়েছে। اِقْتَرَبَ অর্থ قَرُبَ সন্নিকট।

١٨٦. مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَيَذَرُهُمْ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مَعَ الرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا وَالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا .

১৮৬. আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোনো পথ প্রদর্শক নেই। আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় অস্থির অবস্থায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন। يَذَرُ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ن অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচনরূপে বহুবচন পঠিত রয়েছে। এটার শেষ অক্ষর ر -এ رَفْع হলে এটা مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নবগঠিত বাক্য ও جَزْم হলে ف -এর পরবর্তী مَحَلّ -এ عَطْف হয়েছে বলে গণ্য হবে।

١٨٧. يَسْئَلُوْنَكَ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ الْقِيَامَةِ اَيَّانَ مَتٰى مُرْسٰهَا ط قُلْ لَهُمْ اِنَّمَا عِلْمُهَا مَتٰى تَكُوْنُ عِنْدَ رَبِّىْ ج لَا يُجَلِّيْهَا يُظْهِرُهَا لِوَقْتِهَا اَللَّامُ بِمَعْنٰى فِىْ اِلَّا هُوَ ، ثَقُلَتْ عَظُمَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط عَلٰى اَهْلِهَا لِهَوْلِهَا لَاتَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط فُجَاَةً يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ مُبَالِغٌ فِى السُّؤَالِ عَنْهَا ط حَتّٰى عَلِمْتَهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَاكِيْدٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ اَنَّ عِلْمَهَا عِنْدَهُ تَعَالٰى .

১৮৭. তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন ঘটবে?' اَلسَّاعَةُ এ স্থানে অর্থ কিয়ামত। اَيَّانَ অর্থ, কখন। এদেরকে বলে দাও এ বিষয়ের অর্থাৎ তা কবে ঘটবে সেই জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। তিনি ব্যতীত তার সময় আর কেউ স্পষ্ট করবে না, প্রকাশ করতে পারবে না। لِوَقْتِهَا এটার لَامْ টি এ স্থানে فِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অর্থাৎ তার অধিবাসীদের জন্য এর ভয়ঙ্করতার কারণে এটা ভীষণ বোঝা সাংঘাতিক এক বিষয়! আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। তুমি এ বিষয়ে অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল এ বিষয়ে জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটই আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়। যে এটার জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। بَغْتَةً -অর্থ , অকস্মাৎ। حَفِىٌّ অর্থ- যে বারবার খুব প্রশ্ন করে জেনে নেয়। قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا এটা এ স্থানে تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

١٨٨. قُلْ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا اَجْلِبُهُ وَّلَا ضَرًّا اَدْفَعُهُ اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِّىْ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْۤءُ ج مِنْ فَقْرٍ وَغَيْرِهِ لِاِحْتِرَازِىْ عَنْهُ بِاجْتِنَابِ الْمَضَارِ اِنْ مَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ بِالنَّارِ لِلْكٰفِرِيْنَ وَبَشِيْرٌ بِالْجَنَّةِ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

১৮৮. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কল্যাণ করা এবং অকল্যাণ প্রতিহত করারও আমি মালিক নই। আমি যদি গায়েবের অর্থাৎ যা আমা হতে অদৃশ্য তার খবর জানতাম তবে তো আমি বেশি করে কল্যাণই লাভ করে নিতাম এবং এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই আমার ক্ষতি হতে বেঁচে থাকার দরুন কোনো অকল্যাণ দারিদ্র্য ইত্যাদি আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের বেলায় জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদবাহী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَاْخُذُ : এখানে نَسْتَدْرِجُ -এর তাফসীর نَاْخُذُ দ্বারা করে مَعْنٰى مُرَادِىْ -এর দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। اِسْتِدْرَاجٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো ধাপে ধাপে আরোহণ করা। (اَلْاِسْتِصْعَادُ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ) যেহেতু কাফেরদের জন্য কোনো اِصْعَادٌ বা উচ্চ মর্যাদায় আরোহণ নেই, তাই তার مُرَادِىْ অর্থ উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করা।

قَوْلُهُ اَمْهِلُهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ مُرَادِىْ অর্থকে বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। কেননা اُمْلِىْ-এর অর্থ اِمْلَا করানো যা এখানে উদ্দেশ্যে নয়।

قَوْلُهُ فَيَعْلَمُوْنَ : প্রশ্ন. فَيَعْلَمُوْنَ উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. فَيَعْلَمُوْنَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا بِصَاحِبِهِمْ টা উহ্য يَعْلَمُوْنَ-এর মাফউল হয়েছে; يَتَفَكَّرُوْا -এর নয়। কেননা يَتَفَكَّرُوْنَ হলো লাযেম। এর মাফউলের প্রয়োজন হয় না। অথচ মাফউল বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই আপত্তি নিঃশেষ হয়ে গেল যে يَتَفَكَّرُوْا টা مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّيْ নয়।

قَوْلُهُ جُنُوْنٍ : جِنَّةٍ -এর তাফসীর جُنُوْنٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, جِنَّةٍ দ্বারা জিন সম্প্রদায় উদ্দেশ্য নয়: কেননা এটা কাফেরদের জবাবে পতিত হয়েছে। কাফেররা বলত– إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَمَجْنُوْنٌ যদি جِنَّةٍ দ্বারা জিন জাতি উদ্দেশ্য নেওয়া হতো; তবে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য থাকবে না।

قَوْلُهُ وَفِيْ : এটা উহ্য মানার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, مَا خَلَقَ اللّٰهُ -এর আতফ مَلَكُوْت-এর উপর হয়েছে, নিকটবর্তী (اَلْاَرْض) -এর উপর নয়। কেননা এ সুরতে অর্থ ঠিক থাকবে না।

قَوْلُهُ اَيْ اَنَّهُ : এটা উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে اَنْ টা হলো مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ তবে এটা مَصْدَرِيَّة নয়, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করেছেন। কেননা اَنْ مَصْدَرِيَّة টা اَفْعَال غَيْر مُتَصَرِّفَه -এর মধ্যে প্রবেশ করে না। যেহেতু তাদের মাসদার হয় না।

قَوْلُهُ فَيَتَبَادَرُوْا : এটা اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا -এর জবাব হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে

قَوْلُهُ مَعَ الرَّفْعِ اِسْتِيْنَافًا : অর্থাৎ وَهُوَ نَذَرُهُمْ

قَوْلُهُ وَبِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ : এটা نَذَرُهُمْ-এর মধ্যে অন্য আরেকটি তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছে। نَذَرُ -এর মধ্যে দুটি اِعْرَابٌ হতে পারে– جُمْلَه مُسْتَانِفَه হওয়ার কারণে رَفْع হবে جَوَاب شَرْط হওয়ার কারণে جَزْم হবে। لَا هَادِيَ لَهُ এটা جَوَاب شَرْط হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে।

প্রশ্ন. مَحَلّ -এর উপর عَطْف করেছে শব্দের উপর করেনি, এর কারণ কি?

উত্তর. কেননা এ সুরতে ফে'ল এর اِسْم -এর উপর আতফ করা আবশ্যক হয় যা مُسْتَحْسَنْ নয়। উহ্য ইবারত হলো– مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ لَا يَهْدِيْهِ اَحَدٌ وَنَذَرُهُمْ

قَوْلُهُ مُرْسٰهَا : اِرْسَاءٌ হতে মাসদার হতে পারে। অর্থ– اِسْتَقَرَّ এবং اِثْبَاتٌ মুজাররাদ হতে رَسَا অর্থ ثَبَتَ আর رَسَتِ السَّفِيْنَةُ অর্থ হলো وَقَفَتْ عَنِ الْجَرْيِ

قَوْلُهُ حَفِيٌّ : প্রশ্নের মধ্যে মুবালাগা বা অতিরঞ্জনকারী অর্থাৎ মাসআলার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছার চেষ্টাকারী। যে এরূপ করে সে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। আর এর থেকেই اِحْفَاءُ الشَّارِبِ তথা গোঁফ খুবই ছোট করে কর্তন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, যারা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আদর্শের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নীতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতীব ভয়ানক, কেননা তাদেরকে তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না; বরং তাদেরকে আল্লাহ পাক অবকাশ দেন, প্রথমেই কোনো আজাব দেওয়া হয় না; বরং সুখ-সামগ্রীর দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাদের দুর্নীতি এবং দৌরাত্ম্যের শাস্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল এবং নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে– এভাবে তারা অধিকতর অন্যায় আচরণের লিপ্ত হয়, তাদের অন্যায়ের ঘটা পূর্ণ হয়ে যায় তারা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক অবস্থায় জুলুম অত্যাচারে গা ভাসিয়ে দেয় এরপর একদিন অতর্কিতভাবে তাদের উপর আজাব আসে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করেছে, যেমন আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে ধীরে ধীরে শাস্তি দেওয়া হবে। –[তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃ. ১৪২]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে, কেননা তারাই আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব, এভাবে যে, তারা বুঝতেও পারবে না, যে তারা পায়ে পায়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হযরত আতা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি তাদের শাস্তির ব্যাপারে এমন গোপন ও সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করব যে, তাদের কোনো কিছুর খবরই হবে না। কালবী (র.) বলেছেন, ধীরে ধীরে শাস্তি দেওয়ার তাৎপর্য হলো এই যে, তাদের অন্যায় অনাচার তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয় এবং মোহনীয় হবে এরপর তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো কাফেররা যত নতুন নতুন পাপকাজে লিপ্ত হবে আমি তাদেরকে তত নতুন নতুন নিয়ামত দিতে থাকব। যখন তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হবে তখন তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, আমি তাদেরকে দুনিয়ার নিয়ামত এবং সম্পদে সমৃদ্ধ করব এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলিয়ে দেব। এরপর কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে। –[তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫]

قَوْلُهُ وَأُمْلِي لَهُمْ : অর্থাৎ আমি তাদের বয়স বাড়িয়ে দেব এবং তাদের অন্যায় কাজগুলো তাদের নিকট পছন্দনীয় করে দেব এবং তাদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তারা পাপাচারে লিপ্ত থাকবে। অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে

قَوْلُهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ : অর্থাৎ আমার ধরা বড় শক্ত ধরা। অথবা এর অর্থ হলো, আমার কৌশল হলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, তাদের বিরুদ্ধে আমার গোপন তদবির অত্যন্ত শক্ত এবং কঠিন। বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেই সব দুরাত্মাদের সম্পর্কে যারা আল্লাহ পাকের শানে বেআদবি করত এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করত এবং মু'মিনদের প্রতিও ঠাট্টা করত, অবশেষে আল্লাহ পাক এক রাত্রেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫]

قَوْلُهُ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল তথা আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং নাফরমান লোকদের অবস্থা ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে আর তা হলো এই যে, এ কাফেররা সত্য সম্পর্কে চিন্তা করে না, তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারেও তথা আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও তারা এতটুকু চিন্তিত হয় না। এজন্যে তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালতকে অস্বীকার করে এমনকি আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদেও বিশ্বাস করে না। যদি তারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এবং তাঁর মু'জিযা সম্পর্কে চিন্তা করত তবে তাঁর রেসালত সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ থাকত না। এমনভিাবে, যদি পরিবর্তনের ব্যাপারে চিন্তা করত তবে তারা আল্লাহ পাকে একত্ববাদকে অস্বীকার করতে পারত না। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো এসব বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা। আর এ বিষয়ে চিন্তা করাও তাদের কর্তব্য– যে কোনো সময়ই মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান তাদের উপর কার্যকর হতে পারে এবং তাদের জীবনের অবসান ঘটতে পারে। অতএব, মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাও তাদের কর্তব্য।

এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার একথাও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সত্য-বিমুখ কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারা প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে তথা দীন ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। এ দুরাত্মারা প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ করত যে, যিনি নবুয়তের দাবিদার তিনি পাগল নন তো? [নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক] এতদ্ব্যতীত, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভিত্তিহীন সন্দেহের জবাব দিয়েছেন।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ১৭০; তাফসীরে কাবীর, খ. ১৫, পৃ. ৭৫]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ হযরত কাতাদা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা মুয়াযযামার সাফা নামক পাহাড়ে আরোহণ করে কুরায়েশের প্রত্যেক খানদানের লোকদের নাম ধরে ডাক দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষার আহ্বান জানান। আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আখেরাতের আজাব থেকে নাজাত লাভের তাগিদ দেন। কিন্তু দুরাত্মা পৌত্তলিকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়নি; বরং তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত অশালীন এবং বেআদবিপূর্ণ মন্তব্য করে বলে, তোমাদের সাথি কি উন্মাদ হয়ে গেছে যে রাতভর চিৎকার দিচ্ছে? [নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক] তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফফার ও মুনকেরীনদের হঠকারিতা এবং আল্লাহ তা'আলার মহা কুদরতের প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান না আনার আলোচনা ছিল। আর বর্তমান বিষয়টি রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য উম্মত এবং সাধারণ সৃষ্টির সাথে তাঁর অসাধারণ প্রীতি ও দয়ার কারণে তাঁর চরম মনোবেদনা ও দুঃখের কারণ হতে পারত বলে আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে– যাদেরকে আল্লাহ নিজে পথভ্রষ্ট করে দেবেন, তাদেরকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের লোকদের পথভ্রষ্টতায় উদ্ভ্রান্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দেন।

সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হলো একান্ত ভাগ্য সংক্রান্ত। এতে তাঁর কোনো হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন।

এ সূরায় বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১. তওহীদ, ২. রিসালত ও ৩. আখেরাত। আর এ তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাজিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর (র.) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) হযরত কাতাদাহ (র.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশরা হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করলে যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন– এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কিয়ামত কোন সনের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্কে বিদ্যমান তার দাবিও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদের বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্তত আমাদের বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাজিল হয় يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লিখিত سَاعَةٌ শব্দটি আরবি ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোনো বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় سَاعَةٌ [সাআত] যাকে বাংলায় ঘণ্টা নামে অভিহিত করা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সেই দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যু দিবস এবং সে দিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أَيَّانَ [আইয়ানা] অর্থ কবে। আর مُرْسٰى [মুরসা] অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

قَوْلُهُ لَا يُجَلِّيْهَا : শব্দটি تَجْلِيَة থেকে গঠিত। এর অর্থ– প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً [বাগতাতান] অর্থ অকস্মাৎ। حَفِيٌّ [হাফিয়্যুন] অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকেরই আছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পরবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোনো মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও জমিনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরা টুকরা হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাগাদা। তা না হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে– لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে [সওদার] এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউস মেরামত করতে থাকবে তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয়তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেওয়ার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কিয়ামতও, যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হিকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে যে, কোনো একদিন কিয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহর সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভালো-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেওয়া হবে, যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোনো বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবি হলো বয়সের অবকাশকে গনিমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরি হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে- يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদের তার যথাথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি প্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আজাবের ভয় করে নেক-আমল অবলম্বন করার এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এ দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তাদের কথা বোঝা যে, মহানবী ﷺ অবশ্যই কিয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে এ বিষয় অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ কারণে সে কথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদের কিয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আপনি লোকদের বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূলদেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন, যা কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশত মনে করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রাসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী ﷺ -এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইলম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ [নাউযুবিল্লাহ]। কিন্তু উপরোল্লিখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হলো এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্হিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হ্যাঁ, মহানবী ﷺ -কে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী ﷺ বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- "আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দুটি আঙ্গুল।" -[তিরমিযী]

কোনো কোনো ইসলামি কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুজুরে আকরাম ﷺ-এর কোনো হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেওয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতরা আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা কোনো বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোনো বিরোধ ঘটে না। ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হয়তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে, "পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন, যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।" এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুজুর ﷺ -এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেজ ইবনে হাযম উন্দুলূসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা করা যায় না। তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে। -[মুরাগী]

١٨٩. هُوَ اَيِ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ اَيْ اٰدَمَ وَّجَعَلَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج وَيَأْلِفُهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا جَامَعَهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا هُوَ النُّطْفَةُ فَمَرَّتْ بِهٖ ج ذَهَبَتْ وَجَاءَتْ لِخِفَّتِهٖ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ بِكِبَرِ الْوَلَدِ فِىْ بَطْنِهَا وَاَشْفَقَا اَنْ يَّكُوْنَ بَهِيْمَةً دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا وَلَدًا صَالِحًا سَوِيًّا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ لَكَ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ হয় তাদের সম্পর্ক। অতঃপর যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গত হয় তখন সে [স্ত্রী] হালকা গর্ভ অর্থাৎ শুক্রকীট ধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে কাল অতিবাহিত করে হালকা হওয়ায় তা নিয়ে চলাফেরা করে। পেটে শিশুটির বৃদ্ধির দরুন গর্ভ যখন গুরুভার হয় এবং উভয়ের আশঙ্কা হয় যে গর্ভটি পঙ্গু হয়ে পড়ে নাকি তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। যদি তুমি আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত সন্তান দাও তবে আমরা এ কারণে তোমার কৃতজ্ঞ থাকব। جَعَلَ অর্থ এ স্থানে خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন।

١٩٠. فَلَمَّا اٰتٰهُمَا وَلَدًا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الشِّيْنِ وَالتَّنْوِيْنِ اَيْ شَرِيْكًا فِيْمَا اٰتٰهُمَا ج بِتَسْمِيَتِهٖ عَبْدَ الْحَارِثِ وَلَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا اِلَّا لِلّٰهِ وَلَيْسَ بِاِشْرَاكٍ فِى الْعُبُوْدِيَّةِ لِعِصْمَةِ اٰدَمَ وَرَوٰى سَمُرَةُ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اِبْلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَاِنَّهٗ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ فَعَاشَ فَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَاَمْرِهٖ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ بِهٖ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْجُمْلَةُ مُسَبَّبَةٌ عَطْفٌ عَلٰى خَلَقَكُمْ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ.

১৯০. তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাদেরকে যা দেওয়া হলো সে সম্বন্ধে তারা আব্দুল হারিছ [হারিছ শয়তানের অন্যতম নাম। সুতরাং এটার অর্থ দাঁড়ায় শয়তানের দাস] নামকরণ করে আল্লাহর শরিক করে। شُرَكَاءَ এটা অপর এক কেরাতে ش-এ কাসরা ও শেষে তানবীনসহ পঠিত রয়েছে। কারণ, কেউ আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও দাস হতে পারে না; তবে এটা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শরিক করার মতো ছিল না কেননা হযরত আদম ছিলেন মাসুম বা এ ধরনের কাজ হতে মুক্ত ও নিষ্পাপ। হযরত সামুরা বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান বাঁচত না। তখন একবার শয়তান [সাধুবেশে] তার নিকট এসে বলল, এবার সন্তান হলে তার নাম আব্দুল হারিছ [অর্থ শয়তানের দাস] রেখ, তাহলে সে বাঁচবে। যাহোক অতঃপর হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান হলে তিনি তাই করেন। এতে সন্তানটি বেঁচে থাকে। এ কাজটি শয়তানের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে হয়েছিল। হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করে তা সহীহ বলে মত দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান গরীব [মন্দ নয় তবে অপ্রসিদ্ধ] বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মক্কাবাসীগণ আল্লাহর সাথে যা যে সমস্ত প্রতিমা শরিক করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। فَتَعٰلَى اللّٰهُ। এই مُسَبَّبَةٌ অর্থাৎ হেতুবোধক বাক্যটির উপরোল্লিখিত خَلَقَكُمْ-এর সাথে عَطْف হয়েছে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যসমূহ হলো جُمْلَه مُعْتَرِضَه অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বাক্য।

١٩١. أَيُشْرِكُوْنَ بِهٖ فِى الْعِبَادَةِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ـ

১৯১. তারা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট? أَيُشْرِكُوْنَ এ স্থানে تَوْبِيْخ অর্থাৎ ভর্ৎসনা অর্থে প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

١٩٢. وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ اَىْ لِعَابِدِيْهِمْ نَصْرًا وَّلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ بِمَنْعِهَا مِمَّنْ اَرَادَ بِهِمْ سُوْءً مِنْ كَسْرٍ اَوْ غَيْرِهٖ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيْخِ ـ

১৯২. আর তারা তাদেরকে অর্থাৎ নিজেদের উপাসকদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং কেউ যদি ভেঙ্গে বা অন্য কিছু করে এদের সাথে খারাপ কিছু করার ইচ্ছা করে তবে তা প্রতিহত করে নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

١٩٣. وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اَىِ الْاَصْنَامَ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ط بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اِلَيْهِ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ عَنْ دُعَائِهِمْ لَا يَتَّبِعُوْهُ لِعَدَمِ سِمَاعِهِمْ ـ

১৯৩. তোমরা তাদেরকে অর্থাৎ এ প্রতিমাসমূহকে হেদায়েতের আহ্বান করলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না। তাদেরকে لَا يَتَّبِعُوْكُمْ এটা তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। এটার প্রতি ডাক বা তাদেরকে ডাকা হতে চুপ থাকে তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তারা ঐ আহ্বানের অনুসরণ করবে না। কারণ এরা আসলেই শুনতে পায় না।

١٩٤. اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ مَمْلُوْكَةٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ دُعَاءَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ اَنَّهَا اٰلِهَةٌ ـ

১৯৪. আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর উপাসনা কর তারা তো তোমাদের ন্যায়ই মালিকানাভুক্ত দাস। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক এরা উপাস্য তবে তাদেরকে ডাক তো দেখি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।

١٩٥. ثُمَّ بَيَّنَ غَايَةَ عَجْزِهِمْ وَفَضْلَ عَابِدِيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا ز اَمْ بَلْ لَهُمْ اَيْدٍ جَمْعُ يَدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ بَلْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا ز اَمْ بَلْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَىْ لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا هُوَ لَكُمْ فَكَيْفَ تَعْبُدُوْنَهُمْ وَاَنْتُمْ اَتَمُّ حَالًا مِنْهُمْ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اُدْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ اِلٰى هَلَاكِىْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ تُمْهِلُوْنِ فَاِنِّىْ لَا اُبَالِىْ بِكُمْ ـ

১৯৫. অতঃপর আল্লাহ ত'আলা এদের চরম অসহায়তা এবং উপাসকরাই যে, এদের উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী সে কথার বিবরণ দিচ্ছেন। ইরশাদ করেন; তাদের কি চলাফেরা করার পা আছে? তাদের কি ধরবার হাত আছে? তাদের কি দেখবার চক্ষু আছে? কিংবা তাদের কি শ্রবণ করার কর্ণ আছে? اَمْ -এ আয়াতের সবগুলো اَمْ এ স্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَيْدٍ এটা يَدٌ [হস্ত]-এর বহুবচন; اَلَهُمْ এ আয়াতে اِنْكَار বা অস্বীকৃতি অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের যা আছে তাদের তো এগুলোর একটিও নেই। এতদসত্ত্বেও কেমন করে তোমরা এদের উপাসনা কর। অথচ তোমাদের অবস্থা তো এদের চেয়েও ভালো। হে মুহাম্মদ এদের বলে দাও। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক করেছ। আমাকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আর আমাকে অবকাশ দিও না ফুরসত দিও না। আমি তোমাদের কাউকে পরোয়া করি না

١٩٦. اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ يَتَوَلّٰى اُمُوْرِى الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ بِحِفْظِهٖ .

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ অর্থাৎ তিনিই আমার অভিভাবকত্ব করেন যিনি কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন [অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই] তাঁর সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে [সৎকর্ম পরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।]

١٩٧. وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ فَكَيْفَ اُبَالِىْ بِهِمْ .

১৯৭. আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। এরপরও কেমন করে এদের পরোয়া করব।

١٩٨. وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اَىِ الْاَصْنَامَ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰهُمْ اَىِ الْاَصْنَامَ يَا مُحَمَّدُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ اَىْ يُقَابِلُوْنَكَ كَالنَّاظِرِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ .

১৯৮. যদি তাদেরকে অর্থাৎ প্রতিমাসমূহকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান কর তবে তারা শ্রবণ করবে না এবং হে মুহাম্মদ! তুমি দেখতে পাইবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তোমার সামনে এভাবে পড়বে যে তোমার মনে হবে চেয়ে আছে, কিন্তু মূলত তারা দেখে না।

١٩٩. خُذِ الْعَفْوَ اَىِ الْيُسْرَ مِنْ اَخْلَاقِ النَّاسِ وَلَا تَبْحَثْ عَنْهَا وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ الْمَعْرُوْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ فَلَا تُقَابِلْهُمْ بِسَفَهِهِمْ .

১৯৯. তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর অর্থাৎ মানব চরিত্রের সহজ সরল দিক অবলম্বন কর। তাদেরকে কঠিন অবস্থায় ফেলার কোনো পথ তালাশ করো না। ভালো কাজের সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। এদের মূর্খতার মোকাবিলা করতে যাবে না।

٢٠٠. وَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ اَىْ اِنْ يَّصْرِفْكَ عَمَّا اُمِرْتَ بِهٖ صَارِفٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَجَوَابُ الْاَمْرِ مَحْذُوْفٌ اَىْ يَدْفَعُهُ عَنْكَ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ لِلْقَوْلِ عَلِيْمٌ بِالْفِعْلِ .

২০০. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে নির্দেশিত পথ হতে যদি বিচ্যুত করার প্রয়াস পায় তবে আল্লাহর পানাহ নিয়ে তিনি সকল উক্তির শ্রোতা ও সকল কাজ সম্পর্কে অবহিত إِمَّا এতে শর্তবাচক শব্দ إِنْ -এর অতিরিক্ত مَا -এর مِيْم -এ إِدْغَام অর্থাৎ সন্ধি সাধিত হয়েছে فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ এটা উপরিউক্ত শর্তের জওয়াব। এ স্থলে أَمْر বা নির্দেশাত্মক বাক্যটির জওয়াব مَحْذُوْف বা উহ্য। এর মর্ম হলো, তখন তাকে তোমা হতে প্রতিহত করবে।

٢٠١. اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ اَصَابَهُمْ طَيْفٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ طٰۤئِفٌ اَىْ شَىْءٌ اَلَمَّ بِهِمْ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا عِقَابَ اللّٰهِ وَثَوَابَهٗ فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِهٖ فَيَرْجِعُوْنَ .

২০১. যারা তাকওয়ার অধিকারী তাদেরকে যখন শয়তান কোনো প্ররোচনা দানের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করে অর্থাৎ কোনো কিছু পৌঁছায় তখন তাদের আল্লাহর আজাব ও ছওয়াবের কথা স্মরণ হয় এবং সত্যকে অসত্য হতে পৃথক দেখতে পায়। ফলে তারা ফিরে আসে। طَيْفٌ এটা অপর এক কেরাতে طَائِفٌ রূপেও পঠিত রয়েছে।

٢٠٢. وَإِخْوَانُهُمْ اَىْ إِخْوَانُ الشَّيَاطِيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ يَمُدُّوْنَهُمُ الشَّيٰطِيْنَ فِى الْغَىِّ ثُمَّ هُمْ لَا يُقْصِرُوْنَ يَكُفُّوْنَ عَنْهُ بِالتَّبَصُّرِ كَمَا يَتَبَصَّرُ الْمُتَّقُوْنَ.

২০২. এবং তাদের ভ্রাতাগণ, অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রাতা ও সঙ্গী-সাথী শয়তানের রয়েছে তাদেরকে শয়তানরা ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয়। অতঃপর এতে তারা কোনোরূপ ত্রুটি করে না। অর্থাৎ তাকওয়ার অধিকারীগণ যেমন সত্য-দর্শন করত ফিরে যায় তারা তেমন সত্য-দর্শনের মাধ্যমে ফিরতে পারে না।

٢٠٣. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ بِاٰيَةٍ مِمَّا اقْتَرَحُوْهُ قَالُوْا لَوْلَا هَلَّا اجْتَبَيْتَهَا ط اَنْشَأْتَهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ قُلْ لَّهُمْ إِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى إِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج لَيْسَ لِىْ اَنْ اٰتِىَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِىْ بِشَيْءٍ هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَصَائِرُ حُجَجٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

২০৩. তুমি যখন তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট তাদের দাবি ও অভিপ্রায় অনুসারে নিদর্শন উপস্থিত কর না তখন তারা বলে, তুমি নিজেই একটা বেছে নাও না কেন। তুমি নিজে একটা বানিয়ে নাও না কেন? এদের বলে দাও, আমার প্রতিপালকের তরফ হতে আমার প্রতি যে ওহী হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। আমার নিজের পক্ষ হতে কিছু আনয়নের অধিকার আমার নেই। এটা অর্থাৎ আল-কুরআন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন, প্রমাণ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও রহমত। لَوْلَا এটা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٠٤. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا عَنِ الْكَلَامِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ نَزَلَتْ فِىْ تَرْكِ الْكَلَامِ فِى الْخُطْبَةِ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْقُرْاٰنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ وَقِيْلَ فِىْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ مُطْلَقًا.

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে এটা শ্রবণ করবে এবং বাক্যালাপ হতে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। খুতবার সময় কথাবার্তা বর্জন করার বিষয়ে এ আয়াতটি নাজিল হয়। খুতবাতে যেহেতু কুরআনও অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু এ আয়াতে এটাকে কুরআন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায় এ বিধান প্রযোজ্য।

٢٠٥. وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ اَىْ سِرًّا تَضَرُّعًا تَذَلُّلًا وَّخِيْفَةً خَوْفًا مِنْهُ وَ فَوْقَ السِّرِّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اَىْ قَصْدًا بَيْنَهُمَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ اَوَائِلِ النَّهَارِ وَاَوَاخِرِهِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

২০৫ তোমার প্রতিপালককে তোমার মনে গোপনে সকাতর সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে চুপিসার হতে একটু উচ্চে একেবারে সশব্দে না করে অর্থাৎ এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিনের শুরুতে ও শেষ ভাগে স্মরণ করবে। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের জিকর হতে উদাসীন হয়ো না।

٢٠٦. إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ اَىِ الْمَلٰئِكَةَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ يُنَزِّهُوْنَهُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهِ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ اَىْ يَخُصُّوْنَهُ بِالْخُضُوْعِ وَالْعِبَادَةِ فَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ .

২০৬. যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাঁর ইবাদতে অহংকার প্রদর্শন করে না। لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ অহংকার করে না। যা তাঁর উপর আরোপ করার অযোগ্য তা হতে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। পবিত্রতা ঘোষণা করে। এবং তাঁরই নিকট সিজদা নত হয়। ইবাদত ও আনত হওয়া কেবল তাঁর জন্যই বিশেষ করে রেখেছে। সুতরাং তোমরাও তাদের মতো হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَجَعَلَ مِنْهَا : এখানে مَجْرُوْرٌ-এর যমীর نَفْسٌ-এর দিকে ফিরেছে শব্দের হিসেবে। আর لِيَكُنَ-এর যমীরও نَفْسٌ-এর দিকে ফিরেছে অর্থের হিসেবে। আর نَفْسٌ দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الشِّيْنِ وَالتَّنْوِيْنِ اَىْ شِرْكًا بِمَعْنٰى شَرِيْكًا : এটা شُرَكَاءُ-এর অপর একটি কেরাতে বর্ণনা। شُرَكَاءُ এটা شَرِيْكٌ-এর বহুবচন তবে এর দ্বারা مُفْرَدٌ-ই উদ্দেশ্য। তার قَرِيْنَةٌ হলো অপর একটি কেরাত। আর তা হলো شِرْكًا[شِيْن যেরযুক্ত এবং رَاءٌ সাকিন আর كَافٌ-টি তানভীন সহকারে।]

قَوْلُهُ اَىْ شَرِيْكًا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شِرْكًا মাসদারটি شَرِيْكًا ইসমে ফায়েল অর্থে হয়েছে, যাতে করে حَمْلٌ বৈধ হয়।

قَوْلُهُ جَعَلَا لَهُ : جَعَلَا-এর মধ্যে দ্বিবচনের যমীর কোন দিকে ফিরেছে? কতিপয় মুফাসসিরের মতে এটা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। তবে গবেষক আলেমগণের মতে এর যমীর প্রত্যেক আদম সন্তান ও তার স্ত্রীর দিকে ফিরেছে। কতিপয় তাবেয়ী থেকেও এটা বর্ণিত রয়েছে–

قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ اَلضَّمِيْرُ فِىْ جَعَلَا عَائِدٌ اِلَى النَّفْسِ وَزَوْجِهٖ مِنْ وَلَدِ اٰدَمَ لَا اِلٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (جَصَّاص)

ইমাম রাযী (র.) কাফাল -এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন جَعَلَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ شُرَكَاءَ (كَبِيْرٌ عَنِ الْقَفَالِ) এ ঘটনা উপমার ভিত্তিতে মুশরিকদের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করছে এবং এ তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন।

هٰذَا جَوَابٌ فِىْ غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالسَّدَادِ (كَبِيْرٌ) গবেষকগণ এটাও বলেছেন যে, আয়াতের যমীরকে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) -এর দিকে ফিরানোর কোনো সমর্থন কুরআন এবং সহীহ হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় না, আর এ ধরনের কাহিনী পয়গম্বরগণের উপযোগী নয়। –[বাহর, বায়যাবী]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِاِشْرَاكٍ فِى الْعُبُوْدِيَّةِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবীগণের عِصْمَتْ-এর دِفَاعٌ[প্রতিরোধ] করা।

قَوْلُهُ الْعُبُوْدِيَّةُ : যদি اَلْعُبُوْدِيَّةُ-এর পরিবর্তে اَلْعِبَادَةُ বা مَعْبُوْدِيَّةٌ বলত তবে অধিক ভালো হতো।

قَوْلُهُ اَهْلُ مَكَّةَ : এতে এ কথার সমর্থন রয়েছে যে, جَعَلَا-এর মারজি' হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) নন; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী উদ্দেশ্য। এর قَرِيْنَةٌ হলো আল্লাহর বাণী– فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ এখানে يُشْرِكُوْنَ বহুবচনের সীগাহ -এর সাথে আনা হয়েছে। অথচ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) বহুবচন নন।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ مُسَبَّبَةٌ : অর্থাৎ فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-এর আতফ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ-এর উপর হয়েছে। মা'তূফ আলাইহ টা মা'তূফের سَبَبٌ হয়েছে, অর্থাৎ যে সকল বস্তুসমূহকে তোমরা তার অংশীদার সাব্যস্ত করছ, তিনি

তা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কেননা তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টজীব স্রষ্টার অংশীদার হতে পারে না। মনে হয় যেন তাতে فَاءٌ টা تَعْقِيْبِيَّةٌ -এর ফায়দার প্রতি ইঙ্গিত করছে। মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقَابِلُوْنَكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যটি তাশবীহ -এর ভিত্তিতে হয়েছে। কাজেই এখন এ আপত্তি উত্থাপিত হবে না যে, মূর্তিসমূহ হতে দেখা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ طَيْفٌ: এর দ্বারা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, طَيْفٌ টা طَيْفًا থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ হবে অর্থাৎ طَافَ بِهِ الْخَيَالُ আর طَائِفٌ হলো ওয়াসওয়াসা, বিপদাশঙ্কা।

قَوْلُهُ اَلَمَّ بِهِمْ : অর্থাৎ مَسَّ بِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত, হেকমত, নিয়ামত এবং সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের উল্লেখ ছিল। তিনিই আলিমুল গায়ব তথা অদৃশ্য জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ-জ্ঞান শুধু তাঁরই, একথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সূরার প্রারম্ভে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সূরার সমাপ্তি পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে পুনরায় হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের কথা প্রমাণ করা এবং শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করা। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বিস্তারিতভাবে তাওহীদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। –[মাআরেফুল কুরআন; আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী, খ. ২৩, পৃ. ১৭২]

সর্বপ্রথম মানব জাতির সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের সকলকে একজন থেকে তথা আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শান্তির জন্যে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ.)-কেও আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ পাকের কুদরতে, তাঁর মর্জিতে পিতামাতার মাধ্যমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। যদিও আয়াতের শুরুতে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সমগ্র বিশ্ব মানবের সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটিত এবং চিত্রিত করা হয়েছে, যেন মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে ভুলে না যায়, তাঁর অকৃতজ্ঞ না হয়। মানব-সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অবদানকে স্মরণ করে তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।

قَوْلُهُ اِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ : এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন। 'সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় সেই সমস্ত লোক, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোনো ভয় আমার এ কারণে নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, যিনি আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণের মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদের কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাজিল করেছেন, তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলদের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য করেন বলেই কোনো শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেওয়া হয়। আর যদি কখনও কোনো বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ, সৎকর্মশীল মু'মিনের প্রতিটি কাজ হয়

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোনো কারণে পার্থিব জীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুত এটাই হলো সত্যিকার কৃতকার্যতা।

কুরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামা : আলোচ্য আয়াতগুলো কুরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও হেদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চালচলন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এ আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী ﷺ -কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ আরবি অভিধান মোতাবেক عَفْو [আফ্‌বুন]-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সবক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হলো এই যে, عَفْو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোনো রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে! অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাজের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাজির মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত– জাকাত, রোজা, হজ এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে। সহীহ বুখারী শরীফেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাজিল হলে হুজুর ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামদের এক বিরাট জমাত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রাযিয়াল্লাহু আনহুম] এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লিখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عَفْو -এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেওয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমদের একদল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জারীর (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন মহানবী ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী ﷺ -কে জানান যে, এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে [অর্থাৎ হুজুর ﷺ -কে] নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়াহ (র.) হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন হুজুর ﷺ -এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী ﷺ লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা

হামযা (রা.)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুজুর ﷺ -কে বাতলে দেওয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

عَفْو শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে যদিও পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় অর্থের মূল বক্তব্য এক। তা হলো এই যে, মানুষের হালকা ও অগভীর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীকেই গ্রহণ করে নিন; অধিকতর যাচাই-অনুসন্ধানের পেছনে পড়বে না এবং তাদের কাছে থেকে অতি উচ্চস্তরের আনুগত্য কামনা করবেন না। তা ছাড়া তাদের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিন। অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে যাবেন না। সুতরাং মহানবী ﷺ -এর কাজকর্ম ও মহান স্বভাব সর্বদা এ ছাঁচেই ঢেলে সাজানো ছিল। আর তারই বিকাশ ঘটেছিল সে সময় যখন মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে তাঁর প্রাণের শত্রুরা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে হাজির হয়েছিল। তখন তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিশোধ তো দূরের কথা, আজ আমি তোমাদের বিগত দিনের আচার-ব্যবহারের জন্য তোমাদের ভর্ৎসনাও করছি না।

আলোচ্য হেদায়েতনামার দ্বিতীয় বাক্যটি হলো– وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ مَعْرُوْف অর্থে عُرْف বলা হয় যে কোনো ভালো ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

তৃতীয় বাক্যটি হলো– وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ এর অর্থ হলো এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছে থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না দিয়ে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না: বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথাবার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মতো ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়েতও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়। সহীহ বুখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর খেলাফত আমলে উয়ায়নাহ ইবনে হিসন একবার মদিনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন সেই সমস্ত বিজ্ঞ আলেমের একজন যারা হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়ায়নাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল; তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এস। হুর ইবনে কায়েস (রা.) ফারূকে আ'যম (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়ায়নাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়ায়নাহ ফারূকে আ'যম (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আযম (রা.) তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়েস নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন– خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আর এ লোকটিও জাহিলদের একজন।" এ আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোনো কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

যাহোক, এ আয়াতটি বলিষ্ঠ ও সচ্চারিত্রিকতা সম্পর্কে একটি অতি ব্যাপক আয়াত। কোনো কোনো আলেম এর সারমর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ দু-রকম। ১. সৎকর্মশীল এবং ২. অসৎকর্মশীল। এ আয়াত উভয় শ্রেণির সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত দিয়েছে যে, যারা নেক কাজ করে, তাদের বাহ্যিক নেকীকে কবুল করে নাও, তাদের ব্যাপারে বেশি তদন্ত-অনুসন্ধান করতে যেও না কিংবা অতি উচ্চমানের সৎকর্ম তাদের কাছে দাবি করো না; বরং যতটুকু সৎকর্ম তারা সহজভাবে করতে পারে, তাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা কর। আর যারা বদকার বা অসৎকর্মী তাদের ব্যাপারে এ আয়াতের হেদায়েত হলো এই যে,

তাদেরকে সৎকাজের শিক্ষাদান কর এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে থাক। যদি তারা তা গ্রহণ না করে নিজেদের গোমরাহি ও ভ্রান্তিতে আঁকড়ে থাকে এবং মূর্খজনোচিত কথাবার্তা বলতে থাকে, তবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তাদের সেসব মূর্খতাসুলভ কথার কোনো উত্তরই দেবে না। এতে হয়তোবা কখনও তাদের চেতনার উদয় হবে এবং নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো ওয়াসওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিও পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানবপ্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভালো মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লাড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সেজন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবে শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হলো আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দুজন লোক মহানবী ﷺ -এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করেছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা দেখে হুজুর ﷺ বললেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এ উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হলো এই- أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ সে লোক হুজুর ﷺ -এর কাছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

বিস্ময়কর উপকারিতা : তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র.) এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা হলো এই যে, সমগ্র কুরআন মাজীদে বলিষ্ঠ ও উচ্চতর চারিত্রিক শিক্ষাদানকল্পে তিনটি ব্যাপকভিত্তিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ তিনটির শেষেই শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার একটি হলো, সূরা আ'রাফের আলোচ্য আয়াত, দ্বিতীয়টি সূরা মু'মিনূনের আয়াত اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ অর্থাৎ "অকল্যাণকে কল্যাণের দ্বারা প্রতিহত কর। আমি ভালো করেই জানি, যা কিছু তারা বলে থাকে। আর আপনি এভাবে দোয়া করুন যে, হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি আপনার নিকট শয়তানের প্ররোচনার চাপ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আর হে আমার পালনকর্তা, শয়তান আমার নিকট আসবে- আমি এ ব্যাপারেও আপনার নিকট পানাহ চাই।"

তৃতীয় সূরা হা-মীম সাজদার আয়াত- وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ . وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

অর্থাৎ নেকী আর বদী, ভালো ও মন্দ সমান হয় না। আপনি নেকীর মাধ্যমে বদী প্রতিহত করুন, তাহলে আপনার মধ্যে এবং যে লোকের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান সহসাই সে এমন হয়ে যাবে, যেমন হয় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এ বিষয়টি সে সমস্ত লোকের ভাগ্যেই জোটে, যারা একান্ত স্থিরচিত্ত হয়ে থাকে এবং বিষয়টি যারই ভাগ্যে জোটে সে লোক বড়ই ভাগ্যবান। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে কোনো রকম সংশয় বা ওয়াসওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং অত্যন্ত জ্ঞানী।

এ তিনটি আয়াতেই সেসব লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং মন্দের বিনিময়ে কল্যাণের মাধ্যমে দেওয়ার হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরে রাগের সঞ্চার করে। আর সাথে সাথে শয়তানের প্রতারণা থেকে পানাহ চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের সাথে শয়তানেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেখানেই বিবাদ-বিসংবাদের সূচনা দেখা দেয়, শয়তান সে স্থানটিকে নিজের রণক্ষেত্র বানিয়ে নেয় এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককেও ক্রোধান্বিত করে উত্তেজনা প্রদর্শিত করতে প্রয়াস পায়। এর প্রতিকার এই যে, যখন দেখবে রাগ প্রশমিত হচ্ছে না, তখন বুঝবে শয়তান

আমার উপর জয়ী হয়ে যাচ্ছে এবং তখনই আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে পানাহ চাইবে। তবেই চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জিত হবে। সে জন্যই পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ الخ : **নীরব ও সরব জিকিরের বিধিবিধান :** জিকিরের প্রথম আদব হলো নিঃশব্দ জিকির কিংবা সশব্দ জিকিরসংক্রান্ত। এ আয়াতে কুরআন করীম নিঃশব্দ জিকির কিংবা সশব্দ জিকির দু-রকম জিকিরের স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ জিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ অর্থাৎ স্বীয় পরওয়ারদিগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দুটি উপায় রয়েছে- ১. জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহর 'যাত' [সত্তা] ও গুণাবলির ধ্যান করবে, যাকে 'জিকরে কুলবী' [আত্মিক জিকির] বা 'তাফাক্কুর' [নির্বিষ্ট চিন্তা] বলা হয়। ২ তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ তা'আলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হলো জিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের জিকির করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ এভাবে অন্তরের সাথে মুখেও জিকিরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোনো অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতে যথেষ্ট ছওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হলো শুধু মুখে মুখে জিকির করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা। এমনি জিকির সম্পর্কে মাওলানা রুমী (র.) বলেছেন-

بر زبان تسبیح ودر دل گاؤخر # این چنین تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ মুখে জপতাপ, আর অন্তরে গাধা-গরু: এহেন জপতাপে কেমন করে আছর হবে।

এতে মাওলানা রুমীর উদ্দেশ্য হলো এই যে, গাফেল মনে জিকির করাতে জিকিরের পরিপূর্ণ ক্রিয়া ও বরকত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, এ মৌখিক জিকিরও পুণ্য ও উপকারিতা বিবর্জিত নয়। কারণ অনেক সময় এ মৌখিক জিকিরই আন্তরিক জিকিরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মুখে বলতে বলতেই এক সময় মনেও তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া অন্তত একটি অঙ্গ তো জিকিরে নিয়োজিত থাকেই। তাই তাও পুণ্যহীন নয়। অতএব, জিকির-আযকারে যাদের মন বসে না এবং ধ্যানের মাঝে আল্লাহর গুণাবলি প্রতিফলিত করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তারাও এই মৌখিক জিকিরকে নিরর্থক ভেবে পরিহার করবেন না; চালিয়ে যাবেন এবং মনে তার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করতে থাকবেন।

দ্বিতীয় জিকিরের পন্থা। এ আয়াতেই বলা হয়েছে- وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ তা'আলার জিকির করবে তার সশব্দ জিকির করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হলো এই যে, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে জিকির করবে না। মাঝামাঝি আওয়াজে করবে যাতে আদব এবং মর্যদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে জিকির বা তেলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে জিকির করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহর সাধারণ জিকিরই হোক, কিংবা কুরআনের তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর জিকির বা কুরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমত আত্মিক জিকির। অর্থাৎ কুরআনের মর্ম এবং জিকিরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে, যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়ত যে জিকিরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শুনবে। এ দুটি পদ্ধতিই আল্লাহর বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিত ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হলো আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। মাঝামাঝি সীমার বাইরে যাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। জিকিরের এ পদ্ধতিটিই وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কুরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কেরাত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একবারে মনে মনেও নয়; বরং কেরাতে যেন মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করা হয়।

নামাজের মাঝে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে মহনবী ﷺ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-কে হেদায়েতেই দিয়েছেন।

সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রাসূলে কারীম ﷺ শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি নামাজ পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ শব্দহীনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি [হুজুর ﷺ] সেখান থেকে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা.) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শুনে নিয়েছেন. তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-কে লক্ষ্য করে হুজুর ﷺ বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম না আসে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হুজুরে আকরাম ﷺ মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন। –[আবূ দাঊদ]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, কিছু লোক হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট হুজুর আকরাম ﷺ -এর তেলাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, না আস্তে। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কখনও জোরে, আবার কখনও আস্তে আস্তে তেলাওয়াত করতেন।

রাত্রিকালীন নফল নামাজে এবং নামাজের বাইরে তেলাওয়াতে কোনো কোনো মনীষী জোরে তেলাওয়াত করাকে পছন্দ করেছেন আর কেউ কেউ আস্তে পড়াকে পছন্দ করেছেন। সে জন্যই ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানাফী (র.) বলেছেন যে, যে লোক তেলাওয়াত করবে তার যেকোনোভাবে তেলাওয়াত করার অধিকার রয়েছে তবে সশব্দে তেলাওয়াত করার জন্য সবার মতেই কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত রয়েছে। প্রথমত তাতে নাম-যশ এবং রিয়াকারী বা লোক-দেখানোর কোনো আশঙ্কা থাকবে না। দ্বিতীয়ত তার শব্দে অন্য লোকদের ক্ষতি কিংবা কষ্ট হবে না। অন্য কোনো লোকের নামাজ, তেলাওয়াত কিংবা কাজকর্মে অথবা বিশ্রামে কোনো রকম ব্যাঘাত যেন না হয়। যেখানে নাম-যশ ও রিয়াকারী কিংবা অন্যান্য লোকের কাজকর্ম অথবা আরাম বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে, সে ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে তেলাওয়াত করাই সবার মতে উত্তম।

আর কুরআন তেলাওয়াতের যে হুকুম অন্যান্য জিকির-আজকার ও তাসবীহ-তাহলীলেরও একই হুকুম। অর্থাৎ আস্তে আস্তে কিংবা শব্দ করে উভয়ভাবে পড়াই জায়েজ রয়েছে। অবশ্য আওয়াজ এমন উচ্চ হবে না যা বিনয়, নম্রতা ও আদবের খেলাফ হবে। তদুপরি তার সে আওয়াজে অন্য লোকের কাজকর্ম কিংবা আরাম-বিশ্রামেরও যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

তবে সরব ও নীরব জিকিরের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম তার ফয়সালা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো জন্য জোরে জিকির করা উত্তম; আর কারো জন্য আস্তে করা উত্তম। কোনো সময় জোরে করা উত্তম আবার কোনো সময় আস্তে করা উত্তম। তেলাওয়াত ও জিকিরের দ্বিতীয় আদব হলো, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে জিকির করা। তার মর্ম এই যে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও মহিমা উপস্থিত থাকতে হবে এবং যা কিছু জিকির করা হবে, তার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

আর তৃতীয় আদব আলোচ্য আয়াতের خِيْفَةً শব্দের দ্বারা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তেলাওয়াত ও জিকিরের সময় মানব মনে আল্লাহর ভয়ভীতির অবস্থা সঞ্চারিত হতে হবে। ভয় এ কারণে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও মহত্ত্বের পুরোপুরি হক আদায় করতে পারছি না, আমাদের দ্বারা না জানি বেআদবি হয়ে যায়। তাছাড়া স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহর আজাবের ভয়; শেষ পরিণতি কি হয়, কোন্ অবস্থায় না জানি আমাদের মৃত্যু ঘটে। যাহোক, জিকির ও তেলাওয়াত এমনভাবে করতে হবে যেমন কোনো ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি করে থাকে।

দোয়া প্রার্থনার এ সমস্ত আদব-কায়দাই উক্ত সূরা আ'রাফের প্রারম্ভে اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً আয়াতে আলোচিত হয়েছে। তাতে خِيْفَةً -এর পরিবর্তে خُفْيَةً শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তার অর্থ হলো নীরবে বা নিঃশব্দে জিকির করা। এতে বোঝা যায় নিঃশব্দে এবং আস্তে আস্তে জিকির করাও জিকিরের একটি আদব। কিন্তু এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যদিও সশব্দে জিকির করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে করবে না এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে করবে না, যাতে বিনয় ও নম্রতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জিকির ও তেলাওয়াতের সময় বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তা হবে সকাল ও সন্ধ্যায়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দৈনিক অন্তত দু-বেলা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। আর এ অর্থও হতে পারে যে, সকাল সন্ধ্যায় বলে দিবা-রাত্রির সব সময়কে বুঝানো হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম বলে যেমন সারা দুনিয়াকে বুঝানো হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সর্বদা, সর্বাবস্থায় জিকির ও তেলাওয়াতে নিয়মানুবর্তী হওয়া মানুষের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুজুরে আকরাম ﷺ সর্বদা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকতেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ ত্যাগ করে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না। কারণ এটি বড়ই ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের শিক্ষা ও উপদেশের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে নৈকট্য লাভকারীদের এক বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছে তারা তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে গর্ব বা অহংকার করে না। এখানে আল্লাহ নিকটে থাকা অর্থ আল্লাহর প্রিয় হওয়া। এতে সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত নবী-রাসূল এবং সমস্ত সৎকর্মশীল লোকই অন্তর্ভুক্ত। আর তাকাব্বুর বা অহংকার না করা অর্থ হলো এই যে, নিজে নিজেকে বড় মনে করে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না করা। বরং নিজেকে অসহায়, মুখাপেক্ষী মনে করে সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে ও ইবাদতে নিয়োজিত থাকা, তাসবীহ-তাহলীল করতে থাকা এবং আল্লাহকে সিজদা করতে থাকা।

এতে এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সার্বক্ষণিক ইবাদত ও আল্লাহকে স্মরণ করার তাওফীক যাদের ভাগ্যে হয়, তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে রয়েছে এবং তাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য হাসিল হয়েছে।

সেজদার কতিপয় ফজিলত ও আহকাম : এখানে নামাজ সংক্রান্ত ইবাদতের মধ্যে থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো এক লোক হযরত ছাওবান (র.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল দিন, যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত ছাওবান (রা.) নীরব রইলেন, কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে অসিয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। কারণ তোমরা যখন একটি সেজদা কর, তখন তার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। লোকটি বললেন, হযরত ছাওবান (রা.)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দাদারদা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদিগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজদারত অবস্থায় খুব বেশি করে দোয়া প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসাবে কোনো ইবাদত নেই। কাজেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামাজ পড়া। নফল যত বেশি হবে সেজদাও ততই বেশি হবে। কিন্তু কোনো লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাজের সাথেই সম্পৃক্ত; ফরজ নামাজে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হলো। এর শেষ আয়াতটি হলো আয়াতে সেজদা। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোনো আদম সন্তান যখন কোনো সেজদার আয়াত পাঠ করে, অতঃপর সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হলো আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হলো জান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম রয়েছে, কিন্তু আমি তার নাফরমানি করেছি বলে আমার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. لَمَّا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ غَنَائِمِ بَدْرٍ فَقَالَ الشُّبَّانُ هِيَ لَنَا لِاَنَّا بَاشَرْنَا الْقِتَالَ وَقَالَ الشُّيُوْخُ كُنَّا رِدْأً لَكُمْ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوِ انْكَشَفْتُمْ لَفِئْتُمْ اِلَيْنَا فَلَا تَسْتَاْثِرُوْا بِهَا نَزَلَ يَسْئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْاَنْفَالِ ط الْغَنَائِمِ لِمَنْ هِيَ قُلْ لَهُمْ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج يَجْعَلَانِهَا حَيْثُ شَاءُوْا فَقَسَّمَهَا ﷺ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص اَيْ حَقِيْقَةَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَتَرْكِ النِّزَاعِ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ حَقًّا ـ
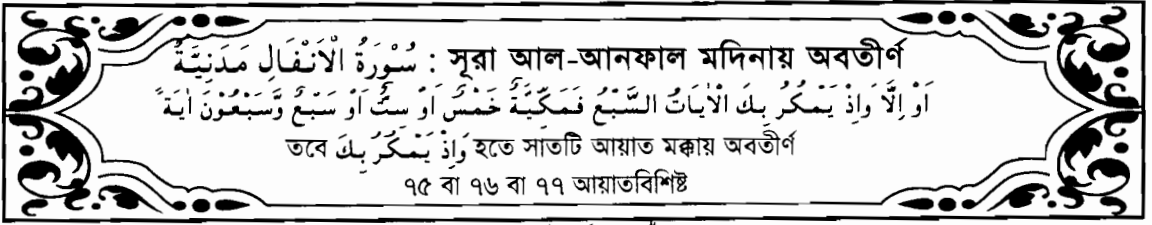
১. বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত সামগ্রী সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। যুবক ও সমর্থ ব্যক্তিরা বলল, সাকুল্য গনিমত সামগ্রী আমাদের। কেননা আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। বৃদ্ধগণ বলল, ঝাণ্ডার নিচে আমরা তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং সহযোগী হিসাবে ছিলাম। তোমরা যদি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে ও পরাজিত হতে আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হত। সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদের প্রাধান্যমূলক কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, হে মুহাম্মাদ! লোক তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে الانفال এ স্থানে অর্থ যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী। যে এটা কার? এদের বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের তাঁরা যেভাবে ইচ্ছা তা বণ্টন করতে পারেন। হাকেম তৎপ্রণীত 'মুস্তাদরাক' নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূল ﷺ এটা সমহারে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ বর্জন করত সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পরস্পরে যথার্থভাবে সদ্ভাব স্থাপন কর যদি সত্যই তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর।

٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَامِلُوْنَ الْاِيْمَانِ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ اَيْ وَعِيْدُهٗ وَجِلَتْ خَافَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ بِهٖ يَثِقُوْنَ لَا بِغَيْرِهٖ ـ

২. বিশ্বাসী অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তো তারাই যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় শিহরিত হয় যখন আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর আজাবের হুমকি স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের বিশ্বাস ও অন্তরের প্রত্যয় বৃদ্ধি করে এবং তারা অন্য কারও উপর নয় কেবল তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তার উপরই ভরসা করে।

٣. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اَعْطَيْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ.

৩. যারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ যথাযথভাবে তার হক ও দাবিসহ তা সমাধা করে এবং আমি যা রিজিক দিয়েছি অর্থাৎ তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে।

٤. اُولٰٓئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط صِدْقًا بِلَا شَكٍّ لَهُمْ دَرَجٰتٌ مَنَازِلُ فِى الْجَنَّةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ فِى الْجَنَّةِ.

৪. উল্লিখিত গুণাবলিতে যারা বিভূষিত তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী নিঃসন্দেহে সত্যানুসারী। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন মানজিল ক্ষমা এবং জান্নাতের মধ্যে সম্মানজনক জীবিকা।

٥. كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ط مُتَعَلِّقٌ بِاَخْرَجَ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ الْخُرُوْجَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ كَافِ اَخْرَجَكَ وَكَمَا خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ هٰذِهِ الْحَالُ فِىْ كَرَاهَتِهِمْ لَهَا مِثْلُ اِخْرَاجِكَ فِىْ حَالِ كَرَاهَتِهِمْ وَقَدْ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذٰلِكَ اَيْضًا وَذٰلِكَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ قَدِمَ بِعِيْرٍ مِنَ الشَّامِ فَخَرَجَ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِيَغْتَنِمُوْهَا فَعَلِمَتْ قُرَيْشٌ فَخَرَجَ اَبُوْجَهْلٍ وَمُقَاتِلُوْ مَكَّةَ لِيَذُبُّوْا عَنْهَا وَهُمُ النَّفِيْرُ وَ اَخَذَ اَبُوْ سُفْيَانَ بِالْعِيْرِ طَرِيْقَ السَّاحِلِ فَنَجَتْ فَقِيْلَ لِاَبِىْ جَهْلٍ اِرْجِعْ فَاَبٰى وَسَارَ اِلٰى بَدْرٍ فَشَاوَرَ ﷺ اَصْحَابَهُ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَنِىْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فَوَافَقُوْهُ عَلٰى قِتَالِ النَّفِيْرِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ وَقَالُوْا لَمْ نَسْتَعِدَّ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى.

৫. এটা এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পছন্দ করেনি। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ অবস্থাটি তাদের পছন্দ না হওয়ার মধ্যে বদরের যুদ্ধে তাদেরকে মদিনা হতে বের করে নিয়ে আসার মতোই। তাও তারা পছন্দ করেনি অথচ পরিণামে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছিল। এমনিভাবে এটাও [অর্থাৎ আনফাল বা গনিমত সামগ্রীর বণ্টন ব্যবস্থাও] তাদের জন্য মঙ্গলজনকই হবে। كَمَا এটা এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَر। بِالْحَقِّ এটা اَخْرَجَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। وَاِنَّ فَرِيْقًا এ বাক্যটি এ স্থানে اَخْرَجَكَ-এর كَ [ضَمِيْر সর্বনাম]-এর حَال হয়েছে। আয়াতোক্ত ঘটনাটি ছিল এই যে, কুরাইশ সর্দার আবূ সুফিয়ান একটি কাফেলাসহ সিরিয়া হতে মক্কার দিকে আসতেছিল, রাসূল ﷺ কতিপয় সাহাবীসহ তাকে প্রতিহত করতে রওয়ানা হন। মক্কার কুরাইশরা এটা জানতে পারে এবং আবূ জাহলের নেতৃত্বে মক্কার বিরাট এক যোদ্ধাদল তাকে বাধা দিতে যাত্রা করে। এই দল 'নফীর' [যোদ্ধাদল] নামে অভিহিত হয়েছে। এদিকে আবূ সুফিয়ান কাফেলাসহ সমুদ্র-তীরের পথ ধরে নিরাপদে চলে যায়, তখন আবূ জাহলকে বলা হলো ফিরিয়ে চল। [কারণ উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে।] আবূ জাহল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং এ বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরে উপনীত হয়। তখন রাসূল ﷺ এ বিষয়ে সাহাবীগণের সাথে দুই দল সম্পর্কে পরামর্শ করেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে দুই দলের [কাফেলা ও নফীরের] একটির ওয়াদা করেছেন। সাহাবীগণ [নিজেদের পূর্ণ প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও] অস্ত্র ও লোক বলে বলীয়ান এ নফীর বা যোদ্ধাদলের সাথে লড়তে রাসূল ﷺ -এর সাথে ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। গুটি কয়েকজন এটা পছন্দ করতে পারেননি। তারা বললেন, আমরা তো এটার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

٦. يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ الْقِتَالِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ظَهَرَ لَهُمْ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ عِيَانًا فِى كَرَاهِيَتِهِمْ لَهُ .

৬. এদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও সত্য সম্পর্কে অর্থাৎ যুদ্ধ করার বিষয়ে তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এটা না পছন্দ করায় মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা সমক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

٧. وَ اُذْكُرْ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الْعِيْرَ اَوِ النَّفِيْرَ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ تُرِيْدُوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ اَىِ الْبَأْسِ وَالسِّلَاحِ وَهِىَ الْعِيْرُ تَكُوْنُ لَكُمْ لِقِلَّةِ عَدَدِهَا وَعُدَدِهَا بِخِلَافِ النَّفِيْرِ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ يُظْهِرَهُ بِكَلِمٰتِهِ السَّابِقَةِ بِظُهُوْرِ الْاِسْلَامِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ اٰخِرَهُمْ بِالْاِسْتِئْصَالِ فَاَمَرَكُمْ بِقِتَالِ النَّفِيْرِ .

৭. আর স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের অর্থাৎ কাফেলা ও নফীরের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে অথচ তোমরা পছন্দ করছিলে চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি অর্থাৎ ঈর বা কাফেলাটি। غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ অর্থ শক্তি ও অস্ত্রহীন। কারণ এদের সংখ্যাও ছিল কম আর অস্ত্রবলও ছিল নগণ্য। পক্ষান্তরে নফীর বা যোদ্ধাদলের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন তার বাণী দ্বারা অর্থাৎ ইসলামের বিজয় প্রদানের পূর্ববর্তী ওয়াদার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে তার প্রকাশ ঘটাতে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শেষটিকে পর্যন্ত উৎপাটিত করে দিয়ে তাদেরকে নির্মূল করতে। আর সেহেতুই তিনি তোমাদেরকে নফীর অর্থাৎ যোদ্ধাদলের সাথে লড়তে নির্দেশ দান করেছেন।

٨. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ يُمْحِقَ الْبَاطِلَ الْكُفْرَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ ذٰلِكَ .

৮. এজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অর্থাৎ কুফরিকে অসত্যে প্রতিপন্ন করেন। অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। যদিও অপরাধীগণ তা পছন্দ করে না।

٩. اُذْكُرْ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ تَطْلُبُوْنَ مِنْهُ الْغَوْثَ بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ مُمِدُّكُمْ مُعِيْنُكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ مُتَتَابِعِيْنَ يُرْدِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَعَدَهُمْ بِهَا اَوَّلًا ثُمَّ صَارَتْ ثَلَاثَةَ اٰلَافٍ ثُمَّ خَمْسَةً كَمَا فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ وَقُرِئَ بِاَلْفٍ كَاَفْلُسٍ جَمْعٌ .

৯. স্মরণ কর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করছিলে তাদের [শত্রুদের] বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তোমরা তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিলে। অনন্তর তিনি তা কবুল করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা শক্তি যোগাব সাহায্য করব যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে যারা পর পর একদলের পিছনে আরেক দল আসবে। প্রথমে এ সংখ্যার ওয়াদা করা হয়েছিল। পরে তা তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানে এটার উল্লেখ রয়েছে। اَنِّىْ এটা بِاَنِّىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এ স্থানে اَنِّىْ-এর পূর্বে একটি بَاتَصْوِيْرِيَّةٌ উহ্য রয়েছে।

١٠. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اَىِ الْاِمْدَادَ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

১০. আল্লাহ এটা অর্থাৎ ঐ সাহায্য করেছিলেন কেবল শুভ সংবাদ হিসাবে এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর নিকট হতেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ : এটা مُرَكَّبْ اِضَافِىْ মুবতাদা হয়েছে। এর খবর হলো দুটি- একটি **হলো مَدَنِيَّةٌ আর অপরটি** হলো خَمْسٌ الخ এখন মুবতাদা খবর মিলে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর اِلَّا হলো حَرْفِ اِسْتِثْنَاءٌ এবং وَيَمْكُرُ بِكَ হলো مُسْتَثْنٰى আর اَوْ হলো মতবিরোধ বর্ণনা করার জন্য। যদিও সূরার শিরোনামে সাত আয়াত মাক্কী বলা হয়েছে, **তবে বিশুদ্ধ কথা** হলো এই যে, পূর্ণ সূরাটাই মাদানী।

قَوْلُهُ عَنِ الْاَنْفَالِ : اَنْفَالٌ শব্দটি نَفَلٌ [যা سَبَبٌ -এর ওজনে হয়েছে] -এর বহুবচন, অর্থ অতিরিক্ত। আর نَفْلٌ **শব্দটির** فَاءٌ বর্ণে সাকিন সহও পাঠ রয়েছে। এর অর্থও অতিরিক্ত। গনিমতের সম্পদ যেহেতু পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য বৈধ **ছিল** না, বিশেষভাবে শুধুমাত্র এ উম্মতের জন্য বৈধ করা হয়েছে। এজন্যই এটাকে نَفْلٌ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ -এর মধ্যে يَسْئَلُوْنَكَ -এর সেলাহ عَنْ নেওয়া হয়েছে। অথচ প্রশ্ন مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হয়েছে। যেমন বলা হয়- سَاَلْتُ زَيْدًا مَالًا

উত্তর. যদি প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ও ব্যাখ্যাকরণের জন্য হয় তবে প্রশ্ন مُتَعَدِّىْ عَنْ -এর সাথে হবে। আর طَلَبْ অর্থে হয় তবে مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হবে। যারা এখানে প্রশ্নকে طَلَبْ -এর জন্য মনে করেন তারা عَنْ -কে অতিরিক্ত মনে করেন।

قَوْلُهُ لَوِ انْكَشَفْتُمْ : অর্থাৎ اِنْهَزَمْتُمْ وَانْتَشَرْتُمْ যদি তোমরা পরাজিত হও এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়।

قَوْلُهُ فَلَا تَسْتَاثِرُوْا : অর্থাৎ فَلَا تَخْتَارُوْا অর্থাৎ তোমাদের **বর্ণিত** দলিলের কারণে তোমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া যাচ্ছে না। اِيْثَارٌ অর্থ হলো প্রাধান্য দেওয়া। গনিমতের সম্পদকে نَفْلٌ **বলার** এটাও একটি কারণ যে, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। আর মাল উপার্জন করা একটি অতিরিক্ত বিষয়।

قَوْلُهُ اَىْ حَقِيْقَةَ مَا بَيْنَكُمْ : এটা ذَاتَ بَيْنِكُمْ-এর তাফসীর। এতে এটা বলা হয়েছে যে, ذَاتٌ টা হলো حَقِيْقَتٌ অর্থে এবং بَيْنٌ হলো وَصْلٌ অর্থে এবং لُغَتٌ -এর **অনুযায়ী** হয়েছে।

قَوْلُهُ الْكَامِلُوْنَ : এ কয়েদ বৃদ্ধি করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান করা।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা اِنَّمَا টা كَلِمَةٌ حَصْرٌ -এর সাথে বলেছেন যে, মুমিন তো সেই যার সম্মুখে আল্লাহর জিকির করা হলে তাদের হৃদয় আল্লাহভীতিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তবে এরূপ ব্যক্তি তো খুবই কম হবে।

উত্তর. এটা পূর্ণাঙ্গ মুমিনের সিফত। সাধারণ মুমিনের নয়।

قَوْلُهُ تَصْدِيْقًا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো, আপনার অভিমত হলো ঈমানের মধ্যে কমবেশি হয় না। অথচ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের মধ্যে কমবেশি হয়ে থাকে।

উত্তর. জবাবের সার হলো, এখানে ঈমান দ্বারা تَصْدِيْقٌ এবং طَمَانِيْنَتْ قَلْبٌ উদ্দেশ্য এবং এতে কমবেশি হয়।

قَوْلُهُ بِهٖ يَتَّقُوْنَ لَا بِغَيْرِهٖ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَقْدِيْمُ مُتَعَلِّقٌ-এর নীতিমালা বর্ণনা করা যা حَصْرٌ হয়েছে অর্থাৎ তোমার উপরই ভরসা করে অন্য কারো উপর নয়।

قَوْلُهُ الْخُرُوْجُ اَىْ خُرُوْجُكَ وَخُرُوْجُهُمْ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো, حَالٌ টা যখন **জুমলা হয়** তখন তাতে عَائِدٌ হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ এখানে কোনো عَائِدٌ নেই।

জবাবের সার হলো, উহ্য ইবারত হলো خُرُوْجُكَ وَخُرُوْجُهُمْ কাজেই আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهُ وَكَمَا، خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْذُوْفٍ : এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো উভয় বাক্যের মধ্যকার সামঞ্জস্য বর্ণনা করা। অর্থাৎ গনিমতের মাল বণ্টন নারাজি প্রকাশ করা সেরূপ যেরূপ خُرُوْجُ اِلَى النَّفِيْرِ [সৈন্যের দিকে বের হওয়া] অপছন্দ ছিল। অথচ যেভাবে তাদের ব্যাপারে বের হওয়া উত্তম ছিল। গনিমতলব্ধ সম্পদ বণ্টনেও কল্যাণ রয়েছে।

قَوْلُهُ عَدَدُهَا : অর্থাৎ اَسْبَابُهَا

قَوْلُهُ بِاَلْفٍ : অর্থাৎ اَلْف -কে اَلِف -এর সাথে অর্থাৎ اٰلُفْ পড়া হয়েছে اَلُفْ -এর উপর মদ এবং لَامٌ -এর **উপর পেশ** সহকারে اَفْلُسٌ -এর ওজনে। অর্থাৎ যেভাবে فَلْسٌ -এর বহুবচন اَفْلُسٌ আসে, এমনিভাবে اَلِفٌ -এর **বহুবচনও اٰلُفٌ** আসে। اٰلُفٌ মূলত اَاْلُفٌ ছিল। দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় اٰلُفٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার বিষয়বস্তু : সূরা আনফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদিনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরিকীন [অংশীবাদী] এবং আহলে কিতাবের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরি ও ফিতনা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই গযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা ও দান এবং কাফেরদের জন্য ছিল আজাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাকওয়া, পরহেজগারি এবং আল্লাহর আনুগত্য, জিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের উম্মতদের অবস্থা এবং তাদের মোকাবিলায় আম্বিয়ায়ে কেরামের বিজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধে যে সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম জিহাদ। এ জিহাদে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন।

যেহেতু এ সূরায় বদরের যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে তাই এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে এর নেপথ্য ঘটনা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি। প্রিয়নবী ﷺ মক্কা মুয়াযযামার সুদীর্ঘ ১৩টি বছর দীন ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মক্কাবাসী শুধু যে ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই নয়, শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করেছে তাও নয়; বরং তারা প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম জুলুম-অত্যাচার করে। জুলুম-অত্যাচারের ইতিহাসে এমন জুলুমের ঘটনা বিরল। এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণ জালেমদের মোকাবিলা করেননি; বরং ধৈর্যধারণ করেছেন। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে এ কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا [সূরা মুযযাম্মিল] হে রাসূল! তারা যা বলে তাতে আপনি সবর অবলম্বন করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদের থেকে দূরে থাকুন। যেমন সূরা কাফে ইরশাদ হয়েছে– وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ হে রাসূল! কাফেররা যা বলে তার উপর সবর অবলম্বন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের হামদের তাসবীহ পাঠ করুন সকাল এবং সন্ধ্যায়।

বস্তুত মক্কা মুয়াযযামায় প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সবর ও ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, অবশেষে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামকে প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করতে হয়। তাঁরা হিজরত করেন নির্যাতিত-উৎপীড়িত অবস্থায়, নিঃস্ব হৃতসর্বস্ব হয়ে। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানী শক্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যেহেতু দুশমনের মোকাবিলার অনুমতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি, তাই জালেম দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করেননি, অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত অবস্থায়ই ১৩ টি বছরের সুদীর্ঘ জীবনযাপন করেছেন।

হিজরতের পর মজলুম মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক জালেম দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দান করে সূরা হজে ঘোষণা করলেন– أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। হিজরি দ্বিতীয় সনে হুজুরে আকরাম ﷺ জানতে পারেন যে, মক্কার মুশরিকদের এক বিরাট বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া থেকে মালপত্র নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে। শত্রুর অর্থবল ভেঙ্গে দেওয়া এ মুহূর্তে একান্ত জরুরি, তাই ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ মদিনা শরীফ থেকে রওয়ানা হলেন। আবূ সুফিয়ান এ খবর পেয়ে মক্কায় সাহায্যের জন্যে লোক পাঠায়। আবূ জাহলের নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মদিনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হয়। আবূ সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে মদিনা শরীফ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বদর নামক স্থানে আবূ জাহলের নেতৃত্বাধীন সৈন্যের মোকাবিলা হয়।

মুসলমানদের নিকট মাত্র দুটি অশ্ব ছিল এবং প্রতি নয়জনের জন্যে একখানা তলোয়ার ছিল। আর ১০০০ অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী কাফের মুসলমানদের ৩১৩ জনের মোকাবিলায় উপস্থিত ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দানে প্রিয়নবী ﷺ -এর নেতৃত্বাধীন সাহাবায়ে কেরামকে বিজয় দান করলেন এবং কুফর ও নাফরমানির বিষ দাঁত চিরতরে ভেঙ্গে দিলেন। কাফেরদের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হলো আর ৭০ জন বন্দী হলো।

শানে নুযূল : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে 'আনফাল' শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, এ আয়াত আমাদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমাদের হাত থেকে নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তা সমানভাবে বিতরণ করে দেন। ঘটনাটি ছিল এই, আমরা সকলে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গে বদর রণাঙ্গনে উপস্থিত হই। উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়।

অবশেষে আল্লাহ পাক দুশমনদেরকে পরাজিত করেন। তখন আমাদের লোকজন তিনভাগে বিভক্ত হয়। একদল দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করেন যেন দুশমন ফিরে না আসতে পারে। আর কিছু লোক দুশমনের পরিত্যক্ত সম্পদ একত্রিত করতে থাকেন। আর কিছু লোক হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর চারিপার্শ্বে একত্রিত থাকেন যেন কোনো আত্মগোপনকারী দুশমন তাঁর উপর হঠাৎ হামলা না করে বসে। রাতে যখন সকালে নিজ নিজ স্থানে পৌঁছেন তখন যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করেছিলেন তাঁরা বললেন, এ সম্পদ আমদের। কেননা আমরাই এগুলো একত্রিত করেছি। এতে আর কারো অংশ নেই। যারা দুশমনের পিছু ধাওয়া করেছিলেন তাঁরা বললেন, তোমরা আমাদের চেয়ে এ সম্পদের অধিকতর হকদার নও, কেননা আমরা দুশমনকে ধাওয়া করেছি বলেই তোমরা এ সব দ্রব্য সামগ্রী একত্রিত করতে পেরেছ।

আর যারা হুজুর ﷺ -এর চারিপার্শ্বে তাঁর হেফাজতের জন্য একত্রিত ছিলেন তাঁরা বললেন, আমরা ইচ্ছা করলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রি করতে পারতাম। কিন্তু আমরা প্রিয়নবী ﷺ -এর হেফাজতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছি। অতএব, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আমরাও অধিকারী। বিভিন্ন মত পোষণকারীদের এসব কথার বিবরণ যখন হুজুর ﷺ -এর নিকট পৌঁছল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন যে, এ সম্পদ আল্লাহ পাকের এছাড়া এর কোনো মালিক নেই। তবে আল্লাহর রাসূল যাকে দান করেন। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে গনিমতের মাল সমানভাবে বিতরণ করে দিলেন। এতে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কারণে তাঁরা অনুতপ্ত হলেন।

-[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ২০২; তাফসীরে নেকাতুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ২০-২৪]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ : হে রাসূল! তারা আপনার নিকট গনিমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ সম্পদের মালিকানা আল্লাহ পাকের আর তা ব্যয় করার অধিকার হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর, যিনি আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক মানুষের মধ্যে তা বিতরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকার আল্লাহ পাক মানুষের হাত থেকে নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করেছেন।

اَنْفَالٌ শব্দটি نَفَلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ- অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামাজ, রোজা, সদকা প্রভৃতিকে 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশিতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় نَفَلٌ ও اَنْفَالٌ [নফল ও আনফাল] গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআন মাজীদে এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- ১. আনফাল, ২. গনিমত এবং ৩. ফায়। اَنْفَالٌ শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غَنِيْمَةٌ [গনিমত] শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فَئٌ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশেরের আয়াত وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনিমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। اَنْفَالٌ [গনিমত] সাধারণত সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَئٌ [ফায়] বলা হয় সে মালকে, যা কোনো রকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজি হোক। আর نَفَلٌ ও اَنْفَالٌ [নফল ও আনফাল] শব্দটি অধিকাংশ সময় ইনাম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নায়ক কোনো বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনিমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাফসীরে ইবনে জারীর গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।- [ইবনে কাসীর] আবার কখনও 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা

হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ [اَنْفَالٌ] শব্দটি সাধারণ, অসাধারণ– উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোনো মতবিরোধ নেই। বস্তুত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই, যা ইমাম আবূ ওবাইদ (র.) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এ উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মালসামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এ প্রচলন ছিল না; বরং গনিমতের মালের ক্ষেত্রে আইন ছিল এই যে, তা কারো জন্য হালাল ছিল না; সমস্ত গনিমতের মালামাল কোনো এক জায়গায় জমা করা হতো। অতঃপর আসমান থেকে এক অনল-বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত। আর এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার নিকট জিহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন। পক্ষান্তরে গনিমতের মাল-সামান একত্রিত করে রাখার পর যদি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে না জ্বালাত, তবে তা-ই ছিল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণ। এতে বুঝা যেত, এ জিহাদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গনিমতের সে মাল-সামানকেও প্রত্যাখ্যাত ও অলক্ষুণে মনে করা হতো এবং সেগুলো কোনো প্রকার ব্যবহারে আনা হতো না।

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ الخ : মু'মিনের বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মু'মিন নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মু'মিনের গুণাবলিতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোনো একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর ভয় : আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবি হলো ভয় ও ভীতি। কুরআনে কারীমের অন্য এক আয়াত তারই আলোচনাক্রমে আল্লাহ-প্রেমিকদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ [হে নবী] সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদের, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর জিকিরের এ বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে– اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থি নয়, যেমন হিংস্র জীবজন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মানের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর জিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْف শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি; وَجَل শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয় বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহর কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আজাবের ভয়।
–[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি : মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসবিদদের সর্বসম্মত মতে ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোনো এক কবি ছান্দিক ভাষায় এভাবে বলেছেন–

وَاِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا ۞ نَشَطَتْ فِى الْعِبَادَةِ الْاَعْضَاءُ অর্থাৎ অন্তরে যখন ঈমানের মাধুর্য বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর ইবাদতের মাঝে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করতে আরম্ভ করে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হবে, তখন

তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে না থাকে কুরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোনো খেয়াল, না থাকে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পুণ্য বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভরসা : মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজকর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার উপর। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী ﷺ বলছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে; বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে; বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে- أَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ স্বীয় জিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়-উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করা : মু'মিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামাজ' পড়ার কথা নয় বরং নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। اِقَامَتْ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اِقَامَتْ صَلٰوةْ -এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাজের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোনো রকম ত্রুটি হলে তাকে নামাজ পড়া বলা গেলেও নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কুরআন মাজীদে নামাজের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে, যেমন- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ [অর্থাৎ নামাজ অশ্লীল ও পাপ থেকে বিরত রাখে] তা এ নামাজ প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাজের আদবসমূহে যখন কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাজকে জায়েজ বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসাবে নামাজের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোনো কোনো অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করা : মর্দে-মু'মিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে যে রিজিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর রাহে খরচ করবে। আল্লাহর রাহে এ ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরিয়ত নির্ধারিত জাকাত-ফিতরা প্রভৃতি, নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারি, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত। মর্দে মু'মিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, أُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا অর্থাৎ এমনসব লোকই হলো সত্যিকার মু'মিন যাঁদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তাওহীদের রং আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবূ সাঈদ! আপনি কি মু'মিন? তখন তিনি বললেন, ভাই, ঈমান দু-প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোজখ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কিনা? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মু'মিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফালের আয়াতে যে মু'মিনে কামিল বা পরিপূর্ণ মু'মিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মু'মিন কিনা? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কিনা। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ্য যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মু'মিনর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- لَهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ এতে মু'মিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে- ১. সুউচ্চ মর্যাদা, ২. মাগফিরাত বা ক্ষমা এবং ৩ সম্মানজনক রিজিক। তাফসীরে বাহরে মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম- ১. সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন- ঈমান, আল্লাহভীতি, আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা। ২. যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন- নামাজ, রোজা প্রভৃতি। ৩. যার সম্পর্কে ধনসম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলির জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা কাজকর্মের জন্য 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন- নামাজ, রোজা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজে পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মানজনক রিজিক'-এর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্য। মু'মিন এ পথে যা ব্যায় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশি প্রাপ্ত হবে।

قَوْلُهُ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ الخ : এ সূরায় রয়েছে বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। আলোচ্য আয়াত থেকেই তার সূচনা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের সময় কোনো কোনো মুসলমান জিহাদের অভিযান পছন্দ করেননি; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রাসূলে কারীম ﷺ -কে জিহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তাঁরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যাঁরা ইতঃপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করেছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে কারীম এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত এই যে, আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ, যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তাফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হাইয়্যান (র.) এ ধরনের পনেরোটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনটি সম্ভাবনা প্রবল।

১. এ তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনিমতের মালামাল বণ্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবিক সবাই মহানবী ﷺ -এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জিহাদের প্রারম্ভে কারো কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফার্‌রা ও মুবার্‌রাদ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল কুরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মু'মিনদের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যম্ভাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে, তেমনভিাবে আখেরাতের ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। -[কুরতুবী]

৩. তৃতীয়ত এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবূ হাইয়্যান (র.) মুফাসসিরীনদের পনেরোটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনোটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একাদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোনো একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ [নাসারাকা] শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপূত ও পছন্দ হলো এবং যার সাথে তর্ক করেছিলাম সেও পছন্দ করল। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে كَمَا শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ ছিল এই যে, এ জিহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তার কোনো কিছুই নিজের মতে করেননি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং আল্লাহর হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহর আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়।

বদর যুদ্ধের ঘটনা : ইবনে আকাবাহ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট মদিনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবূ সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এ বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবনে আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোনো কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না, যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্‌কাল [সাড়ে চার মাশা] পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এ কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দিনার ছিল। দিনার হলো একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের বর্তমান দর অনুযায়ী এর মূল্য হয় বায়ান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমানে ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশি হতে পারে। এ বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার সর্দার, যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস ও মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এ বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এ পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুজুর ﷺ যখন সিরিয়া থেকে এ কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবিলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমজান মাস। যুদ্ধেরও কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুজুর ﷺ ও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারির ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁরা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সওয়ারি ছিল গ্রাম এলাকায়, তারা গ্রাম থেকে সওয়ারি এনে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মতো সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাঁদের কাছে এ মুহূর্তের সওয়ারি উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন; বাইরে থেকে সওয়ারি এনে নেবার মতো সময় এখন নেই। কাজেই হুজুর ﷺ -এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরি হতে পারলেন। বস্তুত যারা এ জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল। তা এই যে, মহানবী ﷺ এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোনো যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবিলা করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদের খুব বেশি পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী ﷺ 'বি'রে সুক্ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'সা'আ (রা.)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তেরো জন রয়েছে। মহানবী ﷺ এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালূতের সৈন্য সংখ্যাও এই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারি করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে অপর দুজন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ লুবাবাহ ও হযরত আলী (রা.)। যখন হুজুর ﷺ -এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসত তখন তারা বলতেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্‌লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত, না, তোমরা আমার চাইতে বেশি বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের ছওয়াবে

আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার ছওয়াবের সুযোগটি তোমাদের দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী ﷺ-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে -যোরকায়' পৌঁছে কোনো এক লোক কুরাইশ কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানকে এ সংবাদ জানিয়ে দিল যে রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন, তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবূ সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হিজাযের সীমানায় গিয়ে পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্‌দম ইবনে ওমরকে (ضَمْضَمُ ابْنُ عَمْرٍ) কুড়ি মিসকাল স্বর্ণ অর্থাৎ প্রায় ছয় হাজার টাকা মজুরি দিয়ে এ ব্যপারে রাজি করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

দম্‌দম্ ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনের ও পিছনের অংশ ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈচৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে পড়ল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোনো কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গমিমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধ অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোনো অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করেছিলেন, তাঁদেরকে এবং বনূ হাশিম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি এমন ধারণা হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাঁদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবূ তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক, এভাবে সব মিলিয়ে এ বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ ঘোড়া ছ'শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদিদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি সহ বদর অভিমুখে রওনা হলো। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো। অপরদিকে রাসূলে কারীম ﷺ শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবিলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমজান শনিবারে মদিনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌঁছে দুজন সাহাবীকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। -[তাফসীরে মাযহারী]

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা মহানবী পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে ! -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

বলা বাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূলে কারীম ﷺ সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেকদাদ (রা.) উঠে নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-কে। তারা বলেছিল- إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ 'যান, আপনি আপনার রব [পালনকর্তাই] গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম।' সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' নামক স্থান পর্যন্ত নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব।"

মহানবী ﷺ হযরত মেকাদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুজুরে আকরাম ﷺ -এর সাথে আনসারদের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদিনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদিনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী ﷺ সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এ জিহাদে মদিনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা? এ সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসাররা। হযরত সা'দ ইবনে মু'আয আনসারী (রা) হুজুর ﷺ -এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইবনে মু'আয (রা.) বললেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, যে কোনো অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে দীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে থেকে কোনো একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদের শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদের যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।"

এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং স্বীয় কাফলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দুটি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দুটি দল বলতে একটি হলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। [এ সমুদয় ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।]

ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার পর আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ মুসলমানদের একটি দল এ জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতে। অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। সাহাবায়ে কেরাম যদিও কোনো রকম নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না। কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতে গযওয়ায়ে বদরের ঘটনা এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সাহায্য ও বিশেষ অনুগ্রহ মুসলমানদের প্রতি হয়েছিল, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যখন এ সংবাদ জানতে পারেন যে, কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে, তখন মুসলমানদের সামনে ছিল দুটি দল। একটি হলো বাণিজ্যিক কাফেলা যাকে হাদীসে عِيْر [ঈর] বলা হয়েছে এবং অপরটি ছিল সুসজ্জিত সেনাদল যাকে نَفِيْر [নাফীর] নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথে যুক্ত সমস্ত মুসলমানদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এ দুটি দলের কোনো একটির উপর তোমাদের পরিপূর্ণ দখল লাভ হবে। ফলে তাদের ব্যাপারে যা খুশি তা করতে পারবে।

বলা বাহুল্য যে, বাণিজ্যিক কাফেলাটি হস্তগত করা ছিল সহজ ও ভয়হীন। আর সশস্ত্র বাহিনী হস্তগত করা ছিল কঠিন ও আশঙ্কাপূর্ণ। কাজেই এহেন অস্পষ্ট ওয়াদার কথা শুনে অনেক সাহাবীর কাম্য হয় যে, যে দলটির উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সেটি যেন নিরস্ত্র বাণিজ্যিক দলই হয়। কিন্তু আল্লাহর ইঙ্গিতে রাসূলে কারীম ﷺ ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবীর বাসনা ছিল যে, সশস্ত্র দলটির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই উত্তম হবে।

এ আয়াতে নিরস্ত্র দলের উপর বিজয় বা অধিকার প্রত্যাশী মুসলমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, তোমরা তো নিজেদের আরামপ্রিয়তা ও আশঙ্কামুক্ততার প্রেক্ষিতে নিরস্ত্র দলের উপর অধিকার লাভ করাই পছন্দ করছ, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলো ইসলামের আসল উদ্দেশ্য অর্জন। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের যথার্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং কাফেরদের মূল কর্তন। বলা বাহুল্য এটা তখনই হতে পারত, যখন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মোকাবিলা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয় ও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা হতো।

এর সারমর্ম হলো, মুসলমানদের এ বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া যে, তোমরা যে দিকটি পছন্দ করছে তা একান্ত কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও সাময়িক লাভের বিষয়। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো কিছুটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার খোদায়ী ক্ষমতার আওতা থেকে কোনো কিছু মুক্ত ছিল না; তিনি ইচ্ছা করলে বাণিজ্যিক কাফেলার উপরেও মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করে বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকেই রাসূলে কারীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার উপযোগী বিবেচনা করেছেন, যাতে সত্যের ন্যায়সঙ্গতা ও মিথ্যার অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তো মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত এবং সর্ব কর্মের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে অবগত। কাজেই তাঁর পক্ষ থেকে এহেন অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মাঝে এমন কি কল্যাণ নিহিত ছিল যে, দুটি দলের যে কোনো একটির উপর মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার লাভ হবে? তিনি তো যে কোনো একটির ব্যাপারে নির্দিষ্ট করেও বলতে পারতেন যে, অমুক দলের উপর অধিকার লাভ হয়ে যাবে? এই অস্পষ্টতার কারণ আল্লাহই জানেন। তবে মনে হয় এতে সাহাবায়ে কেরামকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা সহজ কাজটিকে পছন্দ করেন, নাকি কঠিন কাজকে। তাছাড়া এতে তাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতারও অনুশীলন ছিল। এভাবে তাঁদেরকে সৎসাহস ও উচ্চতর উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় কোনো রকম ভয় বা আশঙ্কা না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ, যা সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর ঘটেছিল। রাসূলে কারীম ﷺ যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গী মাত্র তিনশ তেরো জন, তাও আবার অধিকাংশই নিরস্ত্র, অথচ তাদের মোকাবিলায় রয়েছে এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী, তখন তিনি আল্লাহ জাল্লাশানহুর দরবারে সাহায্য ও সহায়তার জন্য প্রার্থনার হাত উঠালেন। তিনি দোয়া করছিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মহানবী ﷺ -এর প্রার্থনার নিম্নলিখিত বাক্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

'ইয়া আল্লাহ, আমার সাথে যে ওয়াদা আপনি করেছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন। ইয়া আল্লাহ, মুসলমানদের এ সামান্য দলটি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না [কারণ, গোটা বিশ্ব কুফরি ও শিরকিতে ভরে গেছে। এই কয়েকজন মুসলমানই আছে যারা ইবাদত-বন্দেগি সম্পাদন করে থাকে]।'

মহানবী ﷺ অনর্গল এমনিভাবে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দোয়ায় তন্ময় হয়ে থাকেন। এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে সে চাদর তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিশেষ চিন্তা করবেন না, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনার দোয়া কবুল করবেন এবং যে ওয়াদা তিনি করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

আয়াতে إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ বাক্যের দ্বারা এ ঘটনাই উদ্দেশ্য। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই সময়ের কথা মনে রাখার মতো, যখন আপনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করছিলেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করছিলেন। এ প্রার্থনাটি যদিও রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামও যেহেতু তাঁর সাথে 'আমীন আমীন' বলেছিলেন, তাই সমগ্র দলের সাথেই একে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর এ প্রার্থনা মঞ্জুরির বিষয়টি এমনভাবে বিবৃত হয়েছে– فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব, যারা একের পর এক করে কাতারবন্দী অবস্থায় আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাগণকে যে অসাধারণ শক্তি -সামর্থ্য দান করেছেন তার কিছুটা অনুমান করা যায় সেই ঘটনার দ্বারা, যা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে উল্টে দেওয়ার সময় ঘটেছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি মাত্র পাখার [ঝাপ্টার] মাধ্যমে তা উল্টে দিয়েছিলেন। কাজেই এহেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতাদের এত বিপুল সংখ্যককে এ মোকাবিলার জন্য পাঠানোর কোনোই প্রয়োজন ছিল না। একজনই যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থই অবগত–তারা যে সংখ্যার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই প্রতিপক্ষের সংখ্যানুপাতেই সমসংখ্যক ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন, যাতে তাঁদের মন পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়ে যায়!

চতুর্থ আয়াতেও একই বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ ত'আলা এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র এ জন্য করেছেন, যাতে তোমরা সুসংবাদপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়ে যায়।

গয্ওয়ায়ে বদরের সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সমস্ত ফেরেশতা সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল, এখানে তাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আলে ইমরানে তিন হাজার এবং পাঁচ হাজারেরও উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনটি ওয়াদার বিভিন্নতা, যা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। প্রথম ওয়াদাটি ছিল এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের যার কারণ ছিল মহানবী ﷺ -এর দোয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের ফরিয়াদ। দ্বিতীয় ওয়াদা, যা তিন হাজার ফেরেশতার ব্যাপারে করা হয় এবং যা ইতঃপূর্বে সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সেই সময় করা হয়েছিল, যখন মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, কুরাইশ বাহিনীর জন্য আরও বর্ধিত সাহায্য আসছে। রুহুল মা'আনী গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনযির কর্তৃক শা'বীর উদ্ধৃতিক্রমে উল্লেখ রয়েছে যে, বদরের দিনে মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, কুর্য ইবনে জাবের মুহারেবী মুশরিকদের সহায়তার উদ্দেশ্য আরো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। এ সংবাদে মুসলমানদের মাঝে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আলে ইমরানের আয়াত اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ অবতীর্ণ হয়। এতে তিন হাজার ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্য কল্পে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করার ওয়াদা করা হয়। আর তৃতীয় ওয়াদা ছিল পাঁচ হাজারের। তা ছিল এই শর্তাযুক্ত যে, বিপক্ষে দল যদি প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসে, তবে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য পাঠানো হবে। আর তা আলে ইমরানে উল্লিখিত পরবর্তী আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তাকওয়ার উপর স্থির থাক এবং যদি প্রতিপক্ষীয় বাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে, যারা বিশেষ চিহ্নে অর্থাৎ উর্দিতে সজ্জিত থাকবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এ ওয়াদার শর্ত ছিল তিনটি। ১. দৃঢ়তা অবলম্বন, ২. তাকওয়ার উপর স্থির থাকা এবং ৩. প্রতিপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ। প্রথম দুটি শর্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমনিতেই বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের এ আশায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু পার্থক্য আসেনি। কিন্তু তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ ব্যাপক আক্রমণের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়নি। কাজেই পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমনের প্রয়োজন হয়নি। আর সে জন্যই বিষয়টি এক হাজার ও তিন হাজারের মাঝেই সীমিত থাকে। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. তিন হাজার বলতে উদ্দেশ্য হলো প্রথমে প্রেরিত এক হাজারের সঙ্গে অতিরিক্ত দু হাজারকে অন্তর্ভুক্ত করে তিন হাজারে বর্ধিত করে দেওয়া, কিংবা ২. প্রথমোক্ত এক হাজারের বাইরে তিন হাজার পাঠানো।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, উক্ত তিনটি আয়াতে ফেরেশতাদের তিনটি দল প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি দলের সাথেই একেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। সূরা আনফালের যে আয়াতে এক হাজারের ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে مُرْدِفِيْنَ শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো পেছনে লাগোয়া। হয়তো এতে এ ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে, এদের পেছনে আরও ফেরেশতা আসবে। পক্ষান্তরে সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য مُنْزَلِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতারণ করা হবে। এতে একটি গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ব থেকে যেসব ফেরেশতা পৃথিবীতে অবস্থান করছেন, তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করার পরিবর্তে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ কাজের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতারণ করা হবে। বস্তুত সূরা আলেইমরানের দ্বিতীয় আয়াতে যেখানে পাঁচ হাজারের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের مُسَوِّمِيْنَ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা হবেন বিশেষ চিহ্ন এবং বিশেষ পোশাকে ভূষিত। হাদীসের বর্ণনায় তাই রয়েছে যে, বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের পাগড়ি ছিল সাদা, আর হুনাইনের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য আগত ফেরেশতাদের পাগড়ি ছিল লাল।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এতে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনোখান থেকে যে সাহায্যই আসুক না কেন, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপন, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তাঁরই আয়ত্তে রয়েছে ফেরেশতাদের সাহায্যও। সবই তাঁর আজ্ঞাবহ। অতএব, তোমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই ওয়াহদাহু লা-শরীক সত্তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকা কর্তব্য। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমতাশীল, হিকমতওয়ালা ও সুকৌশলী।

অনুবাদ :

١١. اُذْكُرْ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً اَمْنًا مِمَّا حَصَلَ لَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ مِنْهُ تَعَالٰى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالْجَنَابَاتِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَسْوَسَتَهٗ اِلَيْكُمْ بِاَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ مَا كُنْتُمْ ظَمَاءً مُحْدِثِيْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ عَلَى الْمَاءِ وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ بِالْيَقِيْنِ وَالصَّبْرِ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ اَنْ تَسُوْخَ فِي الرَّمْلِ.

১১. স্মরণ কর তিনি তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য অর্থাৎ যে ভীতি তোমাদের পেয়ে বসেছিল তা হতে স্বস্তিদানের জন্য আমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে হাদাছ অর্থাৎ বেঅজুজনিত নাপাকী ও জানাবাত অর্থাৎ গোসল ফরজজনিত নাপাকী হতে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের নিকট হতে শয়তান যে পাপের প্ররোচনা দেয় তা অর্থাৎ সে যে তোমাদেরকে কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা দেয় যে, তোমরা যদি সত্যপন্থি হতে তবে তোমাদেরকে এমন পিপাসার্ত ও অজুহীন থাকতে হতো না আর মুশরিকরা এ ধরনের পর্যাপ্ত পানি পেত না, সেই কুমন্ত্রণার পাপ অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় প্রত্যয় ও ধৈর্যধারণের মাধ্যমে দৃঢ় করার জন্য, সত্যের উপর দৃঢ় বাধনে বেঁধে রাখার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। অর্থাৎ বালিতে যেন তা ঢুকে না যায় তজ্জন্য ঐ ব্যবস্থা করেন।

١٢. اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰۤئِكَةِ الَّذِيْنَ اَمَدَّ بِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ اَنِّيْ اَيْ بِاَنِّيْ مَعَكُمْ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط بِالْاِعَانَةِ وَالتَّبْشِيْرِ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ الْخَوْفَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ اَيِ الرُّؤُوْسِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اَيْ اَطْرَافَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْصِدُ ضَرْبَ رَقَبَةِ الْكَافِرِ فَتَسْقُطُ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ سَيْفُهٗ اِلَيْهِ وَرَمَاهُمْ ﷺ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْحَصٰى فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ اِلَّا دَخَلَ فِيْ عَيْنَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَهُزِمُوْا.

১২. স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি অর্থাৎ যাদেরকে তিনি মুসলিমদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে সাহায্য-সহযোগিতাসহ اَنِّيْ এটা এ স্থানে بِاَنِّيْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে রয়েছি, সুতরাং মু'মিনদেরকে সাহায্য ও সুসংবাদ দান কর ও অবিচলিত রাখ; যারা কুফরি করেছে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে দেব। সুতরাং তাদের ঘরের উপর অর্থাৎ মস্তক দেশে এবং সর্বাঙ্গে আঘাত কর। اَلرُّعْبُ। অর্থ ভয়, ভীতি। بَنَانٌ অর্থ হাত ও পায়ের অগ্রভাগ। এর ফলে এমন হয়েছিল যে, কোনো মু'মিন কোনো একজন কাফেরকে মারতে চাইলে তার স্কন্ধে তলোয়ারের আঘাত লাগার পূর্বেই সে মাথা কেটে পড়ে যেত। তদুপরি রাসূল ﷺ ঐ সময় কাফেরদের প্রতি এক মুঠি নুড়ি নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রতি কাফেরেরই চক্ষে গিয়ে তা পড়েছিল। ফলে পরাজিত হয়।

١٣. ذٰلِكَ الْعَذَابُ الْوَاقِعُ بِهِمْ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا خَالَفُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهٗ ـ

১৩. এটা অর্থাৎ তাদের উপর আপতিত এ শাস্তি এই হেতু যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দানে কঠোর। شَاقُّوْا অর্থ তারা বিরোধিতা করে।

١٤. ذٰلِكُمْ الْعَذَابُ فَذُوْقُوْهُ اَىْ اَيُّهَا الْكُفَّارُ فِى الدُّنْيَا وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابَ النَّارِ ـ

১৪. এই শাস্তি। সুতরাং হে কাফেরগণ! দুনিয়ায় তোমরা এটার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফেরগণের জন্য পরকালে রয়েছে অগ্নির শাস্তি।

١٥. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا اَىْ مُجْتَمِعِيْنَ كَاَنَّهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ يَزْحَفُوْنَ فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ مُنْهَزِمِيْنَ ـ

১৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সমাবেশের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। زَحْفًا অর্থ ভিড়, সমাবেশ, এত ভিড় যে সংখ্যাধিক্যেয় দরুন সকলকেই যেন নিতম্ব ছেচড়িয়ে চলতে হচ্ছে। زَحْفٌ ছেচড়িয়ে চলা।

١٦. وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ لِقَائِهِمْ دُبُرَهٗ اِلَّا مُتَحَرِّفًا مُنْعَطِفًا لِقِتَالٍ بِاَنْ يُّرِيَهُمُ الْفَرَّةَ مَكِيْدَةً وَهُوَ يُرِيْدُ الْكَرَّةَ اَوْ مُتَحَيِّزًا مُنْضَمًّا اِلٰى فِئَةٍ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْتَنْجِدُ بِهَا فَقَدْ بَآءَ رَجَعَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِىَ وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ بِمَا اِذَا لَمْ يَزِدِ الْكُفَّارُ عَلَى الضِّعْفِ ـ

১৬. সেদিন অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধে সম্মুখীন হওয়ার দিন যুদ্ধকৌশল ফিরিয়া আক্রমণের কৌশল অবলম্বন যেমন শত্রুদের দেখাল যে পলায়ন করছে অথচ তার ইচ্ছা হলো তাদেরকে কৌশলে অসতর্ক করে পুনরায় আক্রমণ করা কিংবা স্বীয় দলে অর্থাৎ সাহায্য লাভের জন্য মুসলিম জামাতে স্থান নেওয়া একত্রে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত যে-কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল সে আল্লাহর বিরাগভাজন হলো। তাঁর ক্রোধে নিপতিত হয়ে ফিরল। তার আবাস হলো জাহান্নাম; আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। কাফেরগণ যদি সংখ্যায় মুসলিমদের দ্বিগুণ না হয় তবেই কেবল এ বিধান প্রযোজ্য। بَآءَ -অর্থ প্রত্যাবর্তন করল। اَلْمَصِيْرُ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٧. فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ بِبَدْرٍ بِقُوَّتِكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ص بِنَصْرِهِ اِيَّاكُمْ وَمَا رَمَيْتَ يَا مُحَمَّدُ اَعْيُنَ الْقَوْمِ اِذْ رَمَيْتَ بِالْحَصٰى لِاَنَّ كَفًّا مِنَ الْحَصَا لَا يَمْلَأُ عُيُوْنَ الْجَيْشِ الْكَثِيْرِ بِرَمْيَةِ بَشَرٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ج بِاِيْصَالِ ذٰلِكَ اِلَيْهِمْ فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَقْهَرَ الْكٰفِرِيْنَ وَلِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً عَطَاءً حَسَنًا ط هُوَ الْغَنِيْمَةُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِهِمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِهِمْ ـ

১৭. বদর ময়দানে তোমরা তোমাদের শক্তিতে তাদেরকে বধ করনি, আল্লাহই তোমাদেরকে সাহায্য করত তাদেরকে বধ করেছেন। হে মুহাম্মদ! তুমি যখন কাফের সম্প্রদায়ের চোখে নুড়ি নিক্ষেপ করেছিল তখন মূলত তুমি নিক্ষেপ করনি কেননা একজন মানুষের এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ দ্বারা এত বিরাট এক বাহিনীর সকলের চক্ষু ভরে যাওয়া কখনো সম্ভব নয়; সুতরাং সকলের চোখে তা পৌছিয়ে দিয়ে তা আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। এরূপ করা হয়েছিল কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য এবং মু'মিনগণকে উত্তম প্রতিদান পুরস্কার অর্থাৎ গনিমত সামগ্রী প্রদানের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সকল কথা শ্রবণকারী এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খুবই অবহিত।

١٨. ذٰلِكُمُ الْاِبْلَاءُ حَقٌّ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ مُضْعِفُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

১৮. এই পুরস্কার প্রদান সত্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন। مُوْهِنُ অর্থ যিনি দুর্বল করেন।

١٩. اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا اَيُّهَا الْكُفَّارُ تَطْلُبُوا الْفَتْحَ اَىِ الْقَضَاءَ حَيْثُ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ مِنْكُمْ اَللّٰهُمَّ اَيُّنَا كَانَ اَقْطَعَ لِلرَّحِمِ وَاَتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ فَاحِنْهُ الْغَدَاةَ اَىْ اَهْلِكْهُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ج الْقَضَاءُ بِهَلَاكِ مَنْ هُوَ كَذٰلِكَ وَهُوَ اَبُوْ جَهْلٍ وَمَنْ قُتِلَ مَعَهُ دُوْنَ النَّبِىِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ تَنْتَهُوْا عَنِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَاِنْ تَعُوْدُوْا لِقِتَالِ النَّبِىِّ نَعُدْ ج لِنَصْرِهِ عَلَيْكُمْ وَلَنْ تُغْنِىَ تَدْفَعَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ جَمَاعَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِكَسْرِ اِنْ اِسْتِئْنَافًا وَفَتْحِهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ ـ

১৯. হে কাফেরগণ, তোমরা ফাত্হ চেয়েছিলে ফাত্হ অর্থাৎ মীমাংসা তলব করেছিলে। এ হিসাবেই তোমাদের মধ্য হতে বদর যুদ্ধের পূর্বের দিন কুরাইশ সর্দার আবূ জাহল বলেছিল, হে আল্লাহ! আমরা এ উভয় দলের মধ্যে যে দল অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং যে ব্যক্তি অসত্যের প্রচলনকারী তাদেরকে আগামী ভোরে ধ্বংস কর। ফাত্হ তো অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের নয়; বরং আবূ জাহল ও তার সঙ্গীদের বধ করত ঐরূপ দল ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে ঐ মীমাংসা তো তোমাদের নিকট এসেছে। যদি তোমরা কুফরি ও যুদ্ধ হতে বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তোমরা রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও তাকে তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্যে প্রদানের পুনরাবৃত্তি করব। তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, কোনো উপকারে আসবে না। আর আল্লাহ মু'মিনদের সাথেই রয়েছেন। فِئَتُكُمْ অর্থ তোমাদের দল। اِنَّ اللّٰهَ এটা مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নব গঠিত বাক্যরূপে বিবেচিত হলে হামযায় কাসরাসহ (اِنْ) আর এর পূর্বে একটি (لِ) উহ্য ধরা হলে ফাতাহসহ (اَنْ) পঠিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذْ يُغَشِّيْكُمْ : এটা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের ظَرْف হয়েছে অথবা পূর্ববর্তী اِذْ يَعِدُكُمْ হতে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْنًا : اَمَنَةً -এর তাফসীর اَمْنًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَمَنَةً-এটা মাসদার বলা হয় اَمَنَةً، اَمْنًا، اَمَانَةً বহুবচন নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। আর اَمَنَةً টা يُغَشِّيْكُمْ-এর مَفْعُوْل لَهٗও হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রশান্তির জন্য তোমাদের উপর তন্দ্রা ঢেলে দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ مِنْهُ : مِنْهُ -এর যমীর আল্লাহর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ بِهٖ : অর্থাৎ بِالْمَاءِ

قَوْلُهُ اَنْ تَسُوْخَ : অর্থাৎ مِنْ اَنْ تَسُوْخَ তথা تَدْخُلَ

قَوْلُهُ لَهٗ : প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) لَهٗ উহ্য মানলেন কেন?

উত্তর. مَنْ হলো مُبْتَدَأ যা شَرْط -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ বাক্য হয়ে মুবতাদার খবর। আর খবর যখন বাক্য হয় তখন তাতে একটি যমীর عَائِدْ থাকা জরুরি হয়, যা এখানে নেই। এ কারণেই মুফাসসির (র.) لَهٗ -কে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ الْعَذَابُ : ذَالِكُمْ হলো মুবতাদা আর اَلْعَذَابُ তার খবর যা উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) اَلْعَذَابُ উহ্য মেনে এ তারকীবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর ইসমে ইশারা ذَالِكُمْ -কে উহ্য মুবতাদার খবরও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ اَلْعَذَابُ ذَالِكُمْ কাজেই ذَالِكُمْ فَذُوْقُوْهُ-এর মধ্যে اِنْشَاءٌ -এর খবর হওয়ার আপত্তি শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ فَذُوْقُوْهُ : এখানে فَاءٌ হলো شَرْطِيَّةٌ আর ذُوْقُوْهُ উহ্য শর্তের جَزَاءٌ অর্থাৎ اِنْ كَانَ كَذَالِكَ فَذُوْقُوْهُ

قَوْلُهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ : এর আতফ হয়েছে ذَالِكَ -এর উপর এবং وَاعْلَمُوْا উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبٌও হতে পারে।

قَوْلُهُ زَحْفًا : এটা বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। অর্থ- ভিড়ের কারণে আস্তে আস্তে চলা, বাচ্চার মতো হামাগুড়ি দেওয়া, সরানো।

قَوْلُهُ مُتَحَرِّفًا مُنْعَطِفًا : চক্কর মেরে আক্রমণ করা। অর্থাৎ اَلْكَرُّ بَعْدَ الْفَرِّ

قَوْلُهُ مُتَحَيِّزٌ : এটা বাবে تَفَعُّلٌ থেকে ইসমে ফায়েল -এর সীগাহ। অর্থ- প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় কালের দিকে আগমনকারী। যাতে করে সাথীদের সাহায্য নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে। মূলবর্ণ হলো حَوْزٌ

قَوْلُهُ يَسْتَنْجِدُ : اِسْتِنْجَادٌ অর্থ হলো- সাহায্য প্রার্থনা করা।

قَوْلُهُ هِيَ : এটা مَخْصُوْص بِالذَّمِ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ : এখানে فَاءٌ টা হলো جَزَائِيَّةٌ এটা উহ্য شَرْطٌ ; উহ্য ইবারত হলো- اِنِ افْتَخَرْتُمْ بِقَتْلِهِمْ فَاَنْتُمْ لَمْ تَقْتُلُوْهُمْ

قَوْلُهُ لِيُبْلِيَ : অর্থাৎ يُعْطِي اللّٰهُ تَعَالٰى الْمُؤْمِنِيْنَ اِعْطَاءً حَسَنًا

قَوْلُهُ حَقٌّ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ذَالِكُمُ الْاِبْلَاءُ হলো মুবতাদা حَقٌّ হলো উহ্য খবর

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলার সে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়েবদরের ঘটনাগুলো সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গওয়ায়েবদরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল। এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা وَاِذْ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নিয়ামত হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নিয়ামত দোয়ার মঞ্জুরি ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দুটি নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেওয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্বপ্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কায় কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয়, যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাঁদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কুরআনে কারীম এ যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى -এর সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

রাসূলে কারীম ﷺ প্রথম যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি ... নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোনো অধিকার নেই, নাকি শুধুমাত্র নিজের মতে ও

যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী ﷺ তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির জায়গাটি মুসলমানদের অধিকার নিয়ে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য কোনো একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারিগুলোও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তাবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি খোদানাখাস্তা অন্য কোনো অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারিতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, যারা মদিনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আপনার মদিনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসিজ্জত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদিনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী ﷺ তাঁর এ বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। তাতে মহানবী ﷺ এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মু'আয (রা.) তাঁদের হেফাজতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তেরো জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবিলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানি ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল। কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারাণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যাপৃত রয়েছ। অথচ সব দিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোনো প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেজ হাদীস আবূ ইয়ালা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তযা (রা.) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে এমন কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রাসূলে কারীম ﷺ সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাজে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নিচে তাহাজ্জুদ নামাজে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখে সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, হে আবূ বকর! সুসংবাদ শুন এই যে জিবরাইল (আ.) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবূ জাহলের হত্যা স্থান, এটা অমুকের, সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে। -[তাফসীরে মাযহারী] আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান ছওরী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাজের সময় ঘুম আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এ রাতে মুসলমানরা দ্বিতীয় যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গণের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর বৃষ্টি এখানে অল্প হয়, যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে এ দুটি নিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে– ১ নিদ্রা ও ২. বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিচিত্ত মন থেকে সে সমস্ত শয়তানি ওয়াসওয়াসা ধুয়ে-মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদের প্রশান্তি দান করার জন্য; যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গণে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুত তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের মার দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদের দুটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমত মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফেরেশতা কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করা কিংবা তাঁদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। যাহোক, তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতারা নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈব ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তাফসীরে দুররে মানসূর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফ্ফার কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ তা'আলার সুকঠিন আজাব। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাজিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি, অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আজাব নাজিল করে তাদেরই অসদাচরণের যৎসামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে– ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ এটা হলো আমার যৎসামান্য আজাব; এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরে কাফেরদের জন্য আরো আজাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : উল্লিখিত আয়াতের প্রথম দুটিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে زَحْفٌ শব্দের মর্মার্থ হলো, উভয় বাহিনীর মোকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে এ হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং নাজায়েজ পন্থায় পালনকারীদের সুকঠিন আজাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে– اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েজ রয়েছে। **প্রথমত** যুদ্ধেক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কবাস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্যে। এটাই হলো اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ-এর অর্থ। কারণ, تَحَرُّفٌ অর্থ হয় কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়া। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

দ্বিতীয়ত বিশেষ কোনো অবস্থা যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে। তা হলো এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা রোধ করে সেজন্য পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদরা অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয় أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ-এর অর্থ তাই। কারণ تَحَيُّزٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَةٌ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েজ। এই স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এ স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে- فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায়, তারা আল্লাহ তা'আলার গজব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর সেটি হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দুটির দ্বারা এ নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে যতই বেশিই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবিলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দুটি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হলো এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্যে হবে না; বরং তা হবে পাঁয়তারা পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাজিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোনো তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েজ নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ তেরো জনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এ হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাজিল করা হয়। ৬৫ তম আয়াতে বিশজন মুসলমানকে দু'শ কাফেররের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়। তারপর ৬৬তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয় اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ، فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এ বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ হয় তবে তারা দু'শ কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েজ নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ত্যাগ করা জায়েজ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবিলা থেকে পালিয়ে যায়, তার পলায়ন পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দুজনের মোকাবিলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে। –[রূহুল বায়ান] এখন এ হুকুমই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরিয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গুনাহে কবীরা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলে বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কুরআনে করীম একটি শয়তানি পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলিল। ইরশাদ হয়েছে اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদিনায় এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী ﷺ অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন- بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَاَنَا فِئَتُكُمْ অর্থাৎ "তোমরা পলাতক নও; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী ﷺ এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার

করে দিয়েছেন যে, তাঁদের পালিয়ে এসে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত, যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতি ও মহত্ত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এ বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করেছিলেন।

তৃতীয় আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর, যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জারীর, তাবারী, হযরত বায়হাকী (র.) প্রমুখ মনীষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন।" –[রূহুল বয়ান] তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ] আপনি একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে হাতেম হযরত ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ তিনবার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রু বাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্টি কাঁকরকে আল্লাহ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকি ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রু বাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এ সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে; ফেরেশতারা পৃথকভাবে তাঁদের যুদ্ধে শরিক ছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, রূহুল বয়ান]

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর বাকি সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমনারা এ মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের কাছে নিজের নিজের কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাজিল হয়– فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ আয়াত। এতে তাঁদেরকে হেদায়েত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি বরং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, স্বয়ং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাব হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ گفت حق

کار ما بر کارها دارد سبق

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতে অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি, যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণত বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ আমি মু'মিনদের এ মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। بَلَاءٌ শব্দের শব্দগত অর্থ হলো পরীক্ষা। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা কখনো বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে হয়। بَلَاءٌ حَسَنٌ বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধনসম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কারও গর্বাহংকারের কোনো অবকাশ নেই।

চতুর্থ আয়াতে এর পাশাপাশি এ বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ মুসলমানদের এ বিজয় এ কারণেও দেওয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় এবং যাতে কাফেররা এ কথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোনো কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কুরাইশী কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশী বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেওয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবূ জাহল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিল–

"ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশি হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশি ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান কর।" –[মাযহারী]

এই নির্বোধরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এ দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা এ কথা জানত না যে, এ দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কুরআনে কারীম তাদের বাতলে দিল إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরিজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। إِن تَعُودُوا نَعُدْ আর তোমরা যদি আবারো নিজেদের দুষ্টুমি ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাবে। وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মোকাবেলায় তা তোমাদের কোনো কাজেই লাগবে না। وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোনো দল তোমাদের কিইবা কাজে লাগতে পারে?

অনুবাদ :

٢٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا تُعْرِضُوْا عَنْهُ بِمُخَالَفَةِ اَمْرِهٖ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَالْمَوَاعِظَ ـ

২০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তোমরা যখন কুরআন ও উপদেশাবলি শ্রবণ করছ তখন তাঁর নির্দেশবালির বিরুদ্ধাচরণ করত তা হতে বিমুখ হয়ো না।

٢١. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَّاتِّعَاظٍ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ ـ

২১. এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা বলে 'শ্রবণ করলাম' অথচ তারা চিন্তা-গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য শ্রবণ করে না। এরা হলো মুনাফিক ও মুশরিকগণ।

٢٢. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ عَنْ سِمَاعِ الْحَقِّ الْبُكْمُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ

২২. আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব হলো সত্য বিষয় শ্রবণ করা সম্পর্কে যারা বধির এবং সত্য কথা বলা হতে যারা মূক, যারা কিছুই বুঝে না।

٢٣. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا اِصْلَاحًا بِسِمَاعِ الْحَقِّ لَاَسْمَعَهُمْ ط سِمَاعَ تَفَهُّمٍ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ فَرْضًا وَقَدْ عَلِمَ اَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِمْ لَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ عَنْ قَبُوْلِهٖ عِنَادًا وَجُحُوْدًا ـ

২৩. আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে বলে অর্থাৎ সত্য সম্পর্কে শ্রবণ করত কল্যাণ লাভের যোগ্যতা আছে বলে জানতেন তবে তাদেরকেও তিনি নিশ্চয় বুঝবার কানে শুনাতেন। কিন্তু এদের মাঝে ভালো কিছু নেই জানো যদি তাদেরকে তিনি শুনাতেন তবে তারা তা উপেক্ষা করে জিদ ও অস্বীকার করার প্রবণতা বশত তা গ্রহণ করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিত।

٢٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ بِالطَّاعَةِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ج مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ لِاَنَّهٗ سَبَبُ الْحَيَاةِ الْاَبَدِيَّةِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ فَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّؤْمِنَ اَوْ يَكْفُرَ اِلَّا بِاِرَادَتِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ ـ

২৪. হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে ধর্ম বিষয়ে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে আর ইসলাম ধর্মই মানুষকে অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী জীবনদানের চাবিকাঠি তখন আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে। জেনে রাখ! আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করেন সুতরাং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একজন মুমিনও হতে পারে না বা কাফেরও হতে পারে না। এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।

٢٥. وَاتَّقُوْا فِتْنَةً اِنْ اَصَابَتْكُمْ لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ج بَلْ تَعُمُّهُمْ وَغَيْرُهُمْ وَاتِّقَاؤُهَا بِاِنْكَارِ مُوْجِبِهَا مِنَ الْمُنْكَرِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ.

২৫. তোমরা এমন এক আজাব ও শাস্তি সম্পর্কে সাবধান হও যে তা যদি তোমাদের উপর আপতিত হয় তবে বিশেষ করে যারা সীমালঙ্ঘনকারী কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না বরং এরা এবং অন্য সকলের উপরই তা ব্যাপকভাবে এসে নিপতিত হবে। জেনে রাখ যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদানে অতি কঠোর। উক্ত শাস্তি হতে বাঁচার উপায় হলো তার মূল কারণ পাপকার্য হতে বিরত থাকা ও তা নিষেধ করা।

٢٦. وَاذْكُرُوْآ اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مَكَّةَ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ يَأْخُذُكُمُ الْكُفَّارُ بِسُرْعَةٍ فَاٰوٰكُمْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاَيَّدَكُمْ قَوَّاكُمْ بِنَصْرِهٖ يَوْمَ بَدْرٍ بِالْمَلٰئِكَةِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ الْغَنَائِمِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعَمَهُ.

২৬. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ মক্কা ভূমিতে তোমরা ছিলে দুর্বলরূপে গণ্য; আশঙ্কা করত লোকেরা অর্থাৎ কাফেরগণ তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আকস্মাৎ অতি দ্রুত ধরে নিয়ে যাবে: অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মদিনায় আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতাগণ দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং পবিত্র বস্তু হতে اَيَّدَكُمْ অর্থ তিনি তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন। অর্থাৎ গনিমত ও জেহাদলব্ধ সম্পদ হতে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন; যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٢٧. وَنَزَلَ فِىْ اَبِىْ لُبَابَةَ مَرْوَانِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَقَدْ بَعَثَهُ ﷺ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ لِيَنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِهٖ فَاسْتَشَارُوْهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنَّهُ الذَّبْحُ لِاَنَّ عِيَالَهُ وَمَالَهُ فِيْهِمْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَلَا تَخُوْنُوْآ اَمٰنٰتِكُمْ مَا اؤْتُمِنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

২৭. রাসূল ﷺ মদিনার বনূ কুরাইযা নামক ইহুদিগোত্রকে তাদের বিশ্বাসভঙ্গের কারণে অবরোধ করে রেখেছিলেন। ঐ সময়ে একবার তিনি সাহাবী আবূ লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযিরকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন যেন তারা তাঁর নির্দেশ অনুসারে আত্মসমর্পণ করে। তখনো আবূ লুবাবার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পত্তি তাদের [ইহুদিদের] মহল্লার কাছেই ছিল। তাই এরা তার নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ চাইলে তিনি গলার দিকে ইশারা করে দেখালেন যে, আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে জবাই করে ফেলা হবে। [কিন্তু এটা গোপন করে রাখার কথা ছিল।] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের গচ্ছিত বিষয়াদি সম্পর্কেও অর্থাৎ ধর্ম বা অন্য যে সমস্ত বিষয়াদি তোমাদের নিকট আমানত হিসাবে সেই সম্পর্কে খেয়ানত করো না।

٢٨. وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا لَكُمْ صَادَّةٌ عَنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ فَلَا تُفَوِّتُوْهُ بِمُرَاعَاةِ الْاَمْوَالِ

২৮. এবং জেনে রাখ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি একটি পরীক্ষাবিশেষ। এরা পরকাল গঠনের আমল হতে বাধা দিয়ে রাখে। আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা প্রতিদান। সুতরাং বিত্ত-বৈভব ও সন্তানসন্ততির লক্ষ্য করতে গিয়ে এবং তাদের জন্য খেয়ানত কর্মে লিপ্ত হয়ে তা হারিয়ে

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعْرِضُوا : এখানে تَوَلَّوْا-এর তাফসীর تُعْرِضُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, تَوَلَّوْا-এর মধ্যে একটি تَاءْ উহ্য রয়েছে যা مُضَارِعْ -এর সীগাহ; مَاضِىْ -এর সীগাহ নয়। কাজেই এ প্রশ্নও শেষ হয়ে গেলে যে, مَاضِىْ-এর উপর لَا -কে تَكْرَارْ নেওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ لَا يَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ اَلْحَقَّ

قَوْلُهُ قَدْ عَلِمَ اَنْ لَّا خَيْرَ فِيْهِمْ : এ বৃদ্ধিকরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি আপত্তির নিরসন করা। আপত্তি হলো উল্লিখিত আয়াতে لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। যার ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, আর এটা অসম্ভব।

প্রশ্ন. لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ হলো ফলাফল বের হবে لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا অর্থাৎ যদি তাদের মধ্যে আল্লাহর ইলমে কোনো কল্যাণ হতো তবে সে নিশ্চয়ই ফিরে যেত। আর এটা مُحَالْ বা অসম্ভব।

উত্তর. বিশুদ্ধ ফলাফলের জন্য حَدْ اَوْسَطْ একই রকম হওয়া জরুরি। এখানে حَدْ اَوْسَطْ বিভিন্ন ধরনের হয়েছে। কেননা এখানে প্রথম اِسْمَاعْ দ্বারা سِمَاعْ فِيْهِمُ الْمُوْجِبُ لِلْهِدَايَةِ উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় اِسْمَاعْ দ্বারা اِسْمَاعْ مُجَرَّدْ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اِنْ اَصَابَتْكُمْ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ الخ উহ্য شَرْط-এর জবাব এবং এর দ্বারা সে সকল লোক জনের জবাব দেওয়া হয়েছে যারা বলে যে, لَا تُصِيْبَنَّ এটা فِتْنَةً-এর সিফত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বদর যুদ্ধের যে সমস্ত ঘটনা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মুসলমান ও কাফের উভয়ের জন্যই বহু তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ঘটনার মধ্যভাগে সেগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণত বিগত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের বিবরণ দেওয়ার পর বলা হয়েছে- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান জমিনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে কিংবা আল্লাহর না-ফরমানি করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লিখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিকে মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো এই যে, মুসলমানরা তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হলো আল্লাহর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ "ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে- وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ কুরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেওয়ার পরেও তোমরা আনুগত্য বিমুখ হয়ো না।

শুনে নেওয়ার অর্থ সত্য বিষয়টি শুনে নেওয়া। শোনার চারটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে- ১. কোনো কথা কানে নিল সত্য, কিন্তু না বুঝতে চেষ্টা করল, না বুঝল এবং নাই-বা তাতে বিশ্বাস করল আর না সে মতে আমল করল। ২. কানে শুনল এবং তা বুঝলও, কিন্তু না করল তাতে বিশ্বাস, না করল আমল। ৩. শুনল, বুঝল এবং বিশ্বাসও করল, কিন্তু তাতে আমল করল না। ৪. শুনল, বুঝল বিশ্বাস করল এবং সেমতে আমলও করল।

বলা বাহুল্য, শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় শুধুমাত্র চতুর্থ পর্যায়ে যা পরিপূর্ণ মু'মিনদের স্তর। বস্তুত প্রাথমিক তিনটি পর্যায়ে শ্রবণ থাকে অসম্পূর্ণ। কাজেই এ রকম শোনাকে একদিক দিয়ে না শোনাও বলা যেতে পারে, যা পরবর্তী আয়াতে আলোচিত হবে। যাহোক, তৃতীয় পর্যায়ে শ্রবণ, যাতে সত্যকে শোনা, বোঝা এবং বিশ্বাস বর্তমান থাকলেও তাতে আমল নেই।

এতে যদিও শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, কিন্তু বিশ্বাসেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাও সম্পূর্ণভাবে বেকার যাবে না, এ স্তরটি হলো গুনাহগার মুসলমানদের স্তর। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাতে শুধু শোনা ও বুঝা বিদ্যমান, কিন্তু না আছে তাতে বিশ্বাস, না আছে আমল– এটা মুনাফিকদের স্তর। এরা কুরআনকে শুনে, বুঝে এবং প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাস ও আমলের দাবিও করে, কিন্তু বাস্তবে তা বিশ্বাস ও আমলহীন। আর প্রথম পর্যায়ের শ্রবণ হলো কাফের-মুশরিকদের, যারা কুরআনের আয়াতগুলো কানে শুনে সত্যই, কিন্তু কখনও তা বুঝতে কিংবা তা নিয়ে চিন্তা করার প্রতি লক্ষ্য করে না।

উল্লিখিত আয়াতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সত্য কথা শুনছ, বুঝছ এবং তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসও রয়েছে, কিন্তু তারপর তাতে পুরোপুরিভাবে আমল কর, আনুগত্যে অবহেলা করো না। তাই শ্রবণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়েই অধিকতর তাগিদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা মুখে একথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কিছুই শোনেনি। সে সমস্ত লোক বলতে উদ্দেশ্য হলো সাধারণ কাফেরকুল, যারা শোনার দাবি করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবি করে না এবং এতে মুনাফিকও উদ্দেশ্য যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবিদার। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে চিরদিন সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কাজেই তাদের এ শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদের এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কুরআনে কারীম চতুষ্পদ জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। ইরশাদ করেছে– إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

الدواب শব্দটি دابة -এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী জমিনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীকেই [illegible] বলা হয়, কিন্তু সাধারণ [illegible] প্রচলন ও পরিভাষায় دَابَّةٌ বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীব তুল্য, যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মূক। বস্তুত মূক ও বধিরদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মূক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলা বাহুল্য, যে মূক-বধির বুদ্ধি বিবর্জিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বোঝবার কোনোই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব] দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এ যাবতীয় ইনাম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এ সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তাফসীরে রূহুল-বায়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয় তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন। কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোনো রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি কোনো রকম কল্যাণ থাকত, তবে তা আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ তা'আলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণের চিন্তা তথা সৎচিন্তা নেই, [illegible] তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এ প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি

মুখ ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ তাদের এ বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দীনের মধ্যে কোনো আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোনো লক্ষ্যই করেনি।

এ বিবৃতির দ্বারা সেই তার্কিক সন্দেহটি দূর হয়ে যায়, যা শিক্ষিত লোকদের মনে উদয় হয়। তা হলো এই যে, একটা কিয়াসের শেক্‌লে-আউয়াল। এর মধ্যে থেকে হদ্দে আওসাতকে ফেলে দিলে ভুল ফলোদয় হয়। তার উত্তর এই যে, এখানে হদ্দে আওসাতের পুনরাবৃত্তি নেই। কারণ, এখানে প্রথমোক্ত لَأَسْمَعَهُمْ এবং দ্বিতীয় أَسْمَعَهُمْ -এর মর্ম পৃথক পৃথক। প্রথমোক্ত سَمَاعٌ [শ্রবণ] বলতে গ্রহণসহ শ্রবণ ও উপকারী শ্রবণ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় سَمَاعٌ [শ্রবণ] বলতে শুধু নিষ্ফল শ্রবণ বুঝানো হয়েছে।

পঞ্চম আয়াতে পুনরায় ঈমানদারদের সম্বোধন করে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন ও তাঁদের আনুগত্যের প্রতি এক বিশেষ ভঙ্গিতে হুকুম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের যেসব বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, তাতে আল্লাহ ও রাসূলের নিজস্ব কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, বরং সমস্ত হুকুমেই তোমাদের কল্যাণ ও উপকারার্থে দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে– اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের কথা মান, যখন রাসূল তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যা তোমাদের জন্য সঞ্জীবক।

এ আয়াতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, তাতে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই কারণেই তাফসীরকার আলেমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন। আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেছেন, সেই সঞ্জীবক বস্তুটি হলো ঈমান। কারণ, কাফেররা হলো মৃত। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, সেটি কুরআন, যাতে দুনিয়া এবং আখেরাতে জীবন ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুজাহিদের মতে তা হলো সত্য। ইবনে ইসহাক বলেন যে, সেটি হচ্ছে 'জিহাদ' যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত এ সমুদয় সম্ভাবনাই স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ। এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ 'ঈমান', 'কুরআন' অথবা 'সত্যানুগত্য, প্রভৃতি এমনই বিষয় যা দ্বারা মানুষের আত্মা সঞ্জীবিত হয়। আর আত্মার জীবন হলো বান্দা ও আল্লাহর মাঝে শৈথিল্য ও রিপু প্রভৃতির যে সমস্ত যবনিকা অন্তরায় থাকে সেগুলো সরে যাওয়া এবং যবনিকার তমসা কেটে গিয়ে নূরে মা'রেফাতে নূর -এ স্থান লাভ।

তিরমিযী ও নাসায়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন রাসূলে কারীম ﷺ উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তখন উবাই ইবনে কা'আব (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে হুজুর ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন। হুজুর ﷺ বললেন, আমার ডাক সত্ত্বেও আসতে দেরি করলে কেন? হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) নিবেদন করলেন, আমি নামাজে ছিলাম। হুজুর ﷺ বললেন, তুমি اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ আল্লাহ তা'আলার বাণীটি শোননি? উবাই ইবনে কা'আব (রা.) নিবেদন করলেন, আগামীতে এরই অনুসরণ করব, নামাজের অবস্থায়ও যদি আপনি ডাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ফুকাহা বলেছেন, রাসূলের হুকুম পালন করতে গিয়ে নামাজের মধ্যে যে কোনো কাজই করা হোক, তাতে নামাজে ব্যাঘাত ঘটে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদিও নামাজের পরিপন্থি কাজ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে তা কাজা করতে হবে, কিন্তু রাসূল যখন কাউকে ডাকেন, তখন সে নামাজে থাকলেও তা ছেড়ে রাসূলের হুকুম তামিল করবেন।

এ হুকুমটি তো বিশেষভাবে রাসূল ﷺ -এর সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু অপরাপর এমন কোনো কাজ যাতে বিলম্ব করতে গেলে কোনো কঠিন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখনও নামাজ ছেড়ে দেওয়া এবং পরে কাজা করে নেওয়া উচিত। যেমন, নামাজে থেকে যদি কেউ দেখতে পায় যে, কোনো অন্ধ ব্যক্তি কুয়ায় পড়ে যাবার কাছাকাছি চলে গেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নামাজ ছেড়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ অর্থা ৎ জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোনো সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেল; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনিমত জ্ঞান কর। কারণ কোনো কোনো সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোনো রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোনো কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং

মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনিমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -এ আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোনো বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তাঁর অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন- يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ। অর্থাৎ হে অন্তরসূহের ওলটপালটকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এর সারমর্মও এই যে, আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে আদৌ বিলম্ব করো না এবং সময়ের অবকাশকে গনিমত মনে করে তৎক্ষণাৎ তা বাস্তবায়িত করে ফেল। একথা কারোই জানা নেই যে, অতঃপর সৎকাজের এ প্রেরণা ও আগ্রহ বাকি থাকবে কিনা।

قَوْلُهُ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الخ : কুরআনে কারীম বদর যুদ্ধের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাজিলকৃত ইনামসমূহের কথা উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে। يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটি এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে হেদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আজাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদ ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী বলেন, 'আমর বিল মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হলো এ পাপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা নিজের এলাকায় কোনো অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকাজ সংঘটিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ স্বীয় আজাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোনো গুনাহগার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরাপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে, যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আমর বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোনো সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আজাব করাটা অবিচার এবং কুরআনী সিদ্ধান্ত- لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ -এর পরিপন্থি। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আমর বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি। ইমাম বগভী (র.) 'শরহুস্সুন্নাহ' ও 'মাআলিম' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট দলের পাপের আজাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোনো অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে তা বন্ধ করানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়নি। তবেই আল্লাহর আজাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবূ দাঊদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোনো অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবার উপর ব্যাপক আজাব নাজিল করবেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যারা আল্লাহর কানুনের সীমালঙ্ঘনকারী গুনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণির উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মতো যাতে দুটি শ্রেণি রয়েছে এবং নিচের শ্রেণির লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নিচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু

করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাই বাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে আর তাতে নিচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তাফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فِتْنَةً [ফিতনাহ] বলতে এ পাপ অর্থাৎ "সৎকাজে নির্দেশ দান অসৎকাজে বাধা দান" বর্জনকেই বুঝানো হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ বলার উদ্দেশ্য হলো জেহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল মু'মিন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসলামি 'শেয়ার' সমূহের হেফাজতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জিহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জিহাদ বর্জনকারীদের উপরেই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জানমাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আজাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

এ ব্যাখ্যা ও তাফসীরের সামঞ্জস্য হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জিহাদ বর্জনকারীদের প্রতি ভর্ৎসনা করা হয়েছে- وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ এবং يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ প্রভৃতি পরবর্তী আয়াতগুলোও এরই বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন কতিপয় মুসলমানের পদস্খলন হয়ে যায় এবং ঘাঁটি ছেড়ে নিচে নেমে আসেন, তখন তার বিপদ শুধু তাদের উপরই আসেনি, বরং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর উপরই আসে। এমনকি স্বয়ং মহানবী ﷺ -কেও সে যুদ্ধে আহত হতে হয়।

দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যকে সহজ করার জন্য এবং তাঁর প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের তাদের বিগত দিনের দুরবস্থা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এবং পরে স্বীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে শক্তি ও শান্তিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যা হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআয্যমায় ছিল। তখন তোমরা সংখ্যায় যেমন অল্প ছিলে তেমনি শক্তিতেও। সর্বক্ষণ আশঙ্কা লেগেই থাকত যে, শত্রুরা তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মদিনায় উত্তম অবস্থান দান করেছেন। শুধু অবস্থান বা আশ্রয় দান করেননি; বরং স্বীয় সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে দান করেছে শক্তি, শত্রুর উপর বিজয় এবং বিপুল মালামাল। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এহেন পরিবর্তন, আল্লাহর উপঢৌকন এবং নিয়ামতরাজি দানের উদ্দেশ্য হলো, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশও তাঁর নির্দেশ বা হুকুম-আহকাম পালনের উপরেই নির্ভরশীল।

তৃতীয় আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না, হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও অন্য কোনো রকম শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষ ভাগে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ বলে একথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে- وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আজাবও হয়। তাছাড়া এমন সব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়, যা আজাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এ তিন অর্থেই 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আজাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিই তোমাদের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়াবে।

কোনো সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততি কে আজাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় এ কথাটি অপরিহার্য যে, যে ধনসম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আজাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহর প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আজাবের কারণ হয়ে যায়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে- وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু মুসলমানদের জন্যই ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ মনীষীর মতে আয়াতটি গযওয়ায়ে 'বনূ কুরায়যা' -এর ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছিল। মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম বনূ কুরায়যার দুর্গটিকে দীর্ঘ একুশ দিন যাবৎ অবরোধ করে রেখেছিলেন। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দেশ ত্যাগ করে শাম দেশে [সিরিয়ায়] চলে যাবার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের দুষ্টুমির প্রেক্ষিতে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন এবং বলে দেন, যে সন্ধির একটি মাত্র উপায় আছে যে, সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) তোমাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করবেন তোমরা তাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করবে। তারা আবেদন জানাল, সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর পরিবর্তে বিষয়টি আবূ লুবাবা (রা.)-এর উপর অর্পণ করা হোক। তার কারণ আবূ লুবাবা (রা.)-এর আত্মীয়স্বজন ও কিছু বিষয়-সম্পত্তি বনূ কুরায়যার মধ্যে ছিল। কাজেই তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। যাহোক, হুজুরে আকরাম ﷺ তাদের আবেদনক্রমে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-কেই পাঠিয়ে দিলেন। বনূ কুরায়যার সমস্ত নারী-পুরুষ তাঁর চারদিকে ঘিরে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং জিজ্ঞেস করল, যদি আমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর হুকুমমতো দুর্গ থেকে নেমে আসি, তাহলে তিনি আমাদের ব্যাপারে কিছুটা দয়া করবেন কি? আবূ লুবাবা (রা.) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন যে, তাদের এ ব্যাপারে সদয়াচরণের কোনো পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তিনি তাদের কান্নাকাটিতে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের মায়ায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং নিজের গলায় তলোয়ারের মতো হাত ফিরিয়ে ইঙ্গিতে বললেন, তোমাদের জবাই করা হবে। এভাবে মহানবী ﷺ -এর পরিকল্পনার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া হলো

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসায় এ কাজ তিনি করে বসলেন বটে, কিন্তু সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে অনুভব করলেন যে, তিনি খেয়ানত করে ফেলেছেন। সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন লজ্জা ও অনুতাপ তাঁর উপর এমন কঠিনভাবে চেপে বসে যে, হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হওয়ার পরিবর্তে সোজা গিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লেন এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে নিজেকে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেন। তারপর এরূপ কসম খেয়ে নেন যে, যতক্ষণ না আমার তওবা কবুল হবে, এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকব; এভাবে যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবুও। সুতরাং এভাবে সাত দিন পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর দেখাশোনা করেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং নামাজের সময় হলে বাঁধন খুলে দিতেন, আর তা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আবার বেঁধে দিতেন। কোনো রকম খানাপিনার ধারে কাছেও যেতেন না। এমনকি ক্ষুধায় একেক সময় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেন, সে যদি প্রথমেই আমার কাছে চলে আসত, তবে আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করতাম। কিন্তু এখন তাঁর তওবা কবুলের নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

অতএব, সাতদিন অন্তে শেষ রাতে তাঁর তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে হুজুর ﷺ -এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। কোনো কোনো লোক তাঁকে এ সুসংবাদ জানান এবং বাঁধন খুলে দিতে চান। তাতে তিনি [আবূ লুবাবা] বলেন, যতক্ষণ না স্বয়ং মহানবী ﷺ নিজ হাতে আমাকে বাঁধন-মুক্ত করবেন, আমি মুক্ত হতে চাই না। অতএব, হুজুর ﷺ ভোরে যখন নামাজের সময় মসজিদে তাশরিফ আনেন, তখন স্বহস্তে তাঁকে মুক্ত করেন। উল্লিখিত আয়াতে খেয়ানত ও ধনদৌলত এবং সন্তানসন্ততির মায়ার সামনে নতি স্বীকার করার যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এ ঘটনাটিই ছিল তার কারণ।

২৯. وَنَزَلَ فِىْ تَوْبَتِهٖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ بِالْاَمَانَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا تَخَافُوْنَ فَتَنْجُوْنَ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

৩০. وَ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَدِ اجْتَمَعُوْا لِلْمُشَاوَرَةِ فِىْ شَانِكَ بِدَارِ النَّدْوَةِ لِيُثْبِتُوْكَ يُوْثِقُوْكَ وَيَحْبِسُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ كُلُّهُمْ قَتْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط مِنْ مَكَّةَ وَيَمْكُرُوْنَ بِكَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط بِهِمْ بِتَدْبِيْرِ اَمْرِكَ بِاَنْ اَوْحٰى اِلَيْكَ مَا دَبَّرُوْهُ وَاَمَرَكَ بِالْخُرُوْجِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ اَعْلَمُهُمْ بِهٖ -

৩১. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۤءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ لِاَنَّهٗ كَانَ يَاْتِى الْحِيْرَةَ يَتَّجِرُ فَيَشْتَرِىْ كُتُبَ اَخْبَارِ الْاَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا اَهْلَ مَكَّةَ اِنْ مَا

অনুবাদ :

২৯. তাঁর [হযরত আবূ লুবাবার] তওবা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়। হে মু'মিনগণ! আমানত ইত্যাদির বিষয়ে যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান অর্থাৎ তোমরা যা আশঙ্কা কর তার এবং তোমাদের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী একটি উপায় দেবেন ফলে তোমরা তা হতে মুক্তি পেতে পারবে এবং তোমাদের হতে তোমাদের পাপ অপসৃত করে দেবেন এবং তোমাদের অন্যায় কর্মসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অতিমহান, অনুগ্রহশীল।

৩০. আর হে মুহাম্মদ! স্মরণ কর কাফেরগণ তোমাকে বন্দী করার জন্য বা তারা সকলে [illegible] হত্যা করছে সেরূপভাবে তোমাকে হত্যা করার জন্য অথবা মক্কা হতে তোমাকে নির্বাসিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা তাদের পরামর্শ সভা দারুন নাদওয়ায় তোমার সম্পর্কে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়েছিল। তারা তো তোমার সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহ তা'আলাও এদিকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করত এবং তোমাকে হিজরত করে যেতে নির্দেশ প্রদান করতে তোমার জন্য উপায় উদ্ভাবন করে এদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি সর্বাপেক্ষা অবহিত। لِيُثْبِتُوْكَ অর্থাৎ এখানে তোমাকে বন্দী করে রাখতে, বেঁধে রাখতে।

৩১. যখন তাদের নিকট আমার আয়াত অর্থাৎ আল-কুরআন পাঠ করা হয় তারা যখন বলে আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও তার অনুরূপ বলতে পারি। এটা তো আল-কুরআন তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা। মিথ্যা কাহিনী মাত্র। নজর ইবনুল হারিস নামক জনৈক কাফের এ উক্তি করেছিল। সে ব্যবসা ব্যাপদেশে হীরা নগরীতে যাতায়াত করত এবং সে স্থান হতে অনারব উপ-কাহিনীর পুস্তক ক্রয় করে নিয়ে আসত আর তা মক্কাবাসীদের নিকট বর্ণনা করে শুনাত। اِنْ এটা এ স্থানে

৩২. وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا الَّذِىْ يَقْرَؤُهُ مُحَمَّدٌ هُوَ الْحَقُّ الْمُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ عَلٰى اِنْكَارِهٖ قَالَهُ النَّضْرُ اَوْ غَيْرُهُ اِسْتِهْزَاءً اَوْ اِيْهَامًا اَنَّهٗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ وَجَزْمٍ بِبُطْلَانِهٖ .

৩২. স্মরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! এটা অর্থাৎ মুহাম্মদ যা পাঠ করে তা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্যই অবতীর্ণ হয়ে থাকে তবে এটা অস্বীকার করায় আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাময় শাস্তি দাও। উক্ত নাজর বা অন্য কেউ উপহাস করে বা তার ধারণায় স্বীয় মতের যথার্থতা ও রাসূল ﷺ -কে বাতিল বলে ধারণা করে [নাউযুবিল্লাহ] এ ধরনের উক্তি করেছিল।

৩৩. قَالَ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا سَاَلُوْهُ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ط لِاَنَّ الْعَذَابَ اِذَا نَزَلَ عَمَّ وَلَمْ تُعَذَّبْ اُمَّةٌ اِلَّا بَعْدَ خُرُوْجِ نَبِيِّهَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ حَيْثُ يَقُوْلُوْنَ فِىْ طَوَافِهِمْ غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ وَقِيْلَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْمُسْتَضْعِفُوْنَ فِيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالٰى لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

৩৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ এরূপ নন যে তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে তারা যেমন চায় তেমন আজাব দেবেন। কেননা আজাব যখন আসে তখন তা ব্যাপক আকারেই আপতিত হয়। তাই নবী ও মু'মিনগণকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হতে সরিয়ে নেওয়ার পরই কেবল সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর আজাব আপতিত হয়। এবং তিনি এরূপও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এরা কা'বা শরীফে তাওয়াফের সময় বলত غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ হে আল্লাহ! তোমার দরবারেই ক্ষমা ভিক্ষা চাই। কেউ কেউ বলেন- اَلْمُسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ ক্ষমা-ভিক্ষাকারী বলতে এ স্থানে তাদের [কাফেরদের] মাঝে অবস্থানরত দুর্বল শ্রেণির মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ তারা যদি দূরে সরে যেত তবে কাফেরদেরকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম।

৩৪. وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ بِالسَّيْفِ بَعْدَ خُرُوْجِكَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْاَوَّلِ هِىَ نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ عَذَّبَهُمْ بِبَدْرٍ وَغَيْرِهٖ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ يَمْنَعُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ وَالْمُسْلِمِيْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ يَطُوْفُوْا بِهٖ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَآءَهٗ ط كَمَا زَعَمُوْا اِنْ مَا اَوْلِيَآؤُهٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ .

৩৪. তাদের কি-বা বলার আছে যে, তোমার ও দুর্বল মুমিনদের বের হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে অস্ত্র দ্বারা [যুদ্ধের মাধ্যমে] শাস্তি দেবেন না অথচ তারা রাসূল ﷺ ও মুসলিমগণকে মসজিদুল হারাম কা'বা হতে অর্থাৎ তার তওয়াফ করা হতে [নিবৃত্ত করে] বাধা প্রদান করে। প্রথমোক্ত বক্তব্যানুসারে অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াতটির ভাষ্য কাফেরগণ হলে এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতটির বিধান نَاسِخ বা রহিতকারী নির্দেশ বলে বিবেচ্য হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বদর প্রভৃতি সমরে আজাব দিয়েছেন। আর তারা যেমন ধারণা করে তারা তার তত্ত্বাধায়ক নয়। মুত্তাকীগণই এটার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। যে তার উপর তাদের কোনো তত্ত্বাবধান অধিকার নেই। اِنْ এটা এ স্থনে না-বাচক শব্দ مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٥. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً صَفِيْرًا وَتَصْدِيَةً ط تَصْفِيْقًا اَىْ جَعَلُوْا ذٰلِكَ مَوْضِعَ صَلَاتِهِمُ الَّتِىْ اُمِرُوْا بِهَا فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِبَدْرٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

৩৫. কা'বা গৃহের নিকট শিস ও করতালি দেওয়া ব্যতীত তাদের সালাত কিছুই নয় অর্থাৎ সালাত আদায়ের যে নির্দেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এতদস্থলে তারা তা করে। সুতরাং সত্য-প্রত্যাখ্যানের দরুন তোমরা বদর যুদ্ধে শাস্তি ভোগ কর। مُكَاءً অর্থ শিস। تَصْدِيَةً অর্থ করতালি।

٣٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ حَرْبِ النَّبِىِّ ﷺ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً نَدَامَةً لِفَوَاتِهَا وَفَوَاتِ مَا قَصَدُوْهُ ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط فِى الدُّنْيَا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِلٰى جَهَنَّمَ فِى الْاٰخِرَةِ يُحْشَرُوْنَ يُسَاقُوْنَ.

৩৬. কাফেরগণ আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করার জন্য রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। অনন্তর ভবিষ্যতেও তারা তা ব্যয় করবে আর অতঃপর তা পরিণামে অর্থসম্পদ ও তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও বিনষ্ট হওয়ায় তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। অতঃপর حَسْرَةً অর্থ মনস্তাপ। দুনিয়ার তারা পরাভূত হবে এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে পরকালে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

٣٧. لِيَمِيْزَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُوْنُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَىْ يَفْصِلَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ الْكَافِرَ مِنَ الطَّيِّبِ الْمُؤْمِنِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا يَجْمَعَهُ مُتَرَاكِبًا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَجْعَلَهُ فِىْ جَهَنَّمَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

৩৭. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ কুজনকে অর্থাৎ কাফেরকে সুজন অর্থাৎ মুমিন হতে স্বতন্ত্র করবেন لِيَمِيْزَ এটা পূর্বোক্ত تَكُوْنُ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। এটা [يَمِيْزَ] তাশদীদ (بَابُ تَفْعِيْلٍ) ও তাখফীফ অর্থাৎ তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। পৃথক করবেন এবং কুজনদের একজনকে অপরজনের উপর রাখবেন; অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে একজনকে অপরজনের উপর সারিসারিভাবে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِدَارِ النَّدْوَةِ : দারুন নদওয়া কুরাইশগণের দূরবর্তী দাদা কুসাই ইবনে কিলাব নির্মাণ করেছিল।

قَوْلُهُ بِتَدْمِيْرِ اَمْرِكَ : এতে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يَمْكُرُ اللّٰهُ এটা مَجَازْ مُرْسَلْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَ عَلَى الْقَوْلِ الْاَوَّلِ هِىَ نَاسِخَةٌ : কাজেই পূর্ববর্তী আয়াত এবং বর্তমান আয়াতে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি একটি ফিতনাবিশেষ। অর্থাৎ এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণত আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ এ মহানিয়ামতের যৌক্তিক দাবি ছিল– আল্লাহর এহেন মহাঅনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এ পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে– যাকে কুরআন ও শরিয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয় তাহলে সে এর বিনময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে– ১. ফুরকান, ২. পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ৩. মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

فَرْقَانٌ ও فَرْقٌ দুটি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فُرْقَانٌ [ফুরকান] এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয়, যা দুটি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোনো বিষয়ের মীমাংসাকে ফুরকান বলা হয়। কারণ তা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকেও ফুরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারা ও সত্যপন্থিদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কুরআনে কারীমে গযওয়ায়ে-বদরকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফুরকান' দান করা হবে– কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাজত করেন। কোনো শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তাফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবূ লুবাবা (রা.) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলেই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সবই আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে চলে আসত। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এ আয়াতে ফুরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভালোমন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক তার হয় যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানের তৃতীয় যে জিনিসটি লাভ হয়, তা হলো আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও ইহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোনো পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও ইহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাসূলে মকবুল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তা হলো এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী ﷺ যখন কাফেরদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী ﷺ -কে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে দেন।

তাফসীরে ইবনে কাছীর ও মাযহারীতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদিনা থেকে আগত আনসারগণের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদিনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদিনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যে কোনো রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদিনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ -ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন-নদওয়া' -এ এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন-নদওয়া' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ি। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামি আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুজ-যিয়াদাতই' সে স্থান' যাকে তৎকালে 'দারুন-নদওয়া' বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ দরুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিল, যাতে আবূ জাহল, নজর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি মোকাবিলায় উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। পরামর্শ সভা আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। এমন সময় ইবলীসে লা'ঈন এক বর্ষীয়ান আরব শেখের রূপ ধরে 'দারুন-নদওয়া'র দরজায় এসে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকেরা জানতে চাইল যে, তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ। সে জানাল, আমি নজদের অধিবাসী। আমি জানতে পেরেছি, আপনারা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পরামর্শ করছেন। কাজেই প্রবল সহানুভূতির কারণে আমিও এসে উপস্থিত হয়েছি। হয়তো এ ব্যাপারে আমিও কোনো উপকারী পরামর্শ দিতে পারব।

একথা শোনার পর তাকেও ভেতরে ডেকে নেওয়া হয়। তারপর যখন পরামর্শ আরম্ভ হয়– সুহায়লীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী– তখন আবূল বুখতারী ইবনে হিশাম এ প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, তাঁকে অর্থাৎ মহানবী ﷺ -কে লোহার শিকলে বেঁধে কোনো ঘরে বন্দী করে এমনভাবে তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে তিনি [নাঊযুবিল্লাহ] নিজে নিজেই মৃত্যুবরণ করেন। একথা শুনে নজদী শেখ ইবলীসে লা'ঈন বলল, এ মত যথার্থ নয়। কারণ তোমরা যদি এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তবে বিষয়টি গোপন থাকবে না, দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাঁর সাহাবী ও সঙ্গী-সাথীদের আত্মনিবেদনমূলক কীর্তি সম্পর্কে তো তোমরা সবাই অবগত। হয়তোবা তারা সবাই সমবেত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণই করে বসবে এবং তাদের বন্দীকে মুক্ত করে নেবে। চারদিক থেকে সমর্থনের আওয়াজ উঠল. নজদী শেখ যথার্থ বলেছেন। তারপর আবূ আসওয়াদ মত প্রকাশ করল যে, তাঁকে মক্কা থেকে বরে করে দেওয়া হোক। তিনি বাইরে গিয়ে যা খুশি তাই করুন। তাতে আমাদের শহর তাঁর ফিতনা-হাঙ্গামা থেকে বেঁচে থাকবে এবং আমাদেরকে যুদ্ধবিগ্রহেরও ঝুঁকি নিতে হবে না।

এ কথা শুনে নজদী শেখ আবার বলল, এ মতটিও সঠিক নয়। তিনি যে কেমন মিষ্টভাষী তোমরা কি সে কথা জান না? মানুষ তাঁর কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁকে এভাবে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে অতিশীঘ্রই তিনি এক শক্তিশালী দল সংগঠিত করে ফেলবেন এবং আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলবেন। এবার আবূ জাহ্ল বলল, করার যে কাজ তোমাদের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারনি। একটি কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তা হলো এই যে, আমরা সমস্ত আরব গোত্র থেকে একেক জন যুবককে বেছে নেব এবং তাদেরকে একটি করে উত্তম ও কার্যকর তলোয়ার দিয়ে দেব। আর সবাই মিলে সমবেত হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে আমরা তাঁর ফিতনা-হামলা থেকে প্রথমে অব্যাহতি লাভ করি। তারপর থাকল তাঁর গোত্র বনূ আবদে মানাফ-এর দাবিদাওয়া, যা তারা তাঁর হত্যার কারণে আমাদের উপর আরোপ করবে। বস্তুত এককভাবে যখন তাঁকে কেউ হত্যা করেনি বরং সব গোত্রের একেক জন মিলে করেছে, তখন কিসাস অর্থাৎ জানের বদলা জান নেওয়ার দাবি তো থাকতেই পারে না। শুধু থাকবে হত্যার বিনিমিয়ের দাবি। তখন তা আমরা সব কবীলা বা গোত্র থেকে জমা করে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেব এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাব।

নজদী শেখ তথা ইবলীসে-লা'ঈন একথা শুনে বলল, ব্যাস, এটাই হলো শত কথার এক কথা, মতের মতো মত। আর এছাড়া অন্য কোনো কিছুই কার্যকর হতে পারে না। অতঃপর গোটা বৈঠক এ মতের পক্ষেই সমর্থন দান করে এবং আজকের রাতের ভেতরেই নিজেদের ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প করে নেয়। কিন্তু নবী-রাসূলদের গায়েবী শক্তি সম্পর্কে এ মূর্খের দল কেমন করে জানবে! সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ-কে অবহিত করে এ ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। সেই সাথে এ কথাও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজওয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু-আলম ﷺ -এর বাড়িটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছনায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এ সংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুজুর ﷺ এ অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে! বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তা হলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে মহানবী ﷺ একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর কোনো এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মাদ ﷺ -এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন! তখন তারা সবাই নিজেদের মাথার হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল। সবার মাথায় মাটি পড়েছিল।

হযরত আলী (রা.) মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এ রাত এবং এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর সম্পর্কে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে দীন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা এবং চক্রান্তের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

শানে নুযূল : ইবনে জারীর সাঈদ ইবনে জুবাইর-এর সূত্রে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে আকাবা ইবনে আদি এবং নজর ইবনে হারেস বন্দী হয় এবং মারা যায়। নজর ইবনে হারেসকে বন্দী করেছিলেন হযরত মেকদাদ (রা.)। তার সম্পর্কে যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তখন হযরত মেকদাদ (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার কয়েদি। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন সে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করত তাই তার শাস্তি একান্ত জরুরি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৫, পৃ. ৮৯]

قَوْلُهُ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরির ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানি আজাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপস্থিতি ব্যাপক আজাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায় দুর্বল মুসলমানের কারণে এমন আজাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আজাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আজাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আজাবের যোগ্য

হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরি ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমন সব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আজাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দুটিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ খানায়ে কা'বায় ইবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে ইবাদত-বন্দেগী ও নামাজ, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে আগমনে বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরি সালে যখন রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হলো এই যে, এ নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এ ধারণা ছিল দুটি ভুল বোঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমত এই যে, তারা নিজেদের মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল। অথচ কোনো কাফের কোনো মসজিদের মুতায়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাদের এ ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্য নামাজিদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাজিদের কষ্টেরও আশঙ্কা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাজিদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মুতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেওয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেওয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোনো মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। কুরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেজগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মুতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মুতাওয়াল্লী দীনদার ও পরহেজগার বক্তিরাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো মুফাসসির إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ -এর সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেজগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এ তাফসীরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরিয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবি করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলী আল্লাহ বলে মনে করে, তারা [একান্তভাবেই] ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামাজ' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেওয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এ ধরনের কার্যকলাপকে ইবাদত কিংবা নামাজ তো দূরের কথা, সঠিক কোনো মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ তোমাদরে কুফরি ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহর আজাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আজাব বলতে এখানে আখেরাতের আজাব হতে পারে এবং পার্থিব আজাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাজিল হয়। এর পরে ৩৬ নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের অন্য একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যাতে তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অধিক মাল একত্র করেছিল এবং তা দীনে হক এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তা ব্যয় করেছিল কিন্তু পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, এ সম্পদও তাদের হাত থেকে চলে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়র পরিবর্তে তারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল।

অনুবাদ :

٣٨. قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَاَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهٖ اِنْ يَّنْتَهُوْا عَنِ الْكُفْرِ وَقِتَالِ النَّبِىِّ ﷺ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ج مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا اِلٰى قِتَالِهٖ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَىْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ بِالْاِهْلَاكِ فَكَذَا نَفْعَلُ بِهِمْ .

৩৮. যারা কুফরি করে যেমন আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীগণ তাদেরকে বল, যদি তারা কুফরি এবং রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হতে বিরত হয় তবে তাদের যে দুষ্কর্ম পূর্বে হয়ে গেছে তা ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তারা যদি তার সাথে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো আছেই অর্থাৎ এ বিষয়ে পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্পর্কে আমার অনুসৃত নীতি তো বিদ্যমান। সুতরাং এদের সাথেও আমি তদ্রূপ আচরণ করব।

٣٩. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ تُوْجَدَ فِتْنَةٌ شِرْكٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج وَحْدَهٗ وَلَا يُعْبَدُ غَيْرُهٗ فَاِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ .

৩৯. এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনা অর্থাৎ শিরক দূরীভূত হয়েছে, তার শেষ হয়েছে এবং সমস্ত দীন একক আল্লাহর না হয়েছে। তিনি ব্যতীত আর কারও যেন উপাসনা না হয়। যদি তারা কুফরি হতে বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কাজের সম্যক দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।

٤٠. وَاِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ط نَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّىْ اُمُوْرِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى هُوَ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ اَىِ النَّاصِرُ لَكُمْ .

৪০. আর যদি ঈমান হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও তোমাদের জন্য কত উত্তম সাহায্যকারী। اَلنَّصِيْرُ এটা এ স্থানে نَاصِرٌ [সাহায্যকারী] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَىْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ -এর মধ্যে মাসদারে ইযাফত মাফউলের দিকে হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে سُنَّتُنَا فِيْهِمْ রয়েছে।

قَوْلُهٗ تُوْجَدُ : এখানে تَكُوْنَ -এর তাফসীর تُوْجَدُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كَانَ টা হলো كَانَ تَامَّةٌ কাজেই তার খবরের প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে যত ধনবল এবং জনবলই ব্যবহার করুক না কেন, অবশেষে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তারা হবে তখন অনুতপ্ত, লজ্জিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত, আর আখেরাতে হবে কোপগ্রস্ত। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে কিভাবে এ ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায় তার পন্থা, সে পন্থা হলো ইসলামের বিরোধিতা বর্জন করা এবং ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া। যদি তা করে তবে অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। তাই আল্লাহ পাক

ঘোষণা করেছেন- قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ج হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন যদি তারা কুফরি ও নাফরমানি পরিহার করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আল্লাহ পাক তাঁর হক মাফ করে দেবেন। কিন্তু বান্দার হক থাকবে অর্থাৎ মানুষের দেনা-পাওনা মাফ হবে না তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। যেমন হাদীসে আছে- اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কৃত গুনাহ ইসলাম বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু তারা যদি এখনও কুফর ও নাফরমানি বর্জন না করে তবে সত্যদ্রোহীতার জন্যে পূর্বকালের লোকেরা যে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করেছে সেই পরিণাম এ কাফেরদের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ الخ : এটি হলো সূরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দুটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১. ফিতনা, ২. দীন। আরবি অভিধান অনুযায়ী শব্দ দুটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দুটি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন- ১. ফিতনা অর্থ কুফর ও শিরক আর ২. দীন অর্থ ইসলাম ধর্ম নিতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদের কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব যতক্ষণ না বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোনো ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দীন ইসলামের জন্য তা হবে আশঙ্কাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই যে, এতে 'ফিতনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থা করছিলেন। প্রতি মুহূর্ত তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদিনার দিকে হিজরত করেন, তখন তারা প্রতিটি মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদিনায় পৌঁছার পরও গোটা মদিনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানদের কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তা হলো এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয় পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দুজন লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এখন মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, তিনি কোনোক্রমেই এহেন ফিতনা-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফিতনার সমাধান করার উদ্দেশ্যে কি কারণে এগিয়ে আসেন না! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দুজন আরজ করলেন, আপনি কি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে দীন ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ

যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফিতনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পরস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ -এর হেদায়েত হচ্ছে যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কিয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদের পরিণতিতে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত এতদুভয় অবস্থায় কোনোটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মোকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এ উভয় অবস্থার হুকুমেই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

সে অনুযায়ীই তিনি তাদের সাথে ব্যবহার করবেন। সারমর্ম এই যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য এমন আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, যুদ্ধবিগ্রহের পর কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন কিংবা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করাটা শুধুমাত্র যুদ্ধের চাল এবং ধোঁকাও হতে পারে। এমতাবস্থায় যুদ্ধবিরতি করা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এরই উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা তো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুবর্তী থাকবে। আর সে আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে জানেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কাজেই যখন তারা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করবে এবং সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে নেবে, তখন মুসলমানরা তা মেনে নিয়ে জিহাদ-যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য। কথা হলো এই যে, তারা অকপট ও সত্য মনে ইসলাম কিংবা সন্ধিচুক্তিকে গ্রহণ করল এবং তাতে কোনো প্রতারণা নিহিত রয়েছে কিনা সে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা যথার্থভাবেই দেখেন ও অবগত রয়েছেন। তারা যদি এমনটি করে তবে তার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের ধারণা ও শঙ্কা-সংশয়ের উপর কোনো বিষয়ের ভিত্তি রচনা করা উচিত নয়।

ইসলাম গ্রহণ কিংবা সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের কথা প্রকাশ করার পরেও যদি তাদের উপর হাত তোলা হয়, তবে যারা জিহাদ করেছে তারা অপরাধী হয়ে পড়বে। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দান করা হয়েছে, যেন আমি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা কালেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। [একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।] এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দেবে এবং যখন তারা তা বাস্তবায়িত করবে, তখন তাদের রক্ত, তাদের ধনসম্পদ সবই নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশ্য ইসলামি বিধান মতে কোনো অপরাধ করলে সেজন্য তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে। বস্তুত তাদের মনের হিসাব-নিকাশের ভার থাকবে আল্লাহর উপর। তিনি জানবেন, তারা সত্য মনে এই কালেমা এবং ইসলামি আমলসমূহকে কবুল করেছে কি প্রতারণা করেছে।

অপর একটি হাদীস যা হযরত আবূ দাউদ (র.) বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর অর্থাৎ এমন কোনো লোকের উপর কোনো অত্যাচার-উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, যে ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্যের চুক্তি করে নিয়েছে, কিংবা যদি তার কোনো ক্ষতিসাধন করে অথবা তার দ্বারা এমন কোনো কাজ আদায় করে যা তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কিংবা যদি তার কোনো বস্তু তার মানসিক ইচ্ছায় বাইরে নিয়ে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন আমি সে মুসলমানের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির সমর্থন করব।

কুরআনে-হাকীমের আয়াত ও উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বাহ্যত মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক আশঙ্কার সম্মুখীন করে দিয়েছে। তা হলো এই যে, ইসলামের কোনো মহাশত্রুও যখন মুসলমানদের কবলে পড়ে এবং শুধুমাত্র জান বাঁচাবার উদ্দেশ্য ইসলামের কালেমা পড়ে নেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতকে সংযত করে নেওয়া মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুসলমানদের পক্ষে কোনো শত্রুকেই বশ করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন রহস্যাদির ভার নিজের দায়িত্বে রেখে একান্ত মু'জিযাসুলভ ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কার্যত মুসলমানদের কোনো সমরক্ষেত্রেই এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। অবশ্য সন্ধি অবস্থায় শত শত মুনাফেক সৃষ্টি হয়েছে যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে এবং বাহ্যত নামাজ-রোজাও পালন করেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো সংকীর্ণ ও নিম্নশ্রেণির লোকদের তো এ উদ্দেশ্যই ছিল যে, মুসলমানদের থেকে কিছু ফায়দা হাসিল করে নেবে এবং শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের প্রতিশোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। আবার অনেক ছিল যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার জন্য, বিরোধীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার জন্য এমনটি করত। কিন্তু আল্লাহর আইনের সে সমস্ত ব্যাপারেই মুসলমানদের হেদায়তে দেওয়া হয়েছে, তারা যেমন তাদের সাথেও মুসলমানদের মতোই আচরণ করে যতক্ষণ না তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং চুক্তি লঙ্ঘনের বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়।

কুরআনে কারীমের এ শিক্ষা ছিল সে অবস্থার জন্য যখন ইসলামের শত্রু নিজেদের শত্রুতা পরিহারের অঙ্গীকার করবে এবং এ

ব্যাপারে কোনো চুক্তি সম্পাদন করে নেবে। এছাড়া আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের জেদ ও শত্রুতা বজায় রাখতে প্রয়াস পায়। এ সম্পর্কিত হুকুম এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ অর্থাৎ যদি তারা কথা না মানে, তবে তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী, আর তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী এবং অতি উত্তম সমর্থনকারী।

সারকথা এই যে, যদি নিজেদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও কুফরি-শিরকি থেকে বিরত না হয়, তবে মুসলমানদের জন্য সে নির্দেশই বহাল থাকবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। আর জিহাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ যেহেতু স্বাভাবত বড় রকম সৈন্যবাহিনী, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের উপরই নির্ভরশীল এবং মুসলমানদের কাছে পরিমাণে এসব বিষয় ছিল অল্প, কাজেই এমনটি হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না যে, জিহাদের হুকুমটি মুসলমানদের কাছে ভারী বলে মনে হবে কিংবা তারা নিজেদের সংখ্যা ও সাজসরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন এমন মনে করতে আরম্ভ করবেন যে, আমরা মোকাবিলায় সফল হতে পারব না। কাজেই এর প্রতিকার কল্পে মুসলমানদের বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছে যদিও মুসলমানদের চেয়ে সাজসরঞ্জাম বেশি রয়েছে, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার গায়েবি সাহায্য-সহায়তা কোথায় পাবে যা মুসলমানরা পাচ্ছে এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে প্রত্যক্ষ করে থাকে। আরো বলা হয়েছে যে, এমনিতে তো দুনিয়ার সব পক্ষই করো না কারো কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা অর্জন করেই নেয় কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয় সেই সাহায্যদাতার শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-অভিজ্ঞানের উপর। একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য এবং সূক্ষ্মদর্শিতার চেয়ে বেশি তো দূরের কথা এর সমান সারা বিশ্বেরও হতে পারে না। কেননা তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যদাতা ও পক্ষ সমর্থনকারী।

٤١. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ اَخَذْتُمْ مِنَ الْكُفَّارِ قَهْرًا مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ يَاْمُرُ فِيْهِ بِمَا يَشَآءُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى قَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَالْيَتٰمٰى اَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ هَلَكَتْ اٰبَاؤُهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ وَالْمَسٰكِيْنِ ذَوِى الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَىْ يَسْتَحِقُّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْاَصْنَافُ الْاَرْبَعَةُ عَلٰى مَا كَانَ يَقْسِمُهُ مِنْ اَنَّ لِكُلٍّ خُمُسَ الْخُمُسِ وَالْاَخْمَاسُ الْاَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْغَانِمِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَاعْلَمُوْٓا ذٰلِكَ وَمَآ عَطْفٌ عَلٰى بِاللّٰهِ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْاٰيَاتِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ اَىْ يَوْمَ بَدْرٍ الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ نَصْرُكُمْ مَعَ قِلَّتِكُمْ وَكَثْرَتِهِمْ .

অনুবাদ :

৪১. আরো জানিয়ে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা কাফেদের নিকট হতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ কর হস্তগত কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তিনি এতদসম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন তাঁর রাসূলের স্বজনদের। অর্থাৎ বনূ হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রের, রাসূল ﷺ -এর নিকটাত্মীয়বর্গের এতিমগণের অর্থাৎ ঐ সমস্ত দরিদ্র মুসলিম শিশু যাদের পিতা গত হয়েছে ও দরিদ্রদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের এবং পথচারীদের অর্থাৎ পর্যটনরত মুসলিম ব্যক্তিগণের জন্য। অর্থাৎ রাসূল ﷺ এবং উক্ত চার ধরনের ব্যক্তিগণ তার অধিকার রাখেন। এদের প্রত্যেক শ্রেণি সাকুল্য সম্পদের এ পঞ্চমাংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সাকুল্য যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর অবশিষ্ট চারভাগ যোদ্ধাদলে শরিক ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টিত হবে। যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহর উপর এবং সেই বিষয়ের উপর মীমাংসার দিন অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন যেদিন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করা হয়েছিল সেই দিন যা অর্থাৎ যে সমস্ত নিদর্শন ও ফেরেশতা وَمَآ اَنْزَلْنَا -পূর্বোক্ত بِاللّٰهِ শব্দটির সাথে এটার عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দু'দল অর্থাৎ মুসলিম ও কাফের এই দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল তবে তা তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ তাদেরকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান সুতরাং তোমাদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তোমাদের সাহায্য করা ও জয়দান করা তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত নয়।

٤٢. اِذْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ اَنْتُمْ كَائِنُوْنَ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا الْقُرْبٰى مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَهِىَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا جَانِبُ الْوَادِىْ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى اَلْبُعْدٰى مِنْهَا وَالرَّكْبُ اَلْعِيْرُ كَائِنُوْنَ بِمَكَانٍ اَسْفَلَ مِنْكُمْ مِمَّا يَلِى الْبَحْرَ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ اَنْتُمْ وَالنَّفِيْرُ لِلْقِتَالِ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ جَمَعَكُمْ بِغَيْرِ مِيْعَادٍ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ فِىْ عِلْمِهٖ وَهُوَ نَصْرُ الْاِسْلَامِ وَمَحْقُ الْكُفْرِ فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَهْلِكَ يَكْفُرَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ اَىْ بَعْدَ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ وَهِىَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ قِلَّتِهِمْ عَلَى الْجَيْشِ الْكَثِيْرِ وَيَحْيٰى يُؤْمِنَ مَنْ حَىَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

৪২. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে মদিনার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল তার দূরবর্তী প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে, সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ তোমরা ও কাফেরদের এই যোদ্ধাদলের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে তবে এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে নিশ্চয় তোমাদের মতভেদ ঘটত; কিন্তু তাঁরা জ্ঞানানুসারে যা ঘটার ছিল অর্থাৎ ইসলামের সাহায্য ও বিজয় এবং কুফরির বিনাশ আল্লাহ তা সম্পন্ন করার জন্য কোনোরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়াই তোমাদেরকে একত্র করলেন। আর তা এই জন্যও করলেন যে, যে কেউ ধ্বংস হবে কুফরি করবে সে যেন সত্যাসত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যেমন মু-মিনগণ সংখ্যায় অল্প হওয়ার সত্ত্বেও বিরাট এক বাহিনীর উপর জয়লাভ করল এই প্রমাণ দর্শনের পরও ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করবে সে যেন সত্যাসত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। اِذْ -এটা يَوْمَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য। بِالْعُدْوَةِ -এটা এইস্থানে উহ্য كَائِنُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। এইদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে এটার পূর্বে ঐ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। اَلْعُدْوَةُ -এটা ع-এ পেশ ও কাসরা উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ– এক প্রান্ত। اَلْقُصْوٰى -অর্থ দূরবর্তী। اَسْفَلَ مِنْكُمْ -এটা এইস্থানে উহ্য مَكَانٌ -এর বিশেষণ। এইদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে بِمَكَانٍ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

٤٣. اُذْكُرْ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ اَىْ نَوْمِكَ قَلِيْلًا ؕ فَاَخْبَرْتَ بِهٖ اَصْحَابَكَ فَسُرُّوْا وَلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَفَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فِى الْاَمْرِ اَمْرِ الْقِتَالِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ كُمْ مِنَ الْفَشَلِ وَالتَّنَازُعِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ ـ

৪৩. স্মরণ কর আল্লাহ তোমাকে নিদ্রায় স্বপ্নে তাদেরকে সংখ্যায় অল্প দেখিয়েছিলেন। আর তদনুসারে তুমি তোমার সাহাবীদের এই সংবাদ প্রদান করলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। আর তাদেরকে যদি অধিক করে তোমাকে দেখাইতেন তবে তোমরা হতবল হয়ে যেতে সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে বিরোধ করতে, বিবাদ করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে সাহসহারা ও বিবাদ করা হতে রক্ষা করেছেন এবং বক্ষে যা আছে অর্থাৎ অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

٤٤. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا نَحْوَ سَبْعِينَ أَوْ مِائَةٍ وَهُمْ أَلْفٌ لِتَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْدَمُوا وَلَا يَرْجِعُوا عَنْ قِتَالِكُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ فَلَمَّا الْتَحَمَ أَرَاهُمْ إِيَّاهُمْ مِثْلَيْهِمْ كَمَا فِي اٰلِ عِمْرَانَ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ط وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْأُمُورُ.

৪৪. আর বস্তুত যা ঘটারই ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য হে মুমিনগণ! তোমরা যখন পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে সল্পসংখ্যক সত্তর বা একশত জন হিসেবে দেখিয়েছিলেন। অথচ তারা ছিল এক হাজার। তোমরা যেন এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও সেই জন্য তা করা হয়েছিল। এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে সল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। যাতে তারা অগ্রসর হয় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে যেন ফিরে না যায়। এটাই ছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের অবস্থা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এদের চোখে তাদেরকে দ্বিগুণ সংখ্যক প্রদর্শন করা হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর দিকেই সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর পক্ষ হতেই সকল বিষয় সাব্যস্ত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاعْلَمُوا ذٰلِكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, إِنْ شَرْطِيَّةٌ-এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে, আর তা হলো اِعْلَمُوْا ذٰلِكَ-এর উহ্য হওয়ার উপর পূর্বের فَاعْلَمُوْا দিক নির্দেশনা দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ فَامْتَثِلُوْا-কে উহ্য جَزَاءٌ মনে করেছেন। আর এটাই অধিক সমীচীন। কেননা এখন অর্থ হবে- إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ مَسْئَلَةَ الْخُمُسِ فَامْتَثِلُوْا ذٰلِكَ কেননা ইলমের ক্ষেত্রে নব মুমিন ও কাফের উভয় একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ : এখানে فَاءٌ টা হলো جَزَائِيَّةٌ আর اِنَّمَا-এর মধ্যে مَا-টা হলো مَوْصُوْلَةٌ যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর فَاَنَّ لِلّٰهِ হলো مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنٰى جَزَاءٌ ইমাম নখয়ী (র.) اِنَّ-এর হামযাকে যের দ্বারা পড়েছেন। আবূ বাকুন (র.) যবর দ্বারা পড়েছেন। এই সুরতে اَنَّ এবং তার পরবর্তী অংশ মুবতাদা হবে আর তার খবর উহ্য হবে। উহ্য ইবাতর এরূপ হবে যে فَوَاجِبٌ اَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ

অন্য তারকীব এটাও হতে পারে যে, خُمُسَهُ হলো মুবতাদা আর তার খবর উহ্য হবে। অর্থাৎ- ثَابِتٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরুতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে বলা হয়েছে, আর এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে জিহাদের জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং দুশনের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ যুদ্ধের পর দুশমনদের থেকে 'মালে গনিমত' তথা যুদ্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ : পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল ছিল না; বরং তাদের জন্য এই বিধান ছিল যে, মালে গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে রেখে দেওয়া হতো, আসমান থেকে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে রেখে দেওয়া হতো, আসমান থেকে অগ্নি এসে সে সম্পদ নিয়ে যেত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। সূরার শুরুতে قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ বাক্য দ্বারা যে বিধান পেশ করা হয়েছে তার কিছুটা বিরবণ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন, : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ২৩৫]

যে ধন সম্পদ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের পর পাওয়া যায় তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের জন্যে, রাসূলের আত্মীয় স্বজনের জন্যে, আর এতিম ও মিসকিনের জন্যে ও পথিক মুসাফিরের জন্যে আর অবশিষ্ট চার পঞ্চামাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

ইমাম আযম আবূ হানিফার (র.) মতে, যে অশ্বারোহী সে পাবে দু'ভাগ, আর যে পদব্রজে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে তাকে দেওয়া হবে এক ভাগ। এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে পাঁচটি ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম দু'টি ক্ষেত্র এখন আর নেই। প্রিয়নবী ﷺ -এর অবর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন নেই, তাই তাঁর ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের কোনো ভাগ নেই বলে হানাফী মাযহাবের অভিমত। অবশ্য এতিম মিসকিন বা দরিদ্র হিসেবে অন্যান্যদের উপর তাঁদের অগ্রাধিকার সর্বদা থাকবে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, প্রিয়নবী ﷺ -এর অবর্তমানে তাঁর খলিফাগণ উক্ত এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবেন।

মালে গনিমতের তাৎপর্য : গনিমত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সেই সম্পদ যা দুশমন থেকে অর্জন করা হয়। আর শরিয়তের পরিভাষায় যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে দুশমন থেকে যে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা হয় তাকে গনিমত বলা হয়। পক্ষান্তরে পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে সম্পদ অর্জিত হয় যেমন– জিজিয়া, খেরাজ তাকে 'ফাই' বলা হয়। কুরআনে করীমে গনিমত এবং ফাই এ দু'টি শব্দ দ্বারাই দুশমন থেকে অর্জিত সম্পদের বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধাণযোগ্য যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আল্লাহ পাকের কোনো বন্দাকে তিনি কোনো সম্পদের সাময়িক মালিকানা দান করে থাকেন। তাঁর বিধি মোতাবেক এ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনো সম্প্রদায় যদি আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়, কুফর ও শিরক করে তখন আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং আসমানি কিতাব নাজিল হয়। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহর তরফ থেকে আগত হেদায়েত গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দেন, যার তাৎপর্য হলো এই, যারা আল্লাহর বিদ্রোহী তাদের জান এবং মাল আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য হালাল করা হয়। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনো অধিকার তাদের থাকে না, বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকার তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জব্দ করা হয়। মুসলমান সৈনিকগণ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে সম্পদ জব্দ করেন তাকেই শরিয়তের ভাষায় গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বলা হয়, যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বের হয়ে মূল মালিক আল্লাহ পাকের মালিকানায় ফিরে আসে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে এ বিধান ছিল যে, কাফেরদের থেকে যা কিছু অর্জিত হতো তা ব্যবহার করা কারো জন্যই বৈধ হতো না, বরং উক্ত সম্পদ উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেওয়া হতো। আসমান থেকে অগ্নি এসে ঐ সম্পদকে জ্বালিয়ে ফেলতো। এটা ঐ জিহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন হতো। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর উম্মতের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ الخ অর্থাৎ আর তোমরা জেনে রাখ তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় যা কিছু লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাকের জন্যে এবং তাঁর রাসূলের জন্যে এবং রাসূলের নিকট আত্মীয়স্বজনের জন্যে ও এতিম, মিসকিন, মুসাফিরদের জন্যে।

মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর এক-পঞ্চমাংশের বণ্টন : অধিকাংশ ইমামের মতে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে যে অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য রাখা হয়েছিল তা তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের সুউচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে তেমনি ছিল যেমন করে তাঁকে বিশেষভাবে এ অধিকারও দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে নিজের পছন্দ মতো যে কোনো বস্তুত নিতে পারতেন। সে অধিকারবলে কোনো কোনো গনিমতের মধ্য থেকে মহানবী ﷺ কোনো কোনো বস্তু নিয়েও ছিলেন। আর গনিমতের পঞ্চমাংশ থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ভাতাও গ্রহণ করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই অংশ নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়। কারণ, তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল নেই।

জাবিল কুরবার পঞ্চমাংশ : এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে, গনিমতের এক পঞ্চমাংশে দরিদ্র নিকটাত্মীয়ের অধিকার বা হক এর অন্যান্য প্রাপক তথা এতিম মিসকিন ও মুসাফিরের অগ্রবর্তী। কারণ নিকটাত্মীয়কে সদকা-জাকাত প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা যায় না, অথচ অন্যান্যের ক্ষেত্রে জাকাত-ফেতরার দ্বারা সাহায্য করা যায়। অবশ্য ধনী নিকটাত্মীয়কে এর মধ্য থেকে দেওয়া যাবে কিনা. এ প্রশ্নে হযরত ইমাম আযম আবূ-হানীফা (র.) বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নিকটাত্মীয়দের দান করতেন তার

দু'টি ভিত্তি ছিল। ১. তাঁদের দরিদ্র ও অসহায় এবং ২. দীনের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহায্য-সহায়তা। দ্বিতীয় ভিত্তিটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট থাকতে পারে শুধু দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিষয়টি। আর এই ভিত্তিতে কিয়ামত অবধি প্রত্যেক ইমামই তাঁদেরকে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী গণ্য করবেন। −[হিদায়া, জাস্সাস] ইমাম শাফেয়ী (র.) হতেও এ বক্তব্যই উদ্ধৃত রয়েছে। −[কুরতুবী]

কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে যাবিল-কোরবার অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নৈকট্যের ভিত্তিতে চিরকাল বলবৎ থাকবে এবং তাতে ধনী-গরিব সবাই শরিক থাকবে। তবে সমকালীন আমীর [শাসক] নিজ বিবেচনায় তাদেরকে অংশ দেবেন। −[মাযহারী]

এ ব্যাপারে আদত বিষয়টি হলো খোলাফায়ে-রাশেদীনের অনুসৃত রীতি। দেখতে হবে, তাঁরা মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর কি করেছেন। হেদায়া গ্রন্থকার এ ব্যাপারে লিখেছেন। إِنَّ الْخُلَفَاءَ الْاَرْبَعَةَ الرَّاشِدِيْنَ قَسَّمُوْهُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَسْهُمٍ অর্থাৎ চার জন খোলাফায়ে-রাশেদীনই মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর গনিমতের এক পঞ্চমাংশকে মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত করে এতিম, মিসকিন ও ফকিরদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

অবশ্য ফারূকে আযম হযরত ওমর (রা.) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি হুজুর ﷺ -এর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা গরিব ও অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকেও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করতেন। −[আবূ দাউদ] বলা বাহুল্য, এটা শুধুমাত্র হযরত ওমর ফারুকের রীতি ছিল না, অন্য খলীফারাও তাই করতেন।

আর যেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রা.) ও হযরত ফারূকে আযম (রা.) তাঁদের খেলাফতের শেষকাল পর্যন্তই যাবিল কোরবার হক সে মাল থেকে পৃথক করে নিতেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে তার মুতাওয়াল্লী বানিয়ে যাবিল-কোরবার মধ্যে বিতরণ করাতেন। [যেমনটি বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ ইউসুফ রচিত 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে।] তবে এটা তার পরিপন্থি নয় যে, তা দরিদ্র যাবিল-কোরবার মাঝে বণ্টন করার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

বদর যুদ্ধের দিনটিই ইয়াওমুল ফুরকান : আলোচ্য আয়াতে বদরের দিনটিকেই 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলে অতিবাহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম বাহ্যিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় এবং কাফেদের নিদর্শনমূলক পরাজয় এ দিনটিতেই সূচিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে দিনটিতে কুফর ও ইসলামের বাহ্যিক পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

قَوْلُهُ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ : অর্থাৎ বদরের ঘটনায় ইসলামের সুস্পষ্ট সত্যতা এবং কুফরের অসত্য ও বর্জনীয় হওয়ার বিষয়টি এজন্য খুলে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে যারা ধ্বংসের সম্মুখীন হতে চায়, তারা যেন দেখে শুনেই তাতে পা বাড়ায়, আর যারা বেঁচে থাকতে চায় তারাও যেন দেখে-শুনেই বেঁচে থাকে কোনোটাই যেন অন্ধকার এবং ভুল বোঝাবুঝির মাঝে না হয়।

এ আয়াতের শব্দগুলোর মধ্যে 'হালাক' বা ধ্বংসের দ্বারা কুফরিকে এবং 'হায়াত' বা জীবন শব্দের দ্বারা ইসলামকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা এবং ওজর-আপত্তির কারণ শেষ হয়ে গেছে। এমন যে লোক কুফরি অবলম্বন করবে সে চোখে দেখেই ধ্বংসের দিকে যাবে আর যে লোক ইসলাম অবলম্বন করবে সে দেখে শুনেই চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন গ্রহণ করবে। অতঃপর বলা হয়েছে− إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট শ্রবণকারী, সবার মনের গোপন কুফরি ও ঈমান পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর সামনে রয়েছে এবং এগুলোর শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কেও তিনি পরিজ্ঞাত।

৪৩ ও ৪৪ তম আয়াতে প্রকৃতির এক অপূর্ব বিস্ময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা বদর যুদ্ধের ময়দানে এই উদ্দেশ্যে কার্যকর করা হয়, যাতে উভয় বাহিনীর কোনো একটিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ঠানকেই না শেষ করে দেয়। কারণ, এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বস্তুগত দিক দিয়েও ইসলামের সত্যতার বিকাশ ঘটানো ছিল নির্ধারিত।

বস্তুত প্রকৃতির সে বিস্ময়টি ছিল এই যে, কাফের বাহিনী যদিও তিন গুণ বেশি ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমা ও কুদরতবলে তাদের সংখ্যাকে মুসলমানদের চোখে কম করে দেখিয়েছেন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে কোনো দুর্বলতা ও

বিরোধ সৃষ্টি হয়ে না যায়। আর এ ঘটনাটি ঘটে দু'বার। একবার মহানবী ﷺ -কে স্বপ্নযোগে দেখানো হয় এবং তিনি বিষয়টি মুসলমানদের কাছে বলেন। তাতে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষ সামনা-সামনি হয়, তখন মুসলমানদেরকে কাফেরদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়। সুতরাং ৪৩ তম আয়াতে স্বপ্নের ঘটনা এবং ৪৪ তম আয়াতে প্রত্যক্ষ জাগ্রত অবস্থার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে এমন দেখাচ্ছিল যে, আমি আমার নিকটবর্তী একজনকে বললাম, এরা গোটা নব্বইয়েক লোক হতে পারে। পাশের লোকটি বলল, না, তা নয়– শতেক হতে পারে হয়তো।

শেষ আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সে সংখ্যাই তাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষেই অল্প ছিল। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যা মুসলমানদের ছিল, তার চেয়েও কম করে দেখিয়েছেন। যেমন, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু-জাহল মুসলমানদের বাহিনী দেখে তার সাথীদের বলেছিল যে, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে না, যাদের খোরাক একটি উট হতে পারে। আরবে কোনো বাহিনীর সংখ্যা কতটি জীব তাদের খাবার জন্য জবাই করা হয় তারই ভিত্তিতে অনুমান করা হতো। একশ লোকের খোরাক ধরা হতো একটি উট। রাসূলে কারীম ﷺ নিজেও বদর সমরাঙ্গনে মক্কার কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা জানার জন্য সেখানকার কতিপয় লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের বাহিনীতে দৈনিক ক'টি উট জবাই করা হয়? তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, দশটি উট জবাই করা হয়। তাতেই তিনি সৈন্যসংখ্যা এক হাজার বলে অনুমান করে নেন। সারকথা, আবূ জাহলের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট শতেক দেখানো হয়। এখানেও কম করে দেখানোর তাৎপর্য এই যে, কাফেরদের মনে মুসলিম ভীতি যেন পূর্বে থেকে আচ্ছন্ন হয়ে না যায়, যার ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : যা হোক, আয়াতটির দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, কোনো কোনো সময় মুজেযা ও অলৌকিকতা স্বরূপ চোখের দেখাও ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমনটি এক্ষেত্রে হয়েছে।

সেজন্যই এখানে পুনর্বার বলা হয়েছে– لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا অর্থাৎ এহেন কুদরতি বিস্ময় এবং চোখের দৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ এ কারণে প্রকাশ হয় যাতে সে কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, যা আল্লাহ করতে চান। অর্থাৎ মুসলমানদের তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয় দান করে ইসলামের সত্যতা এবং তার প্রতি অদৃশ্য সমর্থন প্রকাশ পায়। বস্তুত এ যুদ্ধের যা উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা এভাবে তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি যা ইচ্ছা করবেন এবং যেমন ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন। তিনি অল্পকে অধিকের উপর এবং দুর্বলকে শক্তিশালীর উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন; তিনি অল্পকে অধিক, অধিককে অল্পে পরিণত করতে পারেন।

অনুবাদ :

٤٥. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً جَمَاعَةً كَافِرَةً فَاثْبُتُوْا لِقِتَالِهِمْ وَلَا تَنْهَزِمُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا أُدْعُوْهُ بِالنَّصْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ ـ

৪৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোনো দলের অর্থাৎ কাফের দলের সম্মুখীন হবে তখন তাদের সাথে যুদ্ধে অবিচল থাকবে হারবে না এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে যাতে তোমরা কৃতকার্য হও। সফলকাম হও।

٤٦. وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا تَخْتَلِفُوْا فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَتَفْشَلُوْا تَجْبُنُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ قُوَّتُكُمْ وَدَوْلَتُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ ـ

৪৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, পরস্পরে বিরোধ সৃষ্টি করবে না, করলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়বে এবং তোমাদের দৃঢ়তা শক্তি ও সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

٤٧. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيَمْنَعُوْا غَيْرَهُمْ وَلَمْ يَرْجِعُوْا بَعْدَ نَجَاتِهَا بَطَرًا وَرِئَآءَ النَّاسِ حَيْثُ قَالُوْا لَا نَرْجِعُ حَتّٰى نَشْرَبَ الْخُمُوْرَ وَنَنْحَرَ الْجَزُوْرَ وَتَضْرِبَ عَلَيْنَا الْقَيَانُ بِبَدْرٍ فَيَتَسَامَعُ بِذٰلِكَ النَّاسُ وَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مُحِيْطٌ عِلْمًا فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ ـ

৪৭. তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজেদের উষ্ট্রারোহী দল রক্ষাকল্পে স্বীয় গৃহ হতে বের হয়। কিন্তু তা রক্ষা পাওয়ার পরও তারা ফিরে গেল না। তারা বলেছিল, বদরে গিয়ে যতক্ষণ না আমরা মদ্যপান, উষ্ট্রবধ এবং গায়িকা নর্তকীদের নিয়ে উল্লাস করেছি, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাব না। আর তখন বিশ্বময় আমাদের বিজয় উৎসবের কথা ছড়িয়ে পড়বে। তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দ্বারা তাদের সকল কর্ম পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অনন্তর তিনি তার প্রতিফল দিবেন। تَعْمَلُوْنَ -এটা ت সহ [দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى সহ [প্রথম পুরুষ] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

٤٨. وَاذْكُرْ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ إِبْلِيْسُ أَعْمَالَهُمْ بِأَنْ شَجَّعَهُمْ عَلٰى لِقَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ لَمَّا خَافُوا الْخُرُوْجَ مِنْ أَعْدَاءِ هُمْ بَنِيْ بَكْرٍ ـ

৪৮. আর স্মরণ কর শয়তান ইবলীস তাদের কার্যাবলি তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তুলে ধরছিল অর্থাৎ কুরাইশরা যখন তাদের শত্রু বনূ বকরের আক্রমণের আশঙ্কা করতেছিল, তখন–

وَقَالَ لَهُمْ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ مِنْ كِنَانَةَ وَكَانَ أَتَاهُمْ فِيْ صُوْرَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ سَيِّدِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْتَقَتْ الْفِئَتٰنِ الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ وَرَاى الْمَلٰئِكَةَ وَكَانَ يَدُهُ فِيْ يَدِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ نَكَصَ رَجَعَ عَلٰى عَقِبَيْهِ هَارِبًا وَقَالَ لَمَّا قَالُوْا لَهُ أَتَخْذُلُنَا عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ مِنْ جِوَارِكُمْ إِنِّيْ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ ط أَنْ يُهْلِكَنِيْ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

এবং তাদেরকে বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার নাই। কিনানা [বনূ বকর] -এর পক্ষ হতে আমিই তোমাদের সাহায্যকারী। ইবলিস উক্ত অঞ্চলের সর্দার সুরাকা ইবনে মালিকের চেহারা ধারণা করে এসে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ যুগিয়েছিল। অতঃপর দু'দল অর্থাৎ মুসলিম ও কাফেররা যখন একত্র হলো পরস্পর সম্মুখীন হলো, আর সে ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ করল, ঐ সময় তার হাত কুরাইশ সর্দার হারিস-ইবনে হিশামের হাতে ছিল তখন সে পলায়নপর হয়ে সরে পড়ল, ফিরে গেল। তাকে এরা বলল, এই অবস্থায় তুমি আমাদের লাঞ্ছিত করতে চাও? সে বলল, আমি তোমাদের বিষয়ে অর্থাৎ তোমাদেরকে আশ্রয়দানের বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত। তোমরা যা দেখতে পাও না অর্থাৎ ফেরেশতা আমি তা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি যে, তিনি আমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِئَةٌ : فِئَةٌ শব্দের অর্থ- জামাত, দল, গ্রুপ। এটা إِسْمُ جَمْعٍ : এর শাব্দিক কোনো একবচন নেই। বহুবচনে- فِئَاتٌ

قَوْلُهُ قُوَّتُكُمْ وَدَوْلَتُكُمْ : এখানে رِيْحٌ শব্দটি قُوَّةٌ এবং دَوْلَةٌ -এর জন্য ধারকৃত। دَوْلَةٌ অর্থ- যুদ্ধ এটা دُوَلٌ রূপে অধিক ব্যবহৃত হয়। دُوْلَةٌ তথা دَالٌ বর্ণে পেশ সহকারে অর্থ-সম্পদ, ধন, মাল। বহুবচনে دُوَلٌ [دَالٌ বর্ণে পেশ]

قَوْلُهُ تَضْرِبُ عَلَيْنَا الْقِيَانُ : ضَرْبُ الْعُوْدِ وَالطُّنْبُوْرِ অর্থ- তবলা এবং সেতারা বাজানো।

قَوْلُهُ قِيَانٌ : একবচনে قَيْنَةٌ অর্থ- اَلْجَوَارِى الْمُغَنِّيَاتِ তথা গায়িকা বাঁদি।

قَوْلُهُ بَدْرٍ : এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী তিনোটি ফে'লের সাথে।

قَوْلُهُ فَيَتَسَامَعُ بِذٰلِكَ : অর্থাৎ فَيُثْنُوْا عَلَيْهِمْ بِالشَّجَاعَةِ তথা ফলে তারা তাদের বীরত্বের প্রশংসা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুদ্ধ-জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত : প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য এবং শত্রুর মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনের কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল। আর তা হলো নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়-

প্রথমত দৃঢ়তা : অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো মন দৃঢ় এটা এমন বিষয় যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর জিকির : এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদাররা ছাড়া সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনী সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এ নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মুতাবিক যে কোনো অঙ্গনে যে কোনো জাতির সাথে মোকাবিলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর জিকিরের নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোনো ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি, যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিন হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সেগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় স্বভাবত এমন এক সময়, যখন কেউ কাউকে স্মরণ করে না; সবাই শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। সেজন্যই জাহিলিয়া আমলের আরব কবিরা যুদ্ধের ময়দানেও নিজেদের প্রেমাস্পদ প্রেয়সীদের স্মরণ করে গর্ববোধ করত যে, এটা যথার্থই বলিষ্ঠ মনোবল ও প্রেমে পরিপক্বতার প্রমাণ বটে। জাহিলিয়া আমলের কোনো এক কবি বলেছেন– ذَكَرْتُكَ وَالْخَطِّي يَخْطُرُ بَيْنَنَا অর্থাৎ আমি তখনো তোমার কথা স্মরণ করেছি, যখন আমাদের মাঝে বর্শা বিনিময় চলছিল। কুরআনে কারীম এহেন শংকাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদের আল্লাহর স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাগিদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম নেই। صَلٰوةً كَثِيْرًا অথবা صِيَامًا كَثِيْرًا কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোনো বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং না এতে অন্য কোনো কাজের কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর জিকিরের জন্য কোনো শর্তাশর্ত, কোনো বাধ্যবাধকতা, অজু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোনো নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোনো মানুষ যে কোনো অবস্থায় অজুর সাথে, বিনা অজুতে দাঁড়িয়ে বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে-হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর জিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে জিকির করাকেই বলা হয় না; বরং প্রতিটি জায়েজ বা বৈধ কাজ আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই জিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী জিক্রুল্লাহর মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও জাকের বলা যেতে পারে। যেমন, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে– نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ অর্থাৎ আলেম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ যে আলেম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হলো বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর জিকিরের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনো কোনো পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত

হতে থাকে, যা মানুষের কাজকর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোনো একটা বাক্য কিংবা কোনো গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কুরআনে কারীমে মুসলমানদেরকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর জিকরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি জিকির তো হলো তাই, যা সাধারণত 'না'রায়ে তাকবীর'-এর শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই 'জিক্রুল্লাহর'-এর অন্তর্ভুক্ত। ৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- أَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর। কারণ আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হলো ثَبَاتْ - ذِكْرُ اللّٰهِ ও إِطَاعَتْ অর্থাৎ দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর জিকির ও আনুগত্য। অতঃপর বলা হয়েছে لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا এতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে- وَلَا تَنَازَعُوا অর্থাৎ তোমরা পরস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের বল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

এতে বিবাদ-বিসংবাদের দু'টি পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে- ১. তোমরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়বে এবং ২. তোমাদের বল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা শত্রুর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পারস্পরিক ঝগড়া ও বিবাদ-বিসংবাদের দরুন অন্যের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কিন্তু এতে নিজের শক্তির উপর এমন কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে যার কারণে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়তে হবে? এর উত্তর এই যে, পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে গোটা দলের শক্তি সংযুক্ত থাকে। ফলে এককভাবে ব্যক্তি ও নিজের মাঝে গোটা দলের সমপরিমাণ শক্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে যখন পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকবে না, তখন ব্যক্তির একার ক্ষমতাই থেকে যায়, যা যুদ্ধ-বিদ্রোহের বেলায় কোনো কিছুই নয়।

সূরা আন্‌ফালের প্রথম থেকেই চলে আসছে বদর যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলি, উপস্থিত পরিস্থিতি, তাতে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশাবলি এবং আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনা। সেসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে শয়তান কর্তৃক মক্কার কুরাইশদের প্রতারিত করে মুসলমানদের মোকাবিলায় নামানো এবং ঠিক যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তার পালিয়ে যাওয়া। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে সে কথাই বলা হয়েছে। শয়তানের এই প্রতারণা ছিল কুরাইশদের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টির আকারে কিংবা মানুষের আকৃতিতে সরাসরি সামনে এসে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে। এতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। তবে কুরআনের শব্দাবলিতে দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রতিই অধিকতর সমর্থন বোঝা যায় যে, সে মানুষের আকৃতিতে সামনাসামনি এসে প্রতারিত করেছিল।

ইমাম ইবনে জারীর (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশংকা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশি বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগ এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ি-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে!! সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুয়িানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ডদল। সুরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় [illegible] আক্রমণের আশংকা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক

প্রথমত– لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আজকের দিনে এমন কেউ নেই, যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষের সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তিসামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি- কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করবে– এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়ত– إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনূ বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমন টি হবে না, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সুরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল, কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনূ বকর গোত্রের আক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল [বদর প্রাঙ্গণে] সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে গেল, তখন শয়তান পেছনে ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তার একটি শয়তানি বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মোকাবিলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন মানবাকৃতিতে সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় শয়তানি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে হযরত জিবরাঈল আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাতে এক কুরাইশী যুবক হারেস ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, একি করছ! তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের শয়তানি বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেস তাকে সুরাকা মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সুরাকা! তুমি তো বলেছিলে "আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি" অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সুরাকা বেশেই উত্তর দিল– إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি হতে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে নাফরমানি করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আজাব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করায় কোনো লাভ নেই।

সুরাকা এবং তার বাহিনীর পশ্চাদপসরণের দরুন স্বীয় বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখে আবূ জাহল কথাটি ঘুরিয়ে বলল, সুরাকা পালিয়ে যাওয়ায় তোমরা ঘাবড়িয়ো না, সে তো মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। যা-হোক, শয়তানের পশ্চাদপসরণের পর তাদের যা পরিণতি হওয়ার ছিল তা-ই হলো। তারপর যখন মক্কায় ফিরে এলো এবং সুরাকা ইবনে মালিকের সঙ্গে তাদের একজনের দেখা হলো, তখন সে সুরাকার প্রতি ভর্ৎসনা করে বলল, "বদর যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ও যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমারই উপর অর্পিত হবে। তুমি ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সমরাঙ্গন থেকে

পশ্চাদপসরণ করে আমাদের জওয়ানদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছ।" সে বলল, "আমি তো তোমাদের সাথেও যাইনি, তোমাদের কোনো কাজেও অংশগ্রহণ করনি। তোমাদের পরাজয়ের সংবাদও তো আমি তোমাদের মক্কায় ফিরে আসার পরেই শুনেছি।"

এসব রেওয়ায়েত ইমাম ইবনে কাসীর (র.) তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, অভিশপ্ত শয়তানের এটি একটি সাধারণ অভ্যাস যে, সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে ঠিক সময় মতো আলাদা হয়ে যায়। তার এ অভ্যাস সম্পর্কে কুরআনে কারীমও বার বার আলোচনা করেছে। এক আয়াতে রয়েছে–

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْٓ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

শয়তানের ধোঁকা প্রতারণা এবং তা থেকে বাঁচার উপায় : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে

১. শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোনো কোনো সময় শুধু মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

২. শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফিকহবিদের গ্রন্থ 'আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান'-এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সূফী মনীষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশ্ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তাঁরা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোনো লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোনা রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে এমন কি কাশ্ফ ও ইলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য :

৩. যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোনো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসেবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভালো মনে শুরু করে দেয়। ন্যায়পন্থিদের মতো তারাও নিজেদের অন্যায় অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল– اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اَهْدَى الطَّائِفَتَيْنِ অর্থাৎ "আয় আল্লাহ! উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থি তারই সাহায্য কর, তাকেই বিজয় দান কর।" এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থি বলে মনে করতো। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জানমাল কোরবান করে দিতো।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অনুবাদ :

٤٩. اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ اَىِ الْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ ط اِذْ خَرَجُوْا مَعَ قِلَّتِهِمْ يُقَاتِلُوْنَ الْجَمْعَ الْكَثِيْرَ تَوَهُّمًا اَنَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ بِسَبَبِهٖ قَالَ تَعَالٰى فِىْ جَوَابِهِمْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ يَثِقْ بِهٖ يَغْلِبْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ .

৪৯. মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি অর্থাৎ যাদের ঈমান দুর্বল তারা বলে, এদের ধর্ম এদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদের দীন তাদেরকে ছলনায় রেখেছে। সুতরাং এই কারণে তাদেরকে সাহায্য করা হবে বলে কল্পনা করত এত অল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও এত বিরাট এক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে বের হয়ে এসেছে। এদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করলে আস্থা স্থাপন করলে সে জয়ী হবে। আল্লাহ তো পরাক্রান্ত, তাঁর বিষয়ে তিনি পরাক্রমশালী ও তাঁর ক্রিয়াকর্মে তিনি প্রজ্ঞাময়।

٥٠. وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذْ يَتَوَفَّى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ حَالٌ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ج بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيْدٍ وَ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ اَىِ النَّارِ وَجَوَابُ لَوْ لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا .

৫০. কাফেরদের যখন [illegible] করছিল তখন হে মুহাম্মদ! يَتَوَفّٰى -এটা ي সহ প্রথম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت সহ প্রথম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই পাঠ রয়েছে। তুমি যদি দেখতে ফেরেশতাগণ লৌহের গদা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতেছিল এবং يَضْرِبُوْنَ -এটা حَالٌ বা অবস্থাবাচক এবং তাদেরকে বলতেছিল তোমরা জাহান্নামের দহন শাস্তির স্বাদ ভোগ কর তবে সাংঘাতিক এক বিষয় প্রত্যক্ষ করতে। لَوْ تَرٰى -এটার جَوَابٌ এইস্থানে উহ্য। তা হলো لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا অর্থাৎ যদি দেখতে তবে সাংঘাতিক এক বিষয় দেখতে।

٥١. ذٰلِكَ التَّعْذِيْبُ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ عَبَّرَ بِهَا دُوْنَ غَيْرِهَا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ .

৫১. এই শাস্তি তোমাদের কর্মফল আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচারী। অর্থাৎ মোটেই অত্যাচারী নন যে তিনি তাদেরকে বিনা অপরাধে শাস্তি প্রদান করবেন। بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ -[তোমাদের হাত যা পূর্বে করেছে অর্থাৎ তোমাদের কর্মফল] এই স্থানে কেবল হাত উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, অধিকাংশ কাজ হাতের সাহায্যেই সমাধা হয়। ظَلَّامٌ -[অতিশয় জুলুমকারী]-এটা যদিও مُبَالَغَةٌ বা অতিশয়োক্তিবাচক শব্দ; কিন্তু এই স্থানে সাধারণ অর্থ জুলুমকারী ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٢. دَاْبُ هٰٓؤُلَآءِ كَدَاْبِ كَعَادَةِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِالْعِقَابِ بِذُنُوْبِهِمْ ط جُمْلَةُ كَفَرُوْا وَمَا بَعْدَهَا مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَلٰى مَا يُرِيْدُهٗ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

৫২. এদের আচরণ ফেরাউনগোষ্ঠী ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের আচরণের ন্যায়। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ এদেরকে এদের পাপের জন্য শাস্তিতে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তার উপর শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। كَفَرُوْا -এটা এবং তৎপরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটির ব্যাখ্যা স্বরূপ।

٥٣. ذٰلِكَ اَىْ تَعْذِيْبُ الْكَفَرَةِ بِاَنْ اَىْ بِسَبَبِ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ مُبَدِّلًا لَهَا بِالنِّقْمَةِ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ يُبَدِّلُوْا نِعْمَتَهُمْ كُفْرًا كَتَبْدِيْلِ كُفَّارِ مَكَّةَ اِطْعَامَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَاَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَبَعْثَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقِتَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

৫৩. এটা অর্থাৎ কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান এই জন্য যে, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা আজাব দ্বারা পরিবর্তন করেন না, বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। অর্থাৎ তাদের উপর কৃত অনুগ্রহের বদলে কুফরি গ্রহণ করে। যেমন মক্কার কাফেররা ক্ষুধায় অন্ন, ভয় হতে নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের প্রতি রাসূল ﷺ -এর প্রেরণ প্রভৃতি অনুগ্রহের স্থলে কুফরি, আল্লাহর পথে বাধা প্রদান ও মুমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করা গ্রহণ করে নিয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ بِاَنْ -এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

٥٤. كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ج قَوْمَهُ مَعَهُ وَكُلٌّ مِنَ الْاُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ .

৫৪. ফেরাউন গোষ্ঠী ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায় এরা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে অনন্তর তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে অর্থাৎ তৎসহ তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

٥٥. وَنَزَلَ فِىْ قُرَيْظَةَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

৫৫. বনু কুরাইযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরি করে এবং ঈমান আনে না।

٥٦. اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ اَنْ لَا يُعِيْنُوا الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ عَاهَدُوْا فِيْهَا وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ فِىْ غَدْرِهِمْ .

৫৬. তাদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ যে তারা মুশরিকদেরকে কোনোরূপ সাহায্য করবে না তারা যতবারই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে প্রতিবারই চুক্তিভঙ্গ করেছে এবং তারা এই বিশ্বাসঘাতকতায় আল্লাহকে ভয় করে না।

٥٧. فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ تَثْقَفَنَّهُمْ تَجِدَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ فَرِّقْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الْمُحَارِبِيْنَ بِالتَّنْكِيْلِ بِهِمْ وَالْعُقُوْبَةِ لَعَلَّهُمْ اَىِ الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ بِهِمْ .

৫৭. যুদ্ধে তোমরা যদি তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা ও শাস্তি দিয়ে [যারা] অর্থাৎ যে সমস্ত যোদ্ধা তাদের পশ্চাতে রয়েছে তাদের হতে এদেরকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিবে যাতে তারা অর্থাৎ যারা পশ্চাতে রয়েছে। তারা শিক্ষা লাভ করে, এদের মাধ্যমে উপদেশ লাভ করে। اِمَّا -এতে শর্তবাচক শব্দ اِنْ -এর نُوْنٌ অতিরিক্ত مَا -এর مِيْمٌ -এ اِدْغَامٌ বা সন্ধি হয়েছে। تَثْقَفَنَّهُمْ -এর অর্থ– এদেরকে যদি পাও। شَرِّدْ অর্থ– বিচ্ছিন্ন করে দাও।

٥٨. وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ عَاهَدُوكَ خِيَانَةً فِي الْعَهْدِ بِاَمَارَةٍ تَلُوحُ لَكَ فَانْبِذْ اِطْرَحْ عَهْدَهُمْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ط حَالٌ اَيْ مُسْتَوِيًا اَنْتَ وَهُمْ فِي الْعِلْمِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ بِاَنْ تَعْلَمَهُمْ بِهِ لِئَلَّا يَتَّهِمُوكَ بِالْغَدْرِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ.

৫৮. যারা তোমার সাথে চুক্তিবদ্ধ তাদের মধ্যে কোনো সম্প্রদায়ের যদি তুমি কোনো আলামত পেয়ে চুক্তিতে বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তুমি তাদের সাথে কৃত চুক্তি এমনভাবে নিক্ষেপ কর যে চুক্তি বাতিলের সংবাদ অবহিত হওয়ার বিষয়ে তোমরা উভয়েই এক সমান। অর্থাৎ চুক্তি বাতিলের কথা তাদেরকে জানিয়ে দাও যেন তারা আর তোমাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিতে না পারে। আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না। فَانْبِذْ -অর্থ নিক্ষেপ কর। عَلَى سَوَاءٍ -এটা এই স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَغْلِبُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ يَتَوَكَّلْ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো يَغْلِبُ : এই উহ্য থাকার উপর পরবর্তী বাক্য فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ দিক নির্দেশনা দিচ্ছে

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ : প্রশ্ন. تَرٰى হলো مُضَارِعٌ -এর সীগাহ্ যা বর্তমান ও ভবিষ্যতকালকে বুঝায়। আর اِذْ يَتَوَفَّى -টা مَاضِىْ -এর উপর দালালত করে কেননা اِذْ টা মুযারেকে مَاضِىْ -এর অর্থে করে দেয়। কাজেই উভয় বাক্যের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে।

উত্তর. لَوْ -টা مُضَارِعٌ -কে مَاضِىْ -এর অর্থে নিয়ে যায়। কাজেই উভয় বাক্যের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ مَقَامِعُ : এটা مِقْمَعَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– হাতুড়ি। লৌহগদা। এটা مِكْنَسَةٌ -এর ওযনে হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ : এতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন. । ذُوْقُوْا -এর আতফ يَضْرِبُوْنَ -এর উপর হয়েছে আর خَبَرٌ -এর উপর اِنْشَاءٌ -এর আতফ مُسْتَحْسَنٌ নয়। অন্য আরেকটি আপত্তি হলো একই বাক্যে غَائِبٌ এবং حَاضِرٌ একত্র হচ্ছে আর এটাও مُسْتَحْسَنٌ নয়।

উত্তর. ذُوْقُوْا -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য রয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই উভয় আপত্তিরই নিরসন হয়ে গেল। لَوْ -এর জবাবকে ভয়ানকের বড়ত্ব প্রমাণ করার জন্য উহ্য করে দিয়েছেন। যেটাকে মুফাসসির (র.) لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন

قَوْلُهُ دَابُ هٰؤُلَاءِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে رَفْعٌ -এর مَحَلٌّ এ হয়েছে। কাজেই বাক্য অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার আপত্তি শেষ হয়ে গেল এবং এই আপত্তিও শেষ হয়ে গেল যে, এখানে সন্দেহ ব্যতীত তাশবীহ লাজেম আসে।

قَوْلُهُ جُمْلَةُ كَفَرُوْا مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন হলো ধারাবাহিক বাক্যের মাঝে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ -কে কোন উদ্দেশ্যে فَاصِلٌ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর হলো এটা পূর্বের বাক্যের তাফসীর হয়েছে। কাজেই এই উপরিউক্ত ফসল جِنْسِىْ নয়, যার আপত্তি হতে পারে।

قَوْلُهُ بِالنِّعْمَةِ : এটা اِنْتِقَامٌ হতে اِسْمٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِطْعَامُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا بِاَنْفُسِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ামতসমূহ। যেমন– খাবার দাবার ইত্যাদি উদ্দেশ্য; অবস্থা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এই আপত্তি শেষ হয়ে গেল যে, কুরাইশ এবং ফেরাউন পরিবারের জন্য সন্তোষজনক অবস্থাই ছিল না যে, তাদেরকে অসন্তোষজনক অবস্থার দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। –(تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ)

قَوْلُهُ تَجِدَنَّهُمْ : অর্থাৎ- تَظْفُرَنَّهُمْ وَتَغْلِبَنَّهُمْ

قَوْلُهُ بِالتَّنْكِيْلِ : এর অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া।

قَوْلُهُ اَنْتَ وَهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُسْتَوِيًا টা نَابِذْ এবং مَنْبُوْذٌ তথা فَاعِلْ এবং مَفْعُوْلٌ উভয়টি হতে حَالٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ الخ : বদরের রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১০০০। কাফেররা সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। নগণ্য সংখ্যক নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদের মনোবল দেখে মদিনাবাসী মুনাফিকরা বলতে লাগলো, এই মুসলমানগণ আসলে ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মোকাবিলায় তারা রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। কেননা নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি সৈন্যের মোকাবিলা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ : একথা শুধু মুনাফিকরাই বলেনি; বরং সেসব লোকেরাও একথা বলেছে যাদের চিত্ত ছিল দুর্বল, অন্তরে ছিল সন্দেহ, যাদের ঈমান খাঁটি ছিল না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা মুশরিক ছিল। আর কেউ বলেছেন, তারাও মুনাফিকই ছিল। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, রুগ্‌ণ অন্তর বিশিষ্ট লোক যাদেরকে বলা হয়েছে তারা হলো সেসব লোক, যারা মক্কায় ইসলাম কবুল করেছিল; কিন্তু হিজরত করেনি। যখন পৌত্তলিকরা বদরের ময়দানে গমন করে তখন তাদেরও সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে তাদের মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ফলে তারা মুরতাদ হয়ে যায় তখন বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ [মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম ধোঁকা দিয়েছে] যারা সেদিন এই সব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তারা ছিল কায়েস ইবনে ওলীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী, আবূ কায়েস ইবনে ফাকিহ ইবনে মুগীরা মাখযূমী, হারেস ইবনে জুমায়া ইবনে আসওয়াদ , আলী ইবনে উমাইয়া, আস ইবনে মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১৫, পৃ. ১৭৬]

ইমাম রাযী (র.) এই আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক বলা হয়েছে মদিনার আউস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে, আর যাদের চিত্ত রুগ্‌ণ বলা হয়েছে তারা হলো মক্কার সেসব লোক যারা ইসলাম কবুল করেছিল; কিন্তু তাদের ঈমান দুর্বল ছিল বলে তারা হিজরত করেনি। মক্কা থেকে যখন মুশরিকরা বদরের জন্য রওয়ানা হয় তখন তারাও সঙ্গী হয় এই ধারণায় যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গীদের সংখ্যা বেশি হয় তবে তাঁর নিকট চলে যাবে আর যদি মুসলমানদের সংখ্যা কম হয় তবে নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথেই থাকবে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, এই সব লোক বদরের যুদ্ধের দিন নিহত হয়। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, দুশমনের বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক মুসলমানদের মনোবল তাদের ধর্মান্ধতা নয়; বরং প্রকৃত অবস্থা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি মুসলমানদের যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা রয়েছে এটি হলো তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এই অটুট বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করেন। সবলকে দুর্বল করা দুর্বলকে সবল প্রমাণিত করা আল্লাহ পাকের পক্ষে সর্বদা সহজ এবং সম্ভব। আর আল্লাহ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ "যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"

قَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : আর যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে সে অপমানিত হয় না, সে দুর্বল হয় না। আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময় তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তিনি সকল অবস্থায়ই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল লোকদেরকে বিজয় দান করতে পারেন। কিন্তু যদি কোনো সময় তিনি বিজয় দান না করেন, তবে তা হয় কোনো বিশেষ হিকমতের কারণে।

-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ২৩৭, তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৮৬]

ইমাম রাযী (র.) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে আর যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তথা যে নিজের বিষয় আল্লাহ পাকের উপর সম্পূর্ণ করে আল্লাহ পাকই তাকে হেফাজত করেন এবং সাহায্য করেন। কেননা তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের দান করে থাকেন ছওয়াব এবং রহমত। −[তাফসীরে কবীর খ. ১৫, পৃ. ১৭৭]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে সে কোনো দিনও অপমানিত হয় না। কেননা আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আর তিনি বিজ্ঞানময় হিকমতওয়ালা, তিনি তাঁর হিকমতের কারণে এমন কাজ করেন, যা মানুষের জন্য কল্পনাতীত। এজন্য বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে যা তাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়।

দুনিয়াতে কাফেরদের অপমান পরাজয় এবং নিহত হওয়ার বর্ণনার পর আখিরাতে তাদের যে কঠোর শাস্তি হবে তা উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে− وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

অর্থাৎ হে রাসুল! যদি আপনি কাফেরদের মৃত্যুকালীন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতেন যখন তাদেরকে ফেরেশতারা তাদের মুখ এবং পিঠে প্রহার করে তাদের রূহ কবজ করে তখন ফেরেশতাগণ বলে এই শাস্তিতো শুধু সূচনা মাত্র এরপর আলমে বরজখ বা মধ্যলোকের শাস্তি এবং আখিরাতের তথা পরকালের শাস্তি তোমাদের জন্য রয়েছে অবধারিত। বদরের যুদ্ধে কাফেররাও এই শাস্তি ভোগ করেছে। বস্তুত কাফেরদের মৃত্যুকালীন অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।

قَوْلُهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ : অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কাফেরদেকে অগ্নির কোড়া দিয়ে তাদের মুখ এবং পৃষ্ঠে প্রহার করে থাকেন। তাফসীরকার সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেছেন। আলোচ্য আয়াতে أَدْبَارَهُمْ শব্দটির দ্বারা তাদের নিতম্ব উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এর দ্বারা তাদের কঠোর শাস্তির কথাই ঘোষণা করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যে শাস্তির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তা বদরের যুদ্ধের ঘটনা। মধ্যলোকের বিষয় নয়। বদরের যুদ্ধে যখন মুশরিকরা মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হতো তখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখের উপর তরবারি দিয়ে আঘাত দিতেন। আর যখন তারা পলায়ন করতো তখন তাদের পৃষ্ঠে প্রহার করতেন। এভাবে ফেরেশতাগণ কাফেরদেরকে হত্যা করেন। তখন ফেরেশতাগণ একথাও বলেছেন, ভবিষ্যতে অগ্নির শাস্তি ভোগ করবে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ফেরেশতাদের লোহার বুরুজ দ্বারা কাফেরদেরকে প্রহার করতেন। এজন্য ফেরেশতাদের প্রহারের কারণেই তাদের দেহ অগ্নিদগ্ধ হতো। −[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৪৮]

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, কাফেরদের রূহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, যখন তাদের দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটে তখন সে চরম কষ্ট পায়। এ দিকে যখন সম্মুখে তাকায় তখন অন্ধকার ছাড়া সে কিছুই দেখে না, তখন দু'দিক থেকেই সে কষ্ট ভোগ করে। এই নিষ্ঠুর পরিণাম প্রত্যেক কাফেরের জন্য অপেক্ষা করেছে। −[তাফসীরে কবীর খ. ১৫, পৃ. ১৭৮]

قَوْلُهُ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ : আর কাফেরদের এই শাস্তির জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। তাই ইরশাদ হয়েছে যে, এই শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যার অনন্ত অসীম নিয়ামত তোমরা সারাজীবন ভোগ করেছ তাঁর একত্ববাদকে তোমরা অস্বীকার করেছো, তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছ তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছ; তিনি দয়া করে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে নাজিল করেছেন পবিত্র কুরআন তোমরা তাকে অবিশ্বাস করেছ, তিনি তোমাদের হেদায়তের জন্যে তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে প্রেরণ করেছেন, তোমরা তাঁকে ভক্তি ও বিশ্বাস করনি। অতএব, এই শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি। আর এর দ্বারা তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হয়নি, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে অবিচার নেই, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি আদৌ অবিচার করেন না।

قَوْلُهُ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : বদরের যুদ্ধে কাফেরদের ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়; বরং ফেরাউন এবং তার দলবল যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন।' কিন্তু ফেরাউন এবং তার দলবল আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীকে অস্বীকার করে এবং তারও পূর্বে আদজাতি, সামুদ জাতি পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল আল্লাহর নাফরমান হয়েছিল, আল্লাহ পাক যথারীতি তাদের হেদায়েতের জন্যও নবী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা যে তিমিরেই রয়ে গেল। এমন কি তাদের অবাধ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। পরিণামে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তি নেমে এলো। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সলীল সমাধি হলো। আদ জাতি এবং সামুদ জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অতএব, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গে যা হয়েছে তা আল্লাহ পাকের চির শাশ্বত নীতি, নতুন কিছু নয়, যুগ যুগ ধরে এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। এই পৃথিবীতে যখনই কোনো জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় তখন তাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশের সুযোগে আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা আরো বেশি পাপাচারে লিপ্ত হয়।

অবকাশের সুযোগে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়। তখন তারা ধরাকে সরা মনে করে। এরপর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। কুরআনে কারীমের সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে ঘোষণা করেছেন–

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا

আর আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সৎকাজের আদেশ প্রদান করি; কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে এরপর তাদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়, অবশেষে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তি প্রদানে কঠোর। কেউ তাঁর শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে না। নাফরমানদের জন্যে তাঁর শাস্তি অবধারিত।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন। আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৩, পৃ. ২৫০, তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৪৮-৪৯]

قَوْلُهُ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ আলোচ্য আয়াতে উদ্দেশ্য হলো এ কথা ব্যক্ত করা যে, যখন কোনো জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি দান করা হয়, কিন্তু তারা তার মূল্য বুঝে না এবং আল্লাহর দরবারে প্রণত হয় না, তখন সে নিয়ামতসমূহকে বালা-মসিবতে রূপান্তরিত করে দেওয়াই হলো আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম। সুতরাং ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও যখন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মূল্য দেয়নি, তখন তাদের কাছ থেকে নিয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তদস্থলে তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছে। এছাড়া কোথাও শব্দের কিছু পরিবর্তন করে বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম আয়াতে ছিল– كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আর এখানে বলা হয়েছে– بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ এতে 'আল্লাহ' পরিবর্তে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা বড় জালিম ও ন্যায়বিমুখ যে, যে সত্তা তাদের 'রব' তথা পালনকর্তা তাদেরকে প্রাথমিক অস্তিত্ব থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত যার নিয়ামত প্রতিপালন করেছে, এরা তাঁরই নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে।

তাছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে فَاَخَذَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ এতে পূর্বের সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। কারণ প্রথম আয়াতে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করার কথাই বলা হয়েছিল যার বিভিন্ন রূপ হতে পারত। জীবিত অবস্থায়ও নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন করে কিংবা সম্পূর্ণভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে আজাবে পাকড়াও করা যেতে পারত। কাজেই এ আয়াতে اَهْلَكْنٰهُمْ বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সে সমস্ত জাতির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি। প্রত্যেক জাতির ধ্বংসের রূপও ছিল বিভিন্ন। ফেরাউন যেহেতু খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং তার সম্প্রদায়ও তার সত্যতা স্বীকার করতো, সেজন্য বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছি। অন্যান্য জাতির ধ্বংসের বিধৃত রূপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়নি। তবে অন্য আয়াতে তার বিচরণও হয়েছে। কারো উপর ভূমিকম্প নাজিল হয়েছে কেউ মাটিতে ধসে গেছে, কারো আকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে আবার কারো উপর তুফান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সবশেষে মক্কার মুশরিকদের উপর বদর প্রাঙ্গনে মুসলমানদের মাধ্যমে আজাব এসেছে।

এর পরবর্তী আয়াতে সেসব কাফের সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا দাওয়াব্ব শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যহার করা হয়েছে আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে- فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের মতো খানাপিনা ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদি সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

তদুপরি বাক্যটিতে সে সমস্ত লোককে আজাব থেকে বাদ দেওয়াও উদ্দেশ্য, যারা যদিও তখন কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কোনো সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের সাবেক ভ্রান্ত কাজ থেকে তওবা করে নেয়। বস্তুত হয়েছেও তাই। তাদের মধ্য থেকে বিরাট একদল মুসলমান হয়ে শুধু যে নিজেই সৎ ও পরহেজগার হয়েছে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণব্রত ও পরহেজগারীর আহ্বায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় আয়াত : اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ এ আয়াতটি মদিনার ইহুদি এবং বনূ কোরায়জা ও বনূ নযীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে জালিম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবিদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদি। মক্কায় মুশরিকদের মাঝে আবূ জাহল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদিনার ইহুদিদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে আশরাফ।

রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্যে করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল। এদিকে ইসলামি রাজনীতির তাকাদা ছিল এই যে, যতটা সম্ভব মদিনার ইহুদিদেরকে কোনো না কোনো চুক্তি-প্রতিশ্রুতির আওতায় নিজেদের সাথে জড়িয়ে রাখা, যাতে তারা মক্কাবাসীদের মদীনায় এনে না তুলে। তাছাড়া ইহুদিরাও নিজেদের ভয়ের দরুন এরই আগ্রহী ছিল।

ইসলামি রাজনীতির প্রথম ধাপ : ইসলামি জাতীয়তা : রাসূলে কারীম ﷺ মদিনায় আগমনের পর ইসলামি রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুজুর ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। পারস্পরিকভাবে এবং মুহাজিরীনদের সাথেও তিনি ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

দ্বিতীয় ধাপ : ইহুদিদের সাথে মৈত্রী চুক্তি : এ রাজনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দুটি। ১. মক্কার মুশরিকীন, যাদের অত্যচার উৎপীড়ন মুসলমানদেরকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং ২. মদিনার ইহুদিবর্গ, যারা তখন মুসলমানদের প্রতিবেশি হয়েছিল। এদের মধ্যে থেকে ইহুদিদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যার একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞাও লেখা হয় এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদিনা এলাকার সমস্ত ইহুদি, মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য তাফসীরে ইবনে কাসীর, 'আল্ বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' এবং সীরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদিনায় ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে প্রকাশ্য বা গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে মক্কার মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে। তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদের অপমানসূচক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে ওজর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লঙ্ঘন করব না।

মহানবী ﷺ ইসলামি গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাবের বাধ্য ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ততার কথা জানতে পেয়ে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনায় ইহুদিরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারের চুক্তির লঙ্ঘন, যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। উল্লিখিত আয়াতে এভাবে বারবার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে- وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ অর্থাৎ এরা ভয় করে না এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখিরাতের কোনো চিন্তা নেই। কাজেই এরা আখিরাতের আজাব থেকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে, এরা নিজেদের গাফলতি ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবূ জাহলের মতো কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদিদের দেশ ছাড়া করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে সেসব চুক্তি লঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে একটি হেদায়েতনামা দিয়েছেন, যার শব্দ নিম্নরূপ- فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূলধাতু تَشْرِيْد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোনো যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন, যা অন্যদের জন্যও নিদর্শন হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হলো এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেওয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন নিদর্শনমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থায় দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় : পঞ্চম আয়াতে রাসূলে মকবুল ﷺ -কে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতলে দেওয়া হয়েছে। এতে চুক্তির অনুবর্তিতার গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কোনো সময় যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েজ নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হলো এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদের সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হলো এই– وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ অর্থাৎ আপনার যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন, যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ আল্লাহ খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না। অর্থাৎ যে জাতির সাথে কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবিলায় কোনো রকম সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েজ নয়। অবশ্য যদি অপর পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়, অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না; বরং যে কোনো প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

এই হলো ইসলামের ন্যায় পরায়ণতা ও সুবিচার যে, এতে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের হক বা অধিকারেরও হেফাজত করা হয় এবং মুসলমানদের উপরও তাদের মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় যে, চুক্তি প্রত্যাহারের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রস্তুতিও যেন গ্রহণ না করে। –[তাফসীরে মাযহারী]

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা : আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ সুলায়মান ইবনে আমের-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মু'আবিয়া (রা.) এবং কোনো এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা.) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর পর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মু'আবিয়ার সৈন্যদল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল। দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চস্বরে এ শ্লোগান দিয়ে আসছেন যে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرًا অর্থাৎ না'রায়ে তাকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে জাতি বা সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে কোনো গিঁঠ খোলা অথবা বাঁধাও চাই না। যা হোক, হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ। হযরত মু'আবিয়া (রা.) ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

অনুবাদ :

٥٩. وَنَزَلَ فِيْمَنْ اَفْلَتَ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ يَا مُحَمَّدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ط اَللّٰهَ اَيْ فَاتُوْهُ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ لَا يَفُوْتُوْنَهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ التَّحْتَانِيَّةِ فَالْمَفْعُوْلُ الْاَوَّلُ مَحْذُوْفٌ اَيْ اَنْفُسَهُمْ وَفِيْ اُخْرٰى بِفَتْحِ اَنَّ عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ ـ

৫৯. বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের যারা পলায়ন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। হে মুহাম্মাদ! কখনো মনে করবেন না যে কাফেররা আল্লাহকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছে, অর্থাৎ এরা পরিত্রাণ পেয়েছে। তারা কখনো তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না, এড়িয়ে যেতে পারবে না। لَا تَحْسَبَنَّ -এটা অপর এক কেরাতে ی অর্থাৎ প্রথমপুরুষরূপে পঠিত রয়েছে, এমতাবস্থায় এর مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ অর্থাৎ প্রথম কর্মপদ اَنْفُسَهُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে। اَنَّهُمْ -এটা অপর এক কেরাতে اَنَّهُمْ [ফাতাহসহ] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার পূর্বে একটি ل উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে।

٦٠. وَاَعِدُّوْا لَهُمْ لِقِتَالِهِمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ ﷺ هِيَ الرَّمْيُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى حَبْسِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُرْهِبُوْنَ تُخَوِّفُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ اَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج اَيْ غَيْرِهِمْ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ اَوِ الْيَهُوْدُ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ جَزَاؤُهٗ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ تُنْقَصُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا ـ

৬০. তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে। এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে ভীত করবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু মক্কার কাফেরদেরকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। এরা হলো মুনাফিক বা ইহুদি সম্প্রদায়। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় কর তোমাদেরকে তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ তার প্রতিদান হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। قُوَّةٌ অর্থ– শক্তি। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, এটা হলো তীরন্দাযীর শক্তি।

٦١. وَاِنْ جَنَحُوْا مَالُوْا لِلسَّلْمِ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا الصُّلْحِ فَاجْنَحْ لَهَا وَعَاهِدْهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ وَمُجَاهِدٌ مَخْصُوْصٌ بِاَهْلِ الْكِتَابِ اِذْ نَزَلَتْ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط ثِقْ بِهٖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ ـ

৬১. তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে অর্থাৎ তার প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করে اَلسَّلْمُ -এটার س কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিও এবং তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করিও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতটির এই বিধান কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ দ্বারা মানসুখ বা রহিত বলে বিবেচ্য। মুজাহিদ (র.) বলেন, এই আয়াতের বিধান কেবলমাত্র কিতাবীদের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ, কিতাবী ইহুদি সম্প্রদায় বনূ কুরাইযাকে উপলক্ষ করে এই আয়াত নাজিল হয়েছিল। আর আল্লাহর উপর নির্ভর করিও। ভরসা রাখিও, তিনিই সকল কথা শুনেন, সকল কাজ সম্পর্কে জানেন।

٦٢. وَاِنْ يُّرِيْدُوْآ اَنْ يَّخْدَعُوْكَ بِالصُّلْحِ لِيَسْتَعِدُّوْا لَكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ كَافِيْكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ .

৬২. যদি তারা সন্ধির মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার অবকাশ নিয়ে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। حَسْبُكَ অর্থ– তোমার জন্য যথেষ্ট।

٦٣. وَاَلَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ بَعْدَ الْاِحَنِ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط بِقُدْرَتِهٖ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ حِكْمَتِهٖ .

৬৩. এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষের পর প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন, তাদের একত্র করে দিয়েছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতিবন্ধন স্থাপন করতে পারতে না আল্লাহ তাঁর কুদরতে তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর বিষয়ে পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়, কিছুই তাঁর প্রজ্ঞার বাইরে নয়।

٦٤. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ حَسْبُكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৬৪. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট, আর, যথেষ্ট তোমার জন্য তোমার অনুসারী মুমিনগণ। وَمَنِ اتَّبَعَكَ এ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী শব্দ اَللّٰهُ -এর সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে, এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে حَسْبُكَ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَفْلَتَ : এটা বাবে اِنْفِعَالٌ হতে অর্থ– মুক্ত হওয়া, ছেড়ে দেওয়া, পলায়নের পথ অবলম্বন করা। اَلْفَلَاةُ الْبَطْنِ অর্থ হলো ডায়রিয়া হওয়া। اِنْفِلَاتُ الرِّيْحِ অর্থ– বায়ু নির্গত হওয়া। اِنْفِلَاةُ الشَّيْئِ فَلْتَةً অর্থাৎ بَغْتَةً অর্থ– আকস্মিক বের হওয়া।

قَوْلُهٗ لَا تَحْسَبَنَّ : এটা দ্বারা রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে দুই মাফঊল দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়েছে। প্রথমটি হলো اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর দ্বিতীয়টি হলো سَبَقُوْا বাক্য হয়ে। اَللّٰهُ হলো سَبَقُوْا -এর মাফঊল قَرِيْنَةُ مَقَامٍ -এর কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে যাকে মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আর এক কেরাতে تَحْسَبَنَّ টা يَاءٌ -এর সাথে রয়েছে। এই সুরতে يَحْسَبَنَّ -এর মাফঊল উহ্য হবে। অর্থাৎ– لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنْفُسَهُمْ سَابِقِيْنَ اللّٰهَ এক কেরাতে اِنَّهُمْ -এর হামযা فَتْحٌ -এর সাথে রয়েছে এই সুরতে لَاْ উহ্য হবে অর্থাৎ– لِاَنَّهُمْ

قَوْلُهٗ مَصْدَرٌ : رِبَاطُ الْخَيْلِ -এর মধ্যে رَبْطٌ মাসদারটা মাফঊল অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ– اَلْخَيْلُ الْمَرْبُوْطُ [জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়া] رِبَاطٌ -এর عَطْف হয়েছে عَطْفُ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَصْدَرِ রূপে।

قَوْلُهٗ فَاجْنَحْ لَهَا : **প্রশ্ন.** لَهَا -এর যমীর سَلْمٌ -এর দিকে ফিরেছে। যা مُذَكَّرٌ আর যমীর হলো مُؤَنَّثٌ ; এখানে ضَمِيْرٌ এবং مَرْجِعٌ -এর মধ্যে তো مُطَابَقَتْ নেই। এর কারণ কি?

উত্তর. سَلْمٌ -এর নকীয অর্থাৎ حَرْبٌ -এর হিসেবে যমীরকে مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে। حَرْبٌ হলো مُؤَنَّثٌ سِمَاعِىْ

قَوْلُهٗ كَافِيْكَ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো حَسْبُكَ اللّٰهُ -এর মধ্যে মাসদারের حَمْلٌ টা ذَاتٌ -এর উপর করা আবশ্যক হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

উত্তর. এখানে মাসদারটা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হয়েছে। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না। মুফাসসির (র.) حَسْبُكَ -এর তাফসীর كَافِيْكَ দ্বারা করার মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَصْدَرٌ টা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهٗ الْاِحَنُ : এটা اَلْاِحْنَةُ -এর বহুবচন। অর্থ– গোপন শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا الخ : উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে, এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক আল্লাহর আজাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে- إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো-বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখিরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোনো অপরাধী পাপী যদি কোনো বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে; বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরজ : দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হচ্ছে। বলা হয়েছে- وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের ততটাই অর্জন করতে হবে; বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ যোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকু যথেষ্ট; আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে- مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর-বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোনো উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোনো বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় যদি তা এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

رِبَاطٌ ; وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ : قُوَّتْ শব্দটি ব্যাপকার্থে উল্লেখ করার পর প্রকৃষ্টভাবে বিশেষ قُوَّتْ বা শক্তির কথাও বলা হয়েছে- رِبَاطٌ শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর رُبُوْط অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে ঘোড়া বাঁধা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে বাঁধা ঘোড়া। তবে দু'এরই মর্ম এক। অর্থাৎ জিহাদের নিয়মে ঘোড়া পালা এবং সেগুলোকে বাঁধা কিংবা পালিত ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় এনে সমবেত করা। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে বিশেষ করে ঘোড়ার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তখনকার যুগে কোনো দেশ ও জাতিকে জয় করার জন্য ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও উপকারী। তাছাড়া এ যুগেও বহু জায়গা রয়েছে, যা ঘোড়া ছাড়া জয় করা যাবে না। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার ললাট দেশে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। তীর বানানো এবং চালানোর জন্য বিরাট বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকমে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ অর্থাৎ মুশরিকীনদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জিহাদ কর।' -[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করা হয়েছে।] এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোনো কোনো সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই হুকুম রাখে। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশদানের পর সেসব সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেওয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরজ।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য হয় তাদের মধ্যে অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হলো সেসব লোক, যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা চলছে। অর্থাৎ মক্কার কাফের ও মদিনার ইহুদিরা। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে এখনো মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হলো সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিকরা যারা এখনো মুসলমানদের মোকাবিলায় আসেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কুরআন কারীমের এ আয়াতটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু তাদের উপরই পড়বে না; বরং দূর দূরান্তের কাফের তথা কিসরা ও কায়সার প্রমুখের উপরেও পড়বে। বস্তুত হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরি করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফজিলত এবং তার মহা প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। কোনো কোনো সময় দুনিয়াতেই গনিমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই- যা বহুগুণ, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে- وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا : سَلْم সীন বর্ণের উপর যবর(-) এবং سِلْم সীন বর্ণের নীচে যের (-) উভয় উচ্চারণেই সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফেরা রা কোনো সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনাকেও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর إِنْ جَنَحُوا -এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানরা সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও জায়েজ।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোনো সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রাসূলে কারীম ﷺ -কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন! কারণ তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না; এসব আশঙ্কার বিষয়গুলোকে আল্লার উপর ছেড়ে দিন!

তারপর চতুর্থ আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন- وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবু আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার কার্যসিদ্ধ হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

এ আল্লাহর ওয়াদার প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত অবতরণের পর থেকে মহানবী ﷺ -কে সমগ্র জীবনে এমন কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, যাতে শত্রুদের ধোঁকা-প্রাতারণার দরুন তাঁর কোনো রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন, ওয়াদাটি মহানবী ﷺ -এর জন্য وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ওয়াদারই অনুরূপ। কাজেই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাঁর রক্ষাণাবেক্ষণে নিয়োজিত সাহাবায়ে কেরামকে নিশ্চিন্তভাবেই অব্যাহতি দিয়ে দেন। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, এ ওয়াদাটি বিশেষভাবে মহানবী ﷺ -এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। -[বয়ানুল কুরআন] অন্যান্য লোকদের পক্ষে বাহ্যিক ব্যবস্থা ও অগ্রপশ্চাৎ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

قَوْلُهُ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ : আর আল্লাহ পাকই তাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। যদি সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা হতো তবুও তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে তিনভাবে নিশ্চিন্ত করেছেন। যথা–

১. প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ফয়েজ ও বরকত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে।

২. মুমিনদের সাহায্য করার মাধ্যমে।

৩. মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে। -[খোলাসাতুত তাফাসীর খ. ২, পৃ. ১৮২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْمُؤْمِنِيْنَ শব্দ দ্বারা আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এই দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা এবং কলহ-দ্বন্দ্ব সর্বদাই লেগে থাকতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, তিনি এত শক্তিশালী যে তাঁর ইচ্ছাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আর তিনি এত বিজ্ঞানময় যে তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ইচ্ছা মোতাবেক কখন কি করতে হয় এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম হিকমতপূর্ণ।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা–

১. হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাক এবং আপনার অনুসারী মুমিনগণই যথেষ্ট।

২. হে নবী! আপনার এবং আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অর্থাৎ দুনিয়া, আখিরাত উভয় জাহানে যে কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে বায়দা নামক স্থানে। আর মুমিনদের মধ্যে 'আপনার অনুসারী' বলতে আনসার সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তেত্রিশজন পুরুষ এবং ছয়জন নারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত ওমর (রা.)। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চল্লিশতম ব্যক্তি। আবূ শেখ হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ পাক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল করেন।

বাযযার (র.) ইকরিমার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন মুশরিকরা বলল, আজ আমাদের সম্প্রদায়ের অর্ধেক শক্তি কমে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। এই হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এ আয়াত মক্কায় নাজিল হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাশৈলী দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়াত মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে কবীর খ. ৫, পৃ. ১৬০]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) আরেকটি ব্যাখ্যাও করেছেন তা হলো "হে নবী! যদি আপনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, এক আল্লাহ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর যদি আপনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেন, এর কারণ উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করেন তবে আপনার অনুসারী মুমিনগণ আপনার জন্য এবং আপনার দীনের জন্য যথেষ্ট। আপনার অনুসরণের বরকতে মুসলমানদের নগণ্য সংখ্যক দলও কাফেরদের বিরাট দলকে পরাজিত করতে পারে। যেমন বদরের যুদ্ধের ঘটনা এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৬, পৃ. ২৬০]

অনুবাদ :

٦٥. يَآيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ حُثَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط لِلْكُفَّارِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج مِنْهُمْ وَاِنْ يَّكُنْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِّنْكُمْ مِائَةٌ يَّغْلِبُوْآ اَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ اَىْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ وَهٰذَا خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ لِيُقَاتِلِ الْعِشْرُوْنَ مِنْكُمُ الْمِائَتَيْنِ وَالْمِائَةُ الْاَلْفَ وَيَثْبُتُوْا لَهُمْ ثُمَّ نُسِخَ لَمَّا كَثُرُوْا بِقَوْلِهِ .

৬৫. হে নবী! কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন, উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একশতজন থাকলে এক সহস্র কাফেরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। এই আয়াতটির ভঙ্গি خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক হলেও এই স্থানে এটা اَمْرٌ বা নির্দেশবাচক। অর্থাৎ বিশজন মুসলিমকে দুইশত কাফেরের আর একশত জনকে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং অবিচলিত হয়ে থাকতে হবে পরে মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে এটা مَنْسُوْخٌ বা রহিত করে দেওয়া হয়। পরবর্তী আয়াতটিতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। يَكُنْ -এটা ى [প্রথমপুরুষ পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে بِاَنَّهُمْ -এটার ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

٦٦. اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضُعْفًا ط بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا عَنْ قِتَالِ عَشْرَةِ اَمْثَالِكُمْ فَاِنْ يَّكُنْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج مِنْهُمْ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْآ اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاِرَادَتِهِ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ لِتُقَاتِلُوْا مِثْلَيْكُمْ وَتَثْبُتُوْا لَهُمْ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِعَوْنِهِ .

৬৬. আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দশগুণ বেশি সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দুর্বলতা বিদ্যমান। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা তাদের অর্থাৎ কাফেরদের দুইশতজনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা অভিপ্রায়ে দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ তাঁর সাহায্য সহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন। اِنْ ..... يَكُنْ এটা خَبَرِيَّةٌ হলেও اَمْرٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা দ্বিগুণ সংখ্যকের মোকাবিলায়ও লড়বে এবং তাদের সম্মুখে অবিচল হয়ে থাকবে। ضُعْفًا -এটা ض -এ পেশ ও ফাতাহ সহকারে পঠিত রয়েছে। অর্থ– দুর্বলতা। يَكُنْ -এটা ى [প্রথমপুরুষ পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٦٧. وَنَزَلَ لَمَّا اَخَذُوا الْفِدَاءَ مِنْ اَسْرٰى بَدْرٍ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ تَكُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط يُبَالِغَ فِىْ قَتْلِ الْكُفَّارِ تُرِيْدُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا حِطَامَهَا بِاَخْذِ الْفِدَاءِ .

৬৭. বদর যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করলে এই আয়াত নাজিল হয় যে, পৃথিবীতে ভালোভাবে রক্ত প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কাফের-বধ না হওয়া পর্যন্ত تَكُوْنَ -এটা ى [প্রথমপুরুষ, পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়। হে মুমিনগণ! মুক্তিপণ গ্রহণ করে তোমরা পার্থিব সম্পদ তার তুচ্ছ সামগ্রী কামনা কর,

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ لَكُمُ الْاٰخِرَةَ ط اَىْ ثَوَابَهَا بِقَتْلِهِمْ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً .

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পরকাল অর্থাৎ এদের বধ করার মাধ্যমে পরকালের পুণ্যফল দিতে চান আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতটির বিধান فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً [অর্থাৎ হয় অনুকম্পা প্রদর্শন কর বা মুক্তিপণ গ্রহণ কর।] এই আয়াতটির মাধ্যমে মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে।

٦٨. لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ بِاِحْلَالِ الْغَنَائِمِ وَالْاَسْرٰى لَكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ مِنَ الْفِدَاءِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

৬৮. গণীমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী ও বন্দী রাখা তোমাদের জন্য বৈধ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা মুক্তিপণরূপে যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আপতিত হতে।

٦٩. فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৬৯. যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ : এটা হলো একটি আপত্তির উত্তর আপত্তি হলো এই যে– يَغْلِبُوْنَ اَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর মধ্যে খবর দেওয়া হলো যে একশত ধৈর্যশীল মুসলমান এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। আর আল্লাহ তা'আলার খবরের মধ্যে মিথ্যা তথা ঘটনার বিপরীত সম্ভাবনা নেই, অথচ কোনো কোনো সময় সমপর্যায়ের হওয়ার পরও কাফেররা বিজয় লাভ করে ফেলে?

উত্তর. খবরটা اَمْر অর্থে হয়েছে। আর اَمْر -এর মধ্যে মিথ্যার সম্ভাবনা হয় না।

قَوْلُهُ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে– عَلِمَ بِالضَّعْفِ -কে اَلْاٰنَ -এর সাথে مُقَيَّدٌ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার عِلْمٌ بِالْحَادِثِ নেই।

উত্তর. আল্লাহ তা'আলার عِلْم حَادِث -এর সাথে অনেক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু قَبْلَ الْوُقُوْعِ এ হিসেবে যে, اِنَّهٗ سَيَقَعُ আর সংঘটিত হওয়ার.পর এ হিসেবে যে بِاَنَّهٗ يَقَعُ আর সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এ হিসেবে যে بِاَنَّهٗ وَاقِعٌ

قَوْلُهُ اَلْحُطَامُ : অর্থ তুচ্ছ বস্তু, স্বল্প সম্পদ। টুকরো টুকরো ও ছেড়া ফাঁটা।

قَوْلُهُ اَىْ ثَوَابَهَا : উহ্য মুযাফের মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে যে, نَفْس اٰخِرَة তো প্রত্যেকের জন্যই প্রমাণিত এরপরও يُرِيْدُ بِكُمُ الْاٰخِرَةَ -কে নির্দিষ্ট করার কারণ কি?

উত্তর. আখিরাত তো সকলের জন্য রয়েছে; কিন্তু আখিরাতের প্রতিদান শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ : এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য একটি যুদ্ধনীতির আলোচনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় তাদেরকে কতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করা ফরজ এবং কোন পর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করা পাপ। পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার বিবরণে এর বিশদ আলোচনা এসে গেছে যে, আল্লাহর গায়বি সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকে বলে তাদের ব্যাপারটি পৃথিবীর সাধারণ জাতি সম্প্রদায়ের মতো নয়, এদের অল্প সংখ্যকও অধিক সংখ্যকের উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। যেমন, কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে– كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ বহু স্বল্প সংখ্যক দল আল্লাহর হুকুমে অধিক সংখ্যক প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণা

সত্যতার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে অমুসলমানদের সাথে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে কোনো দিনই মুসলমানদের সংখ্যা শত্রু সৈন্য থেকে অধিক ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বিজয়মালা শোভা পেয়েছে মুসলমানদের কণ্ঠে। এ পর্যায়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না–

যুদ্ধ	মুসলমানদের সংখ্যা	শত্রুসৈন্য	বিজয়
বদর	৩১৩	১০০০	মুসলমানদের
ওহুদ	৭০০	৩, ০০০	,,
খন্দক	৩.০০০	১২.০০	,,
মুতা.	৩,০০০	১০,০০০	,,
ইয়ারমুক	৪০, ০০০	২.৪০.০০০	,,
কাদেসিয়া	৮.০০০	৬০.০০০	,,
স্পেন	৭. ০০০	১.০০.০০০	,,
সিন্ধু	৬.০০০	৫০. ০০০	,,

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমান কোনোদিন জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে লড়াই করে না; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে তো আরো বড় সফলতা।

সেজন্যই ইসলামের সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে দশজন মুসলমানকে একশ' লোকের সমান সাব্যস্ত করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়চিত্ত লোক থাকো, তাহলে দু'শ শত্রুর উপর জয়ী হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি একশ জন হও, তবে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।"

এতে সংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একশ মুসলমান এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্যে হলো এই নির্দেশ দান যে, একশ মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের মোকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। এর কারণ যাতে মুসলমানদের মন এ সুসংবাদে দৃঢ় হয়ে যায় যে, আল্লাহ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। যদি নির্দেশাত্মক বাক্যের মাধ্যমে এ হুকুম দেওয়া হতো, তবে প্রকৃতগতভাবেই তা ভারি বলে মনে হতে পারত।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধ গাযওয়ায়ে বদর এমন এক অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। তাও আবার সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না; বরং জরুরি ভিত্তিতে যারা তৈরি হতে পেরেছিলেন শুধু তাঁরাই এ যুদ্ধের সৈনিক হয়েছিলেন। কাজেই এ যুদ্ধে এক'শ মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে মোকিবলা করার নির্দশ দেওয়া হয় এবং এমনই ভঙ্গিতে দেওয়া হয়, যার সাথে সাহায্যের ওয়াদাও বিদ্যমান থাকে।

قَوْلُهُ اَلْـئٰنَ خَـفَّـفَ اللّٰـهُ الخ : আয়াতে পরবর্তীকালের জন্য এ নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী করা হয় যে–

"এখন আল্লাহ তা'আলা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের কমতি দেখা দিয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক দৃঢ়চিত্ত থাকে, তবে তারা দু'শ লোকের উপর জয়ী হবে।"

এখানেও উদ্দেশ্য হলো এই যে একশ' মুসলমানের পক্ষে দু'শ কাফেরের মোকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে আসা জায়েজ নয়। প্রথম আয়াতে একজন মুসলমানের জন্য দশজন অমুসলমানদের মোকাবিলা থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর এ আয়াতে একজন মুসলমানকে দু'জন অমুসলমানের মোকাবিলা থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এটাই হলো এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নির্দেশ যা সর্বকালেই বলবৎ থাকবে।

এখানেও নির্দেশকে নির্দেশ আকারে নয়; বরং সংবাদ ও সুসংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য দু'জন কাফেরের বিরুদ্ধে অটল থাকার নির্দেশ দান [নাউযুবিল্লাহ] কোনো রকম অন্যায় কিংবা জবরদস্তিমূলক নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ঈমানের দৌলতে এমন শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, তারা একজনই দুজনের সমান হয়ে থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য-সহায়তা দানের সুসংবাদটি এই শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, এসব মুসলমানকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণকে বিপদের সম্মুখীন করে দিয়েও দৃঢ়চিত্ত থাকা শুধুমাত্র তাদেরই পক্ষে সম্ভব, যাদের পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে। কারণ পরিপূর্ণ ঈমান মানুষকে শাহাদাতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে আর এই অনুপ্রেরণা তাদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে- إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরিয়তের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যেই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই আল্লাহর সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদিগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى حَتّٰى الخ : উল্লিখিত আয়াতটি গাযওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হলো এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ, যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনো জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোনো বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জিহাদ করতে গিয়ে গনিমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রুসৈন্য নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েজ হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচারণ করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে ইতিপূর্বে কুরআনে আলোচনা করা হয়নি।

পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়া (আ.)-এর শরিয়তে গনিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা সেগুলো ব্যবহার করা হালাল ছিল না; বরং গনিমতের যাবতীয় মালামাল একত্র করে কোনো ময়দানে রেখে দিতে হতো। আর আল্লাহর রীতি অনুযায়ী একটি আগুন এসে সেগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিত। একেই মনে করা হতো জিহাদ কবুল হওয়ার লক্ষণ। গনিমতের মালামাল জ্বালানোর জন্য যদি আসমানি আগুন না আসত, তাহলে বোঝা যেত যে, জিহাদে এমন কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেওয়া হয়েছে। গনিমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর উপর কোনো ওহী নাজিল হয়নি। অতচ গাযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তরজন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ে বৈধতা সম্পর্কে কোনো ওহী তখনো আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন ত্বরান্বিত পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যত দুটি অধিকার মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়! তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মূর্তাজা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল আমীন রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহর এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে এ কথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসেবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ এটি যদি পছন্দসই হতো তবে এর ফলে সত্তরজন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয়ই যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পেশ করা হলো, তখন কোনো কোনো সাহাবীর ধারণা হলো যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোনো সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়ত এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানরা যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের

বিষয়! প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআজ (রা.) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত প্রদান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবিলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে, সে ধারণাই প্রবল।

রাসূলে কারীম ﷺ যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন لَوِ اتَّفَقْتُمَا مَا خَالَفْتُكُمَا অর্থাৎ তোমরা উভয়ে যদি কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। –[মাযহারী]

তাঁদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাগাদা। অতএব, তাই হলো। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর আল্লাহর বাণী মোতাবেক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো।

قَوْلُهُ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا : আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে, তোমরা আমার রাসূলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেওয়া কোনো নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। اِثْخَانٌ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতার ব্যবস্থা দেওয়া। এ অর্থের তাকিদ বোঝাবার জন্য فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হলো এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিসাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ– সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনো পর্যন্ত কোনো সরাসরি 'নস' বা আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের উপর গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি হবে, তাদের পক্ষে গনিমতের সে মাল-সামান বা দ্রব্যসামগ্রীর অগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যেকাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে– تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ চান তোমরা যেন আখিরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসেবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে– গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্ককরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যদিও রাসূলে কারীম ﷺ নিজেও তাদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামিন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশীল, হিকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় আগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন। দ্বিতীয় আয়াতটিতেও এই ভর্ৎসনারই উপসংহারস্বরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক যদি নিয়তি নির্ধারিত হয়ে না যেত, তবে তোমরা যে কাজ করেছ, অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, সেজন্য তোমাদের উপর কোনো বড় রকমের শাস্তি সংঘটিত হতো।

উল্লিখিত নির্ধারিত নিয়তির তাৎপর্য সম্পর্কে তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য গনিমতের মালামাল হালাল ছিল না, বদরের যুদ্ধে ঘটনাক্রমে মুসলমানরা যখন গনিমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে, অথচ তখনো তার বৈধতার কোনো নির্দেশ নাজিল হয়নি, তখন ভর্ৎসনাসূচক এই আয়াতে অবতীর্ণ হয় যে, গনিমতের মালামালের বৈধতাসূচক নির্দেশ আসার প্রাক্কালে মুসলমানদের এহেন পদক্ষেপ এমনই পাপ ছিল, যার দরুন আজাব নেমে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম 'লওহে মাহফূজে' লিপিবদ্ধ ছিল যে, এই উম্মতের জন্য গনিমতের মালকে হালাল করে দেওয়া হবে, সেহেতু মুসলমানদের ভুলের জন্য আজাব নাজিল হয়নি। -[মাযহারী]

কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা আজাব একেবারেই সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তা থামিয়ে দেন। সে আজাব যদি আসত তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুআজ ছাড়া কেউই তা থেকে অব্যাহতি পেত না।" এতে প্রতীয়মান হয়, মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়াই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। অথচ তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুসারে বোঝা যাচ্ছে যে, গনিমতের মালামাল সংগ্রহ করাই ছিল ভর্ৎসনার হেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য নেই। বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করাও ছিল গনিমতের মাল সংগ্রহেরই অংশবিশেষ।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাকের একটি সিদ্ধান্ত পূর্বে গৃহীত না থাকতো ত তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর ভয়াবহ আজাব আপতিত হতো। অপরাধ যত সঙ্গীন হয় শাস্তিও তত ভয় হয়। বহু পূর্বে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত যদি লিপিবদ্ধ না থাকতো, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য ভয়াবহ আজাব তোমা প্রতি আপতিত হতো।

এখন প্রশ্ন হলো পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তটি কি? এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় কোনো কিছু ঘোষণা করা হয়নি. ত তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. মুজতাহিদের এমন ভুলের শাস্তি দেওয়া হবে না। যেমন, বদরের বন্দীদের যদি হত্যা করা হতো তবে কাফেররা ভীত স হতো এবং ইসলামের শক্তি এবং প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ হতো। মুসলমানগণ এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেননি; বরং ধারণা করেছেন যদি মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে দু'টি উপকার হবে। ক. বন্দীরা হয়তো কোনো ইসলাম গ্রহণ করবে, বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য তাই হয়েছিল। অধিকাংশ বন্দী অবশেষে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল মুক্তিপণ হিসেবে যে সম্পদ লাভ হবে তা দ্বারা মুসলমানদের আর্থিক সংকট দূরীভূত হবে; বিশেষত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের ম জিহাদী শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এটি ছিল মুসলমানদের ইজতেহাদী ভুল। আর এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ই হয়েছে- لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ লওহে মাহফূজে আল্লাহ পাক পূর্বেই লিখে রেখেছেন, যদি কেউ ইজতেহ ব্যাপারে ভুল করে তবে এজন্যে তার উপর আজাব হবে না। যদি ইতিপূর্বে এ সিদ্ধান্ত না হতো তবে বদরের যুদ্ধের বন্দী ব্যাপারে যে ভুল হয়েছে তার পরিণাম স্বরূপ আল্লাহর আজাব আপতিত হতো।

২. কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন যে, লওহে মাহফূজে আল্লাহপাক একথা পূর্বেই লিখে রেখেছেন যে, বদরের অংশ গ্রহণকারীদের উপর আজাব নাজিল করবেন না। যদি পূর্বে এ সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের উপর আজাব আ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ তোমরা আল্লাহর হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বেই নিজেদের বিবেচনায় বান্দাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তা ছেড়ে দিয়েছ। এ কারণে তোমাদের উপর আজাব আসত; কিন্তু যদি আজাব না দেওয়ার পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে আপতিত হতো।

৩. কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ পাক অপরাধীকে শাস্তি দেন না।

৪. মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীমুক্তি অচিরেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বৈধ ঘোষণা করা হবে। যদি পূর্বে এ সিদ্ধান্ত না তবে আল্লাহর আজাব আপতিত হতো।

৫. আল্লাহ পাকের একথা জানা ছিল যে, বন্দীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করবে। যদি এমন কথা না হতো, তবে তোমাদের আজাব আসত।

৬. আল্লাহ পাক পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছেন প্রিয়নবী ﷺ -এর বর্তমানে এবং মানুষ যদি ইস্তেগফাররত থাকে তবে এমন আজাব দিবেন না। যদি এমন সিদ্ধান্ত পূর্বে গৃহীত না হতো, তবে অবশ্যই আজাব নাজিল হতো।

অনুবাদ :

٧٠. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسَارٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ مِنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا اِيْمَانًا وَاِخْلَاصًا يُّؤْتِكُمْ اللّٰهُ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ مِنَ الْفِدَاءِ يُضَعِّفُهُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيُثِيْبُكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু ঈমান ও ইখলাছ বা আন্তরিকতা দেখেন তবে তোমাদের নিকট হতে মুক্তিপণরূপে যা নেওয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে দান করবেন। যেমন, পৃথিবীতে তিনি তোমাদের সম্পদ দ্বিগুণ করে দিবেন এবং পরকালে আরো পুণ্যফল দান করবেন। এবং তোমাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٧١. وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَيِ الْاَسْرٰى خِيَانَتَكَ بِمَا اَظْهَرُوْا مِنَ الْقَوْلِ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ قَبْلَ بَدْرٍ بِالْكُفْرِ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ط بِبَدْرٍ قَتْلًا وَاِسْرًا فَلْيَتَوَقَّعُوْا مِثْلَ ذَالِكَ اِنْ عَادُوْا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ.

৭১. তারা অর্থাৎ বন্দীরা তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে চাইলে তাদের কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেলে এরা তো পূর্বে অর্থাৎ বদর যুদ্ধের পূর্বে কুফরি করত আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বদরে তাদের উপর হত্যা ও বন্দী করার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং পুনর্বার যদি তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তবে তাতে বিচিত্র কি? আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তার কাজে প্রজ্ঞাময়।

٧٢. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا النَّبِيَّ وَنَصَرُوْا وَهُمُ الْاَنْصَارُ اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط فِي النُّصْرَةِ وَالْاِرْثِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا مِّنْ شَيْءٍ فَلَا اِرْثَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلَا نَصِيْبَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰخِرِ السُّوْرَةِ.

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে অর্থাৎ মুহাজির সাহাবীগণ এবং যারা নবী করীম ﷺ -কে আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে অর্থাৎ আনসারগণ তারা সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকারত্বে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে ; কিন্তু দীনের জন্য হিজরত করে নেই। হিজরত না করা পর্যন্ত তোমাদের উপর তাদের অভিভাবকত্বের কিছুই নেই। অর্থাৎ তোমরা ও তাদের পরস্পরে কোনোরূপ উত্তরাধিকারত্ব নাই এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদেও এদের কোনো অংশ হবে না। এ বিধানটি অবশ্য এই সূরার শেষ আয়াতটির মাধ্যমে মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَهُمْ عَلَى الْكُفَّارِ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط عَهْدٌ فَلَا تَنْصُرُوْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنْقُضُوْا عَهْدَهُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে কাফেরদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। অর্থাৎ এই ধরনের সম্পদের সাথে তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করিও না এবং তাদের বিরুদ্ধে এদের সাহায্য করিও না। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। وِلَايَتِهِمْ এটা وَاوْ -এ কাসরা বা ফাতাহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٧٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط فِي النَّصْرِ وَالْإِرْثِ فَلَا إِرْثَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ أَيْ تَوَلِّي الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَطْعِ الْكُفَّارِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ بِقُوَّةِ الْكُفْرِ وَضُعْفِ الْإِسْلَامِ.

৭৩. যারা কুফরি করেছে তারা সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার বিধিতে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। সুতরাং তোমরাও তাদের মধ্যে কোনোরূপ উত্তরাধিকারত্ব হতে পারো না। যদি তোমরা তা অর্থাৎ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক বর্জন না কর তবে কুফরির শক্তি বৃদ্ধি ও ইসলাম দুর্বল হয়ে যাওয়ার দরুন পৃথিবীতে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

٧٤. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ فِي الْجَنَّةِ.

৭৪. যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতে সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

٧٥. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ أَيْ بَعْدَ السَّابِقِيْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَأُولٰئِكَ مِنْكُمْ ط أَيُّهَا الْمُهٰجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ ذَوُو الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِي الْإِرْثِ مِنَ التَّوَارُثِ بِالْإِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْاٰيَةِ السَّابِقَةِ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ حِكْمَةُ الْمِيْرَاثِ.

৭৫. এবং যারা ঈমান ও হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের পরে ঈমান এনেছে, দীনের জন্য হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছে। হে মুহাজির ও আনসারগণ! তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নিকট আত্মীয়তার অধিকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফূজে উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত ঈমান ও হিজরতের সম্পর্কে উত্তরাধিকার হওয়ার তুলনায় তারা মীরাছের ক্ষেত্রে একে অন্যের হকদার। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। উত্তরাধিকার স্বত্ব-বিধি দানের হিকমত-গূঢ় তত্ত্বও তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِآخِرِ السُّوْرَةِ : অর্থাৎ- وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدُ : অর্থাৎ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَبْلَ الْفَتْحِ তথা হুদায়াবিয়ার সন্ধির পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ الخ : গায্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোনো ক্রটি করেনি; যখনই কোনো রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেওয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসেবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত মেহেরবানি ও নয় যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয় তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোনো রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خَيْر অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা অর্থাৎ মুক্তিলাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার সাথে সাথে তাদের এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তিলাভের পর নিজেদের লাভ-ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেওয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল

অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় 'সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেওয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুজুর আকরাম ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকে আমার মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করা হোক। হুজুর ﷺ বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরির সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গনিমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে-ইবনে তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রা.) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কুরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে; আমি সম্পূর্ণভাবে ফকির হয়ে যাব। মহানবী ﷺ বললেন, কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফজ্লের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো লোকেই অবগত নয়! হুজুর ﷺ বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রা.)-এর নবুয়তের সত্যতা

সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুজুর ﷺ -এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল, যা এ সময় আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তাঁর বহু টাকা-কড়ি মক্কার কুরাইশদের নিকট ঋণ হিসেবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সেই টাকাগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ - ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহনবী ﷺ -এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রাসূলে কারীম ﷺ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ ও বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেওয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম [ক্রীতাদাস] বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খিদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গায্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খট্‌কা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোনো-না -কোনো ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ খট্‌কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন।

إِنْ يُرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোনো ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্ব প্রতিপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্থ, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হিকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবে কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের একান্ত উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের বন্দীদশা ও মুক্তি দান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম। কারণ কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজি হবে না। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হলো হিজরত। অর্থাৎ এ নগরী বা দেশ ছেড়ে অন্য কোনো নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামি হুকুম-আহকামের উপর আমল করা যাবে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ الخ : আলোচ্য আয়াতগুলো সূরা আন্‌ফালের শেষ চারটি আয়াত। এগুলোতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজিরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজির মুসলমান ও অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরিয়তের বিধি-বিধান বর্তায় তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম। যথা– ১. মুহাজির, যারা হিজরত ফরজ হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদিনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। ২. যারা কোনো বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণে মক্কাতেই থেকে যান। পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্কে এ সবরকম লোকের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন; কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল। কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন; কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে ভাই-ভাতিজা, নানা-মামা প্রমুখের অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজির-অমুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তাদেরই নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর মালিকানাই আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সবকিছু আল্লাহ তা'আলার অধিকারে চলে যাওয়াটাই ছিল ন্যায়বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকর রূপ ছিল ইসলামি বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হতো। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তানসন্ততি, না পাবে আমার পিতামাতা, আর না পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোনো মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করতো। তার বেশি কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হতো না। বলা বাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার আত্মীয়-স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হতো। এরই সাথে সাথে ইসলাম সেই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতিও মীরাসের বণ্টনের ব্যাপারে লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানবজাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত। এদিকে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, মু'মিন ও কাফের। কুরআনে উল্লিখিত আয়াত– خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ -এর মর্মও তাই।

এ দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্ককে মিরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলমান কোনো কাফের আত্মীয়ের মিরাসের কোনো অংশ পাবে না এবং কোনো কাফেরেরও তার কোনো মুসলমান আত্মীয়ের মিরাসে কোনো অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মিরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোনো মুহাজির মুসলমান তার অমুহাজির মুসলমান আত্মীয়দের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজির কোনো মুসলমান মুহাজির মুসলমানের মিরাসের কোনো অংশ পাবে। বলা বাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্ত কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ঘোষণা করে দেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়রে মনসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কুরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নাজিল হয়েছিল, যদি কোনো কালে কোনো দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরজে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতেগোনা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে পড়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজির অমুহাজিরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোনো দেশে আবারো এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামি ফরায়েজ সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরজ হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোনো ওজর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরির লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজির ও অমুহাজিরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে মিরাসী স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃত পক্ষে পৃথক কোনো হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এ কুফরির লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজির মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজির মুসলমানদের নিকট কোনো রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজির মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজির মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি; বরং তাদের এই ইসলামি অধিকার এখনো বলবৎ রয়ে গেছে যে, তারা সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযূল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজির মুসলমান ছিলেন. যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল তা বলাই বাহুল্য। আর কুরআনে কারীম যখন মুহাজির মুসলমানদের প্রতি তাদের [অমুহাজির মক্কাবাসী মুসলমানদের] সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো জাতির মোকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোনো যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামি নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজির মুসলমান যদি মুহাজির মুসলমানের নিকট এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবিলায় নিজেদের ভাইদের সাহায্য করাও জায়েজ নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا أُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا .

অর্থাৎ সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের মুজাহিদবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে অর্থাৎ মদিনার আনসার মুসলমানগণ, এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে; কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কুরআনে কারীম وَلِىٌّ ও وِلَايَتْ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হলো বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে وِلَايَتْ অর্থ উত্তরাধিকার এবং وَلِىٌّ অর্থ উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য-সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিশ হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে, আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলমানদের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দীনি পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকি থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি, তখন মুহাজির ও অমুহাজিরদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোনো কোনো ফিকহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দীনের পার্থক্যও যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ, তেমনিভাবে দেশের পার্থক্য তথা ভিনদেশী হওয়াও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফিকহ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ অর্থাৎ এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোনো অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দীনের হেফাজতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েজ নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদিনায় চলে যাবে হুজুর ﷺ তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি-চুক্তিকালেই আবূ জান্দাল (রা.) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করেছিল, কোনো রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মাপীড়া সত্ত্বেও উল্লিখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারগতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত ﷺ আল্লাহর নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশি দিন নেই। তাছাড়া আর কটি দিন ধৈর্য ধারণের ছওয়াবও আবূ জান্দালের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী ﷺ কুরআনী নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এটাই হলো ইসলামি শরিয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামন্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِىٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদেরকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বণ্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইন প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতিম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্যে থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামি রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাগে ইরশাদ হয়েছে– إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজির ও আনসারদের একে অপরের অভিভাবক হতে হবে, যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। **দ্বিতীয়ত** এখানকার মুহাজিরীন ও অমুহাজিরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্কে বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মুতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। **তৃতীয়ত** কাফেররা একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়।

বস্তুত এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাফের কোনো মুসলমানের এবং কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতাজনিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েজ নয়। এমনিভাবে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, কাফেররা একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যত এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম তথা বিধিবিধান বর্ণনার পর এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হলো এই যে, তোমরা যদি এসব আহকামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলারোধে এসব বিধিবিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদিনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফিরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো বা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করছে। তারপরেই বলা হয়েছে لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাঁদের জন্য মাগফিরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে– اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণির নির্দেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদায়িবিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে– فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদেরই মতো।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল। বলা হয়েছে–

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ আরবী অভিধানে أُولُو শব্দটি 'সাথী' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার বাংলা অর্থ হলো 'সম্পদ'। যেমন أُولُو الْعَقْلِ বুদ্ধিসম্পন্ন। أُولُوا الْأَمْرِ দায়িত্বসম্পন্ন। কাজেই أُولُوا الْأَرْحَامِ অর্থ হয়– গর্ভ-সাথী তথা সহোদর বা একই গর্ভসম্পন্ন; أَرْحَامٌ শব্দটি رَحِمٌ শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হলো সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই أُولُوا الْأَرْحَامِ আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয়; কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللّٰهِ অর্থ فِي حُكْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশবলে এ বিধান জারি হয়েছে। এ আয়াত এই মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বণ্টন করা কর্তব্য। আর أُولُو الْأَرْحَامِ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনে কারীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মিরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েজ' বা 'যাবিল ফুরূজ'। এদেরকে দেওয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা কর্তব্য। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোনো সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দের দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মিরাস বণ্টনের কার্যকর ও বাস্তব রূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফুরূয'-এর অংশ দিয়ে দেওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা'-এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েজ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত أُولُو الْأَرْحَامِ শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূজ, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মিরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূজ' বলা হয়। এছাড়া অন্যদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ অর্থাৎ যাদের অংশ স্বয়ং কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকে দিতে হবে যারা মৃত্যুর ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মিরাসের পরিভাষায় 'আসাবা'(عَصَبَة) বলা হয়। যদি কোনো মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম'। যেমন মামা, খালাপ্রমুখ। সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোনো বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম, যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া ছিল।

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা তওবা, মদিনায় অবতীর্ণ

اِلَّا الْاٰيَتَيْنِ اٰخِرِهَا مِائَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ اَوْ اِلَّا اٰيَةً

তবে শেষের দুই আয়াত বা এক আয়াত ব্যতীত সূরাটি মাদানী আয়াত ১৩০/১২৯

وَلَمْ تُكْتَبْ فِيْهَا الْبَسْمَلَةُ لِاَنَّهُ ﷺ لَمْ يَاْمُرْ بِذٰلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَاُخْرِجَ فِىْ مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْبَسْمَلَةَ اَمَانٌ وَهِىَ نَزَلَتْ لِرَفْعِ الْاَمْنِ بِالسَّيْفِ وَعَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّكُمْ تُسَمُّوْنَهَا سُوْرَةَ التَّوْبَةِ وَهِىَ سُوْرَةُ الْعَذَابِ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّهَا اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ .
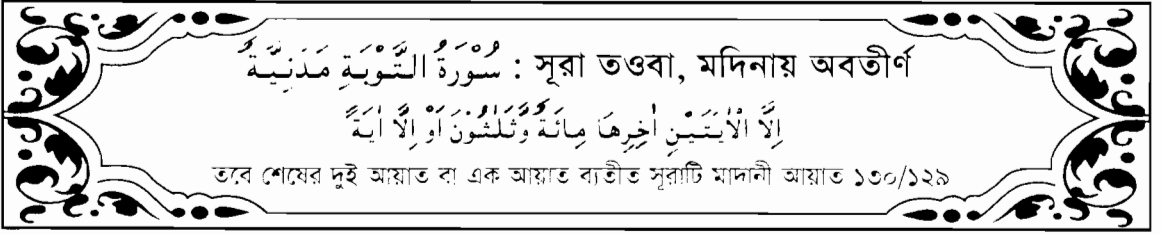
অনুবাদ :

এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি। কারণ হাকিম (র.) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল ﷺ এটার নির্দেশ দেননি। এই মর্মে একটি হাদীস হযরত আলী (রা.) হতেও বর্ণিত আছে যে, বিসমিল্লাহ হলো নিরাপত্তা মূলক আয়াত পক্ষান্তরে এই সূরা নাজিল হয়েছে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে কাফেরদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার বিষয়ে। হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই সূরাটিকে তোমরা সূরা তওবা নামে অভিহিত করে থাক; মূলত এটা হচ্ছে 'সূরাতুল আজাব'। বুখারী শরীফে হযরত বার্‌রা (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা হলো কুরআন শরীফের সর্বশেষ নাজিল কৃত সূরা।

١. بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ وَاصِلَةٌ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ط عَهْدًا مُطْلَقًا اَوْ دُوْنَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ اَوْ فَوْقَهَا وَنَقْضُ الْعَهْدِ بِمَا يُذْكَرُ فِىْ قَوْلِهٖ .

১. এটা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত অংশীবাদীদের সাথে যাদের সাথে তোমরা সাধারণ বা অনির্ধারিত সময়ের বা চার মাসের কম সময়ের মেয়াদে বা তা অপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এদের সাথে নিম্নোক্ত বিবরণ অনুসারে চুক্তি বাতিল করা হলো।

٢. فَسِيْحُوْا سِيْرُوْا اٰمِنِيْنَ اَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوَّلُهَا شَوَّالٌ بِدَلِيْلِ مَا سَيَاْتِىْ وَلَا اَمَانَ لَكُمْ بَعْدَهَا وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ لا اَىْ فَائِتِىْ عَذَابِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ مُذِلُّهُمْ فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاُخْرٰى بِالنَّارِ .

২. অতঃপর হে মুশরিকগণ তোমরা পৃথিবীতে চারিমাস কাল নিরাপদে পরিভ্রমণ কর চলাফেরা কর। এর পর আর তোমাদের নিরাপত্তা নেই। নিম্ন বর্ণিত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই চারিমাসের শুরু হলো শাওয়াল হতে। জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না অর্থাৎ তাঁর আজাব ও শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। তিনি দুনিয়ায় তাদেরকে বধ করত এবং পরকালে জাহান্নামাগ্নিতে নিক্ষেপ করত লাঞ্ছিত করেন।

٣. وَأَذَانٌ إِعْلَامٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنَّ أَيْ بِأَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَعُهُوْدِهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ط بَرِيْٓءٌ أَيْضًا وَقَدْ بَعَثَ ﷺ عَلِيًّا مِنَ السَّنَةِ وَهِيَ سَنَةُ تِسْعٍ فَأَذَّنَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى بِهٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ تُبْتُمْ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْإِيْمَانِ فَاعْلَمُوْٓا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ أَخْبِرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْأَسْرُ فِي الدُّنْيَا وَالنَّارُ فِي الْاٰخِرَةِ.

৩. মহান হজের দিবসে অর্থাৎ ইয়াউমুননাহর জিলহজ মাসের দশম তারিখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, অংশীবাদীদের সম্পর্কে এবং তাদের চুক্তিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও এই বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত। أَنَّ -এর পূর্বে একটি ب উহ্য রয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতসমূহ যে বৎসর অবতীর্ণ হয় সেই বৎসর অর্থাৎ হিজরি নবম বৎসরে রাসূল ﷺ এই ঘোষণা প্রদানের জন্য মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। তখন তিনি ইয়াউমুন নাহর দশম দিবসে মীনা ময়দানে এই আয়াতসমূহের ঘোষণা দেন। তিনি আরো ঘোষণা দেন যে, এই বৎসরের পর আর কোনো মুশরিক হজ করতে আসতে পারবে না এবং কেউ আর উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না। তোমরা যদি কুফরি হতে তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর তোমরা যদি ঈমান গ্রহণ করা হতে মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তির অর্থাৎ দুনিয়ার বধ ও বন্দী হওয়ার আর পরকালে জাহান্নামের সুসংবাদ অর্থাৎ সংবাদ দাও।

٤. إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا مِنْ شُرُوْطِ الْعَهْدِ وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا يُعَاوِنُوْا عَلَيْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ فَأَتِمُّوْٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلٰى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِمْ ط الَّتِيْ عَاهَدْتُّمْ عَلَيْهَا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ بِإِتْمَامِ الْعُهُوْدِ.

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদের মধ্যে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে কৃত চুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ রাখবে। আল্লাহ চুক্তি পূরণ করত যারা তাঁকে ভয় করে তাদেরকে ভালোবাসেন। لَمْ يُظَاهِرُوْا অর্থ– সাহায্য করেনি।

٥. فَإِذَا انْسَلَخَ خَرَجَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَهِيَ اٰخِرُ مُدَّةِ التَّأْجِيْلِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ فِيْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَخُذُوْهُمْ بِالْأَسْرِ وَاحْصُرُوْهُمْ فِي الْقِلَاعِ وَالْحُصُوْنِ حَتّٰى يَضْطَرُّوْا إِلَى الْقَتْلِ أَوِ الْإِسْلَامِ.

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে اِنْسَلَخَ অর্থ– অতিবাহিত হলো, চামড়া খসে পড়ল। অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদের শেষ হলে অংশীবাদীদেরকে হেরেম শরীফ বা তার বাইরে যে স্থানে পাবে বধ করবে, তাদেরকে বন্দী হিসেবে পাকড়াও করবে, কিল্লা ও দুর্গসমূহে অবরোধ করে রাখবে, যাতে তারা ইসলাম বা নিহত হওয়া এই দুইটির একটি গ্রহণের জন্য বাধ্য হয়ে উঠে।

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ج طَرِيقٍ يَسْلُكُونَهُ وَنُصِبَ كُلَّ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ فَإِنْ تَابُوا مِنَ الْكُفْرِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ط وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِمَنْ تَابَ ـ

كُلَّ مَرْصَدٍ প্রত্যেক ঘাটিতে অর্থাৎ তাদের চলার পথে مَنْصُوبٌ عَلٰى نَزْعِ الْخَافِضِ-এই স্থানে كُلَّ শব্দটি অর্থাৎ جَرٌّ কাসরা দানকারী অক্ষরটির প্রত্যাহারের ফল مَنْصُوبٌ অর্থাৎ ফাতাহযুক্ত হয়েছে। তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। তবে তারা যদি কুফরি হতে তওবা করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। এদের পিছনে পড়বে না। যারা তওবা করে তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَرْفُوعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ اسْتَجَارَكَ اسْتَأْمَنَكَ مِنَ الْقَتْلِ فَأَجِرْهُ أَمِنْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ط أَيْ مَوْضِعَ أَمْنِهِ وَهُوَ دَارُ قَوْمِهِ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنْ لِيَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ ذٰلِكَ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ دِينَ اللّٰهِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْاٰنِ لِيَعْلَمُوا ـ

৬. অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে হত্যা হতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে إِنْ أَحَدٌ-এটা مَرْفُوعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ অর্থাৎ এমন একটি উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্থানে مَرْفُوعٌ অর্থাৎ পেশযুক্ত হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়া اِسْتَجَارَكَ যার প্রতি ইঙ্গিতবহ। তুমি তাকে আশ্রয় দিবে নিরাপত্তা দিবে যাতে সে আল্লাহর বাণী আল-কুরআন শুনতে পায়। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে অর্থাৎ সে যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে স্বীয় বিষয়ে বিবেচনা করে দেখার জন্য তাকে তার কবীলার মাঝে পৌঁছিয়ে দিবে। তা উল্লিখিত বিধান এই জন্য যে, তারা আল্লাহর দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোক। সুতরাং জানার জন্য কুরআনের পাঠ শ্রবণ তাদের কর্তব্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আলী (রা.)-এর উক্তির সমর্থন করা।

قَوْلُهُ هٰذِهِ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, بَرَاءَةٌ টা هٰذِهِ উহ্য মুবতাদার খবর। এর দ্বারা সে সকল লোকের অভিমতের খণ্ডন হয়ে গেল যারা বলেন যে, بَرَاءَةٌ হলো মুবতাদা। আর إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ الخ হলো بَرَاءَةٌ-এর খবর। কেননা بَرَاءَةٌ হলো نَكِرَه; যার মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَاصِلَةٌ : মুফাসসির (র.) وَاصِلَةٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنَ اللّٰهِ-এর مِنْ টা হলো اِبْتِدَائِيَّة যা উহ্য وَاصِلَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ- هٰذِهِ بَرَاءَةٌ وَاصِلَةٌ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

قَوْلُهُ فَسِيحُوا الخ : এখানে قُولُوا উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- فَقُولُوا لَهُمْ سِيحُوا; سِيحُوا-এর মধ্যে أَمْر-টা ইজাজতের জন্য। অর্থাৎ তোমাদের শুধুমাত্র চার মাস পর্যন্ত নিরাপত্তার সাথে এখানে অবস্থানের অনুমতি রয়েছে।

قَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي : এখানে أَمْر-টা ইজাজত ও ইবাহাতের জন্য। তার দলিল হলো আগত আয়াত فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ কেননা আল্লাহর বাণী- فَسِيحُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ এটা শাওয়াল মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর হারাম মাসসমূহের শেষ মাস হলো মুহাররম। শাওয়ালের শুরু হতে মুহাররমের শেষ পর্যন্ত চার মাস হয়।

قَوْلُهُ يَوْمَ النَّحْرِ : প্রশ্ন. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ-এর তাফসীর يَوْمَ النَّحْرِ দ্বারা কেন করা হলো?

উত্তর. ওমরাকে যেহেতু حَجٌ اَصْغَرٌ বলে তাই হজকে ওমরা থেকে পৃথক করার জন্য حَجٌ -এর তাফসীর يَوْمَ النَّحْرِ দ্বারা করে দিয়েছেন। কেননা يَوْمَ النَّحْرِ হজের মধ্যেই হয়ে থাকে, ওমরাতে নয়। তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, حَجٌ اَكْبَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজ।

قَوْلُهُ بَرِئٌ اَيْضًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رَسُوْلُهُ হলো মুবতাদা আর بَرِئٌ তার খবর উহ্য রয়েছে। اَيْضًا শব্দ দ্বারা এই উপকার হলো যে, رَسُوْلُهُ -এর আতফ بَرِئٌ -এর উহ্য যমীরের উপর হয়েছে। اَنَّ -এর اِسْم -এর مَحَلّ -এর উপর হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, اَنَّ -এর اِسْم -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হয়েছে। আর তা উহ্য بَاء -এর অধীনে হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে। মূলত তা مَرْفُوْع

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এতে দু'টি সুরত রয়েছে। প্রথম সুরত হলো اِلَّا الَّذِيْنَ -কে مُسْتَثْنٰى স্বীকৃতি দেওয়া হবে আর اِلَّا টা لٰكِنْ অর্থে হবে। এই সুরতে فَالَّذِيْنَ হলো মুবতাদা এবং فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ বাক্য হয়ে মুবাতাদার খবর হবে। দ্বিতীয় সুরত হলো اِلَّا الَّذِيْنَ -কে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ বলা হবে তখন এই সুরতে بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -এর মধ্যে উল্লিখিত اَلْمُشْرِكِيْنَ থেকে مُسْتَثْنٰى হবে। কিন্তু এই সুরতে مُشْرِكِيْنَ خَاصٌ فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ আবশ্যক হবে, যা নিষিদ্ধ। আর যদি اَلْمُشْرِكِيْنَ -এর اَلِفْ وَلَامْ -কে عَهْدِيْ ধরা হয় তবে দ্বারা ঐ মুশরিকগণ উদ্দেশ্য হবে যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি।

قَوْلُهُ وَهِيَ مُدَّةُ التَّاجِيْلِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَشْهُرُ حُرُمٌ দ্বারা প্রসিদ্ধ اَشْهُرُ الْحُرُمِ উদ্দেশ্য নয়। যা হলো রজব, জিলকদ, জিলহজ এবং মুহাররম; বরং اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ দ্বারা সেই চার মাস উদ্দেশ্য যাতে মুশরিকদের অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণের সময় যে চারমাস পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এভাবে যে, শাওয়াল থেকে নিয়ে মুহাররমের শেষ পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের অবস্থানের অনুমতি রয়েছে। এরপর যদি কাউকে পাওয়া যায় তবে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং হত্যা করা হবে। اَشْهُرُ حُرُمٌ দ্বারা এই চার মাসই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ اسْتَجَارَكَ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -এর মধ্যে اِنْ -টা اِسْم -এর উপর প্রবেশ করেছে। অথচ اِنْ টা اِسْم -এর উপর প্রবেশ করে না।

উত্তর. এখানে اِنْ -এর পরে اِسْتَجَارَكَ ফে'ল উহ্য রয়েছে এবং এর তাফসীর করছে পরবর্তী وَاِلَّا اسْتَجَارَكَ বাক্যটি। সুতরাং এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা তওবা প্রসঙ্গে : আবূ আতীয়া হামদানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) একটি ফরমানে লিখেছিলেন, "তোমরা নিজেরা সূরা তওবা শিখ আর তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও।" এর কারণ, সূরা তওবাতে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর সূরা নূরে পর্দা প্রথা প্রচলনের তাগিদ করা হয়েছে। প্রথমে পুরুষদের, পরে স্ত্রীলোকদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ রয়েছে।

এই সূরার নাম : এই সূরার একাধিক নাম রয়েছে–

১. বারাআত : কেননা এই সূরায় কাফেরদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

২. তওবা : কেননা এই সূরায় মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার কথা রয়েছে।

৩. মোকাশকাশা : অর্থাৎ মুনাফেকী থেকে ঘৃণা সৃষ্টিকারী, আবূ শেখ এবং ইবনে মরদবিয়া জায়েদ ইবনে আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন মোকাশকাশা নামকরণের কারণ হলো এই সূরায় মুনাফিকীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

৪. মুবায়ছিরা : এই নামকরণের কারণ সম্পর্কে ইবনুল মুনজের মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন : যেহেতু মানুষের মনের গোপন রহস্য এতে প্রকাশ করা হয়েছে এই জন্য তাকে মুবায়ছিরা বলা হয়েছে।

৫. আল বাহুস : এই নাম ইবনে আবী হাতেম তাবারানী এবং হাকেম আবূ রুশদ হাব্বানীর সূত্রে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের তরফ থেকে লিখেছেন।

৬. আল মাসীরা : এই নাম ইবনুল মুনযির আবুশ শেখ এবং ইবনে আবী হাতেম কাতাদার সূত্রে লিখেছেন। এই নামকরণের কারণ হলো এই সূরায় মুনাফিকদের রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে।

৭. মুনকিল : [আজাব বিশিষ্ট]।

৮. মুদামদিমা [ধ্বংস আনয়নকারী]

৯. সূরাতুল আজাব : এই নামকরণ করেছেন হযরত হুযায়ফা (রা.)। তিনি বলেছেন, তোমরা যে সূরাকে সূরা তওবা বল তা আসলে সূরাতুল আজাব, আল্লাহর শপথ! এমন কেউ নেই যার উপর এই সূরা প্রতিক্রিয়া করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রা.) এই সূরাকে সূরাতুল আজাব বলতেন।

১০. আলফাদিহা : [মুনাফিকদেরকে] অবমাননাকারী। আল্লামা বগভী (রা.) লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবাইর (রা.) বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম, সূরা "তওবা", তিনি বললেন, এই সূরায় মানুষকে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৭৯-৮০]

১১. মুশাররিদাহ

১২. মুখযিয়াহ

এই সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' নেই কেন? : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ওসমান (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সূরা তওবার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" নেই কেন? হযরত ওসমান (রা.)-এর কারণ বর্ণনা করলেন যে, সূরা আনফাল হিজরতের প্রথম দিকে নাজিল হয় আর সূরা তওবা শেষের দিকে নাজিল হয়। পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা বা কোনো আয়াত যখন নাজিল হতো তখন প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই আদত মোবারক ছিল যে, তিনি বলতেন– অমুক সূরার পর এই সূরা এবং অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর এই আয়াত বসবে। আর বিভিন্ন সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করার কথাও বলতেন।

সূরা আনফাল এবং সূরা তওবার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। আর এ কারণে সূরা আনফালের পাশে রাখা হয়েছে সূরা তওবা। হুজুর ﷺ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেননি যে, এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ কর। এ কারণে সাধারণত মনে করা হয়েছে সূরা তওবা কোন স্বতন্ত্র সূরা নয়; বরং সূরা আনফালেরই পরিশিষ্ট। কিন্তু সূরা তওবার আয়াতসমূহ কোন সূরার কোন আয়াতের পর বসবে? এ নির্দেশও প্রিয়নবী ﷺ দেননি। ফলে ধারণা করা হয়েছে যে, এটি একটি স্বতন্ত্র সূরা। এ কারণে সূরা তওবা এবং সূরা আনফালের মধ্যস্থলে ফাঁক রাখা হয়েছে, যেন এই সূরাকে সূরা আনফালের অংশ মনে না করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এই দু'টি সূরার ব্যাপারে মতভেদ ছিল। কেউ বলেছেন, দু'টি স্বতন্ত্র সূরা আর কেউ এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন দু'টি মিলে এক সূরা। অতএব, যারা বলেন যে, তওবা এবং আনফাল দু'টি সূরা তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দু' সূরার মধ্যে ফাঁক রাখা হয়েছে। আর যারা বলেন যে, উভয়টিই আসলে এক সূরা তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য করে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি আপনারা সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ কেন লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি বলেছেন, বিসমিল্লাহতে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা, আর এই সূরাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারি ব্যবহারের আদেশ রয়েছে এজন্য বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয়নি যেন আল্লাহ পাকের গজবের নিদর্শন প্রতিভাত হয়।

ইমাম কুসাইরী বর্ণনা করেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, এই সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ এ জন্য লিপিবদ্ধ হয়নি যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নিয়ে অবতরণ করেননি যা সাধারণত নিয়ম ছিল। প্রত্যেক সূরার শুরুতেই বিসমিল্লাহ নাজিল হতো যেন অন্য সূরা থেকে পার্থক্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নাজিল হয়নি, তাই পবিত্র কুরআন সংকলনের সময় সূরা তওবার শুরুতে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের তরফ থেকে বিসমিল্লাহ সংযোজন করেননি। অন্য সূরার শুরুতে প্রিয়নবী ﷺ বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিতেন, কিন্তু সূরা তওবার ব্যাপারে বিসমিল্লাহ লেখার আদেশ দেননি।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, সমস্ত আয়াত এবং সূরার তরতীব অর্থাৎ কোন সূরার পরে কোন সূরা বসবে এবং কোন আয়াতের পরে কোন আয়াত থাকবে এই সবও আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর তরফ থেকেই হয়েছে ; এ সম্পর্কে অন্য কারো মত বা ইচ্ছার কোনো প্রশ্নই উত্থিত হয় না। এজন্যই হুজুর ﷺ সূরা আনফালের পরে সূরা তওবা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সূরা তওবার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ না হওয়াও আল্লাহ পাকের ওহী মোতাবেকেই হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম তারই অনুসরণ করেছেন। −[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ২৭৭, ফাতহুল বারী খ. ৮, পৃ. ২৩৫]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আনফালে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং বনু কোরায়যার ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সূরার শেষে কাফেরদের সাথে সন্ধি করার অনুমতির বিবরণ রয়েছে। এর পাশাপাশি জেহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ও অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহেরও নির্দেশ রয়েছে।

কাফেরদের সাথে সন্ধি করার অনুমতি থাকলেও জিহাদ অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বভাবকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ রয়েছে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে অটুট রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আর এই সূরায় মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে। এর পাশাপাশি ইসলামের দুশমনদের ব্যাপারে বিশেষত চুক্তি ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এরপর মক্কা বিজয় এবং তাবুকের যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রতি তিরস্কারও রয়েছে। মোটকথা হলো সূরা আনফাল ও সূরা তওবা উভয় সূরায়ই জিহাদের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই উভয় সূরার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য।

দ্বিতীয়ত সূরা আনফালের শেষে মুমিনদের পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে, আর সূরা তওবার শুরুতেই ইসলামের দুশনদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুশরিকরা হলো নিতান্ত অপবিত্র। তাই মসজিদুল হারামের নিকটেও যেন তারা না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা মুসলমানদের কর্তব্য। সূরা আনফালের শেষে মুসলমানদের প্রতি এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন তারা পরস্পরে এক, অভিন্ন অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে। আর সূরা তওবার শুরুতে এই আদেশ হয়েছে− মুসলিম জাতির কর্তব্য হলো কাফের মুশরিকের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কুফর ও শিরকের উপর অসন্তুষ্টি এবং ঘৃণা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

শানে নুযূল : এই সূরা তাবুকের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হন তখন মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিহীন খবর এবং গুজব রটাতে থাকে যেন মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ -এর সাথে যেসব চুক্তি করেছিল এই সুযোগে তারা ঐ চুক্তিসমূহ ভঙ্গ করা শুরু করে। মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মুসলমানগণ তাবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। প্রিয়নবী ﷺ মদিনা শরীফ থেকে প্রায় চার'শ মাইল দূরে অত্যন্ত গরমের মৌসুমে রমজান মাসে ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তাবুকের দিকে রওয়ানা হন। তখন এই সূরা নাজিল হয়। আল্লাহ পাক এই সূরায় তাঁর প্রিয়নবী ﷺ -কে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদের এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেন এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারনামা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন− وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ অর্থাৎ যদি কোনো সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয় করা হয় তবে তাদেরকে অঙ্গীকারনামাটি ফেরত দাও।

সূরা তাওবার বৈশিষ্ট্য : সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয় না, অথচ অন্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়। এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন মজীদ তেইশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাজিল হয়। এমন কি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরীলে আমীন 'ওহী নিয়ে এলে আল্লাহর আদেশ মতে কোন সূরার কোন আয়াতের পর অত্র আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী লেখকদের দ্বারা তা লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাজিল হতো। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হলো, অতঃপর অপর সূরা শুরু হলো। কুরআন মাজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা

তওবা সর্বশেষে নাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ নাজিল হয়, আর না রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লিখে নেওয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়।

কুরআন সংগ্রাহক হযরত উসমান গনী (রা.) স্বীয় শাসনামলে যখন কুরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোনো সূরা নয়; বরং অন্য কোনো সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আন্‌ফালের অংশ বলাই সঙ্গত।

হযরত উসমান (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হতো। -[মাযহারী] সেজন্য একে সূরা আন্‌ফালের পর স্থান দেওয়া হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আনফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কুরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আনফালের শেষে এবং সূরা তওবার শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'-এর স্থান হয়।

সূরা বারাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবূ দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদে স্বয়ং হযরত উসমান গনী (রা.) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত উসমান গনী (রা.)-কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মিঃঈন' অতঃপর রাখা হয় শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো যাদের বলা 'মাসানী' এরপর স্থান দেওয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে যাদের বলা হয় 'মুফাস্‌সালাত'। কুরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আনফালের আগে স্থান দেওয়া কি উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের অধিক। আর সূরা আনফালের আয়াতসংখ্যা শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে, যাদের سَبْعِ طِوَالٌ বলা হয়, তদনুসারে আনফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত উসমান গনী (রা.) বলেন, কথাগুলো সত্য কিন্তু কুরআনের বেলায় যা করা হলো, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আনফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আনফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেওয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর এ কথাও সত্য যে ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোনো সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা। এ কারণেই আমাদের ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আনফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সেই বিসমিল্লাহ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াতকালে কোনো অবস্থায় বিসমিল্লাহ পাঠ জায়েজ নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ-এর স্থলে তারা أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ। পাঠ করে। এর কোনো প্রমাণ হুজুর ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহতে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সুরা তওবায় কাফেরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থি নয়। মূল কারণ হলো, তওবা ও আনফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরিউক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে যে, এ সূরায় কাফেরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেওয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ' সঙ্গত নয়। তাই কুদরতের পক্ষ থেকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করে দেওয়া হয় যাতে বিসমিল্লাহ লিখিত হয়।

সূরা তওবার উপরিউক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্য যে ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো–

১. সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং এ প্রসঙ্গে অনেক হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হলো অষ্টম হিজরি সালের মক্কা বিজয়। অতঃপর এ বছরেই সংঘটিত হয় হুনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরির রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্ব মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

২. চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হলো, ষষ্ঠ হিজরি সালে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত ﷺ -কে মক্কা প্রবেশ বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হুদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। তাফসীরে 'রূহুল-মাআনীর বর্ণনা মতে এই মেয়াদকাল ছিল দশ বছর। মক্কার কুরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কুরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কুরাইশদের মিত্র অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিত্র হয়ে তার সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে খোযাআ গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এবং বনূবকর গোত্র কুরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হলো, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরিতে। সপ্তম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গত বছরের ওমরা কাজা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিনদিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মুতাবিক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোনো পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনূবকর গোত্র বনূ খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কুরাইশরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থান বহুদূরে, তদুপরি এ হলো নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনূবকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে, যা কুরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি ছিল।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিত্র বনূ খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়বি সাহায্য লাভের বিষয়টি কুরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তিভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তিভঙ্গের সংবাদ নবীজী ﷺ -এর কাছে পৌঁছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনিভত হলো। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদিনায় প্রেরণ করে, যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুদ্ধ-প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হুজুর ﷺ -এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলির তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও ইবনে কাসীর' -এর বর্ণনা মতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ অষ্টম হিজরির দশই রমজান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

মক্কা বিজয়কালের উদারতা : কুরাইশদের যে সকল নেতা ইসলামের সততায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু লোকজনের ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না, তারা মক্কা বিজয়ের এ সুযোগ ইসলাম গ্রহণ করে নেন, যারা সেসময়ও নিজেদের পূর্বতন কুফরি ধর্মের উপর অবিচল ছিল, তাদের মধ্যে থেকে কতিপয় লোক ছাড়া বাকি সকলের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গাম্বরী আদর্শের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা প্রতিপক্ষ থেকে মোটেই আশা করা যায় না। তিনি সেদিন কাফেরদের সকল শত্রুতা, জুলুম ও অত্যাচারের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন, আজ তোমাদের সে কথাই বলব, যা হযরত ইউসুফ (আ.) আপন ভাইদের বলেছিলেন, যখন তারা পিতামাতা সহকারে ইউসুফের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে মিশর পৌঁছেন। তিনি তখন বলেছিলেন– لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। [প্রতিশোধ নেওয়া তো পরের কথা]।

মক্কা বিজয়কালে মুশরিকদের চার শ্রেণি ও তাদের ব্যাপারে হুকুম আহকাম : সারকথা, মক্কা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে। মক্কা ও তার আশপাশে অবস্থানকারী অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু সে সময় অমুসলমানেরা ছিল অবস্থানপাতে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত। এদের এক শ্রেণি হলো, যাদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয় এবং যারা পরে চুক্তি লঙ্ঘন করে। বস্তুত এ চুক্তি লঙ্ঘনই মক্কা আক্রমণ ও বিজয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো যাদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। এরা সে চুক্তির উপর বহাল থাকে। যেমন বনূ কিনানার দু'টি গোত্র, বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ। তাফসীরে খাযিন-এর বর্ণনা মতে সূরা বারাআত নাজিল হওয়ার সময় এদের চুক্তির মেয়াদকাল আরো নয় মাস বাকি ছিল। তৃতীয় শ্রেণি হলো, যাদের সাথে সন্ধি হয়েছিল কোনো মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করা ব্যতীত। চতুর্থ হলো, যাদের সাথে আদৌ কোনো চুক্তি হয়নি।

মক্কা বিজয়ের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিক বা আহলে কিতাবদের সাথে যতগুলো চুক্তি করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ওরা গোপনে ও প্রকাশ্যে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে এবং শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল ধারাবাহিক তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও আল্লাহর ইঙ্গিতে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে এদের সাথে সন্ধির আর কোনো চুক্তি সম্পাদন করবেন না এবং আরব উপদ্বীপটিকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে শুধু মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে মক্কা নগরী তথা আরব ভূখণ্ড মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর অমুসলমানদের প্রতি আরব ভূমি ত্যাগের নোটিশ দেওয়া যেত। কিন্তু ইসলামের উদার ও ন্যায়নীতি সর্বোপরি রাহমাতুললীল আলামীন ﷺ -এর অপরিসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার প্রেক্ষিতে তাদের সময় দেওয়া ব্যতীত ভিটামাটি ত্যাগের নির্দেশ দান ছিল বেমানান। সে কারণে সূরা বারাআতের শুরুতে উপরিউক্ত চার শ্রেণির অমুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম-আহকাম নাজিল হয়।

কুরাইশ বংশীয় লোকেরা হলো প্রথম শ্রেণিভুক্ত। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকে এরাই লঙ্ঘন করেছে। তাই ওরা অধিক সময় পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সময়টি ছিল নিষিদ্ধ মাসগুলোর, যাতে কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ। তাই সূরা তওবার পঞ্চম আয়াতে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়- فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ যার সারকথা হলো, এরা চুক্তি লঙ্ঘন করে নিজেদের কোনো অধিকার বাকি রাখেনি। তবে নিষিদ্ধ মাসের মর্যাদা আবশ্যক। অতএব এরা নিষিদ্ধ মাস শেষ হতেই যেন আরব ভূখণ্ড ত্যাগ করে কিংবা মুসলমান হয়ে যায়। নতুবা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

যে লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি হয় এবং তারা এর উপর অবিচলও থাকে, তারা হলো দ্বিতীয় শ্রেণির। তাদের সম্পর্কে সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে-

اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ الخ .

"কিন্তু যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ এবং যারা চুক্তি পালনে কোনো ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো লোকের সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করে চল তাদের মেয়াদকাল পর্যন্ত, 'নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।' এরা হলো বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রীয় লোক। এ আদেশ বলে তারা নয় মাসের সময় লাভ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ব্যাপারে হুকুম আছে এ সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে। সেখানে বলা হয়- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ الخ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ। তাদের জানিয়ে দাও যে, তোমরা এ দেশে আর মাত্র চার মাসকাল বিচরণ কর আর মনে রেখ, তোমরা কখনো আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ নিশ্চয় কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

সারকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত মতে মেয়াদ ধার্য করা ব্যতীত যাদের সাথে চুক্তি হয়, কিংবা যাদের সাথে কোনো চুক্তিই হয়নি, তারা চার মাসকাল সময় লাভ করে। চতুর্থ আয়াত মতে যাদের সাথে মেয়াদ ধার্য করে চুক্তি হয় তারা মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সময় পায়। আর পঞ্চম আয়াত মতে নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের সময় দেওয়া হয়।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় দেওয়ার উদারনীতি : ইসলামের উদারনীতি মতে উপযুক্ত আদেশাবলির প্রয়োগ ও সময় দান এ দু'য়ের শুরু সাব্যস্ত করা হয়। আরবের সর্বত্র এ সকল ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে, আর এগুলোর

প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নবম হিজরির হজের মৌসুমে মিনা আরাফাতের সাধারণ সম্মেলনসমূহে। সূরা তওবার তৃতীয় আয়াতে কথাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়। أَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ الخ অর্থাৎ আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও, যদি তোমরা তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখ তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর এই কাফেরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

চুক্তি বাতিলের খোলা প্রচার ও হুঁশিয়ারি দান ব্যতীত কাফেরদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না : আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নবম হিজরির হজ মৌসুমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করে আরাফাতের মাঠ ও মিনাপ্রান্তরে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর সম্মেলনে আল্লাহর ঘোষণাটি প্রচার করেন। এ বিরাট সম্মেলনে যে কথা প্রচারিত হয়, তা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যায়। এ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে ইয়েমেনে তা পুনঃ প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এ সাধারণ ঘোষণার পর প্রথম শ্রেণিভুক্ত মক্কার মুশরিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ মাসগুলোর শেষ অর্থাৎ দশম হিজরির মহররম মাস, দ্বিতীয় শ্রেণির পক্ষে একই হিজরির রমজান মাস এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পক্ষে উক্ত হিজরির রবিউস্‌সানী গত হলে আরবভূমি ত্যাগ করার বিধান ছিল। নতুবা তারা যুদ্ধের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ আদেশ অনুযায়ী হজের আগামী মৌসুমে আরবের সীমানায় কোনো কাফের মুশরিকের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এ কথাটি সূরা তওবার ২৮ তম আয়াতে ব্যক্ত করা হয় এরূপে فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ চলতি বছরের পর এরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ "এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করবে না" এর মর্মার্থও তাই। এ পর্যন্ত সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতের তাফসীর ঘটনাবলির আলোকে বর্ণিত হলো।

উক্ত আয়াতসমূহের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কুরাইশ ও অপরাপর শত্রু ভাবাপন্ন গোত্রের সাথে ক্ষমা মার্জনা ও দয়া-মায়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার দ্বারা মুসলমানদের এ শিক্ষা দেন যে, যখন তোমাদের কোনো শত্রু তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন তার থেকে বিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নেবে না; বরং তাকে ক্ষমা করে ইসলামি আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। শত্রুর সাথে ক্ষমার আচরণে যদিও মন সায় দেয় না, তথাপি এতে লুক্কায়িত আছে বড় ধরনের কতিপয় মঙ্গল এ মঙ্গল প্রথমে নিজের জন্য। কারণ প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে নফসের আনন্দ থাকলেও তা ক্ষণিকের। কিন্তু ক্ষমার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যে উচ্চ দরজা লাভ করা যায় তা স্থায়ী, এর মূল্যও অসীম। স্থায়ী ক্ষণস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

২. শত্রুকে কাবু করার পর নিজের রাগ সংবরণ একথা প্রমাণ করে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং তা শুধু আল্লাহর জন্য। এ মহান উদ্দেশ্য ইসলামি জিহাদ ও ফাসাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়ার বুকে তাঁর শাসন জারি করার জন্য যে যুদ্ধ, তার নাম জিহাদ, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই ফাসাদ।

৩. শত্রু পরাস্ত হওয়ার পর সে যদি মুসলমানদের ক্ষমা-মার্জনার এ অনুপম আদর্শ প্রত্যক্ষ করে তবে সে ভদ্রতার খাতিরে হলেও মুসলমানদের ভালোবাসবে। আর এ ভালোবাসা দেবে তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা, যা হবে তার জন্য সফলতার চাবিকাঠি। মূলত এটিই জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক্ষমা করার অর্থ নিরাপত্তাবিহীনতা হওয়া নয় : দ্বিতীয় যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হলো, ক্ষমা-মার্জনার অর্থ এই নয় যে, শত্রুকে শত্রুতার সুযোগ দেবে এবং নিজের জন্য নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেবে না; বরং বিচক্ষণতা হলো, ক্ষমা-মার্জনার সাথে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও শত্রুতার সকল ছিদ্র বন্ধকরণ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বড় হিকমতপূর্ণ ইরশাদ করেছে- لَا يُلْدَغُ الْمَرْءُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ "বুদ্ধিমান মানুষ এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।" নবম হিজরি সালে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা এবং হরম শরীফের সীমানা ত্যাগের জন্য তাদের সময় এ সুযোগদান উপরিউক্ত প্রজ্ঞাসম্মত কার্যক্রমের প্রমাণ বহন করে। তৃতীয় বিষয় হলো, সময় সুযোগ দান ব্যতীত দুর্বল মানুষের প্রতি হঠাৎ দেশত্যাগের আদেশ দেওয়া কাপুরুষতা ও চরম অভদ্রতা। তাই কাউকে দেশত্যাগের আদেশ দিতে

গেলে প্রথমে তার প্রচার আবশ্যক এবং তাকে সময়ও সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে সে আমাদের আইন-কানুন মেনে নিতে রাজি না হলে যেখানে ইচ্ছা সহজে চলে যেতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত নবম হিজরির সাধারণ ঘোষণা এবং সকল শ্রেণিকে সময় দানের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

৪. কোনো জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে তা বাতিল অবশ্য করা যায়, কিন্তু উত্তম হলো চুক্তি তার নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত পালন করে যাওয়া। যেমন– সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রের সাথে কৃত চুক্তি নয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ করার বর্ণনা রয়েছে।

৫. শত্রুদের সাথে প্রতিটি আচরণ মনে রাখতে হবে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, শত্রুতা তাদের সেই কুফরি আকিদা বিশ্বাসের সাথে, যা তাদের ইহ-পরকাল ধ্বংসের কারণ। বস্তুত এর মূলে রয়েছে তাদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। তাই যুদ্ধ বা সন্ধির যে কোনো অবস্থায় সহানুভূতিভাব ত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন এ সকল আয়াতে বারংবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য উভয় জাহানে কল্যাণকর। কিন্তু তওবা করা না হলে শুধু দুনিয়ায় নিহত ও ধ্বংস হবে যাকে বহু কাফের জাতি কৃতিত্ব হিসেবেও গ্রহণ করে নেয়, তা নয়; বরং নিহত হওয়ার পর পরকালীন আজাব থেকে নিস্তার পাবে না। উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে সতর্কতার ঘোষণার সাথে নসিহত এবং হিতাকাঙ্খারও আমেজ রয়েছে।

৬. চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি যেমন মেয়াদকাল পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি পালনের আদশে রয়েছে, তেমনি তার শেষ ভাগে রয়েছে إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ অবশ্য সাবধানীদের পছন্দ করেন।" এতে চুক্তি পালনে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য জাতির মতো তোমরা ছলে-বলে-কৌশলে যেন চুক্তিভঙ্গের পাঁয়তারা না কর।

৭. পঞ্চম আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সঠিক উদ্দেশ্যে কোনো জাতির সাথে জিহাদ আরম্ভ হলে তাদের মোকাবিলায় নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক তখন দয়া-বাসনা বা নম্রতা হবে কাপুরুষতার নামান্তর।

৮. পঞ্চম আয়াত প্রমাণ করে যে, কোনো অমুসলমানের ইসলাম গ্রহণকে তিন শর্তে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। যথা– ক. তওবা খ. নামাজ কায়েম, গ. জাকাত আদায়। এ তিন শর্ত যথাযথ পূরণ না হলে নিছক কলেমা পাঠ যুদ্ধ স্থগিত রাখা যাবে না। রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর যারা জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সাহাবাদের সামনে এ আয়াতটি পেশ করে তাঁদের ইতস্তত ভাব দূর করেন।

৯. দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ সাহাবা বলেন– يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ– আরাফাতের দিন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন– اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'হজ হলো আরাফাতের দিন'। –[আবূ দাউদ]। আর কেউ বলেন, এর অর্থ হলো কুরবানির দিন বা দশই জিলহজ্জ।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) এবং অপরাপর ইমাম এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য বলেন, হজ্জের পাঁচ দিন হলো হজ্জে আকবারের দিন। এতে আরাফাত ও কুরবানির দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يَوْمٌ [দিন] শব্দের একবচন আরবি বাকরীতির বিরুদ্ধে নয়। কুরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يَوْمُ الْفُرْقَانِ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يَوْمِ أُحُدٍ ، يَوْمِ بُعَاثَ প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। অনেক দিন ব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হলো হজ্জে আসগর বা ছোট হজ। এর থেকে হজকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজ্জে আকবর অর্থাৎ বড় হজ। তাই কুরআনের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজকে হজ্জে আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ হলো হজ্জে আকবর তাদের ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, হুজুর ﷺ -এর বিদায় হজ্জে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবত এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফজিলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাস্‌সাস (র.) 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে বলেন, হজের দিনগুলোকে 'হজ্জে আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা কুরআন মাজীদ এ দিনগুলোকে হজ্জে আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছেন।

٧. كَيْفَ أَيْ لَا يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهِ وَهُمْ كَافِرُوْنَ بِهِمَا غَادِرُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ قُرَيْشُ الْمُسْتَثْنُوْنَ مِنْ قَبْلُ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ أَقَامُوْا عَلَى الْعَهْدِ وَلَمْ يَنْقُضُوْهُ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ وَمَا شَرْطِيَّةٌ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ وَقَدِ اسْتَقَامَ ﷺ عَلَى عَهْدِهِمْ حَتّٰى نَقَضُوْا بِإِعَانَةِ بَنِيْ بَكْرٍ عَلٰى خُزَاعَةَ .

অনুবাদ :

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কেমন করে বলবৎ থাকবে? না, থাকতে পারে না, কারণ এরা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী। كَيْفَ -এটা এই স্থানে না-বোধক শব্দ لَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যাদের সাথে হুদাইবিয়ার ঘটনাকালে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। অর্থাৎ কুরাইশ সম্প্রদায়, তাদের কথা উল্লিখিত বিধান হতে স্বতন্ত্র। যাবত তারা স্থির থাকবে অর্থাৎ তোমাদের সাথে কৃত চুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, তা ভঙ্গ করবে না [তোমরাও ততদিন তা পূরণে স্থির থাকবে। আল্লাহ সাবধানীদেরকে ভালোবাসেন। রাসূল ﷺ ঐ চুক্তি পালনে স্থির ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরাই তাদের বন্ধুগোত্র বনূ বকরকে মুসলিমদের বন্ধুগোত্র খুজাআর বিরুদ্ধে সাহায্য করত ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে। مَا اسْتَقَامُوْا -এর مَا শব্দটি شَرْطِيَّة বা শর্তবাচক।

٨. كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُمْ عَهْدٌ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَظْفَرُوْا بِكُمْ لَا يَرْقُبُوْا يُرَاعُوْا فِيْكُمْ إِلًّا قَرَابَةً وَّلَا ذِمَّةً ط عَهْدًا بَلْ يُؤْذُوْكُمْ مَا اسْتَطَاعُوْا وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ حَالٌ يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ بِكَلَامِهِمُ الْحَسَنِ وَتَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ ج الْوَفَاءَ بِهِ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُوْنَ نَاقِضُوْنَ لِلْعَهْدِ .

৮. কেমন করে তাদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে? তবে যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় সফল হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দিবে না; বরং তাদের ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় তোমাদেরকে তারা ক্লেশ দানে তৎপর থাকবে। তারা মুখে অর্থাৎ মিষ্টি কথা বলে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা পালনে অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গকারী। إِنْ يَّظْهَرُوْا -এই শর্তবাচক বাক্যটি এই স্থানে حَالٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَا يَرْقُبُوْا অর্থ– পরওয়া করবে না। إِلًّا অর্থ– আত্মীয়তা। ذِمَّةً অর্থ– চুক্তি, দায়িত্ব।

٩. اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا أَيْ تَرَكُوْا اِتِّبَاعَهَا لِلشَّهَوَاتِ وَالْهَوٰى فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ط دِيْنِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ بِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَمَلُهُمْ هٰذَا .

৯. তারা আল্লাহর আয়াত আল-কুরআন দুনিয়ার নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনা ও রিপু বাসনার পিছনে পড়ে তারা কুরআনের অনুসরণ পরিহার করে বসেছে; এবং তাঁর পথ হতে তাঁর ধর্ম হতে লোকদেরকে নিবৃত্ত করে তারা যা করে অর্থাৎ তাদের এই কাজ [কত মন্দ] কত নিকৃষ্ট।

١٠. لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ .

১০. তারা কোনো মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

١١. فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ اَىْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

১১. অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাম কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে দেই। স্পষ্ট বর্ণনা করে দেই।

١٢. وَاِنْ نَّكَثُوْٓا نَقَضُوْا اَيْمَانَهُمْ مَوَاثِيْقَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ عَابُوْهُ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ رُؤَسَاءَهُ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ عُهُوْدَ لَهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ .

১২. তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর তারা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে দোষ বের করে তবে কাফেরদের প্রধানদের অর্থাৎ তাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরা তো এমন যে, তাদের কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। এদের অঙ্গীকার কোনো অঙ্গীকারই নয়। সম্ভবত তারা কুফরী হতে নিরস্ত হতে পারে। نَكَثُوْٓا অর্থ– তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। اَيْمَانَهُمْ অর্থ– তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ। اَئِمَّةَ الْكُفْرِ -এই স্থানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্যের ব্যবহার হয়েছে। اَيْمَانَ শব্দটি অপর এক কেরাতে কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ– এদের কোনো ঈমান নেই।

١٣. اَلَا لِلتَّحْضِيْضِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا نَقَضُوْا اَيْمَانَهُمْ عُهُوْدَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ مِنْ مَكَّةَ لَمَّا تَشَاوَرُوْا فِيْهِ بِدَارِ النَّدْوَةِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ بِالْقِتَالِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط حَيْثُ قَاتَلُوْا خُزَاعَةَ حُلَفَاءَكُمْ مَعَ بَنِىْ بَكْرٍ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تُقَاتِلُوْهُمْ اَتَخْشَوْنَهُمْ ج اَتَخَافُوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ فِىْ تَرْكِ قِتَالِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের অঙ্গীকার চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং পরামর্শসভায় পরামর্শ করত মক্কা হতে রাসূলের বহিষ্করণের সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। তোমাদের আশ্রিত বন্ধুগোত্র খুযা'আর বিরুদ্ধে বনূ বকরের সহায়তা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে কি জিনিস বাধা দেয়? তোমরা কি তাদের আশঙ্কা কর ভয় কর? তোমরা যদি মুমিন হও তবে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করার বিষয়ে আল্লাহকেই তোমাদের অধিক ভয় করা কর্তব্য। -এটা تَحْضِيْض বা উদ্দীপনাব্যঞ্জক অব্যয়।

١٤. قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ يَقْتُلْهُمْ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ يُذِلَّهُمْ بِالْاَسْرِ وَ الْقَهْرِ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ لا بِمَا فُعِلَ بِهِمْ هُمْ بَنُوْ خُزَاعَةَ .

১৪. এদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চলাবে। তোমাদের হস্তে এদের হত্যা করত আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন পরাজিত ও বন্দী করত অপমানিত করবেন লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে জয়ী করবেন এবং তাদের বিপক্ষে কৃত আচরণের মাধ্যমে তিনি মুমিনদের অর্থাৎ বনূ খুযা'আর চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

১৫. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ط كَرْبَهَا وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط بِالرُّجُوْعِ إِلَى الْإِسْلَامِ كَأَبِيْ سُفْيَانَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

১৫. এবং তাদের চিত্তের ক্ষোভ দুঃখ বিদূরিত করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ইসলামের দিকে ফিরে আসার তাওফীক প্রদানের মাধ্যমে তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হন। এর একটি উদাহরণ হলেন হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. أَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا لَمْ يَعْلَمِ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ بِإِخْلَاصٍ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط بِطَانَةً وَأَوْلِيَاءَ الْمَعْنٰى وَلَمْ يَظْهَرِ الْمُخْلِصُوْنَ وَهُمُ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দিবেন অথচ আল্লাহ এখনো জানলেন না প্রকাশ করলেন না أَمْ -এটা এইস্থানে إِنْكَارٌ অর্থাৎ অসম্মতিসূচক প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَمَّا -এটা এইস্থানে নাবোধক لَمْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কারা ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ উল্লিখিত বিশ্লেষণে **গুণান্বিত ও মুখলিছ এবং আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অন্যদের হতে এখনো সুস্পষ্ট হয়নি। সুতরাং এর পূর্বে কেমন করে তোমাদেরকে ছাড়া যেতে পারে? তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।** وليجة অর্থ– অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أَيْ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَيْفَ টা اِسْتِفْهَام تَعَجُّبِيْ যা نَفْي -এর অর্থে হয়েছে। এ কারণেই **তার পরে** اِلَّا দ্বারা اِسْتِثْنَاء **করা** বৈধ হয়েছে। كَيْفَ হলো يَكُوْنُ -এর خَبَر مُقَدَّمْ আর عَهْدٌ হলো اِسْم مُؤَخَّر আর كَيْفَ টা صَدَارَت كَلَام **তথা বাক্যের প্রারম্ভিকা** চাওয়ার কারণেই مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে। لِلْمُشْرِكِيْنَ টা ثَابِتًا বা بَاقِيًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ **হয়ে** عَهْدٌ -এর حَال مُقَدَّمْ হয়েছে। আর যদি لِلْمُشْرِكِيْنَ টা عَهْدٌ থেকে مُؤَخَّرْ হয় তবে তার সিফত হয়। আবার **এটাও হতে পারে যে,** يَكُوْنُ টা تَامَّهْ হবে আর كَيْفَ টা حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূবের مَحَلّ -এ হবে।

قَوْلُهُ مَا شَرْطِيَّةٌ : এখানে مَا টা হলো شَرْطِيَّه ; এটা مَوْصُوْلَه নয়। আর فَاسْتَقَامُوْا لَهُمْ এটা جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ كَيْفَ : كَيْفَ -এর পরে يَكُوْنُ ফে'ল উহ্য রয়েছে, যাকে মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। পূর্বের قَرِيْنَة -এর কারণে فِعْل -কে উহ্য করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. كَيْفَ -কে কেন تَكْرَار আনা হয়েছে?

উত্তর. মুশরিকদের অঙ্গীকারের উপর স্থিতিশীল থাকার দুর্বোধ্যতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং সুদৃঢ় না থাকার ইল্লত বর্ণনা করার জন্য। আর عِلَّتْ হলো وَإِنْ يَظْهَرُوْا

قَوْلُهُ اِلًّا : ال -এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে– নৈকট্যতা, অঙ্গীকার, প্রতিবেশী, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ।

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ حَالٌ : অর্থাৎ وَإِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ হলো শর্ত আর لَا يَرْقُبُوا الخ হলো جَزَاء আর جُمْلَه شَرْطِيَّه -টা كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُمْ -থেকে حَالٌ হয়েছে। কাজেই এখন এই প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটলো যে, جُمْلَه شَرْطِيَّه **-এর** আতফ جُمْلَه حَمْلِيَّه -এর উপর বৈধ নয়।

قَوْلُهُ اَىْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন হলো- فَهُمْ উহ্য মানার কি প্রয়োজন পড়ল?

উত্তর. اِخْوَانُكُمْ যেহেতু فَاِنْ تَابُوْا -এর جَزَاء আর جَزَاء -এর জন্য বাক্য হওয়া শর্ত। তাই মুফাসসির (র.) هُمْ উহ্য মেনে পরিপূর্ণ বাক্য বানিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ خُزَاعَةَ حُلَفَاءَ كُمْ : এখানে خُزَاعَةَ হলো মাওসূফ আর حُلَفَاءَكُمْ হলো তার সিফত।

قَوْلُهُ هُمْ بَنُوْ خُزَاعَةَ : এর উদ্দেশ্য হলো مُؤْمِنِيْنَ -এর مِصْدَاقْ নির্ধারণ করা। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বনূ খোযা'আ অদৃশ্যভাবে ঈমান এনেছিল।

قَوْلُهُ وَلِيْجَةً : এটা وُلُوْجٌ হতে নির্গত। অর্থ হলো প্রবেশ করা, গোপন রহস্যধারী বন্ধু। মুফাসসির (র.) وَلِيْجَةً -এর অনুবাদ بِطَانَةً দ্বারা করেছেন। আর بِطَانَةً আস্তরকে বলে, যা গোপন থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ الخ : সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তার আশপাশের সকল কাফের-মুশরিকের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তাদানের বিষয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবাধ চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেওয়া হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, ত্বরিত মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে, তাদের চারমাসের দীর্ঘ সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা হয় আরামের সাথে যেতে পারে অথবা এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হলো, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাত্তার জন্য নেওয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা হয়। ষষ্ঠ আয়াতে এ কথারই প্রতি ধ্বনি রয়েছে। যার সারবস্তু হলো, হে রাসূল মুশরিকদের কেউ আপনার আশ্রয় নিতে চাইলে তাকে আশ্রয় দেওয়া দরকার। এতে সে আপনার নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহর কালাম শুনতে ও ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। তাকে শুধু সাময়িক আশ্রয় দেওয়া নয়; বরং যথার্থ নিরাপত্তার সাথে তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়াও মুসলমানদের কর্তব্য। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয় যে, এ আদেশ এজন্য যে, এরা পূর্ণ জ্ঞান রাখে না, তাই আপনার পাশে থাকলে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে।

ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র.) এ আয়াত থেকে কতিপয় মাসায়েল ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যা এখানে তুলে ধরছি।

ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা আলেমদের কর্তব্য : প্রথমত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলিল তলব করে, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত কোনো বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলি হাসিলের জন্য যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দানও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহর কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকদের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেবে।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না : তৃতীয়ত বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান ও অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ অর্থাৎ এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোনো অমুসলমান তার প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি [ভিসা] নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত চার আয়াতের প্রথম আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার কিছু কারণ দর্শানো হয়। এতে মুশরিকদের দুষ্ট প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা বাতুলতা মাত্র। তবে মসজিদুল-হারামের পাশে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় তাদের কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে ওদের অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, যারা একটু সুযোগ পেলেই প্রতিশ্রুতি বা আত্মীয়তা কোনোটিরই ধার ধারবে না। কারণ, চুক্তি সই করলেও চুক্তি পালনের কোনো ইচ্ছা তাদের অন্তরে নেই। তারা শুধু মুখের ভাষায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। তাদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক।

সদা ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা : কুরআন মাজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোনো অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন নগণ্য সংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকি সবাই চুক্তিভঙ্গ করেছে। সাধারণত এমতাস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কুরআন اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি এবং আদেশ দেওয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভঙ্গ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশবশত এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী" অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কুরআন মাজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে- وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا "কোনো জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে"। -[সূরা মায়িদা]

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুঁশিয়ার করা হয় যে, এরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হলো দুনিয়াপ্রীতি। মূলত দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলি ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পূতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেওয়া হয়- لَا يَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً অর্থাৎ এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তা নয়; বরং তারা যে কোনো অমুসলমানদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরিউক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কুরআন যে আদর্শ ও ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হেদায়েত দেয় فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ তবে তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন

সে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবি পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য ।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব লাভের তিন শর্ত : এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা- ১. কুফর ও শিরক থেকে তওবা। ২. নামাজ, ৩. জাকাত। কারণ ঈমান ও তওবা হলো গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; আর সেগুলো হলো নামাজ ও জাকাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত নামাজ ও জাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য, তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্র ধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

একাদশ আয়াতের শেষ বাক্যে চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলি পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ "আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

قَوْلُهُ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ الخ : ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ায় মক্কার যে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল তখন এদের মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয়- وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ অর্থাৎ "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فَقَاتِلُوْهُمْ -এখানে লক্ষণীয় যে, এখানে আপাত দৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল,"সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর"। কিন্তু তা না বলে বলা হয়- فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ "সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কুরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হলো এরা। তা'ছাড়া এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়তো প্রশ্রয় পেয়ে বসতো। -[তাফসীরে মাযহারী]

যিম্মিদের বিদ্রূপ অসহ্য : وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামি শরিয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হলো তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামি আইন কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপে শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী যিম্মীদের জন্য সমালোচনার অনুমতি দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেওয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হলো إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ অর্থাৎ "এদের কোনো শপথ নেই" কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোনো মূল্য মান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ অর্থাৎ "যাতে তারা ফিরে আসে।" এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে অপরাপর জাতির মতো শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কদের মতো নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই; বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

অতঃপর ত্রয়োদশ আয়াতে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়, তোমরা সেই জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না কেন, যারা তোমাদের নবীকে দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে? এরা হলো মদিনার ইহুদি অধিবাসী। এদের সদম্ভ ঘোষণা হলো- يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ অর্থাৎ "সম্মানী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অবশ্যই মদিনা থেকে নিচু লোকদের বহিষ্কার করবে"। এদের দৃষ্টিতে সম্মানী লোক হলো তারা আর নীচু ও দুর্বল লোক হলো মুসলমান। যার পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরই দম্ভোক্তিকে অচিরেই এভাবে সত্য করে দেখান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা মদিনা থেকে ইহুদিদের সমূলে উৎখাত করেন। এতে দেখানো হয় যে, সম্মানী ও শক্তিবান হলো মুসলমান এবং নীচু প্রকৃতির হলো ইহুদিরা।

قَوْلُهُ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ : 'তারাই প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত করেছে' বাক্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ বিবাদের সূত্রপাত যখন তারা করেছে, তখন তোমাদের কাজ হবে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলা। আর এটি সুস্থ বিবেকেরই দাবি।

এর পর মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফেরদের ভয়-ভয় দূর করার জন্য বলা হয়েছে- أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যার আজাব রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পরিশেষে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ অর্থাৎ "যদি তোমরা মুমিন হও" বাক্য সংযোজন করে বলা হয় যে, শরিয়তের হুকুম তা'মিলে বাধা হয় গায়রুল্লাহর এমন ভয় অন্তরে স্থান দেওয়া মুসলমানদের শান নয়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে ভিন্ন কায়দায় মুসলমানদের প্রতি জিহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এতে কতিপয় জানার বিষয় রয়েছে।

প্রথমত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই এসে পড়বে, আর এই কাফের জাতি নিজেদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহর আজাবের উপযুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো তাদের উপর আসমান বা জমিন থেকে আল্লাহর আজাব আসবে না; বরং يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের হস্তেই আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।"

দ্বিতীয়ত এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অন্তর থেকে সে সমুদয় চিন্তা-ক্লেশ দূর করবেন, যা কাফেরদের দ্বারা প্রতিনিয়ত পৌঁছুচ্ছিল।

তৃতীয়ত কাফেরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলমানদের মনে যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, আল্লাহ তা প্রশমিত করবেন তাদের দ্বারা শাস্তি দিয়ে।

পূর্ববর্তী আয়াতে لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ [যাতে তারা ফিরে আসে] বাক্য দ্বারা মুসলমানদের হেদায়েত করা হয় যে, নিছক প্রতিশোধের নেশার উদ্দেশ্যে যেন কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়; বরং উদ্দেশ্য হবে তাদের আত্মশুদ্ধি ও সৎপথ প্রদর্শন। আর এ আয়াতে বলা হয় যে, মুসলমানেরা যদি নিজেদের নিয়তকে আল্লাহর জন্য শুদ্ধ করে নেয় এবং শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করে, তবে আল্লাহ নিজ গুণে তাদের ক্রোধ প্রশমনের কোনো ব্যবস্থা করবেন।

চতুর্থত আয়াতে একটি বাক্য হলো- وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ "আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন। অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল করবেন। এ বাক্য দ্বারা জিহাদের আর একটি উপকার প্রতীয়মান হয়। তা' হলো শত্রুদের অনেকের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হবে এবং তারা মুসলমান হবে। তাই দেখা যায়, মক্কা বিজয়কালে সেখানে অনেক দুষ্ট কাফের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যে সকল অবস্থা ও ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী একের পর এক সকল ঘটনা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। সে জন্য এ আয়াতগুলো বহু মুজেযাসম্বলিত রয়েছে- এতে সন্দেহ নেই।

অনুবাদ :

١٧. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ بِدُخُوْلِهٖ وَالْقُعُوْدِ فِيْهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ ج لِعَدَمِ شَرْطِهَا وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ.

১৭. অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে সত্য-প্রত্যাখ্যানের সাক্ষ্য দেয়, তখন তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে সেখানে প্রবেশ করবে, বসবে তা হতে পারে না আমল গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত [ঈমান] না থাকায় তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ বাতিল বলে গণ্য এবং তারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

١٨. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

১৮. তারাই তো আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। তারাই সৎপথপ্রাপ্তদের মধ্যে হতে পারে।

١٩. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ اَهْلَ ذٰلِكَ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط فِى الْفَضْلِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ اَلْكَافِرِيْنَ نَزَلَتْ رَدًّا عَلٰى مَنْ قَالَ ذٰلِكَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ اَوْ غَيْرُهٗ.

১৯. হাজীদের পানীয় জল সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করা অর্থাৎ যারা উক্তরূপ কাজ করে তাদেরকে তোমরা কি তাদের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ কাফেরদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। হযরত আব্বাস বা অন্যান্য যারা তাদের সমতুল্য হওয়ার কথা বলত তাদের প্রত্যুত্তরে এই আয়াত নাজিল হয়।

٢٠. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً رُتْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مِنْ غَيْرِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ الظَّافِرُوْنَ بِالْخَيْرِ.

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর নিকট অন্যদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান বস্তুত তারাই সফলকাম, কল্যাণ লাভে জয়ী। دَرَجَةً অর্থ– এই স্থানে মর্যাদা।

٢١. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ لا دَائِمٌ.

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া, সন্তোষ এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ। مُّقِيْمٌ অর্থ– এই স্থানে চিরস্থায়ী।

২২. خَالِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيْهَا أَبَدًا ط إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ.

২২. সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। خَالِدِيْنَ শব্দটি এই স্থানে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের জন্য এই অবস্থা সুনির্ধারিত এই ভাব বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩. وَنَزَلَ فِيْمَنْ تَرَكَ الْهِجْرَةَ لِأَجْلِ أَهْلِهِ وَتِجَارَتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوْا اِخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

২৩. পরিবার পরিজন ও ব্যবসায়ের কারণে যারা হিজরত করা পরিত্যাগ করেছিল তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়– হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে ভালোবাসে অর্থাৎ তা তারা গ্রহণ করে লয় তবে তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

২৪. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ أَقْرِبَاؤُكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَشِيْرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا اكْتَسَبْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا عَدَمَ نَفَاقِهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَقَعَدْتُمْ لِأَجْلِهِ عَنِ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فَتَرَبَّصُوْا انْتَظِرُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ.

২৪. বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, আত্মীয় স্বজন عَشِيْرَتُكُمْ শব্দটি অপর এক কেরাতে عَشِيْرَاتُكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে। তোমাদের সম্পদ, তোমরা অর্জন কর কামাই কর, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস অধিক প্রিয় হয় আর এগুলোর জন্য জিহাদ ও হিজরত করা পরিত্যাগ করে বসে থাক তবে তোমরা আল্লাহর আজাবের নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। এই আয়াতটি এই সমস্ত লোকদের জন্য হুমকি স্বরূপ। كَسَادٌ অর্থ– মন্দা পড়া। تَرَبَّصُوْا অর্থ– তোমরা অপেক্ষা কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ : এখানে كَانَ হলো فِعْل نَاقِص আর لِلْمُشْرِكِيْنَ **এটা উহ্য** يَنْبَغِيْ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে خَبَر مُقَدَّمٌ হয়েছে আর أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ এটা বাক্য হয়ে كَانَ-এর اِسْم **মুয়াখখার হয়েছে, আর** شَاهِدِيْنَ টা يَعْمُرُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর شَاهِدِيْنَ হলো عَلَى الْكٰفِرِيْنَ-এর **প্রথম** مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى **আর** بِالْكُفْرِ **হলো দ্বিতীয়** مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ مُتَعَلِّقٌ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ; **জমহুরের নিকট** يَعْمُرُوْا হলো عَمَرَ يَعْمُرُ তথা বাবে نَصَرَ থেকে; **অর্থ– আবাদ করবে। আর** اِبْنُ السَّمَيْفَعِ পড়েছেন يُعْمِرُوْا বাবে اِفْعَالٌ থেকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও অন্যান্যরা مَسْجِدَ -কে একবচনের সাথে পড়েছেন। আর بَاقُوْنَ رحـ এটা বহুবচনের সাথে مَسَاجِدَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ اَىْ اَهْلَ ذَالِكَ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. عِمَارَ এবং سِقَايَةَ উভয়টি মাসদার যা একটি مَعْنَوِىْ বস্তু, কাজেই একে جِسْم -এর شَيْئ -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া ঠিক হয়নি। যেমন উল্লিখিত উভয় مَصَادِرْ -কে مَنْ -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে যা হলো شَيْئ مُجَسَّمْ

উত্তর. اَلْعِمَارَةَ এবং اَلسِّقَايَةَ -এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে আর তা হলো اَهْلُ অর্থাৎ- اَهْلُ السِّقَايَةِ এবং اَهْلُ الْعِمَارَةِ কাজেই আর কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ نَزَلَتْ رَدًّا عَلٰى مَنْ قَالَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ-এর মধ্যে হামযাটি হলো هَمْزَه اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ এবং এর দ্বারাই আগত আয়াতের শানে নুযূলের দিকেও ইঙ্গিত করছেন।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এর مُشَارُ اِلَيْهِ মুহাজির এবং মুজাহিদগণকে অন্যদের সমপর্যায়ের স্বীকৃতি দেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সকল লোক যারা উল্লিখিত গুণাবলিকে একত্রকারী। যাদের মধ্যে اَهْل سِقَايَة এবং اَهْل عِمَارَة -ও অন্তর্ভুক্ত। اَعْظَمْ দ্বারা সন্দেহ হয় যে, اَهْل سِقَايَة এবং اَهْل عِمَارَه যদি মহামর্যাদার অধিকারী না হয় তবে বড় মর্যাদার অধিকারী হবে। অথচ ঈমান ব্যতীত কারোও সৎকাজের বিনিময়ে পরকালে কোনো মর্যাদা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরুতে মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং মুসলমানদের সাথে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর তাদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ পেশ করা হয়েছে, যাতে করে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তাদের অন্যায় আচরণই তাদের সম্পর্কে এ চরম সিদ্ধান্তের কারণ। এতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে এই নাফরমানদের কোনো স্থান নেই। তখন মক্কার মুশরিকরা নিজেদের ফজিলত এবং মর্তবা প্রমাণ করার জন্য স্বদম্ভে বলতে লাগলো, আমাদের মধ্যে অনেক গুণাবলি রয়েছে এবং আমরা অনেক ভালো কাজও করে থাকি। মক্কা মোয়াজ্জামায় হজের জন্য যারা আগমন করে আমরা তাদের খেদমতে নিয়োজিত হই এবং তাদেরকে পানি সরবরাহ করি। সমজিদে হারামের মেরামতের কাজ, তার দেখাশোনাও আমরা করে থাকি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ২৯৮, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৬]

এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের আস্ফালনের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কাজ তখন গ্রহণযোগ্য হবে যখন তোমরা ঈমান আনবে। যেহেতু তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাস কর না, সেজন্য তোমাদের এসব কাজের কোনো গুরুত্ব নেই।

শানে নুযূল : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন তখন মুসলমানগণ তাকে কাফের থাকার কারণে বিশেষত, প্রিয়নবী ﷺ -এর এত নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না আনার লজ্জা দেন। হযরত আলী (রা.) এ পর্যায়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। তখন হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ আচরণের কথাই উল্লেখ কর আমাদের দোষত্রুটির বিবরণই দিতে থাক, আমাদের গুণাবলির কথা কেন উল্লেখ কর না? হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো গুণ আছে কি? জবাবে হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমরা মসজিদুল হারামের মেরামত কাজ সুসম্পন্ন করি, আমরা কা'বা শরীফের দেখাশোনা করি এবং হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করি। হযরত আব্বাস (রা.)-এর এই বক্তব্যের বাতুলতা ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৯৬, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৭, তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১০, পৃ. ৬৫]

ইরশাদ হয়েছে– مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করা মুশরিকের কাজ নয়। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না, তাদের মসজিদের খেদমত করা বা তাকে আবাদ করার কোনো অধিকার নেই। মসজিদ পবিত্র স্থান যারা মুশরিক তারা অপবিত্র, তাই কোনো মুশরিকের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামত : ১. শুধু আল্লাহর জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। ২. কোনো অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়– وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ "আর আল্লাহ তোমরা যা করে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" তাই তাঁর কাছে কোনো হীলা-বাহানা চলবে না।

এ বিষয়টি কুরআনের অপর আয়াতে এরূপে ব্যক্ত হয়– اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ "লোকেরা কি মনে করে যে, ঈমানের দাবি করার পর কোনো পরীক্ষায় নিপতিত করা ব্যতীত তাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?"

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েজ নয় : ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ وَلِيْجَةً এর অর্থ– অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بِطَانَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ– কাপড়ের ঐ স্তর, যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেটে বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হলো– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত, আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোনো ত্রুটি বাকি রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াত মসজিদুল হারাম ও অন্যান্য মসজিদকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরীকায় ইবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো– মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত মুশরিকদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম তো পবিত্র, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও মুশরিকদের নিরাপত্তা বিধানে তারা এখনো বাতিল তরীকায় হারাম শরীফে তওয়াফ ও উপাসনা করে চলে।

অথচ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যেরূপ মূর্তি থেকে হারাম শরীফকে পবিত্র করা হয়, সেরূপ মূর্তিপূজা ও অন্য সকল বাতিল উপাসনা থেকেও পবিত্র করা। এ উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশ বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তা হতো সাধারণ ক্ষমার বরখেলাফ। যার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাই ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হলো। তবে মক্কা বিজয়ের পরের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা.)-এর দ্বারা মিনা ও আরাফাতের সমাবেশে ঘোষণা করান যে, ভবিষ্যতে হারাম শরীফে মুশরিকী তরীকায় কোনো ইবাদত-উপাসনা এবং হজ ও তওয়াফের অনুমতি থাকবে না। জাহেলী যুগে কা'বা শরীফে উলঙ্গ তওয়াফের যে ঘৃণ্য প্রথা চলে আসছে আগামীতে এর অনুমতি দেওয়া হবে না। হযরত আলী (রা.) মিনার সামাবেশে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণাটি প্রচার করেন– لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ অর্থাৎ "চলতি বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না।"

এক বছরের এই যে সময় দেওয়া হলো, তার কারণ, এদের মধ্যে আছে এমন অনেকে, যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি সাধিত হয় এবং এরা চুক্তি পালন করেও চলছে। তাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন কোনো আইন পালনে বাধ্য করা ইসলামি উদারনীতির খেলাফ। এজন্য এক বছর আগেই ঘোষণা করা হয় যে, হারাম শরীফকে মুশরেকী তরিকায় ইবাদত, উপাসনা ও আচার-প্রথা থেকে পবিত্র কারার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের ইবাদত প্রকৃতপক্ষে ইবাদত নয় এবং এর দ্বারা মসজিদ আবাদ করা হলো তা বিরান করার নামান্তর।

মক্কার মুশরিকগণ শিরকী আচার-অনুষ্ঠানকে ইবাদত ও মসজিদুল হারামের হেফাজত ও আবাদ রাখার মাধ্যম মনে করতো। আর এ জন্য তাদের গর্বেরও অন্ত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, একমাত্র তারাই বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ও হেফাজতকর্তা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমার পিতা আব্বাস যখন ইসলাম গ্রহণের আগে বদর যুদ্ধ চলাকালে বন্দী হন এবং মুসলমানরা তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোককে কুফর ও শিরকের উপর অবিচল থাকার জন্য বিদ্রূপ ও লজ্জা দান করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ দিকগুলো দেখ, ভালোগুলো দেখ না। তোমাদের কি জানা নেই

যে, যাবতীয় ইন্তেযাম তথা হাজীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি রয়েছে আমাদের দায়িত্ব। তাই আমরাই এর মুতাওয়াল্লী। মসজিদের তা'মীর বা আবাদ করার একাধিক অর্থ রয়েছে। **যথা– ১ গৃহ নির্মাণ। ২.** রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা। ৩. ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে **উপস্থিতি। 'ইমারত'** থেকে ওমরা শব্দের উৎপত্তি। ওমরা পালনকালে 'বায়তুল্লাহ'এর জিয়ারত ও তথায় ইবাদতের জন্য উপস্থিত হতে হয়।

মক্কার মুশরিকরা এই তিন অর্থে নিজেদেরকে বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের আবাদকারী **মনে করতো এবং** তাদের গর্ব ছিল প্রচুর। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবি নাকচ করে বলেন যে, কুফর ও **শিরকের উপর তাদের** স্বীকৃতি ও সুদৃঢ় থাকার প্রেক্ষিতে আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার কোনো অধিকার তাদের নেই; বরং এ বিষয়ে তারা **অনুপযুক্ত।** এ কারণে তাদের আমলগুলো নিষ্ফল এবং তাদের স্থায়ী বসবাস হবে জাহান্নামে।

কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি কথাটির এক অর্থ হলো, তারা শিরক ও কুফরি কার্যকলাপের দ্বারা তার স্বীকৃতি দিচ্ছে। অপর অর্থ হলো, কোনো খ্রিস্টান বা ইহুদির পরিচয় চাওয়া হলে তারা নিজেদের খ্রিস্টান বা ইহুদি বলে পরিচয় দেয়। অনুরূপ, অগ্নি উপাসক ও মূর্তিপূজকদের পরিচয় চাওয়া হলে নিজেদের কুফরি নামের দ্বারা পরিচয় প্রদান করে। এটিই হলো তাদের কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মসজিদ আবাদকরণে কাফেরদের অনুপযুক্ততা এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের উপযুক্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। এর তাফসীর হলো, মসজিদের প্রকৃত আবাদ তাদের দ্বারা সম্ভব, যারা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে হুকুমে **ইলাহীর** অনুগত; যাদের পাকাপোক্ত বিশ্বাস রয়েছে আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি। যারা নিয়মিত নামাজের পাবন্দী করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ভয় অন্তরে স্থান দেয় না।

এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রোজ-কিয়ামতের উল্লেখ করা হলো মাত্র। রাসূলের উল্লেখ এ জন্য করা হলো না যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনীত শরিয়তের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অসম্পূর্ণই থেকে যায়, ঈমান বির-রাসূল, 'ঈমান বিল্লাহ'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা বোঝানোর জন্যই একদিন হুজুর ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ কি? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। হুজুর ﷺ বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো, মানুষ অন্তরের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের আর কেউ যোগ্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান বিররসুল 'ঈমান-বিল্লাহ'-এ শামিল রয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

"আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না" বাক্যের মর্ম হলো কারো ভয়ে আল্লাহর হুকুম পালন থেকে বিরত না থাকা। নতুবা, প্রত্যেক ভয়ঙ্কর বস্তুকে ভয় করা তো মানুষের স্বভাব। এজন্যই হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সর্প ও চোর-ডাকাত প্রভৃতিকে মানুষ ভয় করে। হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে যখন যাদুকরেরা রশিগুলোকে সর্পে পরিণত করে, তখন তিনিও ভীত হন। তাই কষ্টদায়ক বস্তুগুলোর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভয় উপরিউক্ত কুরআনী আদেশের পরিপন্থী নয় এবং তা রিসালত বিরোধীও নয়। তবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে বিরত থাকা মুমিনের শান নয়। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

কতিপয় মাসায়েল : আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হলো, কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরো ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোনো কাফেরকে কোনো ইসলামি ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েজ নয়। তবে নির্মাণ কাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। -[তাফসীরে মুরাগী]

কোনো অমুসলিম যদি ছওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয় তবে কোনো প্রকার দীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি তার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। -[শামী]

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরিউক্ত গুণাবলিসম্বলিত নেককার মুসলমানদের। **এর থেকে বোঝা যায়,** যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির **বা দীনি** ইলমের শিক্ষাদানে কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামিল **মুমিন**

হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ "তারাই আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তাঁর জন্যে জান্নাতের একটি মাকাম প্রস্তুত করেন।" হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর জিয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হলো মেহমানরে সম্মান করা।"
-[তাফসীরে মাযহারী, তাবারানী, ইবনে জারীর ও বায়হাকী প্রভৃতি]

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া বিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ। -[তাফসীরে মাযহারী]

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা' হলো মক্কার অনেক কুরাইশ মুসলমানদের মোকাবিলায় **গর্ব সহকারে বলতো, মসজিদুল** হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর **কারো কোনো আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার** হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আববাস (রা.) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং **তাঁর মুসলিম আত্মীয়রা তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল** থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে **বঞ্চিত রয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত** [দেশত্যাগ]-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, **কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল** হারামের রক্ষণাবেক্ষণ **ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে** না। তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, এ **ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।**

মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর **ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস** ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে **ফজীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ** শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরেও রাত যাপন করতে **পারি। হযরত আব্বাস** (রা.) **বলেন,** হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা আমার **নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর** হযরত আলী (রা.) **বলেন, বুঝতে পারি না** এগুলোর **উপর** তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো, আমি সবার **থেকে ছয় মাস** আগে বায়তুল্লাহর দিকে রুখ করে নামাজ আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। তাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোনো আমল তা যতই বড় হোক আল্লাহ কাছে কোনো মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহর মকবুল বান্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নুমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমার দিন তিনি কতিপয় সাহাবীর সাথে মসজিদে নববীতে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মতো মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো আমল নেই এবং এর মোকাবিলায় আর কোনো আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার মতো উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দুজনের মধ্যে **বাদানুবাদ** চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বরের কাছে শোরগোল **বন্ধ কর।** জুমার নামাজের পরে স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথা মতো প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর **প্রেক্ষিতেই** উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে **প্রাধান্য দেওয়া হয়।**

ঘটনা যা হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদেরও অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের **পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা** ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা **ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে** আয়াতগুলো নাজিল হয়।

সে **যা হোক, উপরিউক্ত আয়াতে যে সত্যটি** তুলে ধরা হয় তা হলো, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় **আমলই হোক কবুলযোগ্য** নয় এবং এর **মূল্যমানও নেই। সে কারণে** কোনো মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের **পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের**

মোকাবিলায় ফজিলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যন্ত ভূমিকার পর উল্লিখিত আয়াতের শব্দ ও অর্থের প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। ইরশাদ হয়–

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে সেই লোকের [আমলের] সমান মনে কর যার ঈমান রয়েছে আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি এবং সে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়।"

পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা আয়াতের এ উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায় যে, ঈমান ও জিহাদ উভয়েই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি সরবরাহের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে মুশরিকের অসার দাবির খণ্ডন রয়েছে। আর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা মুসলমানদের সেই ধারণার বিলোপ সাধন করা হচ্ছে, যাতে তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহকে জিহাদের চাইতেও পুণ্যকাজ মনে করতো।

আল্লাহর জিকির জিহাদের চেয়ে পুণ্যকাজ : তাফসীরে মাযহারীতে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, এ আয়াতে মসজিদ আবাদ করার উপর জিহাদের যে ফজিলত রয়েছে তা তার যাহেরী অর্থানুসারে। অর্থাৎ মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তবে তার চাইতে জিহাদের ফজিলত স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি ইবাদত ও আল্লাহর জিকির উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনাগমন হয় আর এটিই হলো মসজিদের প্রকৃত আবাদকরণ; তবে রাসূলে করীম ﷺ -এর স্পষ্ট হাদীসের আলোকে তা হবে জিহাদের চাইতেও উত্তম কাজ। যেমন মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের এমন আমলের সন্ধান দেব, যা তোমাদের অন্যান্য আমল থেকে উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের মর্যাদা সমুন্নতকারী এবং যা আল্লাহর রাহে সোনা-রূপা দান করার চাইতেও উত্তম। এমন কি সেই জিহাদের চাইতেও উত্তম, যেখানে তোমরা শত্রুর সাথে শক্ত মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে এবং তোমরা তাদেরকে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ , তা অবশ্যই বলবেন। হুজুর ﷺ বলেন, তা হলো আল্লাহর জিকির। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, জিকিরের ফজিলত জিহাদের চাইতেও বেশি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মসজিদ আবাদের অর্থ যদি জিকরুল্লাহ নেওয়া হয় তবে তা জিহাদ থেকে আফজল হবে। কিন্তু মুশরিকদের গর্ব অহংকার জিকির ও ইবাদতের ভিত্তিতে ছিল না; বরং তা ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে। তাই আয়াতে জিহাদকে অধিক ফজিলতের কাজ বলে অভিহিত করা হয়।

তবে কুরআন ও হাদীসের সম্মিলিত আদেশ-উপদেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থার তারতম্যে আমলের ফজিলতেও তারতম্য ঘটে। এক অবস্থায় কোনো বিশেষ আল অপর আমলের চাইতে অধি পুণ্যের হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তা লঘু আমলে পরিণত হয়। যে অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষা যুদ্ধের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, সে অবস্থায় জিহাদ নিঃসন্দেহে সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে কারীম ﷺ -এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছিল। আর যখন যুদ্ধের এমন প্রয়োজন থাকে না তখন আল্লাহর জিকির হবে জিহাদের তুলনায় অধিক ফজিলতসম্পন্ন ইবাদত।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ "আর আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়েত করেন না।" অর্থাৎ ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল ইবাদত থেকে উত্তম এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম তা কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা; কিন্তু আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি-শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ لَا يَسْتَوٗنَ ['সমান নয়'] -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম।" পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোনো সফলতা আল্লাহ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানরা এ সফলতার অংশীদার; কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদদের সফলতা সবার ঊর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হলো তারা।

২১ তম ও ২২ তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়– يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ الخ তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরিউক্ত আয়াতে হিজরত ও জিহাদের ফজিলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হলো মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। ইরশাদ হয়– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ الخ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইয়ের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"

মাতা-পিতা-ভাই-ভগ্নি এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কুরআনের বহু আয়াতে রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়ে যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক, তা মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নি ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত। যেখানে এই দুই সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় : উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরো কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। **প্রথমত** ঈমান হলো আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মতো যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখিরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোনো দাম নেই। তবে আল্লাহ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিষ্প্রাণ নেক আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থ সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কুরআনের আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : গুনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ "আল্লাহ জালিম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়– اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا "তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি ভালোমন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া পরহিজগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠ বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভালোমন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয়ত : নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হলো, আমলের আধিক্যের উপর ফজিলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছে– لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ "যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থত : আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। যথা– ১. নিয়ামতের স্থায়িত্ব। ২. নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহর মকবুল বন্দাদের জন্য আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ [স্থায়ী শান্তি] এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا [তথায় চিরদিন বসবাস করবে] বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চমত: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হলো, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কুরবানি। তাঁর সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বিলাল (রা.), রোমের হযরত সোহাইব (রা.), পারস্যের হযরত সালমান (রা.), মক্কার কুরাইশ ও মদিনার আনসাররা গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় এই প্রমাণ বহন করে।

অনুবাদ :

٢٥. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ لِلْحَرْبِ كَثِيْرَةٍ كَبَدْرٍ وَقُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ وَ اذْكُرْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ اَىْ يَوْمَ قِتَالِكُمْ فِيْهِ هُوَ ازِنَ وَذٰلِكَ فِىْ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ اِذْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَقُلْتُمْ لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ وَكَانُوْا اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا وَالْكُفَّارُ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ مَا مَصْدَرِيَّةٌ اَىْ مَعَ رَحْبِهَا اَىْ سَعَتِهَا فَلَمْ تَجِدُوْا مَكَانًا تَطْمَئِنُّوْنَ اِلَيْهِ لِشِدَّةِ مَا لَحِقَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ج مُنْهَزِمِيْنَ وَثَبَتَ النَّبِىُّ ﷺ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِرِكَابِهِ.

২৫. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন বদর, কুরাযা, নজীর ইত্যাদি আর তোমরা স্মরণ কর হুনাইন দিবসের কথা। অর্থাৎ হাওয়াজিন গোত্রের বিরুদ্ধে সেই দিন তোমাদের যুদ্ধের কথা। তা অষ্টম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হুনাইন মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। সেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করে তুলেছি। তোমরা বলেছিলে, সংখ্যাল্পতার কারণে আজ আর আমরা পরাজিত হব না। সেইদিন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল বার হাজার আর কাফেররাও ছিল বার হাজার কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসল না এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। যে ভীষণ ভীতি তোমাদেরকে পেয়ে বসেছিল সেই কারণে স্বস্তিপূর্ণ ও নিরাপদ কোনো স্থান তোমরা পেতে ছিলে না। অতঃপর তোমরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলায়ন করেছিলে। রাসূল ﷺ এই অবস্থায় তাঁর সাদা খচ্চরটিতে স্থির হয়ে রয়েছিলেন। তাঁরা সাথে তখন হযরত আব্বাস (রা.) ও রেকাব ধারণরত হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ভিন্ন আর কেউ ছিল না। اِذْ -এটা পূর্বোল্লিখিত يَوْمَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مَا رَحُبَتْ এটার مَا -টি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ামূল অর্থজ্ঞাপক। অর্থ– তার বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা সত্ত্বেও।

٢٦. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ طَمَانِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَرَدُّوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ لَمَّا نَادَاهُمُ الْعَبَّاسُ بِاِذْنِهٖ وَقَاتَلُوْا وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ج مَلٰئِكَةً وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ.

২৬. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর সাকীনা অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে প্রশান্তি নাজিল করেন। ফলে হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর অনুমতিক্রমে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে তারা সকলেই রাসূল ﷺ -এর দিকে ফিরে আসেন এবং পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করেন। [এবং তিনি এমন এক সেনাদল] অর্থাৎ ফেরেশতা অবতীর্ণ করে যা তোমরা দেখনি। আর তিনি হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল।

২৭. ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط مِنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

২৭. অতঃপর এদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা ইসলামের তাওফীক প্রদান করত ক্ষমাপরবশ হবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৮. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ قَذَرٌ لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اَىْ لَا يَدْخُلُوا الْحَرَمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج عَامَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَقْرًا بِانْقِطَاعِ تِجَارَتِهِمْ عَنْكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ط وَقَدْ اَغْنَاهُمْ بِالْفُتُوْحِ وَالْجِزْيَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

২৮. হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নিশ্চয় অপবিত্র অর্থাৎ যেহেতু তাদের অভ্যন্তর কলুষপূর্ণ সুতরাং তারা ময়লাকীর্ণ অতএব এই বৎসরের পর অর্থাৎ নবম হিজরির পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে অর্থাৎ হারাম শরীফে যেন তারা প্রবেশ না করে। যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার দরুন দারিদ্র্যের অভাবের আশঙ্কা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ চাইলে তার অনুগ্রহে শীঘ্র তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। বিজয়দান ও জিযিয়া আয়ের মাধ্যমে অচিরেই তিনি তাদের অভাব বিদূরিত করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৯. قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاِلَّا لَاٰمَنُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَالْخَمْرِ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ الثَّابِتِ النَّاسِخِ لِغَيْرِهٖ مِنَ الْاَدْيَانِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ مِنَ بَيَانٌ لِلَّذِيْنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اَىِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ الْخَرَاجَ الْمَضْرُوْبَ عَلَيْهِمْ كُلَّ عَامٍ عَنْ يَّدٍ حَالٌ اَىْ مُنْقَادِيْنَ اَوْ بِاَيْدِيْهِمْ لَا يُوَكِّلُوْنَ بِهَا وَهُمْ صٰغِرُوْنَ اَذِلَّاءُ مُنْقَادُوْنَ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ.

২৯. যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না কারণ, বস্তুতই যদি এতদুভয়ে তাদের বিশ্বাস থাকতো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না, সত্য দীন অর্থাৎ ইসলাম যা সুদৃঢ় ও অন্যান্য সকল ধর্মমত রহিতকারী তা [অনুসরণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে ইসলামের হুকুমের সামনে অবনমিত হয়ে অনুগত্যর নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া অর্থাৎ প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে তাদের উপর আরোপিত কর প্রদান না করে। مِنَ الَّذِيْنَ -এটা পূর্বোল্লিখিত اَلَّذِيْنَ -এর بَيَانٌ বা বিবরণ। عَنْ يَّدٍ -এটা এই স্থানে حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ; অর্থ আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক বা এর অর্থ হলো স্বহস্তে তা পরিশোধ করতে হবে। অন্য কাউকেও তারা এই বিষয়ে উকিল বানাতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَوَاطِنَ : এটা مَوْطِنٌ -এর বহুবচন। অর্থ স্থান জায়গা, অবস্থান স্থল। মুফাসসির (র.) لِلْحَرْبِ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَوْطِنٌ দ্বারা অবস্থান স্থল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো রণাঙ্গন।

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন يَوْمَ টা হলো উহ্য ফে'লের মাফউল مواطن -এর উপর আতফ হয়নি। যেমন বলা হয়েছে, এ কারণে يَوْمَ حُنَيْنٍ হলো ظَرْف زَمَانٌ আর مَوَاطِنَ হলো ظَرْف مَكَانٌ আর زَمَانٌ -এর আতফ مَكَانٌ উপর আতফ বৈধ নয়।

দ্বিতীয় কারণ হলো اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ টা يَوْمَ حُنَيْنٍ -হতে بَدَلٌ হয়েছে, যদি يَوْمَ حُنَيْنٍ -এর আতফ مَوَاطِنَ -এর উপর করা হয় তবে اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ -কেও مَوَاطِنَ হতে بَدَلٌ মানা হবে আর এটা বাতিল। কেননা এর অর্থ হবে যে, সকল স্থানেই আশ্চর্যবোধ হয়েছিল।

قَوْلُهُ هَوَازِنَ : তীরন্দাযীতে প্রসিদ্ধ এক সম্প্রদায় যারা রাসূল ﷺ -এর দুধ মা হযরত হালীমা সাদিয়া (রা.)-এর গোত্র

قَوْلُهُ حُنَيْنٍ : হুনাইন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী মক্কা হতে আঠারো মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম।

قَوْلُهُ بِمَا رَحُبَتْ : رَحُبَتْ -এর رَاء বর্ণটি পেশ যুক্ত হলে অর্থ হবে প্রশস্ততা, আর যবর যুক্ত হলে অর্থ হবে প্রশস্ত বাড়ি/ঘর। আর بِمَا -এর بَاء -টি مَعَ অর্থে। আর مَا হলো مَصْدَرِيَّة কাজেই عَائِد না হওয়ার আপত্তি উত্থাপন করা হবে।

قَوْلُهُ فَلَمْ تَجِدُوْا مَكَانًا : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হলো এই ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ দ্বারা বুঝা গেল যে, জমিন স্বীয় প্রশস্ততা সত্ত্বেও তা সংকীর্ণ হয়ে গেল। অথচ জমিন তার অবস্থায়ই রয়ে গেছে।

উত্তর. উত্তর এই যে, জমিনের প্রশস্ততার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَجَازًا عَدَمُ وُجُوْدِ الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ

قَوْلُهُ لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. نَجَسٌ হলো মাসদার আর মাসদারের حَمْل জাতের উপর বৈধ নয়।

উত্তর. نَجَسٌ মাসদার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذُوْ نَجَسٍ অথবা مُبَالَغَه -এর ভিত্তিতে حَمْل হয়েছে। নাজাসাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে মুবালাগা করার জন্য। মনে হয় যেন মুশরিক হলো প্রকৃত নাপাক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো– اَلْمُشْرِكُوْنَ হলো বহুবচন আর نَجَسٌ হলো একবচন যার কারণে মুবতাদা এবং খবরের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধান হচ্ছে না।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হচ্ছে نَجَسٌ টা মাসদার হওয়ার কারণে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রেই এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– رَجُلٌ نَجَسٌ ، رَجُلَانِ نَجَسٌ ,رِجَالٌ نَجَسٌ কতিপয় জাহিরিয়্যাহ এবং যায়দিয়্যায়হ মুশরিককে نَجَسُ الْعَيْنِ গণ্য করে থাকেন।

قَوْلُهُ عَيْلَةً : এর অর্থ হলো দরিদ্রতা এটা عَالَ يَعِيْلُ তথা বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার, অর্থ হলো মুখাপেক্ষী হওয়া।

قَوْلُهُ وَاِلَّا لَاٰمَنُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -এর দ্বারা আহলে কিতাবদের থেকে اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ এবং اِيْمَانٌ بِالْاٰخِرَةِ -এর نَفْى করা হয়েছে। অথচ এই দলই আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে।

উত্তর. উত্তরের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই লোকেরা যদি সত্যিকারার্থে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হতো, তবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর অবশ্যই ঈমান আনায়ন করত। যখন তারা রাসূল ﷺ -এর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করেনি, কাজেই তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

قَوْلُهُ دِيْنَ الْحَقِّ اَىْ اَلدِّيْنَ الْحَقّ : এখানে اِضَافَةُ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ عَنْ يَدٍ এটা يُعْطُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। يَدٍ-এর তাফসীর مُنْقَادِيْنَ দ্বারা করাটা تَفْسِيْرٌ بِاللَّازِمِ হয়েছে। বলা হয়- اَعْطٰى فُلَانٌ بِيَدِهٖ অর্থাৎ اَسْلَمَ وَانْقَادَ

قَوْلُهُ بِاَيْدِيْكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَنْ يَدٍ-এর মধ্যে عَنْ টা بَاء অর্থে হয়েছে। আর এটা عَنْ يَدٍ-এর দ্বিতীয় বা অন্য তাফসীর।

قَوْلُهُ يُوَكِّلُوْنَ : এটা বাবে تَفْعِيْلٌ-এর تَوْكِيْلٌ মাসদার থেকে মুযারের جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থ হলো সোপর্দ করা, উকিল বানানো।

قَوْلُهُ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ : এমতাবস্থায় যে, সে স্বীয় আপদস্থতার কথা অনুভব করে। اَلصَّاغِرُ الرَّاضِىُّ بِالْمَنْزِلَةِ الدَّنِيَّةِ (راغب) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, صِغَارٌ হলো ইসলামি নীতিমালার অধীনস্থতা স্বীকার করা/ গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে, এমন কি যদি সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, ইসলামের জন্যে স্ত্রী, পুত্র পরিবার, বাড়ি-ঘর ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিতে হয় তবুও অকুণ্ঠচিত্তে এমন ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দেওয়া মর্দে মুমিনের কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পার্থিব জীবনের লোভনীয় বিষয়সমূহ যারা দীনের প্রয়োজনে পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে দীন দুনিয়া উভয়টিই দান করেন।

পক্ষান্তরে, যখন মানুষ দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীর উপর ভরসা করে তখন দীন দুনিয়া উভয়টিই তার বিনষ্ট হয়। যেমন হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বার হাজার, ইসলামের ইতিহাসে এত অধিক সংখ্যক লোক ইতিপূর্বে কোনো দিনও মুসলিম বাহিনীতে শরিক হয়নি। তাই মুসলমানদেরকে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য উৎফুল্ল করে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতার স্থলে সংখ্যা-নির্ভরতার ভাব পরিলক্ষিত হয় যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেননি। তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ পাক অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে বিপদগ্রস্ত করেন। সংখ্যায় অধিক থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের অতর্কিত তীর বর্ষণের কারণে মুসলমানদের পক্ষে রণাঙ্গনে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর নৈকট্যধন্য অল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামই রণাঙ্গনে অটল অবিচল ছিলেন। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১১৬, পৃ. ২০]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হুনাইন যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল এবং কিছু দরকারী বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বের সূরায় মক্কা বিজয় ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির বিবরণ ছিল।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহর সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতিক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।" এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমন সব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য আয়াতের শাব্দিক তাফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তাফসীর অনুধাবন হবে সহজ এবং সে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশ্যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয় তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তাফসীরে মাযহারী থেকে নেওয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম, যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। অষ্টম হিজরির রমজান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কুরাইশরা অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজিন গোত্রে– যার একটি শাখা তায়েফের বনূ সাকীফ নামে পরিচিত, হৈ চৈ পড়ে যায়। ফলে তারা একত্র হয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের শিকার হবো আমরা। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াজিন গোত্র মক্কা থেকে

তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখা গোত্রগুলোকে একত্র করে। আর সে গোত্রের মুষ্টিমেয় শ' খানেক লোক ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এখানে আন্দোলনের নেতা ছিলেন মালিক ইবনে আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা বনূ কা'আব ও বনূ কিলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। এজন্য তারা বলে "পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াটাও যদি মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে একত্র হয়, তথাপি, তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।" যা হোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং যার যার সহায়-সম্পত্তিও সাথে রাখবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায় সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। এ কৌশলের ফলে যেন কারো পক্ষে পলায়নের সুযোগ না থাকে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর (র.) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফে অবহিত হন তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রা.)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মোআজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে লোকদের ইসলামি তালিম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধার স্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশের সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত ﷺ বলেন, না, না, বরং ধার স্বরূপ নিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেবো। একথা শুনে সে একশ লৌহবর্ম এবং নওফেল ইবনে হারিস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম জুহরী (র.)-এর মতে, চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত ﷺ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদিনার বার হাজার আনসার যারা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকি দু'হাজার ছিলেন আশেপাশের অধিবাসী, যাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন; যাঁদের বলা হতো 'তোলাকা'। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী কিনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও রণদৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ভালো সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা বিন উসমানও ছিলেন, যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত শোনান। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রা.)-এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে মারা পড়েন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আইম তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌছি। কিন্তু দেখি যে ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবূ সুফিয়ান বিন হারিস হুজুর ﷺ -এর হেফাজতে আছে। এজন্য পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌছি এবং সংকল্প নিই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁর আয়ূ শেষ করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এসো। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বক্ষের উপর রাখেন আর দোয়া করে, "হে আল্লাহ! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।" অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আর চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হুজুর ﷺ -কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হুজুর ﷺ -এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমি প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হুজুর ﷺ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাজির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধিকে প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে

মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে আর আমাকে হত্যার জন্য আশেপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো। পরিশেষে তাই হলো।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নজর বিন হারেসের সাথে। তিনিও এ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তাঁর অন্তরে হুজুর ﷺ -এর ভালোবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবিলা করে চলেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা বিন নায়ার (রা.)-এর সাথে। তিনি 'আউতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত ﷺ বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার মাথার পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ আমার হেফাজতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবূ বুরদা (রা.) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রু দলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। রাসূল ﷺ বললেন, চুপ কর, আমার দীন অপরাপর দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ আমার হেফাজত করে যাবেন। এই বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যা হোক, মুসলিম সেনাদল হুনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল বিন হানযালা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রু দলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চিন্তা করো না! ওদের সবকিছু গনিমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাদ্দাদ (রা.)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা রূপে পাঠান তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রুসেনা-নায়ক মালিক বিন আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, "মুহাম্মদ এখনো কোনো সাহসী যুদ্ধবাজ জাতির পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবিলা? আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে।" বস্তুত এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হলো শত্রুদের রণ-প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসেবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ তেরজন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সেনা। তাই হুনাইনের বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে 'হাকিম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনা মতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবি করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর না-পছন্দ যে, কোনো মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসা করে থাকুক। তাই মুসলমানদের আল্লাহ এ কথাটি বুঝিয়ে দিতে চান।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলতি আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবীদের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তাঁরা পালাতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী, যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ, অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ কিংবা তারও কম, যারা হুজুর ﷺ -এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নিচে জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাকারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসাররাই বা কোথায়? সবাই ফিরে এসো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীরা ফিরে দাঁড়ায় এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধে করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ এদের সাহায্যে ফেরেশতা দল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের সেনানায়ক মালিক বিন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এর পর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তরজন কাফের নেতা মারা পড়ে।

কতিপয় মুসলমানের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রোপ্য।

আলোচ্য প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে যুদ্ধের এ দিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে এলো না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তার পর তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন দ্বিতীয় আয়াতে বলেন- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর" এ বাক্যের অর্থ হলো হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যেসব সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহর প্রশান্তি লাভের পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি প্রশান্তি প্রেরণের অর্থ হলো, তাঁরা বিজয়কে খুব নিকটে দেখেছিলেন। এতে বোঝা গেল, আল্লাহর সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। যথা- ১. পলায়নরত সাহাবীদের জন্য। ২. হুজুর ﷺ -এর সাথে যারা সুদৃঢ় রয়েছেন, তাঁদের জন্য। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য عَلٰى [উপর] শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন- "অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর।"

অতঃপর বলা হয় وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল, যাদের তোমরা দেখনি। এটি হলো সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণনা আছে তা উপরিউক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলো- وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ "আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের পরিণাম।" এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমাদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হলো। পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের ব্যাপারে উল্লেখ হয় নিম্নরূপে- ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ "অতঃপর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরি আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার মারা পড়ে; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনিমত রূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এর মধ্যে ছিল ছ' হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র , চল্লিশ হাজারেরও অধিক বকরি এবং চার হাজার উকিয়া রূপা, যার ওজন চার মণের সমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হারবকে গনিমতের এসব মালামালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলে কারীম ﷺ পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে থাকেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'জি'ইররানা' নামক স্থানে পৌঁছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদিনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধ প্রাঙ্গণে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'ইররানা নামকস্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এখানে মালে গনিমত রূপে প্রাপ্ত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঠিক ভাগ-বাটোয়ারার সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ সদস্যের এক প্রতিনিধি যোহাইর বিন ছরদের নেতৃত্বে হুজুর ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্পর্কীয় চাচা আবূ ইয়ারকানও ছিলেন। তারা এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের অনুরোধ, আমাদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমরা আবূ ইয়ারকান সূত্রে আপনার আত্মীয়ও হই। আমরা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছি, তা আপনার অজানা নয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হোন। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনি দুর্দশার প্রেক্ষিতে যদি আমরা রোমান

বা ইরাক সম্রাটের কাছে কোনো অনুরোধ পেশ করি, তবে আশা করি যে, তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিন্তু আল্লাহ আপনার আদর্শ চরিত্রকে সবার উর্ধ্বে রেখেছেন। তাই আপনার কাছে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত।

রাহমাতুললিল আলামীনের জন্য এ অনুরোধ ছিল উভয় সঙ্কটের কারণ। তাঁর দয়া ও উদার নীতির দাবি ছিল ওদের সকল বন্দী ও মালামাল ফিরিয়ে দেওয়া। অপর দিক শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের উপর রয়েছে মুজাহিদদের ন্যায্য দাবি। তাদের সে দাবি থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তাই বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে হুজুর ﷺ যে জবাব দিয়েছিলেন তা হলো–

"আমার সাথে আছে অসংখ্য মুসলিম সেনা, এরা এ সকল মালামালের দাবিদার। আমি সত্য ও স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। তাই তোমাদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি দু'টির একটি হয় বন্দীদের ফেরত নাও, নয়তো মালামাল নিয়ে যাও।" যে'টি চাইবে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। তারা বন্দী মুক্তি গ্রহণ করল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল সাহাবীকে একত্র করে একটি খুৎবা পাঠ করেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন।

"তোমাদের এই ভায়েরা তওবা করে এখানে এসেছে। তাদের বন্দীদের মুক্তিদান সঙ্গত মনে করছি। তোমাদের যারা সন্তুষ্ট মনে নিজেদের অংশ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হতে পার, তারা যেন এদের প্রতি দয়াবান হয়। আর যারা প্রস্তুত হতে না পারে, ভবিষ্যতের 'মালে ফাই' থেকে তাদের উপযুক্ত বদলা দেব।"

রাসূলে করীম ﷺ -এর এ খুতবার পর সর্বস্তর থেকে আওয়াজ আসে 'বন্দী প্রত্যর্পণে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে রাজি।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ন্যায়নীতি ও পরের হকের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক আছে বিধায় সমস্বরে তাদের এ সন্তুষ্টি প্রকাশকে যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই বললেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমাদের কে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করতে রাজি হয়েছ, কে লজ্জার খাতিরে নীরব রয়েছ। এটি মানুষের পারস্পরিক হক। সুতরাং গোত্র ও দলের সরদারগণ আপন লোকদের সঠিক রায় নিয়ে আমাকে যেন অবহিত করেন।

সেমতে তারা নিজ লোকদের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে হুজুর ﷺ-কে জানান যে, প্রত্যেকে নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাজি আছে। একথা জানার পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান করেন। এই লোকদের কথা আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তাদেরকে তওবার তাওফীক দেবেন। হুনাইন যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো, তার কিছু অংশ কুরআন থেকে এবং বাকি অংশ নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, ইবনে কাসীর]

আহকাম ও মাসায়েল : উপরিউক্ত ঘটনাবলি থেকে বিভিন্ন আহকাম ও মাসায়েল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু জরুরি বিষয় প্রমাণিত হয়। মূলত এগুলোর বর্ণনার জন্য ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হলো।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য : উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হলো মুসলমানদের কোনো অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহর সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

হুনাইন যুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও মুসলিম সেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, তা আল্লাহর নিকট তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর গায়েবি সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণের ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেওয়া : দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ এবং প্রত্যার্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। কিন্তু হুজুর ﷺ তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় হেদায়েত : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা মুসলমাদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তাহলো, আল্লাহ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহর শোকর আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেওয়া হাওয়াযিন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদদোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া রাসূল ﷺ করেছেন তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়, বরং উদ্দেশ্যে হলো হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ হেদায়েত : পরাজিত শত্রুদেরও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফিকহশাস্ত্রবিদরা এ থেকে এই মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনের চাঁদা আদায় করাও জায়েজ নয়। কারণ অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে অথচ, অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থকড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ الخ : সূরা বারাআতের শুরুতে কাফের মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত বিধিবিধানের উল্লেখ করা হয়। সম্পর্কচ্ছেদের সারকথা ছিল বছরকালের মধ্যে কাফেরদের সাথে কৃত চুক্তিসমূহ বাতিল বা পূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং এ ঘোষণার এক বছর পর কোনো মুশরিক যেন হেরেমের সীমানায় না থাকে।

আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ কায়দায় বিষয়টির বিবরণ দেওয়া হয়। এতে রয়েছে উপরিউক্ত আদেশের হিকমত ও রহস্য এবং তজ্জনিত কতিপয় মুসলমানের অহেতুক আশঙ্কার জবাব। এ আয়াতে উল্লিখিত نَجَسٌ [নাজাস] শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ব্যাপক অর্থে পঙ্কিলতা যার প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধ থাকে, ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, 'নাজাস. বলতে চোখ, নাক ও হাত দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহের যেমন, তেমনি জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহের অপবিত্রতা বোঝানো হয়। তাই 'নাজাস' বলতে দৃশ্যমান ঘৃণিত বস্তুকেও বোঝায় এবং অদৃশ্য অপবিত্রতা যার ফলে শরিয়তে অজু বা গোসল ওয়াজিব হয় তাও বুঝায়। যেমন জানাবত, হায়েজ, নেফাস পরবর্তী অবস্থা এবং ঐ সকল বাতেনী নাজাসত যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে রয়েছে যেমন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ ঘৃণিত স্বভাব।

উল্লিখিত আয়াতের শুরুতে اِنَّمَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা حَصْر বা কোনো বস্তুর সার্বিক মর্মকে সীমিত করা হয়। তাই اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ-এর মর্ম হবে মুশরিকরা সঠিক অর্থেই অপবিত্র। কারণ এদের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের অপবিত্রত থাকে। তারা অনেকগুলো দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তুকেও অপবিত্র মনে করে না। যেমন মদ ও মাদক দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্য অপবি বস্তুতেও অপবিত্র কিছু আছে বলে তারা বিশ্বাসও করে না। যেমন স্ত্রীসঙ্গম ও হায়েজ-নেফাস পরবর্তী অবস্থা সে জন্য এ মন্দ স্বভাবগুলোকেও তারা দূষণীয় মনে করে না।

তাই আয়াতে মুশরিকদের প্রকৃত খাঁটি অপবত্রি রূপে চিহ্নিত করে আদেশ দেওয়া হয়- فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল হারাম' বলতে সাধারণত বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙিনাকে, যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও হাদীসের কোনো কোনো স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হেরেম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা কয়েক বর্গমাইল এলাকা ব্যাপী, যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামদের ঐকমতে এখানে মসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ মেরাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম-এর উল্লেখ রয়েছে اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ এখানে উল্লিখিত সন্ধির স্থান হলো 'হুদয়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। -[জাস্সাস] এ বছরের পর মুশরিকদের জন্য পূর্ণ হেরেম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো।

তবে এ বছর বলতে কোনটি, বোঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরি। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তা হলো নবম হিজরি। কারণ নবী করীম ﷺ নবম হিজরির হজের মৌসুমে হযরত আলী ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরি থেকে দশম হিজরি পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরির পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

কতিপয় প্রশ্ন : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরির পর মসিজদুল হারামের মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিন প্রশ্ন আসে। যথা- ১. এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল হারামের জন্য, না অন্যান্য মসজিদের জন্যও? ২. মসজিদুল হারামের

হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্য, না শুধু হজ ও ওমরার জন্য? ৩. এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্য, না আহলে-কিতাব কাফেরদের জন্যও?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কুরআন নীরব, তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কুরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হুজুর ﷺ -এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোচনা করতে হয়, কুরআন মাজীদ মুশকিদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রতা হেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরজ হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবত্রিতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবত এর হুকুম হবে ভিন্ন।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, মদীনার ফিকহশাস্ত্রবিদরা তথা ইমাম মালেক (র.) ও অন্য ইমামদের মতে মুশরিকরা যে কোনো দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি জানাবতের গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্য হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর একটি ফরমানকে দলিলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকদের লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরিউক্ত আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর এই হাদীস।

"কোনো ঋতুমতী মহিলা বা জানাবতের কারণে যার জন্য গোসল ফরজ হয়েছে, তার পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েজ মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে,. কাফের-মুশরিকরা জানাবতের গোসল সাধারণত করে না। তাই তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হুকুমটি কাফের-মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল হারামের জন্য নির্দিষ্ট। অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশাদি নিষিদ্ধ নয়। -[কুরতুবী]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো ছুমামা ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে এক স্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম ﷺ তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উপরিউক্ত মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য মুশরিকদের প্রতি যে, আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হলো আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজে ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর দলিল হলো, হজের যে মৌসুমে হযরত আলী (রা.)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয় তাতে একথা উল্লেখ ছিল- لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ অর্থাৎ "এ বছর পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না।" তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াতে? فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ "মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হবে না।" এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.) অতঃপর বলেন, হজ ও ওমরা ছাড়া মুশরিকরা অন্য কোনো প্রয়োজনে আমীরুল মুমিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাদের দলিল হলো মক্কা বিজয়ের পর সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ এরা তখন ও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামও আপত্তি তুলেছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এরা তো অপবিত্র। রাসূল ﷺ তখন বলেছিলেন, মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না। -[জাসসাস]

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয় যে, কুরআন মাজীদে মুশকিরদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন, "কোনো মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না।" তবে সে কোনো মুসলমানদের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন বোধে প্রবেশ করতে পারে। -[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হলো কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশঙ্কা। এ আশঙ্কা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানরাও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে মসজিদুল হারাম বলতে যখন পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্য শুধু মসজিদুল হারামের নয়; বরং পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হলো ইসলামের দুর্গ। কোনো অমুসলিম থাকতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত তত্ত্বের সারকথা হলো, কুরআন ও হাদীস মতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরি বিষয় কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদি হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বারাআতের শুরুতে। অর্থাৎ অচিরেই হেরেম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হেরেম শরিফ ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং অন্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এ আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, "এ বছরের পর পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।" তারা শিরকী প্রথামতে হজ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নবম হিজরির পর কোনো মুশরিক হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলে কারীম ﷺ এ আদেশকে আরো ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোনো কাফের-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হুজুর ﷺ নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন।

বাকি থাকল কাফেরদের অপবিত্রতা এবং মসজিদগুলোকে নাপাকী থেকে পবিত্র করার মাসআলা। এ সম্পর্কে ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, কোনো মুসলমান প্রকাশ্য নাপাকী নিয়ে এবং গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় কোনো মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যদিকে কাফের-মুশরিক হোক বা আহলে-কিতাব তারাও সাধারণত উল্লিখিত নাপাকী থেকে পবিত্র নয়, তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে তাদের জন্যও কোনো মসজিদে প্রবে জায়েজ নয়।

উক্ত আয়াত মতে, হেরেম শরীফে কাফের-মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য এক নতুন অর্থনৈতি সমস্যার সৃষ্টি হলো। কারণ মক্কা হলো অনুর্বর জায়গা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এখানে হয় না। বহিরাগত লোকেরা এখানে খাদ্যের চালান নিয়ে আসতো। এভাবে হজের মৌসুমে মক্কাবাসীদের জন্য জীবিকার প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড় হয়ে যেত। কিন্তু হেরেম শরীফে ওদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে পূর্বাবস্থা আর বাকি থাকবে না। এ প্রশ্নের উত্তর আয়াতের এ বাক্যে আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً الخ অর্থাৎ "তোমরা যদি অভাব-অনটনের ভয় কর তবে মনে রেখ যে, রিজিকের সকল ব্যবস্থা আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে কাফেরদের থেকে তোমাদের বেনিয়াজ করে দেবেন। "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাক্য দ্বারা সন্দেহের উদ্রেক করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বাক্যটি এ কথার ইঙ্গিতবহ যে, পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা যদিও মনে করবে যে, কাফেরদের হেরেম শরীফে আসতে না দেওয়ার ফলে আর্থিক সঙ্কট অনিবার্য; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। বরং বিলম্ব তাঁর ইচ্ছার। তিনি ইচ্ছা করলেই সবকিছু অনায়াসে হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের অভাব দূর করে দেবেন।"

قَوْلُهٗ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের এবং তাদেরকে আরব ভূ-খণ্ড থেকে বহিষ্কার করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ রয়েছে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৯৮, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ২৭]

আর এ জিহাদ কত দিন চলবে তার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তারা আপমানিত হয়ে অমুসলিম কর আদায় না করে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে, আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে বিধান হলো হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা তরবারি দ্বারা মীমাংসা করা হবে।

প্রিয়নবী ﷺ যখন আরবদের সঙ্গে জিহাদ শেষ করলেন তখন আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের সঙ্গে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন, হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ আরবদের সঙ্গে জিহাদ করেন আর তাদের নিকট থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেননি, তবে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় তাদের থেকে জিজিয়াও গ্রহণ করেছেন। জিজিয়া হলো অমুসলিম কর। সর্বপ্রথম নাজরানবাসী জিজিয়া আদায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না, আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

মুজাহিদ (র.) বলেছেন যখন রুমীয়দের সাথে প্রিয়নবী ﷺ -কে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরই প্রিয়নবী ﷺ তাবুকের যুদ্ধে তাশরিফ নিয়ে যান।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩০৮, তাফসীরে মাযহারী খ. ৫ পৃ. ২৩৫]

আহলে কিতাব তথা ইহুদি নাসারাদের মধ্যে যখন চারটি দোষ পাওয়া যায় তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। যথা–

১. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না। কেননা তারা হযরত ঈসা (আ.) ও ওজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করে [নাউজুবিল্লাহ] এটি ঈমান বিরোধী কাজ, আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করে না।

২. وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আর তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না। ইহুদিরা মনে করে তারাই জান্নাতে যাবে, আর নাসারারা মনে করে জান্নাতের আধিকারী একমাত্র তারাই। ইহুদিরা দাবি করে সামান্য কয়েক দিন দোজখ তাদেরকে স্পর্শ করবে, এরপর তারা নাজাত পাবে। আর ইহুদি নাসারারা এ কথাও বলে যে, জান্নাতের নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের ন্যায়ই হবে। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জান্নাত চিরস্থায়ী না সাময়িক, এসব কারণে আখিরাতের প্রতি তাদের ঈমান নেই এ কথাই প্রমাণিত হয়।

৩. وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছেন তারা সেগুলোকে হারাম মনে করে না। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। ক. পবিত্র কুরআনে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর মহান আদর্শে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে তারা সেগুলোকে হারাম বলে মনে করে না। খ. তাওরাত ইঞ্জিলে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে তারা সেগুলোও মানে না; বরং তাওরাত ইঞ্জিলে তারা পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের ইচ্ছা মতো বিধান তৈরি করেছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رَسُوْلُهٗ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেই রাসূল, যার অনুসরণের দাবি করে তারা, অথচ সে রাসূলেরও অনুসরণ তারা করে না। কেননা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) আদেশ দিয়ে গেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করতে, কিন্তু তারা তা করে না।

৪. وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের 'হক্ব' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এমন অবস্থায় এর অর্থ হবে যারা আল্লাহর দীন সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না। কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম" আর তারা ইসলাম গ্রহণ করে না।

জিযিয়া ও খেরাজ : জিযিয়া বলা হয় সে করকে, যা কাফেরদের জীবনের বদলে আদায় করা হয়। যিজিয়া শব্দটি "জাযা" থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ তুমি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধী ব্যক্তি। কিন্তু তোমাকে এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমার উপর এ দণ্ড জারি হচ্ছে না এবং দারুল ইসলামে নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তোমাকে হত্যাও করা হয়নি এবং তোমাকে গোলামও বানানো হয়নি। যেভাবে মুক্তিপণ আদায় করলে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে জিযিয়া আদায় করলেও হত্যার বিধান কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয়ত ইসলামি রাষ্ট্র আর একটি উপকার করে তা হলো, ঠিক মুসলমানদের ন্যায় তোমাদের জানমাল, ইজ্জত আবরুর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে জান মালের হেফাজত মুসলিম অমুসলিম সকলের ব্যাপারে সমভাবে করা হয়, এটি ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর ইসরামি রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রকে বলা হয় যার সংবিধান ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে তৈরি হয় যাতে ইসলামি আইন কানুন কার্যকর হয়। আর খেরাজ হলো সে কর যা অমুসলিম প্রজাদের জমিনের উপর ধার্য করা হয়।

قَوْلُهٗ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ : অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া বা অমুসলিম কর আদায় করে। আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَدٍ "আন্ ইয়াদীন" শব্দ দ্বারা আনুগত্য বুঝানো হয়েছে অথবা এর অর্থ হলো অমুসলিমরা এ জিযিয়া স্বহস্তে আদায় করবে অন্য কারো হাতে নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করেছেন। এজন্য জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে আদায়কারীর নিজের কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত করা বৈধ নয়। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় করা। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো নগদ আদায় করা, বাকি না রাখা। আর তাফসীরকারদের মধ্যে কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এর অর্থ হলো মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে জিযিয়া আদায় করা এই মর্মে যে, মুসলমানগণ তাকে হত্যা করেনি, কিছু অর্থ সম্পদ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

صٰغِرُوْنَ -এর অর্থ হলো অপমানিত এবং পরাজিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় করা। এজন্য তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে জিযিয়ার অর্থ গ্রহণ করবে সে উপবিষ্ট থাকবে, আর যে প্রদান করবে সে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান কার্যকর করাই তাদের জন্য অবমাননা।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আহলে কিতাবদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে, আরব হোক বা অনারব এবং অনারব মুশরিকদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হবে সে মূর্তিপূজক হোক বা অগ্নিপূজক। তবে মুরতাদ [ধর্মত্যাগী] লোকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না, এমনিভাবে কুরাইশের মুশরিকদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, জিযিয়া ধর্মের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে নয়। এজন্যে শুধু আহলে কিতাবদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে সে আরব হোক বা অনারব।

ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) 'আল উম্ম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমি জানি না অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে কি করবো? তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তাদের সাথে আহলে কিতাবদের ন্যায় ব্যবহার কর।"

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আমাকে সুফিয়ান সাঈদ ইবনে মরজবানের সূত্রে বলেছেন, ফারেয়া ইবনে নওফল এই মন্তব্য করেন যে, অগ্নিপূজকদের থেকে কোনো ভিত্তিতে জিযিয়া গ্রহণ কর, অথচ তারাতো আহলে কিতাব নয়, এ মন্তব্য শ্রবণ করে 'মোস্তাওরাদ' রাগান্বিত য়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি হযরত আবূ বকর (রা.), হযরতর ওমর (রা.) এবং আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি দোষারোপ করছ, তাঁরা অগ্নিপূজক থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। এরপর মোস্তাওরাদ খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হাজির হন এবং বলেন, আমি অগ্নিপূজকদের অবস্থা সর্বাধিক জানি; তাদের নিকট দীনি ইলম এবং কিতাব ছিল, যা তারা পাঠ করতো।

একবার তাদের বাদশাহ মাতাল অবস্থায় তার কন্যা বা মাতার সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়। তার এ ঘৃণ্য কাজ কেউ দেখে ফেলে। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন লোকেরা তাকে কিতাবে এই অন্যায়ের যে শাস্তি আছে তা দিতে চায়। তখন সে তার প্রজাসাধারণকে একত্র করে বলে, আদমের দীনের চেয়ে কোনো উত্তম দ্বীন হতে পারে কি? আদম তো নিজের পুত্রদের সঙ্গে তার কন্যাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। আমি আদমের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তোমাদেরও এ ধর্ম পরিত্যাগ করার কোনো কারণ নেই। এ কথা শ্রবণ করে লোকেরা তাদের বাদশাহর ধর্ম গ্রহণ করলো। আর যে বিরোধিতা করল তাকে হত্যা করল। এর পরিণাম স্বরূপ একই রাত্রে সমস্ত আলেমদের দিল থেকে ইলম বিদায় নিল।

এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অগ্নিপূজকরা আহলে কিতাব। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনা ইবনে জওযী তাঁর 'আত-তাহকীক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৩৭-৩৮]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে জিযিয়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। হুজুরে আকরাম ﷺ [ইয়েমেনের] নাজরানীদের থেকে দু' হাজার জোড়া কাপড় আদায়ের শর্তে মীমাংসা করেছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) সূত্রে লিখেছেন যে, হুজুর ﷺ নাজরানবাসী থেকে দু'হাজার জোড়া কাপড় আদায়ের শর্তে মীমাংসা করেছিলেন, যার অর্ধেক সফর মাসে, আর অবশিষ্ট অর্ধেক রজব মাসে আদায় করার কথা ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীকে একটি লিখিত দলিল দিয়েছিলেন, তাতে লিখা ছিল নাজরানবাসী দু'হাজার জোড়া পোশাক আদায় করবে।

অনুবাদ :

৩০. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ عِيْسٰى ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج لَا مُسْتَنَدَ لَهُمْ عَلَيْهِ بَلْ يُضَاهِئُوْنَ يُشَابِهُوْنَ بِهٖ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط مِنْ اٰبَائِهِمْ تَقْلِيْدًا لَهُمْ قَاتَلَهُمْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط اَنّٰى كَيْفَ يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيْلِ ـ

৩০. ইহুদিরা বলে ওজাইর আল্লাহর পুত্র আর খৃস্টানরা বলে মসীহ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। তা তাদের মুখের কথা। এই বিষয়ে তাদের কোনো সনদ নেই; বরং তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে পূর্বে যারা কুফরি করেছিল তাদের অনুকরণে তারা তাদের মতো তাদের কথার অনুরূপ কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন তাঁর রহমত হতে এদেরকে বিতাড়িত করুন কেমন করে তারা সত্য-বিমুখ হয়! অর্থাৎ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেমন করে তারা ন্যায় ও সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়! اَنّٰى -এটা এইস্থানে كَيْفَ [কেমন করে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩১. اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ عُلَمَاءَ الْيَهُوْدِ وَرُهْبَانَهُمْ عُبَّادَ النَّصٰرٰى اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَيْثُ اِتَّبَعُوْهُمْ فِىْ تَحْلِيْلِ مَا حُرِّمَ وَتَحْرِيْمِ مَا اُحِلَّ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اَىْ بِاَنْ يَّعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

৩১. তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সন্ন্যাসীগণকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাই তো তারা হারাম বস্তু হালাল করা এবং হালাল বস্তু হারাম করার কাজে তাদেরই অনুসরণ করে আর মারইয়াম-তনয় মসীহকেও। অথচ তাওরাত বা ইঞ্জীলে এক আল্লাহর ইবাদত করতেই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাদেরকৃত শরিক হতে তিনি কত ঊর্ধ্বে! তাঁর জন্যই তো সকল পবিত্রতা। اَحْبَارَهُمْ অর্থ– ইহুদিদের ধর্ম-পণ্ডিতগণ। رُهْبَانَ অর্থ– খ্রিস্টানদের সন্ন্যাসী, ইবাদতকারীগণ।

৩২. يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ شَرْعَهٗ وَبَرَاهِيْنَهٗ بِاَفْوَاهِهِمْ بِاَقْوَالِهِمْ فِيْهِ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ يُظْهِرَ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ذٰلِكَ ـ

৩২. তারা তাদের মুখ দ্বারা অর্থাৎ কথা দ্বারা আল্লাহর জ্যোতি অর্থাৎ তাঁর শরিয়ত ও প্রমাণাদি নির্বাপিত করতে চায়। আর আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত কিছু চান না যদিও কাফেরগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে।

৩৩. هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ مُحَمَّدًا بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ يُغْلِبَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ الْمُخَالِفَةِ لَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ذَالِكَ ـ

৩৩. অপর সমস্ত বিরুদ্ধে দীনের উপর প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ তাকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্যদীনসহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন। যদিও অংশীবাদীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

٣٤. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ يَاْخُذُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ كَالرُّشٰى فِى الْحُكْمِ وَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط دِيْنِهٖ وَالَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا اَىِ الْكُنُوْزَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ لَا يُؤَدُّوْنَ مِنْهَا حَقَّهُ مِنَ الزَّكٰوةِ وَالْخَيْرِ فَبَشِّرْهُمْ اَخْبِرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ .

৩৪. হে মুমিনগণ! ইহুদি পণ্ডিত ও খৃস্টান সন্ন্যাসীদের অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে গ্রহণ করে। যেমন– বিধান দানের বেলায় তাদের ঘুষ গ্রহণ এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর দীন হতে নিবৃত্ত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা অর্থাৎ উক্ত পুঞ্জীভূত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে না অর্থাৎ জাকাত ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মে ব্যয় করত তার হক আদায় করে না। তাদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তির সংবাদ দাও। اَلَّذِيْنَ –এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য।

٣٥. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى تُحْرَقُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط تُوَسَّعُ جُلُوْدُهُمْ حَتّٰى تُوْضَعَ عَلَيْهِ كُلُّهَا وَيُقَالُ لَهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ اَىْ جَزَاءَهُ .

৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে পুড়ানো হবে। তাদের চামড়া বহু বিস্তৃত করে দেওয়া হবে এবং সমস্ত পুঞ্জীভূত সম্পদ তাতে রাখা হবে। তাদেরকে বলা হবে এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং তোমর যা পুঞ্জীভূত করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর। তার প্রতিফল ভোগ কর।

٣٦. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ الْمُعْتَدِّ بِهَا لِلسَّنَةِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَىِ الشُّهُوْرِ . اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ مُحَرَّمَةٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُوا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَ رَجَبُ ذٰلِكَ اَىْ تَحْرِيْمُهَا الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا الْمُسْتَقِيْمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَىِ الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ اَنْفُسَكُمْ بِالْمَعَاصِىْ فَاِنَّهَا فِيْهَا اَعْظَمُ وِزْرًا وَ قِيْلَ فِى الْاَشْهُرِ كُلِّهَا .

৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুজে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় বৎসরে তার সংখ্যা বিরাট। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ। ঐগুলো হলো যিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। এটাই অর্থাৎ তার নিষিদ্ধ হওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় দীন, সুতরাং এটার মধ্যে অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহের মধ্যে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ সকল মাসের মধ্যে তোমরা পাপকার্য করে নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না। কেননা এই মাসের মধ্যে পাপকার্য আরো অধিক অন্যায়।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً اَىْ جَمِيْعًا فِىْ كُلِّ الشُّهُوْرِ كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ .

তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সমবেতভাবে সকল মাসেই যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। জেনে রাখ, আল্লাহ সাহায্য ও সহযোগিতাসহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। حُرُمٌ অর্থ- مُحَرَّمٌ তথা নিষিদ্ধ।

٣٧. اِنَّمَا النَّسِىْءُ اَىِ التَّاخِيْرُ لِحُرْمَةِ شَهْرٍ اِلٰى اٰخَرَ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ مِنْ تَاخِيْرِ حُرْمَةِ الْمُحَرَّمِ اِذَا اَهَلَّ وَهُمْ فِى الْقِتَالِ اِلٰى صَفَرٍ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ لِكُفْرِهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ فِيْهِ يُضَلُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ اَىِ النَّسِىْءَ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا يُوَافِقُوْا بِتَحْلِيْلِ شَهْرٍ وَتَحْرِيْمِ اٰخَرَ بَدَلَهُ عِدَّةَ عَدَدَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ مِنَ الْاَشْهُرِ فَلَا يَزِيْدُوْنَ عَلٰى تَحْرِيْمِ اَرْبَعَةٍ وَلَا يَنْقُصُوْنَ وَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلٰى اَعْيَانِهَا فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ اَعْمَالِهِمْ فَظَنُّوْهُ حَسَنًا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

৩৭. নিশ্চয় পিছিয়ে দেওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধকাল একমাস হতে অন্যমাসে পিছিয়ে নেওয়া যায়, যেমন, জাহেলীযুগে এমন ছিল যে, যুদ্ধরত অবস্থায় যদি মুহাররম মাস এসে পড়তো তবে ঐ বৎসরের জন্য মুহাররাম মাসের নিষিদ্ধতা সফর মাসে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, কুফরির অর্থাৎ এটা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের অবাধ্যতার মাত্রা বৃদ্ধি করা মাত্র যা দ্বারা কাফেররা বিভ্রান্ত করে। তারা তাকে পিছিয়ে দেওয়াকে يُضَلُّ -এর يَاء বর্ণটি পেশও যবর উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। কোনো বৎসর বৈধ করে এবং কোনো বৎসর অবৈধ করে যাতে অর্থাৎ একমাস বৈধ করতে তদস্থলে অন্য মাসকে অবৈধ করার মাধ্যমে তারা যে সমস্ত মাস আল্লাহ অবৈধ করেছেন তার গণনা অর্থাৎ সংখ্যার সাযুজ্য বিধান করতে পারে। অনুরূপ করতে পারে। তারা সংখ্যা হিসেবে চারমাস হতে অতিরিক্তও করতে না এবং তা হতে হ্রাসও করত না, বটে তবে নির্দিষ্ট মাসসমূহ বজায় রাখার প্রতি তারা দৃষ্টি দিত না। এবং যাতে তারা আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে ফলে এগুলোকেই তারা ভালো ধারণা করে। আল্লাহ সত্য-প্রত্যাখানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عُزَيْرٌ : একজন প্রসিদ্ধ ইসরাঈলী বুযুর্গের নাম। যার সম্পর্কে কতিপয় আরবের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আল্লাহর সন্তান। عُزَيْرٌ শব্দটিকে কেউ مُنْصَرِفٌ আবার কেউ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ পড়েছেন। তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। রুহুল মা'আনীতে রয়েছে اِخْتَلَفَ فِىْ عُزَيْرٍ هَلْ هُوَ نَبِىٌّ اَمْ لَا وَالْاَكْثَرُوْنَ عَلَى الثَّانِىْ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) اَلْاِتْقَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ -এর মধ্যে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.) লিখেছেন যে, عُزَيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَاهِنْ عِزْرَاء যিনি স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাওরাতকে পুনরায় জীবন দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ يُضَاهِئُوْنَ : এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর مُضَاهَاةٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ -এর جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো সাদৃশ্য সৃষ্টি করতেছে। ضَهْىٌ অর্থ- দৃষ্টান্ত, মতো, সদৃশ। ضَهْيًا মাসদার, বাবে سَمِعَ হতে জিনসে نَاقِص يَائِىْ অর্থ নারীর পুরুষের মতো হয়ে যাওয়া ঋতুস্রাব না হওয়া, স্তন ফুলে না উঠা এবং গর্ভধারণ না করা। ضَهْيَاءُ অর্থ- পুরুষরূপী নারী।

قَوْلُهُ يُؤْفَكُوْنَ : এটা বাবে ضَرَبَ -এর أَفْكٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ -এর جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থ– কোথায় ফিরে যাচ্ছে।

قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْبُدُوْنا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِيَعْبُدُوْا -এর মধ্যে لَامْ -টি بَاء -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেল যে, إِلَّا -এর সেলাহ لَامْ আসে না।

প্রশ্ন. أَنْ -কে কেন উহ্য মানা হলো?

উত্তর. যাতে হরফে জার প্রবেশ করা বৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ شَرْعَهُ : **প্রশ্ন.** نُوْر -এর তাফসীর শরিয়ত এবং بُرْهَانٌ দ্বারা করার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে?

উত্তর. এর দ্বারাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. হলো এই যে, نُوْر তো আল্লাহ তা'আলার ذَاتْ -এর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহলে সে ঐ নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিভাবে? অথচ সে জ্ঞান সম্পন্নদের অন্তর্গত।

উত্তর. এই যে, নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শরিয়ত।

قَوْلُهُ بِأَقْوَالِهِمْ فِيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে مَحَلّ বলে حَالْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা মুখ দ্বারা শরিয়তকে নির্বাপিত করার কোনো অর্থই হয় না। উদ্দেশ্য হলো أَقْوَالْ অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষণ করা ও অপবাদ আরোপ করা।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : ذَالِكَ এটা كَرِهَ -এর উহ্য মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ يَأْخُذُوْنَ : يَأْكُلُوْنَ -এর তাফসীর يَأْخُذُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাক্যের মধ্যে إِسْتِعَارَه রয়েছে। অর্থাৎ اَكْل দ্বারা اَخْذ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। مَقْصُوْد اَعْظَم হওয়ার কারণে اَكْل -এর নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيِ الْكُنُوْزُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يُنْفِقُوْنَهَا -এর যমীর كُنُوْز -এর দিকে ফিরেছে, যা يَكْنِزُوْنَ -এর দ্বারা বুঝা যায় এই সন্দেহ শেষ হয়ে গেল যে, পূর্বে ذَهَبْ -এবং فِضَّة দুটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে কাজেই يُنْفِقُوْنَهُمَا হওয়া উচিত ছিল।

قَوْلُهُ اَيْ لَا يُؤَدُّوْنَ مِنْهَا حَقَّهُ مِنَ الزَّكٰوةِ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর মধ্যে مُطْلَقًا আল্লাহর পথে ব্যয় না করার উপর ধমক রয়েছে। এতে إِنْفَاقْ -এর পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। বুঝা গেল যে, সমস্ত সম্পদ ব্যয় না করার প্রতি ধমক এসেছে। অথচ সকল মাল ব্যয় করা জরুরি নয়। এই প্রশ্নের জবাবের প্রতিই لَا يُؤَدُّوْنَ الخ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كُلّ বলে جُزْء উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ : অর্থাৎ إِنَّ النَّارَ تُوْقَدُ عَلَيْهَا وَهِيَ ذَاتُ حَمِيٍّ وَحَرٍّ شَدِيْدٍ وَلَوْ قَالَ يَوْمَ يُحْمٰى اَيِ الْكُنُوْزُ لَمْ يُعْطِ هٰذَا الْمَعْنٰى فَجُعِلَ الْاِحْمَاءُ لِلنَّارِ مُبَالَغَةً ثُمَّ حُذِفَ النَّارُ وَاُسْنِدَ الْفِعْلُ اِلَى الْجَارِ

قَوْلُهُ اَخْبِرْهُمْ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য যে, فَبَشِّرْهُمْ এটা মুবতাদার খবর হয়েছে। অথচ إِنْشَاء -এর খবর হওয়া ঠিক নয়।

জবাবের সারকথা হলো যেদিকে মুফাসসির (র.) وَاَخْبِرْهُمْ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা فَبَشِّرْهُمْ فِيْ حَقِّهِمْ -এর তাবীল -এর মধ্যে হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : জালালাইনের নোসখায় اَلْخَبَرُ লেখা রয়েছে যা মূলত অনুলেখকের ভ্রান্তি।

قَوْلُهُ تُكْوٰى : تُكْوٰى অর্থ– দাগ দেওয়া হবে। এটা বাবে ضَرَبَ -এর كَيٌّ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهُ اَيْ جَزَاؤُهُ : উহ্য مُضَافْ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَنْز এটা স্বাদ গ্রহণের বস্তু নয়। উদ্দেশ্য হলো-**ব্যয়** না করার শাস্তি ভোগ করা।

قَوْلُهُ لِلسَّنَةِ : অর্থাৎ اَلْمُعْتَدُّ بِهَا لِحِسَابِ السَّنَةِ এখানে মূলত اَلْحِسَابُ মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মাস ১২ টি। যার মাধ্যমে বছরের হিসাব হয়ে থাকে। চান্দ্র বছর ৩৫৫ দিনে হয়। আর সৌর বছর ৩৬৫ দিনে হয়। চান্দ্র বছর সৌর বছরের তুলনায় দশ দিন কম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مُحَرَّمَةٌ : প্রশ্ন : حُرُمٌ মাসদার কাজেই اَرْبَعَةٌ -এর উপর এর حَمْل বৈধ হবে না।

উত্তর. حُرُمٌ এটা مُحَرَّمَةٌ ইসমে মাফউলের অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهُ اَلنَّسِيْئُ : এটা نَسْأٌ -এর মাসদার অর্থ– পিছনে ফেলা, হটিয়ে দেওয়া, বলা হয়– نَسَأَهُ نَسْأً وَنَسِيْئًا وَنَسَاءً অর্থাৎ তাকে পেছনে করল। যেমন বলা হয়– مَسَّهُ مَسًّا وَمِسَاسًا وَمَسِيْسًا অর্থাৎ স্পর্শ করা। কেউ কেউ نَسِيْئٌ যা مَنْسَوَاءٌ অর্থে এটা فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى مَفْعُوْلٍ ওজনে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের মন্দ আচরণের বিবরণ ছিল, আর আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের বাতিল আকিদা এবং পথভ্রষ্টতা ও শিরকি কীর্তিকলাপের বর্ণনা রয়েছে। আর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুশরিকদের ন্যায় আহলে কিতাবরাও পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত, আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ।

পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "আহলে কিতাবরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না" আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না এবং সত্য দীন গ্রহণ করে না। এ কথাগুলোর কিছু বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য আয়াতসমূহে রয়েছে।

সর্ব প্রথম ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করতো। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ বাতিল আকিদায় সকল ইহুদি বিশ্বাসী ছিল না; বরং তাদের মধ্যে কিছুলোক এ কথায় বিশ্বাস করতো। যেমন– মদিনা শরীফের ইহুদি বনূ কুরায়জা এবং সিরিয়ার কিছু ইহুদিও এ কথা বলতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, সাল্লাম ইবনে মাসকাম, নোমান ইবনে আওফা এবং আবূ উনস এবং শাস ইবনে কায়েশ হুজুর আকরাম ﷺ -এর নিকট এসে বলেছিল– كَيْفَ نَتَّبِعُكَ অর্থাৎ আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করবো, অথচ আপনি আমাদের কেবলা [বায়তুল মোকাদ্দাস] -কে পরিত্যাগ করেছেন এবং আপনি ওযায়েরকে আল্লাহর সূত্র বলে মনে করেন না। এর দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, হুজুর ﷺ -এর যুগে যারা মদিনা শরীফে বাস করতো তাদের মধ্যেও কিছু লোক এই বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী ছিল যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র। [নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক] ইবনে জওযী (র.) লিখেছেন, হুজুর ﷺ -এর যুগে একদল লোক বর্তমান ছিল যারা এমন অন্যায় কথা বিশ্বাস করতো।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ৩১১-১২, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ.-৩৩]

এজন্যই যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন কোনো ইহুদি এর প্রতিবাদ করেনি। ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন, ইহুদিদের একটি ফেরকা হযরত ওযায়ের (আ.) সম্পর্কে এ আপত্তিকর কথায় বিশ্বাস করতো।

–[আকামুল কুরআন: ইমাম জাসসাস (র.) খ. ৩, পৃ. ১০৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই অভিমতই বর্ণিত আছে। ইহুদি ও নাসারারা শুধু যে হযরত ওযায়ের (আ.) এবং হযরত মসীহ (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বানাবার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তাই নয়; বরং তাদের ধর্মযাজক এবং সাধুদেরকেও এই মর্যাদায় আসীন করেছে, এই মর্মে যে, তাদের ধর্মযাজকরা যে আদেশ দিত সে আদেশকে তারা আল্লাহ পাকের আদেশের সমান মর্যাদা দিত। আর তাদের জারি-করা বিধি-নিষেধকে আল্লাহর বিধি-নিষেধের স্থলাভিষিক্ত মনে করতো। ধর্মযাজকরা যা বলতো তাই তারা মানতো, আর যা নিষেধ করতো তা থেকে বিরত থাকতো।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অমার্জনীয় অপরাধের যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো তারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি, আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করেছে।

দ্বিতীয় অপরাধ হলো, ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে এবং নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করেছে। আর তৃতীয় অপরাধ হলো তারা তাদের ধর্মযাজকদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী করেছে। আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে তার স্থলে তাদের ইচ্ছানুযায়ী শরিয়ত তৈরি করার অধিকার দিয়েছে তাদের ধর্মযাজকদেরকে, অথচ তাদের প্রতি আদেশ হয়েছে যে, তারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ : হযরত ওযায়ের (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের বাতিল আকিদার ইতিহাস : আল্লামা বগভী আতিয়া উফির সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদিদের মধ্যে হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বানাবার যে বাতিল আকিদা প্রচলিত হয়েছে তা এভাবে শুরু হয় যখন হযরত ওযায়ের (আ.) বর্তমান ছিলেন এবং তাওরাতও ছিল, আর ইহুদিদের নিকট তাবুতও ছিল তখন ইহুদিরা তাওরাতের উপর আমল করা বর্জন করলো। তারা এবং তাওরাত হারিয়ে ফেলল। পরিণামে আল্লাহ পাক তাওরাতকে সরিয়ে দিলেন এবং তাবুতকে উঠিয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওযায়ের (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাওরাত তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিলেন অর্থাৎ ভুলে যাওয়া তাওরাত তিনি আবার স্মরণ করতে পারলেন। এরপর তিনি বনী ইসরাইলকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে তাওরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। চতুর্দিক থেকে লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাওরাত পাঠ করতে লাগলো। এরপর অনেক সময় অতিবাহিত হলো। তখন আল্লাহ পাক তাবুত ফেরত দিলেন। তাবুতের মধ্যে তাওরাত বন্ধ ছিল। হযরত ওযায়ের (আ.) যে তাওরাতের শিক্ষা দিয়েছেন তার সঙ্গে তাবুতে যে তাওরাত এসেছে তাকে মিলিয়ে দেখলেন যে, একই তাওরাত। তখন লোকেরা বলতে লাগলো ওযায়েরকে যে দ্বিতীয়বার তাওরাত দেওয়া হয়েছে তার কারণ হলো ওযায়ের হলেন আল্লাহর পুত্র। [নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক]

এ পর্যায়ে কালবী (র.) উল্লেখ করেছেন, বখত নসর যখন বনী ইসরাঈলদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল তখন সে এমন সব লোকদেরকে হত্যা করল যারা তাওরাত পাঠ করতো। হযরত ওযায়ের (আ.) সে সময় শিশু ছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করলো না না। ৭০ বা ১০০ বছর পর বনী ইসরাঈল যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে পুনরায় আসলো তখন তাওরাত কারোই স্মরণ ছিল না। আল্লাহ পাক হযরত ওযায়ের (আ.)-কে প্রেরণ করলেন যেন তিনি বনী ইসরাঈলকে নতুন করে তাওরাতের শিক্ষা দেন। তিনিই যে ওযায়ের (আ.) এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি লোকদেরকে তাওরাত শুনিয়ে দেন। কেননা ১০০ বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর আল্লাহ পাক তাঁকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একজন ফেরেশতা একটি পাত্রে পানি এনে হযরত ওযায়ের (আ.)-কে পান করালেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অন্তরে তাওরাত স্থান পেল। এরপর হযরত ওযায়ের (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট এসে বললেন, আমি ওযায়ের লোকেরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করলো এবং বলল তুমি যদি সত্য নবী হও তবে আমাদেরকে তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দাও। হযরত ওযায়ের (আ.) তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দিলেন।

এর কিছুদিন পর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাকে আমার পিতা আমার পিতামহের কথা বলেছেন যে, তাওরাতকে একটি বড় পাত্রের ভেতরে রেখে আঙ্গুর বৃক্ষের গোড়ায় দাফন করা হয় যেন বখত নসরের আক্রমণের সময় তাওরাতের একটি কপি সংরক্ষিত থাকে। এ ব্যক্তির সংবাদের ভিত্তিতে লোকেরা নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে সেখান থেকে তাওরাত বের করে আনলো। তখন হযরত ওযায়ের (আ.)-এর লিপিবদ্ধ কপি প্রাচীন কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল যে, একটি অক্ষরেরও পার্থক্য নেই। তখন লোকেরা আশ্চর্যন্বিত হলো যে, একই ব্যক্তির অন্তরে পূর্ণ তাওরাত আল্লাহ পাক অবতরণ করেছেন! তারা বলতে লাগল, এর একমাত্র কারণ হলো এই ব্যক্তি আল্লাহর পুত্র। তখন থেকেই ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলতে থাকে। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন খ. ৩ পৃ. ৫৩]

قَوْلُهُ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ : হযরত ঈসা (আ.)-কে পুত্র বানাবার বাতিল আকিদা যেভাবে প্রচলি হলো : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলনের পর ৮১ বছর পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা সঠিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে লড়াই [illegible] হলো, ইহুদিদের মধ্যে পুলুস নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীদের এক দলকে হত্যা করে। [illegible] নাসারাদের অত্যন্ত জঘন্য শত্রু ছিল। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে সে একটি ষড়যন্ত্র করল।

একদিন সে ইহুদিদেরকে বলল, যদি হযরত ঈসা (আ.) সত্য নবী হন তবে আমাদের কাফের এবং দোজখী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না, আর যদি নাসারারা জান্নাতে যায় আমরা দোজখে গমন করি তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি চাই এমন কোনো ষড়যন্ত্র করি যার দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং আমাদের সঙ্গে তারাও দোজখে যায়। এরপর সে তার সে অশ্বটির উপর আরোহণ করে, যার উপর আরোহী হয়ে সে যুদ্ধ করতো, সে তার মাথার উপর মাটি রাখে এবং অত্যন্ত লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবার কথা প্রকাশ করে, ক্রন্দনরত অবস্থায় নাসারাদের মজলিসে উপস্থিত হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমাদের শত্রু পুলুস। আমি আসমান থেকে এ বাণী পেয়েছি যে, যে পর্যন্ত তুমি নাসারা না হবে, সে পর্যন্ত তোমার তওবা কবুল হবে না। তাই আমি ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করে তোমাদের নিকট চলে এসেছি। তারা তাকে গির্জায় নিয়ে নাসারা বানিয়ে নেয় এবং একটি কক্ষে থাকতে দেয়। এক বছর সে ঐ কক্ষে অতিবাহিত করে এবং ইঞ্জীল গ্রন্থের শিক্ষা লাভ করে। এক বছর পর সে বলে, আসমান থেকে আমি এ বাণী পেয়েছি যে, আল্লাহ পাক আমার তওবা কবুল করেছেন।

নাসারারা তার এ কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের অন্তরে তার জন্য অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বত সৃষ্টি হয়। তারা তাকে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতে থাকে। তখন সে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে। সেখানে সে গোপনে তিনটি লোককে নির্বাচন করে, যারা তার শিক্ষার প্রচার কাজ করবে। এ তিন ব্যক্তির নাম ছিল নাস্তুর, ইয়াকুব, মালাকান। নাসতুরকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসা, মারইয়াম এবং খোদা এভাবে তিন খোদা [নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক] আর ইয়াকুবকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসা মূলত মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর পুত্র। [নাউজুবিল্লাহ] আর মালাকানকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসাই তো প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। [নাউযুবিল্লাহ] এরপর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে ডেকে বলে, তুমি আমার বিশেষ বন্ধু ও দূত। তুমি অমুক দেশে যাও এবং মানুষকে এ শিক্ষা দান কর। আর ইঞ্জীল কিতাবের দিকে মানুষকে ডাকো। সে বলে, আমি ঈসা (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। এরপর সে বলল, আমি ঈসার নামে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করবো। এ কথা বলে সে আত্মহত্যা করে এবং তার তিন শিষ্য তিন দেশে চলে যায়। একজন রোমে একজন বায়তুল মুকাদ্দাসে, আর একজন অন্যত্র। আর তারা প্রত্যেকে সে বাতিল আকিদা প্রচার করতে থাকে, যা পুলুস তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এভাবে নাসারাদের মধ্যে তিনটি ফেরকার সৃষ্টি হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৫৬-২৫৭, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩১৪-১৫]

قَوْلُهُ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ الخ : উপরিউক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম ও পীর-পুরোহিতদের কুফরি উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। اَحْبَارٌ শব্দটি حِبْرٌ -এর এবং رُهْبَانٌ শব্দটি رَاهِبٌ -এর বহুবচন। حِبْرٌ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আলেমকে এবং رَاهِبٌ তাদের সংসার -বিরাগীদেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণিকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম ও যাজক শ্রেণিকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হলো, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণির জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণির আনুগত্য করে চলে তা আল্লাহ রাসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলা বাহুল্য, পীর পুরোহিতগণের আল্লাহ- রাসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, শরিয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এদের অনুসরণ হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-রাসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হলো, ইমাম ও আলেমরা আল্লাহ-রাসূলের আদেশ নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের অনুকরণ করেন। এই অনুকরণ হলো কুরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহরই অনুকরণ। কুরআনে ইরশাদ হয়- فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, "এরাই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বটে; কিন্তু আল্লাহর আদেশ হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত করার এবং তিনি তাদের শিরকী কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র"।

ইহুদি খৃস্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটির শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং আল্লাহর সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্য অসম্ভব; বরং আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দীনে ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর তৃতীয় আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কুরআন এবং সত্য দীন-ইসলাম সহকারে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরো কতিপয় আয়াত কুরআনে রয়েছে যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দীনের উপর দীনে ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিক্দাদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "এমন কোনো কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

রাসূলে কারীম ﷺ ও সলফে সালেহীনের পবিত্র যুগে আল্লাহর নূরের পূর্ণ বিকাশের দৃশ্য গোটা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও দীন ইসলাম দলিল-প্রমাণ ও মৌলকতার দিক দিয়ে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যার খুঁত ধরার সুযোগ কোনো বিবেকবান মানুষের হবে না। তাই কাফেরদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দীন দলিল-প্রমাণে চির ভাস্বর। এ জন্য মুসলমানরা যতদিন ইসলামের পূর্ণ অনুগত থাকবে, ততদিন তাদের শৌর্য বীর্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাই। মুসলমানরা যতদিন কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুগত ছিল, ততদিন পাহাড় কি সমুদ্র কোনটাই তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এভাবে গোটা দুনিয়ার কর্তৃত্ব একদিন তাদের হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু যেখানে মুসলমানরা পরাভূত ও হীনবল হয়ে পড়েছিল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেই বিপর্যয়ের মূলে ছিল কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ এবং তৎপ্রতি অবহেলা। কিন্তু এ দুর্গতি মুসলমানদের, ইসলামের নয়। ইসলাম আপন জ্যোতিতে সদা ভাস্বর।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদি-খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদি-খৃস্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মতো না হয়। আয়াতে ইহুদি খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতদের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতের যেখানে এ অবস্থা সেখানে সাধারণত সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তা না করে كَثِيرًا [অধিকাংশ] শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদের এ কথা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনোরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হলো, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হলো যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকি থাকে না। তাছাড়া পীর-পুরোহিতদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এ জন্য আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন!"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে মালামালের জাকাত দেওয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" -[আবূ দাউদ, আহমদ] এ থেকে বোঝা যায় যে, জাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গুনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম এ মতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا ["আর তা খরচ করে না"] বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হলো বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে জাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাব মতে জাকাত প্রদান করবে। শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনের উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ যে অর্থসম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার জাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আজাবের রূপ ধারণ করে। এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার কথা উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা জাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আজাব দানের উল্লেখ করা হয়।

قَوْلُهُ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের কুফর ও শিরক এবং গোমরাহী ও অপকর্মসমূহের বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয় এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়, জাহেলী যুগের এক কুপ্রথার বর্ণনা এবং এর থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুসলমানদের তাগিদ দেওয়া হয়। যার বিবরণ হলো এই যে, প্রাচীনকাল থেকে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরিয়তসমূহে বার চান্দ্রমাসকে এক বছর গণনা করা হতো এবং তন্মধ্যে চারটি মাস জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম ও রজব মাসকে বড়ই বরকতময় ও সম্মানিত মনে করা হতো।

সকল নবীর শরিয়ত এ ব্যাপারে একমত যে, এ চার মাসে যে কোনো ইবাদতের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তেমনি এ সময়ে পাপাচার করলে তার পরিণাম এবং আজাবও কঠোরভাবে ভোগ করতে হবে। পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে এ চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহও নিষিদ্ধ ছিল। মক্কার অধিবাসী আরবগণ ছিল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নবুয়তের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর শরিয়ত অনুসরণের দাবিদার। বলা বাহুল্য, ইব্রাহীমী শরিয়ত মতেও এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনকি জন্তু শিকারও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাহেলী আরববাসীদের স্বভাবে পরিণত হওয়ার উপরিউক্ত হুকুম তামিল করা ছিল তাদের জন্য বড়ই দুষ্কর। তাই তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা টালবাহানার আশ্রয় নিত। কখনো এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মনস্থ করলে, কিংবা যুদ্ধের সিলসিলা নিষিদ্ধ মাসেও প্রসারিত হলে তারা বলত, বর্তমান বছরে এ মাস নিষিদ্ধ নয়, আগামী মাস থেকেই নিষিদ্ধ মাসের শুরু। যেমন, যুদ্ধ চলাকালে মুহররম মাস এসে পড়লে বলত, এ বছরের মুহররম নিষিদ্ধ মাস নয়, বরং তা হবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাস। অথবা বলত, এ বছরের প্রথম মাস হলো সফর, মুহররম হবে দ্বিতীয় মাস। সারকথা, আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধে বছরের যে কোনো চার মাসকে তাদের সুবিধা মতো নিষিদ্ধরূপে গণ্য করে নিত। যে মাসকে ইচ্ছা, যিলহজ বা রমজান নামে অভিহিত করত। এমন কি অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে দশটি মাস অতিবাহিত হলে বর্ষপূর্তির জন্য আরো কয়টি মাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত, এ বছরটি হবে চৌদ্দ মাস সম্বলিত। অতঃপর অতিরিক্ত চার মাসকে সে বছরের নিষিদ্ধ মাসরূপে গণ্য করত।

সারকথা, দীনে ইবরাহীমীর প্রতি তাদের এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, বছরের চারটি মাসের হুরমত অনুধাবন করে তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মাসের যে ধারাবাহিকতা নির্ধারিত রেখেছেন এবং সে মতে যে চার

মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে নানা হেরফের করে তারা নিজেদের স্বার্থ পূরণ করে নিত। ফলে সে সময় কোন মাস প্রকৃত রমজান বা শাওয়ালের এবং এবং কোন মাস জিলকদ বা রজবের তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয় পড়েছিল। অষ্টম হিজরি সালে যখন মক্কা বিজিত হয় এবং নবম সালে রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজের মৌসুমে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার জন্য প্রেরণ করছিলেন, সে মাসটি প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ছিল জিলহজের; কিন্তু জাহেলী যুগের সেই পুরাতন প্রথানুসারে তা জিলকদই সাব্যস্ত হলো এবং সে বছরের হজের মাস ছিল জিল হজের স্থলে জিলকদ। অতঃপর দশম হিজরি সালে যখন নবী করীম ﷺ বিদায় হজের জন্য মক্কায় আগমন করেন, তখন অবলীলাক্রমে এমন ব্যবস্থাও হয়ে যায় যে, প্রকৃত জিলহজ জাহেলী হিসাব মতেও জিলহজেই সাব্যস্ত নয়। সেজন্য রাসূলে কারীম ﷺ মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় ইরশাদ করেছিলেন– أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ অর্থাৎ "কালের চক্র ঘুরে ফিরে সেই নিয়মের উপর এসে গেল, যার উপর আল্লাহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টি করেছিলেন।" অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে মাসটি জিলহজ, তা জাহেলী প্রধানুসারেও জিলহজই সাব্যস্ত হলো।

জাহেলী প্রথায় মাস গণনার এই রদবদল ও বিনিময়, তার ফলে কোনো মাস বা দিন বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত ও শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালনেও বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হতো। যেমন, জিলহজের প্রথম দশকে রয়েছে হজের আহকাম, দশই মুহররমের রোজা এবং বছরের শেষে জাকাত আদায়ের হুকুম প্রভৃতি।

মাসের নাম পরিবর্তন ও অদল-বদলে যথা– মুহরমের সফরও সফরের মুহররম নামকরণ প্রভৃতি বাহ্যত বড় কিছু নয়; কিন্তু এর ফলে শরিয়তের অসংখ্য হুকুমের বিকৃতি ঘটে আমল যে নষ্ট হয়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আলোচ্য প্রথম দু'আয়াতে সেই জাহেলী প্রথার মন্দ দিকের উল্লেখ করে তৎপ্রতি মুসলমানদেরকে সাবধানতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মাস-গণনার ক্ষেত্রে মাস হলো বারটি।" এখানে উল্লিখিত عِدَّتٌ অর্থ– গণনা। شُهُوْرٌ হলো شَهْرٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ মাস। বাক্যের সারমর্ম হলো আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশি কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর كِتَابِ اللّٰهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আজল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আজলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ হয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে। তারপর বলা হয়– مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ তন্মধ্যে চার মাস হলো নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হলো, এই চারটি মাস সম্মানিত, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে ইবাদতের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা' ইসলামি শরিয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বহাল রয়েছে।

বিদায় হজের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় নবী করীম ﷺ সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, "তিনটি মাস হলো যথাক্রমে জিলকদ, জিলহজ ও মুহররম, অপরটি হলো রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে, রজব হলো রমজান । আর মুযার গোত্রের ধারণা মতে রজব হলো জমাদিউসসানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই রাসূলে কারীম ﷺ খুতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ : "এটিই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ এবং সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হলো দীনে মুস্তাকীম। এতে কোনো মানুষের কম বেশি কিংবা পরিবর্তন পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

قَوْلُهُ فَلَا تَظْلِمُوْنَ فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ : "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" **অর্থাৎ** এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং ইবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, কুরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে ইবাদত করা হলে বাকি মাসগুলোতেও ইবাদতের তাওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ

কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকি মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

এ পর্যন্ত ছিল জাহেলী প্রথার বর্ণনা ও তার নিন্দাবাদ। আয়াতের শেষ বাক্যে সূরা তওবার শুরুতে প্রদত্ত আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয় অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত কাফের ও মুশরিকের সাথে জিহাদ করাই ওয়াজিব। দ্বিতীয় আয়াতেও সেই জাহেলী প্রথার উল্লেখ করা হয় নিম্নরূপে– إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ। নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরির মাত্রাকেই বৃদ্ধি করে। نَسِيءٌ অর্থ– পিছিয়ে দেওয়া এবং পরে আনা।

মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মাসের এই ওলট-পালট করার ফলে একদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহর হুকুমেরও তা'মিল হবে। কিন্তু আল্লাহ বলেন যে, এর ফলে তাদের কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তাদের গোমরাহী উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে অর্থাৎ কোন বছরে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হারাম করে এবং আর কোনো বছরে হালাল করে। لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ "যাতে শুমার পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলো" বাক্যের মর্ম হলো শুধু গণনা পূরণ দ্বারা হুকুমের তামিল হয় না; বরং যে হুকুম যে মাসের সাথে নির্দিষ্ট, তা সে মাসেই করতে হবে।

আহকাম ও মাসায়েল : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামি শরিয়তে প্রচলিত তা মানবরচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরিয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাব মতেই রোজা, হজ ও জাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কুরআন মাজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে– لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ [যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর]। অতএব চন্দ্র ও সূর্য এই দুয়ের মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরিয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরজে কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গুনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে তা আল্লাহ ও পরবর্তীদের তরিকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও নাজায়েজ মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরিয়তের বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু কোনো হুকুম পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুবাদ :

৩৮. وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ إِلٰى غَزْوَةِ تَبُوْكٍ وَكَانُوْا فِيْ عُسْرَةٍ وَشِدَّةِ حَرٍّ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الْمُثَلَّثَةِ وَاجْتِلَابِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ أَيْ تَبَاطَئْتُمْ وَمِلْتُمْ عَنِ الْجِهَادِ إِلَى الْأَرْضِ ط وَالْقُعُوْدِ فِيْهَا وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيْخِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا مِنَ الْاٰخِرَةِ أَيْ بَدَلَ نَعِيْمِهَا فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِيْ جَنْبِ مَتَاعِ الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ حَقِيْرٌ ـ

৩৮. তাবুক যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ খুবই কষ্ট ও অনটনে ছিলেন। তদুপরি গরমও ছিল মারাত্মক। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ যুদ্ধের আহ্বান জানালে তাদের নিকট তা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মুমিনগণ! তোমাদের হলো কি যে তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা মাটিতে চেপে থাক। অর্থাৎ ঘরে বসে থাক জিহাদ হতে বিমুখ হয়ে গড়িমসি কর। তোমরা কি পরকালের তুলনায় অর্থাৎ তাঁর নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে পার্থিব জীবন ও এটার ভোগ বিলাস নিয়েই পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? পরকালের ভোগ-উপকরণের তুলনায় পার্থিব জীবনের সম্পদ তো খুবই সামান্য, অতি তুচ্ছ। اِثَّاقَلْتُمْ-এতে ث -এ ت -এর اِدْغَام বা সন্ধি সংঘটিত হয়েছে এবং এটার পূর্বে একটি হাম্‌যা ওসল [অর্থাৎ এমন হামযা যা মিলিয়ে পড়াকালে উহ্য থাকে] আনা হয়েছে। مَا لَكُمْ -এইস্থানে প্রশ্নবোধক রূপটি تَوْبِيْخ অর্থাৎ ভর্ৎসনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৯. إِلَّا بِإِدْغَامِ نُوْنِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ لَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَنْفِرُوْا تَخْرُجُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجِهَادِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا مُؤْلِمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ أَيْ يَأْتِ بِهِمْ بَدَلَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ أَيِ اللّٰهَ أَوِ النَّبِيَّ شَيْئًا ط بِتَرْكِ نَصْرِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ نَاصِرُ دِيْنِهِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ نَصْرُ دِيْنِهِ وَنَبِيِّهِ ـ

৩৯. যদি তোমরা اِلَّا -এটা মূলত ছিল اِنْ لَا উভয় স্থানে [অর্থাৎ এই খানে এবং পরবর্তী আয়াতে] শর্তবাচক শব্দ اِنْ -এর ن টিকে لَا -এ اِدْغَام অর্থাৎ সন্ধিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্যদের নিয়ে আসবেন। আর তোমরা সাহায্য-সহযোগিতা পরিত্যাগ করত তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর বা রাসূল ﷺ -এর কোনো রূপ ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তাঁর দীনের সাহায্যকারী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান তাঁর দীন ও নবীকে সাহায্য করাও তাঁর শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

৪০. إِلَّا تَنْصُرُوْهُ أَيِ النَّبِيَّ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ حِيْنَ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَكَّةَ أَيْ أَلْجَؤُوْهُ إِلَى الْخُرُوْجِ لَمَّا أَرَادُوْا قَتْلَهُ أَوْ حَبْسَهُ أَوْ نَفْيَهُ بِدَارِ النَّدْوَةِ ـ

৪০ যদি তোমরা তাকে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -কে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তখন, যখন কাফেররা তাকে মক্কা হতে বহিষ্কার করেছিলেন অর্থাৎ তাদের পরামর্শভবন 'দারুন নাদওয়া'য় বসে তারা রাসূল ﷺ -কে নির্বাসন বা বন্দী বা হত্যা করার সংকল্প করত মক্কা হতে বের হয়ে যেতে যখন তাঁকে বাধ্য করেছিল।

ثَانِيَ اثْنَيْنِ حَالٌ اَىْ اَحَدُ اثْنَيْنِ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ بَكْرٍ رض اَلْمَعْنٰى نَصَرَهُ فِىْ مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَخْذُلُهُ فِىْ غَيْرِهَا اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ هُمَا فِى الْغَارِ نَقْبٌ فِىْ جَبَلِ ثَوْرٍ اِذْ بَدَلٌ ثَانٍ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ اَبِىْ بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ لَمَّا رَاٰى اِقْدَامَ الْمُشْرِكِيْنَ لَوْ نَظَرَ اَحَدُهُمْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج بِنَصْرِهٖ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ طَمَانِيْنَتَهُ عَلَيْهِ قِيْلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقِيْلَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رض وَاَيَّدَهُ اَىِ النَّبِىَّ ﷺ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا مَلٰئِكَةٌ فِى الْغَارِ وَمَوَاطِنَ قِتَالِهٖ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَىْ دَعْوَةَ الشِّرْكِ السُّفْلٰى ط الْمَغْلُوْبَةَ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ اَىْ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ هِىَ الْعُلْيَا ط الظَّاهِرَةُ الْغَالِبَةُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ فِىْ مُلْكِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ ـ

এবং তারা যখন ছওর পাহাড়ের একটি গুহায় ছিল। তখন তিনি ছিলেন দুইজনের একজন। ثَانِيَ اثْنَيْنِ -এটা حَالٌ অর্থাৎ ভাব বা অবস্থাবাচক পদ। অপর জন ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। এই বক্তব্যটির মর্ম হলো, এরূপ কঠিন অবস্থায়ও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তিনি তাঁকে অপর কোনো অবস্থায়ও লাঞ্ছিত হতে দিবেন না। তিনি তখন তার সঙ্গী হযরত আবূ বকরকে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়ো না আল্লাহ তাঁর সাহায্যসহ আমাদের সঙ্গে আছেন। اِذْ هُمَا -এটা পূর্বোল্লিখিত اِذْ -এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। اِذْ يَقُوْلُ -এটা بَدَلٌ ثَانِىْ বা দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত পদ। হযরত আবূ বকর গুহা হতে তাঁদের সন্ধানরত মুশরিকদের পা দেখতে পেয়ে তাঁকে বলেছিলেন, এদের কেউ যদি পায়ের নীচে তাকায় তবে নিঃসন্দেহে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এই সময় রাসূল ﷺ উক্ত উক্তি করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাসূল ﷺ -এর উপর, কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো হযরত আবূ বকরের উপর সকীনা তৎপ্রদত্ত প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -কে উক্ত গুহায় এবং অন্যান্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন এক বাহিনীর দ্বারা শক্তিশালী করেন যা তোমরা দেখনি অর্থাৎ ফেরেশতাগণের সাহায্যে তাকে তিনি শক্তিশালী করেন। তিনি কাফেরদের কথাকে অর্থাৎ তাদের শিরকের দাবিকে হেয় করেন পরাজিত করেন আর আল্লাহর কালেমা একত্বের কালেমাই সর্বোপরি তাই সকলের উচ্চ এবং সকল কিছুরই উপর জয়ী। এবং আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী তিনি তাঁর কাজে প্রজ্ঞাধিকারী।

٤١. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ وَقِيْلَ اَقْوِيَاءَ وَضُعَفَاءَ اَوْ اَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ وَهِىَ مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَةِ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ الخ وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ فَلَا تَثَاقَلُوْا ـ

৪১. তোমরা লঘুভার হও বা গুরুভার অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত থাক বা না থাক; কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হলো দুর্বল হও বা সবল; অথবা এর অর্থ হলো, ধনী হও বা নির্ধন- সর্বাবস্থায়ই অভিযানে বের হয়ে পড়। لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ। [অর্থাৎ যারা দুর্বল তাদের জন্য কোনো দোষ নেই] আয়াতটির মর্মানুসারে উক্ত আয়াতটির এই বিধান مَنْسُوْخٌ বা রহিত বলে বিবেচ্য। আর তোমরা জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে যে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তবে তোমরা গড়িমসি করতে না।

٤٢. وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا لَوْ كَانَ مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ عَرَضًا مَتَاعًا مِنَ الدُّنْيَا قَرِيبًا سَهْلَ الْمَاخَذِ وَسَفَرًا قَاصِدًا وَسَطًا لَّا تَّبَعُوكَ طَلَبًا لِلْغَنِيمَةِ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط الْمَسَافَةُ فَتَخَلَّفُوا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرُوجَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ ذٰلِكَ.

৪২. যে সমস্ত মুনাফিক যুদ্ধে শরিক না হয়ে পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– আশু অর্থাৎ সহজলভ্য জাগতিক কোনো সম্পদ অর্থাৎ উপভোগ্য বস্তু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ মধ্যম ধরনের হলে অর্থাৎ তুমি যে দিকে তাদেরকে আহবান জানাও তা যদি উক্তরূপ হতো, তবে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের আশায় নিশ্চয় তারা তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ অর্থাৎ তার দূরত্ব সুদীর্ঘ মনে হলো। ফলে তারা পিছনে পড়ে থাকল। যখন তুমি প্রত্যাবর্তন করবে তখন অচিরেই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, বের হওয়ার আমাদের সামর্থ্য থাকলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে বের হতাম। মিথ্যা শপথ করত এরা নিজদেরকে ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ জানেন নিশ্চয় এরা এদের এই কথায় মিথ্যাবাদী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الْمُثَلَّثَةِ : প্রকৃত পক্ষে ইদগামের উদ্দেশ্যে হলো تَعْلِيل -এর পূর্বে ثَاء -কে ثَاء করেছে এবং تَاء কে ثَاء -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে এবং শুরুতে সাকিন আসার কারণে প্রথমে একটি هَمْزَهٔ وَصْل যুক্ত করা হয়েছে। اِثَّاقَلْتُمْ মূলত ছিল تَثَاقَلْتُمْ ; উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِثَّاقَلْتُمْ -এর মধ্যে ثَاء -এর তাশদীদ এবং শুরুতে হামযা নেওয়ার কারণ বর্ণনা করা, যদিও এটা বাবে تَفَاعُلْ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ تَبَاطَئْتُمْ : এটা بُطُوْءٌ হতে নিষ্পন্ন। অর্থ- অলসতা করা এটা شِرْعَة -এর বিপরীত।

প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) اِثَّاقَلْتُمْ -এর তাফসীর مِلْتُمْ দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর. যেহেতু تَثَاقَلْ -এর সেলাহ إِلٰى আসে না এজন্যই মুফাসসির (র.) مِلْتُمْ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَثَاقُلْ -টা مَيْل -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْقُعُوْدِ فِيْهَا : প্রশ্ন. اَلْقُعُوْدِ فِيْهَا -এর বৃদ্ধিকরণের উপকারিতা কি?

উত্তর : এই বৃদ্ধিকরণের উপকারিতা হলো এই যে, যদি জিহাদের অংশগ্রহণ করত তবুও জমিনের উপরই হতো। জিহাদে অংশগ্রহণ না করার সুরতে জমিনের উপর থাকার অর্থ হলো–

মুফাসসির (র.) اَلْقُعُوْدِ فِيْهَا -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ -এর অর্থ হলো ভীরুতা দেখানো।

قَوْلُهُ اَىْ بَدَلَ نَعِيْمِهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, مِنَ الْاٰخِرَةِ -এর মধ্যে مِنْ -টি مُقَابَلَه - এর জন্য اِبْتِدَائِيَّة নয়। কাজেই এই আপত্তির অবসান হলো যে, আখিরাত দ্বারা পার্থিব জিন্দেগি শুরু করার কোনো অর্থ হয় না। نَعِيْمِهَا -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مُطْلَقًا আখিরাতকে ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার নিয়ামতসমূহ পরিত্যাগ করাই হলো উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ جَنْبِ مَتَاعِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِى -এর মধ্যস্থ فَا ـ -টি مُقَابَلَة -এর জন; ظَرْفِيَّتْ -এর জন্য নয়। কাজেই দুনিয়ার উপভোগের জন্য আখিরাতের ظَرْف হওয়ার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ ثَانِىَ اثْنَيْنِ রাসূল ﷺ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ اَحَدُ الْاِثْنَيْنِ : এটা হলো এই প্রশ্নের উত্তর যে, যখন ثَانِىَ -এর ইযাফত عَدَدٌ -এর দিকে করা হয় غَيْر مُضَافٌ اِلَيْه উদ্দেশ্য হয়। এই নীতিমালা দ্বারা জানা গেল যে, তিনি দুজন ব্যতীত তৃতীয়জন ছিলেন, অথচ বাস্তবতা এরূপ নয়। أَحَدُ الْاثْنَيْن বলে বলে দিয়েছে যে, উদ্দেশ্য হলো দুজনের মধ্য হতে একজন, দুয়ের তৃতীয়জন উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ جَبَلِ ثَوْرٍ : জাবালে ছওর মক্কার ডান দিকে এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়।

قَوْلُهُ اَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ : এটা تَعْلَمُوْنَ -এর উহ্য মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا تَثَاقَلُوْا : এটা شَرْط -এর جَزَاء হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : সূরার শুরু থেকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ছিল। এই পর্যায়ে মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কিতাবীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাবুক যুদ্ধের বিবরণ স্থান পেয়েছে, এতে রোমের বাদশাহ কায়সারের মোকাবিলায় অভিযান করা হয়। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৩১]

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত সমূহ তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সিরিয়ার রাজা রোম সম্রাটের সহযোগিতায় মদিনা মোনাওয়ারা আক্রমণের পায়তারা করছে, এই খবর যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হামলায় উদ্যত শত্রুকে তার দেশেই মোকাবিলা করা উচিত। প্রিয়নবী ﷺ আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন হানাদার দুশমন মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছার পূর্বেই তাবুক নামক স্থানে গমন করে তাদের মোকাবিলা করবে। অথচ তিনি মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধ শেষ করে সবে মাত্র মদিনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু যারা প্রাণের মদিনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাদের মোকাবিলা করা যে একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাবুক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিলেন। এটি নবম হিজরির ঘটনা। সাহাবায়ে কেরামের নিকট নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে এই জিহাদ কঠিন মনে হলো—

১. তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরম ছিল। ২. মদিনা শরীফে অভাব অনটন ছিল। ৩. মদিনা শরীফ থেকে তাবুকের দূরত্বও অনেক বেশি ছিল। সুদীর্ঘ সফর, দুর্গম পথ। ৪. তখন মদিনা শরীফে খেজুর বাগানের খেজুর প্রায় পেকেছে, খেজুর কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ৫. রোমের কায়সারের সুসজ্জিত বিরাট বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা -এসব কারণে এমন অবস্থায় জিহাদ স্বাভাবিক কারণেই কঠিনতর মনে হয়। তখন জিহাদের জন্যে বের হওয়া তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের ঈমান সুদৃঢ় যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, অন্যের পক্ষে এ অভিযানে অংশ গ্রহণ নিঃসন্দেহে কষ্টকর। এ সময় জিহাদে অনুপ্রাণিত করে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

-[তাফসীরে কবীর খ. ১৩, পৃ. ৫৯, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৩১]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا الخ : উপরিউক্ত আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ কর্তৃক পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম ও পথনির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো তাবুক যুদ্ধ, মহানবী ﷺ -এর প্রায় সর্বশেষ যুদ্ধ।

'তাবুক' মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। সিরিয়া ছিল তৎকালে রোমান সম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। রাসূলে কারীম ﷺ অষ্টম হিজরিতে মক্কা ও হোনাইন যুদ্ধ সমাপন করে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আরব বদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে একটানা আট বছর যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু যে রাব্বুল আলামীন ইতিপূর্বে সকল দীনের উপর ইসলামের বিজয় সম্বলিত আয়াত- لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ নাজিল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অবসর যাপনের সময় কোথায়? মহানবী ﷺ

মদিনা পৌঁছা মাত্র সিরিয়া প্রত্যাগত যয়তুন তৈল ব্যবসায়ী দলের মুখে সংবাদ পেলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া সীমান্তবর্তী তাবুকে তার সেনাবাহিনীর সমাবেশ করছে এবং এক বছরের অগ্রীম বেতন দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রেখেছে। আরো সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরবের কতিপয় গোত্রের সাথেও তাদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, মদিনায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেবে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম ﷺ তাদের আক্রমণের আগে ঠিক তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সংকল্প নিলেন। –[তাফসীরে মাযহারী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ-এর সৌজন্যে] ঘটনাচক্রে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। মদিনার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিজীবি। তখন তাদের ফসল কাটার সময়– যা ছিল তাদের গোটা বছরের জীবিকা। বলা বাহুল্য, চাকুরীজীবীদের অর্থকড়ি যেমন মাস শেষে ফুরিয়ে আসে, তেমনি নতুন মৌসুমের আগে কৃষিজীবীদের গোলাও খালি হয়ে যায়! তাই একদিকে অভাব-অনটন অন্যদিকে ঘরে ফসল তোলার আশা, তদুপরি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা দীর্ঘ আট বছরের রণক্লান্ত মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়।

কিন্তু সময়ের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষত এ যুদ্ধ হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার সকল মুসলমানকে যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দেন এবং আশপাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকেও এতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের এ সাধারণ আহ্বান ছিল মুসলমানদের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবিদার মুনাফিকদের শনাক্ত করার মোক্ষম উপায়। তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল হলো যারা কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল কিছু দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু'দল সম্পর্কে কুরআন বলে اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ "তা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সঙ্কটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে তাদের একদলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।"

তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোনো ওজরের ফলে যুদ্ধে শরিক হতে পারেনি। কুরআন তাদের সম্পর্কে বলে– لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۤءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকদের জন্য গুনাহের কিছু নেই। একথা বলে তাদের ওজর কবুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।

চতুর্থ দল হলো, যারা কোনো ওজর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। এদের ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন– وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ 'যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে।' اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ইত্যাদি।

আয়াতগুলোতে উক্ত দলে অলসতার দরুন শাস্তির হুমকি এবং পরিশেষে তাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ রয়েছে।

পঞ্চম দল হলো মুনাফিকদের। এরা পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এরা যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকে। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে এদের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠ দল হলো মুনাফিকদের সেই উপদল, যারা গোয়েন্দা বৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ [আয়াত : ৪৭] وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ [আয়াত : ৬৫] এবং وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا [আয়াত :৭৪] -এর মাঝে এ মুনাফিকদের বর্ণনা দেওয়া হয়।

কিন্তু এ সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। বিপুল সেই মুসলমানদের সংখ্যায় ছিল, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই এ যুদ্ধে ইসলামি সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যা ইতিপূর্বে কারো কোনো যুদ্ধে দেখা যায়নি।

এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ রোম সম্রাটের কানে গেলে সে ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে কয়েক দিন রণক্ষেত্রে অবস্থান করার পর তাদের মোকাবিলার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। উল্লিখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যত সেই চতুর্থ দলের সাথে, যারা ওজর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্য সাজার হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কি, তা' বর্ণিত হয়। এ বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে তা হলো–

দুনিয়ার মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল : অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা, এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দীনের ব্যাপারে সকল আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গুনাহর মূলে রয়েছে দুনিয়াপ্রীতি এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে- حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয়েছে- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর [চলাফেরা করতে চাও না]। আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।" রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার এই বলে উল্লেখ করা হয় "দুনিয়ার জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।" যার সারকথা হলো, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুত আখিরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামি আকীদার মৌলিক বিষয় তিনটি : তাওহীদ, রিসালত ও পরকালে বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হলো বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গুনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর চিন্তা করলে পরিষ্কার হবে যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা আখিরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুত এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, দুনিয়াবী ব্যস্ততা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হলো, আল্লাহর জিকির ও স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্তপ্রতীক হয়ে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষার পাত্র হয়। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরিউক্ত কুরআনি প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায় দ্বিতীয় আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোনো মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমনটা হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

قَوْلُهُ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا : অর্থাৎ "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।" আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি আমার গারে সওরের সাথী এবং হাউজে [কাউসারেও] আমার সাথী থাকবে।

ইমাম মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস লিখেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি [আল্লাহ পাক ব্যতীত আর] কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু এখন তিনি আমার ভাই ও সাথী। আর আল্লাহ পাক তোমাদের সাথীকে [অর্থাৎ আমাকে] বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে প্রিয়নবী ﷺ -এর সে কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা তিনি 'গারে সওরে' তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ "চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।" এই আয়াত সম্পর্কে হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (র.) বলেছেন, এই বাক্যে হুজুর ﷺ এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ পাক 'আমার সঙ্গে রয়েছেন; বরং বলেছেন, আল্লাহ পাক 'আমাদের' সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সঙ্গে থাকার ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা.)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জন্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফজিলত। অতএব, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদাকে অস্বীকার করে, সে এ আয়াতকে অস্বীকার করে। আর যে এ আয়াতকে অস্বীকার করে, সে কাফের।

এতদ্ব্যতীত, হযরত আবূ বকর (রা.) নিজের জন্য চিন্তিত ছিলেন না। তিনি চিন্তিত ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে। তিনি ভেবেছিলেন, যদি আমার মৃত্যু হয় তবে একটি মানুষের মৃত্যু হবে, পক্ষান্তরে যদি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শহীদ করা হয় তবে উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে, এটিই ছিল হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দুশ্চিন্তার কারণ।

হিজরতের ঘটনা : বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)-এর যে বর্ণনা সংকলিত হয়েছে তা হলো এরূপ– যখন থেকে আমার হিতাহিত জ্ঞান হয়েছে, আমি দেখেছি আমার পিতা-মাতা একই দীনের অনুসারী ছিলেন। এমন কোন দিন অতিবাহিত হতো না যে, সকাল এবং সন্ধ্যায় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গৃহে আগমন করতেন না। যখন [মক্কায়] মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন এবং উৎপীড়ন হচ্ছিল তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, আমি স্বপ্নে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখেছি। সেখানে অনেক খেজুর-বৃক্ষ রয়েছে। এরপর মুসলমানগণ মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করেন। আর যারা মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন তারাও মদীনা শরীফ পৌঁছেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু হুজুর ﷺ তাঁকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর, [এখনো আমার জন্য অনুমতি হয়নি] আশা করি যে, আমার জন্যেও [হিজরতের] অনুমতি হবে। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! আপনারও অনুমতির আশা আছে। তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। হযরত আবূ বকর (রা.) হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে সফরের উদ্দেশ্যে নিজের হিজরত মুলতবি রাখলেন। তিনি দুটি উষ্ট্র ক্রয় করলেন। চার মাস পর্যন্ত উষ্ট্রগুলোকে লালন-পালন করলেন। আমরা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে ঠিক দুপুরের সময় বসা ছিলাম। তখন হযরত আসমা বললেন, আব্বা! রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন। তিনি তখন মাথায় কাপড় রেখে এমন সময় আগমন করছিলেন যে সময় সাধারণত তাঁর আগমন হতো না। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, এ সময় যে আপনি আগমন করেছেন এর অর্থ হলো [হিজরতের] অনুমতি হয়ে গেছে। প্রিয়নবী ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি নিলেন। ঘরে প্রবেশ করে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেনঃ যারা তোমার নিকট রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, এখানে খবর প্রকাশ করার মতো কেউ নেই, শুধু আমার দুটি মেয়ে রয়েছে।

হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, আমাকে সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দান করুন। তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ তুমি আমার সঙ্গে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন ক্রন্দন করতে লাগলেন। এ ক্রন্দন ছিল আনন্দের, ইতিপূর্বে আমি কাউকে খুশি বা আনন্দের জন্য কাঁদতে দেখিনি।

হযরত আবূ বকর (রা.) তখন আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আমার এ দু'টি উষ্ট্রীর মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি ইরশাদ করলেন, মূল্য আদায় করে গ্রহণ করবো। আর যে উষ্ট্রী আমার হবে না তার উপর আমি আরোহণ করবো না। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, এ উষ্ট্রীটি আপনার।

নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, কত মূল্যে তুমি ক্রয় করেছ? হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, এত মূল্যে আমি খরিদ করেছিলাম। তিনি ইরশাদ করলেন আমি এই মূল্যে তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন বললেন, এখন এটি আপনার হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী (র.) 'গাযওয়ায়ে রাজী'র বর্ণনায় লিখেছেন, এটি ছিল জাদআ নামক উষ্ট্রী। ওয়াকেদী এর মূল্য লিখেন, ৮০০ দিরহাম। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা দু'টি উষ্ট্রীর জন্যে উত্তম আসবাবপত্র-সহ একটি বাটিতে খাবার এবং একটি পানির পাত্রও দিয়ে দেই।

মুহাম্মদ ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেন, হযরত আসমা (রা.) তাঁর কোমরবন্দের কাপড়কে টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে পাথেয় বেঁধে দেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) বনী ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি তখন কাফের ছিল, পরে মুসলমান হয়। সে অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক ছিল। তাকে উষ্ট্রী দু'টি দিয়ে দেওয়া হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিন দিন পর গারে সওরে হাজির থেকো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর সফরের ব্যাপারে অবগত করে এ নির্দেশ দেন যে, আমার স্থলে তুমি এখানে থাকবে। মানুষের যেসব আমানত আমার নিকট রয়েছে তা মানুষকে পৌঁছিয়ে দেবে। এরপর তুমি আমার নিকট চলে আসবে। [মক্কাবাসী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুতা করতো এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও চরম জুলুম অত্যাচার করতো। তাদের অন্যায়-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে একে একে মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি বিস্ময়কর বিষয় এতদসত্ত্বেও] মক্কাবাসী কোনো মূল্যবান জিনেসের হেফাজত করার ইচ্ছা হলে তা আমানত করতো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট।

মক্কাবাসীদের পূর্ণ আস্থা ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর সততা এবং আমানতদারীর উপর। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং আমানতদার। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) সওর নামক পাহাড়ের সে গুহায় পৌঁছেন। বায়হাকী হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, তাঁরা রাত্রিকালে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আবূ নাঈম আয়শা বিনতে কোদামা'এর সূত্রে লিখেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছে সর্বপ্রথম আমার সম্মুখে আবূ জেহেল এসেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই সে আমাকে এবং আবূ বকরকে দেখতে পারেনি।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত নগদ অর্থ তথা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে সওর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন পথে আবূ বকর (রা.) কখনো হুজুর ﷺ -এর সামনে কখনো ডানে কখনো বামে চলতে লাগলেন। হুজুর ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমার আশঙ্কা হয় যে, দুশমন সম্মুখে ওঁৎ পেতে আছে তখন আমি সম্মুখে চলে যাই। আর যখন দুশ্চিন্তা হয় যে, হয়তো পেছন থেকে হামলা হবে তখন পেছনে চলে যাই, আর এ কারণেই ডানে-বামে থাকি। যখন তাঁরা সওর নামক গুহার মুখে পৌঁছলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ সে আল্লাহ পাকের শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি গুহার ভেতর তাশরিফ নেবেন না। আপনার পূর্বে আমি গমন করে দেখি যদি সেখানে কোনো কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে তার প্রথম হামলা আমার উপর হবে। এ কথা বলে হযরত আবূ বকর (রা.) গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং হাত দিয়ে তদারক করে সেখানে গর্ত লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তাঁর কাপড় দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে সবগুলো গর্তের মুখ বন্ধ হলো। এরপর হযরত রাসূলে কারীম সওর গুহায় প্রবেশ করলেন।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পদচিহ্নের অনুসরণে মুশরিকরা পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু পাহাড়ের উপর পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করে সওর নামক গুহার উপরে মাকড়সার জাল দেখে বলে, যদি এর ভেতরে কেউ গমন করতো, তবে মাকড়সার জাল এভাবে থাকতো না। যাহোক, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করেন।

কাযী হাফেজ আবূ বকর ইবনে সাঈদ হযরত হাসান বসরী (র.) -এর বর্ণনা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কুরাইশরা যখন হুজুর ﷺ -এর অনুসন্ধানে সওর নামক গুহার নিকটে পৌঁছে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা বলতে থাকে, যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতো তবে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। তখন হুজুর ﷺ দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ আদায় করছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রহরায় রত ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার অনুসন্ধানে এসে গেছে। আল্লাহর শপথ! আমার নিজের জন্য কোনো চিন্তা নেই, চিন্তা হলো শুধু এর জন্যে যে, আপনার ব্যাপারে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়, তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! কোনো চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।

বুখারী শরিফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গুহার মধ্যে আছি, আর কুরাইশরা উপরে আছে, যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! সে দু'ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন [অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আছেন।]

قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন, আর তিনি হযরত আবূ বকরকে বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

ইবনে আবূ হাতেম, আবূ শেখ ইবনে মরদূইয়া, বায়হাকী এবং ইবনে আসাকের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, عَلَيْهِ -এর সর্বনামটি দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আবূ বকর (রা.) -এর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করেছেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, হে আবূ বকর! চিন্তা করো না। আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) এর মনে সান্ত্বনা এসেছে। কেননা হুজুর ﷺ -এর অন্তর তো পূর্বেই ছিল শান্ত- নিশ্চিত, তাঁর কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.)-ও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا : "আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও না।" অর্থাৎ ফেরেশতাদের ফৌজ প্রেরিত হলো যারা কাফেরদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

মক্কাবাসীদের পূর্ণ আস্থা ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর সততা এবং আমানতদারীর উপর। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং আমানতদার। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) সওর নামক পাহাড়ের সে গুহায় পৌঁছেন। বায়হাকী হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, তাঁরা রাত্রিকালে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আবূ নাঈম আয়শা বিনতে কোদামা'এর সূত্রে লিখেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছে সর্বপ্রথম আমার সম্মুখে আবূ জেহেল এসেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই সে আমাকে এবং আবূ বকরকে দেখতে পারেনি।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত নগদ অর্থ তথা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে সওর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন পথে আবূ বকর (রা.) কখনো হুজুর ﷺ -এর সামনে কখনো ডানে কখনো বামে চলতে লাগলেন। হুজুর ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমার আশঙ্কা হয় যে, দুশমন সম্মুখে ওঁৎ পেতে আছে তখন আমি সম্মুখে চলে যাই। আর যখন দুশ্চিন্তা হয় যে, হয়তো পেছন থেকে হামলা হবে তখন পেছনে চলে যাই, আর এ কারণেই ডানে-বামে থাকি। যখন তাঁরা সওর নামক গুহার মুখে পৌঁছলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ সে আল্লাহ পাকের শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি গুহার ভেতর তাশরিফ নেবেন না। আপনার পূর্বে আমি গমন করে দেখি যদি সেখানে কোনো কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে তার প্রথম হামলা আমার উপর হবে। এ কথা বলে হযরত আবূ বকর (রা.) গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং হাত দিয়ে তদারক করে সেখানে গর্ত লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তাঁর কাপড় দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে সবগুলো গর্তের মুখ বন্ধ হলো। এরপর হযরত রাসূলে কারীম সওর গুহায় প্রবেশ করলেন।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পদচিহ্নের অনুসরণে মুশরিকরা পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু পাহাড়ের উপর পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করে সওর নামক গুহার উপরে মাকড়সার জাল দেখে বলে, যদি এর ভেতরে কেউ গমন করতো, তবে মাকড়সার জাল এভাবে থাকতো না। যাহোক, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করেন।

কাযী হাফেজ আবূ বকর ইবনে সাঈদ হযরত হাসান বসরী (র.) -এর বর্ণনা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কুরাইশরা যখন হুজুর ﷺ -এর অনুসন্ধানে সওর নামক গুহার নিকটে পৌঁছে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা বলতে থাকে, যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতো তবে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। তখন হুজুর ﷺ দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ আদায় করছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রহরায় রত ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার অনুসন্ধানে এসে গেছে। আল্লাহর শপথ! আমার নিজের জন্য কোনো চিন্তা নেই, চিন্তা হলো শুধু এর জন্যে যে, আপনার ব্যাপারে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়, তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! কোনো চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।

বুখারী শরিফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গুহার মধ্যে আছি, আর কুরাইশরা উপরে আছে, যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! সে দু'ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন [অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আছেন।]

قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন, আর তিনি হযরত আবূ বকরকে বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

ইবনে আবূ হাতেম, আবূ শেখ ইবনে মরদূইয়া, বায়হাকী এবং ইবনে আসাকের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, عَلَيْهِ -এর সর্বনামটি দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আবূ বকর (রা.) -এর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করেছেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, হে আবূ বকর! চিন্তা করো না। আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) এর মনে সান্ত্বনা এসেছে। কেননা হুজুর ﷺ -এর অন্তর তো পূর্বেই ছিল শান্ত– নিশ্চিত, তাঁর কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.)-ও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

قَوْلُهُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا : "আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও না।" অর্থাৎ ফেরেশতাদের ফৌজ প্রেরিত হলো যারা কাফেরদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

উম্মে মা'বাদের ঘটনা : তাবারানী, হাকেম, আবূ নাঈম এবং আবূ বকর শাফেয়ী হযরত সোলায়েত ইবনে আমের আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন : হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) এবং তাদের পথ প্রদর্শক আমের ইবনে ফাহীরা মদিনা শরীফ গমনের পথে উম্মে মা'বাদ খাজায়ীর তাঁবু অতিক্রম করেন। উম্মে মা'বাদ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনত না, বয়সে সে প্রৌঢ়া ছিল, সে পর্দা করত না, এ অতিথিপরায়ণা মহিলা তার তাঁবুর আঙ্গিনায় বসত এবং পথিক মুসাফিরদের মেহমানদারী করত। মদিনাগামী এ পবিত্র কাফেলা উম্মে মা'বাদের নিকট থেকে গোশত এবং খেজুর ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তখন তাদের খুব অভাব অনটনের সময়। উম্মে মা'বাদের নিকট খেজুর বা গোশত কিছুই ছিল না। উম্মে মা'বাদ বলল, আল্লাহর শপথ। যদি আমাদের কাছে এসব কিছু থাকত তবে আমরা তোমাদেরকে দুঃখিত অবস্থায় রাখতাম না। তাঁবুর এক কোনে একটি বকরি দেখা গেল। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এ বকরিটির কি অবস্থা? উম্মে মা'বাদ বলল, এটি দুর্বলতার কারণে অন্য বকরীর সঙ্গে [জঙ্গলে] যেতে পারেনি।

হুজুর ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কাছে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বলল, এ বকরিটি অত্যন্ত দুর্বল। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি এ বকরি থেকে দুগ্ধ দোহন করতে পারি। উম্মে মা'বাদ আরজ করল, আমার পিতা-মাতা কুরবান, তার নিকট থেকে কখনো দুগ্ধ দোহন করা হয়নি, কোনো নর ছাগলের সঙ্গে তার মেলামেশাও হয়নি। যদি আপনি মনে করেন, তার কাছে দুধ আছে তবে আপনি চেষ্টা করতে পারেন। হুজুর ﷺ বকরিটি কাছে এনে তার পৃষ্ঠদেশে এবং বাঁটের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন, এরপর উম্মে মা'বাদের জন্যে এবং বকরির জন্যে দোয়া করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বকরি থেকে দুগ্ধ প্রবাহিত হতে লাগল।

হুজুর ﷺ একটি পাত্র আনিয়ে নিলেন। পাত্রটি এত বড় ছিল যে তা থেকে সকলে দুগ্ধ পান করে তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন। তিনি ঐ পাত্রেই দুগ্ধ দোহন করলেন। পাত্রটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হুজুর ﷺ সর্বপ্রথম উম্মে মা'বাদকে দুগ্ধ পান করালেন। সে তৃপ্তি লাভ করল। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের দুধ পান করালেন। তাঁরাও তৃপ্ত হলো। তিনি নিজে এরপর দুধ পান করলেন এবং ইরশাদ করলেন "যে পান করাবে তার সর্বশেষে পান করা উচিত।" এরপর তিনি দ্বিতীয়বার দুগ্ধ দোহন করলেন এবং পাত্রটি পুনরায় পরিপূর্ণ হলো এবং তা উম্মে মা'বাদের নিকট রেখে তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

ইবনে সা'দ এবং আবূ নাঈম উম্মে মা'বাদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে বকরিটির উপর হুজুর ﷺ হাত বুলিয়ে দিয়েছেন সে বকরিটি আমার নিকট আঠার হিজরি পর্যন্ত ছিল। তা ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের যুগ। সে বছরটি ছিল অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের; সবুজ বলতে কোনো কিছু তখন ছিল না। কিন্তু আমরা সকাল সন্ধ্যায় ঐ বকরীটির দুগ্ধ দোহন করতাম। সে সর্বদা দুধ দিত তার দুধ কোনো সময় বন্ধ হয়নি।

হিশাম ইবনে হাবশ বর্ণনা করেন [হুজুর ﷺ -এর রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পর] মা'বাদের পিতা কয়েকটি দুর্বল বকরি নিয়ে বাড়ি পৌঁছল। ঘরে দুধ দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, মা'বাদের মা এ দুধ কোথা থেকে আসলো? বকরিগুলো-তো দূরে জঙ্গলে ছিল। বাড়িতে দুধ দেওয়ার মতো কোনো বকরিও ছিল না। মা'বাদের মা বলল, এই দুধ হলো একজন অত্যন্ত বরকতময় মানুষের বরকত, যার ঘটনা এভাবে ঘটেছে। মা'বাদের পিতা বলল, তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ বলল, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উজ্জ্বল চমৎকার সুন্দর এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারী।

তাঁর অবয়ব ছিল অতি আকর্ষণীয়, সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। চক্ষুদ্বয় হলো কালো, ভ্রু প্রশস্ত এবং ঘন, আর কণ্ঠস্বরও ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যখন নিরব থাকতেন তখন অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ মনে হতো, আর যখন কথা বলতেন তখনও অত্যন্ত সুন্দর মনে হতো। দূর থেকে অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দেখা যেত। আর নিকট থেকে বড় মধুর লাগতো। কথাবার্তা ছিল অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কমও নয়, বেশিও নয়। কথাগুলো যেন সাজানো গুছানো মুক্তার হারের মতো। তাঁর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। এত লম্বাও নয় যে দেখতে খারাপ লাগে, আর এত খাটোও নয় যে দেখতে ছোট মনে হয়, অতীব আকর্ষণীয়, অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সাথীরা সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে থাকেন। তিনি যখন "শ্রবণ কর" বলতেন, তখন সকলে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতো। আর যখন কোনো আদেশ দিতেন তখন আদেশ পালনের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর খেদমত এবং আদেশ পালন করা হতো, তিনি কঠোর মেজাযের অধিকারী ছিলেন না।

আবূ মা'বাদ বলল, আল্লাহর শপথ! এতো সে কুরাইশী, মক্কায় যাঁর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করেছি আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার এবং যদি সুযোগ হয় তবে আমি ভবিষ্যতে অবশ্যই তা করবো।

ইমাম বায়হাকী অন্য সূত্র থেকে একটু পার্থক্যসহ এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সন্ধ্যাকালে উম্মে মা'বাদের পুত্র বকরি নিয়ে যখন আসল, তখন উম্মে মা'বাদ একটি ছুরি এবং বকরি প্রেরণ করল। সে তার পুত্রকে বলল, তাদেরকে বল এই বকরি জবাই করে [ভুনে] খেয়ে নিন। হুজুর ﷺ ঐ ছেলেটিকে বললেন, তুমি ছুরি নিয়ে যাও এবং একটি বড় পাত্র নিয়ে এসো! সে বলল, এটি

বন্ধ্যা, এর দুধ নেই। এরপর হুজুর ﷺ বকরিটির বাঁটগুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দুধ দোহন করে পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। এই বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমরা দু'রাত সেখানে ছিলাম, এরপর রওয়ানা হলাম। উম্মে মা'বাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'মোবারক' বলতে লাগলো। তার অনেক বকরী হয়েছিল। এমন কি সে কিছুদিন পর ঐ বকরিগুলো নিয় মদিনা শরিফ এসেছিল। তার পুত্র হযরত আবূ বকর (রা.)-কে দেখে চিনে ফেলে এবং তার মাকে বললো, মা! এ ব্যক্তি 'মোবারকের' সঙ্গে ছিল। উম্মে মা'বাদ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এসে বললো, হে আব্দুল্লাহ [আল্লাহর বান্দা] যিনি তোমার সঙ্গে ছিলেন তিনি কে?

হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তিনি আল্লাহ পাকের নবী। সে বলল, আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির করলেন। হুজুর ﷺ তাকে খাদ্য ও পোশাক দান করলেন এবং সে পরে মুসলমান হয়েছিল। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) যখন চলে গেলেন তখন আমাদের নিকট কুরাইশের কিছুলোক আসলো, তাদের মধ্যে আবূ জাহলও ছিল। তারা গৃহের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ঘর থেকে বের হলাম তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিতা কোথায়?

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না আমার পিতা কোথায়, আবূ জাহল অত্যন্ত বদমেজাযী এবং খবিস লোক ছিল, সে আমার গণ্ডদেশে একটি চাপড় মারলো যে কারণে আমার বালি পর্যন্ত পড়ে গেল। এরপর তারা চলে গেল। তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থাই রইল। আমরা কিছু জানতে পারলাম না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিকে গমন করলেন। তিনদিন পর মক্কার নিচু এলাকার দিক থেকে একটি জিন আরবদের গানের মতো গান গেয়ে গেল। মানুষ তার পেছনে ছুটলো। কিন্তু কেউ তাকে দেখতে ফেল না। জিনের আবৃত্তি করা কবিতার অর্থ হলো "মহান আরশের মালিক উত্তম বিনিময় দান করুন সেই দু' সাথীকে, যারা উম্মে মা'বাদের তাবুতে দ্বি-প্রহরে অবস্থান করেছেন, তাঁরা উভয়ে সঠিক পথে গমন করেছেন; যার কাছ থেকে আমি হেদায়েত পেয়েছি, আর যে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথী হয়েছে, সে সফলকাম হয়েছে। হে বনী কোসাই! আল্লাহ পাক মুহাম্মদ ﷺ -এর সৌজন্যে তোমাদের বৈশিষ্ট্য এবং নেতৃত্বকে বিলুপ্ত করেননি।

বনী কাবকে মোবরক হোক যে একজন স্ত্রীলোক মুসলমানদের পথে অবস্থান করতো, তার ভগ্নি থেকে তার বকরি এবং পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তোমরা যদি বকরিকে জিজ্ঞাসা কর তবে সেও সাক্ষ্য দেবে মুহাম্মদ ﷺ সে বকরি ঐ মহিলার নিকট রেখে যান, যেন দুগ্ধ দোহনকারী তার থেকে দুগ্ধ দোহন করে।" বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেন যে, কুরাইশরা হুজুর ﷺ -এর অনুসরণ করতে করতে অবশেষে উম্মে মা'বাদের নিকট পৌঁছে তাকে হুজুর ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর আকৃতির বিবরণ দেয়। উম্মে মা'বাদ জবাব দিল, তোমরা কি বলছ? একজন মেহমান আমার এখানে অবস্থান করেছিলেন, তিনি একটি বন্ধ্যা বকরির দুধ দোহন করেছিলেন।

কুরাইশরা বলল, আমরাও সে ব্যক্তিরই সন্ধান করেছি। বায়হাকী ঘটনার দুটি বর্ণনায় মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁবুর কোণে বকরি দেখছিলেন। তার পুত্র বকরি নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসেছিল আর উম্মে মা'বাদ তার স্বামী আসলে তার নিকট হুজুর ﷺ -এর গুণাবলি বর্ণনা করেছিল। আর এ কারণেই কুরাইশরা হুজুর ﷺ -এর অনুসন্ধানে উম্মে মা'বাদের নিকট পৌঁছেছিল। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৮৬-৮৭]

সোরকার ঘটনা : বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, সোরকা নিজে বর্ণনা করেন, কুরাইশের প্রতিনিধি আমাদের কাছে আসে, যে হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকরকে হত্যা অথবা গ্রেফতার করবে তার জন্য ১০০ উষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। আমি বনী মোদালাজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাজির হলো। সে বলল, সোরাকা! আমি সমুদ্র তীরে কিছু লোক দেখেছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনজন আরোহী দেখেছি, আমার ধারণা তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথী। এ কথাটি শ্রবণ করা মাত্র আমি বুঝলাম তাঁরাই হবে। আমি ঐ ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলাম যে নিরব থাক, সে নীরব হলে আমি উঠে বাড়ি গমন করলাম। বাঁদিকে আদেশ দিলাম, আমার অশ্বটি 'বতনে ওয়াদী' নামক স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, আর নিজে তাঁবুর পিছনে দিয়ে হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলাম। বর্শাটা টেনে নিয়ে গেলাম বল্লমের উপরের অংশটা নিচু করে রাখলাম এভাবে অশ্ব পর্যন্ত পৌঁছলাম। অশ্বে আরোহণ করে দ্রুত বেগে অগ্রসর হলাম। এর মধ্যে ঐ দু' ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, আমি কাছেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমার অশ্ব হোঁচট খেলে, আমি নিচে পড়ে গেলাম, এরপর উঠে দাঁড়িয়ে তীর দ্বারা এ বিষয়টি পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবো কিনা? যে ফল পাওয়া গেল তা আমার পছন্দনীয় ছিল না। অর্থাৎ আমি তাঁদের ক্ষতি করতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে একটি আশা ছিল যে, আমি এ অবস্থার পরিবর্তন করে ১০০ উষ্ট্রের পুরস্কার পেয়ে যাব। তাই পুনরায় অশ্বে আরোহণ করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম, এমন কি তাদের নিকটে পৌঁছলাম। আমি এতো নিকটবর্তী হলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র কুরআন পাঠের শব্দ শ্রবণ করলাম। আমার

দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, এই অবস্থায় আমার অশ্বের দু'টি পা মাটিতে ধ্বসে যায়। আমি নিচে পড়ে যাই এবং পরে উঠে গেলাম। কিন্তু অশ্ব তার পা বের করতে পারল না। যখন সে এজন্য চেষ্টা করতো লাগলো তখন ধুলাবালু উঠে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে গেল। আমি তীর দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করলাম দেখা গেল যে, আমি তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারব না, তখন আমি এ সত্য উপলব্ধি করলাম যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেফাজত করা হয়েছে আর তিনি বিজয়ী হবেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর নিকট আমি আমার নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলাম যে, আপনারা আমার অবস্থা দেখুন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি সাধন করবো না। তখন প্রিয়নবী ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কি চায়? আমি বললাম, আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যা হোক, আমি আপনাকে এ খবরটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে কোনো কষ্ট দেননি, শুধু এতটুকু কথা বললেন যে "আমাদের খবর মানুষকে জানাবে না" আমি তাঁর নিকট আবেদন করলাম [ভবিষ্যতের জন্য] আমাকে একটি নিরাপত্তা বাণী লিখে দিন। তখন তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে লিখে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,তিনি আমের ইবনে ফুহায়রাকে আদেশ দিলেন, "লিখে দাও"! তখন আমের চামড়ার একটি টুকরায় লিখে দিল।

এরপর প্রিয়নবী ﷺ অগ্রসর হলেন। মদিনা মোনাওয়ারা প্রবেশের সময় তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, দেখ, নবীর জন্য মিথ্যা কথা বলা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আমাকে যদি কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে [আমাকে তো সুস্পষ্ট ভাষায়] সঠিক কথা বলতেই হবে। অতএব, তুমি কোনোভাবে মানুষকে জবাব দেবে [এর কারণ হলো পথে যদি তাঁর পরিচয় প্রকাশ পায় তাহলে দুশমন তাঁর ক্ষতি করতে পারে] তাই যখন হযরত আবূ বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথী ইনি কে? তখন হযরত আবূ বকর (রা.) জবাব দিলেন, পথপ্রদর্শক; যিনি আমাকে পথ দেখান। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা শরিফের নিকটে পৌঁছলেন তখন আবূ কোরায়যা আসলামী ৭০ জন লোক নিয়ে হুজুর ﷺ -কে সম্বর্ধনা জানালেন। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, বুরায়দা।

হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর আমাদের কাজ সঠিক হয়েছে। কারণ বোরায়দা অর্থ– ঠাণ্ডা। এর তাৎপর্য হলো কলহের অগ্নি নিভে গেছে, আর কাজ সঠিক হয়েছে। হুজুর ﷺ বোরায়দা নামের অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এর দলিল পেশ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে [বোরায়দাকে] জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? তিনি বললেন, বনী আসলাম গোত্রের।

হুজুর ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, আমাদের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে। আসলাম শব্দটি থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বনী আসলামের কোন শাখা?

তিনি বললেন, বনী সাহাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে। সকাল হলে বোরায়দা প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলেন, মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশ করার সময় আপনার একটি পতাকা থাকা দরকার। তাই তিনি নিজের পাগড়ি খুলে পতাকা বানালেন এবং বর্শার মাথায় বেঁধে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলেন।

হাকেম (র.) লিখেছেন, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার দিন মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে বের হয়েছিলেন এবং সোমবার দিনই মদিনা তৈয়্যেবায় প্রবেশ করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى : অর্থাৎ "আর আল্লাহ পাক কাফেরদের কথাটি নীচ করে দেন।"

'কাফেরদের কথা হলো শিরক ও কুফরের কথা, যা আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ পথে প্রিয়নবী ﷺ -এর হেফাজত করেছেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রকে বাতিল করেছেন। বিভিন্ন স্থানে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য নেমে এসেছে এবং দুশমনের সকল অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে হেফাজত করেছেন। ঠিক এমনভিবে বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে তাদের শিরকের কথাকে নীচ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর কথাকে চির উর্ধ্বে রেখেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا অর্থাৎ "আর আল্লাহর বাণী তো চির উর্ধ্বে।" আল্লাহর বাণী হলো তাওহীদ অথবা ইসলামের দাওয়াত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কথার অর্থ হলো তারা প্রিয়নবী ﷺ -কে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং মক্কার দারউন নদওয়ার পরামর্শ করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল আল্লাহ পাক তাদের সে সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কালেমা বলতে উদ্দেশ্যে হলো আল্লাহ পাকের সে ওয়াদা যে, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য করবেন। সে ওয়াদা তিনি পূর্ণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : আর আল্লাহ পাক সববিষয়ে পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়। প্রিয়নবী ﷺ -এর ব্যাপারে আল্লাহ পাকের প্রতিটি সিদ্ধান্তই হিকমতপূর্ণ। তাঁর ব্যাপারে গৃহিত যাবতীয় কর্মসূচী নিখুঁত এবং নির্ভুল।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৮৮-৯০ তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৯৮-৯৯]

অনুবাদ :

٤٣. وَكَانَ ﷺ اَذِنَ لِجَمَاعَةٍ فِى التَّخَلُّفِ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَنَزَلَ عِتَابًا لَهُ وَقَدَّمَ الْعَفْوَ تَطْمِيْنًا لِقَلْبِهِ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ فِى التَّخَلُّفِ وَهَلَّا تَرَكْتَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِى الْعُذْرِ وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ فِيْهِ.

৪৩. রাসূল ﷺ স্বীয় বিবেচনানুসারে কিছু সংখ্যক লোককে [তাবুক] যুদ্ধে শরিক না হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁকে 'ইতাব' বা বন্ধুসুলভ তিরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। তবে তাঁর হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্য ক্ষমার কথা অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। অজুহাতের বেলায় কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং এতে কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে পশ্চাতে থেকে যেতে অনুমতি দিলে? তাদের বিষয়টি কেন আমার উপর ছেড়ে রাখলে না?

٤٤. لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فِى التَّخَلُّفِ عَنْ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ.

৪৪. যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তোমার নিকট তারা নিজ জানমাল দ্বারা জিহাদ করা হতে পশ্চাতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

٤٥. اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ فِى التَّخَلُّفِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ شَكَّتْ قُلُوْبُهُمْ فِى الدِّيْنِ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ يَتَحَيَّرُوْنَ.

৪৫. যুদ্ধ হতে পশ্চাতে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তোমার নিকট কেবল তারাই অনুমতি প্রার্থনা করে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের হৃদয় দীন সম্পর্কে সংশয়যুক্ত। তারা তো আপন সংশয়ে অস্থির। দুদোল্যমান। اِرْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থ– তাদের হৃদয় সংশয়যুক্ত।

٤٦. وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ مَعَكَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً اُهْبَةً مِنَ الْاٰلَةِ الزَّادِ وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ اَىْ لَمْ يُرِدْ خُرُوْجَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ كَسَّلَهُمْ وَقِيْلَ لَهُمْ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ الْمَرْضٰى وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ اَىْ قَدَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ.

৪৬. তারা আপনার সাথে অভিযানে বাস্তবিকই যদি বের হতে ইচ্ছা পোষণ করতো তবে নিশ্চয় এটার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত, অস্ত্রশস্ত্র ও পাথেয় যোগাড় করত কিন্তু আল্লাহ তাদের উত্থান পছন্দ করেননি। অর্থাৎ এদের বাহির-যাত্রা তিনি চাননি ফলে, তিনি এদেরকে বিরত রাখেন নিরুদ্যম করে দিলেন, এবং এদেরকে বলা হলো, নারী, শিশু ও অন্ধ প্রমুখ যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। আল্লাহ তোমাদের জন্য এই হেয় অবস্থাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٤٧. لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا فَسَادًا بِتَخْذِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৪৭. তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত মুমিনগণকে অপমানিত করার চক্রান্ত করত বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করতো।

وَّلَا اَوْضَعُوْا خِلَالَكُمْ اَىْ اَسْرَعُوْا بَيْنَكُمْ بِالْمَشْيِ بِالنَّمِيْمَةِ يَبْغُوْنَكُمُ اَىْ يَطْلُبُوْنَ لَكُمُ الْفِتْنَةَ ج بِإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط مَا يَقُوْلُوْنَ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

এবং তোমাদের মধ্যে **শত্রুতা সৃষ্টি করত** ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে **ছুটাছুটি করত।** একজনের নিকট অপরজনের বদনাম গেয়ে **বেড়াতে খুবই** তৎপর থাকত। তোমাদের মধ্যে তাদের **শ্রবণকারী বিদ্যমান।** অর্থাৎ এমন লোক বিদ্যমান যারা তাদের **কথা পালনের** জন্য শুনে। আল্লাহ সীমলঙ্ঘনকারীদের **সম্পর্কে সবিশেষ** অবহিত। يَبْغُوْنَكُمْ অর্থ– তোমাদের জন্য চায়।

٤٨. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ ج لَكَ مِنْ قَبْلُ اَوَّلَ مَا قَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ اَىْ اَجَالُوا الْفِكْرَ فِىْ كَيْدِكَ وَاِبْطَالِ دِيْنِكَ حَتّٰى جَاۤءَ الْحَقُّ النَّصْرُ وَظَهَرَ عَزَّ اَمْرُ اللّٰهِ دِيْنُهُ وَهُمْ كَارِهُوْنَ لَهُ فَدَخَلُوْا فِيْهِ ظَاهِرًا ـ

৪৮. পূর্বেও অর্থাৎ প্রথম যখন মদিনায় এসেছিলেন **তখনই** তারা তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল **এবং** তোমার কর্ম পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল করেছিল। আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও আপনার দীনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এরা সব সময় পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হক অর্থাৎ সাহায্য আসল এবং আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ তার ধর্ম প্রকাশিত হলো শক্তিশালী হলো। যদিও তা তাদের মনঃপূত ছিল না। ফলে তারা কেবল বাহ্যত এটার অন্তর্ভুক্ত হয়।

٤٩. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ فِى التَّخَلُّفِ وَلَا تَفْتِنِّىْ ط وَهُوَ الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ هَلْ لَكَ فِىْ جِلَادِ بَنِى الْاَصْفَرِ فَقَالَ اِنِّىْ مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ وَاَخْشٰى اِنْ رَاَيْتُ نِسَاءَ بَنِى الْاَصْفَرِ اَنْ لَّا اَصْبِرَ عَنْهُنَّ فَافْتَتِنُ قَالَ تَعَالٰى اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا بِالتَّخَلُّفِ وَقُرِئَ سُقِطَ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ لَا مَحِيْصَ لَهُمْ عَنْهَا ـ

৪৯. **এবং তাদের মধ্যে** এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে পশ্চাতে থেকে যেতে অনুমতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। এই ব্যক্তিটি হলো অন্যতম মুনাফিক জাদ্দ ইবনে কায়েস। রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, বানুল আছফারের [অর্থাৎ রোমক জাতি, তাবুক যুদ্ধ এদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল।] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তুমি ইচ্ছা রাখ? সে তখন উত্তর দিয়েছিল, নারীদের বিষয়ে আমি বড় দুর্বল। সুন্দরী রোমক রমণীদের দেখলে আমি আত্মসংবরণ করতে পারব না। ফলে, ফেতনায় লিপ্ত হয়ে পড়ব। আল্লাহ তা'আলা এর সম্পর্কে ইরশাদ করেন, শুনে রাখ, পশ্চাতে থেকে এরা তো ফেতনায় পড়ে আছে। আর জাহান্নাম তো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বেষ্টন করেই আছে। এটা হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো স্থান নেই। سَقَطُوْا শব্দটি سُقِطَ রূপেও পঠিত রয়েছে।

٥٠. اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ كَنَصْرٍ وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤْهُمْ ط وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ شِدَّةٌ يَقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا بِالْحَزْمِ حِيْنَ تَخَلَّفْنَا مِنْ قَبْلُ قَبْلَ هٰذِهِ الْمُصِيْبَةِ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ بِمَا اَصَابَكَ ـ

৫০. তোমার মঙ্গল হলে বিজয় ও গনিমত সামগ্রী লাভ হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় আর তোমার বিপদ ঘটলে কঠিন অবস্থায় পড়লে তারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই অর্থাৎ এই বিপদ আসার আগেই যুদ্ধ হতে পশ্চাতে থেকে আমাদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। আর তারা তোমাকে বিপদে দেখে উৎফুল্ল চিত্তে সরে পড়ে।

٥١. قُلْ لَّهُمْ لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج اِصَابَتَهٗ هُوَ مَوْلٰنَا ج نَاصِرُنَا وَمُتَوَلِّي اُمُوْرِنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

৫১. এদেরকে বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা অর্থাৎ যে বিপদ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছু হবে না। তিনি আমাদের কর্ম বিধায়ক সাহায্যকর্তা ও আমাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।

٥٢. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الْاَصْلِ اَىْ تَنْتَظِرُوْنَ اَنْ يَّقَعَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْعَاقِبَتَيْنِ الْحُسْنَيَيْنِ تَثْنِيَةُ حُسْنٰى تَانِيْثُ اَحْسَنَ النَّصْرِ اَوِ الشَّهَادَةِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ نَنْتَظِرُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ بِقَارِعَةٍ مِّنَ السَّمَآءِ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ز بِاَنْ يَّاْذَنَ لَنَا بِقِتَالِكُمْ فَتَرَبَّصُوْا بِنَا ذٰلِكَ اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ عَاقِبَتَكُمْ ـ

৫২. বল, তোমরা তো আমাদের সম্পর্কে দুটি ভালো আল্লাহর উপরই মুমিনদেরকে নির্ভর করা বা শাহাদাত লাভ করা– এই দুইটির একটি আপতিত হওয়ার প্রতীক্ষা করতেছ। আর আমরা প্রতীক্ষা করতেছি যে আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে تَرَبَّصُوْنَ -এতে মূলত একটি ت বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– তোমরা প্রতীক্ষা করতেছ। الْحُسْنَيَيْنِ শব্দটি اَحْسَنَ –এর স্ত্রীলিঙ্গ حُسْنٰى -এর تَثْنِيَةٌ বা দ্বিবচন। تَرَبَّصَ অর্থ– আমরা প্রতীক্ষা করতেছি। আকাশের ভীষণ নিনাদের মাধ্যমে কিংবা আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি প্রদান করে আমাদের হস্ত দ্বারা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। অতএব তোমরা আমাদের সম্পর্কে তার প্রতীক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে তোমাদের পরিণামের প্রতীক্ষা করতেছি।

٥٣. قُلْ اَنْفِقُوْا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط مَآ اَنْفَقْتُمُوْهُ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ وَالْاَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْخَبَرِ ـ

৫৩. বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্যে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই অর্থ ব্যয় কর না কেন তা অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় করেছ তা কখনো গৃহীত হবে না। তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। اَنْفِقُوْا-এটা اَمْرٌ বা নির্দেশবাচক বাক্য হলেও এই স্থানে خَبَرٌ বা বিবরণমূলক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٤. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ فَاعِلُ مَنَعَهُمْ وَاَنْ تُقْبَلَ مَفْعُوْلُهٗ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى مُتَثَاقِلُوْنَ وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ النَّفَقَةَ لِاَنَّهُمْ يَعُدُّوْنَهَا مَغْرَمًا ـ

৫৪. তাদের অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা হতে কেবল এ কারণেই নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করে, শৈথিল্যের সাথে ভারবাহী অবস্থায় তারা সালাতে শরিক হয় আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে বটে; কিন্তু তারা এই অর্থ ব্যয় অপছন্দ করে। কেননা তারা তাকে ট্যাক্স বলে মনে করে। يُقْبَلَ শব্দটি ت ও ى উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اِلَّآ اَنَّهُمْ -এটা আয়াতোক্ত مَنَعَهُمْ ক্রিয়ার فَاعِلٌ বা কর্তা, আর তার مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারক হলো اَنْ يُّقْبَلَ -

৫৫. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اَيْ لَا تَسْتَحْسِنْ نِعَمَنَا عَلَيْهِمْ فَهِيَ اِسْتِدْرَاجٌ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اَيْ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِمَا يَلْقَوْنَ فِيْ جَمْعِهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ وَفِيْهَا مِنَ الْمَصَائِبِ وَتَزْهَقَ تَخْرُجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ فَيُعَذِّبُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

৫৫. তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে। অর্থাৎ তাদেরকে আমার নিয়ামত প্রদান ভালো বলে মনে করবে না; এটা আমার পক্ষ হতে অবকাশ প্রদান মাত্র। আল্লাহ তো এদেরকে তা দ্বারাই পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। এইগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে কত ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয় এবং এতে আবার কত ধরনের বিপদ-আপদ রয়েছে। আর কুফরি অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে। অনন্তর পরকালে আরো কঠিন শাস্তির মধ্যে তাদেরকে নিপতিত করা হবে। لِيُعَذِّبَهُمْ -এই স্থানে لِ -এর পর اَنْ শব্দটি উহ্য রয়েছে। তাফসীরে اَنْ يُعَذِّبَهُمْ উল্লেখ করে ঐদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। تَزْهَقَ অর্থ– বের হয়ে যাবে।

৫৬. وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط اَيْ مُؤْمِنُوْنَ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ تَفْعَلُوْا بِهِمْ كَالْمُشْرِكِيْنَ فَيَحْلِفُوْنَ تَقِيَّةً ـ

৫৬. তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শপথ করে বলে যে, তারা মুমিন। কিন্তু আসলে তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে। অর্থাৎ এই ভয় করে যে, এদের সাথেও মুশরিকদের ন্যায় আচরণ করা হবে। সুতরাং নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে তারা ঐ ধরনের শপথ করে।

৫৭. لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً يَلْجَؤُوْنَ اِلَيْهِ اَوْ مَغٰرٰتٍ سَرَادِيْبَ اَوْ مُدَّخَلًا مَوْضِعًا يَدْخُلُوْنَهُ لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ يُسْرِعُوْنَ فِيْ دُخُوْلِهِ وَالْاِنْصِرَافِ عَنْكُمْ اِسْرَاعًا لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ كَالْفَرَسِ الْجَمُوْحِ ـ

৫৭. তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল পেত যেখানে তারা আশ্রয় নিবে বা কোনো গিরি-গুহা সুড়ঙ্গ বা কোনো প্রবেশস্থল যেখানে তারা প্রবেশ করবে তবে তারা তাতে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করত। অর্থাৎ দ্রুত গিয়ে তারা তাতে প্রবেশ করত। তোমাদের হতে ক্ষিপ্রগতি একরোখা ঘোড়ার মতো এমনভাবে তারা পালিয়ে যেত যে, কিছুই তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারত না।

৫৮. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ يُعَيِّبُكَ فِيْ قَسْمِ الصَّدَقٰتِ ج فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ـ

৫৮. তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। এটা হতে তাদেরকে কিছু দেওয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং তার কিছু তাদেরকে দেওয়া না হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। يَلْمِزُكَ অর্থ– তোমাকে দোষারোপ করে।

৫৯. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنَ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِهَا وَقَالُوْا حَسْبُنَا كَافِيْنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ غَنِيْمَةٍ اُخْرٰى مَا يَكْفِيْنَا اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ اَنْ يُّغْنِيَنَا وَجَوَابُ لَوْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

৫৯. ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গনিমত সামগ্রী বা অন্যান্য যা কিছুই দেন তাতে পরিতুষ্ট হতে এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অচিরেই আমাদেরকে তাঁর করুণা দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও অন্যান্য সময়ের যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হতে এমন দিবেন যে, তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর প্রতি অনুরাগ রাখি। তিনিই আমাদেরকে আনপেক্ষ করে দিবেন। حَسْبُنَا অর্থ– আমাদের জন্য যথেষ্ট। لَوْ -এই স্থানে এটার জওয়াব উহ্য। তা হলো– لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ [তবে তাদের জন্য এটা ভালো হতো।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ : এটা جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ অসন্তুষ্টির স্থানে স্নেহ মমতা প্রকাশের জন্য অগ্রবর্তী করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِمَ : এটা মূলত لِمَا জার-মাজরূর ছিল। একটি মূলনীতি রয়েছে যে, যখন হরফে জর مَائِى اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর উপর প্রবেশ করে তখন اَلِفْ পড়ে যায়। এ কারণেই এখানে اَلِفْ পড়ে গেছে। لَمْ -এর মধ্যে لَا -টি হলো تَعْلِيْلِيَّةٌ আর لَهُمْ -এর মধ্যে تَبْلِيْغِيَّةٌ কাজেই উভয়টি اَذِنْتَ -এর مُتَعَلِّقٌ হওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا : এটা يَتَبَيَّنَ -এর فَاعِلْ হয়েছে صَدَقُوْا বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। تَعْلَمَ -এটা يَتَبَيَّنُ -এর উপর আতফ হয়েছে। كَاذِبِيْنَ মাফউলে লাহু হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَرِدْ خُرُوْجَهُمْ : كَرَاهَةٌ বলা হয়- اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ لِلْعِلْمِ بِنُقْصَانِهِ -কে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কাজেই كَرِهَ اللّٰهُ -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে কারাহাতের সম্বন্ধ করা তো জায়েজ নয়!

উত্তর. মুফাসসির (র.) كَرِهَ -এর তাফসীর لَمْ يَرِدْ خُرُوْجَهُمْ দ্বারা করে এই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন এখানে كَرَاهَتٌ -এর লাযেমী অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা যে বস্তু অপছন্দনীয় হয় তার ইচ্ছা করা হয় না।

قَوْلُهُ ثَبَّطَهُمْ : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَثْبِيْطًا মাসদার হতে মাযী -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ- বিরত রাখা, ফিরিয়ে রাখা। هُمْ হলো جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর যমীর।

প্রশ্ন. تَثْبِيْط -এর অর্থ হলো বিরত রাখা। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনোভাবেই এটা সমীচীন নয় যে, বান্দাগণকে ফরজ বিষয়গুলো হতে ফিরিয়ে রাখবেন। কাজেই রূপকভাবে বিরত রাখার নিসবত অলসতার দিকে করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অনুপাতে তাদের অলসতা তাদেরকে বিরত রেখেছেন।

قَوْلُهُ اَىِ اللّٰهُ ذَالِكَ : প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اُقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ; এতে قُعُوْدٌ عَنِ الْجِهَادِ -এর হুকুম প্রদান করা হয়েছে। আর নির্দেশিত বিষয়টি প্রশংসিত হয়; তিরস্কৃত হয় না।

উত্তর. উত্তরের সারকথা বা উদ্দেশ্য হলো تَقْدِيْرِ اَزَلِىْ আর এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই قَدَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذَالِكَ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন যে, এটা اَمْرِ تَهْدِيْدِىْ যা اِعْلَمُوْا مَا شِئْتُمْ -এর অন্তর্গত। আর قَرِيْنَةٌ হলো مَعَ الْقَاعِدِيْنَ

قَوْلُهُ اِلَّا خَبَالًا : এটা مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغْ হয়েছে। অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- مَا زَادُوْكُمْ شَيْئًا اِلَّا خَبَالًا خَبَالًا অর্থ হলো বিশৃঙ্খলা, অনিষ্ট। এটা خَبَلَ يَخْبُلُ তথা বাবে نَصَرَ হতে নির্গত। এরূপ অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা যার কারণে কোনো প্রাণীর মধ্যে পাগলামি বা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়ে যায়। خَبَالًا হলো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ

قَوْلُهُ اَوْضَعُوْا : অর্থাৎ لَسَعَوْا بَيْنَكُمْ بِالنَّمِيْمَةِ আর اِيْضَاعٌ অর্থ হলো اِسْرَاعٌ দ্রুত করা। বলা হয়- وَضَعَ الْبَعِيْرُ وَضْعًا اِذَا اَسْرَعَ বুঝা গেল যে, এখানে وَضْع অর্থ- نِهَادَنْ বা রাখা নয়।

قَوْلُهُ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ : سَمّٰعُوْنَ অর্থ- খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী, গুপ্তচর। سَمَّاعٌ শব্দটি কখনো গুপ্তচর অর্থে আবার কখনো অনুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এই উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ بَنِى الْاَصْفَرِ : রোমের আশপাশের কোনো এক এলাকার সর্দারের নাম ছিল اَصْفَرْ ; সে একজন রোমীয় নারী বিয়ে করেছিল। তার থেকে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করত, তাদেরকে بَنِىْ اَصْفَرْ বলা হতো। এ বংশ যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে। এটা সেই বংশের দিকেই ইঙ্গিতবহ।

قَوْلُهُ جَلَّادْ : চাবুক দ্বারা আঘাত/ প্রহারকারী, তরবারি দ্বারা হত্যাকারী। এর থেকেই জল্লাদ শব্দটি এসেছে। এখানে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য। কোনো কোনো নোসখায় جَلَّادْ -এর পরিবর্তে جِهَادْ রয়েছে, যা সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ اَنْفِقُوْا طَوْعًا وَكَرْهًا الخ : এটা اَمْر بِمَعْنَى خَبَرْ হয়েছে। এর অর্থ হলো- نَفَقَتَكُمْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ

قَوْلُهُ فَاعِلُ مَنَعَهُمْ : অর্থাৎ اِلَّا اَنَّهُمْ হলো مَنَعَ -এর ফা'য়েল। উহ্য ইবারত হলো **এরূপ**- مَا مَنَعَهُمْ قَبُوْلَ نَفَقَاتِهِمْ اِلَّا كُفْرُهُمْ ; আর قَبُوْلَ হলো مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ আর مَنَعَهُمْ -এর মধ্যকার هُمْ হলো مَفْعُوْلٌ اَوَّلْ

قَوْلُهُ اِسْتِدْرَاجٌ : এর অর্থ- ধীরে ধীরে নিকটবর্তী করা, ধীরে ধীরে অবকাশ দেওয়া।

قَوْلُهُ تَقِيَّةٌ : বাতিনের বিপরীত প্রকাশ করা। এ শব্দটি اَهْلِ تَشَيُّعْ -এর পরিভাষা। অর্থাৎ স্বীয় ধর্মীয় **বিশ্বাসের বিপরীত** প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ سَرَادِيْبُ : এটা سِرْدَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বাংকার, হিমাগার, ভূগর্ভস্থ ঘর। গহবর, সুরঙ্গ।

قَوْلُهُ مُدَّخَلًا : মূলে ছিল مُدْتَخَلًا ; এখানে تَاءْ -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ -কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম **করে** দেওয়া হয়েছে। অর্থ- প্রবেশ করার জায়গা।

قَوْلُهُ يَجْمَحُوْنَ : এটা جَمْح থেকে নির্গত। جَمْح ঐ অবাধ্য ঘোড়াকে বলে যা লাগাম দ্বারাও আয়ত্তে আসে না এবং খুব দ্রুত দৌড়িয়ে চলে। এখানে উদ্দেশ্য হলো দ্রুত চলা, দৌড়ানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ اَذِنْتَ لَهُمْ الخ : এ রুকূর সতেরটি আয়াতের অধিকাংশ স্থান জুড়ে সেই মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, যারা মিথ্যা বাহানা দাঁড় করে তাবুক যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুমতি নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মাসায়েল, আহকাম ও হেদায়েতের সমাবেশ রয়েছে। প্রথম আয়াতে এক অপূর্ব সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অভিযোগ করা হয় যে, মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর দেখিয়ে নিজেদের মা'যুর বলে প্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের সত্য -মিথ্যা যাচাইয়ের আগে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো কেন? যাতে এরা উল্লাস প্রকাশ করে বলছে যে, তারা আল্লাহর রাসূলকে সহজে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে দেন যে, নিছক বাহানা তালাশের জন্যই তাদের ওজর প্রকাশ, নতুবা অব্যাহতি না পেলেও তারা যুদ্ধে শরিক হতো না। আলোচ্য আয়াতে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, তারা যুদ্ধে শরিক হলেও মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হতো না। তবে এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধ থেকে তাদের অব্যাহতি না দিলেও তারা অবশ্য যেত না; কিন্তু এতে তাদের মনের কুটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং মুসলমানদের প্রতারিত করে উল্লাস প্রকাশের সুযোগ পেত না। আয়াতের শুরুতে অভিযোগের যে ভাব, তার উদ্দেশ্য তিরস্কার করা নয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণ। বাহ্যত এক প্রকারের তিরস্কার মনে হলেও কত স্নেহমমত্বের সাথে তার প্রকাশ ঘটে। কি সুন্দর বাচনভঙ্গি? لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ["কেন আপনি অনুমতি প্রদান করলেন"] -এর আগে বলে দেওয় হয়- عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ["আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।"]- অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুউচ্চ মর্যাদা ও শান এবং আল্লাহর পথে তাঁর গভীর সম্পর্কের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা বলেন যে, আল্লাহর সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কোনো কাজের জবাব তলব ছিল তাঁর বরদাশতের বাইরে। প্রথমেই যদি "কেন অব্যাহতি দিলেন" বলা হতো, তবে রাসূল ﷺ -এর কলব মোবারকের পক্ষে তা সহ্য করা দুষ্কর হতো। তাই প্রথমেই "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন" বলে এক দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হলো যে, এমন কিছু হয়ে গেল, যা আল্লাহর অপছন্দ। অন্য দিকে ক্ষমা করার আশ্বাসবাণী শোনানো হয়েছে, যাতে তাঁর কলব মোবারক ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে।

প্রশ্ন আসতে পারে, রাসূলে কারীম ﷺ ছিলেন নিষ্পাপ। অতএব এখানে 'ক্ষমা' শব্দের ব্যবহার কেন? ক্ষমা তো গুনাহ ও অপরাধের জন্য হয়ে থাকে। এর উত্তর হলো, 'ক্ষমা' শব্দটির প্রয়োগ যেমন গুনাহের জন্য, তেমনি অপছন্দ ও উত্তম নয়- এমন ব্যাপারেও করা যেতে পারে। আর এটি নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য দেখানো হয়েছে যে, মুমিনগণ জান ও মালের মোহে পড়ে জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে না:

বরং এ হলো তাদের কাজ, আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। আর আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করে জানেন।

চতুর্থ আয়াতে মুনাফিকদের পেশকৃত ওজর যে মিথ্যা তার একটি আলামত দেখিয়ে বলা হয়েছে– وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً "জিহাদের জন্য বের হওয়ার সংকল্প এদের থাকলে নিশ্চয় এর কিছু প্রস্তুতিও নিত" কিন্তু দেখা যায় যে, তাদের কোনো প্রস্তুতিই নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ওজর মিথ্যা বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত জিহাদে বের হবার কোনো ইচ্ছাই তাদের ছিল না।

গ্রহণযোগ্য ওজর ও জিহাদে বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওজর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হলো সেই লোকদের ওজর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে; কিন্তু আদেশ পালনে যার কোনো ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোনো ওজরও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহের এ ওজর হবে গুনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন– কেউ জুম'আর নামাজে শরিক হওয়ার প্রস্ততি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওজর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ মা'যুর লোককে পূর্ণ ছওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুম'আর কোনো প্রস্ততিই নেয়নি, তার কোনো ওজর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর। উদাহরণত দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময় মতো জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে; কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামাজ কাযা হয়ে যায়। যেমন– রাসূলে কারীম ﷺ -এর লায়লাতুত তা'রীজের ঘটনা। সময় মতো জেগে উঠার জন্য তিনি হযরত বিলাল (রা.)-কে নিয়োজিত রাখেন, যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলে চোখ খোলে- এ ওজর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– لَا تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ অর্থাৎ "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হলো যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হলো, সময় মতো জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি-অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য কিনা? তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমাখরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

পঞ্চম আয়াতে মিথ্যা ওজর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জিহাদ থেকে এদের নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয়– وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আছে এমন অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান, যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হতো।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ 'ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। যেমন– ওহুদ যুদ্ধে প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অর্থাৎ "আল্লাহর বিজয় হলো, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমনভাবে ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়েস নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেওয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ওজর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কুরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে– اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا। 'ভালো করে শোন' এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশঙ্কার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশঙ্কা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধের দ্বারা এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখিরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ মতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যত মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ["আপনার কোনো মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়।"] وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ هُمْ خَرَجُوْا

[এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, **মুসলমানরা** বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।]

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ পাক মহানবী ﷺ ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে **আসল** সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا **অর্থাৎ** "আপনি ঐ বস্তুপূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হলো এক যবনিকা **বিশেষ**। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহরই। আমরা যে সকল অবস্থায় সম্মুখীন হই তা আগেই **আল্লাহ আমা**দের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি **ভালোবাসা** রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভালোমন্দ নির্ভলশীল **নয়**।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য এবং বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুল : আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল [আল্লাহর প্রতি ভরসা] -এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে; বরং তার অর্থ হলো, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের সাধ্যমতো চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে আর দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হবেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্মবিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায় উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেওয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জিহাদের জন্য নবী করীম ﷺ -এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি? তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে- برتوکل زانوے اشتر بہ بند অর্থাৎ "তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।" অর্থাৎ দুনিয়ার উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমের যে অধীন সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মুমিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী ছওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূল কথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হলো هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ অর্থাৎ "তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হলো তার বিপরীত। আজাব থেকে কোনো অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোনো প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখিরাতের আজাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

قَوْلُهُ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا الخ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে জদ ইবনে কায়েস সম্পর্কে। সে ভিত্তিহীন ওজর আপত্তি পেশ করে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তখন এ কথাও বলেছিল, আমি এ যুদ্ধে যেতে পারব না তবে অর্থ সম্পদ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব। পূর্ববর্তী আয়াতে তার প্রথম কথার জবাব দেওয়া হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে তার দ্বিতীয় কথার জবাব দেওয়া হয়েছে।

-[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৮৮, তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ১০, পৃ. ১১৬]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কুস্বভাব ও মন্দ আচরণের আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের সারকথাও অনেকটা তাই। আর اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا ["আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলোর দ্বারা তাদের আজাবে রাখা"] বাক্যে মুনাফিকদের জন্য তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আজাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ হলো, দুনিয়ার মোহে উন্মুক্ত থাকা মানুষের জন্য পার্থিব জীবনেও এক বড় আজাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্য নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাজত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হলো একেকটি স্বতন্ত্র আজাব। এরপর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদা মতো

অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থসম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাতছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুত এসবই হলো আজাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখিরাতের আজাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেওয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্‌কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমতো না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করতে। এখানে যদি সদ্‌কার সাধারণ অর্থ নেওয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদকা বোঝায়, তবে কোনো প্রশ্ন থাকে না। কারণ অমুসলিমদের নফল সদকা দান ইমামদের ঐকমত্যে জায়েজ এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদকা বলতে ফরজ সদকা যথা– জাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্য দেওয়া হতো যে, তারা নিজেদের মুসলমান রূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরির কোনো প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَايَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى : অর্থাৎ "তারা নামাজে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে" আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাজে আলস্য ও দান খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

খারিজী পরিচিতি ও তাদের মতবাদ : এ সম্প্রদায় উৎপত্তির ঘটনা হলো এই যে, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের দ্বিতীয় দিন যখন লোকজন হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন, সে সময় হযরত আয়েশা (রা.) হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে কতিপয় লোক হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ মর্মে উত্তেজিত করে তুলল যে, হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শনাক্তকরণে বাধ্য করা হবে। হযরত আলী (রা.) যদি এতে অস্বীকার করেন তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এরা হযরত আয়েশা (রা.)-কে বসরায় নিয়ে গেল। বসরাতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে অনেক লোক সমবেত হলো। হযরত আলী (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বসরা পানে বেরিয়ে পড়লেন। ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো, যা ইতিহাসে 'জঙ্গে জামাল' নামে সুপ্রসিদ্ধ। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) এ যুদ্ধে উষ্ট্রে আরোহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর উটকে আরবিতে 'জামাল' বলা হয়। এ কারণে এ যুদ্ধ 'জঙ্গে জামাল' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। একটি ইজতিহাদী ভুলের ভিত্তিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এতে হযরত আলী (রা.) বিজয় লাভ করেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণের পর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। যেহেতু হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন, তাই তিনি এর প্রতিশোধ নেওয়াকে নিজের দায়িত্ব মনে করলেন।

সিফফীনের যুদ্ধ : ৩৭ হিজরিতে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা ইতিহাসে জঙ্গে সিফফীন নামে প্রসিদ্ধ। ইরাক ও শামের মাঝামাঝি একটি জায়গার নাম হলো সিফফীন। এ যুদ্ধ প্রায় এক মাস যাবৎ অব্যাহতভাবে চলছিল। জয়ের পাল্লা হযরত আলী (রা.)-এর দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এরপরামর্শক্রমে সন্ধির জন্য 'সালিশ বোর্ড' গঠন করা হলো। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ হতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) সালিশ নিযুক্ত হলেন। এ পঞ্চায়েতের সন্ধি হতে অসন্তুষ্ট হয়ে اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ বলে আট হাজার লোকের একটি দল হযরত আলী (রা.) হতে বিমুখ হয়ে তার সেনাবাহিনী হতে পৃথক হয়ে গেল। এরাই ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত। তারা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মনে করে। এ দলটিকে হারূরিয়াহও বলা হয়। হারূর নামক স্থানের দিকে সম্বোধন করে এটা বলা হয়। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম এ দলেরই সদস্য ছিল, যে ব্যক্তি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করে দেয়।

٦٠. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الزَّكَوَاتُ مَصْرُوفَةٌ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَالْمَسَاكِيْنِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يَكْفِيْهِمْ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا اَىْ اَلصَّدَقَاتِ مِنْ جَابٍ وَقَاسِمٍ وَكَاتِبٍ وَحَاشِرٍ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ لِيُسْلِمُوْا وَ يَثْبُتَ اِسْلَامُهُمْ اَوْ يُسْلِمَ نُظَرَاؤُ هُمْ اَوْ يَذُبُّوْا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ اَقْسَامٌ وَالْاَوَّلُ وَالْاَخِيْرُ لَا يُعْطَيَانِ الْيَوْمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِعِزِّ الْاِسْلَامِ بِخِلَافِ الْاٰخِرَيْنِ فَيُعْطَيَانِ عَلَى الْاَصَحِّ وَفِي فَكِّ الرِّقَابِ اَىْ اَلْمُكَاتَبِيْنَ وَالْغَارِمِيْنَ اَهْلِ الدَّيْنِ اِنِ اسْتَدَانُوْا لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ اَوْ تَابُوْا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاءٌ اَوْ لِاِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ اَغْنِيَاءَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ اَلْقَائِمِيْنَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لَا فَيْءَ لَهُمْ وَلَوْ اَغْنِيَاءَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط اَلْمُنْقَطِعِ فِيْ سَفَرِهٖ فَرِيْضَةً نُصِبَ لِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهٖ فَلَا يَجُوْزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِ هٰؤُلَاءِ وَلَا مَنْعُ صِنْفٍ مِنْهُمْ اِذَا وُجِدَ .

অনুবাদ :

৬০. সাদাকাত অর্থাৎ জাকাত তো কেবল ব্যয়িত হবে দরিদ্র, অর্থাৎ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণেরও যার অর্থ নেই, মিসকিন, অর্থাৎ যাদের যথেষ্ট অর্থ নেই, তার অর্থাৎ জাকাত সংগ্রহকারী, বণ্টনকারী, খাতা লিখক, জমাকারী প্রভৃতি কর্মচারীগণ, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে বা তাতে দৃঢ় রাখার জন্য বা এদের দেখিয়ে অন্যরাও যাতে ঈমান গ্রহণ করে সেই জন্য বা মুসলমানদের পক্ষ হতে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হলো, বর্তমানে প্রথম ও শেষ ধরনের লোকদেরকে জাকাত হতে প্রদান করা যাবে না। কারণ ইসলাম বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিশালী। তাঁর অধিকতর সহীহ অভিমত হলো, বাকি দুই ধরনের লোকদের অবশ্য বর্তমানেও দেওয়া যেতে পারে। এবং দাসদের অর্থাৎ মুকাতিব গোলামদের মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, অর্থাৎ যে কাজে পাপ নেই এমন কাজ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়েছে বা পাপকার্যে ঋণ করেছিল বটে কিন্তু তা হতে সে তওবা করেছে আর ঐ ঋণ আদায় করার তার কোনো ব্যবস্থা নেই তবে জাকাতের অর্থ হতে এই ধরনের ব্যক্তিকেও দেওয়া যেতে পারে। কিংবা বিবদমান দুই মুসলিম দল বা ব্যক্তির মধ্যে আপোস করতে গিয়ে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয় তবে সে বিত্তশালী হলেও জাকাতের অর্থ হতে তাকে তা দেওয়া যায়। আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য, এরা বিত্তশালী হলেও তাদেরকে তা প্রদান করা যায়। তবে এমতাবস্থায় ফাই সম্পদে উহাদের কোনো হিস্যা নেই এবং পথ সন্তানদের জন্য। অর্থাৎ মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ فَرِيْضَةً এটা এই স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে مَنْصُوْب হয়েছে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে খুবই অবহিত এবং স্বীয় কার্য সম্পর্কে প্রজ্ঞাময়। সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্য কোথাও এটা ব্যয় করা জায়েজ নয়। পাওয়া গেলে তাদের কোনো একটি প্রকারকেও তা হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

فَيَقْسِمُهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ اٰحَادِ الصِّنْفِ عَلٰى بَعْضٍ وَاَفَادَتِ اللَّامُ وُجُوْبَ اِسْتِغْرَاقِ اَفْرَادِهِ لٰكِنْ لَا يَجِبُ عَلٰى صَاحِبِ الْمَالِ اِذَا قُسِمَ لِعُسْرِهِ بَلْ يَكْفِيْ اِعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَلَا يَكْفِيْ دُوْنَهَا كَمَا اَفَادَتْهُ صِيْغَةُ الْجَمْعِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ شَرْطَ الْمُعْطٰى مِنْهَا الْاِسْلَامُ وَاَنْ لَا يَكُوْنَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا.

ইমাম বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান সকল প্রকারের মধ্যে তা সমভাবে বণ্টন করবেন। তবে একই প্রকারভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অবশ্য তিনি তারতম্য করতে পারবেন। খাতসমূহ বর্ণনায় শব্দগুলোকে لَامْ ও اَلِفْ যুক্ত করে ব্যবহার করায় [যেমন اَلْمَسَاكِيْنَ اَلْفُقَرَاءُ] যদিও বুঝা যায় যে, ঐ জাতীয় সকলেই এটার অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেক প্রকারের সকলজনকেই তা আদায় করতে হবে তেমন নয়। কারণ তা খুবই কঠিন। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের তিনজন করে দিলেই তা আদায় হয়ে যাবে এটার কম হলে হবে না। কারণ এই শব্দসমূহ বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবি ভাষায় বহুবচন হতে হলে ন্যূনপক্ষে তিন-এর প্রয়োজন হয়। হাদীসে বিবৃত হয়েছে যে, যাকে তা প্রদান করা হবে তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে, আর সে হাশেমী ও মুত্তালেবীয় বংশের হতে পারবে না।

٦١. وَمِنْهُمْ اَيِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ بِعَيْبِهِ وَنَقْلِ حَدِيْثِهِ وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا نُهُوْا عَنْ ذٰلِكَ لِئَلَّا يَبْلُغَهُ هُوَ اُذُنٌ ط اَيْ يَسْمَعُ كُلَّ قِيْلٍ وَيَقْبَلُهُ فَاِذَا حَلَفْنَا لَهُ اِنَّا لَمْ نَقُلْ صَدَّقَنَا قُلْ هُوَ اُذُنُ مُسْتَمِعُ خَيْرٍ لَّكُمْ لَا مُسْتَمِعُ شَرٍّ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا اَخْبَرُوْهُ بِهِ لَا لِغَيْرِهِمْ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اِيْمَانِ التَّسْلِيْمِ وَغَيْرِهِ وَرَحْمَةٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى اُذُنُ وَالْجَرِّ عَطْفًا عَلٰى خَيْرٍ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ط وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

৬১. এবং তাদের মধ্যে অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয়। অর্থাৎ তাঁকে দোষারোপ করে এবং তাঁর কথা শত্রুর নিকট বলে দেয়, যখন তাদেরকে এটা হতে এই আশঙ্কায় নিষেধ করা হয় যে না জানি তাঁর কানে এই কথা পৌঁছে যায় তখন তারা বলে, তিনি তো কর্ণধারক অর্থাৎ তিনি সকল কথাই শুনেন এবং তা গ্রহণ করে নেন। সুতরাং আমরা তাঁর নিকট যদি শপথ করে বলি যে আমরা ঐরূপ বলিনি তবেই তিনি তা বিশ্বাস করে ফেলবেন। বল, তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তার তিনি কর্ণধারক অর্থাৎ তাই তিনি শুনেন। ক্ষতিকর যা তা তিনি শুনেন না। তিনি আল্লাহে বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণকে অর্থাৎ তারা তাঁকে যে সংবাদ দেয় তা বিশ্বাস করেন সত্য বলে জানেন। অন্য কারো কথা তিনি শুনেই বিশ্বাস করে ফেলেন না। তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তিনি তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। لِلْمُؤْمِنِيْنَ -এই স্থানে ل -টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। আল্লাহর উপর ঈমান এবং কোনো কিছু সত্য জানা অর্থে ঈমান এতদুভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করার উদ্দেশ্য এই স্থানে এটার ব্যবহার করা হয়েছে। رَحْمَةٌ -এটা اُذُنٌ -এর عَطْف বা অন্বয় রূপে مَرْفُوْع আর خَيْرٍ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয় রূপে مَجْرُوْر উভয় রূপে পঠিত রয়েছে।

٦٢. يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فِيْمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُمْ مِنْ اَذَى الرَّسُوْلِ اَنَّهُمْ مَا اَتَوْهُ لِيُرْضُوْكُمْ ج وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ بِالطَّاعَةِ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا وَتَوْحِيْدُ الضَّمِيْرِ لِتَلَازُمِ الرِّضَائَيْنِ اَوْ خَبَرُ اللّٰهِ اَوْ رَسُوْلِهِ مَحْذُوْفٌ -

৬২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা রাসূল ﷺ -কে ক্লেশ দেয় বলে তোমরা যা শুনতে পাও সেই সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে যে, তারা তা করেনি। অথচ এরা যদি সত্যই মুমিন হয়ে থাকে তবে আনুগত্য প্রদর্শন ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক হক রাখেন। يُرْضُوْهُ এই স্থানে مَفْعُوْل বা কর্মবাচক ضَمِيْر বা সর্বনাম ، এক বচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এই স্থানে اَللّٰهُ ও رَسُوْل -এর প্রতি লক্ষ্য করলে দ্বিবচন রূপেই উক্ত সর্বনামটির ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। তবুও তা একবচন রূপে ব্যবহার করার কারণ হলো, আল্লাহ ও রাসূলের যে কোনো একজনের সন্তুষ্টি অন্যজনের সন্তুষ্টির সাথে অব্যশম্ভাবী রূপে বিজড়িত। সুতরাং এই বিষয়ে যেন তাঁরা একই। অথবা বলা যেতে পারে যে اَللّٰهُ কিংবা رَسُوْلُهُ -এর خَبَرْ বা বিধেয় এই স্থানে উহ্য। সুতরাং আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে না।

٦٣. اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهُ اَىِ الشَّاْنُ مَنْ يُّحَادِدِ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ جَزَاءً خَالِدًا فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ -

৬৩. তারা কি জানে না যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি? এই প্রতিফল সেই স্থানে স্থায়ী হবে। তাই চরম লাঞ্ছনা। اَنَّهُ-এটার ضَمِيْر বা সর্বনামটি شَاْن বা অবস্থাব্যঞ্জক। يُحَادّ অর্থ- বিরোধিতা করে।

٦٤. يَحْذَرُ يَخَافُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط مِنَ النِّفَاقِ وَهُمْ مَعَ ذٰلِكَ يَسْتَهْزِءُوْنَ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ج اَمْرُ تَهْدِيْدٍ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مُظْهِرٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ اِخْرَاجَهُ مِنْ نِفَاقِكُمْ -

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে যে, আশঙ্কা করে যে, মুমিনদের নিকট এমন এক সূরা নাজিল না হয়ে যায় যা তাদের অন্তরের মুনাফিকীর কথা ব্যক্ত করে দেবে। এতদসত্ত্বেও তারা আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত। আল্লাহ ইরশাদ করেন, বল, বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর অর্থাৎ তোমাদের মুনাফিকীর কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার যে আশংকা তোমরা কর আল্লাহ তা বের করে দিবেন, প্রকাশ করে দিবেন। اِسْتَهْزِئُوْا অর্থ- বিদ্রূপ করতে থাক। এই اَمْر বা নির্দেশবাচক শব্দটি এই স্থানে تَهْدِيْد বা হুমকি প্রদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٥. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ عَنِ اسْتِهْزَائِهِمْ بِكَ وَالْقُرْاٰنِ وَهُمْ سَائِرُوْنَ مَعَكَ اِلٰى تَبُوْكَ لَيَقُوْلُنَّ مُعْتَذِرِيْنَ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط فِى الْحَدِيْثِ لِنَقْطَعَ بِهِ الطَّرِيْقَ وَلَمْ نَقْصُدْ ذٰلِكَ قُلْ لَهُمْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ -

৬৫. তারা তোমার সাথে তাবুকে যেতেছে এই অবস্থায়ও তোমাকে ও আল কুরআনকে বিদ্রূপ করা সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা কৈফিয়ত হিসেবে নিশ্চয় বলবে, আমরা তো পথের একঘেয়েমী কাটাবার উদ্দেশ্যে এই একটু আলাপ-সালাপ ও ক্রীড়া-কৌতুক করতেছিলাম এই স্থানে প্রকৃত মর্ম আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করতেছিলে?

٦٦. لَا تَعْتَذِرُوْا عَنْهُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اَىْ ظَهَرَ كُفْرُكُمْ بَعْدَ اِظْهَارِ الْاِيْمَانِ اِنْ نَّعْفُ بِالْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ وَالنُّوْنِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ بِاِخْلَاصِهَا وَتَوْبَتِهَا كَمَخْشِيِّ بْنِ حُمَيْرٍ نُعَذِّبْ بِالتَّاءِ وَالنُّوْنِ طَائِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ مُصِرِّيْنَ عَلَى النِّفَاقِ وَالْاِسْتِهْزَاءِ .

৬৬. এই সম্পর্কে তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফরি করেছ। অর্থাৎ বাহ্যত ঈমান প্রকাশের পর তোমাদের কুফরি প্রকাশ পেয়েছে। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে তাদের আন্তরিকতা ও তওবা অনুশোচনার কারণে ক্ষমা করলেও যেমন মাখশী ইবনে হুমাইরকে ক্ষমা করা হয়েছিল অন্য দলকে শাস্তি দিব, কারণ মুনাফিকী ও সত্যকে বিদ্রূপ করার কাজে জেদ ধরে থাকায় তারা অপরাধী। يَعْفُ -এটা ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে পঠিত হলে مَبْنِيَّةٌ لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ কর্মবাচ্যরূপে বিবেচ্য হবে। আর ن সহ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ বহুবচনরূপে হলে مَبْنِيَّةٌ لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য রূপে গণ্য হবে। نُعَذِّبْ -এটাও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গরূপে এবং ن অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ : এখানে اِنَّمَا টা كَلِمَةُ حَصْرٍ এখানে قَصْر مَوْصُوْف عَلَى الصِّفَة -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সদকা তথা জাকাতের খাত শুধুমাত্র উল্লিখিত খাতগুলোই। এগুলো ব্যতীত অন্য গুলো নয়। لِلْفُقَرَاءِ -এর মধ্যেকার لام -এর ব্যাপারে অনেক কথোপকথন হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, لَامٌ টা تَمْلِيْك -এর জন্য। যেমনটি বলেন যে, এটা اِخْتِصَاص এবং اِسْتِحْقَاق -এর জন্য। এর প্রবক্তা হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) اَلْفُقَرَاءُ এবং اَلْمَسَاكِيْن -এর তাফসীরে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হানাফীগণ বলেন যে, ফকির হলো সেই নিঃস্ব ব্যক্তি যে কারো নিকট প্রার্থনা করে না। আর মিসকিন হলো সেই নিঃস্ব ব্যক্তি যে, মানুষের নিকট প্রার্থনা করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, জাবের ইবনে যায়েদ মুজাহিদ যুহরী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ হানীফার উক্তি তাদের উক্তির অনুরূপ। -[জাসসাস]

ফকির ও মিসকিনের ব্যাখ্যায় যতই মতভেদ থাকুক না কেন এতে জাকাতের মাসআলায় কোনোই প্রভাব পড়বে না। মাসআলায় পার্থক্য হবে। যদি শুধুমাত্র ফকিরদের জন্য অসিয়ত করা হয় তবে তারা এর হকদার হবে। আর যদি মিসকিনদের জন্য অসিয়ত করা হয় তবে শুধুমাত্র তারাই এর অধিকারী হবে।

জাকাতের খাত সম্পর্কীয় বিশদ আলোচনা : জাকাতের খাত ৮টি। যথা–

১. ফকির, অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্য তার প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো সম্পদ নেই। এভাবে যে, তার প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে অর্ধেকের কম সম্পদের মালিক হয়। যেমন তার প্রয়োজন একশত টাকার কিন্তু তার নিকট বিশ বা ত্রিশ টাকা রয়েছে।
২. মিসকিন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ নেই। যেমন– তার একশত টাকার প্রয়োজন কিন্তু তার নিকট রয়েছে সত্তর টাকা।
৩. اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا অর্থাৎ জাকাত আদায়ের কর্মচারী যেমন– জাকাত উসুলকারী, হিসাব রক্ষক প্রমুখ।
৪. اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ এমন নও মুসলিম, যাদের হৃদয়ে এখানো ইসলাম সুদৃঢ় হয়নি। অথবা এমন লোক যার মনোতুষ্টির জন্য দেওয়ার কারণে অন্যদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়।
৫. اَلرِّقَابُ অর্থাৎ মুকাতাবকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে।
৬. اَلْغَارِمُ অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে বৈধ সমস্যার সমাধানকল্পে ঋণ নিয়েছে; কিন্তু এখন ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে। অথবা اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ -এর কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যদিও সে ধনী হয়।
৭. اَهْلُ السَّبِيْلِ অর্থাৎ সেই সম্পদশালী ব্যক্তি, যিনি জিহাদে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক।
৮. اِبْنُ السَّبِيْلِ অর্থাৎ মুবাহ সফরের মুসাফির যে, স্বীয় শহর হতে বহুদূরে অবস্থান করছে, কিন্তু তার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। এমন ব্যক্তিকে তার বাড়িতে পৌছার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সে পরিমাণ জাকাত দেওয়া যেতে পারে। -[ই'রাবুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনাফিকরা হুজুর ﷺ -এর প্রতি এই অভিযোগ করেছে যে, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে সদকার অর্থ বিতরণ করেননি। তাই আলোচ্য আয়াতে জাকাত, সদকা বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে। আর সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এর বিতরণ বিধি স্বয়ং আল্লাহ পাকের দ্বারা নির্ধারিত। এমন কি, এতে আল্লাহর নবীরও কোনো এখতিয়ার নেই। এর বিতরণের জন্য আল্লাহ পাক আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐ নির্ধারিত খাতেই জাকাত সদকা বিতরণ করতে হবে।

মুনাফেকদের অভিযোগের মূল কারণ হলো তারা ছিল অর্থলোভী, তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্য তারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অধিক পরিমাণে অর্থ দাবি করতো এবং বলতো, আমাদের চাহিদা মোতাবেক আমাদেরকে দিয়ে দিন। কিন্তু তিনি যখন তাদের চাহিদা মোতাবেক দিতেন না তখন তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করতো। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন যেন একথা সুস্পষ্টভাবে সকলেই জানতে পারে যে, যারা অধিক পরিমাণে অর্থ লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করে তারা সদকার অর্থ লাভের যোগ্যই নয়।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াত দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হলো যে, জাকাত ও সদকার বিতরণ একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই হয়। এতদ্ব্যতীত, জাকাত সদকা প্রিয়নবী ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর বংশীয় লোকজন এমন কি তাঁর আজাদ করা গোলামদের জন্যও হারাম। এমনি অবস্থায় এ ব্যাপারে কোনো প্রকার স্বজন-প্রীতির আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুনাফিকরা হুজুর ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার জন্য এবং তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যেই এমনি বানোয়াট ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট জাকাত ও সদকার যে অর্থ-সম্পদ আসতো তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক বিতরণ করে দিতেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন এ আয়াতের মর্ম হলো একথা প্রকাশ করা যে জাকাত সদকার যোগ্য হলো শুধু মিসকিন কপর্দকহীন লোকেরা, আর ফকির তাকে বলা হবে যে ধনী নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ফকির সেই ব্যক্তি যার নিকট জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো সম্পদ না থাকে। এর দলিল স্বরূপ হযরত মা'আজ (রা.)-এর ঘটনা পেশ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরে আকরাম ﷺ হযরত মা'আজ (রা.)-কে ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, তুমি এমন লোকদের নিকট গমন করছো যারা আহলে কিতাব, সর্বপ্রথম তাদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের জন্যে আহ্বান জানাও, যদি তারা একথা মেনে নেয় তবে তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, যদি তারা একথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জাকাত ফরজ করেছেন যা তাদের ধনী লোকদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দারিদ্রপীড়িত লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে। জাকাতে সর্বোত্তম জন্তুটি নিয়ে নিবে না, মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করতে থাকবে, মজলুমের বদদোয়া সরাসরি আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছে, তার মধ্যে এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোনো বাধা থাকে না।

এ হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, জাকাত গ্রহণকারী মুসলমান হতে হবে, অমুসলিমকে কোনো অবস্থাতেই জাকাত দেওয়া যাবে না।

জাকাতের পাত্র বা ক্ষেত্র আটটি : যথা- ১. ফকির- যার কিছুই নেই, তথা কপর্দকহীন। ২. মিসকিন, যার নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় ধন সম্পদ নেই। ৩. যারা ইসলামি রাষ্ট্রের তরফ থেকে জাকাত উসুল করে। ৪. নওমুসলিম, যাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, জাকাত দেওয়া হয়। ৫. গোলামের মুক্তিপণ আদায়ের জন্য। ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্য। ৭. আল্লাহর রাহে যারা জিহাদ করেন, তাদের সাহায্যার্থে। ৮. পথিক-মুসাফির, যার অর্থ-সম্পদ থাকলেও সঙ্গে নেই, ফলে সে বিপদগ্রস্থ। তবে এদের সকলকে জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে; জাকাত আদায়ের জন্য এটি পূর্বশর্ত।

قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ : আলোচ্য আয়াতে জাকাত প্রদানের জন্যে সর্বপ্রথম ফকিরদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ফকির বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কপর্দকহীন, যাদের কিছুই নেই। এরপর উল্লিখিত হয়েছে মিসকিনের কথা। মিসকিন সে ব্যক্তি যার নিকট কিছু আছে; কিন্তু প্রয়োজন মোতাবেক নেই। ফকির মিসকিন উভয়ই অভাবগ্রস্ত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তবে মিসকিনের চেয়ে ফকিরের অভাব অধিকতর, এজন্যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম ফকিরের নাম উল্লেখ করেছেন, এরপর মিসকিনের।

قَوْلُهُ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا : অর্থাৎ যাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্র জাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত করে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হবে জাকাতের তহবিল থেকে, তবে জাকাত হিসেবে তাদেরকে দেওয়া হবে না; বরং যেহেতু তারা জাকাত আদায়ের খেদমতে নিয়োজিত। তাই এ খেদমতের বিনিময়ে তাদেরকে যথা প্রয়োজনে প্রদান করা হবে আর তাও তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে নয়; বরং তাদের দ্বীনি খেদমতের পুরস্কার হিসেবে।

জাকাত উসুলকারীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে : এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, জাকাত উসুলকারীর কাজ কম হোক বা অধিক সকল অবস্থায় অর্জিত জাকাতের ৮ ভাগের একভাগ তাদের জন্যে ব্যয় করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জাকাতের জন্যে পবিত্র কুরআনে যে ৮টি খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে সমুদয় অর্থ সমান আট ভাগে ভাগ করে আদায় করতে হবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, জাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যে পরিমাণ সময় এ কাজে ব্যয় করেছে সে সময়ের বিনিময় তাকে দেওয়া হবে। কোনো ব্যক্তি জাকাত উসুল করার কাজে একদিন ব্যয় করেছে, এই একদিনের মেহনতের জন্যে যা সমীচীন মনে করা হয় তাই দেওয়া হবে। আর যদি সে এক বছরকাল জাকাতের তহশীল কাজে ব্যয় করে সে এক বছরে যা তার প্রাপ্য বিবেচিত হয় তা দেওয়া হবে। কেননা জাকাতে ধনীদের কোনো অংশ নেই, জাকাত ফকিরদের হক, তাই ফকিরদের হক থেকে তাকে যা দেওয়া সমীচীন মনে হবে তাই দেওয়া হবে। যদি জাকাত হিসেবে যা সে উসুল করেছে, সে সমুদয় অর্থই তার প্রাপ্য হয় তবে সম্পূর্ণ অর্থ তাকে দেওয়া হবে না, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত; তাকে অর্ধেক দেওয়া হবে। অর্ধেক থেকে একটু বেশিও দেওয়া হবে না। যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় তবে এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হবে যে, সে ফকিরদের জন্যে নয়; বরং নিজের জন্যেই উসুল করেছে আর এভাবে আসল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ : অর্থাৎ সে নওমুসলিম যারা ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু এখনো ইসলামের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল এবং যেহেতু তারা দারিদ্র পীড়িত, এজন্য তাদেরকে জাকাত থেকে দেওয়া হয় যেন ইসলামের উপর কায়েম থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে হুজুর ﷺ -এর ইন্তেকালের পথের 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূবে'র অংশ বাতিল হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, জাকাতের এ ক্ষেত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৬০, তাফসীরে কুরতুবী খ. ৮, পৃ. ১৮১]

অবশ্য নওমুসলিম যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে ফকির মিসকিন হিসেবে তাকেও জাকাত দেওয়া যেতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জাকাত উসুলকারী ব্যক্তিদের ছাড়া অবশিষ্ট সকল খাতেই জাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের অভাবগ্রস্ত হওয়া পূর্বশর্ত।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' অর্থাৎ যাদেরকে চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তারা দু' প্রকার। যথা– মুসলমান ও কাফের। যারা মুসলমান তাদেরকেও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু গ্রহণের সময় ঈমান দুর্বল ছিল। যেমন উয়াইনা ইবনে বদর ফাজারী, আকরা ইবনে হাবেছ এবং আব্বাস ইবনে মারদাস। ২. সেই মুসলমান ইসলাম গ্রহণের সময় যাদের ঈমান মজবুত ছিল; কিন্তু তারা তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। দলের মধ্যে কিছু দুর্বল ঈমানের লোক ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় দলকেই দান করতেন। প্রথম দলকে তাদের ঈমান মজবুত করার জন্য, দ্বিতীয় দলকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে। যেমন– হযরত আদী ইবনে হাতেম এবং হযরত জরকান ইবনে বদরকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বিভিন্ন সময় অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। তবে তিনি তাদেরকে জাকাতের তহবিল থেকে দান করেনি; বরং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে দান করেছেন, আর কাফেরদের থেকে অর্জিত সম্পদের যে অংশটুকু হুজুর ﷺ -এর জন্যে সংরক্ষিত থাকত, তা থেকেও তিনি এমন সব লোকদেরকে দান করতেন।

মুয়াল্লাফাতুল কুলূবের আরেকটি শাখা হলো, সেই মুসলমান, যাদের এলাকায় মুসলমান সৈন্য কাফেরদের মোকাবিলার জন্যে পৌঁছেছে, আর স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্য ব্যতীত মুজাহিদগণ অগ্রসর হতে পারেন না। অথচ অভাব অনটনের কারণে অথবা ঈমানের দুর্বলতার কারণে স্থানীয় মুসলমানগণ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। এমন অবস্থায় মুসলিম শাসনকর্তার জন্যে ইসলামি শরিয়ত অনুমতি দেয় যে, মুজাহিদদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ থেকে এবং মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের জাকাতের অংশ থেকে ঐ মুসলমানদের দান করবেন।

বর্ণিত আছে যে, হযর আদী ইবনে হাতেম তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে জাকাত বাবদ তিনশত উষ্ট্র নিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেদমতে হাজির হন। হযরত আবূ বকর (রা.) তন্মধ্য ৩০ টি উষ্ট্র তাকে দান করেন। অমুসলিম মোয়াল্লাফাতুল কুলূব বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তরফ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অথবা যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়। ইমামুল মুসলিমীনের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তাদেরকে কিছু দিয়ে দিতে পারেন যেন তাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। অথবা তাদের মুসলমান হওয়ার আশা পূর্ণ হয়। এমন লোকদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দান করেছেন। যেমন– সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট দেখে তাকে দান করেছিলেন।

কিন্তু এখন আর অমুসলিমকে এমননিভাবে জাকাত সদকা প্রভৃতি থেকে দান করা বৈধ নয়। আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। অতএব, বর্তমান অবস্থায় এমন পন্থা গ্রহণের অনুমতি নেই। এজন্যে ইকরিমা, শাবী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মুয়াল্লাফাতুল কুলূবের অমুসলিম খাঁত সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে।

ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, যদি কোনো এলাকায় বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় মুসলমানগণ চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে কোনো কাফেরকে অর্থ-সম্পদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে জাকাতের খাত থেকে দেওয়া যেতে পারে যদি এর যুক্তিসঙ্গত কারণ সৃষ্টি হয়। ইমাম আহমদও (র.) এই মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে আর ইসলাম গ্রহণের সময় তার ঈমান দুর্বল ছিল অথবা এমন প্রভাবশালী লোক, যাকে কিছু দিলে অন্যরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে তবে এমন লোকদেরকে জাকাতের অর্থ দেওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ وَفِى الرِّقَابِ : অর্থাৎ গোলাম বাঁদিদেরকে আজাদ করার জন্যে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। ইমাম আবূ হানিফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) এ মতই পোষণ করতেন। মোকাতাব অর্থাৎ যে গোলাম বাঁদিকে তার মালিক মুক্তি দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করার শর্তারোপ করে এমন ব্যক্তি অর্থ লাভ করলে আজাদ হতে পারে। তাই ইসলামি শরিয়ত এমন লোককে জাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করার বিধান পেশ করেছে। এমন কি যদি তার কাছে অর্থ সম্পদ থাকেও; কিন্তু তার মুক্তি লাভের জন্য তা যথেষ্ট না হয় এমন অবস্থায় তাকে জাকাতের অর্থ দিয়ে তার মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, নিজের জাকাতের টাকা দিয়ে বাঁদি গোলাম ক্রয় করে আজাদ কর। মায়মূন (র.) বর্ণনা করেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, যদি কেউ তারা জাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে আজাদ করে অথবা মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করে তবে তার কি হুকুম? আবূ আব্দুল্লাহ বলেন, তা জায়েজ আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই মত পোষণ করতেন। আর এর বিরোধিতা করার কোনো কারণ নেই।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, জাকাতের টাকা দিয়ে যে বাঁদি গোলামকে আজাদ করা হয় তার হক্ব মুসলমানদের হবে অর্থাৎ এই আজাদ করা গোলামের মৃত্যুর পর তার যদি কোনো ওয়ারিশ না থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মাল তথা ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে। اَلرِّقَابُ-এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের আরো একটি অভিমত রয়েছে, জাকাতের সম্পদের যে অংশটুকু এ পর্যায়ে ব্যয় হবে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্ধেক মুসলিম মোকাতাবেদের মুক্ত করার কাজে ব্যয় হবে, আর অর্ধেক দ্বারা মুসলিম গোলাম বাঁদিদের ক্রয় করে আজাদ করা হবে। ইবনে আবি হাতেম এবং 'কিতাবুল আমওয়ালে' আল্লামা আবূ ওবায়েদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম জুহরী (র.) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে এ কথাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন মোকাতাব তাকে সম্বোধন করে বলল, আমার মুক্তি লাভের জন্যে অর্থ সম্পদ সাহায্যের আবেদন করুন, তিনি আবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা দান করতে লাগল। কেউ মাথার পাগড়ি দিয়ে দিলেন, কেউ হার, কেউ আংটি কেউ নগদ। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক

কিছু জমা হয়ে গেল। হযরত মূসা আশ'আরী (রা.) সবকিছু একত্র করে বিক্রি করে দিলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ মোকাতাবের মুক্তিপণ আদায় করলেন। আর অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা গোলাম বাঁদি ক্রয় করে মুক্ত করলেন।

قَوْلُهُ وَالْغَارِمِيْنَ : অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের জন্য। ওলামায়ে কেরাম এ শব্দটির এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ ঋণগ্রস্তদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. সেই ঋণগ্রস্ত, যে ঋণ নিয়ে পাপকর্মে ব্যয় করেনি, এমন ঋণগ্রস্ত লোকের নিকট যদি ঋণ আদায়ের টাকা না থাকে তবে ঋণ আদায়ের পরিমাণ জাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যেতে পারে। ২. সেই ঋণগ্রস্ত, যে ঋণ গ্রহণ করে কোনো নেক কাজে বা মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করার কাজে ব্যয় করেছে সে ব্যক্তিগতভাবে ধনী হলেও তার ঋণ জাকাতের খাত থেকে আদায় করা যেতে পারে। ৩. সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে পাপাচারে ব্যয় করার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছে, অথবা অপচয়ের জন্য, এমন ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্য জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যদি ঋণ আদায়ের জন্য টাকা না থাকে সে যেমনই হোক না কেন তাকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। ইমাম আযম (র.) বলেছেন- اَلْغَارِمِيْنَ শব্দটির মধ্যে এমন কোনো শর্ত আরোপের ব্যবস্থা নেই। اَلْغَارِمِيْنَ অর্থ- ঋণগ্রস্ত। ঋণগ্রস্ত নেককার কি বদকার এমন কোনো শর্ত কুরআনে কারীমে নেই।

অনুরূপ মতভেদ ইমাম আযম (র.) এবং অন্য ইমামদের মধ্যে সফরের মাসায়েল সম্পর্কেও রয়েছে। সফর তিন প্রকার হতে পারে। যথা- ১. নেককাজের জন্য ২. বৈধ কাজের জন্য। ৩. পাপকর্মের জন্য সফর। মুসাফিরের জন্য নামাজের কসর করা এবং রোজা কাজা করার যে সুযোগ রয়েছে অন্য ইমামদের মতে প্রথম দুই প্রকার সফরকারী তা ভোগ করবে। যার সফর গুনাহর কাজে হয় সেই মুসাফির এই সুযোগ ভোগ করবে না। কিন্তু ইমাম আযম (র.) বলেন, সকল মুসাফিরই এই সুযোগ ভোগ করবে।

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট তার ঋণ আদায়ের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক টাকা থাকে তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, এমন ব্যক্তিকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি ছওয়াবের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে আর তার নিকট ঋণ আদায়ের টাকাও থাকে তবুও তাকে জাকাতের টাকা দেওয়া যেতে পারে।

قَوْلُهُ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ : যারা আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য বের হন তাদেরকেও জাকাতের টাকা দেওয়া যেতে পারে। আর কারো নিকট বাড়িতে অর্থ-সম্পদ আছে; কিন্তু সে ভ্রমণরত অবস্থায় থাকার কারণে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। তার কাছে এমন টাকা নেই যার দ্বারা সে বাড়ি পৌঁছতে পারে, এমন ব্যক্তিকে اِبْنُ السَّبِيْلِ বলা হয়। আর এমন ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া যায়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, জাকাতের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দারিদ্র। যেখানে দারিদ্র থাকে সেখানেই জাকাতের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়; শুধু যারা জাকাত উসুল করে তারা এর ব্যতিক্রম। কেননা তাদের ব্যাপারে দরিদ্র হওয়া শর্ত নয়। তবে তারা দরিদ্রদের প্রতিনিধি আর প্রতিনিধি জাকাতের খাত থেকে নিজেদের অংশ গ্রহণ করে।

জাকাত প্রদানের ব্যাপারে প্রাধান্য কার? মূলত কপর্দকহীন ব্যক্তিই জাকাতের উপযুক্ত। এজন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ফকিরদের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য যারা জাকাতের যোগ্য তাদের ব্যাপারে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার বিধানও আছে। যেমন যে মিসকিন কারো নিকট কিছু চায় না তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সেই মিসকিনের উপর যে ভিক্ষা করে বেড়ায় এমনিভাবে মুসাফির ফকিরকে বাড়ি ঘরে অবস্থানকারী ফকিরের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

ঠিক এমনভিাবে গোলামকে আজাদ করার জন্যে ব্যয় করার মাধ্যমে অনেক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। এমনিভাবে আত্মীয়তার বন্ধনও প্রাধান্য দেওয়ার একটি কারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম সদকা হচ্ছে যা প্রদানের পর কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না আর দান খয়রাত শুরু করো তোমরা আপন পরিবারবর্গ থেকে। -[সহীহ বুখারী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি দিনার হলো এমন যা তুমি আল্লাহ রাহে ব্যয় করেছ, আর একটি দিনার তুমি গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে ব্যয় করেছ, আর একটি দিনার তুমি কোনো মিসকিনকে দান করেছে, আর একটি দিনার তুমি তোমার পরিবারভুক্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। সর্বাধিক ছওয়াব সেই দিনারটির জন্য হবে যা তুমি তোমার পরিবারভুক্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। -[সহীহ মুসলিম]

হযরত মায়মূনা বিনতে হারেস বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ -এর যুগে আমি বাঁদি আজাদ করেছিলাম। আমি হুজুর ﷺ -এর দরবারে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি যদি তোমার মামাদেরকে দিতে তবে অনেক ছওয়াব হাসিল করতে। -[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত সুলায়মান ইবনে আমের বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, মিসকিনকে খয়রাত দেওয়া একটি খয়রাত, আর আত্মীয়-স্বজনকে দানের মাধ্যমে দু'টি খয়রাত হয়। একটি [সাধারণ খয়রাত] আরেকটি হলো আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা।

-[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

হযরন আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ তালহা (রা.) আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেরোহা [এর বাগান] আমার সর্বাধিক পছন্দনীয় সম্পত্তি, আর এ বাগানটি আমি আল্লাহর রাহে দান করছি। আমি আশা করি, এর নেকী আমার জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট সঞ্চিত থাকবে। এখন আপনি আল্লাহর পাকের নির্দেশ মোতাবেক তা বিতরণ করুন। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আমি সমীচীন মনে করি যে, তুমি বাগানটি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দান কর। হুজুর ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবূ তালহা (রা.) বাগানটি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইয়ের মাঝে বিতরণ করে দেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পিতা তার সন্তাদেরকে এবং সন্তান তার পিতা মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে জাকাত দিতে পারে না। কেননা জাকাতের জন্যে শর্ত হলো জাকাত গ্রহীতাকে মালিকানা প্রদান করা আর উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে মালিকানা যৌথ থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রদেয় জাকাতের মালিকানা শুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সম্পদ একজনের মালিকানা থেকে বের হয়ে অন্যজনের মালিকানায় পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে না। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।" তবে এ ছাড়া অন্য আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া যায়; বরং আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া উত্তম। কেননা এতে আত্মীয়তার হক্ব আদায় হয়, এর পাশাপাশি দান করাও হয়। এজন্য ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা সকলকেই জাকাত দেওয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করে অথচ কাজী তার প্রতি এ দায়িত্ব অর্পণ করেনি, এমন অবস্থায় সে যদি ঐ দরিদ্র আত্মীয়ের ব্যাপারে সমস্ত ব্যয় জাকাতের নিয়তে করে তবে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কাজী যদি ঐ ব্যক্তির ব্যয়ভারের দায়িত্ব সম্পদশালী লোকটির উপর অর্পণ করে আর সে তাকে লালন পালন করে তবে এমন ক্ষেত্রে তার ব্যাপারে প্রদেয় খরচ জাকাত হিসেবে আদায় হবে না। কেননা কাজী বা বিচারক যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার উপর আমল করা একটি কর্তব্য, আর জাকাত আদায় কবা আরেকটি কর্তব্য। একটি কর্তব্যের মাধ্যমে আর একটি কর্তব্য আদায় করা সম্ভব নয়।

ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, এমন আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নয়, যাদের লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় জাকাতদাতাদের প্রতি, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত যে, যৌথ মালিকানা জাকাত আদায়ের ব্যাপারে বাঁধাস্বরূপ, তবে তাঁরা একখানি হাদীসের অনুসরণে এ মত পোষণ করেন। হযরত যয়নব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর ﷺ -কে মসজিদে দেখলাম, তিনি ইরশাদ করছিলেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকা দিতে থাক এমন কি, যদি নিজের অলংকার দিয়ে হয় তবুও। আমি [আমার স্বামী] আব্দুল্লাহর ব্যয়ভারও বহন করতাম এবং কিছু এতিমের দায়িত্ব আমার উপর ছিল। আমি আব্দুল্লাহকে বললাম, আপনি হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করুন যয়নব আব্দুল্লাহর এবং কিছু এতিমের প্রতি যে ব্যয় করে তা দ্বারা কি তার জাকাত আদায় হবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, তুমি নিজেই হুজুর ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি তাঁর নিকট হাজির হলাম। সেখানে গিয়ে আরেকজন আনসারী মহিলাকে পেলাম, তারও একই সমস্যা। এমন সময় হযরত বেলাল (রা.)-কে অতিক্রম করতে দেখলাম। আমি তাঁকে বললাম, হুজুর ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি আমার স্বামী এবং যেসব এতিমদেরকে লালন পালন করি তাদেরকে যদি আমার সম্পদের সদকা দান করি তবে তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? কিন্তু আমাদের নাম বলবেন না। হযরত বেলাল (রা.) হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে মাসয়ালা জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুজন মহিলা কে? হযরত বেলাল (রা.) আরজ করলেন, একজন যয়নব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন যয়নব? হযরত বেলাল (রা.) আরজ করলেন, আব্দুল্লাহর স্ত্রী। তখন তিনি ইরশাদ করলেন হ্যাঁ, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব হবে। একটি আত্মীয়তার জন্য আর অপরটি সদকার জন্য।

প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর আল-আওলাদের জন্য জাকাত সদকা হারাম : এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর আল-আওলাদের জন্য জাকাত সদকা অবৈধ ছিল এমন কি, তাঁর খান্দান বনী হাশেমের জন্যও জাকাত হারাম ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ -এর খেদমতে কোনো খাবার পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, এগুলো হাদিয়া নাকি সদকা? যদি বলা হতো সদকা, তখন তিনি ইরশাদ করতেন, তোমরা খাও। তিনি নিজে সেগুলো গ্রহণ করতেন না, আর যদি বলা হতো হাদিয়া, তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং সাথীদের সাথে নিজেও আহার করতেন। এমনিভাবে তাঁর পরিবারবর্গের জন্যও সদকা হালাল ছিল না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) একটি সদকার খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন হুজুর ﷺ সঙ্গে সঙ্গে তা মুখ থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন, "আমরা সদকা খেতে পারি না" আর এমনিভাবে হুজুর ﷺ -এর খানদান তথা বনী হাশেমের জন্য জাকাত হারাম ছিল অন্তর্ভুক্ত। বনী হাশেমের মধ্যে আলে-আলী, আলে-আব্বাস, আলে-জাফর, আলে-আকীল, আলে-হারেস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব অন্তর্ভুক্ত। এই মত হলো ইমাম আযম (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বনী মোত্তালিবও বনূ হাশেমের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, প্রিয়নবী ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ থেকে নিকটাত্মীয় হিসেবে বনী মোত্তালিবকেও অংশ দান করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বনী হাশেমের গোলামদের জন্য জাকাত হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের জন্য সদকা হালাল নয় এবং কোনো সম্প্রদায়ের গোলামও ঐ সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

−[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ৩৪১]

একটি রহস্য : জাকাতের খাত হলো আটটি। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ আটটি খাতের উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথম চারটি খাতকে 'আলিফ লাম' দ্বারা সুনির্দিষ্ট করেছেন আর পরের চারটি খাতে 'আলিফ লামের স্থলে فِيْ অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ এই প্রথম চারটি খাত তথা لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ ফকির, মিসকিন এবং জাকাত তহশীলের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী আর যাদের চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্যে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, এ চারটি দল লোক জাকাতের হকদার, তাই হকদার হিসেবে তাদেরকে 'আলিফ লাম' দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আর এরপর যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে কি কারণে জাকাত দেওয়া হবে তা فِيْ অব্যয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যেমন গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করা ও ঋণের বোঝা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা ও অসহায় পথিক মুসাফিরের সফর সম্পূর্ণ করা। এসব কারণে তারা জাকাত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এসব কারণ না থাকলে তারা জাকাত লাভের যোগ্যতা হারাবে। পক্ষান্তরে, ফকির মিসকিন, জাকাত তহশীলদার এবং যাদেরকে তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য জাকাত প্রদান করা হয়, তারা প্রকৃত পক্ষেই জাকাত লাভের যোগ্য।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ الخ : আয়াতে এ খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে থাকেন তারই একটি হলো গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা, যখন কিছু মুনাফিক মহানবী ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে অবহিত করে সে পথ থেকে সরিয়ে দেন, যেখানে মুনাফিকরা এ কাজের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল।

−[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সত্তর জন মুনাফিকের নাম, তাদের পিতৃপরিচয় ও পূর্ণ ঠিকানা-চিহ্নসহ বাতলে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাহমাতুললিল আলামিন তা লোকদের সামনে প্রকাশ করেননি। −[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ : অর্থাৎ হে রাসূল! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন হবে তারা বলবে, আমরা তো শুধু কথাবার্তা বলছিলাম এবং শুধু তামাশা করছিলাম। আপনি বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করছিলে।

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল আমরা এই কুরআন পাঠকদের ন্যায় আর কাউকে দেখিনি, যারা খাওয়ার প্রতি লোভী, মিথ্যাবাদী এবং ভীরু। একজন মুসলমান একথা শ্রবণ করে বললেন, তুই মিথ্যা কথা বলেছিস, তোর এ কথার খবর আমি হুজুর ﷺ -এর কাছে পৌছাব। এরপর হুজুর ﷺ -এর কাছে এ খবর পৌছে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, ঐ সাহাবী হুজুর ﷺ -কে সংবাদ দেওয়ার পূর্বেই এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (র.) লিখেছেন, শুরাইহ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদ (রা.)-কে বলেছিল, হে কোরআন পাঠকের দল! এর কি কারণ যে, তোমরা আমাদের চেয়ে অধিকতর ভীরু, তোমাদের কাছে কিছু চাওয়া হলে তোমরা কার্পণ্য কর, আহার করার সময় বড় বড় লোকমা ধর। হযরত আবুদ দারদা (রা.) তার দিক থেকে মু ফিরিয়ে নিলেন, কোনো জবাব দিলেন না এবং হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে এই খবর দিলেন। হযরত ওমর (রা.) ... লোকটিকে তার গলায় কাপড় পেচিয়ে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে হাজির করলেন। সে বলল, আমরা শুধু গল্প গুজবের স্থলে এসব বলেছি।

ইবনে জারীর কাতাদার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েক জন মোনাফেক তাবুকের যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করে বলে, এই লোকটি কি মনে করেছে যে, আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা যত সহজ সিরিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কি তত সহজ হবে ? তারা বলেছে, আমরা মনে করি আমরা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী দেখবো। আল্লাহ পাক তাদের এ কথা প্রিয়নবী ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন। প্রিয়নবী ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এমন কথা বলেছিলে? তারা বলল, আমরা গল্পগুজব করছিলাম এবং নিতান্ত খেলার ছলেই এমন কথা বলেছিলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল কালবী, মোকাতিল এবং কাতাদার মতানুসারে এভাবে লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুক অভিযানে গমন করছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে তিনজন মুনাফিকও চলছিল। যাদের মধ্যে দু'জন পবিত্র কুরআন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করছিল আর তৃতীয় ব্যক্তি উপহাস করে হাসছিল।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীরা মনে করেন যে, কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ এটিতে তাঁরই কথা, আল্লাহ পাক তাদের এসব কথা প্রিয়নবী ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন এই উষ্ট্রের আরোহীদেরকে আমার নিকট নিয়ে আস যখন তারা হাজির হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এমন কথা বলেছিলে? তখন তারা বলল, আমরা নিতান্ত গল্প গুজবের স্থলেই এসব কথা বলেছি, আমরা মূলত এসব কথায় বিশ্বাস করি না। –[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ১২২ তাফসীরে মাজহারী খ. ৫, পৃ. ৩৫০-৫১]

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ : অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহ পাক ও তাঁর নিদর্শনসমূহের সঙ্গে বিদ্রূপ করছিলে, বিদ্রূপ বা তামাশার জন্য তোমরা আর কোনো স্থান পাওনি অতএব, মিথ্যা ওজর আপত্তি করোনা, টালবাহানা করো না, নিজেদেরকে নির্দেশ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিবে না।

قَوْلُهٗ إِنْ نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ : যদি আমরা তোমাদের কিছু লোককে ক্ষমাও করি, কিন্তু কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দেব, কেননা, তারা ছিল অপরাধী। অর্থাৎ খাঁটি তওবা করার কারণে, নিয়ত সঠিক হওয়ার জন্য কিছু লোককে মাফ করা হবে। কিন্তু অন্য মুনাফিকরা খাঁটি তওবা করেনি, অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে। কেননা তারা মুনাফেকীর, প্রিয়নবী ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার, প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্রূপ করার ন্যায় জঘন্য অপরাধে অপরাধী, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেছেন, মখশী ইবনে হুমাইর আশ'আরীর অপরাধ মাফ করা হয়েছে। মখশী মুনাফিকদের সাথে মিলে-মিশে হাসতো। নিজে কোনো মন্তব্য করতো না এবং অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়ে চলাফেরা করতো; বরং মুনাফিকদের কোনো কোনো কথা অপছন্দ করতো, যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন সে মুনাফিকী থেকে তওবা করে এবং দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি এমন আয়াত শ্রবণ করছি যার কারণে আমার নয়ন-মন শীতল হয়। হে আল্লাহ! তোমার পথে আমাকে প্রাণ উৎসর্গ করার তাওফীক দান কর, যেন কেউ আমাকে গোসল না দেয় কাফনও না পরায়। [তাঁর এই দোয়া কবুল হয়েছিল, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন, আর কেউ জানতে পারেনি যে, তিনি কোথায় শহীদ হয়েছেন এবং কোথায় দাফন হয়েছেন।

মখশী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নাম পরিবর্তন করে দিন যেন কুফরি যুগের নামও তাঁর নিকট অপছন্দনীয় ছিল। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর নামকরণ করেছিলেন আব্দুর রহমান বা আব্দুল্লাহ।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ৩৫৩]

অনুবাদ :

٦٧. اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ـ اَىْ مُتَشَابِهُوْنَ فِى الدِّيْنِ كَاَبْعَاضِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ الْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط عَنِ الْاِنْفَاقِ فِى الطَّاعَةِ نَسُوا اللّٰهَ تَرَكُوْا طَاعَتَهُ فَنَسِيَهُمْ ط تَرَكَهُمْ مِنْ لُطْفِهِ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

৬৭. মুনাফিক নরনারী একজন অন্যজন হতে অর্থাৎ একই বস্তুর অঙ্গসমূহের মতো এরাও ধর্মের ব্যাপারে একজন অপরজনের অনুরূপ। এরা অসৎকর্মের অর্থাৎ কুফরিও অবাধ্যতার নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্যের কাজ হতে নিষেধ করে। আর আনুগত্যে ও বন্দেগীর কাজে অর্থ ব্যয় করা হতে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে ফলে তিনিও তাদেরকে বিস্মৃত হয়ছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ হতে এদেরকে বাদ দিয়েছেন। মুনাফিকরা তো সত্যত্যাগী।

٦٨. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط هِىَ حَسْبُهُمْ ج جَزَآءً وَعِقَابًا وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ج اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ دَائِمٌ ـ

৬৮. আল্লাহ মুনাফিক নর-নারী এবং কাফেদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির। সেথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের শাস্তি ও পরিণাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তাঁর রহমত হতে এদেরকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শাস্তি।

٦٩. اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُوْنَ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْآ اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ط فَاسْتَمْتَعُوْا تَمَتَّعُوْا بِخَلَاقِهِمْ نَصِيْبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُوْنَ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ فِى الْبَاطِلِ وَالطَّعْنِ فِى النَّبِىِّ ﷺ كَالَّذِىْ خَاضُوْا ط اَىْ كَخَوْضِهِمْ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

৬৯. হে মুনাফিকবৃন্দ! তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো। তারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পত্তিও ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক। তারা দুনিয়ার যা তাদের হিস্যায় ছিল ভাগ্যে ছিল তা ভোগ করেছে। اِسْتَمْتَعُوْا অর্থ– তারা ভোগ করেছে। হে মুনাফিকগণ! তোমাদের ভাগ্যে যা আছে তোমরাও তা ভোগ করলে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের ভাগ্যে যা ছিল ভোগ করেছে। তোমরাও বাতিল, অসত্য এবং রাসূল ﷺ -এর দোষারোপ বিষয়ে এমন মগ্ন হয়েছ যেমন তারা মগ্ন হয়েছিল। অর্থাৎ এই বিষয়ে তাদেরই মতো তোমাদের বর্তমান মগ্নতা। তাদেরই কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০. اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ خَبَرُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ وَّثَمُوْدَ لا قَوْمِ صَالِحٍ وَقَوْمِ اِبْرَاهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ قَوْمِ شُعَيْبٍ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ اَىْ اَهْلُهَا اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج بِالْمُعْجِزَاتِ فَكَذَّبُوْهُمْ فَاُهْلِكُوْا فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ بِاَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَّلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِارْتِكَابِ الذُّنُوْبِ -

৭০. তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ অর্থাৎ হযরত হুদের সম্প্রদায় ও সামুদ জাতি অর্থাৎ হযরত সালেহের কওম ইবরাহীমের সম্প্রদায়, মাদ্ইয়ান অধিবাসী অর্থাৎ হযরত শুয়াইবের সম্প্রদায় ও বিধ্বস্ত নগরের অর্থাৎ হযরত লূতের সম্প্রদায়ের জনপদসমূহের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের নিকট আসেনি? তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ মুজেযাসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। অনন্তর এরা তাঁদেরকে অস্বীকার করে। ফলে, তারা ধ্বংস হয়। আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করার নন। তিনি এমন নন যে, বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। বরং পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতি জুলুম করতেছিল। نَبَاُ অর্থ– সংবাদ।

৭১. وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ لَا يُعْجِزُهٗ شَىْءٌ عَنْ اِنْجَازِ وَعْدِهٖ وَوَعِيْدِهٖ حَكِيْمٌ لَا يَضَعُ شَيْئًا اِلَّا فِىْ مَحَلِّهٖ -

৭১. মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকর্ম হতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্র রহমত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী। তার প্রতিশ্রুতি পূরণে বা হুমকির বাস্তবায়নে কেউ তাকে অক্ষম করতে পারবে না, প্রজ্ঞাময় সুতরাং সকল জিনিসকে তিনি যথাস্থানেই স্থাপন করেন।

৭২. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط اِقَامَةٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

৭২. মুমিন নর ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই বড় এটাই সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ এবং তা-ই মহা সাফল্য। عَدْنٍ অর্থ– চিরস্থায়ী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ : এখানে بَعْضُهُمْ হলো মুবতাদা আর مِنْ بَعْضٍ হলো তার খবর। আর مِنْ হলো اِتِّصَالِيَّة

قَوْلُهُ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ : এখানে قَبْض يَد দ্বারা কৃপণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাস্তবিক মুষ্ঠিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। মুফাসসির (র.) عَنِ الْاِنْفَاقِ فِى الطَّاعَةِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ تَرَكُوْا اِطَاعَتَهُ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, نِسْيَانٌ-এর উপরে কারো থেকে مُوَاخَذَه হয় না এবং نِسْيَانٌ-টা তিরস্কারের যোগ্যও নয়। কেননা এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এরপরও একে তিরস্কারের স্থানে কেন উল্লেখ করলেন?

উত্তর. এখানে এবং পরবর্তী স্থানে نِسْيَانٌ দ্বারা তার লাযেমী অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা نِسْيَانٌ-এর জন্য تَرْك আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা ভুলিয়ে দেওয়া অর্থ হলো স্বীয় বিশেষ রহমত হতে বঞ্চিত করে দেওয়া।

قَوْلُهُ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُنٰفِقُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্যাংশটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب নয়। কেননা এই সুরতে বহু উহ্য থাকা আবশ্যক হবে। অথচ উহ্য থাকার ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ থাকাই অধিক উত্তম।

قَوْلُهُ نَصِيْبِهِمْ : এতে خَلَاقٌ-এর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এটা خَلْق হতে নির্গত। যার অর্থ হলো তাকদীর বা ভাগ্যলিপি।

প্রশ্ন. فَكَذَّبُوْهُمْ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ফায়দা কি?

উত্তর. যাতে করে فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ-এর আতফ فَاء تَعْقِيْبِيَّه-এর মাধ্যমে বৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِقَامَةٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَدْنٍ অর্থ হলো خُلُوْد কাজেই تَكْرَار-এর প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

قَوْلُهُ رِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ : رِضْوَانٌ-এর মধ্যে تَنْوِيْن تَنْكِيْر হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সামান্য সন্তুষ্টি ও বিরাট বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَاتُ بَعْضُهُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুরাত্মা মুনাফিকদের ছলচাতুরী এবং দূরভিসন্ধির বিবরণ ছিল, আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন কপটচিত্ত সকল মুনাফিক কি নারী কি পুরুষ সকলে আল্লাহর নাফরমানি এবং অবাধ্যতায় একই প্রকার। যে মন্দ আচরণ তাদের পুরুষের মধ্যে রয়েছে তা তাদের নারীদের মধ্যেও রয়েছে। তারা মুখে ইসলামের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু ইসলামের ক্ষতি সাধনে সর্বদা তৎপর থাকে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাদের এই যে, মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে এবং ভালো কাজে বাধা দেবে অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে শিরক করার এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সৎকাজে বাঁধা দিয়ে থাকে যেমন তারা বলে, গরমে জিহাদে যেয়ো না।

এ আয়াতে মুনাফিকদের একটি দাবির মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়েছে। তারা মুসলমানদেরকে বলত, আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ অর্থাৎ "আর তারা তোমাদের মধ্যে থেকে নয়।" বরং মুনাফিকরা পরস্পর একে অন্যের অনুরূপ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনো মিল হতেই পারে না, মুনাফিকরা পুরুষ হোক কি নারী মুনাফিকীতে তারা এক ও অভিন্ন। তাদের আরেকটি অন্যায় আচরণ হলো তারা কৃপণ।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে মুনাফিকদের একটি অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ অর্থাৎ "তারা নিজেদের হাতকে বন্ধ করে রাখে।" তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাত বন্ধ রাখার অর্থ জিহাদ বর্জন ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ-এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তারা যখন আল্লাহকে ভুলে গেছে, তখন আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ ভুল বা বিস্মৃতির দোষ থেকে পাক। কাজেই এখানে এর মর্ম এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামকে এমনভাবে বর্জন করেছে যেন একবারে ভুলেই গেছে, তাই আল্লাহ তা'আলাও আখিরাতের ছওয়াবের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, নেকী ও ছওয়াবের তালিকায় তাদের নাম থাকেনি।

৬৯ তম আয়াত– كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ; এক তাফসীর অনুযায়ী এতে মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে যেমনটা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় তাফসীর মতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। [অর্থাৎ اَنْتُمْ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ] মর্ম

এই যে, তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরই মতো। তারা যেমন পার্থিব ভোগ-বিলাসে মজে গিয়ে আখিরাতকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছিল এবং নানাবিধ পাপ ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে তোমরাও তাই করবে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তোমরাও সে পন্থা অবলম্বন করবে যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা করেছে- হাতের মধ্যে হাত, বিঘতের মধ্যে বিঘত। অর্থাৎ হুবহু তাদের নকল করবে। এমন কি তাদের মধ্যে যদি কেউ গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও ঢুকবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এই হাদীসের সত্যায়নকল্পে যদি তোমাদের মন চায়, তবে কুরআনের كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াত পাঠ করে নাও। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ অর্থাৎ আজকের রাতটির গত রাতের সাথে কতই না মিল রয়েছে এবং এর সাথে কতই না সামঞ্জস্যশীল! ওরা ছিল বনী ইসরাঈল, আমাদেরকে তাদের তুলনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হাদীসের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট যে, শেষ জমানার মুসলমানরাও ইহুদি-নাসারাদেরই মতো পথ চলতে আরম্ভ করবে। আর মুনাফিকদের আজাবের বর্ণনার পরে এ বিষয়টির আলোচনায় এ ইঙ্গিতও বোঝা যায় যে, ইহুদি-নাসারাদের মত ও পথের অনুসারী মুসলমান তারাই হবে যাদের অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান নেই। নেফাকের জীবাণু তাদের মধ্যে বিদ্যমান। উম্মতের সৎলোকদের তা থেকে বাঁচার জন্য এ আয়াতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের অবস্থা তাদের ষড়যন্ত্র ও কষ্ট দেওয়া এবং সেজন্য তাদের আজাবের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কুরআনের বর্ণনারীতি অনুযায়ী এখানে নিষ্ঠাবান মুমিনদের অবস্থা এবং তাদের ছওয়াবের বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত। কাজেই আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাই বিবৃত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে মুনাফিকীন ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু একটি জায়গায় মুনাফিকদের বেলায় بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ বলা হলেও এর তুলনা করতে গিয়ে মুমিনদের আলোচনা এলে সেখানে بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুধুমাত্র বংশগত সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কাজেই তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয় এবং তাতে সে ফল লাভ সম্ভব হতে পারে না, যা আন্তরিক ভালোবাসা ও আত্মিক সহানুভূতির মাধ্যমে হতে পারে। পক্ষান্তরে মুমিনগণ একে অপরের আন্তরিক বন্ধু এবং সত্যিকার মহানুভব। -[কুরতুবী]

আর তাদের এ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি যেহেতু একান্তভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকে, কাজেই তা প্রকাশ্যে, গোপনে এবং উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে একই রকম হয় এবং চিরকাল স্থায়ী হয়। নিষ্ঠাবান মুমিনের লক্ষণও এটিই। ঈমান ও নেক আমলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারেই কুরআন কারীম বলেছে- سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলের পাবন্দী অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পারিক আন্তরিক গভীর বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। বর্তমানকালে আমাদের ঈমান ও সৎকর্মের ক্রটির কারণেই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে এমনটি দেখা যায় না; বরং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পড়েছে।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য : এ আয়াত দ্বারা মুমিনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হলো যথা-

১. মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে ভ্রাতৃত্বভাব এবং মমত্ববোধ, কেননা তাদেরকে পরস্পরের বন্ধু বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
২. মুমিনের কাজ হলো ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া, ঈমান ও নেক আমলের দিকে মানুষকে আহ্বান করা।
৩. এমনিভাবে মুমিনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।
৪. সঠিকভাবে নামাজ কায়েম করা।
৫. যথানিয়মে জাকাত আদায় করা, তথা বান্দার হক্বের প্রতি দায়িত্ব পালনে সদা সক্রিয় থাকা।
৬. সব বিষয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এ কথাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ফরজ আদায় করাই যথেষ্ট নয়; বরং সকল অবস্থায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি আনুগত থাকা একান্ত কর্তব্য। আর এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক রয়েছে। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে কর্তব্য পালন করাও ঈমানের নিদর্শন। এতিম-মিসকিন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করাও মুমিনের বৈশিষ্ট্য, আর কোনো মুমিনকে কথায় বা কাজে কষ্ট দেওয়া মুমিনের জন্য বৈধ নয়। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি যে অন্য মুসলমানকে তার কথায় ও আচরণে কষ্ট দেয় না।

-[খোলাসাতুততাফাসীর খ. ১, পৃ. ২৫৯]

٧٣. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنٰفِقِيْنَ بِاللِّسَانِ وَالْحُجَّةِ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط بِالْاِنْتِهَارِ وَالْمَقْتِ وَمَاْوٰيهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِيَ ـ

٧٤. يَحْلِفُوْنَ اَيِ الْمُنَافِقُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط مَا بَلَغَكَ عَنْهُمْ مِنَ السَّبِّ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ اَظْهَرُوا الْكُفْرَ بَعْدَ اِظْهَارِ الْاِسْلَامِ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ج مِنَ الْفَتْكِ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ عِنْدَ عَوْدِهٖ مِنْ تَبُوْكَ وَهُمْ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَضَرَبَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وُجُوْهَ الرَّوَاحِلِ لَمَّا غَشُوْهُ فَرُدُّوْا وَمَا نَقَمُوْا اَنْكَرُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنٰيهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ط بِالْغَنَائِمِ بَعْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ اَلْمَعْنٰى لَمْ يَنَلْهُمْ مِنْهُ اِلَّا هٰذَا وَلَيْسَ مِمَّا يُنْقَمُ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا عَنِ النِّفَاقِ وَيُؤْمِنُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاٰخِرَةِ ط بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُهُمْ مِنْهُ وَّلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُهُمْ ـ

অনুবাদ :

৭৩. হে নবী! কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ কর এবং যবান ও যুক্তি প্রমাণাদির মাধ্যমে মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও; আর হুমকি ও ক্রোধ প্রদর্শন করত তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম প্রত্যাবর্তনস্থল।

৭৪. তারা অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, এরা গালি-গালাজ ও নিন্দাবাদ করে বলে আপনার নিকট যা পৌঁছেছে তার তারা কিছু বলেনি অথচ তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি করেছে। অর্থাৎ বাহ্যত ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করার পর তারা কুফরির কথা প্রকাশ করেছে। তারা যা কামনা করেছিল তাতে সফল হয়নি। তাবুক হতে ফেরার পথে একটি গিরিপথের সংকীর্ণ স্থানে কিঞ্চিৎ অধিক দশজন মুনাফিকের একটি দল অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে রাসূল ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। শেষে তারা পরিকল্পনানুযায়ী তাঁর উপর মুখোশ পরিহিত অবস্থায় আক্রমণ করলে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির এদের সওয়ারীর মুখে আঘাত করে এদেরকে প্রতিহত করেন। ফলে তারা নিষ্ফল হয়ে ফিরে যায়। বর্ণিত বাক্যটিতে আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় গণিমতসামগ্রী প্রদান করত এদের অভাবগ্রস্ততার পর তাদেরকে অভাবমুক্ত করছিলেন বলেই এরা দোষারোপ করে। অর্থাৎ অস্বীকার করে। তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট হতে এটা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ করেনি। আর এটা কোনোদিন দোষের কারণ হতে পারে না। এরা যদি মুনাফিকী হতে তওবা করত এবং ঈমান আনয়ন করতো তবে তা তাদের জন্য ভালো হতো। আর যদি ঈমান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আল্লাহ এদেরকে দুনিয়াতে হত্যার এবং পরকালে অগ্নির মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। পৃথিবীতে এদের কোনো অভিভাবক নেই যে এদেরকে আল্লাহ হতে হেফাজত করবে এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই। যে তাদের তরফ হতে উক্ত আজাব ঠেকিয়ে রাখবে।

٧٥. وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَهُوَ ثَعْلَبَةُ ابْنُ حَاطِبٍ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ يَّدْعُوَ لَهٗ اَنْ يَرْزُقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَيُؤَدِّىْ مِنْهُ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَدَعَا لَهٗ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ فَانْقَطَعَ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنَعَ الزَّكٰوةَ.

৭৫. এদের মধ্যে কেউ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিল যে, আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয় সদকা দিব এবং সৎ হবো। এই ব্যক্তিটি ছিল সা'লাবা ইবনে হাতিব। সে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট দোয়ার অনুরোধ করে। [এবং বলে, ধন হলে] সে প্রত্যেক হকদারের হক যথাযথভাবে আদায় করে দিবে। নবীজী ﷺ দোয়া করলেন। ফলে তার রিজিকে বহু বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু তখন সে জুমা ও জামাতে শরিক হওয়া পরিত্যাগ করে বসে এবং জাকাত পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। نَصَّدَّقَنَّ -তে মূলত ص -এ تَاء -এর اِدْغَامٌ বা সন্ধি হয়েছে।

٧٦. كَمَا قَالَ تَعَالٰى فَلَمَّا اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

৭৬. ঐ লোকটির কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন দান তখন তারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

٧٧. فَاَعْقَبَهُمْ اَىْ فَصَيَّرَ عَاقِبَتَهُمْ نِفَاقًا ثَابِتًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ اَىِ اللّٰهَ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ فِيْهِ فَجَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِزَكَاتِهٖ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَنَعَنِىْ اَنْ اَقْبَلَ مِنْكَ فَجَعَلَ يَحْثُوا التُّرَابَ عَلٰى رَاْسِهٖ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ثُمَّ اِلٰى عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ثُمَّ اِلٰى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَمَاتَ فِىْ زَمَانِهٖ.

৭৭. ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিণাম এই করলেন যে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থায়ী হয়ে রইল। কারণ, তারা আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং এতে তারা ছিল মিথ্যাচারী। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর উক্ত সা'লাবা জাকাত নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তোমার নিকট হতে তা গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা শুনে সে নিজের মাথায় মাটি ফেলতে শুরু করে। পরে হযরত আবূ বকরের আমলেও সে তা নিয়ে তাঁর নিকটও আসে; তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পরে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে তাঁর নিকটও তা নিয়ে আসে। তিনিও তা গ্রহণ করলেন না। অতঃপর হযরত উসমানের যুগে তাঁর নিকটও সে তা নিয়ে আসে তিনিও তা গ্রহণ করেননি অবশেষে তাঁর আমলেই সে মারা যায়। فَاَعْقَبَهُمْ অর্থ– অনন্তর তিনি তাদের এই পরিণাম করলেন।

৭৮. اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَيِ الْمُنَافِقُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ مَا اَسَرُّوْهُ فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَنَجْوٰىهُمْ مَا تَنَاجَوْا بِهٖ بَيْنَهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا غَابَ عَنِ الْعَيَانِ ـ

৭৮. তারা মুনাফিকরা কি জানত না যে, তাদের গোপন বিষয় অর্থাৎ তাদের অন্তরে যা গোপন করে রাখে এবং তাদের গোপন পরামর্শ অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে গোপন সলা-চক্রান্ত করে তাও আল্লাহ জানেন। আর নিশ্চয় তিনি গায়েব সম্পর্কে খুবই অবহিত। اَلْغُيُوْبِ অর্থ– যা দৃশ্যপট হতে অপসৃত, অদৃশ্য।

৭৯. وَلَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا فَنَزَلَ اَلَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ يَلْمِزُوْنَ يَعِيْبُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ الْمُتَنَفِّلِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ فَيَاْتُوْنَ بِهٖ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط وَالْخَبَرُ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز جَازَاهُمْ عَلٰى سُخْرِيَّتِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৭৯. সদকা সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলে জনৈক ব্যক্তি [সাহাবী] বহু পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সদকা করার জন্য নিয়ে আসেন। এতে মুনাফিকরা বলতে লাগল, রিয়াকার লোক দেখবার উদ্দেশ্যে সে তা নিয়ে এসেছে। অপর একজন সাহাবী স্বীয় সাধ্যানুযায়ী সামান্য এক ছা' [পৌনে দুই সের] খর্জুর নিয়ে আসলে মুনাফিকরা বলতে লাগল, "এত সামান্য সদকার প্রয়োজন আল্লাহর নেই।" এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– মুমিনদের মধ্যে যারা নফল সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কায়িক শক্তি ব্যয় ব্যতীত কিছুই পায় না আর তা নিয়েই তারা হাজির হয় তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন অর্থাৎ তিনি তাদের বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। اَلَّذِيْنَ-এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। سَخِرَ اللّٰهُ-এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। يَلْمِزُوْنَ অর্থ– তারা দোষারোপ করে।

৮০. اِسْتَغْفِرْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط تَخْيِيْرٌ لَهٗ فِى الْاِسْتِغْفَارِ وَتَرْكِهٖ قَالَ ﷺ اِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ يَعْنِى الْاِسْتِغْفَارَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط ـ

৮০. হে মুহাম্মদ! তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর একই কথা। এই বাক্যটিতে রাসূল ﷺ -কে এদের জন্য ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। সুতরাং ইস্তিগফার অর্থাৎ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমি গ্রহণ করে নিলাম। তুমি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।

قِيْلَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِيْنَ الْمُبَالَغَةُ فِيْ كَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ وَفِي الْبُخَارِيِّ حَدِيْثٌ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّيْ لَوْ زِدْتُّ عَلَى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَزِدْتُّ عَلَيْهَا وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْعَدَدُ الْمَخْصُوْصُ لِحَدِيْثِهِ أَيْضًا وَسَأَزِيْدُ عَلَى السَّبْعِيْنَ فَبُيِّنَ لَهُ حَسْمُ الْمَغْفِرَةِ بِآيَةِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

কেউ কেউ বলেন, আধিক্য বুঝার উদ্দেশ্যে এই স্থানে সত্তর বার সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সত্তর বারের অধিক করা হলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে বলে যদি জানতে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমি এরও অধিকবার তাদের জন্য ইস্তিগফার করতে প্রয়াস পেতাম। কেউ কেউ বলেন, এই স্থানে উক্ত সত্তর সংখ্যাটিকে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে। কারণ একটি হাদীসে আছে রাসূল ﷺ-ইরশাদ করেন, সত্তর বারেরও অধিক বার আমি [এদের জন্য] ইস্তিগফার করব। শেষে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [অর্থাৎ এদের জন্য ইস্তেগফার কর বা না কর একই কথা] এই আয়াতের মাধ্যমে এদের ক্ষমার আশা না করার কথা তাঁকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُنٰفِقُوْنَ : এটা বাবে مُفَاعَلَة হতে اِسْم فَاعِل -এর جَمْع مُذَكَّر -এর সীগাহ। অর্থ– দ্বিমুখী নীতি গ্রহণকারী। শরিয়েতের পরিভাষায় মুনাফিক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে মুখে ইসলামের স্বীকারোক্তি প্রদান করে; কিন্তু অন্তরে এর বিপরীত ভাব পোষণ করে। نَفَقٌ -এর মূল অর্থ হলো খরচ হয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া। نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ অর্থ– টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেল। نَافِقَاءُ অর্থ– গুইসাপের প্যাঁচ, গর্ত। যার কমপক্ষে দুটো মুখ থাকে, এক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে, শিকারী সেদিকে মনোযোগী হয়। আর অন্য মুখ দিয়ে গুইসাপ বেরিয়ে চলে যায়। মুনাফিকও মৌখিক স্বকিারোক্তি দ্বারা ইসলামে প্রবেশ করে আর আন্তরিক বিশ্বাস না থাকার কারণে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। রাসূল ﷺ -এর যুগে মুনাফিক পুরুষের সংখ্যা ছিল তিনশত জন। আর মুনাফিক নারীর সংখ্যা ছিল একশত সত্তর জন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের গুণাবলি এবং তাদের জন্যে সংরক্ষিত নিয়ামতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে ছওয়াব এবং আজাবের কথা পাশাপাশি থাকে। সৎকাজের ছওয়াব বা শুভ পরিণতির আশা যেখানে থাকে, সেখানেই অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের জন্য দোজখের কঠোর শাস্তির ঘোষণা করা রয়েছে। যেহেতু প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা এবং মহানুভবতার কারণে মুনাফিকদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করতেন, তাই এ আয়াতে মুনাফিকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে।

মুনাফিকরা মুখে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো; কিন্তু অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ পুষে ষড়যন্ত্র করতো, তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন, হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের সঙ্গে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। বিনম্র ও ভদ্র ব্যবহারের যোগ্য তারা নয়, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, তাই তাদের সাথে দুশমনের ন্যায় ব্যবহার করুন। তাদের ঠিকানা হলো দোজখ আর তা হলো অত্যন্ত মন্দ ও নিকৃষ্ট ঠিকানা।

এ পর্যায়ে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জিহাদ অর্থ হলো কেনো অপ্রিয় বিষয়কে প্রতিরোধ করা বা তাকে অপসারণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ জিহাদ শুধু যে অস্ত্র দ্বারা হয় তা নয়, কখনো হাতে, কখনো কলমে, কখনো মুখে কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতে জিহাদকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে বলে তাফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ১৩৫]

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হলো মৌখিক জিহাদ অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এতে غِلْظ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোনো রকম ছাড় বা কোমলতা যেন প্রদর্শন না করা হয়। এ শব্দটি رَأْفَتْ -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হলো কোমলতা ও করুণা। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غَلَظَتْ শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরিয়তের হুকুম জারি করতে গিয়ে কোনো রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা নবী-রাসূলগণের রীতিবিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন- إِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا "যদি তোমাদের কোনো ক্রীতদাসী জেনায় লিপ্ত হয়, তবে শরিয়ত অনুযায়ী তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না।" -[তাফসীরে কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ "আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতিনীতিতেও কোথাও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

জ্ঞাতব্য : একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম যেখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে غَلَاظَتْ বা কটুবাক্য অবলম্বন করেনি, ইদনীংকালে মুসলমান অপর মুসলমানদের সম্পর্কে অবলীলাক্রমে তাই ব্যবহার করে চলেছে এবং কিছুলোক তো এমনও রয়েছে, যারা একে দীনের খিদমত বলে মনে করে আনন্দিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ -তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরি সব কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের শুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের শানেনুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ গযওয়ায়ে তাবুকের ক্ষেত্রে এক ভাষণ দান করেন, যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজে বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু বলেন, তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা [মুনাফিকরা] গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট আর এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রা.) নামক এক সাহাবী শুনে ফেলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রা.) এ ঘটনা মহানবী ﷺ -কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রা.) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে [আমি এমন কথা বলিনি]। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে 'মিম্বরে নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, "আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে।" হযরত আমের (রা.)-এর পালা এলে তিনিও [নিজের বক্তব্য সম্পর্কে] কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বলেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীল আমিন ওহী নিয়ে হাজির হন, যাতে উল্লিখিত আয়াতখানি নাজিল হয়। জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি স্বীকার করছি যে এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবনে কায়েস (রা.) যা কিছু বলেছেন, তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়। -[তাফসীরে মাযহারী]

কোনো কোনো তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষত এজন্য যে. আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে- وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا "অর্থাৎ তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা

কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, যাতে মুনাফিকরা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করেছিল; যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বারজন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে ছিল যে, মহানবী ﷺ যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে হযরত জিবরীল আমিন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীন চক্রান্ত ধুলিসাৎ হয়ে যায়। এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াত– وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ ; এটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারী রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করল যে, হুজুর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরিকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদিনার পাহাড় সোনা হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল। এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করে দিলেন, যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমন কি মদিনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে জোহর ও আসরের নামাজ মদিনায় এসে মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে আদায় করতো এবং অন্যান্য নামাজ সেখানেই পড়ে নিত, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদিনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোনো একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাজের জন্য সে মদিনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাজ সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদিনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুমা ও জামাআত সবকিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালমাল এত বেশি বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করেছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রাসূলে কারীম ﷺ একথা শুনে তিনবার বললেন– يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ সা'লাবার প্রতি আফসোস! সা'লাবার প্রতি আফসোস! সা'লাবার প্রতি আফসোস!

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্কার আয়াত নাজিল হয়, যাতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্কা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়– خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ; তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করে দু'জন লোককে সদকা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবার কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবা বলতে লাগল, এতো জিযয়া' কর হয়ে গেল যা অমুসলমানদের কাছে থেকে আদায় করা হয়! তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। তারা চলে গেলেন।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী ﷺ -এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত তথা পশু উট-বকরিসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নিসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাজির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি তো নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় প্রকাশ করে বললেন, আমি নিজের খুশিতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন!

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানের সদকা আদায় করে সা'লাবার কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এতো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল, যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয়। যাহোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে চিন্তা করে একটি সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদিনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ– يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ [অর্থাৎ সা'লাবার উপর আফসোস!] কথাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়– وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা

আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ যদি তাদের ধনসম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মতো সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজনও গরিব-মিসকিনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন যাতে তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

জ্ঞাতব্য : এতে বোঝা যায় যে, কোনো কোনো অসৎ কর্মের এমন অশুভ পরিণতি ঘটে যে, তাতে তওবা করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। **'নাউযুবিল্লাহ মিনহু'** [এহেন অবস্থা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই]।

হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সেই বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো, ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন যে, **রাসূলুল্লাহ** ﷺ **যখন** সা'লাবার ব্যাপারে يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ তিন তিন বার বলেন, তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় আত্মীয় এবং **আপনজনও উপস্থিত ছিল।** হুজুর ﷺ -এর এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার **কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে** ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সা'লাবা **ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাজির হয়ে** নিবেদন করল, হুযুর! আমার সদকা কবুল করে নিন। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা **আমাকে তোমার সদকা কবুল** করতে বারণ করে দিয়েছেন। এ কথা শনে সা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। হুজুর ﷺ **বললেন,** এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। **এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে না।** তখন সা'লাবা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই **মহানবী** ﷺ **-এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত** আবূ বকর (রা.) খলীফা হলে সা'লাবা সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর **খেদমতে হাজির হয়ে তার** সদকা কবুল করার **আবেদন জানাল।** সিদ্দীকে আকবর (রা.) উত্তর দিলেন, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ **-ই কবুল করেননি, তখন আমি** কেমন করে কবুল করব!

তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর ওফাতের পর সা'লাবা **ফারূকে** আযম (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয় এবং সেই আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে আকবর (রা.) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালেই সা'লাবার মৃত্যু হয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهُ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ : অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন একই কথা, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও **আল্লাহ পাক কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।**

শানে নুযূল : আব্দুল্লাহ ইবনে **উবাই** ছিল মুনাফিক সর্দার। **কিন্তু তার পুত্র ছিল প্রকৃত মুমিন, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই** মৃত্যু শয্যায় ছিল তখন তার মুমিন পুত্র আব্দুল্লাহ প্রিয়নবী ﷺ -এর **দরবারে তার** মাগফেরাতের **জন্য দোয়া করার আরজি পেশ** করলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ৭০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন মুনাফিকদের **সম্পর্কে** পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হয় তখন তারা বলে, হে **আল্লাহর রাসূল!** আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হুজুর ﷺ **বলেন,** অচিরেই আমি তোমাদের জন্য ইস্তেগফার **করবো।** এরপর প্রিয়নবী ﷺ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুরু **করলেন,** তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الخ এরপর মহানবী ﷺ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পরিত্যাগ **করলেন। হযরত** হাসান বসরী (রা.) বলেছেন, মুনাফিকরা **হুজুর** ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তাদের নানা ওজর **আপত্তির কথা বলতো** এবং এ কথাও বলতো যে, আমাদের নিয়ত ছিল মহৎ, আমরা আপনাদের সাথে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু **কামনা করি না তখন** এ আয়াত নাজিল হয়। আর অন্য **একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন** মদিনায় মসজিদে নববীতে হুজুর ﷺ **খুৎবা দিতেন তখন** আব্দুল্লাহ ইবনে **উবাই** দাঁড়িয়ে বলতো, **ইনি হলেন** আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মানিত করেছেন, **মর্যাদাসম্পন্ন** করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন। **কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের** দিন এই আব্দুল্লাহ ইবনে **উবাই** ইবনে সলুল **বিশ্বাসঘাতকতা** করে তার তিনশ লোক নিয়ে রণাঙ্গন **থেকে পলায়ন** করেছে। ওহুদের যুদ্ধের পরও সে পূর্বের ন্যায় প্রিয়নবী ﷺ -এর ভাষণের পর বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য **দাঁড়ালো।** তখন হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর দুশমন! বসে পড় তোমার কুফুরি ও নাফরমানি সবদিক থেকে **প্রকাশ** পেয়েছে। তখন সে মসজিদে নববী থেকে বের হয়ে পড়লো। তার সম্প্রদায়ের একজনের সাথে তার দেখা হলে সে **জিজ্ঞাসা** করলো, তোমার কি হয়েছে? সে ঘটনা বর্ণনা করল। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি আল্লাহর রাসূলের নিকট ফিরে যাও তিনি তোমার জন্য ইস্তেগফার করবেন। সে বলল, তিনি আমার জন্য ইস্তেগফার করুক বা না করুক, আমি পরোয়া করি না। তখন নাজিল হলো- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয় এসো! তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ইস্তেগফার করবেন, তখন তারা ঘাড় বাঁকা করে চলে যায়। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১৬, পৃ. ১৪৬, তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১০, পৃ. ১৪৮]

٨١. فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ عَنْ تَبُوْكَ بِمَقْعَدِهِمْ بِقُعُوْدِهِمْ خِلَافَ اَىْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْآ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَا تَنْفِرُوْا لَا تَخْرُجُوْا اِلَى الْجِهَادِ فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط مِنْ تَبُوْكَ فَالْاَوْلٰى اَنْ تَتَّقُوْهَا بِتَرْكِ التَّخَلُّفِ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا تَخَلَّفُوْا.

অনুবাদ :

৮১. যারা তাবুক যুদ্ধ হতে পশ্চাতে রয়েছিল তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করত مَقْعَدِهِمْ -অর্থ এদের বসে থাকা। তাঁরা চলে যাওয়ার পর ঘরে বসে থাকতেই আনন্দ লাভ করেছে এবং নিজেদের জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদ করা তারা পছন্দ করেনি। তারা বলেছিল, একজন অপরজনকে বলেছিল, গরমের মধ্যে জেহাদের অভিযানে বের হয়ো না। বল, জাহান্নামের আগুন তাবূক প্রান্তর হতে আরো অধিক উত্তপ্ত। সুতরাং তাবূক যুদ্ধ হতে পশ্চাতে না থেকে জাহান্নামাগ্নি হতে মুক্তিলাভের প্রয়াস পাওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি তারা তা বুঝতো জানতো তবে আর তারা পশ্চাতে পড়ে থাকতো না।

٨٢. فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا فِى الدُّنْيَا وَلْيَبْكُوْا فِى الْاٰخِرَةِ كَثِيْرًا ج جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ خَبَرٌ عَنْ حَالِهِمْ بِصِيْغَةِ الْاَمْرِ.

৮২. তারা দুনিয়ায় কিঞ্চিত হেসে নিক পরকালে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁরা প্রচুর কাঁদবে। এই স্থানে اَمْر বা নির্দেশবাচক শব্দ [فَلْيَضْحَكُوْا، فَلْيَبْكُوْا] দ্বারা মূলত তাদের বাস্তব অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

٨٣. فَاِنْ رَّجَعَكَ رَدَّكَ اللّٰهُ مِنْ تَبُوْكَ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ مِمَّنْ تَخَلَّفَ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ مَعَكَ اِلٰى غَزْوَةٍ اُخْرٰى فَقُلْ لَّهُمْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ط اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ عَنِ الْغَزْوِ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ.

৮৩. আল্লাহ যদি তোমাকে তাবূক হতে তাদের অর্থাৎ যে সমস্ত মুনাফিক মদিনায় রয়ে গেছে তাদের কোনো দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার সাথে অন্য কোনো অভিযানে বের হতে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন এদেরকে বলবে, তোমরা তো আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবারই বসে থাকা পছন্দ করেছিলে সুতরাং যারা পিছনে থাকে অর্থাৎ শিশু, নারী ইত্যাদি যারা যুদ্ধ হতে পিছনে থাকে তাদের সাথেই তোমরা বসে থাক। رَجَعَكَ -অর্থ তোমাকে ফিরিয়ে নেন।

٨٤. وَلَمَّا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَى ابْنِ اُبَىٍّ نَزَلَ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ط لِدَفْنٍ اَوْ زِيَارَةٍ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ كٰفِرُوْنَ.

৮৪. মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসূল ﷺ তাঁর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাজা আদায় করবে না এবং তার কবরে] দাফন বা জিয়ারতের উদ্দেশ্যেও দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় কাফের অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

٨٥. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ تَخْرُجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ـ

৮৫. তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো তার মাধ্যমেই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান আর কাফের অবস্থায় যেন তাদের আত্মা বের হয়। দেহত্যাগ করে।

٨٦. وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَىْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَنْ اَىْ بِاَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ ذَوُو الْغِنٰى مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقَاعِدِيْنَ ـ

৮৬. আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর এই মর্মে যখন কোনো সূরা অর্থাৎ কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হয়, তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি আছে অর্থাৎ যারা অর্থ ও সামর্থ্যের অধিকারী তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা বসে থাকে, আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব। اَنْ -এটা এই স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٧. رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ جَمْعُ خَالِفَةٍ اَىِ النِّسَاءِ اللَّاتِىْ تَخَلَّفْنَ فِى الْبُيُوْتِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ الْخَيْرَ ـ

৮৭. এরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে। তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা মঙ্গল কি তা বুঝতে পারে না। اَلْخَوَالِفُ শব্দটি خَالِفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ঐ সমস্ত নারী যারা ঘরে অবস্থান করে।

٨٨. لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

৮৮. তবে রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তাদের জন্য রয়েছে **ইহকাল ও পরকালের** কল্যাণ। আর তারাই **সফলকাম**।

٨٩. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এটাই মহা সাফল্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُخَلَّفُوْنَ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে اِسْم مَفْعُوْل -এর جَمْع مُذَكَّر -এর সীগাহ, অর্থ– পিছনে ফেলে আসা লোকজন। تَخْلِيْف বলা হয় কোনো কিছুকে **পেছনে** করে দেওয়া, পিছনে ফেলে দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্যে সেই বারো জন লোক যারা স্বীয় অলসতা ও নেফাকের **কারণে রাসূল** ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি।

قَوْلُهُ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَىْ خَلْفَهٗ : এখানে خِلٰفَ শব্দটি مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ– قَعَدُوْا لِمُخَالَفَتِهٖ অথবা حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ– مُخَالِفِيْنَ لَهٗ ; আবার উহ্য ফে'লের কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ– تَخَلَّفُوْا خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ আবার এটা ظَرْفِيَّة -এর কারণে مَنْصُوْب হওয়াও জায়েজ। অর্থাৎ– بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ; আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ মতটিকেই পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهُ بِتَعَوُّدِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَقْعَد -এর مِيم -টি হলো مَصْدَر مِيْمِى ; এটা ظَرْف -এর مِيْم নয়।

قَوْلُهُ وَكَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا : এর আতফ হয়েছে فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ -এর উপর এবং اَنْ يُّجَاهِدُوْا বাক্যটি كَرِهُوْا -এর مَفْعُوْل হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا تَخَلَّفُوْا : এটা لَوْ -এর জবাব, যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ خَبَرٌ عَنْ حَالِهِمْ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, আল্লাহ তা'আলা হাসির নির্দেশ দেন না, অথচ এখানে فَلْيَضْحَكُوْا আমরের সীগাহ ব্যবহার হয়েছে; যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তর. এখানে أَمْر টা خَبَر অর্থে হয়েছে; অর্থাৎ তাদের অবস্থার সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য। ضِحْك -এর নির্দেশ দেওয়া উদ্দেশ্যে নয়।

قَوْلُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ : এটা দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে সূরা দ্বারা পূর্ণ সূরা উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনের একটা অংশ উদ্দেশ্য। এতে পূর্ণ এবং তার চেয়ে কম সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ الخ : এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখিরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহিদীনের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া এবং পরবর্তী কোনো জিহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। مُخَلَّفُوْنَ শব্দটি مُخَلَّفٌ -এর বহুবচন। অর্থ– 'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জিহাদ বর্জনকারী' নয়; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

قَوْلُهُ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ : এতে خِلَافَ অর্থ– 'পেছনে বা 'পরে'। আবূ ওবায়দা (র.)-এর অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে, যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। لِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قُعُوْدٌ [বসে থাকা] –এর মূলধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خِلَافٌ অর্থ– مُخَالَفَتْ তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্য লোকদেরকেও একথাই বুঝাল যে– لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ [এমন] গরমের সময় জিহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময় সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন– قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুত এর ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানির দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশি? অতঃপর বলেন– فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম' কাঁদো বেশি'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাফসরিবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারবের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনটি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তারা আনন্দ ও হাসি প্রকাশ করবে, তবে সেটা অতি সাময়িক। এরপর আখিরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে– اَلدُّنْيَا قَلِيْلٌ فَلْيَضْحَكُوْا فِيْهَا مَا شَاءُوْا فَاِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَصَارُوْا اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْتَانِفُوا الْبُكَاءَ بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا অর্থাৎ দুনিয়া সামান্য কয়েকদিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে, যা আর বন্ধ হবে না। –[তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয় আয়াতে لَنْ تَخْرُجُوْا বলা হয়েছে। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এর মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না, যখন রওয়ানা হওয়ার সময় হবে, পূর্বেকার মতোই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তারা নিজেরাও যখন কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোনো কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। বস্তুত তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসেবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোনো জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া না হয়।

قَوْلُهُ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুনাফিকদের উপর নামাজে জানাজা আদায় না করার নির্দেশ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মৃত্যু হলে তার পুত্র হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের পিতার জন্য তার একটি জামা দানের আরজি পেশ করে। হুজুর ﷺ তাকে তা দান করেন। এরপর তাকে জানাজা পড়াবার জন্যে আবেদন করলে তিনি জানাজা পড়াবার জন্য তৈরি হন। তখন হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ পাক মুনাফিকদের জানাজা পড়াবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি বা না করি সবই সমান। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যদি সত্তর বারও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি তবুও আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না। আমি তার জন্যে সত্তর বারের চেয়েও অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে সহীহ হাদীসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ আয়াতটি মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাজা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সহীহাইন [অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম] -এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাজায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়েন। নামাজ পড়ার পরই এ আয়াত নাজিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোনো মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়েননি।

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রথমত প্রশ্ন উঠে এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল, যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মুবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন?

উত্তর. এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। যথা– ১. তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠবান সাহাবী ছিলেন, তাঁর আবেদন। অর্থাৎ শুধুমাত্র তাঁর মনতুষ্টির জন্য তিনি এমনটি করেছিলেন। ২. অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গাযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী ﷺ -এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুজুর ﷺ দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হোক। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মতো লাগছিল না। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সে ইহসানের বদলা হিসেবেই মহানবী ﷺ নিজের জামা মুবারক তাকে দিয়ে দেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় প্রশ্ন. এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারূকে আযম (রা.) যে মহানবী ﷺ -কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মুনাফিকদের নামাজ পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোনো আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর (রা.) বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাজের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী ﷺ এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না কেন; বরং তিনি তো বললেন যে, এ আয়াতটিতে আমাকে মুনাফিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

উত্তর. প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলির বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়; বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফিরাত হবে না যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুজুরকে বারণও করা হয়নি। কুরআনে কারীমের সূরা ইয়াসিনের এক আয়াতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে– سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ; এ আয়াতে মহানবী ﷺ -কে দীনের তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি; বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়। যেমন– بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অথবা اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী ﷺ -কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলিলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী ﷺ উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের মাগফেরাত হবে না! কিন্তু অপর কোনো আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি প্রদর্শনে বাধাও দেওয়া হয়নি। আর মহানবী ﷺ জানতেন যে, আমার কামীসের কারণ কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত তো হবে না; কিন্তু এতে অন্যান্য দীনি কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্য কাফেররা যখন হুজুর ﷺ -এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে তখন

তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তা ছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু [মুনাফিকের] জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়ে নেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশি দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম। -[তাফসীরে কুরতুবী]
দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সে হাদীস যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না, তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোনো কোনো তাফসীরগ্রন্থে রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাজরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুজুর ﷺ -এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের এ কাজের দরুন এই মুনাফিকের মাগফিরাত তথা পাপমুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলিতে বাহ্যত এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল অন্য কোনো আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপরদিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামাজ পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আযম (রা.) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফিরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাজে জানাযা পড়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলে মকবুল ﷺ যদিও এ কাজটি মূলত কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাজের উপর কোনো আপত্তি থাকে, না ফারূকে আযম (রা.)-এর কথায় কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]
অবশ্য পরিষ্কারভাবে যখন لَا تُصَلِّ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল, তখন প্রতীয়মান হলো যে, যদিও জানাজার নামাজ পড়ার পেছনে একটি দীনী কল্যাণ নিহিত ছিল; কিন্তু এতে একটি অপকারিতাও বিদ্যমান ছিল। সেদিকে মহানবী ﷺ -এর খেয়াল হয়নি। তা ছিল এই যে, স্বয়ং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনে এ কাজের দরুন উৎসাহহীনতা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর নিকট নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুনাফিক সবাইকে একই পাল্লায় মাপা হয়। এ আশঙ্কার প্রেক্ষিতে কুরআনে এই নিষেধাজ্ঞা নাজিল হয়। অতঃপর মহনবী ﷺ কোনো মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়েননি।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কোনো কাফেরের জানাযার নামাজ পড়া এবং তার জন্য মাগফেরারেত দোয়া করা জায়েজ নয়।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা জেয়ারত করতে যাওয়া জায়েজ নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থি নয়। যেমন হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোনো মুসলমানের কোনো কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোনো ওলী-ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় সুন্নত নিয়মের লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁতে পারে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে; যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহর নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নিয়ামত পাবে?

এর উত্তরে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো রহমত ও নিয়ামত নয়; বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আজাব বিশেষ। আখিরাতের আজাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আজাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধনসম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধনসম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আজাবের কারণ হিসেবেও এগুলোকে আজাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধন সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُوا الطَّوْلِ শব্দটি সক্ষম লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সক্ষম নয় অর্থাৎ যারা অক্ষম এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওজরও ছিল [যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত]।

অনুবাদ :

٩٠. وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَيِ الْمُعْتَذِرُوْنَ بِمَعْنَى الْمَعْذُوْرِيْنَ وَقُرِئَ بِهِ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ فِي الْقُعُوْدِ لِعُذْرِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ط فِي ادِّعَاءِ الْإِيْمَانِ مِنْ مُنَافِقِي الْأَعْرَابِ عَنِ الْمَجِيْءِ لِلْإِعْتِذَارِ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

৯০. মরুবাসীদের মধ্যে কিছু অজুহাত পেশকারীরা তাদের ওজর-অসুবিধার কারণে তাদেরকে বসে থাকতে অনুমতি প্রদানের জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট এসেছিলেন। অনন্তর তিনি তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন আর যারা অর্থাৎ মরুবাসী মুনাফিকদের যারা অজুহাত পেশ করতে এসে ঈমানের বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। اَلْمُعَذِّرُوْنَ শব্দটি মূলত ছিল اَلْمُعْتَذِرُوْنَ; এটার ذ বর্ণে تَاء -এর إِدْغَام অর্থাৎ সন্ধি সাধিত হয়েছে। اَلْمَعْذُوْرُوْنَ অর্থ– অজুহাত ওয়ালাগণ, অপারগতা প্রকাশকারীগণ, কৈফিয়তদাতাগণ। অপর এক কেরাতে এইরূপেই পঠিত রয়েছে।

٩١. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ كَالشُّيُوْخِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى كَالْعُمْيِ وَالزَّمْنٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ فِي الْجِهَادِ حَرَجٌ إِثْمٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ط فِيْ حَالِ قُعُوْدِهِمْ بِعَدَمِ الْإِرْجَافِ وَالتَّثْبِيْطِ وَالطَّاعَةِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ بِذٰلِكَ مِنْ سَبِيْلٍ ط طَرِيْقٍ بِالْمُؤَاخَذَةِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لَهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ فِي التَّوْسِعَةِ فِيْ ذٰلِكَ.

৯১. বসে থাকাকালে মন্দকাজ ও জিহাদ হতে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে এবং আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে যারা দুর্বল, যেমন বৃদ্ধগণ, যারা পীড়িত যেমন অন্ধ ও বিকলাঙ্গগণ এবং যারা জিহাদের ব্যয় নিবাহ করতে অসমর্থ জিহাদ হতে পশ্চাতে থাকায় এদের কোনো অসুবিধা নেই, অপরাধ নেই। এতদ্বিষয়ে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অভিযুক্ত করার কোনো কারণ নেই, কোনো পথ নেই। এই সম্পর্কে উদারতা প্রদর্শনে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল এদের সম্পর্কে পরম দয়ালু।

٩٢. وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقِيْلَ بَنُوْ مُقْرِنٍ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص حَالٌ تَوَلَّوْا جَوَابُ إِذَا أَيِ انْصَرَفُوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ تَسِيْلُ مِنَ لِلْبَيَانِ الدَّمْعِ حَزَنًا لِأَجْلِ أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ فِي الْجِهَادِ.

৯২. তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো হেতু নেই যারা তোমার সাথে যুদ্ধ যাত্রার জন্য তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে "তোমাদেরকে আরোহণ করার মতো কিছু তো পাচ্ছি না। জিহাদ অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে তারা অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল। এরা ছিলেন সাতজন আনসারী সাহাবী। কেউ বলেন, এরা হলেন বনূ মুকরিনের কতিপয় লোক। قُلْتَ -এটা حَالٌ -বাচক বাক্য; تَوَلَّوْا -এটা পূর্বাল্লিখিত إِذَا -এর জওয়াব। অর্থ– তখন তারা ফিরে গেল। تَفِيْضُ অর্থ– প্রবাহিত হচ্ছিল। مِنْ -এটা এই স্থানে بَيَانٌ বা বিবরণব্যঞ্জক। أَلَّا يَجِدُوْا -এই বাক্যটি হেতুবোধক। তাই এটার পূর্বে তাফসীরে لِأَجْلِ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٣. وَإِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ فِي التَّخَلُّفِ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ ـ

৯৩. যারা সামর্থ্যশালী হয়েও তোমার নিকট পশ্চাতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের হেতু রয়েছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে; আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। ফলে, তারা বুঝতে পারে না। এই ধরনের আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُعَذِّرُوْنَ :- এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَعْذِيْرٌ মাসদার থেকে اِسْم فَاعِلْ -এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ; অর্থ হলো ছোট ওজর পেশকারী। মুফাসসির (র.) مُعَذِّرُوْنَ -এর মূল مُعْتَذِرُوْنَ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مُعَذِّرُوْنَ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে এসেছে। تَفْعِيْل থেকে নয়। তখন এর অর্থ হবে বাস্তবিক পক্ষেই মাজুর।

قَوْلُهُ اَلزَّمْنٰى : এটা زَمَانَةٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো- বিকলাঙ্গ, অক্ষম।

قَوْلُهُ اِرْجَافٌ : এর অর্থ হলো গুজব ছাড়ানো, বিপর্যয় ছড়িয়ে দেওয়া, মুমিনদের মধ্যে খারাপ সংবাদ প্রচার করা। بِعَدَمِ الْاِرْجَافِ এটা نَصَحُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلتَّثْبِيْطِ : অর্থ– বাধা দেওয়া, বিরত রাখা।

قَوْلُهُ وَالطَّاعَةِ : এর আতফ হয়েছে عَدَمِ الْاِرْجَافِ -এর উপর। শুধু اِرْجَافٌ -এর উপর নয়। কাজেই এখন অর্থ ঠিক হয়ে গেল।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ قُلْتَ لَا أَجِدُ এটা أَتَوْكَ -এর كَافٌ থেকে قَدْ উহ্য থাকার সাথে حَالٌ হয়েছে। কাজেই এ প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল যে, قَدْ -বিহীন مَاضِيْ -টা حَال হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মদিনা শহরের মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে গ্রাম্য এলাকার মুনাফিকদের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৫৮, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৯১]

প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করলেন, তখন যারা ইসলামের বিরোধিতা করতে সাহস পেলো না, তারা প্রকাশ্যে ইসলামের দাবিদার হলো; কিন্তু গোপনে ইসলামের দুশমনই রয়ে গেল। এরাই মুনাফিক। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। মদিনা শহরে যেমন খাঁটি মুসলমানগণ বাস করতেন, তাঁদের সঙ্গে এ মুনাফিকরাও থাকত, ঠিক তেমনিভাবে গ্রাম্য এলাকায় যেখানে বেদুঈনরা বাস করতো, সেখানেও খাঁটি মুসলমানদের পাশাপাশি মুনাফিকরাও থাকত। আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাই ইরশাদ হয়েছে। তারা অভাব-অনটনের ওজর আপত্তি পেশ করে বলেছে যে, আমরা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, আমাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দিন!

মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, কিছু মুনাফিক হুজুর ﷺ -এর খেদমতে জিহাদ থেকে অব্যাহিত লাভের আবেদন করে, অথচ তাদের কোনো ওজর ছিল না, তিনি তাদেরকে অনুমতি দান করেন। ইবনে মরদূবিয়া হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদের জন্যে আহ্বান করলেন, তখন ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তি জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি তাকে অনুমতি দান করেন। এরপর আরো কিছু মুনাফিক আসে, তিনি তাদেরকেও অনুমতি দান করেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এরা বনূ গিফার গোত্রের লোক। এদের সংখ্যা দশের কম ছিল। যাহহাক (র.) লিখেছেন, যাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, তারা হলো আমের ইবনে তোফায়েলের সম্প্রদায়। তারা এসে এভাবে আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি আমরা জিহাদে যেতাম, তবে তাঈ গোত্রের জঙ্গী লোকেরা আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং জন্তুগুলো লুট করে নিয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন "আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নে আমাকে তোমাদের খবর দিয়েছেন, ভবিষ্যতে তোমাদের আর প্রয়োজন হবে না, আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যারা টালবাহানা করে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, হুজুর ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ : যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সেই মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ করে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, যারা আল্লাহর রাসূলের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহ হয়েছে, তাদের সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে বিশেষ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যারা কুফর ও নাফরমানির কারণে জিহাদে শরিক হয়নি, তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পৌঁছবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যারা নিতান্ত গাফলতের কারণে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, তাদের জন্যে শাস্তির ঘোষণা নয়; বরং যারা কুফর ও নাফরমানি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, তাদের সম্পর্কেই এ শাস্তির ঘোষণা।

ইবনে আবি হাতেম (র.) লিখেছেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লেখক ছিলাম আর সূরা বারাআত লিখছিলাম, কলমকে আমার কানের উপর রেখেছিলাম। হুজুর ﷺ ওহীর অপেক্ষা করেছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ লোক এসে আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি অন্ধ, আমার সম্পর্কে কি আদেশ রয়েছে? ঠিক তখনই নাজিল হলো- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى অর্থাৎ যারা দুর্বল, অসুস্থ এবং যাদের নিকট ব্যয় করার মতো কিছু নেই, তাদের কোনো দোষ নেই, যদি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মন পরিষ্কার থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে যারা জিহাদের ব্যাপারে মিথ্যা ওজর আপত্তি পেশ করে অব্যাহতি চেয়েছে তাদের কথা ছিল, আর এ আয়াতে যারা সত্যিই আপারগ, অক্ষম তাদের কথা ইরশাদ হয়েছে। শারীরিক বা আর্থিক অসুবিধার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যারা অপারগ, তাদের গুনাহ হবে না বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ضُعَفَاء শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো পঙ্গু, বৃদ্ধ, দুর্বল এবং অসহায়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো শিশু। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো মহিলা। এমনিভাবে, যারা অন্ধ তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব লোক জিহাদে শরিক না হলে কোনো গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আনুগত্য থাকতে হবে এবং তারা রসনা ও আমলের মাধ্যমে যথাসম্ভব ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করবে।

জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দন : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট আরজি পেশ করে বলেছিলেন, আমাদের জন্যে কিছু যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিন! যখন তাদেরকে প্রিয়নবী ﷺ জানিয়ে দিলেন যে, যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা আপততো সম্ভব নয়, তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। এমন কি, তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা অবশেষে এ কথাও বলেছিলেন, আমাদের জন্যে জুতা মোজার ব্যবস্থা করে দিন যেন আমরা আপনাদের পাশাপাশি পদব্রজে দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে পারি। অবশেষে কোনো ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে গেলেন।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মরদূবিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের এক দল হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে যানবাহনের আবেদন পেশ করলেন। এ সাহাবীগণ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু হুজুর আকরাম ﷺ -এর সঙ্গী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত হয়ে ফেরত গেলেন এজন্যে যে, ব্যয় করার মতো তাদের কাছে কিছুই ছিল না।

ইবনে ইসহাক ইউনুস এবং ইবনে ওমরের সূত্রে লিখেছেন, আলীয়া ইবনে যায়েদ যখন কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না এবং হুজুর ﷺ -এর নিকটও কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তখন তিনি রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। এরপর এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি জিহাদের আদেশ দিয়েছে এবং এজন্য অনুপ্রাণিত করেছ, অথচ আমার নিকট কোনো যানবাহন নেই। এখন আমি আমার যা কিছু রয়েছে সবই মুসলমানদের জন্যে সদকা করব, সে হকের জন্যে যা আমার উপর বর্তায়। আর এ দায়িত্ব পালনে আমার সম্পদ অথবা দেহ অথবা সম্মান সবই ব্যয় করবো। যখন সকাল হলো, তখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আলীয়া (রা.)ও হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আজ রাতে সদকা দানের অঙ্গীকারকারী কোথায়? সমস্ত লোক নীরব ছিলেন, এমন সময় আলীয়া দণ্ডায়মান হয়ে হুজুর ﷺ -কে তাঁর কথা জানিয়ে দিলেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার জন্যে সুসংবাদ, শপথ সে আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তোমার সদকা কবুল হয়েছে এবং তা জাকাত হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, যানবাহনের ব্যবস্থা না হওয়ায় কয়েকজন সাহাবী ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাদের মধ্যে আবু ইয়ালা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফালও ছিলেন। পথে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো ইয়ামিন ইবনে আমর নাজারীর সঙ্গে। তাদেরকে ক্রন্দনরত দেখে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললেন, আমরা যানবাহনের অভাবে তাবুকের জিহাদে শরিক হতে পারছি না। হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়েছিলাম, তাঁর নিকটও কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, এ অভিযানে তাঁর সঙ্গী না হতে পারা আমাদের জন্যে অসহনীয়। ইয়ামিন তাঁদের ক্রন্দনের কারণ জানতে পেরে তাঁদেরকে একটি উষ্ট্র এবং প্রত্যেককে আট সের করে খেজুর দিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রা.) দু' ব্যক্তির জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেন এবং হযরত ওসমান (রা.) আরো তিনজনের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন যাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হয়নি, তাদের সংখ্যা ছিল ষোল। তাদের কয়েকজনের এভাবে ব্যবস্থা হয় যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শুধু সাতজন এমন রয়েছেন যারা জিহাদে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে– وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ অর্থাৎ তাদের দোষ নেই, যারা আপনার নিকট যানবাহনের জন্যে হাজির হলে আপনি বলেছিলেন, আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাতে পারি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত